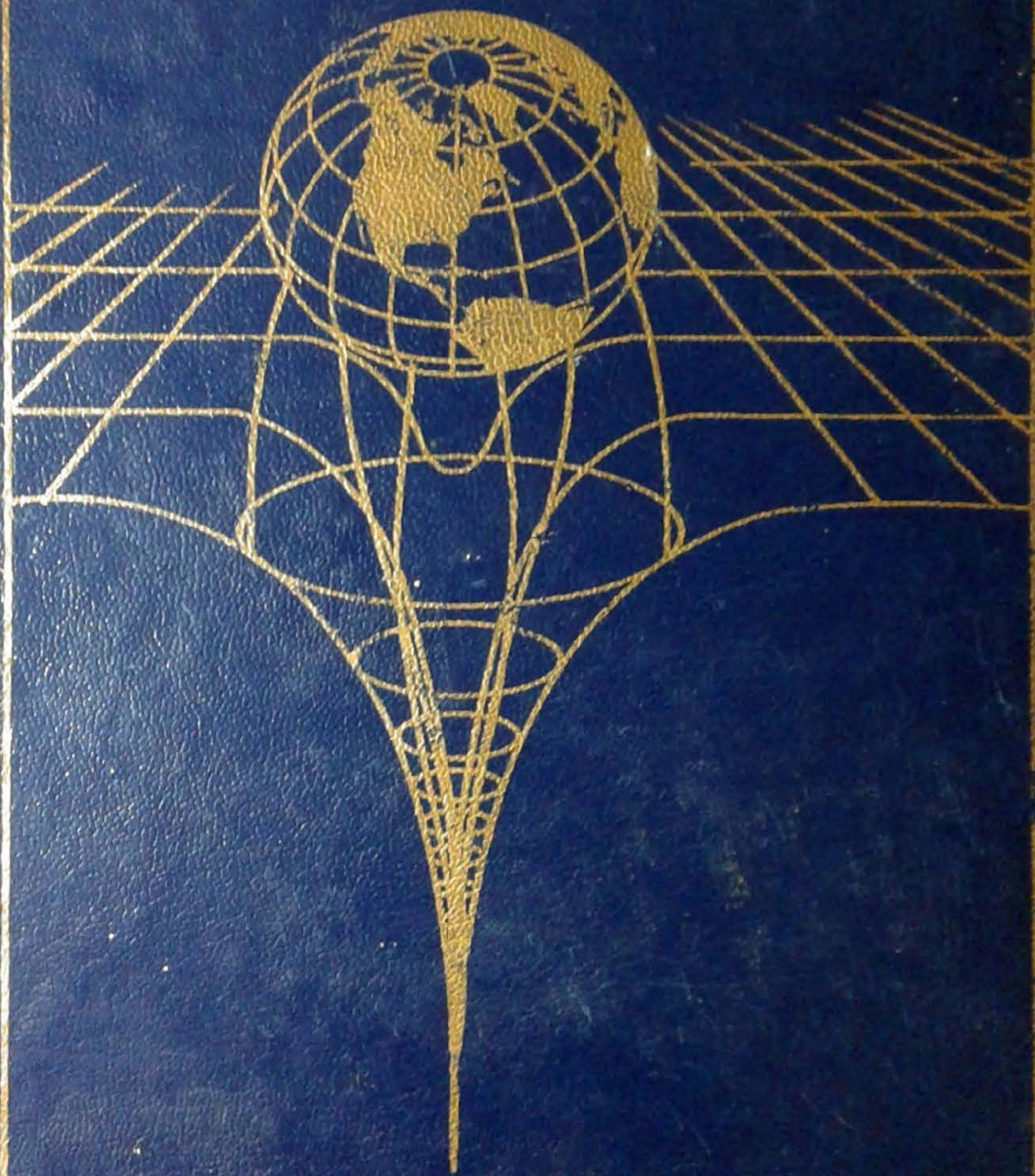


# আল-কুরআনে বিজ্ঞান

Scientific Indications in the Holy Quran



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



# আল-কুরআনে বিজ্ঞান

(Scientific Indications in the Holy Quran)



মূল

গবেষণা বিভাগ বোর্ড

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

**আল-কুরআনে বিজ্ঞান (Scientific Indications in the Holy Quran)**

বোর্ড অব রিসার্চ কর্তৃক সম্পিত

অনূবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে অনুদিত ও সম্পাদিত

এস্টেব্রত : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

অনূবাদ ও সংকলন প্রকাশন : ২৪৪

ইফাবা প্রকাশনা : ২১৬২

ইফাবা প্রকাশনা : ২৯৭.১২২৮

ISBN : 984-06-0807-0

প্রকাশক

মুহাররম : ১৪২৫

ফালুন : ১৪১০

মাঝে : ২০০৪

প্রকাশক

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম

পরিচালক

অনূবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগরগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ

নিউ হাইটেক কম্পিউটার

জি, পি, ক-৩৮, মহাখালী, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মেসার্স আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন

৮৫, শরৎপুর রোড, নারিন্দা, ঢাকা

মূল্য : ১৯৫.০০ (একশত পঁচানবই) টাকা মাত্র।

---

**AL-QURANEY BIGGAN** (Scientific Indications in the Holy Quran) : Written by a Board of Researchers in English. Translated and edited by a board sponsored by Islamic Foundation Bangladesh and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e Bangla Nagar, Dhaka-1207.

March 2004

Web Site : [www.islamicfoundation-bd.org](http://www.islamicfoundation-bd.org)

E-mail : [info@islamicfoundation-bd.org](mailto:info@islamicfoundation-bd.org)

Price : Tk 195.00; US Dollar 7.00

أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا  
فَفَتَّثْنَاهَا وَجَعَلْنَا مِنَ النَّمَاءِ كُلًّا شَيْءٌ حَتَّىٰ أَفَلَّا يُؤْمِنُونَ (٢١ : ٢٠)

### সামনের পাতা মহানিনাদ

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী  
মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং  
প্রাণ্যান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবু কি তারা বিশ্বাস করবে না ?  
-আল-কুরআন ২১ : ৩০

### সামনের পাতা

মাইকেল ফ্রান্স ম্যান কর্তৃক উদ্ভাবিত মহানিনাদের বিশেষ প্রভাব ভাবমূর্তি  
(ডায়ালগ-১ (১৯৮৪) পৃ. ১৭-এর সৌজন্যে)।

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُثُ مِنْ دَابَّةٍ إِيْتُ لَقْوْمٍ بُوْقِنْوْنَ لَا (٤٥ : ٤)

### পিছনের পাতা (ডিএনএ অণু)

তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীবজগতের বিস্তারে নির্দর্শন রয়েছে নিচিত  
বিশ্বাসীদের জন্যে। - আল কুরআন ৪৫ : ৪

### পিছনের পাতা

জীবনের মূল নিয়ন্ত্রক অণু- ডিএনএ, জীবনের বংশানুকরণিক নীল নকশা  
(ডায়ালগ-৩ (১৯৮৯), পৃ. ৫৪-এর সৌজন্যে)।

## **কমিটির সদস্যবৃন্দ ও লেখকবর্গ**

১. এম. আকবর আলী, এম এস সি (কলিকাতা)
২. এম. শমশের আলী, এম এস সি (ঢাকা), পি এইচ ডি (ম্যানচেষ্টার),  
চেয়ারম্যান।
৩. মরহুম আবদুল কাদের চৌধুরী, এম এস সি (ঢাকা)।
৪. মরহুম এম. এ. জব্বার, এম এস সি (কলিকাতা)
৫. এম. ফেরদৌস খান, এম এস সি (ঢাকা), এম. এ (লণ্ঠন)।
৬. এম. সালার খান, এম এস সি (আলীগড়) পি এইচ ডি (এডিনবরা)
৭. খোন্দকার এম. মান্নান, এম এস সি (ঢাকা), ডি, ফিল (অক্সফোর্ড)।
৮. ডাঃ গোলাম মুয়ায়্যম, এমবিবিএস (কলিকাতা) ডিসিপি (লণ্ঠন),  
ডি.প্যাথ (ইংল্যান্ড), এফ প্যাথ (ইংল্যান্ড)।
৯. মাওলানা মোঃ সালাহউদ্দিন, কামিল, এম এ (ঢাকা)।

## **অনুবাদকবৃন্দ**

১. ডাঃ গোলাম মোয়ায়্যম
২. জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার
৩. জনাব আবু মুহম্মদ
৪. জনাব আফতাব হোসেন
৫. জনাব শাহাবুদ্দীন খান
৬. জনাব আবদুল আউয়াল

## **সম্পাদক**

অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

## সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাক্ কথন	৭-১০
ভূমিকা	১১-১৮
মূলপাঠ	১৯-৬৩২
পরিশিষ্ট	৬৩৩-৬৬৯

## মহাপরিচালকের কথা

মেহেরবান আল্লাহর ইচ্ছায়ই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিত্রক কুরআনে বিধৃত বিজ্ঞান সংক্রান্ত ইঙ্গিতসমূহ উদ্ঘাটনের কাজ হাতে নেয়। আল-কুরআন হচ্ছে একটি হিদায়েত বা দিক নির্দেশনা এবং আর মানবীয় কর্মতৎপরতার সকল পরিকল্পিত ক্ষেত্রেই এই দিক-নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।

কাজেই, কোন যুব মানস সাধারণভাবে জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে আল-কুরআনের নীতি কী তা জানতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আমরা ইতিমধ্যেই একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য প্রত্যক্ষ করবে। আমরা অনুভব করছি যে, আমাদের যুগের তরুণ-তরুণীরা যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে পেশাগত জীবন গড়তে আগ্রহী তাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, পরিত্রক কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে গবেষণা করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। খুব অল্প সংখ্যকই আছে যারা এই গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। আবার প্রত্যেক মুসলমানের এটি উপলক্ষ করা কর্তব্য যে, জীব ও জড় পদার্থ আল্লাহর সৃষ্টি।

এই উভয় প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণাপ্রসূত জ্ঞানকে মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণে লাভজনকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এ ধরনের গবেষণামূলক অধ্যয়ন অধ্যয়নকারীর পক্ষে আল্লাহর সৃষ্টির বিশালত্ব ও মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে একটা যথাযথ উপলক্ষ লাভ করা সম্ভব হবে।

এ সকল ধারণা নিয়েই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ থেকে ‘আল-কুরআনে বিজ্ঞান’ (Scientific Indications in the Holy Quran) শীর্ষক একটা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি দেশের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে জড়িত করতে সক্ষম হয় যারা কয়েক বছর ধরে পরিশ্রম করে কাজটিকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যান। তাদের কাজের ফলাফলই ছিল গ্রন্থের প্রথম ইংরেজী সংস্করণ যা ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

ফাউন্ডেশন এ সকল পণ্ডিতবর্গকে সামান্য উৎসাহ ব্যক্তিত তেমন কিছু দিতে পারেন। পণ্ডিতগণ তাদের কাজের পরিপূর্ণতা কিংবা উৎকৃষ্টতার দাবি করেন না। তবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই জনপ্রিয় ও স্থানজনক প্রকাশনাটি অল্প সময়েই বাজার থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়।

[ আট ]

ঝুঁটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে ও ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করেছে। এ প্রেক্ষাপটেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা বিভাগ থেকে ঝুঁটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমান যুগের বিশেষত তরুণ মানস আল্লাহর সৃষ্টির মহস্ত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে উদ্যোগী হলেই এ প্রকাশনা কর্মটি সাৰ্থক হবে।

ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয় অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ। এ ধরনের এই অনুবাদ করার কাজ খুব সহজ নয়। দক্ষ অনুবাদকগণ অনুবাদ কর্মটি সুন্দর ও সম্মত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমি এই সুযোগে আমাদের স্বনামধন্য পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ জানাই এবং অনুবাদকবৃন্দকে মুবারকবাদ জানাই। অনুবাদ পাত্রলিপিটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান।

পরিশেষে হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট যিনি আমাদেরকে আংশিক হলেও তাঁর সৃষ্টির সীমাহীন মাহাত্ম্য তুলে ধরার তোফিক দান করেছেন।

আমরা আশা করি, অত্য প্রকাশনার বাংলা সংস্করণটি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুসঙ্গানে অব্যাহতভাবে অবদান রাখবে এবং ইসলাম, মুসলিম উৱাহ ও মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ভাবমূর্তি উচ্চল করবে।

আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম  
মহাপরিচালক,  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## প্রকাশকের কথা

‘আল-কুরআনে বিজ্ঞান’ শীর্ষক বইটি ‘সাইনিফিক ইভিকেশন ইন দি হেলি কুরআন’-এর বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাড়া জাগানো প্রকাশনা। ১৯৯০ সালে মূল বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর অল্পদিনে মধ্যে এর প্রথম সংকরণ শেষ হয়ে যায়। ফলে ১৯৯৫ সালে বইটির দ্বিতীয় সংকরণ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংকরণও বাজারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সাড়া জাগানো এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যাপক দাবি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে গ্রন্থটি বাংলায় প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গ্রন্থটি নির্ভূলভাবে প্রকাশের চেষ্টায় আমরা কোন ক্রটি করিনি। তারপরেও সুধীজনের নজরে কোন তুল-কৃটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংকরণে তা সংশোধন করে দেব ইন্শাআল্লাহ্।

আজকের বইটির বাংলা সংকরণ প্রকাশের সময় আমরা গবেষক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ অনুবাদকর্মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাই।

জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে সহযোগিতায় আমাদের এই প্রয়াস মহান আল্লাহ্ তা'আলা কৃত্ত করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম  
পরিচালক  
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## ভূমিকা

পবিত্র কুরআন হচ্ছে পথ-নির্দেশনা ঘৃত্ত। এই পথ-নির্দেশনা সমগ্র মানবজাতির জন্যে এবং মানব জীবনের সকল কর্মতৎপরতাই এর আওতাভুক্ত। বিজ্ঞান যেহেতু একটা গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় তৎপরতা এবং মানবজাতির অঞ্চলিত সাধনে আবশ্যিকীয় বটে, স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রত্যাশা করা হয় যে, কুরআনের পথ-নির্দেশনা বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোতেও পরিব্যাপ্ত হবে। বিশয়ের কিছু নেই যে, পরিত্র কুরআন অত্যন্ত চমৎকারভাবেই তা করেছে। গ্রন্থটির মোট আয়ত সংখ্যার মধ্যে প্রায় এক-অষ্টমাংশই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নিবেদিত হয়েছে। কুরআন আক্ষরিক অর্থে কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়; কাজেই, বিজ্ঞানের সকল নীতিই এর মধ্যে সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে—এমন আশা করা যেতে পারে না। তবুও, প্রকৃত ঘটনা ও বিজ্ঞানের সূত্র নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে কুরআনের নিজস্ব ভঙ্গিমা রয়েছে। এটি বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহের মূল প্রতিপাদ্য তুলে ধরে এবং বেশ কিছু ঘটনা বা সত্য সম্পর্কে ইঙ্গিতধর্মী বক্তব্য প্রদান করে যাতে থাকে সর্বোচ্চ সংগঠিত সূত্রসমূহ সম্পর্কে পরিষ্কার ইঙ্গিত। কুরআনের একটা বক্তব্য কোন একটা নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ব্যাপক কথা তুলে ধরে। একটা দ্রষ্টান্ত বিষয়টা স্পষ্ট করে তুলতে পারে। ৩ : ১৯১ আয়াতে আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণাকারী মাত্রাই বলে উঠবে : “হে আমাদের প্রভু! এ সবের কোন কিছুই তুমি অথবা সৃষ্টি কর নাই! ....” কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি—এই যে ঘোষণা, প্রকৃতপক্ষে, এটি একজন আধুনিক প্রতিবেশ বিজ্ঞানীর সর্বপ্রধান মৌলিক বিশ্বাসের বিষয়বস্তু যিনি উপলব্ধি করেন যে, এই মহাবিশ্বের একটা সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা রয়েছে যাতে আমাদের বিষ্ণু সৃষ্টি করা উচিত নয়। প্রায় ৩ কোটি প্রকারের জীবদেহ রয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র ৫০ লক্ষের উপর গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল ধরনের জীবদেহের অনেকগুলোরই কার্যগত উপযোগিতা কী তা আমরা জানি না। অবশ্য, অনেক সময়ই দেখা গেছে, এ সকল জীবদেহের জীবনধারায় মানুষ বিষ্ণু সৃষ্টি করে উচিত খেসারত দিয়েছে। এমনকি আমরা যদি নাও জানি কোন বিশেষ প্রজাতির জীবদেহের কাজ কী, তবুও এটি যাতে টিকে থাকতে পারে সেদিকে আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা, এটি বিলুপ্ত বা উচ্ছেদ হলে তা প্রকৃতির সঠিক প্রতিবেশিক ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবেশ বা বাস্তুসংস্থান বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ ভিত্তি কুরআনের এই ঘোষণা/বক্তব্য ব্যক্তিত আর কিছু না যে, কোন কিছুই অথবা/বৃথা

সৃষ্টি করা হয়নি। আরেকটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোন কিছুর বিন্যাস ও সঠিক অনুপাতের প্রতি কুরআনের অঙ্গুলি নির্দেশ। কুরআনের ২৫ : ২ আয়াতে বলা হয়েছে : “তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করেছেন সঠিক অনুপাতে।” প্রকৃতির গঠন-ভারসাম্য বৈশিষ্ট্যাবলি এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যকার আপেক্ষিক অনুপাত সম্পর্কে কৌতুহলী যে কেউ উপলক্ষ্য করবেন যে, বিন্যাস ও সঙ্গতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো বস্তু ও জীবসমূহের অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত। দৃষ্টান্তস্মরণ, মানুষ বর্তমানে যে, আকার-আকৃতিবিশিষ্ট, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনরূপ হলে পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্র এবং অন্যান্য পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে মানিয়ে চলতে পারত না। একটা নির্দিষ্ট দেহকাঠামোর ভিতরেও আবার বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশ ভিন্ন অনুপাত অনুসরণ করে থাকে। উভিদের ক্ষেত্রে, এসব সঙ্গতি বা অনুপাত ফীবোনাচি সংখ্যা দ্বারা উপলক্ষ্য করা যেতে পারে। বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গতিই কোন কিছুকে সৌন্দর্যের সুসামঞ্জস্যতা দান করে। কাজেই, সৃষ্টির সার্বিক মহাপরিকল্পনায় সঙ্গতি অন্যতম শুরুত্বপূর্ণ দিক।

বৈজ্ঞানিক সত্যকে চক্ষু উন্মীলকভাবে উপস্থাপনে কুরআনের ভঙ্গিমার আরেকটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় ৯৬ : ২ আয়াতে যাতে মাত্র উদরে আলাক (যা আটকে থাকে) তথা জমাটবাঁধা রক্ত থেকে মানব সৃষ্টির কথা উল্লিখিত হয়েছে। স্ত্রা আল-মু’মিনুন-এ জ্ঞান স্তর থেকে ধাপে ধাপে মানব শিশু কীভাবে বেড়ে পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হয় তার উল্লেখ রয়েছে। এ সকল ধাপের কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে ৭ম শতকে (খ্রিস্টান সাল) যখন জ্ঞানতত্ত্ব বিজ্ঞানের উদ্ভাবনই ঘটেনি। ঘটনাচক্রে, জ্ঞানতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক শাখা যা বেশীর পক্ষে বিগত একশ বছরে গড়ে উঠেছে। এভাবে, বস্তুত এ এক অবাক করার মত ঘটনা যে, পৰিত্ব কুরআনে উল্লিখিত মানব জনের ধাপে ধাপে বৃদ্ধির বিষয়টি মাত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে তাঁর সৃষ্টি এবং এর উন্নয়ন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে বলেছেন যেন মানুষ জীববিদ্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং জীবনের রহস্য উন্মোচন করতে পারে। আবার, জীববিজ্ঞান বিষয়ক ঘটনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সুসম্পৃক্ত ধারার একটা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ মানুষকে সকল বিজ্ঞানিত দিক সহ চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নের দিকে আহ্বান জানায় এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে তার মনে আবেদন সৃষ্টি করে। কাজেই, এ সকল বৈজ্ঞানিক ঘটনার উল্লেখমাত্রাই সাড়হারে এ ধারণা সমর্থন করে যে, আল্লাহর মহস্তের উপলক্ষ্য তর সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপলক্ষ্য সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমরা যাকে সৃষ্টিজগৎ বলে ধাকি, তা আল্লাহরই এক প্রকার স্মারকচিহ্ন বা নির্দশন। বিজ্ঞান মানুষকে এই স্মারকচিহ্নই বুঝতে সাহায্য করে। এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট

[ তেরো ]

হওয়া উচিত যে, প্রকৃতিরাজ্য যে দক্ষ কুশলতা রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণে কুরআনের নিজস্ব একটা ভঙ্গিমা আছে এবং এ ধরনের দৃষ্টি আকর্ষণীভে কুরআন সর্বাধিক শুরুত্ব আরোপ করেছে জ্ঞান আহরণের উপর।

যে জিজ্ঞাসাটা আজকের তরঙ্গ-তরঙ্গীদের মনে বড় তোলে তা হলো : কেন তরঙ্গ (ইকরা বিসমে রাবিকাল্পাজী খালাক) থেকে কুরআনের শেষ আয়াত পর্যন্ত অত্যন্ত কড় তাগিদ সন্দেশে মুসলিম উচ্চাহর দুই-ত্রুটীয়াৎ্বশ অশিক্ষিত, অথনেতিকভাবে দরিদ্র এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকছে ? বস্তুত এটি একটি অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা সুগভীর শুরুত্বের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। এর উপর এ সত্যটির মধ্যে নিহিত থাকতে পারে যে, যদিও আমরা কুরআন তেলাওয়াত করে থাকি, আমাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানের অভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি না। আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন “তাদেরই জন্য যারা চিন্তাশীল।” কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিগণই তাঁর নির্দর্শনাদি উপলব্ধি করতে পারেন। ঘটনাক্রমে, পবিত্র কুরআনে নির্দর্শন হিসেবে উল্লিখিত অধিকাংশ প্রাকৃতিক ঘটনাই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রকৃতির; যে কারণে এতে বিশ্বায়ের কিছু নেই যে, ইল্ম বা জ্ঞান অন্য কোনভাবে বিশেষিত না হলে তা বিজ্ঞানেরই প্রতীক। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ আল-কুরআন থেকেই জ্ঞান অর্জনের প্রেরণালাভ করতেন। জ্ঞানকে তারা পূর্ণাঙ্গ অর্থেই নিতেন এবং মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহ তারা সমর্পিতভাবেই অধ্যয়ন করতেন। জ্ঞানানুসন্ধানের কারণেই মুসলমানরা ক্ষমতা ও সম্মান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন যদ্বারা তারা হাজার বছর ধরে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। এই গৌরব পরবর্তীকালে নষ্ট হয়ে যায় বেশ কয়েকটি কারণে। যাহোক, মুসলমান সভ্যতা থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তাহলো, সাধারণতাবে জ্ঞান এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অবশ্যই ধর্মের সাথে সাথেই চর্চা করতে হবে। বস্তুত কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞান অন্যান্য মানবিক কর্মতৎপরতার মতই ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যেখানে বিজ্ঞান আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কীভাবে প্রকৃতি কাজ করে এবং এই শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য ও প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে সক্ষম করে, তেমনি ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় সেই সকল মূল্যবোধ যা আল্লাহ্ আমাদেরকে চর্চা করতে বলেন যাতে জীবনের মূল্যবোধ ও উপযোগিতার দিকগুল়া সুসমর্ত্তনুপে সংযোগ ঘটাবে যায়।

কাজেই, জীবনের আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে গেলে বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ই প্রযোজন। বিজ্ঞান বস্তুগত জ্ঞান দান করে; ধর্ম সেই জ্ঞানকে ব্যবহারের মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়। ধর্ম মানুষকে আহ্বান জানায় সৃষ্টিজগৎ ও স্নিগ্ধ।

## [ চৌদ্দ ]

নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে, বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বুঝার মত ভাষা দান করে এবং সৃষ্টিই স্রষ্টার নির্দশন হিসেবে কাজ করে। কাজেই, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সতিকার অর্থে কোন বিরোধ নেই।

দুঃখজনকভাবে, আজ আধুনিক যুগের নর-নারীরা না জানে কুরআন জ্ঞান অর্জনের উপর কী রকম শুরুত্ব আরোপ করে, আর না জানে কুরআনের বক্তব্যকে বিজ্ঞানের তথ্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে। পবিত্র কুরআনে বিধৃত বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতসমূহের ব্যাপারে এই যে অজ্ঞতা, এর কারণ হল এ সত্যটি যে, অনেকে কুরআন শুধু তেলাওয়াত করে থাকেন কিন্তু আরবী ভাষা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকায় তারা কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ বোঝেন না; ত্বরীয়ত, যারাও আরবী জানেন এবং কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ বোঝেন তারাও আবার বিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রসমূহ সম্পর্কে অবহিত না থাকায় বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতসমূহ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। যারা ধর্মতাত্ত্বিক বলে নিজেদের পরিচয় দেন, তারা জনগণের সামনে কথা বলার সময় এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে কিছুই বলেন না। তারা সাধারণত কবরে ও জাহানামের শান্তি আর বেহেশতের পুরস্কার বিষয়েই বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তরুণরা তাদের কথা শোনবার সময় বুঝতে পারে যে, এ সকল ধর্ম প্রচারক কোন কোনভাবে এ সময়ের সর্বাধিক আলোচিত সমস্যাসমূহ তথা মৌলিক শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক অবিচার ইত্যাদি বিষয় এড়িয়ে যান, এ সকল বিষয় যোকাবিলার বৈজ্ঞানিক পছ্নার কথা ত বলাই বাহ্য। এভাবে, তরুণ সমাজের মাথায় একটা ভুল ধারণা ঢুকে যায় যে, বিজ্ঞানের সংস্কৃতি আর ধর্মের সংস্কৃতি একসাথে চলে না। ত্বরীয় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর বৈজ্ঞানিক পশ্চাত্পদতা এবং এমনকি জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামগ্রীসহ আমদানীকৃত পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা এ সকল তরুণের ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণায় আরো সমর্থন যোগায়। অথচ, এই বিজ্ঞান চর্চাই প্রথম যুগের মুসলিমানদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল বহন করার ক্ষমতা দান করেছিল এবং তাদেরকে বিষের অপরাপর জাতির উপর নেতৃত্বের আসন লাভে সক্ষম করেছিল। এখন আবারও যথাযথভাবে কুরআনের মূল্যবোধ অনুসারে চর্চা করলে এই বিজ্ঞানই মুসলিম সমাজসমূহের মধ্যে পরিবর্তন আনার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

কাজেই, বিজ্ঞান ও কুরআনের মধ্যে যে কোন বিরোধ নেই এ বিষয়ে মুসলিমান তরুণ সমাজকে একমত করানো এবং তাদেরকে বুঝানো যে, প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি অর্জন স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি লাভের পথ সুগম করতে পারে-এর জন্যে পবিত্র কুরআনে বিধৃত বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতসমূহ বুঝা এবং অশিক্ষিতদের নিকট তা ব্যাখ্যা করা একান্তই

[ পনেরো ]

আবশ্যিক। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এ দিকটাতেই নিবেদিত এক প্রচেষ্টা যাত্র।

গ্রন্থখানির জন্মের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছি। আমরা কয়েকজন তথ্য মরহুম এ কিউ চৌধুরী, জনাব ফেরদৌস খান, প্রফেসর মফিজুল মান্নান এবং আমি নিজে আলাদা আলাদাভাবে কুরআনের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যসম্পন্ন আয়াতসমূহ অনুসন্ধানের চিন্তা করছিলাম। আমাদের চিন্তা-ভাবনাসমূহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. ইয়াহুয়াকে জানালে তিনি প্রায় উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবং আমাদেরকে একত্রিত করার ব্যাপারে অনুঘটক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন। ইতোমধ্যে 'কুরআনে বিজ্ঞান' নামে ডা. মোঃ ওলাম মুয়াজ্জামের একখানি গ্রন্থ ইসলামি পাঠ্যাগার রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৯৬৬ খ্রি.) এবং 'সাইয়েন্স ইন দ্য কুরআন' শীর্ষক আরেকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৯৭২-৭৬ খ্রি.) যার লেখক প্রখ্যাত এম আকবর আলী যিনি 'মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু সাইয়েন্স' শীর্ষক মালিক লাইব্রেরী ঢাকা কর্তৃক বাংলায় কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রণেতা। আরেকখানি প্রয়াস উদ্ভৃত গ্রন্থ যার শিরোনাম 'দ্য বাইবেল, দ্য কোরআন এন্ড সাইয়েন্স' এবং লেখক প্রখ্যাত ফ্রেঞ্চ চিকিৎসক মরিস বুকাইলি ও এরই মধ্যে বাজারে চলে আসে। এম ফেরদৌস খানের একখানি পুস্তিকা যার শিরোনাম 'দ্য সাইয়িন্টিফিক ফাইডিংস এন্ড দ্য হলি কোরআন' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৯৭৪ খ্রি.)। এগুলোতে কুরআনের কিছু নির্বাচিত আয়াতের উপরই শুধু কাজ করা হয়েছে। এম আকবর আলীর ধৰ্মে বৈজ্ঞানিক সাথে জড়িত কুরআনের আয়াতের উল্লেখ রয়েছে এবং এটির ভাল উদ্ভৃতি মূল্য রয়েছে। কিন্তু আয়াতসমূহে উল্লিখিত ঘটনাবলির সাথে বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলির সত্যিকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি। আবার বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতের জন্য কুরআনের আয়াতসমূহ যতটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তা পুঁথানুপুঁথ এবং পরিপূর্ণ ছিল না। এভাবে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন তৌরভাবে উপলক্ষ করে যে, বর্তমান গ্রন্থখানি সাধারণভাবে মুসলিম উচ্চাহর সদস্যদের এবং বিশেষভাবে মুসলিম যুবসমাজের বিরাট কৌতুহল মিটাবে। ফাউন্ডেশন তখন তৎক্ষণাত 'সাইয়েন্স ইন আল কোরআন' নামে একটা প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পটি পরে গৃহীত হয় এবং বিজ্ঞানের শাখার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় (যাদের নাম প্রথম পাতায় রয়েছে)। কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পড়ে আমার উপর যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে এ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে পুরোপুরি যোগ্য মনে করিনি। তথাপি, ব্যাপারটি যেহেতু আমার জন্য প্রাঞ্জ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে

### [ খোল ]

সর্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিষয়ে আরো বিজ্ঞ হওয়ার একটা বিরাট সুযোগ এনে দিল, তাই আমি এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলাম যে, আমরা একটা দল হিসেবে দায়িত্ব পালনে আল্পাহ্র করুণা ও রহমত পাব। কাজটা সম্পূর্ণ করতে আমাদের কয়েক বছর লাগলো, যার কর্মপদ্ধতি ছিল এমন : কমিটি সঙ্গাহে তিনবার সভায় বসলো। আমরা কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ নিয়মতাত্ত্বিকভাবে পাঠ করলাম এবং কমিটি সদস্যগণের বিশেষজ্ঞতার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে যে সকল আয়াতের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে বলে প্রতীয়মান হয় সেগুলো সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণকে বরাদ্দ করে দেয়া হল। তারা স্ব স্ব গৃহে আয়াতগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং যথাযথ বিবেচনার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক কুরআনের নির্দিষ্ট কোন আয়াতের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত তুলে ধরে একটি করে খসড়া নিবন্ধ তৈরি করলেন। এই নির্বকটি অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের নিকট পাঠানো হয় যারা খসড়াটির উপর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ প্রদান করেন। বেশ কয়েকবার এমনও ঘটেছে যে, শুধু যে অনেক খসড়া ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়েছে তা নয়, বরং এমন কিছু কিছু খসড়া বাতিল করতে হয়েছে যেগুলো মাসের পর মাস কাজ করে তৈরি করা হয়েছিল। সদস্যগণ এ ধরনের প্রত্যাখানকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন এ কথা মনে রেখে যে, যুক্তির প্রাবল্য এবং কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সুসঙ্গতিকে আমাদের চিন্তা ও বিবেচনার মানদণ্ড হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে, কিছু সতর্কবাণী রাখা জরুরী। সর্বশক্তিমান আল্পাহ্র নিকট থেকে অবগত পবিত্র কুরআন পরম সত্যের উপর তিতিশীল যা কুরআনেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই পরম সত্যে বিশ্বাসীগণ কুরআনকে আমাদের বৈজ্ঞানিক সূত্রের পরীক্ষা হিসেবে যবহার করার ব্যাপারে সুযোগত, কিন্তু এর বিপরীতক্রমে নয়। ঘটনাক্রমে উল্লেখ্য যে, মরিস বুকাইলি তার 'দ্য কোরআন, দ্য বাইবেল এন্ড সাইয়েপ্স' গ্রন্থে ইতিমধ্যেই দাবী করেছেন : "পবিত্র কোরআনে এমন একটি মাত্র আয়াতও নেই যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আকৃষণযোগ্য।" আমাদের বর্তমান গ্রন্থবানি এ দাবীকে পুরোপুরি সমর্থন করে। একটা প্রশ্ন আছে যা এ প্রসঙ্গে তোলা যেতে পারে, তাহলো : যদি কোন আয়াত পাওয়া যায় যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না তাহলে কী হবে ? এ প্রশ্নের জওয়াব রয়েছে এ সত্যের মধ্যে যে বিজ্ঞান সত্যের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করে নিয়েছে। এ পদ্ধতিটা অবশ্য সীমাবদ্ধতাযুক্ত নয়। তথাপি, একটা সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে উঠে এবং প্রয়োগকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে এড়িয়ে যায়।

## [ সত্তেরো ]

কাজেই, সকল সত্তাই বিজ্ঞানের স্বীকৃত/গৃহীত পদ্ধতির অধীন নাও হতে পারে। তথাপি, বিজ্ঞানীগণ কোন কিছুকে একেবাবে খোলা ছেড়ে দিতে পারেন না এবং সত্যানুসন্ধানে তার একটা শুরু এবং একটা পদ্ধতি সমষ্টি থাকতেই হবে। যাহোক, তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কোন একটা নির্দিষ্ট আয়াতকে যদি আজকের বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে তারা বড় জোর যা বলতে পারেন তাহলো এই যে, আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বর্তমান স্তরে/পর্যায়ে উক্ত আয়াতটি বোধগম্য নয়। বিজ্ঞানের অধিকরণ অগ্রগতি সম্ভবত ঐ আয়াতের উপর অধিকরণ আলোকপাত করবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এই অগ্রগতি সত্যিই বিশ্বয়কর। তথাপি, অবাক হতে হয় যে, মাত্র ৫০ বছর আগে আজকের দিনের গৃহস্থালী পণ্য রেডিও/ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হয়নি। বিশেষ এই যে বিদ্যুতায়ন তা মাত্র শতাধিক বছর আগের কথা, মাত্র ৯০ বছর আগে মানুষ জানত না কীভাবে উড়তে হয়, ৬০ বছর আগেও জীবনের মহাপরিকল্পক অণু ডিএনএ ছিল অজ্ঞাত। এমনকি ৪০ বছর আগে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নিষ্কিণ্ঠ হয়নি আর চাঁদে যাওয়া ত দূরের কথা। বিগত ১০০ বছরে মানুষ ভয়ঙ্কর রকম ব্যাপক কিছু মেনেছে তবে এতে তার এই উপলক্ষ্মীই জন্মেছে যে তার জ্ঞানের মত যা কিছু বাকি আছে তার সামান্য অংশ মাত্রই শুধু সে এ পর্যন্ত জ্ঞানতে পেয়েছে। কাজেই, বর্তমান সময়কার বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন আয়াত বোধগম্য না হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে যে, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ঐ সর্কল আয়াতের ব্যাপারে আরো উন্নতভাবে আলোকপাত করবে। আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হলো যে, মানুষ বন্ধু রহস্যের যতই গভীরে প্রবেশ করে এবং অধিকরণ জ্ঞান আহরণ করে, কুরআনের বক্তব্যের উপর তার উপলক্ষ্মী স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়, যার প্রতি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটার উৎপত্তি হয়েছে পবিত্র কুরআনে বিধৃত খোদায়ী ঘোষণা থেকে যাতে বলা হয়েছে, ‘এই শুন সেই সকল লোকের জন্য যারা অনুধাবন করে’। বিজ্ঞান তথ্য জ্ঞানানুসন্ধান ব্যাপক অর্থে এই অনুধাবনকেই তুরাবিত করে।

পরিশেষে, আরেকটা সতর্কবাণী করতে হয়। আমরা মোটেই ভান করছি না যে, পবিত্র কুরআনে বিধৃত বৈজ্ঞানিক ইতিহসমূহ সম্পর্কে আমাদের উপলক্ষ্মী পূর্ণাঙ্গ। আমরা শুধু আমাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে কাজটা করার চেষ্টা করেছি মাত্র, যা অবশ্যই সীমিত এবং পাঠকবর্গের পক্ষেও উত্তম হবে এটা মনে রাখা যে, কোন বিষয়ে শেষ কথা বলা কঠিন ব্যাপার; আর আল্লাহর প্রজ্ঞাও অসীম ও অফুরন্ত। আল্লাহর রহমতে আমরা তাঁর প্রজ্ঞার শুধু অংশবিশেষ তুলে ধরার সর্বোত্তম চেষ্টা করতে পারি মাত্র। কুরআনের আয়াতসমূহের সত্যিকার ব্যাখ্যা

## [ আঠারো ]

একমাত্র আল্লাহ'ই জানেন যিনি এগলো নাফিল করেছেন। সমাপ্তি ক্ষণে, আমরা আল্লাহ'র নাবিলকৃত কিছু আয়াতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করার সুযোগদানের জন্য আল্লাহ'র নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। অত কর্তব্য কর্মটি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করার জন্য আমাদের ধন্যবাদ প্রাপ্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এ এফ এম ইয়াহুইয়া এবং তাঁর উত্তরসূরীগণের। আমরা আরো ধন্যবাদ জনাই সেই সকল পণ্ডিতবর্গকে যাদের সাথে আমাদের কমিটি সদস্যগণ অনেক বিষয় স্পষ্ট করার জন্য আলোচনায় বসেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী বর্তমান প্রস্ত্রানি রচনার কাজের সাথে জড়িত বিশয়ে মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর দীর্ঘক্ষণ ধরে আমাদের সাথে কাজ করেছেন তারাও ধন্যবাদার্থ। আমরা গভীরভাবে প্রশংসারাক্ষ উচ্চারণ করতে চাই মাওলানা আবদুল জব্বার চাখারি, জনাব এ এন এম আবদুর রহমান, জনাব এম আবদুর রব এবং জনাব এম ঝুঁক্ল আমিনের জন্য যারা বর্তমান প্রস্ত্রানির কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

আমরা এই মোনাজাতের মাধ্যমে উপসংহার টানতে চাই “রাবির যিদনী ইলমা (ওগো প্রভু, আমার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে দাও)” যা আমাদের প্রভুই আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আমরা বর্তমান প্রত্নের কাজে আমাদের অনিচ্ছাকৃতভাবে থেকে যাওয়া ক্রটিগ্লোর জন্যেও আল্লাহ'র নিকট ক্ষমা চেয়ে নিছি।

এম শমশের আলী  
চেয়ারম্যান,  
আল-কুরআনে বিজ্ঞান কমিটি,  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ١٠- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১ : ১ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

‘আর রাহমান’ এবং ‘আর রাহীম’ শব্দদ্বয় সূরা ফাতিহার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ । আল্লাহর এ দুটো গুণ আল-কুরআনে যথাক্রমে ৫৭ ও ৯৫ বার উল্লিখিত হয়েছে । কাজেই, কোন অনুসন্ধিৎসু মন এ দুটো গুণের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক ।

যেসব অগণিত দান ও নেয়ামতের মধ্য দিয়ে দয়াবান-মেহেরবান আল্লাহ তাঁর ‘রহমত’-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তাঁর আলোচ্য গুণাবলির সত্যতা ও যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট এই সব গুণাবলির কয়েকটিমাত্র নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. মাতৃগর্ভে মানুষের জীবনের ইতিহাস নিয়েই শুরু করা যায় । মাতৃগর্ভ নামক এই স্থানটি এক ধরনের তরল পদার্থের পরিপূর্ণ এক আবদ্ধপ্রায় কক্ষ বিশেষ । এটি এক অভিনব কলাকৌশলও বটে । যার মধ্যে আল্লাহর সীমাহীন করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । কেননা, এতে রয়েছে তরল পদার্থে নিমজ্জিত জ্ঞানকে বহিঃস্থ আঘাত এবং ক্ষতিকর জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা । এই আদর্শ পরিবেশে জ্ঞানটি পূর্ণপ্রাপ্ত হয় এবং গর্ভধারণকৃত সূন্দর ডিবাণু সুনির্দিষ্ট আকৃতিসহ বড় হয়ে একটি পূর্ণ শিশুতে পরিণত হয় । মাতৃগর্ভে শ্঵াস-প্রশ্বাস ছাড়াই একটি শিশুর বেঁচে থাকা আরেক বিস্ময় । ৪ থেকে ৮ পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট একটি শিশুর এক সংকীর্ণ পথে নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হওয়াও আল্লাহর করুণাপূর্ণ কৌশলসমূহের আরেক দৃষ্টান্ত ।

২. পরম করুণাময় আল্লাহ তা’আলাই পিতা-মাতার হৃদয়ে অপরিমেয় ভালবাসা সৃষ্টি করেন যা ব্যক্তিরেকে এই বিশ্বের এক অজানা-অচেন্য প্ররিবেশে একটি শিশুর বেঁচে থাকার কথা চিন্তাই করা যায় না । এ ধরনের সন্তান স্বেহ-বাস্তসল্য সকল জীবের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় ।

৩. একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই তার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোত্তম আদর্শ পুষ্টি তার মায়ের বুকের দুধের মধ্যে আগে থেকেই প্রস্তুত অবস্থায় পায়।

৪. জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই একটি শিশু আল্লাহ'র মেহেরবাণী হিসেবে বিনা ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে বায়ু, পানি (আর্দ্রতা), তাপ এবং আলো পেয়ে থাকে, যা ছাড়া পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ত। উল্লেখ্য যে, বায়ু অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্দ্রতা এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড-এর সঠিক অনুপাত বিশিষ্ট একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্রণ, যা স্বাভাবিক জীবনের গতিপ্রবাহ ও কার্যক্রমের নিয়মক। বাতাসের উপাদানসমূহের ভারসাম্যপূর্ণ প্রক্রিয়া আল্লাহ'র কর্তৃক আয় অপরিবর্তনীয়ভাবে রক্ষিত হয়ে থাকে যে প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল রয়েছে গাছ-পালা, মানুষ, জীবজীব এবং অতি ক্ষুদ্রদেহী অণুজীবের মধ্যকার স্থিতিগতিক্রিয়া চক্র।

৫. এছাড়া, আল্লাহ'র মানবদেহে বিভিন্ন আকারে বহু প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা ব্যবহৃত দান করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. অনমনীয় অথচ নরম চামড়ার আবরণী, যার রয়েছে বিশ্বায়কর সৃষ্ট নব নব পুনর্নির্মাণ ও মেরামত ক্ষমতা এবং অসংখ্য সংজ্ঞাবহ স্বায় প্রাপ্তসীমা।

খ. চোখের পাপড়ির খোলা ও বন্ধ হওয়া এবং অন্ত গঠন ক্ষমতা, যা বাহিংস্থ বস্তু বিদূরণ এবং চোখের কর্ণিয়াকে আর্দ্র রাখতে সহায়ক।

গ. চোখের উপরিস্থিত ভু, যা ধাঁধানো আলো থেকে চোখকে ছায়া দিয়ে রক্ষা করে।

ঘ. হাত ও পায়ের নখ, যা দৃঢ়তা দান করে।

ঙ. বৃক্ষাঙ্গুলি, যার রয়েছে মুষ্টিবন্ধ করার ক্ষমতা।

চ. মৃত্তানালি এবং মলদ্বারাষ্ট গোলাকৃতির নিয়ন্ত্রক পেশী, যা মলমৃত্তের বেগ ধারণের অক্ষমতা রোধ করে।

ছ. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ প্রতিরোধে সঠিক মাপে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা।

৬. দেহাভ্যন্তরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলি যথা : হৃদপিণ্ড, যা রক্ত পাস্প করে; ফুসফুস, যা অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে এবং রক্ত পরিশোধন করে; ক্ষুদ্রাক্ত, যা (খাদ্য) হজম করে এবং পুষ্টি শোষণ করে; যকৃৎ, যা প্রধানত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির বিষক্রিয়া রোধ করে; বৃক্ষদ্বয়, যা রক্ত শোধন করে থাকে; এবং মস্তিষ্ক, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সচেতন প্রয়াস ছাড়াই দেহের ইচ্ছাকৃত এবং অনিষ্টাকৃত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; এসবই আমাদের প্রতি আল্লাহ'র কর্মণার আরেক প্রমাণ।

৭. রোগ-ব্যাধি সৃষ্টিকারী জীবাণু এবং অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আঘাতকার জন্যে মানবদেহ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষা বস্তুর উৎপাদনও আল্লাহ'র কর্মণার স্বাক্ষর বহন করে।

৮. দয়াবান, মেহেরবান আল্লাহই মেহেরবানী করে ফল, শস, শাকসজি, মাছ-মাংস ইত্যাদি আকারে মানবজাতির জন্যে, বস্তুত সকল জীবের জন্যেই হরেক রকম পৃষ্ঠিকর খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেছেন।

৯. সূর্য আমাদের পৃথিবীর শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সূর্য থেকে আগত বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণসমূহের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, বেতার তরঙ্গ, বর্ণালীর প্রান্ত-বহির্ভূত রশ্মি, দৃশ্যমান আলো, হস্তর অতি বেগুনী রশ্মি এবং রঞ্জন রশ্মি। সূর্যের বহিদেশীয় বায়ুমণ্ডল থেকে সৃষ্টি সৌর ঝড়ে রয়েছে স্থলাগু আইওন ও ইলেক্ট্রন, যা স্টোয়ার নয় লাখ মাইল বেগে পৃথিবীতে আঘাত হানে। কখনও কখনও সূর্যের পরিপার্শ্বস্থ সৌর কল্ঙক এলাকায় এমন সুতীক্ষ্ণ ঘটনাবলি ঘটে যায় যাতে সূর্য দাউড়াত করে জুলতে থাকে। এ ধরনের দহনকালে বর্ণালির উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণা, রঞ্জন-রশ্মি এবং অন্যান্য বিকিরণ পৃথিবীতে এসে পড়ে। যেসব মহাজাগতিক রশ্মি অবিরাম পৃথিবীর বহিঃঙ্গ বায়ুমণ্ডলে আঘাত হানে সেগুলো হচ্ছে সুতীক্ষ্ণ বেগে ছুট্টি অণুসমূহের নিউক্লিয়াস। এগুলোর অধিকাংশের উৎপন্নি হয় সূর্য থেকে এবং সম্ভবত তারকা-বিক্ষেপণের কারণে। মহাজাগতিক রশ্মি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর ক্রিয়া করে, তখন মারাত্মক রঞ্জন-রশ্মি এবং অতি বেগুনী রশ্মি সৃষ্টিকারী সৌর কর্মকাণ্ড ছাড়াও এগুলো রঞ্জন রশ্মি ও সৃষ্টি করে। রঞ্জন-রশ্মি ‘পালসার’ নামে এক ধরনের (আন্তঃ তারকামণ্ডলীয়) নিউট্রন তারকা বিপুল পরিমাণ প্রাণঘাতী রঞ্জন রশ্মি তৈরি করে। সৌর ঝড়, মহাজাগতিক রশ্মিমালা, অতি বেগুনী রশ্মি এবং রঞ্জন রশ্মির তীব্রতা পৃথিবীতে জীবনের জন্যে তয়কর প্রমাণিত হতে পারত, যদি না মেহেরবান আল্লাহর বিভিন্ন রশ্মি প্রতিরোধক বায়ুমণ্ডল তথা আয়নোফেয়ারে ব্যাং ক্রিয়া-কোশলের ব্যবস্থা রাখতেন এবং পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের (ম্যাগনেটোফেয়ার) সাহায্যে ইলেক্ট্রন ও আয়নের জন্যে এক ধরনের ফাঁদের ব্যবস্থা যদি না করতেন, যা দ্বারা এ সকল প্রাণঘাতী বিকিরণ এবং কণা আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়া ঠেকানো যায়।

১০. অপর এক অনন্য সৃষ্টির মধ্য দিয়েও আল্লাহ তাঁর নিয়মাত প্রকাশ করেছেন। আর তা হলো পানি। জীবজগতের অস্তিত্বের ব্যাপারে পানির ভূমিকা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সম্ভবত জলজ জীবের হিমায়িত হয়ে মারা পড়া থেকে রক্ষার ব্যাপারে পানি যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা খানিকটা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এটাই একমাত্র জানা পদার্থ যা তরল অবস্থায় ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (সঠিকভাবে বলতে গেলে ৩.৯৮ সেন্টিগ্রেড কিংবা তারও কম) তাপমাত্রা থেকে ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এটি কঠিন বরফ অবস্থা ধারণ করে এবং তখনকার তুলনায় অধিক ঘন থাকে। ফলে, ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কিংবা

তারও কম তাপমাত্রাবিশিষ্ট বরফখও পানিতে ভেসে থাকে। বলা যেতে পারে, এই বরফের পাতঙ্গলোই আবার তাপ অপরিবাহীর ভূমিকা পালন করে, যে কারণে উদাহরণৰকম, বরফপাতঙ্গের উপরে বা বাইরের তাপমাত্রা দীর্ঘদিন ধরে হিমাকের নীচে থাকলেও সম্পূর্ণ হ্রদের পানি হিমায়িত হয়ে কঠিন পদার্থে পরিণত হয় না।

অপরদিকে, বরফ যদি পানির চেয়ে তারী হত, তাহলে তা তলায় ঝুঁকে যেত এবং সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে উচু স্তুপে পরিণত হত। এভাবে, হিমগুলীয় হ্রদ, নদী, পুরুর ইত্যাদি অঞ্চলের এবং সুষেৱন সাগর হিমায়িত হয়ে কঠিন বরফে পরিণত হত। পরিণামে, ধ্রায় সমস্ত জলজ জীবই হিমায়িত হয়ে মারা পড়ত। পানি হিমায়িত হয়ে বরফ আকারে পানির উপরে ভেসে থাকার যে অনন্য গুণ বা ধর্ম, তার মধ্য দিয়েই এমনকি প্রতিকূল হিমগুলীয় অঞ্চলেও জীবনের টিকে থাকা এবং সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ রাখ্বুল আলামিনের অপার মহিমা প্রকাশ লাভ করছে। এভাবে, সৃষ্টিগত নিয়ে গভীরভাৱে চিন্তা করলে আল্লাহৰ কর্মণা ও দানের অগণিত দৃষ্টিকোণের দৃষ্টিগোচর হয়।

### তথ্যসূত্র :

1. Baqi. M. F. A.. Al-Mu'jamul Musahras li-Alfazil Quran 1364/1940, p. 307.

٢- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

১৪২ প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমৃহের শামন ও পালনকর্তা।

‘ରାବୁଲ ଆଲାମିନ’-ଏର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ଆଲ୍ଲାହୁ ସମୟ ଜଗତସମୂହେର ଲାଲନ ଓ ପାଲନକର୍ତ୍ତା । ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥେ ‘ଜଗଃ’ ଶବ୍ଦରେ ବହୁାଚନିକ ବ୍ୟବହାର କରା ହେବେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠାନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବହୁଜଗତ ବୁଝାତେ । ବହୁାଚନିକ ରୂପ ତଥା ଜଗଃମୂହ-ଏର ବ୍ୟବହାରେ ତାତ୍ପର୍ୟ ଅନୁଧାବନ କରତେ ହଲେ ଆମାଦେରକେ ଶ୍ରୀକାର କରତେ ହବେ ଯେ, ଆମାଦେର ପରିଚିତ ଜଗତେର ଭିତରେ ଓ ବାହିରେ ଆରୋ ଜଗଃ ରହେ । ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଆମାଦେରକେ ଏ ସକଳ ଜଗତକେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିମାପକ ଏକକେର ଭିତ୍ତିତେ ଶ୍ରୀ-ବିନ୍ୟାସ କରତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

এই পরিমাপক এককটি কত বিশাল কিংবা কত ক্ষুদ্র ? প্রোটনের যত মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এই এককটি  $10^{-13}$  সেন্টিমিটার কিংবা তারও কম। অপরদিকে, এই বিশ্বের জ্ঞাত অংশের আকার হচ্ছে প্রায়  $10^{28}$  সেঃ মিঃ।<sup>1</sup> আজ পর্যন্ত জ্ঞাত আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম সৃষ্টির মধ্যে কী বিশাল ব্যবধান। এই বিশাল পরিমাপককে চারটি সুবিধাজনক ধরনের অংশ বা আকারে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন :

২. প্রোটন থেকে বিশালাকার অণুর জগত।

২. বিশাল অণু থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত (অর্থাৎ  $10^{-5}$  সেঃ মিঃ থেকে  $10^{+5}$  সেঃ মিঃ)।

৩. আমাদের গ্রহ পথিবী (১০৯ সেঃ মিৎ)।

৪. আমাদের এই পৃথিবী থেকে বিশ্বজগতের জ্ঞাত অংশ (অর্থাৎ ১০৯ সেঃ মিঃ থেকে ১০২৮ সেঃ মিঃ)।

দৈর্ঘ্য পরিমাপকের উপরোক্ত ৪ ভাগে বিভক্তকরণ একত্রফা বা বিধি  
বহিভূত হতে পারে। তবে, এ সকল অংশ চারটি ভিন্ন ধরনের জগতের  
প্রতিনিধিত্ব করে। মজার ব্যাপার হলো যে, বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপক বিভিন্ন অঞ্চলে

১. সংখ্যাটির অর্থ হলো ১ (এক)-এর পর ২৮টি শূন্য বসাতে হবে। অর্থাৎ  $1 \times 10^{28}$ । এই সংখ্যাটি কত বিশাল তা বুঝার জন্য চিন্তা করুন যে, এই দূরত্ব অতিক্রম করতে  $3 \times 10^{10}$  সেঃ যি/সেঃ (অর্থাৎ ১,৮৬,০০০ মাইল/সেকেণ্ড) বেগে পরিদ্রোধকারী আলোর সময় লাগবে যোটা ১ হাজার বছরেরও বেশী (১ বিলিয়ন =  $10^9$  বছর)।

ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে থাকে। নিম্নে আলোচিত বিভিন্ন জগতের সহজাত বৈশিষ্ট্য থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হবে :

**আকার-১ ভূক্ত জগতসমূহ :** অতি সূক্ষ্ম সৃষ্টি তথা মৌলিক কণা, পরমাণু-কেন্দ্র, অণু ইত্যাদি জগতসমূহের কথা বিবেচনা করা যাক। এই সব জগতের নিয়ম বিধান আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা সরাসরি বোধগম্য হয় না। এ জগতের গঠন-উপাদানসমূহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু আমরা কেন দেখতে পাই না তা বুঝতে হলে পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটা আসলে কী রকম তা অনুধাবন করা দরকার। আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, তখন আলোক তরঙ্গ এই বস্তু থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের চোখের মধ্যে প্রবেশ করে। এখন যদি একটা আলোকতরঙ্গ কোন বস্তুর উপর প্রতিত হয় এবং তা বস্তুটিকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন বা গ্রাস করে তাহলে স্পষ্টতই তা থেকে আলো ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এভাবে, কোন বস্তু থেকে আলো ছড়িয়ে পড়তে হলে বস্তুটির আকার তার উপর আপত্তি দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গের তুলনায় অবশ্যই বড় হতে হবে। একটি পরমাণুর আকার দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গের তুলনায় অনেক বড় বিধায় যখন কোন পরমাণুর উপর একটা আলোকতরঙ্গ এসে আপত্তি হয় তখন এটা সম্পূর্ণ পরমাণুটিকেই ঢেকে ফেলে। ফলত এ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হতে পারে না। আর এ কারণেই পরমাণু দৃষ্টিগোচর হতে পারে না। পরমাণু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে আমাদেরকে পরমাণুর আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্র আলোকতরঙ্গ ব্যবহার করতে হবে।

কিন্তু এ সকল তরঙ্গ আমাদের চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। এগুলো হচ্ছে রঞ্জনরশ্মি কিংবা আরো বেশি শক্তিশালী গামা রশ্মি। দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গের তুলনায় এই সব ত্রুটি তরঙ্গ অনেক বেশী তেজস্বী। এ সকল তেজস্বী তরঙ্গের মাধ্যমে পরমাণু পর্যবেক্ষণে একটা সমস্যা রয়েছে। তাহলো কোন কণা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে তথ্য সংগ্রহ করার অর্থ আমাদেরকে অবশ্যই এই কণার অবস্থান এবং গতি ও নির্ণয় করতে হবে। কিন্তু, উদাহরণস্বরূপ ইলেক্ট্রনের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যখন শক্তিশালী বিকিরণ ব্যবহার করা হয় (অর্থাৎ ইলেক্ট্রনটি কোথায় এবং এটি কী করছে অর্থাৎ এর অবস্থান ও গতি), তখন বিকিরণটির প্রবাহ ইলেক্ট্রনটিকে প্রবলভাবে ধাক্কা বা ঝাঁকুনি দেয় এবং এতে ইলেক্ট্রনটির অবস্থান ও গতি উভয়ই বিপ্লিত হয়। বিচ্ছুরিত বা অপরিবর্তিত বিকিরণ অবশ্য ইলেক্ট্রনটির অবস্থান ও গতি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করে বটে, কিন্তু বিকিরণ প্রবাহ দ্বারা বিপ্লিত না হলে ইলেক্ট্রনটির অবস্থান ও গতি যা থাকত, এই অবস্থান ও গতি তা নয়। কাজেই, যে সময়ে বিকিরণ প্রবাহ ইলেক্ট্রনে প্রবেশ করে তখনকার তথ্য সম্পর্কে খালিকটা অনিচ্ছয়তা থাকে বৈকি। অবশ্য, ইলেক্ট্রনের

ଅବଶ୍ଵାନ ଓ ଗତିର ପରିମାପେର ଅନିଶ୍ଚୟତା ବିଚିନ୍ତନ କୋନ ଘଟନା ନୟ । ବସ୍ତୁତ, ଏ ସକଳ ଅନିଶ୍ଚୟତାର ଗୁଣଫଳେର ମାନ 'ଏଇଚ' (h) ପର୍ଯ୍ୟାକ୍-ଏର ସ୍ଵତଃସିଦ୍ଧ ଧ୍ରୁବକ ) । ଏହି ହାଇସେନ୍‌ବାର୍ଗେର ଅନିଶ୍ଚୟତା ନୀତି ନାମେ ପରିଚିତ । ଏହି ସବ କିଛୁ ଏଟାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ତୁଲହେ ଯେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକିରଣ ପ୍ରୋଗ୍ କରେ ଆମରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିନେର ଅବଶ୍ଵା ସମ୍ପର୍କେ ଯେ ସତ୍ୟ ଖୁଜେ ପାଇ ତା ଶୁଦ୍ଧ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ଅପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର, ଆସଲ ବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୟ । ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଥେକେ ଅପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କତ୍ଥାନି ଭିନ୍ନ ହବେ ତା ନିର୍ଭର କରେ ପରୀକ୍ଷା-ନିରୀକ୍ଷା ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାର ସମୟ ସଂଖ୍ୟାଟ ବସ୍ତୁଟିକେ କଟଟା ବିସ୍ତିତ ବା ବିକ୍ଷୁଳ କରା ହେଁବେ ତାର ଉପର । ବ୍ୟାପାରଟା ସୂଚ୍କ ଜଗତେର ଦାର୍ଶନିକ ଦିକ ସମ୍ପର୍କେ ଏକଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଅର୍ଥାଂ ଏ ଧରନେର ଜଗତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ପରୀକ୍ଷା-ନିରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାଇ ଏକଟା ବିସ୍ତର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଧୀନ ବସ୍ତୁର ଉପର କ୍ରିୟା କରେ । ଏଟା ଏମନ ଏକଟା ବ୍ୟାପାର ଯା ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳତର ବସ୍ତୁଜଗତେ ଦେଖା ଯାଇନି । ସତ୍ୟ ବଲତେ କି, ସୂଚ୍କ ଜଗତ 'କୋଯାଟ୍ରାମ ମେକାନିସ୍କ୍ରୀ' ନାମେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଧରନେର ବଲବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯା ବୃଦ୍ଧତା ପରିମାପେର ବସ୍ତୁର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଚଲିତ ବଲବିଦ୍ୟା ଥେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । କାଜେଇ ଦେଖା ଯାଛେ, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁର ଗତି ସୂତ୍ର ଆର ବୃଦ୍ଧ ବସ୍ତୁର ଗତି ସୂତ୍ର ନାଟକୀୟଭାବେ ପରମ୍ପରା ଥେକେ ଭିନ୍ନ । ବ୍ୟାପାରଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିମାପେର ଭିନ୍ତିତେ ବିଭିନ୍ନ ଜଗତେର ଶ୍ରେଣୀ ବିନ୍ୟାସେର ପ୍ରତି ଅଧିକତର ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଯା ବଟେ ।

**ଆକାର-୨ ଭୂକ୍ତ ଜଗତସମୂହ :** ଏ ସବ ଜଗତେର ବସ୍ତୁ ସରାସରି ଆମାଦେର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରହ୍ୟ । ଆମରା ଏଗୁଲୋ ଦେଖିତେ ପାଇ ଏବଂ ମଜାର ବ୍ୟାପାର ହଲୋ, ଆମରା ଯଥିନ ଏଗୁଲୋ ଦେଖି ତଥିନ ଆମରା ଏସବେର ଉପର କୋନ ବିସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରି ନା, ଯା ଆମରା ସୂଚ୍କତମ ବସ୍ତୁଜଗତେର କ୍ଷେତ୍ରେ କରେ ଥାକି । କେନ ଆମରା ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଧୀନ ବସ୍ତୁକେ ବିକ୍ଷୁଳ କରି ନା ତା ଏକଟି ପିପଡ଼ାକେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ତୋଳା ଯାଇ । ପିପୀଲିକାର ଆକାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ତୁଳନାୟ ଅନେକ ବେଶୀ ବଡ଼ । କାଜେଇ, ପିପୀଲିକା ହତେ ଆଲୋ ସହଜେଇ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିତେ ପାରେ ଯେ କାରଣେ ଏକଟି ପିପୀଲିକା ସହଜେଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୟ । ସତ୍ୟ ବଟେ, ପିପୀଲିକାର ଉପର ଆପତିତ (ଆଲୋକ କଣା) ଫୋଟନ ପିପୀଲିକାର ଉପର ବାଁକୁନି ଦେଇ ବୈକି, କିନ୍ତୁ ତା ଇତିପୂର୍ବେ ସୂଚ୍କ ଜଗତେର ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାପର୍ବେ ବିବେଚିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିନେର ଭରେର ତୁଳନାୟ ତେମନ ଏକଟା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟେର ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ପଡ଼େ ନା । ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୃତ ବସ୍ତୁର ଅବଶ୍ଵାନ ଓ ଗତିର ଉପର କୋନ ପରିବର୍ତନ ସୂଚିତ କରେ ନା, ତାଇ ଏ ସକଳ ଜଗତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏଖାନକାର କୋନ ଘଟନାୟ ପ୍ରଭାବ ବିଭାଗ କରେ ନା । ଅର୍ଥାଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବା ପରିମାପକ ପରିମାପକୃତ ବସ୍ତୁକେ ବିଚଲିତ ବା ବିକ୍ଷୁଳ କରେ ନା । ଆବାର, ଏ ଜଗତସମୂହେ ଗତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟକ ଆଚରଣ ବର୍ଣନାର ଭଲ୍ୟ ପ୍ରଚଲିତ ବଳ-ବିଦ୍ୟାଇ ନିଖୁତଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଲେ ମନେ ହୟ ।

আকার-৩ ভূত্ত জগতসমূহ : দৈর্ঘ্য পরিমাপক ভিত্তিতে জগতসমূহের শ্রেণী বিন্যাসে আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটিকে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এমনটি করার কারণ এই যে, আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষ সহ বহু জীবের জীবন ও পরিবেশকে আল্লাহু বায়ুমণ্ডল, মাধ্যাকর্ষণীয় ক্ষেত্র এবং পৃথিবীর গতি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন এবং সূর্যের চারদিকে আবর্তনের কারণে আমরা একটা প্রমাণ সময় পাই। যথাযথভাবে ক্ষুদ্রতর বিভাগে পৃথিবীর ব্যাস আমাদেরকে দেয় দৈর্ঘ্যের মান। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল জীবনের জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর ভূমি, পানি এবং বায়ু ব্যবস্থাসমূহ পৃথিবী নামক এই গ্রহস্থিত সর্ব আকারের প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে সূক্ষ্ম প্রতিবেশীয় ভারসাম্য স্থাপন করে। এই গ্রহটি তার নিজ আকার-আয়তনের তুলনায় বিশ্বজগতের বিশালতার ব্যাপ্তি কতটুকু তা বুঝতেও আমাদেরকে খানিকটা হলেও সাহায্য করে। এভাবে, অনেক দিক বিবেচনায়, পৃথিবী গ্রহটি নিজেই একটা জগত হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার মত যথেষ্ট বিশেষ মর্যাদাজনক স্থান অধিকারের দাবী রাখে। এ গ্রহটির গতি প্রচলিত বলবিদ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা আগে থেকে অনুধাবনযোগ্য ও বটে।

আকার-৪ ভূত্ত জগতসমূহ : এবার আমরা এসে পড়েছি বহু যোজন দ্বারে মহাকাশে এবং বহু ক্ষেত্রেই আমাদের আলোচ্য বিষয় বিশাল বিশাল দূরত্ব আর বিপুল ভরবিশিষ্ট তারকারাজি। এ ধরনের বস্তুর গতির ক্ষেত্রে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার সূত্র ও ধারণাসমূহ প্রয়োগ করা হয়ে থাকলেও গতির সঠিক বর্ণনার জন্য বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ উভয়ই এ বিষয়ে জড়িত। বিশাল বিশাল দূরত্বের কারণে প্রকাও প্রকাও সব মহাজাগতিক বস্তু সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় সাধারণত বেতার সংক্ষেতের সাহায্যে। আকার-৪ এর ‘ব্যাপ্তি-বিস্তৃতি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ায় বিপুল সংখ্যক জগতকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বস্তুত বিশ্বকর বৈচিত্র্য সহ এ ধরনের বহু জগত (জীব ও জড়) মহাবিশ্বের অন্যত্র থাকতে পারে, যাদের আকার-আকৃতি আমাদের এই বিশ্বেরই অনুরূপ, কিংবা হতে পারে এ থেকে একেবারেই ভিন্নতর কিছু।

পৃথিবীটা সূর্য নামক নক্ষত্রেই একটি গ্রহ। সূর্য নামক এই নক্ষত্রটি আবার ছায়াপথ নামক গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত এক সদস্য। আর, মহাবিশ্বে প্রায় ১০ কোটি ছায়াপথের সঙ্গান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

নক্ষত্রসমূহের রয়েছে সূর্যের সাথে তুলনীয় ধর্ম—তাদের ভর, উপরিভাগের তাপমাত্রা, আলোর ত্বরতা, স্থিতিশীল অবস্থায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বয়স (প্রধান ধারা অনুক্রমে) ইত্যাদি ক্ষেত্রে। আর সম্ভবত এ ধরনের নক্ষত্রের রয়েছে তাদের চারদিকে আবর্তনশীল গ্রহসমূহ যাদের বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর অনুরূপ। ছায়াপথ নামীয়

গ্যালাক্সীর এক-চতুর্থাংশ গ্রহেরই এ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একমাত্র আমাদের ছায়াপথেই যুগ্ম ও যৌগিক নক্ষত্র মিলে প্রায় দু'হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে বলে প্রাকৃতন করা হয়।

ইতোমধ্যে শনাক্তকৃত বা আবিষ্কৃত ১০ কোটি গ্যালাক্সীর কথা বিবেচনা করলে এবং সব ধরনের সীমাবদ্ধতার বিষয় মেনে নিলেও নিঃসন্দেহে ১০০ কোটি নক্ষত্রে প্রাণী আছে বলে যে হিসাব করা হয় তাকে খুবই সতর্কতাপূর্ণ হিসাব বলে মানতেই হবে।<sup>১</sup>

পৃথিবীতে প্রাণ-রসায়ন নির্ভর করে দু'টি জিনিসের উপর। এক, জটিল কার্বন (অপার) যৌগের উৎপাদন এবং দুই, দ্রাবক হিসেবে তরল পানির উপস্থিতি। অন্য নক্ষত্রসমূহের বাসযোগ্য গ্রহগুলোতে প্রাণ-রসায়ন পৃথিবীর মত হ্রবহ একও হতে পারে, কিংবা হতে পারে তিনি রকম কিছুও। দ্রষ্টান্তস্বরূপ, মৌলিক প্রাণ-রসায়ন উপাদান হিসেবে সিলিকন তথা বালু কণা হতে পারে কার্বন বা অঙ্গারের বিকল্প, তেমনি তরল এমোনিয়া হতে পারে দ্রাবকের ভূমিকা পালনকারী ইত্যাদি।

বর্তমানে যেভাবে হিসাব করা হয় তাতে স্থিতিশীল অবস্থায় শত শত কোটি বছর আয়ু বিশিষ্ট (প্রধান ধারা অনুক্রমে) সূর্যের মত নক্ষত্রগুলোর অন্তত একটা করে এমন গ্রহ আছে যেখানে প্রাণের সঞ্চার ও বিজ্ঞার লাভ ঘটেছে। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আন্তঃচারকামগুলীয় অঞ্চলে ফরমালডিহাইড এবং সেলুলোজ ইত্যাদির মত রাসায়নিক অণু সহ ৪০ টি বিভিন্ন ধরনের জটিল অণুর সক্কান পাওয়া গেছে। বিশ্বজগতের অন্যত্রও যে প্রাণের উন্নেশ ঘটে থাকতে পারে, এটা তার এক জোরালো ইঙ্গিত বহন করে।

বিভিন্ন ধরনের জগতের উপর উপরোক্ত আলোচনা এ সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ যদি নিজকে জগতসমূহের পালনকর্তা হিসেবে ঘোষণা না করে শুধু এই বিশ্বের পালনকর্তা ঘোষণা করতেন, তাহলে বিভিন্ন জগতের এইসব সূক্ষ্ম জটিলতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের তেমন কোন অর্থ থাকত না। বস্তুত বিভিন্ন ধরনের যেসব জগতকে আমরা দৈর্ঘ্য পরিমাপকের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করেছি, যা কিনা একমাত্র মৌলিক জিনিস এবং যার পরিমাপে আমরা সক্ষম হয়েছি, সেগুলো সবদিক দিয়েই ভিন্ন। প্রত্যেক ধরনের জগতেরই রয়েছে নিজস্ব গঠন-কাঠামো, রয়েছে অনুসন্ধানী কৌশল এবং বলবিদ্যা। আর একমাত্র আল্লাহই সকল জগতসমূহের সার্বিক তথ্যাদি অবগত আছেন।

উপরে আলোচিত বস্তুগত জগতসমূহ এবং তাদের শ্রেণীবিন্যাস ছাড়াও আধ্যাত্মিক জগতও এক বিশ্বয় বটে। যাহোক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যা

কিছু অন্ত ও কলাকৌশল আমাদের হাতে রয়েছে তা দিয়েও আধ্যাত্মিক জগতকে সেভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় যেমনটা সম্ভব জীবজগত ও জড় জগতের ক্ষেত্রে। হতেই পারে যে, বস্তুর উপর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের জন্যে বর্তমানে যেসব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তা আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য উন্মোচনে একেবারেই অনুপযুক্ত। এ কারণেই আমরা আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কে তথ্যাদি দিতে বা বিস্তারিত আলোকপাত করতে পারছি না, যা শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অনুধাবন করা সম্ভব।

**জগতসমূহের লালন-পালন :** এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জগতের গঠন-কাঠামো আলোচনা করেছি মাত্র। এবার আসা যাক তাদের লালন-পালন প্রসঙ্গে। জগতটা ক্ষুদ্রই হোক আর বিশালই হোক, আল্লাহ সংশ্লিষ্ট জগতের সকল অধিবাসীকে লালন-পালনের চমৎকার অ্যোজন করে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম জগতের কথাই বিবেচনা করা যাক। বিপুল সংখ্যক অণুজীব আমাদের জীবন ও পরিবেশ বেষ্টন করে আছে। এদের মধ্যে এমনও অনেকগুলো আছে যাদের ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব হমকির সম্মুখীন হত। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, আণুবীক্ষণিক ছত্রাক এত ক্ষুদ্রাকৃতির যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদেরকে খালি ঢাঁকে দেখাই যায় না। এই সকল অণু-জীবকে অত্র আলোচনার শুরুতে উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিমাপকের মধ্যবর্তী একটা জগতে স্থান দেয়া যেতে পারে। এই সব জীব নানান প্রকৃতির এবং সে কারণে এদের খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা ও পদ্ধতিও নতুন ধরনের। এদের কতক খাদ্য সংগ্রহ করে মাটি থেকে, কতক উল্লিঙ্ক দেহ থেকে আবার কতক খাদ্য সংগ্রহ করে প্রাণীদেহ থেকে। আর এরা সকলেই খাদ্য মজুদ করে থাকে। আল্লাহ এ সকল অণুজীবের মাধ্যমে গাছপালা এবং উন্নত প্রাণীদের লালন-পালনের ব্যবস্থাও করেছেন। এ সকল অণুজীবকে সৈন্যের সাথে তুলনা করা যায়—আল্লাহ তাদেরকে যুদ্ধ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, দিয়েছেন বিস্তার লাভের ক্ষমতাও। এই বিস্তার যদি হয় ব্যাপকতর এবং তা কোন জীবনের জন্য যদি হয়ে দাঢ়ায় হমকিস্বরূপ, তাহলে প্রকৃতিতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এসব অণুজীবের সংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতা রোধ করতে আল্লাহ জীব বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। সূক্ষ্ম-জগত থেকে এখন যদি আমরা পোকা-মাকড়, পক্ষীকুল, পশু, গাছপালা এবং মানুষের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে জীবনের এ সকল উন্নত আকার বা স্তরের বিরাজমান বিশ্যয়কর বৈচিত্র্যও সহজেই আমাদের নজর কাঢ়ে। প্রত্যেক আকারের প্রাণের রয়েছে নিজস্ব খাদ্য, নিজস্ব যোগযোগ সংকেত, আছে নিজস্ব ঘরদোরের ধরন, আর বংশবৃক্ষির ব্যবস্থা। তবে লক্ষ্য করার মত বিশ্যয়কর ব্যাপারটা হলো যে, আল্লাহ কাউকেই খাদ্য, আশ্রয় আর প্রতিলক্ষ্মা ব্যবস্থাহীন অবস্থায় রাখেন নি। সূক্ষ্ম

ଜଗତେର ଅଧିବାସୀଇ ହୋକ କି ବୃଦ୍ଧ ଜଗତେର, ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ରଯେଛେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନେର ଉପାୟ; ଆର ଆଲ୍ଲାହ୍‌ଇ ତାଦେର ରିଧିକଦାତା ।

ଅବଶ୍ୟ, ରାକୁଳ ଆଲାମିନ ବଲତେ ଆମରା ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ୍ ଜୀବ ଜଗତସମୂହେର ଲାଲନ-ପାଲନକର୍ତ୍ତାଇ ବୁଝି, ତାହଲେ କାହିଁନିଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣି ଥେକେ ଯାଏ । ଜଗତେର ପାଲନକର୍ତ୍ତା ବଲତେ ଆସଲେ ଜୀବନ ଓ ଜଡ଼ ଉତ୍ସବ ଜଗତକେଇ ବୁଝାଯ । ଜୀବ ଜଗତେର ଲାଲନ-ପାଲନେର ବ୍ୟାପାରେର ସାଥେ ଆମରା ପରିଚିତ ହଲେ ଓ ଜଡ଼ବନ୍ତୁର ଲାଲନ ପାଲନେର ବିଷୟଟି ଆମାଦେର କାହେ ଖାନିକଟା ଅତ୍ତୁଂ ଲାଗତେ ପାରେ । ବାନ୍ଧବ ସତ୍ୟ ହଲୋ ଯେ, ଜଡ଼ ବନ୍ତୁର ଟିକେ ଥାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଥାକଲେ ଜୀବେର ଅନ୍ତିତ୍ବ ବଜାଯ ରାଖାଇ ସମ୍ଭବ ହତୋ ନା । ଆଲ୍ଲାହ୍ ପ୍ରାଣେର ଅନ୍ତିତ୍ବ ବଜାଯ ରାଖାର ପ୍ର୍ୟୋଜନେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥସମୂହେର ସ୍ଥିତିଶୀଳତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଛେ । ବନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାସନେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଏଇ ସ୍ଥିତିଶୀଳତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହେଁବେ । ପରମାଣ ଯଦି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ନା ହତ, ତାହଲେ ସୌରଜଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ହତ ନା । ବନ୍ତୁର ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରତେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ଚାରଟି ବଲେର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରେଛେ, ଯଥା : ଆଗବିକ ବଲ, ଦୂରବଳ ଆଗବିକ ବଲ, ତୃତ୍ତିଙ୍କୁ-ଚୌଷ୍ଵକୀୟ ବଲ ଏବଂ ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ ବଲ । ପ୍ରଥମ ତିନି ଧରନେର ବଲ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରଯେଛେ ଇତିପୂର୍ବେ ଆଲୋଚିତ ଆକାର-୧ ଏବଂ ଆକାର-୨ ବ୍ୟାପ୍ତି ଜୁଡ଼େ ଆର ଚତୁର୍ଥ ବଲ ଯଦିଓ ସର୍ବଜୀନ, ଏଠି ଆକାର-୩, ଆକାର-୪ ଏବଂ ଆକାର-୫ ଏଇ ଅତ୍ତର୍ଭକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବନ୍ତୁର ମଧ୍ୟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ । ମଜାର ବ୍ୟବାର ହଲୋ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାର ପ୍ରେସମୂହ ସମସ୍ତରେ ଯେମନ ବୃଦ୍ଧ ସୌର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତିତ୍ବମାନ ରଯେଛେ, ତେମନି ରଯେଛେ ନିଉକ୍ଲିଯାସ ଏବଂ ଏଇ ଚତୁର୍ଦିଶିକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଷ୍ଟପଥେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାଯମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନିଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତିତ୍ବ । ବୃଦ୍ଧ ସୌରଜଗତ ଏକଟି ଆକର୍ଷଣଧର୍ମୀ ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣୀୟ, ବିପରୀତମୁଖୀ ବର୍ଗୀୟ ବଲ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଅର୍ଥାଏ ଦୁଟୋ ବନ୍ତୁର ମଧ୍ୟକାର ଦୂରତ୍ବେର ବିପରୀତ ବର୍ଗେର ଆନୁପାତିକ ବଲ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଏକଟା ଆକର୍ଷଣଧର୍ମୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌଷ୍ଵକୀୟ ବଲ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଯା Coulomb ବଲ ନାମେ ପରିଚିତ । ଏ ବଲଟିଓ ଏକଟି ବିପରୀତ ବର୍ଗୀୟ ବଲ । ଏ ଦୁଟି ଜଗତ ମାପେର ବିଚାରେ ବିଶାଳଭାବେ ଆଲାଦା, ଏଦେରକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବଲଦ୍ୱାରୟ ଶକ୍ତିତେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫାରାକ (ବନ୍ତୁତ ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ ବଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌଷ୍ଵକୀୟ ବଲେର ତୁଳନାଯ ୧୦+୩୮ ଗୁଣ ଦୂରବଳ) । ତଥାପି, ବଲଗୁଲୋର ଦୂରତ୍ବ ସାପେକ୍ଷତା ଏକଇ ଥାକଛେ । କୀ ଅପୂର୍ବ ବନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଯାତେ ପ୍ରମାଣ କରା ଯାଏ ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିଧୃତିଓ ହତେ ପାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏମନକି ବନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଥେକେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଯ ପରିବର୍ତ୍ତି ହୁଏ କିଂବା ବନ୍ତୁ ଯଦି ଶକ୍ତିତେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯଦି ବନ୍ତୁତେ କ୍ଳପାତ୍ତରିତ ହୁଏ ତାହଲେ ଏଇ କ୍ଳପାତ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମନଭାବେ ନିର୍ଧାରଣ କରା ହେଁବେ ଯାତେ, ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନା ମତେ, ସକଳ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଓ ତାଦେର ପରିବେଶେର ସାଥେ ଖାପ ଯାଏ ପ୍ରକୃତିର ଏମନ ଅଭିବେଶିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ।

অত্যন্ত মজার ব্যাপার যে, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে জীব ও জড় উভয় প্রকারের নতুন নতুন জগত আবিষ্কৃত হচ্ছে। জীনা যায় যে, চৌদ্দ শতাধিক বছর আগে আল্লাহ আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে জগত শৰ্কটির বহুচন ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্ত জগত সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন।

উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে, জীব ও জড় বস্তুর বিভিন্ন ধরনের যে সকল জগতের কথা এ পর্যন্ত আলোচিত হল, সে সবই আল্লাহ কর্তৃক চমৎকার এক বিধানসমষ্টি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিচালিত ও লালিত-পালিত হয়ে থাকে। বস্তুত আল্লাহই জগতসমূহের লালন ও পালনকর্তা।

### তথ্যসূত্র :

1. Barnard Lovell, In the Centre of Immensities 1971, Hutchinson, London.

**الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَ أَرْزَاقِنَاهُمْ يُنْفِقُونَ**

২৪৩ যারা (যারা আল্লাহকে তফসিল করে) অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কার্যম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

অদৃশ্যে বিশ্বাস : এই সূরায় আল্লাহ রাবুল আলামিন ‘অদৃশ্য’ বিশ্বাসের বিরাট গুরুত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহর নিকট থেকে হিদায়েত পেতে হলে তাকওয়ার পরেই অদৃশ্যে বিশ্বাস এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিকীয় শর্ত।

এ ধরনের বিশ্বাস কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অযৌক্তিক ? বাস্তবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। স্যার আর্থর এডিংটন তার বিখ্যাত ক্যাম্ব্ৰিজ বক্তৃতামালায় দেখিয়েছেন যে, পদাৰ্থবিদ্যার সকল মৌলিক সূত্র এবং ধূৰ্বক স্পষ্টতাই পূর্বানুমান নির্ভর মূলনীতি থেকে গৃহীত। বস্তুগত জগতের ব্যাখ্যায় এ সকল সূত্র অত্যন্ত সফল। কাজেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুক্তিতর্কের যুগেও বিশ্বাসের স্থান সর্বোচ্চেই রয়ে যায়। কেননা, যুক্তি হচ্ছে বিশ্বাসেরই অন্যতম ভিত্তি।

কিছু কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টা পরিকার করা যাক। কোয়ান্টাম পদাৰ্থবিদ্যা যাত্রাই শুরু করে আলোকণশী বহনকারী ফোটন নামে এক অদ্ভুত কণার অস্তিত্ব কল্পনা করে। কণার কোন মাত্রা কিংবা বিদ্যুৎশক্তি নেই। অন্য কোন ভৌত বস্তুর মত এর কোন ধর্মও নেই। স্থির অবস্থায় এর ভর শূন্য আর চলন্ত অবস্থায় এর ভর অপরিমাপযোগ্য। বিজ্ঞানের যে শাখা এই অনুমানের গোড়াপত্তন করে সেটাকে মানব বুদ্ধিমত্তার অন্যতম বিরাট সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ডি ব্ৰোগ্লি (De Broglie) অনুমান করেন যে, চলন্ত অবস্থায় সকল আণুবীক্ষণিক কণাকেই একটি তরঙ্গের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। এটাই বস্তু তরঙ্গ নামে পরিচিত। এটা যেহেতু একটা জটিল তরঙ্গ, এর কোন সাদৃশ্য বা উপমা নেই এবং এর প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বস্তু নিরপেক্ষ। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, স্পন্দন সংখ্যা এবং গতিবেগ এই তিনটি রাশির যে কোন দুটি পরিমাপের মাধ্যমে কোন তরঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়। সুপরিচিত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় এবং যান্ত্রিক তরঙ্গের এ সবগুলো রাশির ধূৰ্বক পরিমাপ করা সম্ভব। কিন্তু বস্তু তরঙ্গের ক্ষেত্ৰে, কোন যন্ত্ৰ দিয়ে স্পন্দন সংখ্যা এবং তরঙ্গ গতি কথনোই নির্ধাৰণ কৰা যায় না। বস্তুতরঙ্গ একটি গাণিতিক কৌশল, পর্যবেক্ষণ দ্বাৰা যাকে সঠিকভাৱে বৰ্ণনা কৰা

যায় না। তথাপি, এই বস্তুতরঙ্গে বিশ্বাস দ্বারা আণবিক ও পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করা যায়। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক পদার্থবিদ্যায় বস্তুতরঙ্গ একটি বিশ্বাসের বিষয়বস্তু।

একটি চলমান কণা একটি তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করে—এ হচ্ছে একটা বিশ্বাস। আর তরঙ্গ বলবিদ্যা এই বিশ্বাসেরই উপর ভিত্তিশীল। হেইসেনবার্গের অনিক্ষয়তা মূলনীতির বক্তব্য অনুযায়ী একটা কণার অবস্থান ও গতি একই সাথে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না এবং এ সকল পরিমাপের অনিক্ষয়তার গুণফলও একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতমের চেয়ে কম হতে পারে না। এই সর্বনিম্ন সীমার অন্তিম প্রথমদিকে বিশ্বাসের বিষয় ছিল যার ফলে ধারণা করা হত যে, ক্রিয়ার ক্ষুদ্রতম একক আছে। এই বিশ্বাস পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হলে ক্রিয়ার ক্ষুদ্রতম একক পাওয়া যায় :  $I=6.63 \times 10^{-38}$  joule-sec যা প্ল্যাকের ধ্রুবক নামে পরিচিত।<sup>১</sup>

আপেক্ষিকতাবাদে স্থানের সাথে সময়ের উপর নির্ভরশীল ফলাফলকে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মতবাদটি স্বয়ং অনুমান নির্ভর। বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদগণ আজ পর্যন্ত সকল পর্যবেক্ষকের সাধারণ বর্গীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের আঘাত্যী প্রভাব দ্রুত করতে সক্ষম হননি। আপেক্ষিকতাবাদ আবারো মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার এক বিশাল বিজয় হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে।

আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ‘একীভূত ক্ষেত্র মতবাদ’ সম্পর্কিত ঘোষণার মধ্যেও বিশ্বাসের ভূমিকা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই মহান বিজ্ঞানী তাঁর জীবনের শেষ ৩০ টি বছর ব্যয় করেছেন মহাকর্ষবল আর ত্বরিত-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রকে একত্রে যুক্তকারী কোন বৃহত্তর সূত্র আছে কিনা তার সন্ধানে। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার এই বিশ্বাসের উপর স্থির ছিলেন যে, এ রকম একটা সূত্র আছেই। প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম সহ বিজ্ঞানীরা আংশিক সফলতা সহ এর উপর এখন পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন। সালামের গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা ‘মহা সমৰয় মতবাদ’ খুঁজে বের করা। এ সবের মধ্যে রয়েছে : মাধ্যাকর্ষণ, ত্বরিত-চৌম্বকীয়, দুর্বল আণবিক শক্তি ও শক্তিশালী আণবিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এ সকল দৃশ্যত বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সমরিত করার প্রচেষ্টা কেন? মোটের উপর, এ সকল বলের সমৰয় ছাড়াও তো প্রকৃতিকে বুঝাতে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আসলে, এই সকল বলকে একটি বলে সমরিত করার অভিপ্রায় বিজ্ঞানীদের মধ্যে জমেছে এই বিশ্বাস থেকে যে, এ বলগুলো একটি একক

১. এই ধ্রুবককে স্পন্দনসংখ্যা দ্বারা গুণ করা হলে ফোটন নামক প্রতিটি আলো প্রবাহের সাথে সংস্পষ্ট ন্যূনতম শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়।

সজ্ঞারই ভিন্ন বহিংপ্রকাশ মাত্র। বোঝা যায়, ত্বরিত-চৌম্বকীয় এবং দুর্বল আণবিক বলদ্বয়কে সমর্পিত করার ব্যাপারে সালামের প্রচেষ্টা ও সফলতার মূলে ছিল সূরা আল-মূলক-এর ৩য় ও ৪ৰ্থ আয়াতদ্বয়ের প্রেরণা যা তাঁর মধ্যে সৃষ্টিগতের শৈলো ও সঙ্গতি সম্পর্কে অনড় বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

কাজেই, সূক্ষ্মসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট কোন নমুনা অনুসন্ধানের ২ অর্থই হলো আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের মহাপরিকল্পনায় বিশ্বাস। বস্তুত বিজ্ঞানের জগতে আরো বহু বিষয় আছে যেগুলোর ভিত্তি হলো ‘বিশ্বাস’।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপরোক্ত আলোচনাগুলো জ্ঞানজগতে মানুষের অগ্রগতির পিছনে বিশ্বাসের ভূমিকার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কাজেই, আল্লাহর দাবীকৃত ‘অদৃশ্য’ বিশ্বাস অযৌক্তিক নয়। কেননা, অদৃশ্য বস্তু আমাদের বোধগম্যতার বাইরে থাকে আমাদের বর্গীয় সীমাবদ্ধতার কারণে। এখানে যা কিছু বলা হয়েছে তা এ বিষয়টির উপরই জোর দিচ্ছে যে, অদৃশ্যের বিশ্বাস বস্তুগত জগত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে।

### তথ্যসূত্র :

1. The Philosophy of the Physical Science, The University of Michigan Press, 1958.
2. The Structure of Scientific Revolutions, Encyclopaedia of Unified Science. The University of Chicago Press, 1974..

۱۹۔ أَوْ كَسَبْتُ مِنَ النَّمَاءِ فِيهِ طَلْقٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، يَعْلَمُونَ أَصْنَاعَهُمْ فَيَأْذِنُمْ فِي الْعَرَاعِ حَذَرَ الْمُؤْمِنُوْتُ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ

২ : ১৯      অথবা তাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে পুঁজি যা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এ ধরণের মেঘমালা, যার সঙ্গে গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকও থাকে তাকে 'cumulo nimbus' অথবা thunder-heads বলা হয়। এসব দেখতে বড় বড় পাহাড়ের মত-মেঘরাঙ্গি, যার বিস্তৃতি ১০ থেকে ১০০ বর্গমাইল এবং উচ্চতায় ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ ফুট হয়ে থাকে। এই মেঘপুঁজি পৃথিবীর খুব নিকট থেকে অর্ধাং প্রায় ৬৫০০ ফুট উপর থেকে শুরু হয়। এই বিরাট উচ্চতার বা গভীরতার জন্য এই মেঘপুঁজি অঙ্ককারয় হয়। সূর্যের আলো মেঘমালায় প্রবেশ করে পানি ও বরফ কণায় প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। ফলে খুব সামান্য আলো এই মেঘপুঁজি ভেদ করে পৃথিবীতে পৌছতে পারে। তাই এই পানিভরা মেঘপুঁজিকে নিচ থেকে কালো দেখায়। এই মেঘপুঁজির অঙ্ককার সর্বক্ষেত্রে একরূপ নয়; উপরের দিকে সামান্য অঙ্ককার কিন্তু নিচের দিকে ক্রমেই এই অঙ্ককারের গাঢ়ত্ব বাড়তে থাকে এবং সর্বনিম্নে গভীর অঙ্ককারে পরিণত হয়। সুতরাং এই মেঘপুঁজির অভ্যন্তরে বিভিন্ন গভীরতার অঙ্ককার এই মেঘপুঁজি আর একটি ব্যাপার ঘটিয়ে থাকে, তাহলো এতে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে। তবে এতে বিদ্যুৎশক্তি (electric charge) সম্পন্ন কণার সংখ্যা এবং মেঘমালার অভ্যন্তরে এদের গতির সঠিক পরিসংখ্যান জানা নেই। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে বিশেষ করে এই বিদ্যুৎশক্তির উৎস এবং বিদ্যুতায়িত এলাকা সম্পর্ক। সবচেয়ে প্রধান মতবাদ হলো-মেঘের অভ্যন্তরে বিদ্যুতায়িত কণাগুলো, ion capture, contact electrification, বরফ হয়ে যাওয়া (freezing) এবং drop break up পদ্ধতিতে থিতিয়ে যাওয়ার ফলেই বিদ্যুতায়িত হয়।<sup>১</sup> অন্য এক মত হলো-বিদ্যুতায়িত কণাগুলোর মেঘের অভ্যন্তরে উপরে ও নিচে ধাবিত হবার ফলে মেঘের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির বিদ্যুতায়িত এলাকার সৃষ্টি হয়। অন্য আর একটি মতে<sup>২</sup> বিদ্যুতায়িত কণা ও বৃষ্টির কণা বাতাসের প্রবল বেগে উঠানামা

করার ফলে মেঘপুঁজের হিমায়িত এলাকায় পৌছে গেলে পানির কণাগুলো বরফ কণায় পরিণত হয়। এই বরফে পরিণত হওয়ার সময় কণাগুলো ফেটে যায় এবং স্কুদ্র স্কুদ্র বরফ কণা ছিটকে পড়ে। এই বরফের স্কুদ্র কণাগুলো ধনাত্মক বিদ্যুৎ শক্তি বহন করে নিয়ে যায় এবং সেখানে ঝগাত্মক বিদ্যুৎ এলাকা সৃষ্টি করে।

ধনাত্মক বিদ্যুৎ শক্তি সম্পন্ন স্কুদ্র বরফকণাগুলো হালকা উর্ধ্বগামী বায়ুর সাহায্যে মেঘপুঁজের উপরের দিকে উঠে যায়। আর তারী ঝগাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন বরফকণাগুলো মেঘপুঁজের নিচের দিকে অবস্থান করে। এর ফলে মেঘপুঁজের অভ্যন্তরে ধনাত্মক ও ঝগাত্মক বিদ্যুৎ এলাকা পৃথক হয়ে যায়। যখন এই বিপরীত বিদ্যুৎ শক্তি এতটা বৃদ্ধি পায় যে, মধ্যবর্তী বাতাস এই দুই শক্তিকে পৃথক করে রাখতে পারে না, তখন এক বিরাট অগ্নিস্কুলিঙ্গ এই দুই এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত হয়। এই দু'য়ের মধ্যে অথবা এদের যে কোন একটা ও পৃথিবীর মধ্যে ভোল্টেজ পার্থক্য (শক্তির পার্থক্য) প্রায় ১০০ কোটি ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে। এই স্কুলিঙ্গ মেঘপুঁজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে অথবা এক মেঘমালা থেকে অন্য মেঘমালায় বা মেঘমালা থেকে পৃথিবীতে বিস্তৃত হতে পারে। এই স্কুলিঙ্গগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক। আকাশের বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাত এই স্কুলিঙ্গেরই বহিঃপ্রকাশ।

মেঘমালার এই বজ্রপাত প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করে (১০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড); বাতাসের প্রবল সম্প্রসারণ (expansion) ঘটে এবং প্রচণ্ড শব্দ তরঙ্গ ভেসে আসে যা আমরা বজ্রধ্বনি হিসেবে শনতে পাই।

সুতরাং বৃষ্টিভরা মেঘপুঁজে রয়েছে : (ক) বিভিন্ন স্তরের অঙ্ককার, এবং (খ) বিদ্যুৎ শক্তির সংশয় যা একই সঙ্গে বিদ্যুৎ-চমক বা lightning এবং প্রচণ্ড বিশ্বেরণ যা আমরা বজ্রধ্বনি হিসেবে শনতে পাই।

উপরে বর্ণিত মেঘমালা সৃষ্টির পদ্ধতি এবং বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাতের আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞানসম্বন্ধে ব্যাখ্যায় বক্ষ্যমাণ আয়াতের বর্ণনা মেঘের অঙ্ককার, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমক ইত্যাদির পারম্পরিক সম্পর্ক বেশ ভালভাবে বোধগম্য হয়। ,

### তথ্যসূত্র :

1. Encyclopaedia of Science and Technology, McGraw Hill, 1977, p. 688
2. World Book of Encyclopaedia, vol. 7. 1966, p. 432

۱۰۔ يَكُذُّ الْبَرْقُ بِعَنْطَفٍ أَبْصَارُهُمْ كُلُّمَا أَخَاهُ لَهُمْ نَسْوَافُهُمْ وَإِذَا أَطْلَمَ عَلَيْهِمْ  
كَلَمًا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَعْيِهِمْ وَأَبْصَارُهُمْ أُنْهَى إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

২ : ২০ বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি থায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উজ্জ্বলিত হয় তখনই তারা পথ চলতে থাকে এবং যখন অঙ্ককারাঞ্জল হয় তখন তারা ধরকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইঞ্চা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মানুষের দৃষ্টিশক্তি আলোর প্রতি সংবেদনশীল। এই আলো সাধারণভাবে দৃশ্যমান বর্ণালি হিসেবে পরিচিত যা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাপে  $3,800 \text{ \AA}$  থেকে  $7,200 \text{ \AA}$  পর্যন্ত বিস্তৃত ( $1 \text{ \AA} = 1 \text{ এ্যঁট্রোমি} = 10^{-8} \text{ সেমি মি}^3$ )। আলোর প্রতি চোখের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে রডোপসিন (রড) এবং আইডোপসিন (কোনু) নামে অক্ষি-গোলকের দুটি কোষের রঞ্জক পদার্থ। রড ও কোন্সমূহ হচ্ছে আলোক গ্রহণকারী কোষ। এগুলোর উপর আপত্তিত আলোক সালোক-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার কারণে একটা অনুভূতির সৃষ্টি করে। রডসমূহ রাত্রিকালীন দৃষ্টির ব্যাপারে খাপ খায় এবং অনুজ্জ্বল আলোয় কাজ করে। আর কোন্সমূহ উজ্জ্বল আলোয় কাজ করে এবং রঙের উপলক্ষ্মির জন্য এগুলো দায়ী। অমন জীবজগত আছে যাদের দৃষ্টিশক্তি শুধুমাত্র দিনে কিংবা শুধুমাত্র রাতে কাজ করে। মানুষ এদিক থেকে ভাগ্যবান; রড এবং কোন্সমূহের তৎপরতায় মানুষ দিনে ও রাতে দেখতে পায়। রেটিলাস্কুল কিছু সংযুক্ত কোষ আলোক সংকেত গ্রহণ করে এবং রড ও কোন্সমূহ সৃষ্টি সংকেত মন্তিকে পাঠিয়ে দেয় যেখানে একটি দশনীয় প্রতিবিষ্প সৃষ্টি হয়।

চোখের ক্ষটিকী অক্ষিপটের সামনেই আইরিস বা চোখের কনীনিকা যার কেন্দ্রে রয়েছে একটি গোলাকৃতি রঞ্জ যা চোখের মণি হিসেবে পরিচিত। কনীনিকার কাজ হলো, ক্যামেরার মধ্যচ্ছদার মত ব্যবহৃক্রিয়ভাবে আলোর তীব্রতা অনুযায়ী চোখের মণির খুলে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা। অল্প তীব্রতায় মণির ব্যাস বাড়ে আর মধ্যম তীব্রতায় সংকুচিত হয়। আলোর তীব্রতার সাথে দর্শন সংবেদনশীলতার গবেষণায় দেখা যায়, অত্যন্ত তীব্র আলোয় রড ও কোন্সমূহ সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ চমকানি অক্ষয়াৎ অত্যন্ত তীব্র আলো সৃষ্টি করে এবং রড ও কোন্সমূহ কাজ না করায় মানব দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে ঝাপসা হয়ে যায়।

۲۲-الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًاً لَكُمْ هَنَاءً مَوَاطِئًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّرْتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَمْحَلُوا إِلَهٌ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

২ : ২২ যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার ঘারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শনে কাকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।

যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে শয্যারূপে সৃষ্টি করেছেন : আমরা ভূপৃষ্ঠকে সমতলরূপে পাই; আর এই সমতল বিশিষ্টতার জন্যেই আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে আরামে শয়ন করতে এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারি। এই একই ধারণা সূরা তাহা-র ৫৩ আয়াত এবং সূরা যুখরুফ-এর ১০ আয়াতেও বিধৃত হয়েছে এভাবে : 'যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিস্তৃত গালিচারূপে সৃষ্টি করেছেন।' এ সকল আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল অথচ ধারণাটি পৃথিবী গোলাকার-এ বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে অসমাঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই আপাত বৈপরীত্যের মীমাংসা করা সম্ভব।

আমরা জানি, একটি ক্ষেত্র যত বড় হবে তার তলের বক্তব্য তত কম হবে। পৃথিবী একটি বিশাল ক্ষেত্র যার ব্যাস প্রায় ৬,৪০০ কিঃ মি� (প্রায় ৪ হাজার মাইল)। আর আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীপৃষ্ঠের খুব সামান্য একটা অংশ নিয়েই শুধু কাজ-কর্ম করে থাকি। এই অংশটুকুকে সকল ব্যবহারিক কাজে সমতল ধরে নেয়া যেতে পারে। এই স্বল্প অংশের বক্তব্য পরিমাণ উপলক্ষ্য করার মত নয়। এমনকি, পৃথিবীপৃষ্ঠের এক মাইলের মত বড় দূরত্বেও পৃথিবীর কেন্দ্রে এক ডিগ্রীর ৭০ ভাগের এক ভাগের মত অত্যন্ত সামান্য কোণ সৃষ্টি করে মাত্র।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, সেই ক্ষেত্রের তলকে সমতল বলা হয় যার ব্যাসার্ধ সীমাহীন, অনন্ত।

আর আসমান হচ্ছে তোমাদের জন্যে শাখিয়ানা ব্রহ্মণ : অত্র আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলামিন আমাদেরকে বলছেন যে, আসমান নামে পরিচিত যে বায়ুমণ্ডল তা মানুষের মাথার উপরে এক প্রতিরক্ষামূলক এবং উপকারী আচ্ছাদন হিসেবে কাজ করে। কতগুলো গ্যাসের মিশ্রণ সম্বলিত এই বায়ুমণ্ডলের রয়েছে কয়েকটি স্তর এবং একটি স্তুলাগুরুত স্তর পৃথিবীকে ঘিরে আছে।

প্রথম স্তরটিকে বলা হয় ট্রিপোক্ষেয়ার এবং এটা পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরের দিকে ৮-১৬ কিঃ মিৎ (৫-১০ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে প্রায় ৪ : ১ অনুপাতের আয়তনে রয়েছে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের অণু; আছে জলীয় বাষ্প কার্বনডাই অক্সাইড (CO<sub>2</sub>). এবং অন্যান্য কিছু গ্যাস ও ধূলিকণা। ধীনহাউসের কাঁচের ছাদের মত রাত্রিবেলা ভূপৃষ্ঠের তাপ রক্ষায় ক্ষমতার কাজ করে থাকে। এই স্তরটি পৃথিবী কর্তৃক রাত্রিবেলা বিকিরণকৃত সূর্যীর্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অভিক্রম করে যাওয়া প্রতিরোধ করে। এটাই হীন হাউস ইফেক্ট নামে পরিচিত।

বাযুমণ্ডলের পরের স্তরটি ট্রিপোক্ষেয়ারের উপরে ৭০ কিঃ মিৎ (৪৪ মাইল) বিস্তৃত। এ স্তরের নাম স্ট্রাটোক্ষেয়ার। এ স্তরে রয়েছে ওজোন অণুর (O<sub>3</sub>) একটি স্তর। এই ওজোন স্তর পৃথিবীর প্রায় ৩০ কিঃ মিৎ উপরে অবস্থান করে সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অভিবেগনী রশ্মি এবং রঞ্জন রশ্মি থেকে সকল জীবকে রক্ষা করে থাকে।

স্ট্রাটোক্ষেয়ারের প্রায় ৩২০ কিঃমিৎ (২০০ মাইল) উপর পর্যন্ত এ্যানোক্ষেয়ার নামে পরিচিত এক বিশেষ স্থূলাগু স্তর। এ্যানোক্ষেয়ার হ্রস্ব বেতার তরঙ্গ প্রতিক্ষেপণের মাধ্যমে দীর্ঘ দূরত্বের বেতার যোগাযোগে আমাদের সাহায্য করে থাকে।

বিজ্ঞানীগণ সম্প্রতি বাযুমণ্ডলের উপরে ম্যাগনেটোক্ষেয়ার নামে আরেকটি স্তর আবিষ্কার করেছেন যা চৌম্বকীয় প্রতিরক্ষা বর্ম হিসেবে কাজ করে। সূর্য থেকে নির্গত ইলেক্ট্রন ও প্রোটনকে এই স্তরে আটকানো হয়ে থাকে। এই চৌম্বকীয় প্রতিরক্ষা ছাড়া আমাদের এছের উপর এসে পড়া অজ্ঞাত বিকিরণের মাত্রা হত কয়েকগুণ বেশী, যা আজ আমরা জীবনের যে সকল রূপ বা আকার দেখতে পাই তার সবগুলোকেই ধ্রংস করে দিত। সূর্যের জ্যোতির্বলয় থেকে ইলেক্ট্রন ও প্রোটন আকারে পদার্থ ২০০০০০০ কেলভিন তাপমাত্রায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সৌরবড় যখন পৃথিবীর বাযুমণ্ডলের বহিঃস্থ এলাকায় এসে পৌছায়, তখন তার তাপমাত্রা থাকে প্রায় ১০০,০০০ কেলভিন। এভাবে ম্যাগনেটোক্ষেয়ার এ সকল উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত কণার এবং এদের বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। সূর্যের দিকে ম্যাগনেটোক্ষেয়ারের ব্যাণ্ডি প্রায় ৬৪ হাজার কিঃমিৎ (৪০ হাজার মাইল) এবং তা ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে সূর্যের বিপরীতে অন্তত ৬৫×১০৬ কিঃমিৎ (৪০ লক্ষ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত।

আসমান এবং বাযুমণ্ডল বহিঃস্থ আকাশমণ্ডলী সম্পর্কে যা কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হল তা মাত্র এই বর্তমান শতকেই আমাদের জ্ঞানের আওতায় । ১. এন্থুনি বিশ শতকে লেখা বিধায় বর্তমান শতক বলতে বিশ শতককেই বুঝানো হয়েছে- অনুবাদক।

আসে। প্রকৃতিতে পর্যবেক্ষণকৃত এ সকল প্রতিরক্ষামূলক ও উপকারী প্রতিক্রিয়াগুলো স্বীয় সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অপরিসীম কর্ণণার কথাই বলে। এগুলো ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারত না। এ সবই কী নিষ্কর দুর্ঘটনা, নাকি এগুলো পরম দয়াবান ও মেহেরবান আল্লাহর অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে?

আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং এভাবে তোমাদের জন্যে রিযিকের ব্যবস্থা করেন ফল-ফলাদি থেকে : সকল গাছপালারই তাদের পরিপূষ্টি, বৃক্ষসাধন, বংশবৃদ্ধি এবং বস্তুত তাদের অস্তিত্বের জন্যে পানি অত্যন্ত মৌলিক প্রয়োজনীয় উপাদান। উদ্ভিদ কোষের অভ্যন্তরে সকল বিপাকীয় প্রক্রিয়াই ঘটে একটা জলীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এর মাধ্যমেই মাটি থেকে বিভিন্ন খনিজ পৃষ্ঠি শোষিত হয়ে থাকে, আর প্রস্তুত খাদ্যবস্তুসমূহ পরিবাহিত হয়ে থাকে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। আয়াতটির অঙ্গ-অংশের তৎপর্য পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রকৃতিতে বিদ্যমান পানি চক্র এবং উদ্ভিদ কোষের কার্যক্রমে পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বুঝতে হবে। কেননা, এর ফলেই উৎপাদিত হয় উদ্ভিজ্জাত খাদ্যবস্তুসমূহ যেসবের কথা আলোচ্য আয়াতে 'ফল' আকারে মানুষের রিযিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিপূর্ণ ফল উৎপাদনে দ্বি প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে, তা কয়েকটি মজার ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। পৃথিবী, পৃষ্ঠে পিতিত বৃষ্টির পানির একটা অংশ র্মাটি চুইয়ে নিচে চলে যায় এবং ভৃগর্ভস্থ বিশাল পানি ভাস্তারের সাথে মিলিত হয়। আমাদের চারপাশে যে সকল গাছপালা আমরা দেখতে পাই, এদের অধিকাংশেরই রয়েছে জটিল পানি শোষণ ও পরিবহন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার শুরুটা হয় উদ্ভিদের শিকড়েই যেখানে লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং আরো অনেক আবশ্যিকীয় উপাদানসহ পানি আস্ত্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমের মাধ্যমে মাটি থেকে শোষিত হয়। এই শোষিত পানি ও অন্যান্য খনিজ উপাদানসমূহ সূক্ষ্ম পরিবাহীনলের একটি জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাণরস আকারে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌছে যায়। উদ্ভিদের দেহাত্যন্তরস্থ অতিরিক্ত পানি শেষ পর্যন্ত বায়ু প্রাতীয় অংশ থেকে এর আণুবীক্ষণিক রক্তপথে নির্গত হয়ে চারপাশের বায়ুতে গিয়ে মেশে। উদ্ভিদ কর্তৃক মাটি থেকে শোষিত পানির অণুসমূহ অংশত ব্যবহৃত হয় এমন এক প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরিতে যা আজ পর্যন্ত পরীক্ষাগারে দেখানো সম্ভব হয়নি। সালোকসংশ্লেষণ নামক এই সুনিপুণ প্রক্রিয়ায় চিনির অণুর সাথে সম্পত্তি সুষ্ঠ শক্তির সংশ্লেষণ ঘটে এবং এ আকারে তাদের মিলন হয় সাধারণত কাণ্ডে (যেমন ইকু), মূলে (যেমন গাজর), কল্পে (যেমন পেঁয়াজ) অথবা বীজে যেমন কলাই ও ভুট্টা। এদিকে আবার চিনি সংশ্লেষণ করে রাখার জন্য তৈরী করে শর্করা অণু।

উভয় পদার্থই বিভিন্ন রকম উদ্ভিজ্জ এনজাইম দ্বারা ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায় এবং অসংখ্য রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে। উদ্ভিদ আবার একই শক্তির উৎস তথা চিনিকে কাজে লাগিয়ে চর্বি এবং শত শত অন্যান্য দ্রব্যের সংশ্লেষণও ঘটায়, যা জমা করে রাখার উদ্দেশ্যে ফলের মধ্যে পাঠানো হয়।

উদ্ভিদ দেহাভ্যন্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের খাদ্য তথা আমিষের এই সংশ্লেষণও অংশত বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টি চলাকালে বিদ্যুতের চক্র বায়ুমণ্ডলীয় কিছু নাইট্রোজেনকে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করায়। এতে নাইট্রোজেনের যে সকল অক্সাইড উৎপন্ন হয় সেগুলো নাইট্রাস এবং নাইট্রিক এসিড আকারে বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে এসে মেশে। অতঃপর এগুলো মাটিত্ত্ব খনিজ পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রাইট ও নাইট্রোটে রূপান্তরিত হয়। এই সর্বশেষ প্রক্রিয়াটি আবার অংশত মাটিত্ত্ব অণু জীবের সহায়তায় সংঘটিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এক জাতের জীবাণুও শিশুগোত্তীয় উদ্ভিদের মূলে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন লাগাতে সক্ষম যা পরবর্তীতে মাটিকে নাইট্রোজেনীয় পৃষ্ঠি উপাদানে সমৃদ্ধ করে। উদ্ভিদ পানির সাথে এসব নাইট্রোজেনীয় উপাদান দ্রুত শোষণ করে নেয় এবং নতুন নতুন এমাইনো এসিড তৈরি করে যা উদ্ভিদ আমিষের পূর্ব উপাদান হিসেবে কাজ করে। ঘটনাক্রমেই, কুড়ি প্রকারের মত বিভিন্ন এমাইনো এসিডের বিভিন্ন রকম সংযুক্তি বা মিশ্রণের ফলে এ সকল আমিষের সংশ্লেষণ সম্পন্ন হয়। মজার ব্যাপার হলো যে, প্রাণীরা সাধারণ অজৈব নাইট্রোজেন যৌগ থেকে সরাসরি আমিষের সংশ্লেষণ করতে পারে না। বরং তারা তাদের আমিষ ভাস্তার গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদবিদ্যা মতে ফল মূলত ফুলের একটি গর্ভাধানকৃত ডিস্মাশয়, আর পরিভাষাটির সাধারণ সংজ্ঞায় সকল খাদ্যশস্য ও খোসাযুক্ত তোজ্য ডাল এর অন্তর্ভুক্ত।

মজুদুকৃত খাদ্যের প্রকৃতি এবং এর পৃষ্ঠি মূল্য অনুসারে ফলকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা : ১. শর্করাসমৃদ্ধ ফল যেমন : খাদ্য শস্য, খেজুর ইত্যাদি, ২. আমিষসমৃদ্ধ ফল যেমন : বাদাম, ডাল ইত্যাদি, এবং ৩. মেহসুসমৃদ্ধ ফল যেমন : আফ্রিকার তালের তৈল ইত্যাদি। কোন কোন ফলের মধ্যে উপরোক্ত তিনি শ্রেণীর খাদ্য ছাড়াও কিছু খনিজ পদার্থ এবং খাদ্য প্রাণ আছে যা আমাদের দেহের সুসামঝস্যপূর্ণ বৃক্ষি সাধন ও উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, মেহেরবান আল্লাহ অভ্যন্ত মেহেরবানী পূর্বক উপরে উদ্ভৃত দু'টি সংক্ষিপ্ত লাইনে তাঁর সুনিপুর্ণ ব্যবস্থাপনার দিকে মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। তিনি বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকা সৃষ্টি করে মানুষের রিয়িকের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি অন্যতম উরুত্তপূর্ণ একটি খাদ্যের আকারে তথা

চিন্তাকর্ষক রং, ক্ষুধা উদ্বেককারী সুস্থান, মিষ্টি স্বাদ ও আকৃতিবিশিষ্ট নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফলফলাদির মাধ্যমে তিনি মানুষের রিয়িকের ব্যবস্থা করেছেন।

মানুষ কী তবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে না!

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَالْأَنْزَلَ الَّتِي رَوَدُهَا النَّاسُ وَالْجِنَّةُ إِذْ أُعْدَتْ  
لِكَفَّارِنَّ

২ : ২৪ যদি তোমরা আনয়ন না কর, এবং কখনই করতে পারবে না, তবে  
সেই আণনকে তয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার ইঙ্গন, সত্য  
প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।

(জাহানামের) আণন যার জ্ঞালানি হবে মানুষ ও পাথর

জ্ঞালানি এমন এক বস্তু যা তাপশক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। দহনের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তি মুক্ত করা কিংবা পরমাণু বিভাজন অথবা একীভবনের দ্বারা আণবিক শক্তি মুক্ত করার মাধ্যমে তাপশক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে। আমাদের জ্ঞানের আওতাধীন যে পাথর তা শুধু দহন অযোগ্যই নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পাথরকে দহন নেভানোর কাজে লাগানো যেতে পারে। কাজেই, যে সকল পাথর জ্ঞালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেগুলোকে অবশ্যই এমন ধরনের হতে হবে যা উচ্চ তাপমাত্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে এর গঠন উপাদানগুলো আলাদা হয়ে যাবে। এভাবে মুক্ত উপাদান বা উপাদানগুলো তখন তাপ উৎপাদক রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে পরিবেশগত বস্তুর সাথে। আর এভাবেই, চুল্লির তাপমাত্রা বজায় থাকে। ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্য আমরা ক্যালসাইট নামে (অর্থাৎ মার্বেল কিংবা চুনাপাথর) একটা সাদামাটা পাথর বিবেচনায় আনতে পারি। এটি প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের একটা প্রাকৃতিক রূপ। অবাধে উন্নত করলে এটি ৫৫০ সেঃ প্রেঃ তাপমাত্রায় বিশিষ্ট হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বনডাই অক্সাইডে পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম অক্সাইড ২৫৭০ সেঃ প্রেঃ তাপে গলে যায় এবং আরো উচ্চ তাপমাত্রায় একে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ফুটানো যায়। এর গঠন-উপাদান ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেন পেতে হলে একে এমনকি আরো উচ্চ তাপমাত্রায় বিশ্বিষ্ট করতে হবে। এভাবে বেরিয়ে আসা ক্যালসিয়াম নিষ্পত্তির তাপমাত্রায় অক্সিজেনের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারে, কিংবা অন্যান্য পদার্থের সাথে মিলিত হয়ে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। আর এভাবেই ক্যালসিয়াম পরিবেশের তাপমাত্রা বজায় রাখে কিংবা বৃদ্ধি করে। চুনাপাথর বা মার্বেল হচ্ছে পাথরের সরল দৃষ্টান্ত। আরো অনেক জটিল

গঠন-প্রকৃতি ও কাঠামোর পাথরও রয়েছে যেগুলো মার্বেলকে জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে যে তাপমাত্রা প্রয়োগের প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক বেশী উচ্চ তাপে তাদের গঠন-উপাদানে বিভক্ত হয়। কাজেই, এটা স্পষ্ট উপরোক্ত আয়াতে জাহানামের জ্বালানি হিসেবে পাথরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, কাফেররা যেন সচেতন হতে পারে তাদের শাস্তির জন্য দোজখের আগনের তাপমাত্রা হবে চরম উচ্চ। একইভাবে ঐ উচ্চ তাপমাত্রায় মানবদেহ ভস্মীভূত হবে এবং জ্বালানির কাজও করবে।

٢٨- كُفَّافَ لَكُلُّهُوْنَ بِاللَّهِ وَكُلُّمُ امْرَأٍ فَلَعْيَا لَهُ تَرْبِيعُكُلُّمُ شَرْجِيْكُلُّمُ  
لَمَّا إِنَّهُ تَرْجَعُنَ

২ : ২৮ তোমরা কীরুপে আল্লাহকে অঙ্গীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে আণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন। পরিণামে তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।

আয়াতটি বুঝার জন্য প্রথমে মানবজীবন সৃষ্টি এবং এর মধ্যে নিহিত প্রজন্ম সৃষ্টি ব্যবস্থার কৌশল ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, এ্যামিবার মত সরল এককোষ বিশিষ্ট জীব থেকে বিবর্তন ধারার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম মানবের আগমন ঘটে। অণু-পরমাণু থেকে পৃথিবীতে প্রথম মানবের আগমনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খোজা যেতে পারে। জীববিজ্ঞানীগণের অঙ্গ বিশ্বাস মতে, জীবনের সবচেয়ে সুবিধাজনক সংজ্ঞা হলো এই যে, এটি এমন একটা শুর যেখানে কোন কিছুর উদ্ধৃত ঘটে এবং তা নিজ থেকে অনুরূপ কোন কাঠামো তৈরী করতে সক্ষম। আমাদের আজকের জানা মতে, অণু তরে জীবনের যাত্রা শুরু হয় ডিএনএ (ডিঅ্যারাইডনিউড্রিইক' এসিড) নামক একটি অত্যন্ত জটিল অণু এবং এনজাইমের সম্প্রসারিত রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ডিএনএ-ই জীবনের মূল প্রেরণাবৃত্তি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ভৃত করে। এনজাইমটি একটি অণুঘটক হিসেবে কাজ করে। কাজেই, ডিএনএ এবং এর রাসায়নিক ক্রিয়া অণুঘটক এনজাইমটির সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা গেলে জীবনের উৎপত্তিরও ব্যাখ্যাদান সম্ভব।

অত্র আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে এই সত্যের মধ্যে যে, জনের আগে মানুষের কোন দৈহিক অস্তিত্ব নেই। পিতামাতা উভয়ের ডিএনএ-সম্প্রসারিত গর্ভাধানকৃত ডিওগুই মানুষের সর্ব প্রাথমিক অস্তিত্ব। পিতামাতার শুকাণ

ও ডিস্কু পুষ্টি থেকে প্রাণ অণু ও পরমাণু সমৰয়ে গঠিত। সব খাদ্যই আবার পাওয়া যায় শাকসজি ও প্রাণীজগৎ থেকে। আমিষ, স্রেহ, শর্করা এবং খাদ্য প্রাণসহ সকল খাদ্য উপাদানই হচ্ছে পৃথিবী এবং এর পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান অজেব ধাতু ও অণু থেকে প্রাণ জৈব যোগ। প্রাণীদেহের ব্যবহারের জন্য উত্তিদ কর্তৃক ধাতব কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, লোহা, ম্যাঞ্চানিজ, কোবাল্ট ইত্যাদিকে জৈব কিংবা জৈবধাতবীয় অণুর আকারে রূপান্তরের কৌশল একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং খোদায়ী মেহেরবাণীরই বহিঃপ্রকাশ বটে। কাজেই, দেখা যাচ্ছে যে, মানবদেহের গঠন-উপাদান যে সকল অণু ও পরমাণু, তারা অজেব ধাতু হিসেবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এগুলোই উত্তিদ কর্তৃক একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় জৈব আকার লাভ করে। পিতামাতা যে খাদ্য প্রাণ করে তা থেকেই উৎপন্ন হয় শুক্রাণু ও ডিস্কু, আর একটা জুণ পূর্ণত্ব প্রাণ শিশুতে পরিণত হয় তার মাতা কর্তৃক গৃহীত পুষ্টির দ্বারা। কাজেই, (প্রমাণিত হয় যে) সকল মানুষ জন্মের আগে ছিল প্রাণহীন আল-কুরআনের এ বক্তব্য সঠিক। কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, একবার যদি ডিএনএ-র অস্তিত্ব কোথাও পাওয়া যায়, তাহলে সেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই জীবনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু, কেউ কেউ যেমন বিশ্বাস করেন, প্রকৃতি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিএনএ-র উদ্ভব হওয়া কি সম্ভব? ডিএনএ অণুর গঠন অত্যন্ত জটিল অথচ সংগঠিত। তাপীয় গতির দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী যে কোন অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার কারণে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। যখনই কোন ব্যাপারের পশ্চাতে উদ্দেশ্য সম্বলিত পরিকল্পনা থাকে, তখনি সেখানে শৃংখলা কাজ করে। কাজেই, যে আকারে ডিএনএ-কে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই আকারে এর অস্তিত্বে আগমন শুধুমাত্র আল্লাহর করুণাতেই সম্ভব হয়েছে। তথাকথিত টেস্ট টিউব শিশু আসলে পিতা ও মাতার নিকট থেকে টেস্ট টিউবে সংগৃহীত যথাক্রমে শুক্রাণু ও পরিপক্ষ ডিস্কুর টেস্ট টিউবেই গর্ভাধানের ফল ছাড়া আর কিছু নয়। মাত্গর্ভের বাইরে এ ধরনের গর্ভাধান সামুদ্রিক জীবের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবেই বিদ্যমান। যদি গর্ভাধানকৃত মানব ডিস্কুটি সাফল্যের সাথে মাত্গর্ভে স্থাপন করা যায়, তখন গর্ভাধারণ সফল হতে পারে। কাজেই, টেস্ট টিউব শিশুর মধ্যকার প্রাণ বিজ্ঞানীগণের সৃষ্টি নয়।

পৃথিবীতে প্রথম জীবন কণিকার উদ্ভব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মিল লক্ষণীয়। অবশ্য বহু জিজ্ঞাসা আছে যা বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এটা সত্য যে, পরমাণু ও অণুই জীব ও জড় উভয় বস্তুর গঠন-কাঠামোর সর্বশেষ বা চূড়ান্ত উপাদান। কিন্তু একটি জীবে কীভাবে পরমাণুর সম্মিলন জীবনের স্পন্দন আনে তা ব্যাখ্যা করা

সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে যে সকল পরমাণু ও অণু রয়েছে তার সরগুলোকে যদি বিজ্ঞানীরা একটা পাত্রে জড়ো করে তাতেই কোন জীবন সৃষ্টি হবে তা নয়। আমরা জানি না, কোথা থেকে আসে জীবনের এই স্ফূলিঙ্গ। মানুষ বস্তু ও চেতনার সংশ্লিষ্ট। বিজ্ঞান শুধু জীবনের বস্তুগত দিকটারই ব্যাখ্যা দিতে পারে। বিজ্ঞানের বর্তমান প্রগতির এটাই একটা সীমাবদ্ধতা যে, তা সবকিছুকে বস্তুগত দৃষ্টিকোণেই ব্যাখ্যা করে থাকে। মানবীয় গুণাবলী তথ্য চেতনা, বিবেক, ভালবাসা, মেহ ও আবেগ ইত্যাদি বিবেচনায় না আনলে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হয় না। বিজ্ঞান জীবনের এ সকল মৌলিক গুণাবলির ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়।

কাজেই, বিশ্বাস করা কঠিন নয় যে গর্ভাধানের আগে মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না, বরং সে ছিল প্রাণহীন অজৈব পরমাণু ও অণু মাত্র। অনুরূপভাবে, মানুষ মৃত্যুবরণ করলে পুনরায় যে মৌল উপাদানে পরিণত হয় তা তার আগে আগ্নে ভূষণ করা হোক, কিংবা করবে জীবাণুতে খেয়ে ফেলুক, আর বন্য প্রাণী ও পার্যী কিংবা মাছের পেটেই যাক এই একই মৌল বস্তু-উপাদানসমূহ পুনরায় চক্রাকারে অন্য কোন জীবজন্ম কিংবা মানুষ তৈরি করতে পারে।

١٩- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا وَهُوَ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ  
فَوِهْنَ سَبِّحْ سَمْبُوتْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

২ : ২৯      তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মন সংযোগ করেন এবং তাকে সঙ্গাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সব বিশ্বে সবিশেষ অবহিত।

আয়াতটির প্রথমাংশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে। কারণ, এটি সাধারণভাবে মানব জাতির নিকট এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের নিকট বিরাট তাৎপর্যবহ। প্রথমত এই আয়াত মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার বিশেষ ভূমিকার কথা বুঝাচ্ছে যার জন্যে আল্লাহ পৃথিবীতে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, এ আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তার সবই মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে, এ সকল জিনিসের কোন কিছুই খামাখা বা বৃথা মানুষের কোন উপকার ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়নি। তৃতীয়ত যেহেতু আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহই সবকিছু পৃথিবীতে মানুষের জন্য সৃষ্টি

କରେଛେ, ମାନୁଷେର ଉଚିତ ଏସବ କିଛୁ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି ସୁଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତାର ସାଥେ ବ୍ୟବହାର କରା । ଏଭାବେ ବ୍ୟବହାରେର ଜନ୍ୟ ମାନୁଷକେ ଏସବ ସମ୍ପର୍କେ ନିୟମତାତ୍ତ୍ଵିକ ଜାନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜନୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରୟୁକ୍ଷିଗତ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରାତେ ହବେ ।

ଆଯାତଟି ମାନୁଷକେ ଦାନ କରେଛେ ଏକ ବିଶେଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, କୁରାନେର ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାକେ ଆଲ୍ଲାହର ଖଲିଫାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରା ହୁଯେଛେ । ମାନୁଷକେ ଆଲ୍ଲାହର ଖଲିଫା ବା ପ୍ରତିନିଧି ହିସେବେ କାଜ କରାତେ ହଲେ ସମସ୍ତ କିଛୁ ତାର ସେବାଯ ଓ କର୍ତ୍ତ୍ବେ ଥାକାତେ ହବେ । ବିଭିନ୍ନ ରଂ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଵାଦ ଓ ଚେହାରା ଏବଂ ଆକୃତି-ପ୍ରକୃତି ସହ ନାନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସମ୍ବଲିତ ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ବସ୍ତୁର ସଥାଯଥ ବ୍ୟବହାରେର ମାଧ୍ୟମେ ତାର ଦୈହିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଆତ୍ମିକ ପରିତ୍ରଣୀଳ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହତେ ହବେ ।

ଅତ୍ର ଆଯାତଟି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ଯୁଲୋଜିକାଲ୍ ପରିଯୋଗିତା ରହେଛେ ମାନୁଷେର ନିକଟ । ଘଟନାକ୍ରମେ ଆଧୁନିକ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ୟାଛେନ ଯେ, ଆମାଦେର ଚାରପାଶେ ଯା କିଛୁ ଆଛେ ତାର ସବହି ଦରକାରି ଯାତେ ଆମରା ପ୍ରକୃତିର ଏକତାନେର ସାଥେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରେଖେ ବାସ କରାତେ ପାରି । ପୃଥିବୀତେ ଅନ୍ତିତ୍ତମାନ ସବ କିଛୁଇ ଯେ ମାନୁଷେର କୋନ କୋନ କାଜେ ଲାଗେ ଏଇ ସତ୍ୟଟା ଆଜ ଅଧିକ ହାରେ ସକଳେଇ ଅନୁଧାବନ କରାହେ ଏବଂ ଏଟାକେ ସ୍ଵପ୍ରଶଂସ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଦେଖାନ୍ତରେ । ଆଯାତଟିର ଏହି ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର କୁରାନେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଯାତ ଥେକେ କିଛୁ ବାଢ଼ିତି ସମର୍ଥନ ପାଇ ଯେଥାନେ ଆଲ୍ଲାହ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଘୋଷଣା କରେନ : କୋନ କିଛୁଇ ଅବଧା ସୃଷ୍ଟି କରା ହୁଯନି (ଆଯାତ ୩ : ୧୯୧) । ଏହି ଘୋଷଣାଟି ଅନୁଧାବନେର ଜନ୍ୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମରା ଅନେକଟିଲୋ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଉତ୍ସ୍ରୋଷ କରାବ । ଆପାତତ ଏତାକୁ ବଲେ ରାଧାଇ ଯଥେଷ୍ଟ ହବେ ଯେ, ଯଦିଓ ପୋକାମାକଡ୍ଟ୍, ପଞ୍ଚି, ସରୀସୃପ, ଶନ୍ୟପାରୀ, ସର୍ପ ଇତ୍ୟାଦିର ଅନେକ ଜାତି ଦୃଶ୍ୟତ ଅପ୍ରୋଜନୀୟ ମନେ ହୁଯ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟୁକ୍ଷିତ କ୍ରମବର୍ଧମାନ ଜାନେର ସାହାଯ୍ୟେ ଆମରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଦେର ଅନେକଟିଲୋର ଉପଯୋଗିତା ଥୁଜେ ପାଇଁ । ଆମାଦେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନଭାଗର ସକଳ କୁନ୍ଦ୍ର-ବୃଂଖ ଜୀବ-ଜୀବାଗୁର ଉପଯୋଗିତା ବୁଝାର ଜନ୍ୟ ଏକେବାରେଇ ଅପ୍ରତ୍ୱୁଳ ।

ଆଲୋଚ୍ୟ ଆଯାତଟି ମୁସଲିମ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ୟ ଜ୍ଞାନକ୍ଷର୍ତ୍ତୁ ଉଲ୍ଲୋଚନକାରୀ ହିସେବେ ବିବେଚନା କରା ଉଚିତ । କାରଣ, ଏଟି ମେଇ ଉତ୍ସାହ ଯାଦେର ଅଧିକାରେ ରହେଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁସଲିମ ଉତ୍ସାହ ଯଦି ସେନ୍ଟଲୋର ଉପର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଅବ୍ୟାହତ ରାଖେ, ତାହଲେ ଆଲ୍ଲାହ ପୃଥିବୀତେ ଯେ ସକଳ ଜିନିସ ମାନୁଷେର ଜନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ସେନ୍ଟଲୋ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାରେ ଏକ ସୁଧୀ, ସମୃଦ୍ଧିଶାଲୀ ଓ କୃତଜ୍ଞ ଜୀବନ ଏବଂ ତାରା ଅନୁଭବ କରାତେ ପାରବେ ଯେ, ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ଖଲିଫା । ଏଭାବେ ବୋକା ଯାଛେ ଯେ, ଅତ୍ର ଆଯାତ

একজন মুসলমানের জন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাকে অবশ্য করণীয় কর্তব্য করেছেন যাতে সে মানুষের জন্যে আল্লাহ'র সৃষ্টি থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা তুলে নিতে পারে।

অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সঙ্গ আসমানে শৃংখলা এবং পূর্ণতা দান করলেন : আয়াতটির এ অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আসমান সৃষ্টির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন। আগে ধারণা করা হত যে, আসমান একটি কঠিন গোলাকার গুরুজ যা পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে রূলে আছে আর এই গুরুজেই সেঁটে দেয়া হয়েছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সহ অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুসমূহ। কিন্তু কঠিন পদাৰ্থ দ্বারা গঠিত গুরুজের এই ধারণাটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ও সমর্থিত হয়নি। মহাজাগতিক বস্তুসমূহ কোন গুরুজে সঁটানো কিছু নয়, বরং সেগুলো মহাকাশে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে (আয়াত ২১ : ৩৬; ৩৬ : ৪০)। কাজেই, এখানে আসমান সৃষ্টির অর্থ মহাজাগতিক বস্তু সহলিত মহাকাশ ক্ষেত্রের সৃষ্টি অর্থাৎ এই বিশ্বজগত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ মহাকাশকে সাতটি বিশাল অঞ্চলে ভাগ করতে প্রয়াস পেয়েছেন।<sup>১</sup> সেগুলো নিম্নরূপ :

প্রথম অঞ্চলে রয়েছে সূর্য ও পৃথিবী পরিবারের গ্রহসমূহ যথা—বৃুধ, শুক্র ও পৃথিবী। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৮ আলোক মিনিট।

দ্বিতীয় অঞ্চলে রয়েছে সৌরজগৎ, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের বহিঃস্থ গ্রহসমূহ মঙ্গল, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষিগুল, শনি, ইউরেনোস এবং পুটো। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৫ আলোক ঘণ্টা।

তৃতীয় অঞ্চলে রয়েছে সূর্যের গোটাবিশেক প্রতিবেশী। এই গোলকাকৃতি অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ২০ আলোক বর্ষ।

চতুর্থ অঞ্চলে রয়েছে ছায়াপথ, নক্ষত্রমণ্ডলী। আগে এটাকে সমগ্র বিশ্বজগৎ বলে মনে করা হত। কিন্তু এ পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটির মত ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির সংক্ষান পাওয়া গেছে। আমাদের ছায়াপথটি মাধ্যাকর্যণ দ্বারা বন্ধনযুক্ত প্রায় ১০ হাজার কোটি ঘূর্ণায়মান তারকার এক সমাবেশ বিশেষ। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৫০ হাজার আলোকবর্ষ।

পঞ্চম অঞ্চলে রয়েছে ২০টির মত হালকা, টিলে-ঢালা গোছের বন্ধনযুক্ত একগুচ্ছ প্রতিবেশী গ্যালাক্সি। এটি একটি স্থানীয় ছায়াপথ গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ২০ লাখ আলোকবর্ষ।

ষষ্ঠ অঞ্চলে রয়েছে এক গুচ্ছ স্থানীয় ছায়াপথ গোষ্ঠী। এটি স্থানীয় সুপার ক্লাস্টার যা বৃহৎ গুচ্ছ নামে পরিচিত। এটাই হচ্ছে বৃহত্তম মহাজাগতিক সৃষ্টিকর্ম।

বৃহৎ গুচ্ছগুলোর মধ্যবর্তী বিশালায়তনের স্থানে আপেক্ষিকভাবে শূন্য স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ সাড়ে সাত কোটি আলোকবর্ষ।

সপ্তম অঞ্চল জুড়ে যা রয়েছে তাই আমাদের জ্ঞাত বিশ্বজগৎ। ছায়াপথের সকল বৃহৎ গুচ্ছই এর অঙ্গবৰ্তুক। এর ভিতর আরো রয়েছে কোয়াসার তথা ছায়াপথ বহিঃস্থ বিকিরণ উৎসসমূহ যা সমস্ত মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক কৌতৃহল উদ্বীপক। দুই হাজার কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিশাল দূরত্ব জুড়ে এরা ছড়িয়ে আছে।

এই সপ্তম অঞ্চলটি মহাবিশ্বের সাথে রহস্যজনকভাবে যুক্ত বলে অনুমিত হয়। মহাজাগতিক বস্তুগুলোকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা : ১. তারকারাজি, ২. গ্রহ-নক্ষত্র, ৩. উপগ্রহসমূহ, ৪. ধূমকেতুসমূহ, ৫. নীহারিকামণ্ডলী, ৬. ছায়াপথ, ৭. কোয়াসার।

তারকারা আবার সাত ধরনের, যেমন : ১. বাদামী বামন তারকা, ২. প্রধান অনুবর্তী তারকা, ৩. প্রকাও হরিৎ তারকা, ৪. কল্পমান বা মিটিমিটি তারকা, ৫. শ্বেত বামন তারকা, ৬. নিউট্রন তারকা, এবং ৭. কৃষ্ণ গহ্বরসমূহ।

মহাবিশ্ব সমঘনত্ব বিশিষ্ট নয়, যা অবিরাম সৃষ্টি মতবাদের জন্য দরকার। দেখা যায় সূর্য, বৃথা, শুক্র ও পৃথিবী সমবর্যে প্রথম অঞ্চলের ঘনত্ব ১.৪ গ্রাম/সিসি। অর্থাৎ, নিউট্রন তারকা, কৃষ্ণ গহ্বর ইত্যাদি সমবর্যে গঠিত চতুর্থ স্তরের ঘনত্ব ১০১৪ গ্রাম/সিসি-র চেয়েও বেশী। কাজেই, ঘনত্বের দিক দিয়ে অঞ্চলগুলোর কিছু কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ডঃ মরিস বুকাইলিও সপ্ত আসমানকে ব্যাখ্যা করেছেন এন্টে বলে, “সাত নব্বর মানে বহুত্ব ছাড়া আর কিছু না; কাজেই বহু আসমান আর বহু পৃথিবী রয়েছে। আমাদের পৃথিবীর মত মহাবিশ্বে আরো পৃথিবী পাওয়া যেতে পারে। এ এমন এক সত্য যা আমাদের সময়ে মানুষ কর্তৃক যাচাই করা হয়নি।”

মিশ্রীয় পণ্ডিত শেখ মোহাম্মদ আবদুহুস্তানি আকাশমণ্ডলী এবং এর বিশ্যয়কর গঠন কাঠামোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাধারণ মাধ্যাকর্ণণ সূত্রের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি বলেন, “আকাশমণ্ডলী হচ্ছে আপনার মাথার উপরিস্থিত যা কিছু আছে তাই ; আসমান যা আকাশমণ্ডলী শব্দটি প্রবণ করে আপনি ভাববেন মহাকাশের কথা যেখানে আছে সূর্য, চন্দ্র এবং আপন আপন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান গ্রহ নক্ষত্রাজি। এটাই সেই আসমান যা আল্লাহ নির্মাণ করেছেন অর্থাৎ উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন এবং তিনিই প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রকে বলতে গেলে এক একটি ইঁটের মত করে বানিয়েছেন যা আপনারা আপনাদেরই চারপাশের ছাদ, গম্বুজ, কিংবা দেয়ালে দেখতে পান আর তিনিই প্রতিটি গ্রহকে তার প্রতিবেশীর (দের) সাথে

সাধারণ মহাকর্ষ বলের দ্বারা বেঁধে দিয়েছেন ঠিক যেমন কোন ইমারতের প্রত্যেকটি অংশকে কিছু দ্রব্য স্থাপনের মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে আটকানো হয়ে থাকে।”

কিছু কিছু ব্যাখ্যাকারী ‘সাত’ সংখ্যাটিকে ‘বহু’ হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেক্ষেত্রে আয়াতটির অর্থ দাড়ায়। “তিনি বহু আসমান (অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী) সৃষ্টি করেছেন।” একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আমরা লক্ষ্য করি যে, সম্বত মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবীর মত বহু বিশ্বই রয়েছে। এ ধরনের প্রতিটি বিশ্বেরই উপরে একটি করে আকাশ থাকবে। কাজেই, অনেক আকাশ রয়েছে এ কথা বলা যায়। অন্য কোন বিশ্ব তথা জীবের অস্তিত্বসম্পন্ন কোন গ্রহের, আমাদের গ্যালাক্সির অন্য কোন তারকার, ছায়াপথের আকাশেও সেই একই তারকামণ্ডলী থাকতে পারে, যা আমরা আমাদের আকাশে দেখতে পাই। কিন্তু ভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে নক্ষত্রগুলি আলাদা হবে। এ কারণে, এ ধরনের জগতের আকাশ দেখতে ভিন্ন রকম হবে। মহান আল্লাহ এক ব্যাপক ও পূর্ণঙ্গ মহাপরিকল্পনার অধীনে সকল আসমানকেই মহাজাগতিক বস্তু, তারকা, নক্ষত্র, উপগ্রহ, ধ্যকেতু, প্রহাণপুঁজ, ছায়াপথ এবং কোয়াসার দিয়ে সম্পূর্ণতা দান করেছেন।

আমাদের বৌধগম্যতার মধ্যে মহাজাগতিক বস্তুসমূহের উৎপত্তি পরিশিষ্ট-১ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

### তথ্য সূত্র :

1. National Geographic, June, 1983.
2. Appendix II
3. Maurice Bucaille : The Bible, The Quran and Science, North America Trust Publications, USA, 1978.
4. El-Kirdany A. A. S. The Glimpses of the Scientific Unattainable Marvels of the Quran, Cairo Edition p. 19. 1977.

وَظَلَّنَا عَلَيْهِمُ الْفَسَادُ وَأَنْزَلَنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالْتَّلُوِيُّ كُلُّ مِنْ طَبَقَتْ  
مَارِزَقْنَاهُ وَمَا ظَلَّنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفَسَهُمْ يَطْلُبُونَ ۝

২ : ৫৭ আধি বেষ্ট ধারা তোমাদের উপর ছাড়া বিস্তার করলাম; তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্গুয়া থেরণ করলাম। বলেছিলাম, ‘তোমাদেরকে তাল যা জ্বান করেছি তা হতে আহার কর।’ তারা আমার প্রতি কোন জ্বলুম করে নি, বরং তারা তাদের প্রতিই জ্বলুম করেছিল।

**মান্না ও সাল্গুয়া :** পবিত্র কুরআনের তিন জায়গায় (আয়াত ২ : ৫৭; ৭ : ১৬০; ২০ : ৪০-৪১) মান্না ও সাল্গুয়ার উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ‘আন্যানলা’ কিংবা ‘নায্যালুনা’ শব্দের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, হ্যরত মুসা (আ)-এর নির্দেশনায় বিশুঙ্খ ঘরভূমিতে ইসরাইলীদের দীর্ঘ সফরকালে তাদেরকে খোদায়ীভাবে এ সকল (খাদ্য) দ্রব্য সরবরাহ করা হয়েছিল। অধিকতর, অন্ত আয়াতে ইসরাইলীদেরকে প্রদত্ত উভয় খাদ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এ দু'টি পুষ্টি উপাদানের উৎস সম্পর্কে আর কোন বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়নি। নিম্নোক্ত আলোচনায় এ দু'টি খাদ্যকে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

**মান্না :** প্রতীয়মান হয় যে, মান্না শব্দটি হিন্দু শব্দ। মান-হু কিংবা আরবী শব্দ মান-হয়া (অর্থ : এটা কী ?) থেকে নেয়া হয়েছে, যা অনুমিত হয় যে, ইসরাইলীরা কোন কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে মাটির উপর দেখলে পরম্পরাকে এভাবে বলত। পরবর্তীকালে, মান্না শব্দটি প্রতীকী গুরুত্ব পায় এবং মরু এলাকায় খাদ্যাভাব চলাকালে আগাত অলৌকিকভাবে উৎপাদিত কোন খাদ্যের ব্যাপারে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এ নামে পরিচিত হত, বিশেষত ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে আজও এগুলো মিষ্টান্ন প্রস্তুতে কিংবা রেচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানকালে এ নামটি নিম্নোক্ত কোন একটি উপকরণের ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে :

ক. ভোজ্য শৈবাল কিংবা পুস্পল ছত্রাকের মত পুরো জীবদেহ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে শৈবাল ও ছত্রাকের সমন্বয়ে গঠিত যা তারা পারম্পরিক উপকারের স্বাধৈর্যে করে থাকে।

খ. গুল্ম কিংবা বৃক্ষ থেকে নিঃস্তু এক প্রকার রস যা নিম্নোক্ত কোনভাবে তৈরি হয়ে থাকে।

- ১) সরাসরি মানুষের তৈরি ক্ষত থারা; যেমনটি করা হয়ে থাকে মানু এ্যাশ নামক (ফ্র্যান্ডলাস ওরনাস) এক প্রকার মরু বৃক্ষের ছাল ছিদ্র করে বানিজ্যিকভাবে রস সংগ্রহকালৈ; কিংবা
- ২) অপ্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ প্রাণরস হিসেবে, যা ছিটপোকা কিংবা কোকিড নামীয় এক প্রকার গোলাকৃতি জীবাণুর বিষ্ঠা হিসেবে পাওয়া যায়; এই পোকাগুলো উদ্ভিদরস খেয়ে বেঁচে থাকে; অথবা
- ৩) বৃক্ষের লাক্ষিক ক্ষরণ বা নিঃসরণ যা কীটপতঙ্গ কর্তৃক বৃক্ষদেহে ছিদ্র সৃষ্টির দ্বারা ঘটে থাকে।

প্রথমটি বাদে অন্যান্য নিঃসৃত পদার্থগুলো পাওয়া যায় ট্যামারিক বৃক্ষের বিভিন্ন জাত থেকে। কাজেই মানু শব্দটি নানা দ্রব্যের ব্যাপারেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ইসরাইলীদের মানুর পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এমন পদার্থে যা নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ করে :

১. এটাকে অবশ্যই হতে হবে এমন এক দ্রব্য যা সিনাই এবং এর আশেপাশে পাওয়া যায়। কেননা পরিত্র কুরআনের তাফসীরকারকগণ অত্র অঞ্চলকে দীর্ঘ দিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো ইহুদিদের দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। অথবা এটাকে হতে হবে এমন বস্তু যাকে সিনাই উপনিষদের আশপাশ হতে প্রবল বাতাস বয়ে নিয়ে এসে অত্র অঞ্চলে ফেলে দিয়েছে;

২. বস্তুটির পৃষ্ঠাগুণ থাকতে হবে; এবং

৩. সিনাই উপনিষদের মরু অঞ্চলে এ সকল ঘটনা চলাকালে বিপুল সংখ্যক ইসরাইলীর স্কুধা নিবারণ করতে সক্ষম এমন বিপুল পরিমাণে এটি উৎপন্ন হতে হবে। কিছু কিছু বাইবেল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের মতে, প্রায় বিশ লাখ ইহুদি সেখানে ছিল। তবে, কুরআনে এ ধরনের কোন তথ্য দেয়া হয়নি।

শৈবাল তত্ত্ব ৪ জানা যায়, রাত্রিবেলা যখন প্রচুর শিশিরপাত হয় এবং মাটি ভেজা থাকে, তখন ক্ষুদ্র নাশপাতি আকৃতির কোষ আকারে নষ্টক নামীয় এক ধরণের নরম ও আঠোলো শৈবাল অবিষ্঵াস্য রকম দ্রুত বাড়ে। এই শৈবাল নরম ও আঠোলো হওয়ায় পরদিন সকালে সূর্যতাপে শিশির উবে গেলে এবং মাটি শুকিয়ে গেলে এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরদিন রাত্রিবেলা আবার এদেরকে দেখা যায়। এ সকল জীবের এ ধরণের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাইবেল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ মানু শনাঞ্জ করতে শৈবাল তত্ত্ব প্রয়োগ করেন যা তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, মানু রাতে মাটি ভোজা থাকাকালে বেড়ে ওঠে কিন্তু সূর্যতাপ এর উপর পতিত হলে শুকিয়ে যায় ও ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ ছড়ায় (নিক্রমণ ১৬ :

୧୩-୨୧) । ନଟକଗୁଛେ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ହିସେବେ ରହେଛେ ପ୍ରଚୂର ତେଲ । ସମ୍ପ୍ରତି ଗବେଷଣାଯ ଦେଖାନୋ ହୟ ଯେ, ନଟକ ବାୟୁମ୍ବଲେର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନିଜ ଦେହେ ଆଟକାତେ ପାରେ । ଏଭାବେ ଏହି ଏକଟି ନାଇଟ୍ରୋଜେନସମ୍ବନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ସେ ପରିଣତ ହୟ ଏବଂ କିଛୁ ପୃଷ୍ଠିଗୁ ସୃଷ୍ଟି କରତେ ପାରେ । ଏହି ମର୍ମେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୟ ଯେ, ୧୮୫୫<sup>୩</sup> ସାଲେ ଭାରତେର ମୁଖୀୟ ରାଜ୍ୟ କର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଗମାଇଲ ଏଲାକା ଜୁଡ଼େ ଏକ ଜାତେର ନଟକ (ଏନ, କଲିନାମ) ଜନ୍ମେଛେ । ଅସମ୍ବ ନଯ ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏଟା ଆସମାନ ଥେକେ ପତିତ ହେଯେଛେ ବଲେ ମନେ କରେଛି । ଶୈବାଳ ଗୁଛେର ଏହି ବିଳାଯମାନ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସିନାଇ ଉପଦ୍ଵୀପେର ମତ ପ୍ରଧାନତ ବିଶ୍ଵକ ଏବଂ ଅନୁପଯୋଗୀ ପରିବେଶେ ଏଦେର ଶୁବ୍ର ବେଳୀ ପରିମାଣେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅସଞ୍ଜାବ୍ୟତାଟାଇ ବନୀ ଇସରାଇଲେର ଖାଦ୍ୟ ମାନ୍ଦା ହିସେବେ ନଟକକେ ଏକଟି ଦୂର୍ବଲ ଯୁକ୍ତି ହିସେବେ ପ୍ରମାଣ କରେ ।

ପୁଷ୍ପଲ ଛାକ ୫ ନାମଟି ଦାରୀ ବୁଝାନୋ ହଛେ ଛାକ ଓ ଶୈବାଲେର ପାରମ୍ପରିକ ଉପକାରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତୟେ ଏକତ୍ର ବାସ । ଚଚରାଚର ଏଦେରକେ ଗାଛ, ଶିଳା କିଂବା ପାଥରେର ଉପର ଆବରଣ ବା ପାତାର ଆକାରେ କିଂବା ଅଧିକ ଶାଖାବିଶିଷ୍ଟ ହାଲକା ସବୁଜ ଥେକେ ଧୂର ବର୍ଣ୍ଣର କାଠାମୋ ଆକାରେ ଦେଖା ଯାଯ । ଲୋକାନ୍ତରା ଗୋତ୍ରୀୟ କର୍ଯ୍ୟକୁ ରକମ ପୁଷ୍ପଲ ଛାକ ପଚିମ ଏଶ୍ୟା ଓ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ପାହାଡ଼େର ଉପରେ ଜନ୍ମେ ଏବଂ ଏତଦ୍ଵାରର ଅନୁର୍ବ ସମତଳଭୂମିର ବିଶାଳ ଏଲାକା ଜୁଡ଼େ ଏବଂ ପାହାଡ଼େ ପାହାଡ଼େ ଦେଖା ଯାଯ । ଏଣ୍ଟଲୋ ଆସମାନ, କୁଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ପ୍ରକ୍ଷେ ୧୦ ମି. ମି. ଏବଂ ୬ ମି. ମି. ପୁରୁଷବିଶିଷ୍ଟ ଖାନିକଟା ଚ୍ୟାନ୍ଟା ଦଲା ଆକୃତିର । ଦୀର୍ଘ ଖରାର ପର ଏରା କୁଣ୍ଡଲୀ ପାକିଯେ ସଂକୁଚିତ ହୟ ଏବଂ ଏରା ଯେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପର ବେଡେ ଓଠେ ତାତେ ଆଲଗା ହୟେ ଯାଯ । କଥନଓ ବା ଏରା ମଟରାଣ୍ଟିର ମତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲେର ଆକାରେ ଦଲା ପାକାଯ । ଅଭ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ହେଁଯାଯ ଏରା ବାତାସେର ସାଥେ ଭେସେ ବେଡ଼ାଯ ଏବଂ କଥନଓ କଥନଓ ବାତାସେ ଭାସତେ ଭାସତେ ଓରା ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେ ଯାଯ । ଅବଶ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରା ଯାଟିତେ ପତିତ ହୟେ କର୍ଯ୍ୟକୁ ମେନ୍ଟିମିଟାର ପୁରୁଷ ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏରା ଯେଥାନେ ଯେଥାନେ ପତିତ ହୟ, ସେଖାନକାର ମାନୁଷେର ନିକଟ ଏରା ଥାକେ ଅପରିଚିତ ଏବଂ ତାରା ଯେ ଅବହ୍ୟ ଏଦେରକେ ଦେଖିତେ ପାଯ ସେଟା ଛାଡ଼ା ଏଦେର ଅନ୍ୟ କୋନ ଅବହ୍ୟର ସାଥେ ଏଇ ଏଲାକାବାସୀ ପରିଚିତ ଥାକେ ନା । ଆକାଶ ଥେକେ ରହସ୍ୟଜନକଭାବେ ମାଟିତେ ପତିତ ହେଁଯାଯ ବୋଧଗମ୍ୟଭାବେଇ ମର୍ବ୍ଭୁମିର ଗୋତ୍ରୀୟ ଲୋକେରା ଏଦେରକେ ସତିୟ ସତିୟ ଆସମାନ ଥେକେ ପତିତ ହେଯେଛେ ବଲେ ମନେ କରତ । ବିଷୟଟିକେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଏଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ଯାଯ ଯେ, ଏହି ଏମନ ଏକଟି ସଜ୍ଜ ଉତ୍ସାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାତେ ପୁଷ୍ପଲ ଛାକ ଦେହେର ଛାଡ଼ାନେ ଛିଟାନେ ଅଂଶସମୂହ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶେ ନତୁନ କରେ ଉତ୍ସିଦ୍ଧ ଆକାରେ ଜନ୍ମାତେ ଓ ବେଡେ ଉଠିତେ ସକ୍ଷମ । ପୁଷ୍ପଲ ଛାକକେର ଏ ରକମ ବ୍ୟାପକ ବେଡେ ଓଠାର ଘଟନା ୧୮୫୪ ସାଲେ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚଲାକାଲେ ଇରାନେ ଘଟେଛିଲ ବଲେ ଜାନା ଯାଯ । ଅଭୁତ-ଅନାହାରୀ ମାନୁଷ ତଥନ ଆନନ୍ଦ

আর কৃতজ্ঞতায় আত্মহারা হয়ে ওঠেওক। ১৮৯১ সালে তুরস্কে একই রকম ঘটনা ঘটে 'বৃষ্টি খাদ্য'-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ঠিক এমন এক সময়ে যখন সেখানে কঠিন খরা আর দুর্ভিক্ষ চলছিলৈখ। লেকানোরা এসকুলেন্টো নামক এক জাতের পুষ্পল ছাত্রাক বর্তমানে পরিদৃষ্ট হয় ইরানী মরুভূমি এবং দক্ষিণ সোভিয়েত, তুরস্ক ও উত্তর সিরিয়া হয়ে বিশাল ক্রিয়াজি প্রান্তের জুড়ে। সিনাই মরুভূমি, মিশর এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা হয়ে খানিকটা এলাকা বাদ দিয়ে পুষ্পল ছাত্রাকের এই জাত পুনরায় পাওয়া যায় আলজিরিয়া, মরক্কো এবং এটলাস পর্বতমালার দক্ষিণ ঢাল অঞ্চলে। যদিও বর্তমানে সিনাই উপর্যুক্ত মান্না ছাত্রাক আর দেখা যায় না তথাপি এটা অস্তিত্ব নয় যে, হযরত মূসা নবীর (আ) সময়কালে উক্ত অঞ্চলে এই ছাত্রাকের অতিক্রম ছিল। এমনকি যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এ সকল পুষ্পল ছাত্রাক ঐ সময়ে সিনাই অঞ্চলে ছিল না, তথাপি আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড থেকে এদের বাতাস দ্বারা বাহিত হয়ে আঞ্চলিক স্থানান্তরিত হওয়া ছিল খুবই সম্ভব একটা ঘটনা। এ সকল পুষ্পল ছাত্রাক জেলি সহযোগে খাওয়া হয় যা মরু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বা দুর্প্রাপ্যতার সময় খাদ্যমানের যোগান দেয়। যায়াবর গোত্রগুলো তাদের আয়ত্তুধীন পুরো ভৌগলিক এলাকায় এই ছাত্রাকের সাথে সুপরিচিত। এগুলো নানাভাবে রান্না করা যায়। কখনও কখনও একগাদা ছাত্রাক গুঁড়ো করে ঝুঁটি সেঁকার জন্য এক ধরনের মিশ্রণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের ছাত্রাক ইসরাইলীদের মান্নার অন্তর্গত একটা অংশ ছিল 'বৃষ্টি খাদ্য' আকারে বিপুল পরিমাণে অকস্মাৎ আবির্ভূত হওয়া এবং এদের পুষ্টি মানের কারণেই এটা সম্ভব ছিল।

উল্ল্য ও বৃক্ষের লাক্ষিক ক্ষরণ ৪ মহান পারস্য পত্তি ও বিজ্ঞানী আল-বিরুনী (৯৭৩-১০৫০ খ্রি) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বক্তব্য প্রকাশ করেন যে, মরু বোপ, উষ্ট্র কন্টক (আল হাগি মৌরোরাম) পত্র থেকে পাওয়া বা সংগৃহীত মান্না (ফার্সি গায়ান জাবিন বা তারান জাবিন) বা বৃক্ষ নির্যাস আসলে এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকারণে মাধ্যমে তৈরি হয়। এই ক্ষরণ-নির্যাস বৃক্ষ শাখার ঘন হয়ে আটকে থাকে এবং কাপড়ের উপরে ঝাঁকানি দিয়ে এটি সংস্থাহ করা হয়। আলহাগি মান্না নামে এই স্যাকারিন জাতীয় বস্তুটিকে এক সময় আসমান থেকে বৃক্ষের উপরে পতিত সুমিষ্ট নির্যাস বলে মনে করা হত। সিনাই পার্বত্যাঞ্চলে এ রকম 'আসমানের ঝুঁটি' বা আসমান থেকে ঝুঁটি নাজিল হওয়ার একটি চাকুয় বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৪৫৮ সালে। এতে ব্রেইটেনব্যাচ লেখেন : এটি ভোরে শিশির কিংবা তৃষ্ণারের মত পড়ে এবং ঘাস, প্রস্তর এবং বৃক্ষপন্থৰে গুটি গুটি আকারে ঝুলে থাকে। এটি মধুর মতই সুমিষ্টিখ। অতঃপর, ১৮২৩ সালে এহরেনবার্গ নামে এক জার্মান উচ্চিদিবিদ মান্নার এক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। এতে

তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মানু বিশেষ বিশেষ কিছু পোকা দ্বারা সৃষ্ট গুল্য জাতীয় গাছের ছিদ্রপথে নিঃসৃত নির্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। আল-বিরুনী আট শত বছর আগেই উন্নত কন্টক নামে মরু বোপ সম্পর্কে এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। গসিপেরিয়া মেনিফেরা নামে এই পোকা বা কীট সিনাই উপদ্বীপাধ্যলে গুল্য জাতীয় গাছের শাখা ছিদ্র করে মানুর নির্যাস ক্ষরণের কারণ ঘটায়। এহরেনবার্গের গবেষণাপত্র প্রকাশের একশ বছর পর বোদেনহিমার ও থিওডোর কর্তৃক সিনাই উপদ্বীপে এক মানু অভিযান সংগঠিত করেন। তাদের প্রাণে ফলাফল ব্রেইটেনব্যাচ এবং এহরেনবার্গের মতকে নিশ্চিত করে যে, উপরে উল্লিখিত স্কুদ্র পোকা প্রধানত গুল্য বৃক্ষে বাস করে যা সিনাই অঞ্চলেই জন্মে থাকে।<sup>১৬</sup>

অপরাপর বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়েছেন যে, এফিড নামীয় পোকা যা গাছে পরিবহনতন্ত্রের রাসের মধ্যে তুকিয়ে দেয়। এর চাপে গাছের ভিতরের তরল বস্তু এফিডের পরিপাকতন্ত্রের ভিতর দিয়ে এর দেহের পিছনের অংশের শেষ প্রান্তে এসে 'হানি ডিউ' অর্ধাং সুমিষ্ট বৃক্ষ নির্যাসের কেটা তৈরি করে।<sup>১৭</sup> এই সুমিষ্ট বিষ্ঠা প্রথমে তরল থাকে কিন্তু পরে চটচটে আঠালো হয় এবং ঘন ও শক্ত হয়ে ক্ষটিকী আকার ধারণ করে শাখা-প্রশাখার চারদিকে লেগে থাকে কিংবা সাদা দানার মত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। সুমিষ্ট এই বৃক্ষ নির্যাসে থাকে বেশ কয়েকটি যৌগিক শর্করা, কিছু এমাইসো এসিড, ফসফরাস যৌগ আর ঐজেব কণিকা। পোকা কর্তৃক সৃষ্ট গুল্যবৃক্ষের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে নিঃসৃত লাক্ষিক ক্ষরণের মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের শর্করা তথা সুক্রেজ, লেভুলোজ, গ্লুকোজ, ডেক্রুট্রিন আর পানি।<sup>১৮</sup> কাজেই, এ সকল বৃক্ষক্ষরণ এবং বৃক্ষরস খেয়ে বেঁচে থাকা পোকার সুমিষ্ট বিষ্ঠা ইসরাইলীদের দৈনন্দিন খাবারের অংশ বিশেষ ছিল বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে। অবশ্য পরিমাণগত দিক দিয়ে এ দু'ধরনের মানু আর শৈবাল মানুর স্তুপের মধ্যে তুলনা চলে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মরুচারী বেদুইনরা আজও গুল্য মানু সংগ্রহ করে থাকে-তোরবেলা, সূর্যতাপে গলে যাবার কিংবা পিপড়া কর্তৃক খেয়ে ফেলার আগে যেমনটি উল্লেখ করেছেন বোদেনহিমার ও থিওডোর।

**সালওয়া : সালওয়া হচ্ছে কোয়েল তথা গ্যালিফর্ম শ্রেণীর ফিস্যান্ট, তিতির এবং টার্কি জাতীয় এক প্রকার অতিথি পাখীর আরবী প্রতিশব্দ (কন্টারানিঝ)।<sup>১৯</sup> কোটারনিস ভালগারিস নামে এ জাতের একটি অতি পরিচিত অতিথি পাখি সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় পাওয়া যায়। পার্থিচি একটি ছোট তিতির আকারের এবং ফিলিতিন এলাকায় এটি ব্যাপক সংখ্যায় বৎসর ঘটায়।**

বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে মার্চ মাসে এদের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে। শীতকালে এরা আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এলাকায় পাড়ি জমায়। এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে, অতিথি পাখিরা তাদের দীর্ঘ ভ্রমণকালে অন্যান্য কৌশলের মধ্যে বাতাসের প্রবাহকেও কাজে লাগায়। অনুকূল বাতাসের সাহায্যে তারা আফ্রিকা থেকে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে হঠাতে করেই কখনও বা মাত্র এক রাতেই পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ফিরে আসে। প্রথম বিশ্বযুক্ত চলাকালে বহু ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা মিশ্র ও ফিলিস্তিনে এ ধরনের দীর্ঘ ভ্রমণ ব্যক্তে দেখেছেন বলে কথিত আছে।<sup>১০</sup>

কোয়েল পাখির এমন উড়য়ন পেশী আছে যেগুলোর রয়েছে দ্রুত সংকোচনের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা। এরা হঠাতে করেই সজোরে খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠে যেতে পারে। কিন্তু অ্রিজেন এবং অন্যান্য শক্তির জ্বালানী মাংশপেশীতে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মত যথেষ্ট রক্তনালী এদের নেই। এ কারণে, এরা দীর্ঘক্ষণ উড়তে অক্ষম।<sup>১১</sup> বার কয়েক তাড়া করে তয় দেখালে এরা ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং সহজেই হাত দিয়ে ধরা যায়। অসুস্থ ব নয় যে, ইসরাইলীরা কোয়েল পাখিদের এই দৈহিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছিল।

আমিষ সমৃদ্ধ কোয়েলের মাংস শর্করা সমৃদ্ধ মানু সহযোগে গঠন করত একটা চমৎকার সুৰম আহার। কোয়েল পাখির সাথেই মানুর আসার ব্যাপারটা এ ধারণাকেই সমর্থন করছে যে, আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড থেকে প্রবল বাতাসের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে আসা শৈবালই ছিল মানু, অন্তত আংশিকভাবে।

### তথ্য সূত্র :

1. Smith, W. G., *Dictionary of the Bible.* 1876.
2. Moldenke, H. N. and Moldenke A. L., *Plants of the Bible.* Chronica Botanica Co. USA, 1952.
3. Smith, J. *Bible Plants. Their History with a Review of the Opinions of Various Writers Regarding Their Identification.* 1878.
4. (a) Brouk. B. *Plants Consumed by Man.* Academic Press. London. 1975.  
(b) *Encyclopaedia Britannica.*
5. Meyeroff, In *Isis* 37. pp. 31-36. 1947.

6. (a) (b) (c). Keller, W., The Bible as History, Hodder & Stoughton, London. pp. 129-131. 1974.
7. Harrison S. G. 1951. Manna and Its Sources, Kew Bulletin, pp. 407-417. 1950.
8. Said, Hakim M., The potential of Herbal Medicines in Modern Medical Therapy, Hamdard Medicus, Vol. 26 (2), pp. 3-25. 1983.
9. Wortabet, J. and Porter H., Wortabet's Pocket Dictionary. Arabic-English, Beirut.
10. Ali, A. Y., The Holy Quran, Text, Translation and Commentary. Vol. 1. Sheikh Mohammad Ashraf, Lahore, 1938.
11. Peterson. R. T., The Birds, Time-Life International (Nederland). p. 49. 1968.

وَلَوْ اسْتَقْبَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَعَلَّمَ الْجِرْبَ لِعَصَمَكَ الْحَجَرَ فَانْجَرَتْ  
مِنْهُ هَذَا عَشَرَةً عَيْنَاتٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّامٍ تَشَرِّبُهُمْ كُلُّا وَ اسْتَرْبُوا مِنْ  
رِزْقِ الْفَوْلَ لَا تَعْنَوْنَ أَرْضَكُلَّ بَيْنَ ۝

২৪ ৬০ “স্বরণ করো, মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানির প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, পাহাড়ের উপর তোমার হাতের সাঠি ধারা আঘাত কর। এর ফলে তা হতে বারটি বর্ণধারা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র ভার নিজের পানি এহণের স্থান জ্ঞানে নিল। (তখন এই উপদেশ দেয়া হয়েছিল) আল্লাহর দেয়া রিহিক খাও, পান কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

পৃথিবীর বাইরের আবরণ (ভৃত্ক) তিন ধরনের শিলা দিয়ে তৈরি— আগ্নেয়, (Igneous) পালিক, (sedimentary) এবং রূপান্তরশীল (metamorphic)। আগ্নেয় স্তর সরাসরি ‘মেগমা’ (magma) বা গলিত সিলিকেটস (silicates) এর ঘনত্ব প্রাণ্ডির ফল। জমাটবক্ষ লাভা, বেসালট এবং গ্রানাইট এই দলভূক্ত। যখন আগ্নেয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তলানি পড়তে থাকে তাই ক্রমে পালিক শিলায় পরিণত হয়। শেইল (shale) বা কোমল শিলা পালিক শিলার অন্তর্ভুক্ত। যখন প্রবল চাপের ফলে কর্দম স্তরে স্তরে জমাট বাঁধে তখনই এই কোমল শিলায় পরিণত হয়। কোমল শিলার অন্যান্য উদাহরণ হলো বেলে পাথর (sand stone) এবং চুনা পাথর (lime stone)। এগুলো আবার অসংখ্য সামুদ্রিক জীবের ক্যালসিয়াম সংযুক্ত পরিয়াজ অংশ থেকেও তৈরি হয়ে থাকে। আগ্নেয় ও পালিক শিলা প্রচল তাপ ও চাপের ফলে রূপান্তর শিলায় পরিণত হয়। এমনিভাবে চুনা পাথর রূপান্তরিত হয়ে মার্বেল পাথরে পরিণত হয়।

পৃথিবীর বাইরের আবরণে পানি চুক্তে পারার ভিত্তিতে ভৃত্ক প্রবেশ্য এবং অপ্রবেশ্য (permeable and impermeable) হতে পারে। বালি এবং বৃক্ষ প্রবেশ্য, আর কাদামাটি এবং শক্ত পাথর অপ্রবেশ্য। বৃক্ষের পানি প্রবেশ্য মৃত্তিকা ও শিলার মাধ্যমে অপ্রবেশ্য শিলায় গহ্বরে সঞ্চিত হয়ে থোলা, আবৃত অথবা বালুত্বের নিচে জলস্তোতের সৃষ্টি করে। আবৃত জলস্তোতের আবরণ দূরীভূত হলোই পানির প্রবাহ প্রকাশ পায়।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হ্যরত মুসা (আ)-কে পাথরে আঘাত করতে বললে তিনি আল্লাহ নির্দেশিত স্থানে আঘাত করায় বারটি পানির প্রস্তুবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ে।

وَإِذْ قَالُوكُلُّنَا مُتُوفِّي لَنْ كُضِيرَ عَلَى طَعَامِ رَاجِحٍ فَادْعُ لَنَا رَبَكَ بِمُنْجِرْخَ  
لَنَا وَنَائِبِهِ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيلَهَا وَفَقِيلَهَا دُفَّهَا وَعَدَهَا وَبَصِيلَهَا قَلَّ  
أَتَتْبِدِلُنَ الْبَزْنِ هُوَ أَدْنِي هُوَ خَيْرٌ لِفَطُوا وَصْرًا فَانَ لَكُنْ قَا سَالْمُ

২ : ৬১      যখন তোমরা বলেছিলে, ‘হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে  
কখনও দৈর্ঘ ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের  
নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর-তিনি যেন তৃষ্ণিজ্ঞ দ্রব্য  
শাক-সজি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য  
উৎপাদন করেন।’ মূসা বলল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে  
নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও? তবে কোন নগরে  
অবস্থাপন কর? তোমরা যা চাও সেখানে তা আছে।’

শাক-সজি, শসা, গম, মসুর ও পেঁয়াজ : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন  
জায়গায় উল্লিঙ্কৃত বিজ্ঞান কর্তৃক শনাক্তযোগ্য গাছপালার সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। এ  
ছাড়াও আরো আঠারোটি দৃষ্টান্তে বিভিন্ন প্রক্ষিতে গাছপালা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি  
কিংবা গাছগাছালির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র এই কিভাব  
প্রতীকী অর্থবিশিষ্ট আরো কয়েকটি গাছের দৃষ্টান্ত দেয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদের  
পরিচয় আজও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

জাতিগোষ্ঠীগত উল্লিঙ্কৃত বিজ্ঞানের প্রধানাদি এ সত্য প্রকাশ করে যে, উপরে  
উল্লিখিত আয়াতে যে পাঁচটি গাছগাছালির উল্লেখ করা হয়েছে, মূসা নবীর (আ)  
নেতৃত্বে ইসরাইলীরা যখন দলে দলে দেশ থেকে বহিগমন করে তখনি সেগুলো  
মিশরে ছিল। বিশেষ ধূ ধূ মরুভূমিতে অবস্থান করে আবাস করে আলাদা আলাদা  
সালওয়া (কোয়েল) খাবারের একধরেয়েমিতে তারা ইঁপিয়ে উঠেছিল এবং  
বিরক্তিতে হাপিডোশ শরু করেছিল। মিশরের সুবাদু খাদ্যসম্পদের প্রতি লালায়িত  
অর্থচ তা থেকে বক্ষিত ইসরাইলীরা মূসা নবীর (আ) নিকট অভিযোগ পেশ করে  
তাকে আলাদাহীন নিকট দোয়া করতে বলল তিনি যেন নিচে আলোচিত পাঁচটি  
খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন :

بَقْل - বাক্স বা শাকসজি : শব্দটি ধারা এমন এক বা একাধিক পাতা  
কিংবা সম্পূর্ণ লতাগুলাকে বোঝানো হয়েছে যা রান্না করা এবং খাওয়া যায়।  
কিধু ও মিগাহিদ২ তাদের লিবিয়া ও সৌদি আরবের মরুভূমিতে পুল্লোৎপাদন

বিষয়ক বিবরণীতে বিকি-র অভিত্তের কথা উল্লেখ করেছেন যা সাধারণভাবে ইংরেজীতে শাকসজি ও সালাদ (পর্জুলাকা লেরাসিয়া) হিসেবে পরিচিত। এটি মাটির উপরে লতিয়ে যাওয়া রসাল পদারিশিট ছেষ ভল্যাবিশেষ যা বিশ্বের উজ্জ্বলগুলোতে বিশেষত অনুর্বর ও আংশিক উর্বর মরুভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর মাঝে পাতা মিশর সহ বিশ্বের অনেক অংশে সালাদ এবং চাটনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যান্য আরো অধিক পাতারিশিট শাকসজির পাশাপাশি এটি মিশরে অবস্থানকালীন সময়ে ইসরাইলীদের খাবারে সালাদের আইটেম হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

**فَتَّاهُ - كৃচ্ছা'** বা খসা (কিউকারিস স্যাটিভাস) : আরবী শব্দ 'কৃচ্ছা' অর্থ খসা, লাউ জাতীয় সজি পরিবারেরই এক সদস্যের নাম। এ গাছটির উৎপত্তি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে ক্যান্ডলিও ধারণ করেন যে, সহস্রাধিক বছর আগে ভারতে এটির চাষ হত এবং অতঃপর তা পাচাতো ছড়িয়ে পড়ে। মিশরে ১২শ রাজবংশেরও শাসনামলে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৯১ সালের ৫ দিকে ব্যাপক আকারে এটির চাষ করা হ'ত। শসার বাদ্যযন্ত্র প্রধানত এটির শর্করা ও খাদ্যগ্রাণের মধ্যে নিহিত। ভক্ষণযোগ্য অংশে রয়েছে প্রায় ৯৫% ভাগ পানি, ০.৭ % ভাগ আমিষ, ০.১% ভাগ স্বেচ্ছ, ৩-৪% ভাগ শর্করা এবং ০.৪% ভাগ আঁশ। এটিকে একটি নিষ্ক ক্যালরী যুক্ত খাবার হিসেবে গণ্য করা হয়।

**فوم - ফুম বা রসুন (এশিয়াম স্যাটিভাস)** : টেইনগ্যাস-এর মতে, আরবী শব্দ ফুম বা তুম-এর অর্থ রসুন, গম কিংবা কৃটি তৈরির অন্যান্য ভূট্টা অথবা মটের গাছ।

এ গাছটি মিশরের রাজবংশ শাসনপূর্ব আমলে (খ্রি: পৃঃ ৩০০ সালের আগে) মিশরে পরিচিত ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের নিকটও এটির পরিচিতি ছিল। এতে রয়েছে প্রায় ৬৪% ভাগ পানি, ৭% ভাগ আমিষ, ০.২% ভাগ স্বেচ্ছ, ২৮% ভাগ শর্করা এবং ০.৮% ভাগ আঁশ। বীৰামো গুৰের কারণে রসুন সাধারণভাবে একটা গুৰুবৰ্ধক উপাদান হিসেবে গণ্য হয়, নিজ গুণে সজি হিসেবে নয়। সক্রিয় প্রধান উপাদান এলিসিনের গুণে রসুনের মধ্যে জীবাণু নাশক পুণ বিদ্যমান।

**গম (ট্রিটিকাম ডিকোকাম)** : গম উজ্জ্বলবায়ু অঞ্চলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। ১২টি বিভিন্ন জাতের গম আছে যার মধ্যে একার জাতীয় গমই (ট্রিটিকাম ডিকোকাম) চাষাবাদকৃত জাতের গমসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এটির চাষাবাদ করা হয়ে আসছে বলে

জানা যায়। এই গমের প্রাচীনতম দানা খ্রিৎ পৃঃ ৬৭৫০৮ সালে পূর্ব ইরাকের উচ্চ অঞ্চল জার্মাতে খনন তথা খননকৃত গর্তে পাওয়া যায়। অধুনা সকল বিশেষজ্ঞই একমত যে, এখার জাতের গম প্রাচীন মিশরের আবাদ হত। মিশরের পঞ্চম রাজবংশের শাসনকালে (খ্রিৎ পৃঃ প্রায় ৩৫০০ সাল) দেয়ালে খোদাইকৃত শস্যাক্ষন চিত্রে দেখা যায় যে, একজন কৃষক গমের শীষ কর্তন করছে।<sup>১০</sup> গমের দানা থেকে তৈরি হয় খাবার অথবা আটা যা রুটির প্রধান উপাদান। পুরো শস্য দানাটিতে আছে প্রায় ১৩% ভাগ পানি, ১১.৫% ভাগ আমিষ, ২% ভাগ স্নেহ, ৭০% ভাগ শর্করা, আর ২% ভাগ অঁশ।

আরবী শব্দ 'ফুম'-এর যে তিনটি বিকল্প অর্থ টেইনগ্যাস দিয়েছেন তার মধ্যে রসুন মিশরে ইসরাইলীদের দ্বারা গৃহৰক্ষণ উপাদান হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকবে, কিন্তু তাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য আইটেম হিসেবে নয়। অপরদিকে, প্রাচীন মিশরের একটি উচ্চতৃপূর্ণ খাদ্যশস্যের আবাদ হিসেবে এবং সেই সাথে এর পৃষ্ঠাগুরের কারণে গম ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। তৃতীয় বিকল্প হিসেবে আরবী শব্দ 'ফুম'-এর অর্থ ঘটর গাছ (বা শস্য)-হওয়া প্রভাব্যান করা যেতে পারে। কেননা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে বিলের চতুর্থ ও শুষ্ঠ শতকে আরব অভিযানকালে আবিসিনিয়ার ইথিওপিয়ায় এটির প্রচলন ঘটে।

**মসুর ডাল (লেব এসকুলেটা) :** সম্ভবত এই সুপরিচিত ডালটির উৎপত্তি হয় নিকটপ্রাচ্য কিংবা ভূয় ধূসাগরীয় অঞ্চলে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এটি চাবাবাদ হয় এবং প্রাচীন মিশরীয় ও শ্রীকদের নিকট এটি ছিল পরিচিত। পুরো বীজের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১১.২% ভাগ পানি, ২৫% ভাগ আমিষ, ১% ভাগ স্নেহ, ৫৫.৪% ভাগ শর্করা এবং ৩.৭% ভাগ অঁশ। উচ্চ আমিষ উপাদানের জন্যে এটি ব্যাপকভাবে সুপ এবং ভাঁপে তৈরি খাদ্যে ব্যবহৃত হয়।

**পেঁয়াজ (এশিয়াম সেপা) :** ইরান, পাকিস্তান এবং আরো উত্তরের পার্বত্য দেশগুলোতে পেঁয়াজের উৎপত্তি বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে প্রাচীন কাল থেকে পেঁয়াজের চাষ হয়। প্রাচীন মিশরে পেঁয়াজ জনপ্রিয় খাবার ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা, খ্রিৎ পৃঃ ৩২০০-২৭৮০ সালের মত সুপ্রাচীন কালে ১০ওঁ কবরগাহে এটির খোদাই করা চিত্র পাওয়া যায়। মমির মধ্যেও পেঁয়াজ পাওয়া গেছে। পিরামিড নির্মাতারা পেঁয়াজ খেত এবং তাদের ধর্মীয় ও শেষ কৃত্য প্রার্থনায় পেঁয়াজ ব্যবহৃত হত। বাইবেলেও পেঁয়াজের উল্লেখ রয়েছে। এতেও সেই একই পরিস্থিতির বিবরণ দেয়া হয়েছে, যাতে ইসরাইলী মিশরে অবস্থানকালে তারা যে পেঁয়াজ খেত সেকথা ব্রহ্ম করে তারা তাদের কষ্টের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করেছিল (সংখ্যা

১১-৫)। তাজা শাকসজির তুলনায় পেয়াজ ছিল অপেক্ষাকৃত উচ্চ খাদ্যমান সম্পন্ন এবং আমিষ উপাদানের দিক থেকে মধ্যবর্তী আর ক্যালসিয়াম ও রিবোফ্লেভিন সমৃদ্ধ। পরিপূর্ণ পেয়াজে আছে ৮৬% ভাগ পানি, ১.৪০% ভাগ আমিষ, ১১% ভাগ শর্করা আর ০.৮% ভাগ আংশ। দৃশ্যত মানানসই হরেক রকম যেসব খাদ্য মিশরে ইসরাইলীয়া গ্রহণ করত, মশলাপাতি, শসা ও শাকসজি এবং সেই সাথে প্রধান খাবার গম ও ডাল খাদ্য তালিকায় থাকায় তা ছিল অত্যন্ত সুন্দার ও মজাদার।

পুরুষের জন্য ২৪ ঘন্টার খাদ্য তালিকায় প্রয়োজন হত ২৪০০-৬০০০ ক্যালরী। ক্যালরীতে এই পরিমাণ ভেদ ঘট্ট খাদ্য গ্রহণকারীর দৈহিক পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে— অর্থাৎ সে পরিশ্রমবিহীন বেকার, নাকি শ্রমিক, নাকি খেলোয়াড় তার উপর। শর্করাযুক্ত খাদ্যের ক্যালরীমান হচ্ছে : ৫০০ গ্রামে ২০০ ক্যালরী অথচ প্রতি ১০০ গ্রাম আমিষ ও মেহজাতীয় খাদ্য রয়েছে যথাক্রমে ৪০০<sup>+</sup> ও ৯০০ ক্যালরী। অবশ্য ক্যালরীর পরিমাণই মানবপুষ্টির উপযুক্ত বিচারের একমাত্র বিষয় নয়। এমনকি ৩০০০ ক্যালরীর সবটাই যদি কৃটি থেকে পাওয়া যায়, তাহলে তাতে মানুষের যথেষ্ট পুষ্টিবিধান হবে না। বিশেষ বিশেষ কিছু বস্তু মানুষের আবশ্যিক যার মধ্যে রয়েছে খাদ্য প্রাণ এবং বিশেষত কিছু নির্দিষ্ট এমাইনো এসিড যেগুলো উত্তির্জন আমিষে দুর্লাপ্য। শর্করা জাতীয় খাদ্য মানুষ রয়েছে সুক্রোজ, লেভুলোজ, গ্লুকোজ এবং ডেক্রিনের মত চিনির প্রধান উপাদানসমূহ। এ সবই তাৎক্ষণিক শক্তির মোগান দেয়। অপরদিকে, তুলনামূলক বিচারে গমের কৃটিতে যে শর্করা আছে হজমকালীন সময়ে প্রথমে তাকে ভেঙ্গে চিনিতে রূপান্তরিত করা দরকার হয়।

কলাই তথা মসুর ডালের আমিষের পুষ্টিমান উচ্চ (২৫%) বটে, তবে প্রাণীজ উৎসের আমিষের পুষ্টিমান তদপেক্ষা উচ্চ। আবার, এগুলো শাকসজির উৎস থেকে পাওয়া আমিষের তুলনায় আরো সহজে হজম ও শেষিত হয়। কোয়েল পাথির মাংসের মত উত্তম প্রাণীজ আমিষে সুবর্ষ এমাইনো এসিড মিশ্রণ ও মেহ রয়েছে, যে কারণে ডাল, সস্যদান আর তৈলবীজের এক বিচক্ষণ মিশ্রণে। একটি বিকল্প খাবার হতে পারে। এ কারণে, শুধু কোয়েলের মাংসই কলাই এবং গমের সংযুক্তি খাদ্য মানের তুলনায় আমিষের অনেক উত্তম উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

মানু ও সালওয়া-বৰ সংমিশ্রণে যে মানের খাদ্য তৈরি হয় তাতে খাকে প্রয়োজনীয় শক্তির শর্করা এবং সেই সাথে সহজপাচ আমিষ, খাদ্যপ্রাণ এবং অপরিহার্য এমাইনো এসিড। এ কারণে, এই খাবার বিভিন্ন মসলা সহযোগে তৈরি ইসরাইলীদের পছন্দের খাবারের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত মানের হওয়ার

ଦାବୀ ରାଖେ । ଇସରାଇଲୀରା ଶୁଭମାତ୍ର ଖାଓୟାର ଜନ୍ୟ ଲାଲାଯିତ ଛିଲ, ଅଥଚ ଗୁଣଗତ ଦିକ୍ ଦିଯେ ତା ଛିଲ ତୁଳନାମୂଳକଭାବେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟମାନସମ୍ପନ୍ନ । ହୟରତ ମୂସା (ଆଃ)-ଏର ଭାଷାଯ - ‘ତୋମରା କି ତାହଲେ ଉତ୍ସମେର ବିନିମୟେ ଅଧିମକେଇ ବେହେ ନିଜିରେ?’ - ଇସରାଇଲୀଦେର ତିରକାରେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଅତ୍ର ଆଯାତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଲ୍ଲାହର ଅସୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞାଇ ବ୍ୟାପକଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଁଥେ ।

### ତଥ୍ୟ ସୂଚି :

1. Keith H. G., *Libyan Flora 2*, Ministry of Agriculture and Agrarian Reforms, Libyan Arabic Republic, p. 791, 1965.
2. Migahid, A. M. *Flora of Saudi Arabia 2*, p. 815, 1978.
3. De Candolle, A., *Origin of Cultivated Plants*, New York (reprint 1959). 1882.
4. Purseglove, J. W., *Tropical Crops Dicotyledons*, Longman Group Ltd, 1968.
5. Encyclopaedia Britannica, vol. 6 p. 469, 1973.
6. Steingass, F., *A. Learner's Arabic-English Dictionary*, Beirut, 1972.
7. Purseglove, J. W., *Tropical Crops Monocots*, Longman Group Ltd., London, 1972.
8. Brouk, B., *Plants Consumed by Man*, Academic Press, London.
9. Berlinger, M., *Plants of the Bible in Their Natural Surroundings*, 1969.
10. Purseglove, J. W., *Tropical Crops, Monocotyledons*, Longman Group Ltd., London, 1972.

۱۷۔ لَئِنْ قَسَّتْ لُؤْلُؤَكُوْرَقْمَنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُنَّ كَانِجَارَةُ أَوْ أَشْلُّ كَشْوَةُ وَرَائِعٌ مِنَ  
الْجَاجَارَةِ لَمَا يَتَجَزَّرُ مِنْهُ الْأَهْرَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَتَفَقَّنْ تَيْخُرُجُ مِنْهُ النَّادُورُ وَ  
إِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْبَةِ اللَّوْ

২ : ৭৪ কিন্তু এরূপ নির্দর্শনসমূহ দেখতে পাওয়ার পরও তোমাদের মন  
কঠিন হয়ে গিয়েছে- পাথরের ন্যায় কিংবা তা হতেও কঠিনভর।  
কেননা কোন কোনটি এমনও হয়ে থাকে যা হতে ঝর্ণাধারা  
প্রবাহিত হয়, কোন কোনটি বিদীর্ঘ হয়ে যায় এবং তার মধ্য  
হতে পানি প্রবাহিত হয়। আর কোন কোনটি আল্লাহর ভয়ে  
কল্পিত হয়ে ভৃত্যাতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের  
কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই অনবাহিত নন।

এই আয়াতে আল্লাহ তিন প্রকারের শিলার কথা উল্লেখ করেছেন (১) এক  
প্রকারের মধ্য থেকে পানির ধারা প্রবাহিত হয়; (২) আর এক প্রকার শিলার মধ্য  
থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়; এবং (৩) তৃতীয় প্রকার শিলা ভৃত্যকের নীচে  
প্রোথিত থাকে।

যে ধরনের শিলা থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় সে সম্পর্কে ২ : ৬০  
আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। যখন বৃষ্টির পানি প্রবেশ্য শিলার উপর  
পতিত হয়, ইহা স্বত্বাবতই সহজ এবং সরাসরি নিম্নগামী পথে প্রবাহিত হয়ে শেষ  
পর্যন্ত অপ্রবেশ্য শিলা এলাকায় প্রবেশ করে। অপ্রবেশ্য এলাকায় পানি সর্বনিম্ন  
স্তরে জমা হয়। সেখানে যদি প্রবল চাপ সৃষ্টি হয় তবে পানি পাথর বিদীর্ঘ করে  
ঝর্ণা বা “আর্টেজীয়” কৃপ সৃষ্টি করে। যদি পানির সরবরাহ স্থির বা অবিরাম হয়  
তবে ঝর্ণাধারা ও স্থায়ী হয় নতুন সাময়িক বা অবিরাম হয়ে থাকে। (২) দ্বিতীয়  
প্রকারের শিলাই বিদীর্ঘ হয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছিল, যা এই আয়াতে বর্ণিত  
হয়েছে।

বেসাল্ট, গ্রানাইট, মার্বেল ইত্যাদি পাথর মনে হয় যেন আল্লাহর ভয়ে  
ভৃত্যকের নীচে প্রোথিত থাকে। এগুলোই আল্লাহ বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের শিলা।  
উপরে বর্ণিত তিন প্রকারের শিলার উদাহরণ বিভিন্ন ধরনের গুহাহ্গারদের কঠোর  
হৃদয়ের জন্মক বর্ণনা বলা যায়- (ক) এক প্রকার, যারা স্বতঃকৃতভাবে অনুশোচনা  
করে ত্রন্দন করে, (খ) দ্বিতীয় প্রকার, যারা কঠিন বিপদে পড়ে ত্রন্দন করে, আর

(গ) তৃতীয় প্রকার, যারা কেবল ভয়ে ভীত হয়ে কম্পমান থাকে। কিন্তু মহাপাপীদের হন্দয় কঠোরতম শিলার চেয়েও কঠিন যা কোন অবস্থায়ই বিচলিত হয় না। আল্লামা ইউসুফ আলী এ ধরনের ব্যাখ্যাই দিয়েছেন কিন্তু বিভিন্ন প্রকার শিলার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেননি।

এ ব্যাপারে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে শিলার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মানুষ খুব অল্পদিন হলো জানতে পেরেছে, অথচ এই তিনি প্রকার শিলার কথা পরিত্র কুরআনে প্রায় চৌদশ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছে। এতে প্রমাণ হয় যে আল-কুরআন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বাণী।

### তথ্যসূত্র :

1. Yusuf Ali, A. The Holy Quran.

## ۱۰۔ بِلَيْقُونُ الْثَّمُرُتْ وَالْأَرْضُ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

২.৪ ১১৭ আল্লাহ আকাশমন্তলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং ষৰ্বন তিনি কিছু  
করতে সিদ্ধান্ত করেন শধু বলেন ‘ইও’ আৰ তা হয়ে যায়।

এ আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ সম্পর্কে  
সবচেয়ে মৌলিক ধারণা তুলে ধৰা।

বিশ্বজগতের সৃষ্টি বিষয়টির অনুধাবন নিয়ে কিছু গভীর সমস্যা রয়েছে। এতে  
যে নৈপুণ্য ও কৃটিহীন দক্ষতা জড়িত তা গভীর চিন্তা ভাবনার দাবী রাখে।  
শ্বরণাতীত কাল থেকে এই সুবিশাল বিশ্বজগৎ এবং যে পৃথিবীতে সে বাস করে  
তাকে বুঝার ব্যাপারে মানুষের মন ছিল কৌতুহলী। এই অনুসন্ধিৎসা বিভিন্ন  
সময়ে নানা পৌরাণিক কাহিনীর জন্য দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে  
বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের অনন্ত অনুসন্ধান প্রচেষ্টা এক  
যুগান্তকারী সাফল্য প্রত্যক্ষ করে। আধুনিক ও উন্নত জ্যোতিবিদ্যা প্রণালীর  
মাধ্যমে হাবল-এর সূত্র আবিষ্কৃত হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং জর্জ  
গ্যারো-র নৈপুণ্যের কারণে বিশ্বজগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে বিখ্যাত ‘বিগ-  
ব্যাঙ’ (অর্থাৎ প্রচন্ড বিস্ফোরণ) মতবাদের আবির্ভাব ঘটে (আয়াত ২১ : ৩০)।

অতি ক্ষুদ্রাকৃতিতে অঙ্গিগোলকের এ রকম আদিমকালীন বিস্ফোরণের  
স্বপক্ষে সাঙ্গ্য পাওয়া যায় উইলসন ও পেনজিয়াস-এর আবিষ্কার থেকে। ১৯৬৫  
সালে এই বিজ্ঞানীদ্বয় ৩০ ডিনী কেলভিনের সময়মানের তাপমাত্রায় মহাজাগতিক  
সূক্ষ্ম তরঙ্গের পশ্চাত্ত্বমি বিকিরণ আবিষ্কার করেন, যার জন্য তাদেরকে নোবেল  
পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই সেই পশ্চাত্ত্বমি বিকিরণ থাকে প্রচন্ড বিস্ফোরণেরই  
একটি অবশ্যে হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। বিশ্ব জগৎ এবং মহাকাশের উৎপত্তি  
সম্পর্কে বিকল্প রয়েছে শুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত স্থিতাবস্থা মতবাদ  
এজন্যই প্রত্যাখ্যাত হয় যে, তা এই পশ্চাত্ত্বমি বিকিরণের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়।

১৯২৯ সালে হাবল একটি ছায়াপথের দূরত্ব এবং এর মন্দাকালীন  
গতিবেগের মধ্যে একটা সরলরেখিক সম্পর্ক দেখতে পান। দূরত্ব যত বেশী,  
গতিবেগও ততই বাঢ়ে। আনুগাতিকতার ধ্রুবকর্তৃ হাবল-এর ধ্রুবক নামে  
পরিচিত। সরলরেখিকতা থেকে সামান্য ভিন্নতার কারণে বিশ্ব জগতের অতীত ও  
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লক্ষণীয় ভিন্ন সিদ্ধান্ত চলে আসে। বর্তমানে ৫৫ একক  
(কিঃ মিঃ/ সেঃ মেগাপার সেঃ)কে হাবল-এর ধ্রুবক হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

## ଆଲ-କୁରାନେ ବିଜ୍ଞାନ

ତଦନ୍ୟାୟୀ ୧ ହାଜାର ୯ଶତ କୋଟି ବହୁ ଆଗେ ପୃଥିବୀର ଅତିତ୍ବ ଛିଲ ନେଇ ଛିଲ ନା  
ଚାଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶାହୀ, ତାରା, ଛାଯାପଥ ଅର୍ଥାଏ କୋନ ପୃଥିବୀ ବା ଆକାଶମଣଳୀ ।

‘ ସୃଷ୍ଟିର ସୂଚନାଲଗ୍ନେ ବିପୁଲ ଉତ୍ତଣ (୧୦୩୨ ଡିଗ୍ରୀ କେଲଭିନ୍ନର କମ ନାୟ) ଏବଂ  
ଅପରିସୀମ ଘନତ୍ୱବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରମାବୟେ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତିର ଏକ ଆଦିମ ଅଗ୍ନିଗୋଲକ  
ଛିଲ । ବିଗ-ବ୍ୟାଙ୍ଗ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଦିମୟୁଗୀୟ ଅଗ୍ନିଗୋଲକେର ପ୍ରଚନ୍ଦ ଏକ  
ବିକ୍ଷେରଣେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ମେର ସୂଚନା ହୟ, ଆର ସେଇ ସାଥେଇ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଘଟେ  
ଏ ଅଗ୍ନିଗୋଲକେବେ । ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶୁରୁ ହତେଇ ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ କାଳେର ବିବରତନ ଶୁରୁ ହୟେ  
ଯାଏ । ପ୍ରଧାନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, କିଛୁ ପରିମାଣ ଡିଉଟାରନ୍, ହିଲିଆମ ଏବଂ  
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମ୍ବାଦେ ଗଠିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଲାଗୁକୃତି ଗ୍ୟାସେର ଫୁଟକି ସୃଷ୍ଟି କରାତେ  
ଆରାତ କରେ । ସମ୍ପ୍ରସାରଣେର ବଳେର କାରଣେ ଫୁଟକିଗୁଲୋ ପରମ୍ପର ଥେକେ ଆଲାଦା ହୟେ  
ଦୂରେ ସରେ ଯେତେ ଆର ବସ୍ତୁର ଫୁଟକିଗୁଲୋ ନିଜ ନିଜ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣେର କାରଣେ ସଂକୁଚିତ  
ହତେ ଥାକତୋ । ଦୁଇ ବିପରୀତମୁଖୀ ବଳେର କ୍ରିଯା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କାରଣେ ଫୁଟକିଗୁଲୋର  
ଭିତର ପ୍ରଚନ୍ଦ ଆଲୋଡ଼ନପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିର ଉତ୍ସବ ହୟ, ଏତେ ଫୁଟକିଗୁଲୋ ଗୋଲାକୃତି,  
ପେଂଚାନୋ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଧାରଣ କରେ ।

ବିଶ୍ୱଜଗତେର ବୟସ ଯଥନ ଛିଲ ମାତ୍ର ୧ ମେକେନ୍, ତଥନ ଏର ତାପମାତ୍ରା ଛିଲ  
୧୦୧୦ ଡିଗ୍ରୀ କେଲଭିନ୍ନ ଏବଂ ଘନତ୍ବ ଛିଲ ୧ ଗ୍ରାମ/ ସିସି । ସେଇ ମୁହଁରେ ଯଦି  
ସମ୍ପ୍ରସାରଣେର ହାର ଲକ୍ଷ କୋଟି ତାଗେର ଏକଭାଗ ମାତ୍ର କମ ହତ, ତାହଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ  
କରେକ କୋଟି ବହୁରେ ମଧ୍ୟେ ଧର୍ମସ ହୟେ ଯେତ । ଆବାର, ସମ୍ପ୍ରସାରଣେର ହାର ଯଦି  
ଅନୁରାପ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାଣେ ବେଶୀ ହତ, ତାହଲେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣେର ମାତ୍ରା ଏମନ ବିଶାଲଭାଯ  
ପୌଛାତ ଯେ, କୋନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣୀୟ ସୀମାର ବ୍ୟବହ୍ରା ସନ୍ତ୍ଵବ ହତ ନା । ଯେଟୁଇ ହୋକ ନା  
କେନ, ବିଶାଲ ବିଶାଲ ଏହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୟରିତ କୋନ ମହାକାଶ ଏବଂ ଜୀବନେର ସକଳ  
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମିଭିତ୍ତି କୋନ ପୃଥିବୀର ଅତିତ୍ବ ସନ୍ତ୍ଵବ ଛିଲ ନା । ଏ ଥେକେ ବିଶ୍ୱଜଗତେର  
ଉଦ୍ଧାତାର ନୈପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବ ଦକ୍ଷତାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୟ ଯାର ପ୍ରତି ଯେ କେଉ  
ବିମୁଦ୍ଧିଟିଲେ ସିଜଦାୟ ଅବନନ୍ତ ହତେ ବାଧ୍ୟ ।

ମହାବିଶ୍ୱର ବୟସ ଯଥନ ୧୦ ଥେକେ ୧୦୦ ମେକେନ୍ ତଥନ ମହାବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ  
ହିଲିଆମ ପରମାଣୁର ପିଭିଭୂତ ଅଂଶ ତଥା ନିଉକ୍ରିୟାସ ତୈରି ହୟ । ଯଦି ଏ ସମୟ  
ହିଲିଆମ ନିଉକ୍ରିୟାସ ତୈରି ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ମହାବିଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରୋଟନ ଶୋଭିତ ହୟେ  
ଯେତ ତାହଲେ ମହାବିଶ୍ୱର ଥାକତ ଶୁଦ୍ଧ ବଲତେ ଗେଲେ ଡିଉଟାରିଆମ ଅଥବା ହିଲିଆମ  
ନୟ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନିର୍ଭର । ଡିଉଟାରିଆମ ଯଦି ହତ ପ୍ରଧାନ ଫଳ, ତାହଲେ ତାରକାରାଣି  
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମାର ମତ ବିକ୍ଷେରିତ ହୟେ ଯେତ ।

তাপমাত্রা  $3000^{\circ}$  ডিগ্রী কেলভিনে নেমে আসলে প্রোটন ও ইলেক্ট্রন থেকে হাইড্রোজেন অণু তৈরি হয়। প্রধানত হাইড্রোজেন অণু এবং সেই সাথে কিছু পরিমাণ হিলিয়াম সমৰয়ে গঠিত বস্তু ফুটকি তৈরি শুরু করে। এগুলো পরম্পর থেকে আলাদা হয়ে উড়তে থাকে। বিগ ব্যাঙ বা প্রচণ্ড নিনাদের  $10^{10}$  বছর পর এই পর্যায়ে এসে ফুটকি আকারে ভাসমান পদার্থ মাধ্যাকর্ষণ বল দ্বারা ঘনীভূত হয় এবং প্রথমে আদি ছায়াপথ ও পরে ছায়াপথের জন্ম দেয় যাতে পঁচিশ কোটি বছর সময় লাগে। ছায়াপথের আণবিক গ্যাস আর ধূলিকণা থেকে সৃষ্টি হয় তারকামন্ডল। তারকাস্ত পদার্থ ঘনীভূত হয়ে আসলে ঘূর্ণায়মান সৌর নীহারিকা সংকুচিত হয়ে তৈরি করে আদি সূর্য আর বহিস্থ বৃত্তাকার পরিবেষ্টক জন্ম দেয় গ্রহ-নক্ষত্র আর উপগ্রহের। এতে সময় লাগে পঁচাত্তর কোটি বছর।

মাধ্যাকর্ষণীয় সংকোচনের কারণে সূর্যের অভ্যন্তর ভাগ  $15 \times 10^6$  ডিগ্রী কেলভিনের মত উত্তপ্ত হয়। এত উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় সূর্য একটি গলন চুল্লিক কাজ করে। এই তাপমাত্রায় ২টি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস একীভূত হলে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন সংযুক্ত একটি ডিউটারিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। পরবর্তীতে ডিউটারিয়াম নিউক্লিয়াস আরেকটি সাধারণ হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয়ে হিলিয়ামের আইসোটোপে পরিণত হয় যার মধ্যে থাকে দু'টি প্রোটন আর একটি নিউট্রন। পরিশেষে, এ ধরনের দুটি হিলিয়াম আইসোটোপ একীভূত হয়ে একটি সাধারণ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে একীভবন প্রক্রিয়ায়। ভরের ক্ষুদ্র একটা অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যাকে আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র  $E=mc^2$  অনুযায়ী  $E$  আকারে প্রকাশ করা হয়। এখানে  $E$  হচ্ছে বহিগত শক্তি,  $m$  হচ্ছে শক্তিতে রূপান্তরিত ভরের পরিমাণ এবং  $c$  হচ্ছে আলোর গতি। বহিগত শক্তিই সূর্যকে উজ্জ্বল রাখে। সৌরশক্তিই আমাদের সকল খাদ্য ও শক্তির ভিত্তি এবং বস্তুত উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্যে এটি অত্যাবশ্যকীয়।

একটি করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস যুক্ত করে একটা পর একটা অধিকতর ভারী নিউক্লিয়াস তথা নিওন, ম্যাগনেশিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি তৈরি করা যায়। একীভবন প্রক্রিয়াগুলোতে দু'টি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের একীভবনের একটি বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াস অস্থিতিশীল হওয়ায় প্রকৃতি এটি তৈরি করা থেকে এড়িয়ে যায়। বেরিলিয়াম উৎপাদনকারী একীভবন ক্রিয়ায় তারকাস্তিত সমস্ত হিলিয়াম দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেত আর তৎপরবর্তী বিক্রিয়ায় কার্বন, অক্সিজেন প্রভৃতি তৈরি হত। এ ধরনের

ବିକ୍ରିଯାଗୁଲୋତେ ଯେ ଦ୍ରୁତତାର ସାଥେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୟ ତାତେ ତାରକାଘଡ଼େର ମତ ତାରକାଗୁଲୋ ବିକ୍ଷୋରିତ ହତ । ବସ୍ତୁତ ଫ୍ରେଡ ହୋୟଲି ହିସେବ କରେ ଦେଖାନ ଯେ, ତାରକା ବିକ୍ଷୋରଣେ ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯଥନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ହତ, ତତକ୍ଷଣେ କାର୍ବନ ତୈରି ହୟେ ଥାକତ । ଏତାବେ ମହାବିଶ୍ୱେ ଥାକତ ବିଶାଳ ବିପୁଲ ପରିମାଣେ କାର୍ବନ, କିନ୍ତୁ ଥାକତ ନା ସାଲଫାର, ସିଲିକନ, ଲୋହ ପ୍ରତିର ମତ ଭାରୀ ମୌଲିକ ପଦାର୍ଥ । ପ୍ରୟୋଜନେର ଖାତିରେଇ ବେରିଲିଯାମକେ ହତେ ହତ ଅଞ୍ଚିତଶୀଳ । କିନ୍ତୁ ତାତେ ଆରେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିତ । ବେରିଲିଯାମ ଥେକେ ସଦି କାର୍ବନ ତୈରି ନା ହତ, ତାହଲେ କାର୍ବନ ତୈରି ହତେ ହତ କୀଭାବେ? ହିଲିଯାମ ନିଉକ୍ରିୟାସ ଏକିଭବନେର ଯାଧ୍ୟେ କାର୍ବନ ତୈରି ହତେ ପାରତ । ତବେ ସମ୍ଭବତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ । ହୋୟଲିର ହିସେବ ମତେ ଏ ସଂବ୍ୟତ ବାଡ଼ାତେ ହଲେ ଏକଟା ଅଣୁମାଦୀ ବିକ୍ରିଯା ଘଟା ପ୍ରୟୋଜନ । ଆର ଏଇ ବିକ୍ରିଯାର ଜନ୍ୟେ କାର୍ବନ ନିଉକ୍ରିୟାସକେ ଏକଟା ବିଶେଷ ଉତ୍ୱେଜିତ ଅବସ୍ଥା ଥାକତେ ହବେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାର ସଙ୍କାନ କରା ହୟେଛିଲ ଏବଂ ଦେଖା ଗେଲ କାର୍ବନ ନିଉକ୍ରିୟାସେ ସଠିକ ଶକ୍ତିତେ ଏମନ ଏକଟା ଉତ୍ୱେଜିତ ଅବସ୍ଥା ବିରାଜ କରେ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସାଥେ ସାଥେଇ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁରୁ ହୟ । ଆର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଏକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାରେ ଆନା ହୟ । ସାଡେ ଚାରଶ କୋଟି ବହର ଆଗେ ଆନ୍ତଃତାରକାମଗୁଲୀୟ ଗ୍ୟାସ ଓ ଧୂଳିକଣା ସମର୍ଯ୍ୟେ ଗଠିତ ଏକଟି ଅନୁଜ୍ଞଳ, ରଙ୍ଗିମ-ଉତ୍ସୁକ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଗୋଲକ ହିସେବେ ପୃଥିବୀର ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ । ତାପମାତ୍ରା କମେ ଏଲେ ପୃଥିବୀ ତରଳ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଅରସର ହୟ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ୧୦୦ କୋଟି ବହରେର ମତ ପରେ ଏର କୋନ କୋନ ଅଂଶେ କଠିନ ଆନ୍ତରଣେର ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ବିଦ୍ୟୁଂ ଚମକାନି ଆର ଅଗ୍ନି-ଉଦ୍‌ଦ୍‌ଗୀରଣ ଚଲତେ ଥାକେ ହର ହାମେଶା । ଆର ଆଗ୍ନିମଯ ପ୍ରହିତିକେ ଘରେ ଥାକେ ଏକ ବାସ୍ତ୍ଵୀୟ ବାୟଦଗୁଲ । ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଠାଣା ହୟେ ଏଲେ ବାସ୍ତ୍ଵୀୟ ଜଳକଣା ଘନୀଭୂତ ହୟ ଏବଂ ଭାରୀ ବର୍ଷଣ ଶୁରୁ ହୟ । ବୃଷ୍ଟିପାତେର ଫଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୟ ନଦୀ, ଝିଦ, ସାଗର ଓ ମହାସାଗର । ତଥବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନେର ଉନ୍ନେସ ନା ଘଟାଯ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ପରିଣତ ହୟ ପାହାଡ଼-ପର୍ବତ, ମରଭୂମି, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଆର ପ୍ରବହମାନ ଲାଭାକ୍ଷେତ୍ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଧୂ-ଧୂ ମାଠେ । ପୃଥିବୀର ଆଯନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଠିନ ହବାର ପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୦୦ କୋଟି ବହର ସମ୍ପର୍କେ ତେମନ କିଛୁ ଜାନା ଯାଯ ନା । ପରେ ଉଷ୍ଣ ସାଗରଗୁଲୋତେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ଏ ଛିଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦିମ ଯୁଗୀୟ ଘଟନା । ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୟ ଏକ କୋଷୀ ଜୀବ, ତାରପର ଆସେ ସାଗର ଜଳେର ଶେଳୋ ଏବଂ ଅମେରଦୟୀ ପ୍ରାଣୀ । ସର୍ବପ୍ରାଥମିକ ମେରଦୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଦିମ ଯୁଗୀୟ ଧରନେର ଏକ ପ୍ରକାର ମାଛେର ଉନ୍ନେସ ଘଟତେ ସମୟ ଲାଗେ ତୃପରବର୍ତ୍ତୀ ଆରୋ ଏକଶ ମିଲିଯନ ବା ଦଶ କୋଟି ବହର । ଭୂମିତେ ଉତ୍ୱିଦ ଜୟାନୋ ଶୁରୁ ହଲେ ଅମେରଦୟୀ ପ୍ରାଣୀରାଓ ସେଖାନେ ହାନା ଦିତେ ଥାକେ ଏବଂ ସେଖାନେ ତାଦେର ସଂଖ୍ୟା

বাড়তে থাকে। জমিতে খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম এমন প্রাণীরা সংখ্যায় বেড়ে যায়। এভাবে জলজ প্রাণীদের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে।

এরই মধ্যে পৃথিবীপৃষ্ঠ ভেঙ্গে কয়েকটি ঠাণ্ডা, কঠিন এবং প্রায় একশো কিলোমিটার পুরু প্লেইটে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এস্থেনোক্ষেয়ার নামে এক উষ্ণ, অপেক্ষাকৃত প্লাস্টিক ধরনের অংশত গলিত অঞ্চলের উপর ভাসতে শুরু করে। পৃথিবী আজও সেই অবস্থায়ই আছে। এই খণ্ড বা চাকতিগুলোর আবরণ স্তরের সঞ্চালন গতি মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা তড়িত হয়ে ঘূরতে থাকে। এটি প্লেইট টেকটোনিক্স নামে পরিচিত। এ সময়ের মধ্যে এই গতিবেগ বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মহাদেশীয় চাকতিগুলোর মধ্যে সংবর্ধের কারণে বিশালায়তন ভাঁজ বিশিষ্ট পার্বত্যাঞ্চল গড়ে উঠে। আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটে সামুদ্রিক প্রাণীদের আধিপত্যের এবং সেই সাথে ইউরোপ ও এশিয়ায় উভৰ হয় সুউচ্চ পর্বতমালার।

পরবর্তী ১৪ কোটি বছরকে বলা যায় সরীসৃপের যুগ। এ সময়কালে সরীসৃপরা সংখ্যায় ও আকারে বড় হয়। পার্থী ও স্তনপায়ীদের তখন আবির্ভাব ঘটে, তবে তারা দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে যায়। অধিকাংশ সময়ে দৈত্যাকার সরীসৃপ ডাইনোসর ভূমিতে বসবাসকারী জীবজগতের উপর আধিপত্য চালায়। এ সময়কালে প্লেইট টেকটোনিক্স -এর কারণে রকি, আনিজ, পানামা শৈলশিরা পর্বতের আবির্ভাব ঘটে।

বিগত সাড়ে ছয় কোটি বছরে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৃদ্ধি ঘটে বিপুল সংখ্যায়। গত এক লক্ষ বছর ধরে মানব প্রজাতি পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। মহাদেশীয় প্লেইট টেকটোনিক্স-এর কারণে অভ্যন্তর ঘটে হিমালয় এবং আলপস পর্বতমালার। আর পৃথিবীর শক্তিশালী গতিবেগের কারণে মহাদেশসমূহ এবং সাগরগুলো বর্তমান আকার-আকৃতি গ্রহণ করে।

এতসব যুক্তি এটাই প্রমাণ করছে যে, একীভবন প্রক্রিয়ায় ডিউটারিয়াম নিউক্লিয়াস প্রধান সৃষ্টি বস্তু না হওয়ায় বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে (ভারী নিউক্লিয়াসমূহের বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াসকে এড়িয়ে চলা) পৃথিবীর সংশ্লেষণ ও সৃষ্টি কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা নয়। এগুলো মহাবিশ্বকে তার অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে এক মহাপরিকল্পনারই অংশমাত্র। উপরোক্ত যুক্তিগুলো আরো প্রমাণ করে কীভাবে দৃশ্যত ছোটখাট ব্যাপার মহাবিশ্বের সার্বিক মহাপরিকল্পনায় অত্যন্ত তরুণপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঢ়ায়। বস্তুত আঞ্চাহ্নাই মহাবিশ্বের মহাপরিকল্পক।

أَنْ فِي خَلْقِ النَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُلْخَلَافٌ لِلْبَلَدِ وَالنَّهَلَكِ؛ الْفَلَكُ الَّذِي تَجْهِيْنِ بِلِي  
الْعَيْرَ بِمَا يَنْتَهِيْنِ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ النَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَلَكِيْهَا يَهُوَ الْأَرْضُ  
يَعْدُ مَوْرِيْنَهَا وَبَعْثَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَارَتُوْهُ وَكُعْرُيْفُ التَّرْجِمَ وَالتَّحَابَ  
**السَّخَرَيْرُ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَبْيَ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ○**

২ : ১৬৪ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, যা  
মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল  
জলযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা  
ধরিবাকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার  
মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্মের ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত  
মেঘমালাতে জ্বানবান জাতির জন্য নির্দর্শন রয়েছে।

অত্র আয়াতে আল্লাহর বছবিধ নির্দর্শনের প্রতি বিশেষভাবে প্রজ্ঞাবান  
ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যেমন :

- ক. আসমান ও যমিনের সৃষ্টি;
  - খ. দিন ও রাতের প্রভেদ;
  - গ. মানব কল্যাণে সাগরবক্ষে যাতায়াতকারী জাহাজ;
  - ঘ. আল্লাহ আসমান থেকে যে বারিবর্ষণ করান, যা মৃত ধরিবাকে পুনর্জীবিত  
করে এবং তাতে সব রকমের জীবজন্মকে ছড়িয়ে দেন;
  - ঙ. বায়ুর (দিক) পরিবর্তন; এবং
  - চ. আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে (ভাসমান) অনুগত মেঘমালা।
- ক. আসমান ও যমিনের সৃষ্টি : পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির  
ব্যাপকভাবে গৃহীত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতে এবং  
পরিশিষ্ট-২ এ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে মহাবিশ্বের উদ্দেশ্যপূর্ণ  
সৃষ্টিতে আল্লাহর মহেন্দ্র সম্পর্কে চিন্তার উদ্বেক্ষকারী চিহ্ন বা নির্দর্শনের কথা  
আমরা বিস্তারিতভাবেই তুলে ধরেছি। মহাবিশ্বের অসংখ্য বন্ধ ও কাঠামোর মধ্যে  
রয়েছে একক ছায়াপথ থেকে শুরু করে সুবিশাল এমন সব শুচ্ছ যেগুলোর  
প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে প্রায় পাঁচ শত ছায়াপথ।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়েই আল্লাহ রাকবুল আলামিনের রহমতের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বজনীনভাবে ঝীকৃত ও গৃহীত ‘বিগ ব্যাঙ’ তথা ‘বজ্রনিনাদ’ মতবাদ বলছে যে, একটি ভীষণ ঘন, অতি উচ্চশি এবং অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র আদিম অগ্নিগোলকের অকস্মাত বিক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু। বিক্ষেপণের পর সৃষ্টির সর্বপ্রাথমিক পর্যায়ে মহাবিশ্বে ছিল ফোটন সাগরে নিমজ্জিত আঙ্গুত সব কণিকা আর প্রতি কণিকা। সম্পূর্ণসারণের হার যদি প্রকৃত হারের তুলনায় সামান্য কম বা বেশী হত, তাহলে তারকামণ্ডলী ও সৌরব্যবস্থা গড়ে উঠার বহু আগেই নক্ষত্রের বিক্ষেপণ ঘটে যেত। কিভাবে মহাবিশ্ব ৩০০০° কেলভিন তাপমাত্রার মত ঠাণ্ডা অবস্থায় নক্ষত্রের অভাস্তরে নিউক্লিয়াসের সংশ্লেষণের ফলে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে শুরু করে ভারী মৌলিক পদার্থ উৎপাদিত হয় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। একীভবন বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংঘটিত নিউক্লিয়াস সংশ্লেষণের এই প্রক্রিয়ায় বেরিলিয়াম উৎপাদন এড়িয়ে যায়। কেননা, অন্যথায় তারকা বিবর্তনের পথে না এগিয়ে নাক্ষত্র বিক্ষেপণ ঘটে যেত। নিউক্লিয়াস সংশ্লেষণের এই প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্বের যাত্রা ২৫%-৩০% ভাগ পদার্থ হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে রূপান্বিত হয়। যদি ঐ সময়ে মহাবিশ্বের সব ফোটন শোষিত হত, তাহলে কোন প্রহ-নক্ষত্র কিংবা সূর্যও থাকত না। কারণ এ সবের মধ্যকার আগবিক প্রক্রিয়া হাইড্রোজেনভিড্রিক। সৃষ্টির আদিতে সংঘটিত বিগব্যাঙ বা বজ্রনিনাদের ( $t_1$  সময় = ০) অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ দু'জন আমেরিকান পদার্থ বিজ্ঞানী ২.৭৬ ডিগ্রী কেলভিন হিসেবে শনাক্ত করে বিগ ব্যাঙ মতবাদের যথার্থতা ও সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন যা মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার (আয়াত ২১ : ৩০) সাথে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উইলসন ও পেন্জিয়াস কর্তৃক আবিষ্ট এই মহাজাগতিক ক্ষুদ্র তরঙ্গ, পচাত্তুমি বিকিরণ সত্যিই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে আল্লাহর অন্যতম নির্দেশন যা এই সৃষ্টি জগতের এক বিশ্বায়কর প্রমাণ উপস্থাপন করে।

পৃথিবী সৌরজগতের নয়টি বৃহৎ গ্রহের অন্যতম। বিশ্বয়ের সাথে লক্ষ্যণীয় যে, বিভিন্ন দূরত্বে সূর্যের চতুর্দিকে দুর্গায়মান অন্য সব গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যার মধ্যে জীবনের উন্নেষ্ট ঘটা ও সমৃদ্ধি লাভের অনুকূল অবস্থা বিরাজ করে। একমাত্র পৃথিবীই তাপমাত্রা নাতিশীলতাও, যে কারণে এখানে জীবনের ধারা চলমান থাকে। একমাত্র পৃথিবীতেই রয়েছে পানি, মানুষ, গাছপালা ও আণীসহ জীবনের অস্তিত্ব, বৃক্ষ ও উন্নয়নের জন্যে উপযোগী একটি ভারসাম্যপূর্ণ বায়ুমণ্ডল। আমাদের সৌর পরিবারের অন্য কোন গ্রহেই জীবনের জন্য অপরিহার্য ও আবশ্যিকীয় সকল অবস্থা ও শর্তাদি পাওয়া যায় না। বিপরীতপক্ষে, আমাদের পৃথিবী বাদে অন্যান্য গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে

ଜୀବନେର ବେଡ଼େ ଓଠା ଓ ଶ୍ଵାସତ୍ତ୍ଵର ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକର ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଏମୋନିଆ, ମିଥେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନାଇଡ୍ରୋଜେନ, ହିଲିୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ୟାସ ।

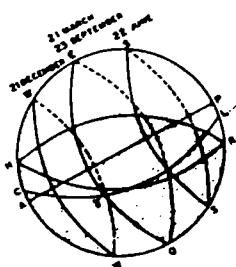
ଉପରୋକ୍ତ ସବଗୁଲୋ ଆଲୋଚନା ମହାବିଶ୍ୱ ଏବଂ ମନବ ବସତିର ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ନାମକ ପ୍ରତିକରିତ ସ୍ମିଟିତେ ମହାନ ଆହ୍ଲାହ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ସତର୍କ ପରିକଳ୍ପନା, କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଦକ୍ଷତା ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଙ୍କର ରେଖେହେନ ସେ କଥାଇ ଜୋରାଲୋଭାବେ ଓ ପଟ୍ଟୁତାର ସାଥେ ତୁଲେ ଧରଛେ । ବନ୍ତୁତ ଆଲ-କୁରାନେର ଘୋଷଣା ମତେ, ଏଗୁଲୋ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ବ୍ରାହ୍ମପ ।

ସ୍ଥିତି ଦିନ ଓ ରାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକି ଏଥାନେ ଆହ୍ଲାହ ଦିବାଭାଗ ଓ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସମୟେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତୁଲେ ଧରେହେନ । ଦିବାଭାଗ ହଞ୍ଚେ ସେଇ ସମୟ ସଥିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିକଚକ୍ରବାଲେର ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଆର ନୈଶକାଳ ହଞ୍ଚେ ସେଇ ସମୟ ସଥିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିକଚକ୍ରବାଲେର ନିଚେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ । ଦିବା ଓ ନୈଶକାଳୀନ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଞ୍ଚେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପାସ୍ଥିତି ଆର ଅନୁପାସ୍ଥିତି । ରାତ୍ରିର ଆଗମନେ କର୍ମତ୍ୟପରତାର ଧାରା ବଦଳେ ଯାଯ । ଦିନେର କର୍ମତ୍ୟପରତାଗୁଲୋ ଧୀର ହୁଏ ଆସେ ଆର ରାତରେ କର୍ମତ୍ୟପରତାର ଜନ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରକାରାଜିର ଆଲୋ ବେରିଯେ ପଡ଼େ । ଦିନେର ପ୍ରାଣୀଗୁଲୋ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ବକ୍ଷ କରେ ଆଶ୍ୟରେ ସନ୍ଧାନ ଶୁରୁ କରେ; ଅପରଦିକେ, ରାତରେ ପ୍ରାଣୀରା ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନେ ବେରିଯେ ଆସେ । ଦିନେ ପାଖିରା ନୀଡ଼େ ଫିରେ ଯାଯ, ଆର ରାତରେ ପାଖିରା ବେର ହୁଏ ପଡ଼େ । ପ୍ରଧାନତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଂସ ଥେକେ ଆଲୋ ଓ ତାପ ଆସା ବନ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଆଲୋ ଓ ତାପେର ଜନ୍ୟ କୃତିମ ଉଂସକେ କାଜେ ଲାଗାନେ ହୁଏ । ସବୁଜ ଗାଛପାଳା କର୍ତ୍ତକ ସାଲୋକ-ସଂପ୍ରେଷଣ ଥେମେ ଯାଯ ଏବଂ ଗାଛପାଳାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ନୃତ୍ୟ ଧରିବି କର୍ମତ୍ୟପରତା ଶୁରୁ ହୁଏ । ସାଗର ସମୀରଣ ଦିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଏଭାବେ ଦେଖା ଯାଛେ, ଦିବସେର ଅବସାନେ ଏବଂ ରାତରେ ଆଗମନେ ସମ୍ପଦ କର୍ମତ୍ୟପରତାର ଧାରାଇ ପରିବର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଯାଯ ।

ଦିବାଭାଗ ଓ ରଜନୀକାଳେର ମଧ୍ୟେ ଦୀର୍ଘତାର ଦିକ ଦିଯେଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଛେ । ଶ୍ଵାନ-କାଳ ଭେଦେ ଦିନ ଓ ରାତରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେ ଘଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଅଂଶେ ଏବଂ ବହରେର ଦିନଭେଦେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ମିତ ହୁଏ ।

ପୃଥିବୀର ରହେଛେ ଦୁଃଧରନେର ଗତି : ୧) ନିଜ ଅକ୍ଷେର ଚାରଦିକେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନେର ଆହିକ ଗତି, ଏବଂ ୨) ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁର୍ଦିକେର କଞ୍ଚପଥେ ପରିତ୍ରମନେର ବାର୍ଷିକ ଗତି । ଏହି ବାର୍ଷିକ ଅକ୍ଷୀଯ ଗତିର କାରଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହରେର ବିଭିନ୍ନ ଦିନେ ପୃଥିବୀର ଆକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାନ ପ୍ରହଗ କରେ ବଲେ ମନେ ହୁଏ । ପୃଥିବୀର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ କିଂବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟତ ବାର୍ଷିକ ପରିତ୍ରମ ପଥ-ଏକ ବିଶାଳ ବୃତ୍ତ, ଯା କ୍ରାନ୍ତିବୃତ୍ତ ନାମେ ପରିଚିତ । ଆବାର ପୃଥିବୀର ନିଜ ଅକ୍ଷେର ଚାରଦିକେ ଆହିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକମଙ୍ଗଳୀ ଗତିର କାରଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିରକ୍ଷ ରେଖାର (ଗଗନ କ୍ଷେତ୍ରେର ସାଥେ ନିରକ୍ଷ ରେଖାର ଛେଦ ତଳେର ବିଶାଳ

বৃত্ত) সমান্তরাল ছোট ছোট বৃত্তাকারে যোরে বলে মনে হয়। এই সব ক্ষুদ্র বৃত্তের আকার এবং আকাশে সূর্যের আপাত অবস্থান (জ্ঞানিবৃত্ত) তথা বছরের বিশেষ দিনের উপর নির্ভর করে। এ সকল ছোট ছোট বৃত্ত দিগ্বলয়কে অসমান অংশে ছেদ করে (চিত্র-১)।



চিত্র-১ অয়ন ও বিশুব

$HR$  = দিগ্বলয়,  $EQ$  = গাগনিক নিরক্ষরেখা

$CL$  = জ্ঞানিবৃত্ত,  $P$  = মেরু,  $PA$  = মেরু অক্ষরেখা,

$SS$  = শীতকালীন অয়ন,  $WW$  = শীতকালীন অয়ন, কৃষ্ণাত অংশ = দিগ্বলয়ের নিম্নাংশ।

বিভিন্ন স্থানে দিগ্বলয় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কাজেই ক্ষুদ্র বলয়ের অংশের দৈর্ঘ্য যার উপর দিগ্বলয়ের উপরিভাগে সূর্য থাকে বলে মনে হয় (অর্থাৎ দিবাভাগের দৈর্ঘ্য) দিগ্বলয়ের নিচের অংশ থেকে ডিন্দু (অর্থাৎ নৈশকালীন সময়)। আর এইসব দৈর্ঘ্য পৃথিবী পৃষ্ঠের অংশ এবং বছরের দিনের (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ) উপর নির্ভর করে। মরু অঞ্চলে সূর্য ৬ মাস দিগ্বলয়ের উপরে আর বাকী ৬ মাস দিগ্বলয়ের নিচে অবস্থান করে।

প্রতি বছর দু'টো দিন আছে যখন দিবাভাগ আর নৈশকালীন সময়ের দৈর্ঘ্য সমান থাকে। কর্কট জ্ঞানি ও মকর জ্ঞানি নামে দুই বৃহৎ বৃত্ত বিশুবীয় বিন্দু নামে দু'টি বিন্দুতে প্রস্তৱকে ছেদ করে। সূর্য এ দুই বিন্দুতে অবস্থান করে যথাক্রমে ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে। তাই, এই দুইদিন সূর্য গাগনিক নিরক্ষরেখা বরাবর অবস্থান করে বলে মনে হয় এবং এর দৈনন্দিন পরিক্রমণ পথ (যা সব সময় গাগনিক নিরক্ষরেখার সমান্তরাল হয়ে থাকে) হয় গাগনিক নিরক্ষরেখাই। আর দিবাভাগে সূর্য দিক্তচক্রবালের উপরে গাগনিক

নিরক্ষরেখার অংশে অবস্থান করে আর রাতে অবস্থান করে দিকচক্রবালের নিচে। কিন্তু গাগনিক নিরক্ষরেখা এবং দিকচক্রবাল বিশাল বৃক্ষ পরম্পরকে ছেদ করে। কাজেই দিকচক্রবালের উপরে গাগনিক নিরক্ষরেখার অংশ নিচের অংশের সমান। সে কারণে এই দু'দিন দিবাভাগ আর রাতের দৈর্ঘ্য সমান।

দিবাভাগ এবং নৈশকালীন সময়ের আরেক ধরনের পরিবর্তন আছে যা সাময়িক। যে কোন সময়ে দিবাভাগের পরেই আসে রাত্রি, আবার রাতের পরেই আসে দিন। আর এই সাময়িক পরিবর্তন চলতেই থাকে।

পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে এর আঙ্কিক গতিই সাময়িক পরিবর্তনের কারণ তথা আঙ্কিক গতিই পর্যায়ক্রমে দিন ও রাতের আগমন ঘটায়। ঘূর্ণযামান পৃথিবীর উপরে অবস্থান করি বলেই আমরা এই গতির কথা ভূলে যাই। আর ধারণা করি, সূর্যই বুঝি ঘূরছে। পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের এই আপাত ঘূর্ণনকালে সূর্য পালাক্রমে দিকচক্রবালের উপরে ও নিচে অবস্থান করে। এইভাবে পালাক্রমে সূর্যের দিকচক্রবালের উপরে ও নিচে অবস্থান অর্থাৎ সূর্যের আপাত ঘূর্ণন হিসেবে দৃশ্যমান দিন ও রাতের আবির্ভাব (পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন) চলতে থাকে।

এই সাময়িক পরিবর্তনকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে, পৃথিবী সূর্যকে এক স্থানে স্থির রাখে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে এর প্রতিটি বিন্দুই সূর্যের দিকে প্রতিভাত হয় এবং কিছুক্ষণের জন্যে সে অবস্থায়ই থাকে। আবার পৃথিবীর বক্রতলের কারণে ঐ বিন্দু সূর্যের আড়ালে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ সে অবস্থায়ই থাকে। যে সময় ধরে কোন স্থান সূর্যের দিকে প্রতিভাত অবস্থায় থাকে সেটাই ঐ স্থানের দিবা ভাগ এবং যে সময়ের জন্য স্থানটি সূর্যের আড়ালে থাকে সেটাই স্থানটির নৈশকাল। এভাবে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে দিন ও রাতের সাময়িক পরিবর্তনও চলতে থাকে।

সূর্যের নিজের গতি থাকলেও কোন স্থানে দিবাভাগ এবং নৈশকালের উপর সূর্য কোন প্রভাব ফেলে না। কেননা সূর্য যেখানেই থাকুক না কেন, এটি সবসময়ই একই ভাবে তার ভাপ ও আলো বিকিরণ করে থাকে। দিন ও রাতের এ সকল পরিবর্তনের মধ্যে প্রজ্ঞাবানদের চিন্তার জন্য নির্দর্শন রয়েছে।

গ. মানব কল্যাণে সাগরে চলাচলকারী জাহাজ ও আয়াতের এ অংশটুকু সাগর বা নদীপথে চলাচলকারী জাহাজ বা নৌকার বিষয় ভূলে ধরছে যার দ্বারা মানুষ উপকার পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ নানাভাবে এ অংশের ব্যাখ্যা করেছেন। এ সকল ভিন্নতর ব্যাখ্যার মধ্যে তেমন সাংঘাতিক কিছু না থাকলেও এগুলোর মধ্যে দিয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ফুটে উঠে।

যাহোক আয়াতটির এ অংশে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। যথা- এক. নদী/সাগর বক্ষে নৌকা বা জাহাজের চলাচল, এবং দুই. এ থেকে প্রাণ সুবিধা বা উপকার। জাহাজ বা নৌকার চলাচলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলো হচ্ছে : ১. পানিতে ভেসে থাকা; ২. চলাচল করা; ৩. সাগর-মহাসাগরের বিশালতায় দিক খুঁজে পাওয়া।

এটা সুবিদিত যে, বিশ্বব্যাপী ভিত্তিন্মূল ধরনের জাহাজ/ নৌকা ছিল বা আছে। প্রাচীনকালে সাগরবক্ষে চলাচলকারী অর্থাৎ সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবহার করত ফিনিশীয়, মিসরীয়, গ্রীক, রোমক, চীনা, স্ক্যানডিনেভীয়রা। দাঁড়, পাল কিংবা উভয়টি দ্বারা এগুলো চালিত হত। সাধারণভাবে নৌকা হিসেবে পরিচিত ছোট খোলা জলযান পাল, দাঁড়, দীর্ঘ দঙ্গ, বৈঠা প্রভৃতি দ্বারা চালিত হত এবং এখনও হয়। আরবীয় তরণী ঢাও এবং চীনা তরণী জাংক-এর মত কিছু কিছু জলযান সাগরেও চলত। এখনও চলে। এসব জাহাজ/ নৌকার সবই ছিল কাঠের তৈরী।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে পালতোলা জাহাজের স্থান দখল করে বাস্পীয় জাহাজ। আর এ শতকেরই পরবর্তীকালে কাঠকে হটিয়ে দিয়ে ইস্পাত তার স্থান করে নেয়।

আল-কুরআন স্থান, কাল কিংবা আকার-আকৃতি বা ধরনের উল্লেখ না করেই সাধারণ পরিভাষায় সাগরে নৌকা বা জাহাজের উল্লেখ করেছে।

নদী বা সাগরে নৌকা বা জাহাজের চলাচল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতার উপর। যে অদ্ভুত গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন ভারী বস্তুর বিশেষ একটা আকৃতি দান করা হলে কোন হাল্কা মাধ্যমে ভাসতে পারে তাকে বলা হয় প্লাবতা, অর্থাৎ কোন অঘনীভূত বস্তু তথা তরল ও গ্যাসের ভিতর আংশিক কিংবা পূর্ণ নিমজ্জিত কোন বস্তুর উপর ঐ অঘনীভূত বস্তুর উর্ধ্মরূপী চাপ কিংবা উপরের দিকে ঠেলা দিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরার ক্ষমতা। অঘনীভূত বস্তু তথা তরল ও গ্যাসের এই আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ধর্মের কারণেই আমরা পানিতে নৌকা বা জাহাজকে ভাসতে দেখি। যতদূর জানা যায় গ্রীক দার্শনিক আর্কিমিডিস প্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সর্বপ্রথম অঘনীভূত বস্তুর এই ধর্মের ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, প্লাবতা বা প্লাবমান শক্তি কোন ভাসমান বস্তুর ওজনের সমান, আর এই ওজন আবার ঐ বস্তুর নিমজ্জিত অংশ দ্বারা অপসারিত অঘনীভূত বস্তুর ওজনের সমান। এটিই আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত।

বিজ্ঞানীদের মতে, প্লাবমান শক্তিসমূহ বস্তুর নিমজ্জিত অংশের সর্বত্র সর্বতলে সমকোণে ধাক্কা মেরে বস্তুটিকে তরল পদার্থের বাইরে নিয়ে যেতে চায়। এদেরকে সমন্বিতভাবে একটি উর্ধ্মরূপী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায় যা

অপসারিত তরল পদার্থের ভরের কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে কাজ করে। এই স্থানটি পুরুতার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। পুরুতার এই কেন্দ্রটি আবার বস্তুর পানিতে নিমজ্জিতমান অংশের আকৃতির উপর নির্ভর করে এবং তা পানি অপসারণের মাধ্যমে জলযগ্ন বস্তুটি যে গভীরতায় নিমজ্জিত হয় তার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এই অপসারণের পরিমাণ আবার নির্ভর করবে বস্তুটির আকার বা আকৃতির উপর এবং গঠনাকৃতির<sup>২</sup> উপর ভিত্তি করে জাহাজ বিভিন্ন গভীরতায় ডামে।

জাহাজের কাঠামোর উপর বিভিন্ন বল কাজ করে। এদের কতকগুলো স্থির প্রকৃতির আবার কতকগুলো গতিশীল। জাহাজ জুড়ে ওজন আর উল্লম্বের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটে, তার কারণে কাজ করে স্থির বল আর জাহাজের উপর পানির ধাক্কা, জাহাজ বরাবর ঢেউ বয়ে যাওয়া এবং ঘূর্ণায়মান বা চলমান ঘন্টাংশ দ্বারা সৃষ্টি হয় গতিশীল বল।<sup>৩</sup> ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে সামনে অগ্নসর হওয়ার সময় পুরুতার বন্টনের পার্থক্যের কারণে বক্র গতিতে পার্থক্য হয়। সর্বাধিক পার্থক্য ঘটে তখন, যখন জাহাজ এমন ঢেউয়ের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে যার শীর্ষ থেকে শীর্ষের দৈর্ঘ্য জাহাজটির দৈর্ঘ্যের সমান।<sup>৪</sup>

বিশেষত জাহাজের ডিজাইনে ভাসমানতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে স্থিতিশীলতার স্তর যা সমান। পুরুতার বল যদি অভিকর্ষের কেন্দ্র বরাবর কাজ করে, তাহলে বস্তুটি থাকবে ভারসাম্যপূর্ণ বা সমভার অবস্থায়। তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত কোন কঠিন বস্তু ততটা দ্রুত স্থিতিশীল সমভার অবস্থায় আসে না। কেননা তরল পদার্থের সামান্য সংক্ষেপণসাধ্যতা বস্তুর অভ্যন্তরীণ ছিদ্রস্থ উচ্চ সংক্ষেপণসাধিত গ্যাসের উপস্থিতি অথবা এর সাথে লেগে থাকা বুদবুদের ভিতরকার উচ্চ সংক্ষেপণসাধ্য গ্যাসের উপস্থিতি এবং বস্তুটি ও তরল পদার্থের লক্ষণীয় সম্প্রসারণ গুণকরমযুক্ত বস্তুটিকে দ্রুত এ অবস্থায় আসতে দেয় না। অবশ্য, যদি তরল পদার্থটির তুলনায় বস্তুর গড় ঘনত্ব কম হয়, তবে এটি আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় পানিতে ভাসবে। আকিমিডিসের সূত্র অনুযায়ী উল্লম্বের তুলনায় বস্তুটির ভাসমানতার স্তর ও অবস্থান নির্ধারিত হবে। মেটাসেন্টার নামে জাহাজের একটা বিন্দু আছে যার অবস্থান কেন্দ্রের উপরে থাকে। এই বিন্দুটি অবশ্যই অভিকর্ষ কেন্দ্রের উপর থাকবে, কেননা তাতে এতদুভয় জাহাজটিকে স্থানাবিক অবস্থানে রাখতে চায়। আর যদি এটা নিচে হয়, তাহলে জাহাজটি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং ডুবে যায়। কাজেই অভিকর্ষ কেন্দ্রের উপরে মেটাসেন্টারের উচ্চতাই (মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা) একটি নির্দিষ্ট উল্লম্বতলে স্থিতিশীলতার মাপ।<sup>৫</sup>

আগেই বলা হয়েছে, নদী বা সাগরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নৌকা/ জাহাজ চালানো হত। শত শত বছর ধরে সাগরে জাহাজ চলত দাঁড়ের সাহায্যে, আর পালে আটকানো বাতাসে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে সমুদ্রযাত্রায় সফলভাবে বাষ্প শক্তিকে প্রয়োগ করা হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পরেই আসে টারবাইন অর্থাৎ বাষ্পীয় ঘূর্ণন যন্ত্র। সামুদ্রিক জাহাজে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহারের আগে এই উভয় প্রকার শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৭০ -এর দশকে আণবিক শক্তি ব্যবহারের পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়।

সাগরে চলাচল করতে গিয়ে নাবিকেরা সচরাচর যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলো গন্তব্যে পৌছার জন্য সঠিক দিক কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে। যতদূর জানা যায়, আচীনকালে নাবিকরা সূর্য আর তারকার উপর ভিত্তি করে দিক নির্ণয় করত। আরব নাবিকরা ভারত মহাসাগরে চলাচলের ক্ষেত্রে তাদের পথের নিশানা খুঁজে পাওয়ার জন্য অনেকটা উন্নত কৌশল উন্নাবন করে, যেমনটি তারা করত শত শত বছর ধরে মরুভূমিতে চলাচলের ক্ষেত্রে। সমতল ভূমিতে স্বল্প দূরত্বে চলাচলে তেমন একটা অসুবিধা না থাকলেও দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর আকার ও আকৃতি নাবিকদের মহাসংকটে ফেলে দেয়। ফলে, তারা অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ইত্যাদি বিষয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটায়। পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে যে কোন দুটি বিন্দুর মধ্যে স্বল্পতম দূরত্ব বলতে এই দুই বিন্দুর মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া বিশাল বৃত্তের বৃত্তাপকে বুঝায়। নাবিকরা তাদের ছেড়ে যাওয়া নৌবন্দর আর তাদের গন্তব্যের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া মহাবৃত্তকে অনুসরণ করে। নাবিকদেরকে তাদের গন্তব্য পথের দিক নির্দেশনা আঁকার ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য ছক, মানচিত্র, নকশা ইত্যাদি তৈরি করা হয় যাতে অনেক হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন। নৌযুদ্ধের কথা বলাই বাহ্য। দূরবর্তী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য এবং সমুদ্রপথে পৃথিবীকে জানার জন্য ভ্রমণ করতে গিয়ে উন্নত সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান গড়ে উঠার পক্ষে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। আরেকটা শুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে যা নাবিকদের মোকাবেলা করতে হত তা হলো সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার স্রোত কীভাবে উন্নত উপায়ে আগে থেকে অনুমান করা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পানি শক্তি বিজ্ঞান এ সমস্যার সমাধান করে দেয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান তত্ত্বের সাথে স্রোত পরিমাপের সুবিজ্ঞ সমবয়ের মাধ্যমে ব্যবহারিক স্রোত-ছক বানাতে হয়। অনুমানের সর্বাধিক সঠিক পদ্ধতি নির্ভর করে সমৰয়পূর্ণ বিশ্লেষণের উপর যাতে চান্দ দিবস, সৌর দিবস, চন্দ্র ও সূর্যের ক্রমান্বয়ে অবস্থান পরিবর্তনের পার্থক্য ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়।

বর্তমান শতকের অর্থাৎ বিংশ শতকের, (কেননা এত্ত্বানি বিংশ শতাব্দীতে লেখা- অনুবাদক) প্রথমার্ধে এসে নৌবিজ্ঞানের পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটে।

୧୯୩୯-୪୫ ସାଲେ ପ୍ରାୟ ସବ ବିମାନ ଓ ଜାହାଜଙ୍କ ତାଦେର ପଥ ବୁଝେ ନିତ କମ୍ପ୍ସାସେର ସାହାଯ୍ୟେ, ମାନଚିତ୍ର ଦେଖେ, ଏବଂ ସାଗରର ଉପର ଦିଯେ ସୁନୀର୍ଦ୍ଦ ଆକାଶପଥେ ଚଳାଚଳକାଳେ ମାଝେ ମାଝେ ବେତାର ସଂବାଦ ଥିଲେ । ରାଡାର ଆବିଜ୍ଞାରେ ଫଳେ ନାବିକେର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଗେଲ ବେଢେ । କାରଣ, ଏତେ ସେ ଦେଖିତେ ପେତ କୁଯାଶାର ଭେତରେ କିଂବା ରାତରେ ଅନ୍ଧକାରେ ଠିକ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକ ଯତ୍ନା ସେ ଦେଖିତ ପରିକାର ଦିନେ । ସନ୍ତରେ ଦଶକ ଥେକେ ଆସେ ଆରେକ ନୃତ୍ୟ ବ୍ୟାବସ୍ଥା । ଏତେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦିକ୍ଷଣକାରୀ ଉପରହ ଥେକେ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟଟାରେ ସାହାଯ୍ୟେ ଜାହାଜେର ଅବସ୍ଥାନ ହିସେବ କରେ ବେର କରା ଯାଏ ।

ଘ. ଆଲ୍‌କୁରାନ୍ ଆସମାନଙ୍କ ଯା ଥେକେ ବୃକ୍ଷି ବର୍ଷଣ କରାନ ଏବଂ ମୃତ ଧରିଦୀକେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରେନ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସବରକମ ଜୀବଜ୍ଞତ୍ବ ଛଡ଼ିଯେ ଦେନ : ଅତି ଆୟାତେ ପାନି ବଲତେ ଆକାଶେ ଭାସମାନ ମେଘେର ମଧ୍ୟକାର ପାନିକେ ବୁଝାନ ହେଁବେ । ବୃକ୍ଷିର ଫୋଟାର ସୃଷ୍ଟି ହେଁଯା ଏବଂ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠେ ବୃକ୍ଷିପାତ ହେଁଯାର ମେଘେ ଆଲ୍‌କୁରାନ୍ କର୍ତ୍ତକ ସୃଷ୍ଟି ବେଶ କରେକିଟି ଶକ୍ତି ତ୍ରିଯାଶୀଳ ।

ମେଘ ହେଁଜେ କୁନ୍ଦ କୁନ୍ଦ ଫୋଟାର ଆକାରେ ଆକାଶେ ଭାସମାନ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଓ ଘନୀଭୂତ ବାପ୍ପେର ନାମ । ଏବଂ କୁନ୍ଦ କୁନ୍ଦ ଫୋଟା ବାତାସେର ଉର୍ଧ୍ଵମୁଖୀ ଓ ନିମ୍ନମୁଖୀ ପ୍ରବାହେର ଧାକ୍କାଯ ମେଘେର ଅଭ୍ୟାସରେ ଉଠାନାମା କରେ । ନିମ୍ନମୁଖୀ ପ୍ରବାହକାଳେ ବଡ଼ ଫୋଟାଗୁଲୋ ଦ୍ରୁତର ବେଗେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଛୋଟ ଫୋଟାଗୁଲୋର ସାଥେ ଧାକ୍କା ଥାଏ ଓ ତାଦେର ସାଥେ ମିଳେ ଗିଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାରେ ଓ ଓଜନେ ବୁନ୍ଦି ପାଏ । ଶେଷେ ଫୋଟାଗୁଲୋ ଏତ ଭାରୀ ହେଁଯ ଯେ, ଉର୍ଧ୍ଵମୁଖୀ ପ୍ରବାହେର ସାଥେ ଉପରେ ନା ଉଠେ ବରଂ ବୃକ୍ଷିର ଫୋଟାର ଆକାରେ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେଁଯ ।

ଆରେକଭାବେତେ ବୃକ୍ଷିର ସୃଷ୍ଟି ହତେ ପାରେ । ମେଘେର ଉପରେର ଠାତା ଅଂଶେର ଫୋଟାଗୁଲୋ ଜମେ ଗିଯେ ବରକେର କ୍ଷଟିକେ ପରିଣିତ ହେଁଯ । ଏ ଧରନେର କରେକଟି କ୍ଷଟିକ ଏକସାଥେ ମିଲିତ ହେଁଯ ତୁଷାର ଫଳକ ଗଠନ କରେ । ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାରୀ ହେଁଯାର ତୁଷାର ଫଳକ ମେଘେର ଭିତର ଦିଯେ ନିଚେ ପଡ଼େ ଯାଏ ଏବଂ ନିଚେର ଉର୍ଧ୍ଵ ବାତାସେର ଭିତର ଦିଯେ ପଡ଼େ ପଡ଼ିତେ ପଡ଼ିତେ ଗଲାତେ ଥାକେ । ଅବଶେଷେ ମାଟିତେ ପୌଛେ ଯାଏ ବୃକ୍ଷିର ଫୋଟାର ଆକାରେ ।

ବୃକ୍ଷିପାତ କିଂବା ଶିଲାପାତେର ଆରୋ ଦୁ'ଟି ପଦ୍ଧତି ଆଛେ, ଯଥା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାଢ଼ ବିଷୟକ ଏବଂ ପରିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ଧତି । ଏକଟି ଉର୍ଧ୍ଵ ବାୟୁପ୍ରବାହ ଆର ଏକଟି ଠାତା ବାୟୁପ୍ରବାହ ଯଥନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାଢ଼ ଦ୍ୱାରା ଏକଟା ସମ୍ପ୍ରଦାରିତ କ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ରମଶ ଏକନ୍ତିତ ହେଁଯ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ସଂଚରେ ଆସେ, ତଥନ ଏର ଫଳେ ତାପମାତ୍ରା କମେ ଯେତେ ପାରେ ଏବଂ ଅବଶେଷେ ବୃକ୍ଷି ବା ଶିଲାପାତ ହେଁଯ । ପରିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ଧତିତେ କୋନ ଏଲାକାର ବାୟୁ ଯଦି ଉପରେର ଦିକେ ଉଠେ ଯାଏ ଏବଂ ପରିତେ ମତ କୋନ ବାଧାର ସୟୁଥୀନ ହେଁଯ ତଥନ ବୃକ୍ଷିପାତ ଘଟିତେ ପାରେ ।

এখানে উল্লেখ্য যে, আসমান থেকে পতিত হওয়া বৃষ্টির ফোটা নাইট্রোজেনের অক্সাইড মাটিতে বহন করে নিয়ে আসে। এই সকল অক্সাইড আবার তৈরি হয় বিজলী চমকানোর কারণে। নাইট্রোজেন অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে নাইট্রিক ও নাইট্রাস এসিডের মিশ্রণ তৈরি করে। সাধারণত সবুজ গাছপালা আমিষ ও অন্যান্য বস্তু তৈরির জন্য এই নাইট্রোজেন (নাইট্রেট আকারে) মাটি থেকে শোষণ করে নেয়।

আগ্রহ কর্তৃক আকাশ থেকে যে পানি বর্ষিত হয় তা দিয়ে বেশ কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে যা নিম্নোক্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় : ক- মৃত ধরিত্রীর পুনরজীবন ও খ- সকল প্রকার জীবজন্তুর বংশ বিস্তার।

ক. মৃত ধরিত্রী অর্থ বিরামহীনভাবে পানি সরবরাহের অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট খরার ফলে গাছ-পালা তরুলতা শস্য ফসলাদির আবাদবিহীন ভূমি। পৃথিবীর জীবন ফিরে আসার অর্থ বৃষ্টি পরবর্তী পৃথিবীতে সংঘটিত সকল ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন। এ সকল পরিবর্তনের ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম হয়, গাছ-পালা বেড়ে ওঠে এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। বৃষ্টির পানির প্রাপ্ত্য মাটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : পি এইচ (pH-হাইড্রোজেন কনিকার কেন্দ্রীভবন), মাটির কার্যক্রম, গাছ-পালা ও জীবজন্তু, মাটির গঠন, আকৃতি এবং বন্ধনবৃলতা যার উপর নির্ভর করে বীজের অঙ্কুরোদগম এবং বীজ মূলের মাটির ভিতরে প্রবেশের উপযোগী বা অনুকূল মৃত্তিকা পরিবেশ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি অন্যতম মৌলিক উপাদান যা পৃথিবীকে আবাদি রূপ দেয় তা হচ্ছে পানি। বিশ্বের বৃষ্টিপাতের রেকর্ড অত্যন্ত বিস্তৃত এক সীমার মধ্যে উঠানামা করে বা এর কমবেশী হয়। আর্দ্র অঞ্চলগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাত হয় এবং এসব এলাকা সবুজ গাছ-পালার আবাদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে পৃথিবীর মরুভূমিগুলোতে বৃষ্টিপাত বিক্ষিণ্ণ ও পাতলা এবং বছরের পর বছর বৃষ্টিহীনতায় সেখানে দীর্ঘ খরা দেখা দেয়। বর্ষণের উপস্থিতিতে বিরান বালুময় এলাকায় দীঘনিদের ঘূষন্ত বা সুষ্ঠ বীজে অঙ্কুরোদগম হয়, ডালপালা, পত্র পত্রব মুকুলিত ও পুষ্পিত হয় এবং নতুন বীজ উৎপাদন করে যা মাটিতে সুষ্ঠ অবস্থায় থাকে পরবর্তী বৃষ্টিপাতের আগ পর্যন্ত। এভাবে প্রাণ ফিরে পায় মরুময় পৃথিবী। দ্রুত, শক্ত আবরণ থাকায় বীজ দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং বেড়ে উঠার মত বাইরের সঠিক ও উপযুক্ত পরিস্থিতি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। মাটি থেকে শোষণ প্রক্রিয়ায় বীজ তার আবরণের মাধ্যমে পানি শুষে নেয় এবং তার প্রাণশক্তিকে পুনঃ সংজীবিত ও সক্রিয় করে। শ্বসনক্রিয়া দ্রুত

ବୃଦ୍ଧି ପାଯ ଏବଂ ବିଯୋଜନ ଓ ଶ୍ଵସନ ଏନଜାଇମେର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସତ୍ରିଯକରଣେର ଫଳେ ସଂଖିତ ଖାଦ୍ୟ ସରବରାହ ବେଡ଼େ ଯାଏ । ବୀଜେର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଜାଟିଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନସମୂହ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବେରିଯେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଭ୍ରଗେର କୋଷଗୁଲୋ କ୍ଷୀତ ଓ ବିଭକ୍ତ ହତେ ଶୁରୁ କରେ । ନତୁନ ଅକ୍ଷୁରିତ ଚାରାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି ହଛେ ସଦ୍ୟ ଗଜାନୋ ମୂଳ ଯା ମାଟିତେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ପାନିର ଜନ୍ୟ ମାଟିର ଭିତରେ ଢୁକେ ଯାଏ । ବୃଦ୍ଧିର ପାନିର ତ୍ରୈପରତାୟ କ୍ଷୟିଙ୍କୁ ଆବାଦି ମାଟିର ଉପରେ ଏକଟା ନତୁନ ତ୍ରୈ ଗଠନ କରେ ଯାତେ ଥାକେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେ ପାନି ସହ୍ୟୋଗେ ଉଚ୍ଚ ମାନେର ଉପକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍ତିଦେର ପୁଣି ଉପଦାନ ଯା ଗାହେର ଶିକ୍ଷ୍ମ ଦାରା ଶୋଭିତ ହେଁ ଥାକେ । ମାଟିତେ ପାନିର ଅଭାବ ହୁଲେ ଅକ୍ଷୁରୋଦଶ୍ୟ ଧୀରଗତି ଲାଭ କରତେ କିଂବା ବାଧାଗ୍ରହଣ ହତେ ପାରେ, ଯା ନିର୍ଭର କରେ ବୀଜ ଏବଂ ଚାର ପାଶେ ଭେଜୋ ମାଟିର କଣାର ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗେର ମାତ୍ରାର ଉପର । ଯେବେ ଉତ୍ତିଦେର ପୁନରୁତ୍ୱଜୀବନ ବୀଜ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମେ ଘଟେ, ଯେମନଟି ଘଟେ ଥାକେ କିଛୁ କିଛୁ ଘାସେର କ୍ଷେତ୍ରେ, ତାଦେର ଡୁଗର୍ତ୍ତରୁ ଦ୍ୱାରୀ ଅପାଇ ବୀଜେର ଭୂମିକା ପାଲନ କରେ ଥାକେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ପରେ ଠିକ ସେଭାବେଇ କାଜ କରେ ଯେମନଟି କରେ ଥାକେ ବୀଜ ।

ମାଟିର ଉପରେ ତ୍ରୈ ବୃଦ୍ଧିର ଫୌଟୋଟାର ପତନେର ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବେଓ କିଛୁ କିଛୁ ବିକ୍ଷନ୍ଦ ବା ଉତ୍ୱେଜିତ ବୀଜ ମାଟିର ଉପରେ ତ୍ରୈ ଚଲେ ଆସନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଏଥାନେ ପ୍ରଚାର ଅଭ୍ୟାସିନ୍ ପେଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅକ୍ଷୁରୋଦଶ୍ୟ ଶୁରୁ କରେ । ଏଭାବେ ଭାରୀ ବର୍ଷଣ ଏବଂ ଅର୍ଥେ ବୀଜେର ସ୍ଥିର ଭାଗ୍ୟ ଯା ଅନାବୃତିକାଲୀନ ଲୁମ୍ବେ ସୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ହିଲ । ଫଳେ, ଏତଦିନକାର ବିଶ୍ଵକ, ଅନୁର୍ବର ମାଟିତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଚାରାଗାହ ଗଜିଯେ ଉଠେ ।

୩. ମାଟିର ଉପର ବାରିପାତ ଏବଂ ଫଳତ ଉତ୍ୱିଦ ଜଗତେର ପୁନରୁତ୍ୱଜୀବନେର ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ ପାଣୀର ଜୈବିକ କର୍ମତ୍ରୈପରତାର ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଯେହେ । ବୀଜେର ଅକ୍ଷୁରୋଦଶ୍ୟରେ ପାଶାପାଶି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡିମ ଓ ଗୁଟି ଫେଟେ ଯାଏ ଏବଂ ବେର ହେଁ ଆସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟକ୍ତ ଗୁବରେ ପୋକା, ତିମରଳ, ପିପଡ଼ା, ଯି ଯି ପୋକା, ପଞ୍ଚପାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଛଢିଯେ ପଡ଼େ ତାଦେର ନିଜ ନିଜ ଶିକାରଭୂମିତେ । ଏଦେର ଜୀବନକୁଳ ଓ ସମାନ ହୁଏ ଶୀଘ୍ରଇ । ତବେ ଏରା ରେଖେ ଯାଏ ଡିମେର ନତୁନ ସରବରାହ ଯାତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନାବୃତି ଚଲାକାଳେ ତାଦେର ବଂଶଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ଥାକେ । ବୃଦ୍ଧିର ପାନିତେ ସଯଳାବ ହେଁ ଗେଲେ କ୍ଷଣଦ୍ୱାରୀ ଜାଲାଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯା କୋଳା ବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସୋନା ବ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ବହୁ ଧରନେର ଜଲଜ ପାଣୀର ଜନ୍ୟଦ୍ୱାନେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଅବଶେଷେ ଗାଛପାଲା ବଡ଼ ହେଁ ହୁଏ ଚଢାନ୍ତପର୍ବେ ବନ-ଜଙ୍ଗଳ ଗଡ଼େ ତୋଳେ, ଯା ପ୍ରକୃତିର ଜୀବଜ୍ଞତ୍ଵର ଜନ୍ୟେ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରେର ଭୂମିକା ପାଲନ କରେ । ଶିକାରି ପାଖିରୀ ଗାହେର ମଗଡ଼ାଳେ ବାସା ବାଧେ । ତାର ନିଚେଇ ଥାକେ ବାନରେରା ଆର ଉତ୍ୱଜ୍ଞଳ ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଖିର ଦଲ । ଭୂମିତେ ବାସ କରେ ପ୍ରାୟ ସକଳ ଚତୁର୍ବୀଦ ଜୀବଜ୍ଞତ୍ଵ ଓ ସବ ଧରନେର ସରୀସୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଚିତ୍ୟାବଧିଶହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଡାଳ ଜାତୀୟ ପଶ୍ଚାତ୍ରା ଭୂମି ଆର ନିଚୁ ଗାଛପାଲାର ମଧ୍ୟେ ଚଲାଫେରା କରେ । ଏ ସକଳ ଜୀବଜ୍ଞତ୍ଵର ସକଳେରଇ ବସନ୍ତ ତାଦେର ଆଲାଦା ଆଲାଦା ଜୀବନପଦ୍ଧତି ଓ ଶିକାରେ ଧରନେର ସାଥେ ବେଶ ମାନନ୍ତୁଇ ।

সকল প্রাণীই ‘খাদ্য ধারা’ নামে এক চিরস্তন নিয়মে তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। আর এ খাদ্য ধারা প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনকারী হিসেবে উদ্ভিদ দিয়েই শুরু হয়।

বৃষ্টির বর্ষণের সাথে অন্য আরেকটা ঘটনার যে ধারার সূচনা হয় তা হলো পাহাড় ও উপত্যকার পূর্ণ বর্ধনশীল সবুজ চারণভূমিতে পরিণত হওয়া। এতে বন্য তৃণভোজী প্রাণী সহ গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, হরিণ ইত্যাদি আকৃষ্ট হয়ে খাদ্যের সন্ধানে সেখানে দলে দলে স্থানান্তর করে। বিষয়টি অন্যান্য আরো বহু প্রকার লতাগুল্বভোজী প্রাণী এবং আদিমযুগীয় মানুষের বেলায় খাটে যারা তাদের খাদ্যের জন্য অংশত বনের গাছ-পালার উপর নির্ভর করত।

আবার বৃষ্টির ফলে ঝরণাগুলো পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে পাহাড় থেকে জলপ্রপাতের মত বেগে ধাবিত হয়ে নদীতে গিয়ে মিশে যায় এবং অবশেষে তাদের পথ পরিক্রমণ সাগরে গিয়ে সমাপ্ত হয়। বহু প্রকার মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর স্থানান্তরিত হয়ে উপযুক্ত প্রজনন ক্ষেত্রে চলে যাওয়া অন্যান্য কারণে পাশাপাশি নদীতে জলবিষয়ক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন জীবজন্ম প্রাণীজগতের ২৭টি গোত্রভুক্ত দশ লক্ষাধিক বর্গের (species) অঙ্গর্গত সকল প্রকার পশুর মধ্যে অল্প কয়েকটা দৃষ্টান্ত মাত্র।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বৃষ্টি থেকে শুরু করে মৃত (প্রায়) পৃথিবীর সবুজ আবাদে পুনরুজ্জীবন এবং এর সাথে সকল পশুর প্রতিবেশিক বিভাজনের সম্পর্ক-এসব কিছুই অনুপম স্রষ্টার অসীম প্রজ্ঞারই নির্দর্শন বিশেষ, যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি।

গ. বায়ুর পরিবর্তন : বায়ু প্রবাহের অর্থ প্রবহমান বা গতিশীল বাতাস, আর এই গতি সৃষ্টি হয় বায়ু চাপের পার্থক্যের ফলে। বাতাস উচ্চ থেকে নিম্ন বায়ুচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ু প্রবাহের গতি বায়ুচাপের পার্থক্যের মাত্রা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

স্থানের বিচারে বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনকে দু'ভাবে প্রকাশ করা যায় যথা-সাগরের বায়ু এবং ভূমি বায়ু। কোন কোন বায়ুপ্রবাহ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত যেমন ট্রেড উইন্ড।

সাগরের বায়ু : নিম্ন আপেক্ষিক তাপ এবং পানির চেয়ে অধিক শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভূখন্ড দ্বৰাভাগে সূর্যতাপে সাগরের তুলনায় অধিক উন্নত হয়। ফলে, সক্ষ্যার দিকে ভূমির উপরের বায়ু অধিক উন্নত হয়ে ওঠে এবং সাগরের উপরকার অপেক্ষাকৃত ঠাভা বাতাসের উচ্চ চাপে উপরের দিকে উঠে যায়। ঠাভা বাতাস সাগর থেকে ভূমির দিকে প্রবাহিত হলে তখন তাকেই বলা হয় সাগর বায়ু।

ভূমি বায়ু : ভূমি বায়ু উত্তম তাপ শোষক আবার উত্তম তাপ বিকিরকও বটে। রাত্রিবেলা সাগরের তুলনায় ভূমি অধিক তাপ হারায়। ভৃ-ভাগের তাপমাত্রা সাগরের তুলনায় নিচে নেমে গেলে ভূভাগের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাসের চাপ সাগর উপরিষ্ঠ উষ্ণতর তাপমাত্রার হালকা বাতাসকে তাড়া করে। কাজেই, এভাবে ভৃ-ভাগের উপরিষ্ঠ ঠাণ্ডা বাতাস সাগরের দিকে প্রবাহিত হলে একেই বলা হয় ভূমিবায়ু।

ট্রেড উইণ্ড বা ট্রেড বায়ু প্রবাহ : বিশুব রেখা বরাবর পৃথিবীগৃহের সর্বাধিক উত্তপ্ত অঞ্চল অবস্থিত। নিরক্ষীয় শান্ত বলয় নামক অত্র অঞ্চলের বায়ু এর দু'পাশের ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ এলাকার যা অক্ষ দ্রাঘিমাংশ নামে পরিচিত, বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ ও হালকা হওয়ায় অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাসের উচ্চ চাপের ধারায় উপরে উঠে যায়। উষ্ণ বায়ু উপরে উঠে গেলে উত্তর মেরু থেকে উচ্চ চাপ বিশিষ্ট অন্যান্য বায়ু প্রবাহিত হয়ে ঐ বায়ুর স্থান পূর্ণ করে। একে বলা হয় ‘পোলার ক্যাপ’ বা মেরু অঞ্চলীয় টুপি। এ সকল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, ভারী বায়ুর প্রবাহ উত্তর থেকে দক্ষিণে ধারিত হওয়ার কথা। কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে এ বাতাস উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বিশুব রেখার দিকে আর দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বিশুব রেখার দিকে প্রবাহিত হয়। এ সকল বায়ু প্রবাহকেই বলা হয় ট্রেড উইণ্ড।

বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনের বেশ কিছু উপকারিতা সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছি। বায়ু প্রবাহের সাথে তা ক- মেঘমালাকে বিভিন্ন স্থানে বয়ে নিয়ে যায় যার ফলে বিস্তৃত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়; খ- দূরিত বায়ু বয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেয় এবং তদন্ত্বলে তাজা ও বিশুদ্ধ বায়ু নিয়ে আসে; গ- পুষ্পরেণুকে পরাগধানী থেকে গর্তমুড়ে বহনের মাধ্যমে পরাগায়নে সাহায্য করে যা শেষ পর্যন্ত রধিত ফল উৎপাদন করে; এবং ঘ- বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রায় এক ধরনের ভারসাম্য আনে।

অধিকত্তু, বায়ুপ্রবাহের মৌসুমী ঝুগত পরিবর্তনও আছে। এভাবে, সাইবেরিয়ায় শীতকালে একটা এলাকা জুড়ে উচ্চ চাপ সৃষ্টি হয়। এ এলাকা থেকে শুষ্ক বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। এটাই শীতকালীন মৌসুমী বায়ু নামে পরিচিত। শীতকালে সূর্য যতই উত্তর দিকে হেলতে থাকে দক্ষিণ এশীয় ভৃ-ভাগ উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং নিম্নচাপের একটা অঞ্চল এখানে সৃষ্টি হয়। জলীয় কণাপূর্ণ বাতাস তখন ভারত মহাসাগর থেকে এই নিম্নচাপের কেন্দ্রের দিকে ধারিত হতে থাকে। এ বায়ু যতই হিমালয়ের ঢাল

অঙ্গল হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে, ততই তা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঠাণ্ডা হতে থাকে। এতে মেঘের সৃষ্টি হয় যার ফলে ভারী বর্ষণ হয়। এটাই 'বর্ষণ' হিসেবে পরিচিত।

অধিকভূত, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত উদ্ভাবনী শক্তির বলে স্বরগাতীতকাল থেকে বায়ু শক্তিকে বায়ুকল এবং পালের সাহায্যে নৌকা ও জাহাজ চালনাসহ নানাভাবে তার প্রয়োজন পূরণের কাজে লাগিয়ে আসছে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বায়ুপ্রবাহের প্রাত্যহিক এবং মৌসুমী পরিবর্তনসমূহের মধ্যে আল্লাহর বেশ কিছু নির্দর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে। আমরা যতই এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করব ততই আমাদের জ্ঞানের গভীরতা বাঢ়বে।

৪. আসমান-জগ্নীনের মধ্যবর্তী অনুগত মেঘমালা ৪ আবহাওয়া বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ধরনের মেঘ শনাক্ত করেছেন এবং এগুলোকে নিচে সংক্ষিপ্তভাবে দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হলঃ

১. অলক মেঘ ৪ এ সকল মেঘ ফিসফিসানির মত শব্দ করে। এরা দেখতে বরফ ক্ষটিকের পাখনার মত। মেঘের উপরে অনেক উচ্চতায় এরা গঠিত হয়। এদের কতক পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দশ মাইলের মত উচ্চতায় গঠিত হয়ে থাকে।

২. অনুভূমিক মেঘ ৪ সাধারণত এ ধরনের মেঘ মাটি থেকে মাত্র কয়েকশ' ফুট উপরে গঠিত হয়। এরা হালকা-পাতলা, কুয়াশার মত। ভোর বেলা কিংবা অন্তিম সন্ধ্যায় যখন বাতাস ঝিল থাকে তখন এ ধরনের মেঘ দেখা যায়।

৩. পুঁজ মেঘ ৪ এগুলো দেখতে সুন্দর পুঁজীভূত সাদা মেঘ। গ্রীষ্মকালে এরা আকাশে ভেসে বেড়ায়। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাইলাবানেক উপর দিয়ে এরা পরিত্রাণ করে এবং মাটিতে দ্রুত ধাবমাল ছায়া ফেলে। মধ্য বিকেলে সূর্য যখন সর্বাধিক উষ্ণ থাকে, তখন এরা আকার ও সংখ্যায় বেড়ে যায় এবং এদের শীর্ষদেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় উঠে যায়। সক্ষ্যাবেলা এরা অনুভূমিক মেঘের স্তরে মিশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

৪. জলদ মেঘ ৪ এগুলো হচ্ছে ঘন ধূসর বর্ণের বর্ষণ মেঘ। এদের গঠন প্রকৃতি আকারবিহীন। বর্ষণ মেঘের নিচের দিকে অর্ধাংশ থাকে জলকণায় ভারী যা কখনও কখনও বৃষ্টির ফেঁটায় পরিণত হয়ে নিচে পতিত হয়।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরণের মেঘকে আবার সংযুক্ত আকারেও দেখা যায়। সংযুক্ত মেঘকে সাধারণত তাদের উচ্চতানুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে।

୫. ଉଚ୍ଚପୁଣ୍ଡ ମେଘ ଗୋଲାକାର, ଯହାତରଙ୍ଗମୟ, ସାଦା କିଂବା ଧୂସରାତ୍ର । ଏଣ୍ଟଲୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଘପୁଣ୍ଡେର ଘନ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ରୂପ । ଆଟ ଥେକେ ବିଶ ହାଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାଯ ଏଦେର ଦେଖା ଯାଇ ।

୬. ଉଚ୍ଚ ଅନୁଭୂତିକ ମେଘ ଦେଖିତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧୂର ନୀଳାଭ ପାତେର ନ୍ୟାୟ । ମାଟି ଥେକେ ସାଡ଼େ ଛୟ ହାଜାର ଥେକେ ବିଶ ହାଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାଯ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ।

୭. ଘନ ଅନୁଭୂତିକ ମେଘ ବିଶ ହାଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାଯ ଅବସ୍ଥିତ ବରଫ କ୍ଷଟିକେ ଗଠିତ ଏକ ପ୍ରକାର ପାତଳା ସାଦା ପାତେର ମତ ମେଘ ।

୮. ଅଳକପୁଣ୍ଡ ମେଘ ହଞ୍ଚେ ଘନ ମେଘମାଲାର ଭିତର-ଗଠିତ ଏକ ଟୁକରା ମେଘ ଯା ଦେଖିତେ ସାଗର ଭୌରାଶ୍ଵର ଟେଉଁରେ ମତ । ବିଶ ହାଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାଯ ଏହି ମେଘ ଗଠିତ ହୁଏ ।

୯. ପୁଣ୍ଡ ବର୍ଷଣ ମେଘକେ ବଜ୍ରମଣ୍ଡକ ଓ ବଲା ହେଁ ଥାକେ । ଏରା ପ୍ରକାନ୍ତ, ଫୁଲକପି ଆକୃତିର ଯା ସବ ମେଘ ତୁରେଇ ଛଡ଼ାତେ ପାରେ ।

୧୦. ଅନୁଭୂତିକ ପୁଣ୍ଡ ମେଘ ହଞ୍ଚେ ସେଇ ସବ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମେଘ ଯା ପୃଥିବୀ ପୃତେର କାଢାକାହି ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ସାଡ଼େ ଛୟ ହାଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗ ଲାଭ କରେ ଥାକେ ।

ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ବାହ୍ୟକ ଅବଯବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇସବ ନାନା ଧରନେର ମେଘେର ଚଳାଫେରା ଆଲ୍ଲାହୁ କର୍ତ୍ତ୍ବ ନିର୍ଧାରିତ ଭୌତିକ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ । ଅନୁଭୂତିକଭାବେ ଏ ସକଳ ମେଘକେ ବାତାସ ଯତନ୍ଦ୍ର ତାଡ଼ିଯେ ନିଯେ ଯେତେ ପାରେ ତତନ୍ଦ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କରେ, ଆବାର ଖାଡ଼ାଭାବେ ଏଣ୍ଟଲୋ ପୃଥିବୀ ପୃତେର କାଢାକାହି ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାଯ ଉପରେ ଉଠାଇବା ପାରେ । ଏହି ଉଚ୍ଚତାରେ ବାହିରେ ବାତାସ ଏତ ହାଲକା ଯେ ତା ମେଘେର କଣ ଧାରଣ କରାତେ ପାରେ ନା ।

### ତଥ୍ୟ ସୂତ୍ର ୫

1. Van Nostrand's Scientific Encyclopaedia,
2. L. G. Taylor, The Principles of Ship Stability. p. 12, 1977 edition.
3. E. A. Stoke, Reeds Ship Construction for Marine Students, p. 13, 1973.
4. Ibid, p. 17.
5. Van Norstrand's Scientific Encyclopaedia.
6. Hansbury Brown, (ed.) Man and the Stars, p. 81-82, 1978.
7. Encyclopaedia Americana.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكُمْ مِنْ أَذْرِيزٍ حَلَالًا طَبِيبًا لَا تَسْبِحُوا خُطُوبِ النَّمَاءِ  
إِنَّمَا لَكُمْ عَذْرٌ مُبِينٌ ۝ ۱۶۸

২ : ১৬৮ হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিচ্ছয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি।

উপরে বর্ণিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ রাবুল আলামীন মানবজাতিকে পৃথিবীতে যেসব হালাল খাদ্যবস্তু রয়েছে তা আহারের অনুমতি দান করেছেন। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর জীবন ধারণের জন্য মানুষের খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক তাই ইসলামে খাদ্যবস্তুর গ্রহণ সম্পর্কে নীতিমালা রয়েছে। হালাল খাদ্যবস্তু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট অনেক আয়াত রয়েছে ( আয়াত ৫ : ৫-৬, ৫ : ৯১)।

শাক-শব্রজি ও ফলমূল (আয়াত ২ : ২২), মাছ অথবা সামুদ্রিক খাদ্যগ্রহণ (আয়াত ৬ : ১৪১, ১৬ : ৬৯) গ্রহণে ইসলামে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই। হালাল-হারামের বিধান মূলত প্রদান করা হয়েছে জীব-জন্মের মাংস সম্পর্কে। হালাল জীব-জন্ম ও পাখীর মাংস আহার করা প্রসঙ্গে ইসলাম বিস্তারিত নীতিমালা দিয়েছে।

এখানে ‘পবিত্র’ শব্দটি দ্বারা ‘স্বাস্থ্যকর’ ও ‘পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন’ বুঝানো হয়েছে। পচা বা দূষিত খাদ্য পবিত্র নয়। এতে বুঝা যায় যে, ‘পবিত্র’ শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্ চান যেন আমরা কেবলমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য আহার করি, যা আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য সহায়ক হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّنَا مِنْ طَبِيبٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانِي ۝ ۱۶۹  
تَعْبُدُونَ ۝

২ : ১৭২ হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর।

উপরে বর্ণিত আয়াতে এটা প্রয়াণ করে যে, একজন খাঁটি মুসলমানকে মাংস ও অন্যান্য খাদ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং সে কেবলমাত্র ঐ খাদ্য-বস্তু আহার করবে যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এ বিষয়ে সূরা বাকারার ১৬৮ নম্বর আয়াতে বিস্তারিত আঁলোচনা করা হয়েছে।

۶۴  
إِنَّا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَةَ وَالثَّمَرَ وَلَحْمَ الْغَنِيَّرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَنِيَّرِ اللَّهِ  
قَنِينَ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِرٍ لَا عَادَ فَلَمَّا إِنْتَمْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

২ : ১৭৩ নিচয়ই আল্লাহু মৃত জন্ম, রক্ত, শূকর মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অন্যের পায় অথচ নাফুরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। নিচয়ই আল্লাহু অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা বাকারার ১৬৮ ও ১৭২ নম্বর আয়াতে আল্লাহু পাক ঘোষণা করেছেন, সব হালাল ও পবিত্র দ্রব্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এই আয়াতে আল্লাহু কতকগুলি হারাম খাদ্য-বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন-

মৃত জন্ম : মৃত জন্ম বা পার্থী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হারাম। এতে বৈধ যেসব পশু ও পার্থী রয়েছে তার মৃতদেহও হারাম করা হয়েছে। এটা পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক ও সাম্মতিশাস্ত্র। কোন পশু মারা গেলে এর মৃত্যুর কারণ জানা খুবই দুরহ ব্যাপার হয়ে দাঢ়ায়। হয়ত বিষক্রিয়া, টক্সিন অথবা এন্থ্রাক্সের মত ভয়াবহ সংক্রামক রোগের জীবাণুতে আক্রান্ত হয়েও তা মারা যেতে পারে। এ ধরনের মৃত জন্মের মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়াই স্বাভাবিক। পশুর মধ্যে এন্থ্রাক্সের জীবাণু সংক্রমণধর্মী এবং এন্থ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া পশুর দেহ স্পর্শ বা বহন করা খুবই ঝুকিপূর্ণ; এতে মানুষের দেহেও এই ঘাতক জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

রক্ত : রক্ত বলতে এখানে প্রবাহিত রক্ত যা কোন জন্মের গলা কেটে যবেহ করার পর প্রবাহিত হয় (দ্র. আয়াত ৬ : ১৪৫) তা বোঝানো হয়েছে। প্রবাহিত রক্তে বিষাক্ত বিপাকীয় পদার্থ, টক্সিন ও রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব থাকতে পারে। খাদ্যে এসব পদার্থ থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ছাড়াও এটা বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে যে, প্রবাহিত রক্ত ও এর ক্ষতিকর উপাদানসমূহ অপসারণ করা হলে তা মাংসকে স্বাস্থ্যপোষণী করে থাকে।

শূকরের মাংস : কুরআনের আয়াত দ্বারা শূকরের মাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূরা আনআমের ১৪৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহু পাক ঘোষণা করেছেন যে, শূকরের মাংস হারাম। কারণ, এর মধ্যে 'অপবিত্র' এবং দৃষ্টিত উপাদান রয়েছে। এর পক্ষে নিম্নোক্ত বৈজ্ঞানিক কারণগুলি ছাড়া আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, যা ভবিষ্যতে জানা যেতে পারে : (ক) শূকরের মাংসে Trichiniasis নামক এক প্রকার পরজীবী সংক্রমণ বাহিত হয়। এই পরজীবীর নাম Trichinella spiralis যা মানবদেহে বসবাসকারী সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির গোল ক্রিমি।

কাঁচা অথবা অলসিদ্ধ করে রান্না করা শূকরের মাংসে দলবদ্ধভাবে এই ক্রিমির শুক্কীট জীবিত রয়ে যায়, যা হতে মানুষ ক্রিমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই শুক্কীট দেহের বহুদার্তে বৃক্ষি লাভ ও বৎশ বিস্তার ঘটায়; এবং এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন শুক্কীটের জন্ম দেয় যা শরীরের প্রবহমান রজ্জ দ্বারা মাংসপেশী ও দেহকোষে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে তারা দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রদাহ ও অন্যান্য জটিলতা সৃষ্টি করে। বর্তমানে বিষ্঵ব্যাপী এই রোগের প্রান্তর্ভূত হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক এই রোগে আক্রান্ত। কোন উপসর্গ না থাকায় এদের অধিকাংশই অনাবিস্কৃত রয়ে যায়। তবে সংক্রমণের মাত্রা নির্ভর করে আহারকৃত মাংসে কিরাপ Trichinae -এর সংখ্যা বিদ্যমান তার উপর। এক হিসেব অনুযায়ী শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Trichinasis দ্বারা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ কোটি। প্রাণ্ত তথ্যে আরো জানা যায়, মানবদেহে এই রোগের সংক্রমণের আধিক্যের কারণে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। উপসর্গ পাওয়া রোগীদের মধ্যে মৃত্যুর হার শতকরা ৫ ভাগ হতে ৪০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। তবে, তা নির্ভর করে রোগ ধরা পড়ার পর কত তাড়াতাড়ি তার উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে তার উপর। অন্তনালীতে অন্যান্য ক্রিমির সংক্রমণের প্রতিষেধক থাকলেও Trichinella দ্বারা সংক্রমণে এসব প্রতিষেধকের কার্য্যকারিতা যৎসামান্য এবং এ রোগের কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থাও অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি। দেহের ভেতর মাংসপেশী ও কোষকলায় একবার Trichinae প্রবেশ করতে পারলে তা দূর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। রোগের শেষ পর্যায়ে উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা এক্ষেত্রে কার্য্যকর হতে পারে। জটিল পর্যায়ে হৃদযন্ত বা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মারা যায়। বস্তুত ক্রিমি হৃদপিণ্ড ও ঝিল্লি কোষে আক্রমণ করে মায়োকার্ডিয়াক হৃদরোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং তাতে শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন মাংসজাত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শূকরের মাংসকে অনুমোদন দেয় না যদি না তা দ্রুত হিমায়িত করা বা কমপক্ষে ২০ দিন ১৫° সেলসিয়াস বা তার কম মাত্রায় সংরক্ষণ না করা হয়। এই তাপমাত্রায় Trichina জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র এই ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। তাই Trichiniasis দমনের একমাত্র পথ হলো শূকরের মাংস পরিহার করা।

খ) *Taenia solium* নামক আরো এক ধরনের ফিতা ক্রিমি ও সংক্রমিত শূকরের মাংস দ্বারা বিস্তার লাভ করে।

গ) শূকর স্বত্বাবগতভাবেই নোংরা।

তথ্যসূত্র :

1. The World Book of Encyclopaedia, Vol-vii p. 279, 1966.

۱۸۸ - أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ هُنَّ كَانُوا مِنْكُمْ مَرْيَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَذَّهُ قِنْ  
أَيَّامٌ بَخْرَهُ رَعَى الَّذِينَ بُطِينُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ لَمَنْ تَطْغَى  
خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنَّ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُفَّرٍ إِنْ كُثُرُ تَغْلِبُونَ ۝

২ : ১৮৪ সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ ব্রতঃস্ফুর্তভাবে সংকোচ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে।

প্রত্যেক মুসলিম নব-নারীর জন্য ইসলামী ক্যালেন্ডারের নবম মাসে অর্থাৎ রমজান মাসে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম পালন ফরয করা হয়েছে। রমজান মাসে এই রোজা রাখার (আরবী প্রতিশব্দ সিয়াম) অর্থ হলো : রোজা রাখার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পানাহার, ধূমপান বা যৌন সঙ্গম থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। তবে অসুস্থ বা সফরে থাকা অবস্থায় তাদেরকে রোজা পালন করতে হবে না। কিন্তু সুস্থ হওয়ার বা সফর থেকে বাড়ী ফেরার পর ঐ নির্ধারিত দিনগুলোর পরিবর্তে সমান সংখ্যক দিন রোজা পালন করতে হবে। এই রোজা আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত। বর্ণিত আয়াতিতির ঠিক পরবর্তী আয়াতে (আয়াত ২ : ১৮৫) তিনি এই ছাড়ের বিষয়টি বিতীয়বার ঘোষণা করেছেন “আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং তোমাদের জন্য ক্রেতের কিছু চান না।”

তাই রোজাদার ব্যক্তির কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যেই একপ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসুস্থতার সময় রোজা না রাখার অনুমতি প্রদানের যৌক্তিক কারণ হতে পারে যে কোন রোগী দিনব্যাপী পানাহার বর্জন করলে তা ঐ রোগীর স্থান্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। কোন কোন রোগে রোগীকে কিছু সময় পর পর নিয়মিত খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ গ্রহণ করতে হয় যেমন মারাওক ডায়ারিয়া বা আমাশয়, জটিল এপেনডিসাইটিস, ব্রক্ষে নিউমেনিয়া, জটিল মেনিমজাইটিস, টাইফয়েড জুর, ডায়াবেটিস মেলিটাস ও জটিল পেটের পীড়া ইত্যাদি। ডায়ারিয়া ও আমাশয় উপবাসের কারণে রোগীর শরীরে পানি শূন্যতা ও ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। মারাওক ডায়াবেটিস রোগে রোজার কারণে

হাইপোগ্রাসেমিয়া কোমা (রক্তে চিনির মাত্রাতিরিক্ত শ্বল্লতার কারণে অচেতন হয়ে পড়া) দেখা দিতে পারে। উচ্চ মাত্রার জ্বর ও বমিভাব হয় এমন রোগে তরল পানীয় গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে। সুতরাং রোজাদারের অসুস্থতায় এই ধরনের রেয়াত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাজনিত কারণে উন্নত। তবে, সামান্য ডায়াবেটিসের বেলায় কোন ব্যক্তির রোজা রাখতে অসুবিধায় পড়ার কথা নয়। কিছু কিছু জটিল প্রদাহে দীর্ঘ মেয়াদী এন্টিবায়োটিক কার্যকর; সেসব রোজী কেবলমাত্র রাতের বেলায় ঔষধ সেবন করে রোজা পালন করতে পারে।

বিশেষ কষ্টকর নয় এমন হালকা অসুস্থতা যেমন মৃদু ঠাণ্ডা, খোস-পাচড়া, Trauma, মাথাব্যথা ইত্যাদি রোগীদের রোজার মাসে অসুস্থতার অভিহাতে রোজা পরিত্যাগ করা মৌটেও যুক্তিযুক্ত নয়। অসুস্থতার কারণে রোজা পালন বা ভাসার বিষয়টি সম্পূর্ণ অসুস্থ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে।

সফরের সময় রোজা না-রাখার ওজরটিও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কারণ, সফরের সময় একজন রোজাদার পর্যাপ্ত খাদ্য (বিশেষ করে সেহরী), বিশ্রাম ও ঘুমের (স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য) সুযোগ-সুবিধা নাও পেতে পারে। তাই এমন কষ্ট ও অসুবিধা দূর করার জন্য পরম করণশাময় আল্লাহ্ তাঁর অপার রহমতের বরকতে সংক্ষিপ্ত সফরের সময় (১৫ দিনের কম) বাঢ়ি হতে দূরে (৪৮ মাইল দূরে) গেলে তাঁর জন্য ঐ সময় রোজা পালন থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে, হালকা অসুস্থতার মত আরামদায়ক ভ্রমণ ও বিদেশে অবস্থানকালে যেখানে রোজা রাখা বিশেষ কোন কষ্টের ব্যাপার হবে না, তখন রোজা পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু সকল সফরের ক্ষেত্রেই রোজাদার ব্যক্তির রোজা রাখা বা না রাখা তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন, ‘আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে’।

কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন মাসব্যাপী রোজা পালনের ফলে শরীরে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে যাতে রোজাদারের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু রমজান মাসের রোজা পালনকে উপবাস মনে করা ঠিক নয়। এটি এক মাসের জন্য খাদ্য গ্রহণের সময়সূচীর পরিবর্তন ঘটায় মাত্র এবং একজন রোজাদার যদি রাতের বেলায় সুষ্ম-খাদ্য গ্রহণ করে তবে তাঁর স্বাস্থ্যহানির কোন আশংকা থাকে না।

বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, রমজানের রোজা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। আমরা এখনো রমজানের রোজার স্বাস্থ্যগত

ও আধ্যাত্মিক সব উপকার সম্পর্কে জ্ঞাত নই। ঢাকা ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৫৮-১৯৬৫ সালে রমজান মাসে রোজা রাখার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়। তাতে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত স্বাস্থ্যগত সুবিধাদি খুঁজে পাওয়া যায় :

(১) শতকরা ৮০% ভাগ রোজাদারের শরীরের ওজন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়া ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। এই ধরনের ওজন হ্রাস স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কারণ দেখা গেছে মেদবহুল রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতিতে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এই ধরনের রোগীদের রমজান মাসে রাতের বেলায় এবং বছরের অন্যান্য সময় অতি ভোজন ও চর্বিযুক্ত আহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

(২) পাকস্থলীর মাত্রাতিরিক্ত অপ্রয়োগ রমজান মাসে মাসব্যাপী রোজা পালনের কারণে হাইপো এবং হাইপারক্রোরিড্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে স্বাভাবিক এসিডিটিতে (আইসোক্রোরিড্রিয়া) পরিণত হয়। রোজা রাখার কারণে পাকস্থলীতে অপ্রয়োগের পরিমাণ কমে যায় (রাতে আহারের পর রোজা রাখা অবস্থায় খুব সকালে থালি পেটে স্বাভাবিকভাবেই গ্যাস্ট্রিক এ্যাসিডের মাত্রা সর্বনিম্ন হয়ে থাকে); রমজান মাসের রোজা অতিমাত্রায় এ্যাসিডিটি নিঃসরণ রোধে সহায়তা করে যা পেপটিক আলসার সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহের অন্যতম।

(৩) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে পেপটিক আলসার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এর কারণ হতে পারে দুটি (১) রমজান মাসে মুসলমানদের নিয়মিত রোজা পালন, এবং (২) তাদের খাদ্য তালিকায় এ্যালকোহল না থাকা। উন্তর নাইজেরিয়ার জারিয়ায় অবস্থিত উসাসা হাসপাতালের ডাঃ ই টি হেস ১৯৬০ সালে লিখেছেন, পেপটিক আলসার প্রসঙ্গে অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এক জাতির আচার-আচরণে বসবাসকারী আফ্রিকানদের মধ্যে এই রোগের ঘটনা সম্পূর্ণ শূন্যের কোঠায়। ক্লীভ (Cleave) আরো জানিয়েছেন স্থানীয় জাভা ও মালয় মুসলমানদের তুলনায় ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী চীন অধিবাসীদের মধ্যে পেপটিক আলসারের রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী।

এসব ঘটনা থেকে এটা প্রমাণিত হয়, রমজানের রোজা রাখার কারণে গ্যাস্ট্রিক এ্যাসিড ক্ষরণের স্পন্দনা এবং হাইপার এ্যাসিডিটির সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসার কারণে মিশনীয় গ্রামবাসী, উন্তরাঞ্চলীয় নাইজেরীয়বাসী, জাভা ও মালয় মুসলমানদের পেপটিক আলসার হওয়ার ঘটনা খুবই কম।

**তথ্যসূত্র :**

1. Muazzam, M. G. and Khaleque, K. A., Effects of Fasting in Ramadan, J. Trop. Med and Hyg. 62, 292, 1959.
2. Muazzam, M. G. and Ali, M. N. Effects of Ramadan Fasting on Body Weight. The Medicus. 34, 134, 1967.
3. Khaleque, K. A., Muzzam, M. G. and Ispahani, P., Further Observations on the Effects of Fasting In Ramadan. J. Trop. Med, and Hyg. 63, 247, 1960.
4. Muazzam, M. G., Ali M. N. and Husain, A. Observations on the Effects of Ramadan Fasting on Gastric Acidity, The Medicus, 25, 228, 1963.
5. Cleave, T. L. Peptic Ulcer, 1st edn, John Wright & Sons Ltd, Bristol, 1962.

۱۸۵- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَّاسِ وَبَغْتَةً مِنَ الْمُدْنِي  
وَالْمُرْعَلِيْنَ لَئِنْ شَهَدَا مِنْكُوْنَ التَّهْرَرَ لِلْمُصْمَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ عَلَى  
سَعْيِهِ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَى بِرِبِّ الْإِلَهِ بِكُلِّ الْإِسْرَارِ وَلَا يُبَدِّلُ بِكُلِّ الْعُسْرَ  
وَلَا يَكِنُوا الْعِزَّةَ وَلَا يُكَبِّرُوا إِلَهَهُمْ أَوْ عَلَى مَا هُدُّوا كُفُّرٌ وَلَا يَكُونُونَ شَكِّرُونَ ۝

২ : ۱۸۵ ৱমজান মাস, এতে মানুষের দিশাবী এবং সৎপথের স্পষ্ট নির্দর্শন  
ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।  
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই  
মাসে সিয়াহ পালন করে। এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা  
সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ  
তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য  
ক্ষেপকর তা চান না এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে  
এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবার কারণে তোমরা  
আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা  
প্রকাশ করতে পার।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সূরা বাকারার ۱۸۴ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত  
হয়েছে।

وَكُلُوا وَأْشِرُوا حَلِيْلَيْتَ بَيْتَبَيْنَ لَكُلِّ الْمُغَيْطِ لَا يَبْصُرُ مِنَ الْفَيْطَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْطِ

২ : ۱۸۷ ... আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ রেখা হতে  
উষাৰ রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয় ...।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, ৱমজান মাসে রোজাদারদের জন্য  
আহার ও পানীয় বৈধ করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সুবহে সাদেকে উষাৰ  
শুভ রেখা রাতের অঙ্গকার হতে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর না হয় অর্থাৎ সুবহে  
সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। পৃথিবীর চূর্ণনের কারণে, কোন একটি স্থান এমন অবস্থায়  
আসে যখন স্বর্য দিক্-চক্রবালের অনেক নিচে অবস্থান করলে সূর্যালোক সরাসরি  
ঐ স্থানে পৌছাতে পারে না; সূর্যালোক ভূমগুলের মেঘপুঞ্জ, ধূলিকণা ইত্যাদিতে  
প্রতিফলিত হয়ে আকাশকে আলোকিত করে। জ্যোতিবিজ্ঞানে এটাকে উষা বা

উষার গোধূলি বলা হয় যতক্ষণ উষার সূচনা হয় না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ হিসাব করে দেখেছেন, যখন সূর্য দিকচক্রবালের  $18^{\circ}$  ডিগ্রী বা তার নিচে অবস্থান করে তখনই তা সম্ভব। সুতরাং উষা এমন এক সময় শুরু হয় যখন সূর্য দিগন্তের  $18^{\circ}$  ডিগ্রী নিচে অবস্থান করে।

সুবহে সাদেক বা উষার সময়কাল নির্ণিত হয় দিগন্ত রেখার  $18^{\circ}$  ডিগ্রী নিচে সূর্য অতিক্রম করতে যে সময় প্রয়োজন তার উপর। এটা নির্ভর করে ঐ স্থানের বিষুব রেখার অবস্থান ও সূর্যের পরিক্রমণের উপর অর্থাৎ পৃথিবীতে ঐ স্থানের অবস্থান ও বছরের ঐ দিনটির উপর। উষা নিরক্ষরেখায় সবচেয়ে কম সময়ের জন্য হয়ে থাকে। কারণ সূর্যের আঙ্গিক গতিপথ এখানে দিগন্ত অতিক্রমণ করে ডান কৌণিকভাবে এবং সূর্য-রশ্মি খাড়াভাবে পতিত হওয়ায় দূরত্ব কম হয়ে থাকে। তাই বিষুবীয় দিনগুলিতে নিরক্ষরেখায় উষা ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট স্থায়ী হয় অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট পূর্বে উষা শুরু হয়।

উত্তর অক্ষাংশের  $30^{\circ}$  ডিগ্রীর নিকটবর্তী স্থানসমূহে মার্চ মাসে উষা স্থায়ী হয় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট এবং জুন মাসে ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। বাংলাদেশে রমজান মাসে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট পূর্বে পর্যন্ত পানাহার করা যেতে পারে।

‘রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হতে উষার শুভ রেখা স্পষ্টকরণে অতিভাত না হয়’ আয়াতটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা উপলব্ধি করা খুবই কঠকর। তবে যতটুকু বুঝা যায়, উষার শুভতা ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায় এবং এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন উভয়ের মধ্যে তেমন লক্ষণীয় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু উপরের বর্ণনা মতে জ্যোতির্বিজ্ঞানে উষার শুভের সময়ে যদিও তখন পূর্বাকাশের নক্ষত্রগুলি অদৃশ্য হতে থাকে কিন্তু পশ্চিমাকাশে এ ধরনের নক্ষত্রগুলি তখনো দেখা যায়। তাই তাত্ত্বিকভাবে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন উর্ধ্বাকাশে সঙ্গৰ্ষিমঙ্গলীর নক্ষত্রগুলির দৃশ্য ও অদৃশ্যের ব্যবধান খুবই ক্ষীণ থাকে যেমন দৃষ্টি সুতা পাশাপাশি অবস্থান করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইউসুফ আলী বলেছেন, যারা প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত তারা উষার সৌন্দর্য সম্পর্কে ভালই জানেন। প্রথমে পূর্ব দিগন্তে শুভ আলোর রেখা দেখা দেয়, তারপর একটি কৃষ্ণ বর্ণ সবকিছু ছাপিয়ে উঠে। এ অবস্থানকে অনুসরণ করে অতি মনোরম ঈষৎ রক্ষিত শুভ আভা যা স্পষ্টত রাতের আধার থেকে পৃথক। এটাই অক্ত ফজরের (উষার সময় এবং এর পরই রোজার উপবাস শুরু করতে হয়) সময়। শুভ ও কৃষ্ণ রেখা সম্পর্কিত আয়াতটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

#### তথ্যসূত্র :

1. Parker, G. W, Elements of Astronomy.
2. Ali, Allama Yusuf, The Holy Quran, p. 74, 1977.

## ١٨٩- يَنْهَاكَ عَنِ الْأَهْلَةِ ثُمَّ هُنَّ مُوَاقِعُهُ لِلْأَسْرِ وَالْحُجَّ

২ : ১৮৯ সোকে আপনাকে নতুন চাঁদ সংযোগে প্রশ্ন করে। বলুন, এটা মানুষ  
এবং ইজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।

বর্ণিত আয়াতটি দ্বারা নতুন চাঁদকে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং ইজ্জের তারিখ ও সময় নির্ধারণের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে বুকা যায় চাঁদকে বর্ষপঞ্জি তৈরির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণের জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্ত, বিভিন্ন সময়ের ব্যবধান ও সময়কাল ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য বর্ষপঞ্জির প্রয়োজন হয়ে থাকে। এর জন্য সর্বাঙ্গে সময়ের একক নির্ধারণ করতে হবে। মৌলিক একক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন সময় হতে হবে যা সবার জন্য চেনা সহজ। বর্ষপঞ্জি নির্মাণে তিনটি একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব হলো : সৌর দিবস, চান্দ্ৰ মাস এবং ক্রান্তীয় বর্ষ। এই তিনটি একক সৌর জগতের তিনটি আলাদা কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত।

একটি দিবস, আরো স্পটভাবে বললে বলতে হয় একটি সৌর দিবসের অর্থ হলো পৃথিবীর গতিপথে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণের সময়কাল। চান্দ্ৰমাস চন্দ্ৰের সাথে সম্পর্কিত এবং সূর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চন্দ্ৰ দ্বারা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময়কাল বোঝায়। তাই চাঁদের পর পর দুটি সুস্পষ্ট পর্যায়ের সময়কে যদি এক মাস ধরা হয় (অর্থাৎ দুটি পর্যায়ক্রমিক নতুন চাঁদ) তাতে দেখা যায় যে, এই সময়কাল (অর্থাৎ চান্দ্ৰ মাস) কখনো ২৯ দিন আবার কখনো ৩০ দিন হয়ে থাকে এবং গড়ে ২৯.৫০ দিন না হয়ে তা ২৯.৫৩০৬ দিন হয়ে থাকে। তাই পূর্ণ দিবস দ্বারা মাসকে পূর্ণ করা যায় না।

সময়ের তৃতীয় একক হলো ক্রান্তীয় বর্ষ যা পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে ঝুক্তুর সাথে সম্পর্কিত থেকে একবার প্রদক্ষিণ করাকে বোঝায়। ঝুকু পরিবর্তন, রাতের বেলায় নক্ষত্রের পরিবর্তিত অবস্থান এবং দিনের বেলায় সূর্য পরিক্রমণের পথের ভিন্নতা দেখে তা বোঝা যায়।

একটি ক্রান্তীয় বর্ষের মধ্যে সৌর দিবসের সংখ্যা ও চান্দ্ৰ মাসের সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা নয়। এভাবে একটি ক্রান্তীয় বর্ষে ৩৬৫.২৪২২২টি সৌর দিবস ও ১২.৩৬৮৩ চান্দ্ৰ মাস হয়ে থাকে। তাই, যেহেতু এক বছরে দিবসের সংখ্যা ও চান্দ্ৰ মাসের সংখ্যা কোনটিই যথাযথভাবে বছরের সাথে মিলে যায় না। যদিও পার্থক্যের অংশ খুবই সামান্য কিন্তু শত শত বছরের ব্যবধানে এর সমষ্টি ভয়ানক বিভাস্তির সৃষ্টি করতে পারে। তাই এই স্কুল বিভাস্তির বিষয়েও দৃষ্টি দেয়া খুবই

জরুরী। খিস্টপূর্ব ৪৬ সালে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা হয়। তাতে এক বছরে দিনের সংখ্যা ছিল ৪৫৫ দিন।<sup>১</sup> এরপর ১৫৮২ সালে সকল রোমান ক্যাথলিক দেশগুলিতে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার হতে বছরে ১০ দিন কমিয়ে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনা করা হয়। এরপর ১৭৫৭ সালে ইংল্যান্ডে ‘আমাদের ১১ দিন ফিরিয়ে দাও’-এই শোগান তুলে ২ৰা সেপ্টেম্বরকে ১৪ই সেপ্টেম্বর ধরে এই ক্যালেন্ডার সংশোধন করা হয়।

উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র চাঁদের উপর ভিত্তি করে বর্ষপঞ্জি তৈরি করা যেতে পারে। এ ধরনের একটি চান্দু বর্ষপঞ্জিতে সবগুলি একক যেমন সৌর দিবস, চান্দু মাস এবং ১২টি চান্দু মাসে একটি চান্দু বছর হয়ে থাকে। হিজরী ক্যালেন্ডার এমনি একটি বর্ষপঞ্জি এবং মুসলিম দেশসমূহে এটি ব্যবহার করা হয়। একটি স্বাভাবিক হিজরী ক্যালেন্ডারে ১২টি চান্দু মাস থাকে যাতে এর একমাস অন্তর কোন মাস ৩০ দিনের এবং কোন মাস ২৯ দিনের (চান্দু মাসের সূচনা নতুন চাঁদ উঠার সাথে সাথে হয়ে থাকে) হয়। চান্দু মাসের গড় সময়সীমা ২৯.৫৩ দিন, যেখানে হিজরী মাসের সময়কাল ২৯.৫০ দিন। এতে বছরে ক্যালেন্ডারের সাথে চাঁদের হিসেবে যে ব্যবধান হয় তা ০.৩৬ দিন (৮ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট) যা শুরু শীত্বই চোখে পড়ে এবং নতুন চাঁদ উঠার সাথে মাস আরম্ভ হয় না। এই সমস্যা দূর করার জন্য হিজরী ক্যালেন্ডার ৩০ বছরের চক্রে বিভক্ত হয়; প্রতি চক্রের প্রথম ১৯ বছরের প্রতি দ্বাদশ মাস ২৯ দিনে এবং পরবর্তী ১১ বছরের দ্বাদশ মাস ৩০ দিনে হয়ে থাকে। এই সহজ কৌশল অবলম্বনের কারণে হিজরী ক্যালেন্ডারের গড় মাসে সময়সীমা ২৯.৫০ দিন হতে বাড়িয়ে ২৯.৫৩০৫৬৬ দিন করা হয়েছে, যা প্রকৃত চান্দু মাসের সময়সীমা হতে .০০০০৩৩ দিন বা ৩ সেকেন্ড কম হয়ে থাকে। এর ফলে, চাঁদের সাথে ক্যালেন্ডারের হিসেবে পুরো ১ দিন ব্যবধান হতে ২৫০০ বছরের প্রয়োজন পড়ে। অন্যদিকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ১ দিনের ব্যবধান হতে ৩৩০০ বছরে প্রয়োজন হয়।<sup>২</sup>

মানুষ সৌর ক্যালেন্ডার পরিবর্তন করে থাকে হিসেবের প্রয়োজন অনুসারে যা সাধারণ মানুষের নিকট অপরিহার্য নয়। কিন্তু চান্দু ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে নতুন চাঁদের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের নিকট সহজে বোধগম্য হয়। নতুন চাঁদ উঠার সাথে সাথে চান্দু মাস শুরু হয় এবং চাঁদের ক্রমপর্যায়ে চান্দু মাসের দিন বাঢ়তে থাকে। তাই বলা যায়, আল্লাহ রাকবুল আলামীন একটি সরল বর্ষপঞ্জি দান করেছেন যা সহজেই দেখা ও বুঝা যায়। সহজবোধ্যতার কারণেই এই ইসলামী ক্যালেন্ডারের প্রহণযোগ্যতা সর্বজনীন। চান্দু ক্যালেন্ডারে

ଖତୁର ଆଗମନେର କୋନ ନିର୍ଧାରିତ ମାସ ନେଇ । ତାଇ ବହରେର ସବ ଖତୁତେଇ ଘୂରେ ଘୂରେ ରମଜାନ ମାସେର ଆଗମନ ହୟେ ଥାକେ । ସାଧାରଣତ ହିଜରୀ ବହର ସୌର ବହର ଥେକେ ଗଡ଼େ ୧୧ ଦିନ କମ ହୟେ ଥାକେ । ଫଳେ, ୩୩ ବହରେର ବ୍ୟବଧାନେ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସେର ସାଥେ ଖତୁର ଫିଲ ହୟେ ଥାକେ । ସଦିଓ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଯାପନେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନେ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସେର ଉପଯୋଗିତା କମ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମନ- ରୋଜା ରାତ୍ରି, ହର୍ଜ ପାଲନ କରା ଇତ୍ୟାଦି କାଜେ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ ଖୁବଇ ସନ୍ତୋଷଜନକତାବେ କାର୍ଯ୍ୟକର । ଏଥାନେ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସେର ଏକଟି ସୁବିଧା ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯେତେ ପାରେ । ତାହଲୋ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେର ମୁସଲମାନଙ୍କା ଶ୍ରୀଅ ଓ ଶୀତ ଉଭୟ ଖତୁତେଇ ଘୂରେ ଫିରେ ରୋଜାର ମାସ ପେଯେ ଥାକେ ।

### ତଥ୍ୟସୂର୍ଯ୍ୟ :

1. Brown, H. *Man and Stars*, Oxford University Press, 1972.
2. Brandt I.C. and Maran, S.P. *New Horizon of Astronomy*, W.H Freeman and Company, 1972.

## كَانَ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْجَادِهِ

২৪ ২১৩ প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই উদ্ভতভূত ছিল।

এখানে এক উদ্ভত বলতে একই মতাবলম্বী এবং জাতি ছিল বলে ধরা যায়। আর জাতি অর্থ ধরলে মানুষ যে এক জাতি তাও ধরা যায়।

বৈজ্ঞানিকদের মতে দুনিয়ার সকল মানুষ একই প্রজাতির মানব গোষ্ঠী যাকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী Linnaeus হোমো সেপিয়াপস (Homo sapiens) নাম দিয়েছেন। প্রথম দিকে হয়তো মানুষ স্কুদ্ স্কুদ্ জনসংখ্যার বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ধীরে ধীরে ছোট ছোট দল নতুন নতুন এলাকা দখল করে। এ সবের বহু দল বা জনগোষ্ঠী হয়ত অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। এই সমস্ত পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠীতে জিনস (genes-জীবকোষের মৌলিক উপাদান বিশেষ) এর বিবর্তন (mutation) ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত অধিকতর যোগ্য বংশগুলোই ঢিকে থাকে যাদের জীবকোষে বিশেষ বিশেষ জৈব উপাদান (genetic trait) সংরক্ষিত হয়।

এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, জেনেটিক্সের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদের মধ্যে সত্ত্বান প্রজনন সম্ভব এবং এরা প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন বংশধর জন্ম দিতে পারে। তা সত্ত্বেও মানব জাতির বিভিন্ন প্রজন্মে আকৃতিগত যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। মানুষের আকার, গায়ের রং, চুলের গড়ন, শরীরের বিভিন্ন অংশে লোমের অবস্থান, মাথার খুলির আকার এবং নাক-ঠোঁট ইত্যাদিসহ চেহারার বিভিন্নতা ইত্যাদিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। নূবিজ্ঞানীগণ (anthropologists) এই সমস্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে মানব জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

অনেকগুলো সম্পৃক্তির জনগোষ্ঠীকে একটি বর্ণ বা জাতি বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই শ্রেণীর প্রধান বর্গগুলো হলো কক্ষীয় (কোকড়ান চুল, সরু নাক এবং সাদা চামড়া), নিপ্রো (পশ্চের মত চুল, প্রশস্ত নাক এবং কাল চামড়া), মঙ্গোলীয় (খাড়া চুল, কিছুটা প্রশস্ত নাক এবং হলুদ বা পিঙ্গল বর্ণের চামড়া) এবং অস্ট্রেলোশীয় (Australoid) (কুঁঝিত চুল, কিছুটা প্রশস্ত নাক এবং পিঙ্গল বর্ণ)। তবে এদের মধ্যে আরও অনেক শ্রেণী বিভাগ এবং মধ্যবর্তী শ্রেণীও করা হয়েছে।

মানব জাতির ক্রম বিকাশ (evolution) ঘটেছে জিনের পরিবর্তন (mutation), নির্বাচন (selection), চিরস্থায়ী স্থান পরিবর্তন (migration) এবং ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য (geographical isolation) ইত্যাদি সামগ্রিক

ପ୍ରତିଫଳନେର ଫସଲ, ଯାର ଫଳେ ବିଭିନ୍ନ ଏଲାକାର ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ ପରିଲଙ୍ଘିତ ହୁଁ । ଗତ ୫୦୦ ବଂସରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାକ ମାନୁଷେର ହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ପୂର୍ବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ବିଶେଷ କତଞ୍ଚିଲୋ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖା ଯେତୋ । ବର୍ତ୍ତମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ମାନୁଷେର ସ୍ଥିଯ ଆତମ୍ବ୍ରା ରଙ୍ଗା କରତେ ପାରେ ନା । ଡ୍ରମ୍ ଓ ଯୋଗାଧ୍ୟୋଗ ଦୂରତ୍ଵେର ବାଧା ଦୂର କରେ ଫେଲଛେ । ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମଧ୍ୟେ ବିବାହ ବନ୍ଧନେର ଫଳେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଜାତିର ମୌଲିକ ଜେନେଟିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ୍ରମାବୟେ ହ୍ରାସ ପେତେ ଚଲେଛେ ।

୧୯୦୩ ସାଲେ ଆମେରିକାର ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନୀ ଉଇଲିଆମ ସି ବୱେଡ ରକ୍ତେର ଜିନେର ଭିନ୍ତିତେ ମାନବ ଜାତିର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାର ପ୍ରସାବ କରେନ । ଇତିପୂର୍ବେ ୧୯୦୦ ସାଲେ ଲ୍ୟାନଡଷ୍ଟେଇନାର ତିନଟି allelic genes ଏର ଭିନ୍ତିତେ ରକ୍ତେର ଚାରଟି ଗ୍ରୁପ A, B, AB ଏବଂ O ଆବିକ୍ଷାର କରେନ । ମାନୁଷେର ରକ୍ତ ପରିକ୍ଷା କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝା ସମ୍ଭବ ହେଁଥେ । ଏହିସବ ପରିକ୍ଷାର ଭିନ୍ତିତେ ନୃତ୍ୟିକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଯୁଗେର ମାନୁଷେର ଇଉରୋପ ଓ ଏଶ୍ୟାଯା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ତେଲିଆଯ ବ୍ୟାପକ ହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସକଳନ ପେଯେଛେ ।

ଯଦିও ମାନବ ପ୍ରଜାତିକେ (*Homo sapiens*) ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତରାଧିକାର୍ଯ୍ୟୋଗ୍ୟ ଚିହ୍ନେର (traits) ମାଧ୍ୟମେ ବିଭକ୍ତ କରା ଯାଏ ତବୁତେ ମାନବ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟୀ ବା ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟେ ଅଧିଳ ଥିଲେ ଥିଲେ ବେଶୀ । ସବ ମାନୁଷେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଳନୀୟ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଅନ୍ତସମୂହ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟସମୂହ ବିରାଜମାନ, ଆର ତାଦେର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଧରନେର । ସକଳ ଗୋଟି ବା ବର୍ଣେର ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେଇ ୨୩ ଜୋଡ଼ା କ୍ରେମୋଜମ ଏବଂ ଏକଇ ପ୍ରକାର ରକ୍ତେର ଗ୍ରୁପ ରହେଛେ । ମାନୁଷ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରସୂରୀ (ବାନର, ଶିମପାଞ୍ଜି, ଗରିଲା ପ୍ରାଇମେଟଦେର primates) ଥିଲେ ପୃଥିକ ତାଦେର ତୁଳନାମୂଳକ ବଡ଼ ଆକାରେର ମଗଜ, ଛୋଟ ଛେଦନକରୀ ଦାଁତ, ସୋଜା ହେଁ ହାଟବାର କ୍ଷମତା, ଯତ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କଥା ବଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟେର କାରଣେ । ସକଳ ରକମେର ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ଭାନ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମାନୁଷେର ମିଳନେ ଜନ୍ମହିଂକାରୀ ସମ୍ଭାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜନନ ଶୀଳ । ଗୋଟା ପୃଥିବୀର ସକଳ ମାନୁଷ ଜୀବବିଜ୍ଞାନେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଏକଟି ମାତ୍ର ଜାତି ।

### ତଥ୍ୟସୂର୍ତ୍ତ :

1. The New Encyclopaedia Britannica 2 : 1143, 1980.

٢٩- يَسْكُنُوكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْرِقِ فَإِنْ فِيمَا إِرْثُكُمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ الْكَلَافِ  
وَإِنْ هُمْ بِأَكْبَرٍ مِنْ تَغْيِيْهُمَا وَيَسْكُنُوكُمْ مَا دَأَيْتُمْ فِيهِنَّ ذُلِّيْلُ الْعَفْوُ كَذِلِّكِ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

২ : ২১৯ লোকেরা আপনাকে (হে নবী) মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলে দিন, এ দুটোতেই বড় পাপ (অকল্যাণ) রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে, কিন্তু উভয় কাজের পাপ তাদের উপকারিতা থেকে অনেক বেশী।

এই আয়াতে মদের জন্য আল-খাম্র (الخمر) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, এতে সব রকম নেশাকর বস্তুকেই ধরা হয়েছে। এর আরবী মূল শব্দ ইয়াখমুর (يَخْمَر) যার অর্থ ঢেকে ফেলা বা কমিয়ে ফেলা। মদকে আল-খাম্র বলা হয় এই জন্য যে এটা মস্তিষ্কের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে বাধা দেয় বা কমিয়ে দেয়। সাধারণত এতে শুধু মদকেই বুঝানো হত কারণ মহানবী (সা)র সময়কালে আরব দেশে মদই একমাত্র নেশাকর পানীয় হিসেবে প্রচলিত ছিল। তবে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর থেকে উদ্ভৃত মহানবী (সা)-এর বিখ্যাত হাদীসে এই শব্দের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, “সব রকম নেশাকর দ্রব্যই খামর এবং সর্বপ্রকার খামরই নিষিদ্ধ বা হারাম।” অবশ্য বর্তমান আলোচনায় আমরা প্রথমে শুধু মদের ক্ষতিকর কথাই বলব পরে লটারি ও বাজিধরার ন্যায় জুয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উপরের আয়াতে মদ ও জুয়ায় অনেক পাপ রয়েছে বলা হয়েছে। পাপ মানেই আল্লাহর হুকুম অমান্য করা এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করলেই মানুষের অকল্যাণ হয়। এছাড়া এই আয়াতে পাপের সঙ্গে উপকারের তুলনা করা হয়েছে। সূতরাং এখানে পাপ বলতে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে যে ক্ষতি হয় সে কথাই বলা হয়েছে।

মদ ও জুয়ার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং এ দুয়ের মাধ্যমে যে প্রচুর সামাজিক অপরাধমূলক দুঃটিনা ঘটে থাকে তা সবাই জানে। কিন্তু অনেকেই জানে না যে গবেষণায় মানবদেহে মদের কত ব্যাপক অপকারের কথা আবিষ্ট হয়েছে। মদ ও জুয়ার অপকারিতা বেশী। তবে আল্লাহ সত্য বলেন তাই এর উল্লেখ করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে এদের অপকার অনেক বেশী।

ମଦ ପାନ କରିଲେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ରଇ ତା ରଙ୍ଗେ ଚଲେ ଯାଏ ଓ କିଛୁ କ୍ୟାଳୋରିର ଯୋଗାନ ଦେଇ, ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସେର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ରଙ୍ଗବାହୀ ଶିରା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ । ମଦେ ଶରୀରେର କର୍ମଶକ୍ତି ଯା ବାଡ଼ାଯ ତା ନଗଣ୍ୟ । ଏତେ କୋନ ପୁଣି ସାଧନ ହୁଏ ନା, ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଶରୀରେର କୋନ କାଜେଇ ଲାଗେ ନା । ତବେ ପାନୀୟ ହିସାବେ ନୟ ଏଇ ବାହିରେ ମଦ ବା ଏଲକୋହଲେର କିଛୁ ଉପକାରୀ ଭୂମିକା ରହେଛେ ଯେମନ :

(୧) ପରିଶ୍ରମ ପାନିତେ ୭୦ % ଏଲକୋହଲ ମିଶ୍ରିଯେ ଭାଲ ଜୀବାଗ୍ନ ଅତିରୋଧକ ବା ଏଷ୍ଟିସେପଟିକ ତୈରି କରା ଯାଏ ଏବଂ ତା ଇନଜେକ୍ଶନ ପ୍ରୋଗେର ପୂର୍ବେ ଚାମଡ଼ା ଜୀବାଗ୍ନମୁକ୍ତ କରତେ ବ୍ୟବହର ହୁଏ । ଅପାରେଶନେର ପୂର୍ବେ ଏକଜନ ଶଲ୍ୟ ଟିକିଂସକ ଏହି ୭୦% ଏଲକୋହଲ ମିଶ୍ରିତ ପାନି ଦିଯେ ହାତ ଡିଜିଯେ ନେନ, ତାତେ ହାତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଶୁକାଯ ଏବଂ ଜୀବାଗ୍ନ ମୁକ୍ତ ହତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । (୨) ଟିଂଚାର ଆଇଓଡିନ (ଏଲକୋହଲେ ଦ୍ରୁବୀଚୂର୍ଚ୍ଛି ଆଇଓଡିନ) ସାର୍ଜାରୀର ପୂର୍ବେ ଚାମଡ଼ା ଜୀବାଗ୍ନମୁକ୍ତ କରତେ ବ୍ୟବହର ହୁଏ ।

(୩) ଏଲକୋହଲ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବେର କରତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରୁବ୍ୟ ଏଲକୋହଲେ ସହଜେ ଗଲେ ଯାଏ । ତାଇ ଏହି ଏଲକୋହଲ ନାନା ପ୍ରକାର ମୁଗଙ୍ଗି ପ୍ରତ୍ଯେକଟି କରତେ ଓ ଲେବୋଟେରିତେ ରି-ଏଜେନ୍ଟ୍ସ ତୈରିତେ ବ୍ୟବହର ହୁଏ ।

(୪) ରି-ଏଜେନ୍ଟ୍ ହିସାବେ ଏଲକୋହଲ ରସାୟନ ଓ ପ୍ରାଣରସାୟନେ ବ୍ୟାପକଭାବେ ବ୍ୟବହର ହୁଏ ।

(୫) ଏଲକୋହଲ ପଚନ ରୋଧ କରତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବଲେ ସଂରକ୍ଷଣକର (preservative) ଦ୍ରୁବ୍ୟ ହିସାବେ ବ୍ୟବହର ହୁଏ ।

ପାନୀୟ ହିସାବେ ଏଲକୋହଲ ତଥା ମଦେର ଅପକାରିତା ଅନେକ ଯା ଗବେଷଣାୟ ପ୍ରମାଣିତ । ଏଇ ସବଚେଯେ କ୍ଷତିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ମନ୍ତ୍ରିକେର ଉପର, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ସକଳ ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନୀରୀ (pharmacologists) ଏକମତ ଯେ ମନ୍ତ୍ରିକେର ଉପର ମଦେର ପ୍ରଭାବ ଯୋଟେଇ ଉପକାରୀ ନୟ ବରଂ ସବ ସମୟ କ୍ଷତିକର । ଏ ବିଷୟେ ଐକମ୍ୟ ରହେଛେ ଯେ ମଦ ଏକଟି ନେଶାକର ବନ୍ଦୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟକାରୀ ନୟ । ୨ ମଦେର ନେଶା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏବଂ ଅବସାଦ ଦାନକାରୀ ପ୍ରଭାବ ମନ୍ତ୍ରିକେର ଉପର ସରାସରି କାର୍ଯ୍ୟକର ହୁଏ । ଏକେ ପ୍ରାଥମିକଭାବେ ଉତ୍ସେଜକ ବନ୍ଦୁ ବଲେ ମନେ ହୁଏ । ଏକପାଇଁ ନାନା କର୍ମକାଳ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କଥା ବଲା ଆସିଲେ ନେଶାକାରୀକେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଇ ଯାର କାରଣ ତାର ଉଚ୍ଚତର ମାନବୀୟ ଧୈର୍ୟ ଓ ପ୍ରଜାର ଅଭାବେ ତାର ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗରେ ମନୋବ୍ୟକ୍ତିଗତୀରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ । ଦୁଇ ବା ତିନି ଆଉସେର ଏକ ଡୋଜ ହିସିକ୍ (୪୦% ଏଲକୋହଲ) ପାନେର ଫଳେ ମନୋନିବେଶ, ମନୋଯୋଗ, କୃତିର୍ଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତିଦାନେର କ୍ଷମତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ମନ୍ତ୍ରିକେର ସଙ୍ଗେ କର୍ମକାଳେର ସମ୍ପର୍କ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଯେହେତୁ ତାର ମନେର ଓ ବିବେକେର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇ, ନିଜେର ଦୋଷ ଦେଖିବାରେ ପାଇ ନା, ନିଜେର ପ୍ରତି ଆସିବିଶ୍ଵାସ ଅନ୍ତାଭାବିକଭାବେ ବେଦେ ଯାଏ ତାଇ ନେଶାକାରୀ ଯେ କୋନ କାଜେଇ

সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে বেথেয়াল হয় এবং যেখানে বিচার শক্তি ও ভাল-মন্দ বুঝে কাজ করার প্রয়োজন হয় সে সময় তা করতে পারে না। যদি রক্তে মদের পরিমাণ ০.১৫% (১৫০ মিঃ গ্রাঃ) বা তার বেশী হয় তাহলে নেশাকারীর গাড়ী চালানো পথচারীর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

(২) নিউম্যান এবং ফ্লেচার<sup>৪</sup> ৫০ জনের দৃষ্টিশক্তির উপর মদের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছেন। রক্তে ০.১১৫% বা তার বেশী পরিমাণ মদের উপস্থিতির ফলে সবাই দৃষ্টিশক্তির হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ দিয়েছে। গোল্ডবার্গের<sup>৫</sup> মতে মদপানে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় বলেই মদ্যপানকারীদের গাড়ী চালনায় বেশী সড়ক দূর্ঘটনা ঘটে। তিনি লিখেছেন মদাপানে দৃষ্টিশক্তির উপর সেরুপ প্রভাব পড়ে যা চোখের সামনে একটি ঘোলা কাচ রাখলে যেরূপ হয়ে থাকে অথবা গোধূলি বেলায় কালো চশমা পরে বা অঙ্ককারে গাড়ী চালালে যেরূপ অবস্থা হয়। কোন বস্তুকে পরিষ্কার বুঝতে হলে উজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন হয় এবং বস্তু আলোতে কোন বস্তুকে স্পষ্ট করে দেখাই যায় না। যখন কোন ব্যক্তির চক্ষু উজ্জ্বল আলোতে ঝলসে যায় তার পক্ষে স্পষ্ট করে দেখতে একটু সময় লাগে। আর মদ্যপানকারীর বেলায় এই অবস্থায় অনেক বেশী সময় লাগে।

(৩) যদিও ৭% মদ পানিতে মিশিয়ে পান করলে হিস্টামিন জাতীয় বস্তু বা গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণের ফলে সাময়িকভাবে পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ক্ষরণ বন্ধ পায়<sup>৬</sup>। এর চেয়ে বেশী পরিমাণে (১৫-২০%) পান করলে পাকস্থলীর বিভিন্ন রসের ক্ষরণ হ্রাস পায় এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবে পাকস্থলীর প্রদাহ দেখা দিতে পারে। এক সঙ্গে বেশী মদ্যপানে প্রায়ই বমি হয়ে থাকে।<sup>৭</sup> এছাড়া বার বার অল্প পরিমাণে এবং ধীর গতিতে পান করার ফলে পাকস্থলীতে অতিরিক্ত এসিড উৎপন্ন হয় (hyperchlorhydria) যা পেপটিক আলসার বা পাকস্থলীর ঘা সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং এই রোগ মদ্যপান চালু রয়েছে এমন সব দেশেই বেশী।<sup>৮</sup>

(৪) প্রোনম্যান লক্ষ্য করেছেন যে ২ থেকে ৩ আউস হাইকি পানে নাড়ীর গতি ৫% থেকে ১০% বৃদ্ধি পায়। রক্তচাপ এবং শরীরে রক্ত প্রবাহণও (হৃদপিন্ডের ধর্মনিতে নয়) বৃদ্ধি পায়।<sup>৯</sup>

(৫) পান করা মদের ৯০% থেকে ৯৫% যকৃতে অক্সিডাইজ (oxidized) হয়<sup>১০</sup> এবং মদ (ethyl alcohol) যকৃতের স্বাভাবিক কার্যকরিতা নষ্ট করে।<sup>১১</sup>। ডানকান লক্ষ্য করেছেন যে প্রতি কেজি ওজনের ইন্দুরকে ৩ গ্রাম এলকোহল দিলে, যা ৬০ কেজি ওজনের একজন মানুষকে ১০০ প্রফ হাইকির ১৮ আউস দেওয়ার সমান। ইন্দুরের যকৃতের প্লাইকোজেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বর্তমানে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, alcoholic fatty liver বা

**hepati steatosis** (ଯକୃତେ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଯା)-ଏର ଥ୍ରେଣ କାରଣ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶର୍କରାଜାତ ଉପାଦାନେର ଅଭାବ ବା ଅପୁଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ନୟ ୧୩,୧୪ । ଯକୃତେର ଟୁପର ମଦେର ସରାସରି ପ୍ରଭାବ ଇନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟେ ଓ ପ୍ରମାଣିତ ହାଲେଛେ । ୧୫ ଏହି fatty liver ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରୋସିସ (cirrhosis) ରୋଗେ ପରିଣତ ହତେ ପାରେ ଏବଂ କୋନ କୋନ ସମୟ ରଙ୍ଗେର ଶିରାଯ fat embolism ହେଁ ହଠାତ୍ ଅଜାନ ହୋଯା ଏମନକି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ପାରେ ।

(୬) ମନ୍ତିକେ ଏଲକୋହଲ ପୌଛାଳେ, ମନ୍ତିକେ ଥେକେ ଶରୀରେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକ୍ରିୟ ମାଂସପେଶିର ପ୍ରତି ନିର୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣେ ବାଧାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏର ଫଳେ ଫ୍ରଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଶି ସଙ୍କୋଚନ ଘଟେ ଥାକେ । ଏଇ ଧରଣେର ବାଧା, ଭାରୀ ଆଓୟାଜେ କଥା ବଳା, ଦାଁଡ଼ାତେ ଅକ୍ଷମତା ଏମନ କି ସ୍ଵେଚ୍ଛା ମାଂସପେଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସାଡ ହେଁ ଯେତେ ପାରେ । ମନ୍ତିକେର ନିର୍ଦେଶ ପାଲନେ ବିଲାସ ଏହି କ୍ଷତିର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ । ମନ୍ତିକେ ମଦେର ଉପହିତି ମାଂସପେଶିକେ ନିର୍ଦେଶ ମାନନ୍ତେ ବିଲାସିତ କରେ । ଫର୍ବସ ପ୍ରମାଣ କରେଛେ ଯେ ରଙ୍ଗେ ମଦେର ପରିମାଣ ୦.୧୦% ଥେକେ ୦.୨୦% ହଲେ ମନ୍ତିକେର ନିର୍ଦେଶ ପାଲନେ ୧୦ ଥେକେ ୩୦% ବେଳୀ ସମୟ ଲାଗେ । ଏକଟି ମୋଟର ଗାଡ଼ୀ ଯଦି ଘଟାଯ ୩୦ ମାଇଲ ବେଗେ ଚଲେ ତବେ ପ୍ରତି ସେକେନ୍ଦ୍ରେ ୪୪ ଫୁଟ ଦୂରତ୍ବ ଅଭିକ୍ରମ କରେ । ତାଇ ମନ୍ତିକେର ନିର୍ଦେଶ ମାନନ୍ତେ ଯଦି ଏକ ସେକେନ୍ଦ୍ରେ ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ଦେରୀ ହୁଏ ତା ହଲେ ଦୁଘଟନା ଘଟାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଚାର ।

(୭) ବ୍ରାସେଲସ ୧୬ ଲିଖେଛେ, ଯଦି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷ ଏବଂ ହୃଦୀୟଭାବେ ଉତ୍ତେଜକ (irritant) । ପ୍ରଚଲିତ ଧାରଣାର ବିପରୀତେ ଯଦି ମୋଟେଇ ଉଦ୍ଦୀପକ (stimulant) ନୟ ଯଦିଓ ମଦ୍ୟପାନେର ଆପାତ ଉତ୍ତେଜନାକେ ଉଦ୍ଦୀପକ ବଳେ ଧାରଣା କରା ହୁଏ । ମେର୍କିକୋର ଡଃ କୁଯାରନ (Cuaron) ୧୭ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ ଯେ ତାର ଦେଶେର ଅଧିକାଂଶ ହିଂସାଭ୍ରକ ଅପରାଧ ଯେମନ ଆକ୍ରମଣ, ନରହତ୍ୟା, ଚାରି, ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଏବଂ ସମ୍ପଦେର କ୍ଷତିସାଧନ ଇତ୍ୟାଦିର ଜନ୍ୟ ବିଷେର ରାଜା ଯଦିଇ ଥ୍ରେଣ ଅଧାନତ ଦାରୀ । ଫୋରେଲ (Forel) ୧୮ ଲିଖେଛେ, “ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳେ ଯେ, ଯେବେ ଦେଶେ ମଦ୍ୟପାନେର ଅଭ୍ୟାସ ରହେଛେ ସେ ସବ ଦେଶେ ଅର୍ଧେକ ଥେକେ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଅପରାଧ, ଆଭାହତ୍ୟା, ମାନସିକ ବୈକଳ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଯୌନ ଅପରାଧ, ଯୌନ ବ୍ୟଧି ଏବଂ ପରିବାର ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ବିରାଟ ଅଂଶେର ଜନ୍ୟ ଦାରୀ ଯଦି । ସୁହିଜାରଲ୍ୟାନ୍ଡେର ୧୫ଟି ବଡ଼ ଶହରେର ହିସାବ ଥେକେ ଜାନା ଯାଏ ଯେ, ପୁରୁଷ ଆଭାହତ୍ୟାକାରୀର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଏବଂ ବିଶ ବଂସରେର ଅଧିକ ବୟସୀ ପୁରୁଷେର ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଦଶମାଂଶେର ଜନ୍ୟ ଯଦିଇ ଥ୍ରେଣ ଅଧାନତ ଦାରୀ ।

(୮) ମଦ୍ୟପାନେର ସବଚୟେ ମାରାଘକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଏହି ଯେ, ଏଟା ଏକଟି ଏମନ ବଦାଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନେଶାକ ଜିନିସ ଯା ପ୍ରତିରୋଧ ପାନ କରାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗର୍ତ୍ତ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ପରିମାଣେ ସତ୍ତ୍ଵ ଥାକା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ । ବଲତେ ଗେଲେ ମଦେର କୋନ ନିରାପଦ ପାନ-ମାତ୍ରା (dose) ନେଇ ଏବଂ ମଦ୍ୟ ପାନେର ଶେଷ ପରିଣତି ମଦ୍ୟପ

বোগী হয়ে যাওয়া যাকে বলে chronic alcoholism। এই রোগের সংজ্ঞা হলো ব্রহ্মাবের বিকৃতি সাধন যার ফলে মদ্যপায়ী ঘন ঘন মদ্যপান করতে থাকে যা ক্রমে সাধারণভাবে স্বাভাবিক পান-মাত্রাকে অতিক্রম করে এবং তার সামাজিক, আর্থিক ও শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। ১৯ সুতরাং মদ্যপ বা গাড়াল (alcoholic) সেই বাণিজ্যে তার মদ্যপানের উপর থেকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে অথবা মদ পান না করে থাকতে পারে না যার মধ্যে অত্যধিক মদ্য পানের কুফল প্রকাশ পায়।

(৯) অসামাজিক আচরণ : মদ মানুষের মানসিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নষ্ট করার ফলে মানুষ অসামাজিক আচরণ করে বলে প্রাচীন রোমক বুদ্ধিজীবীরাও জানতেন। বিখ্যাত রোমক দার্শনিক 'সেনেকা'<sup>২০</sup> লিখেছেন-মাত্রান অবহৃৎ সকল পাপের ইঙ্কান যোগায় এবং সকল পাপকাজের বাহ্যিক প্রকাশ হয়। যে লজ্জা মানুষের পাপ প্রবৃত্তি গোপন করে সেই লজ্জাকেই মদ দূর করে দেয়। অধিকাংশ মানুষ নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে পাপ করতে লজ্জা পায় বলে, তাল কাজ করতে মন চায় বলে নয়। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সন্ত্রাসের জন্য মদের প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য।<sup>২১</sup>

(১০) মদ ও মানসিক ব্যাধি : মদ্যপান মানসিক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। দীর্ঘ কাল ধরে প্রচুর মদ্য পানের অভ্যাস হঠাতে বন্ধ করলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আবল-তাবল কথা বলতে থাকে যার বৈজ্ঞানিক নাম delirium tremens। অবশ্য এটা দীর্ঘ টিকিংসার মাধ্যমে আরোগ্যযোগ্য। এতে অনেক সময় অলীক ও ভীতিপ্রদ জন্ম-জানোয়ার দেখে রোগী ভয় পায় এবং খুব শোরগোল করে। বারবার এরূপ হলে মানসিক অবনতি, বুদ্ধিবৃত্তিরহাস এবং স্মৃতিশক্তিহীনও হতে পারে।<sup>২২</sup>

(১১) মৃত্যুহার : Tashira ও Lipscombe<sup>২৩</sup> রিপোর্ট করেছেন যে, ক্যালিফোর্নিয়াতে মদ্যপানে মৃত্যুর হার স্বাভাবিক মৃত্যুহার থেকে আড়াই গুণ বেশি। তারা ব্যক্ত লোকদের মধ্যে ৯% দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তুলনায় মদখোরদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার দেখতে পেয়েছেন ২৫%। Dahlgren<sup>২৪</sup> মদ্য পানের ফলে পানিতে ডুবে দুর্ঘটনায় ও আঘাত্যায় মৃত্যুর সংখ্যা বেশী লক্ষ্য করেছেন। Kessel ও Grossman<sup>২৫</sup> তাইহত্যার হার মদ্যপানকারীদের মধ্যে ৮০ গুণ বেশী পেয়েছেন।

(১২) মদ্যপানের নেশার টিকিংসা তেমন সত্ত্বেজনক নয়। মদের নেশা দূর করার জন্য কয়েক বছরব্যাপী টিকিংসায়ও ভাল ফল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে মদ্যপান ছেড়ে দেওয়া যথেষ্ট নয়। কারণ মদের নেশা প্রায়ই পুনঃ পুনঃ দেখা দেয়।<sup>২৬</sup>

উপরের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, উপকারিতার তুলনায় মদের অপকারিতা অনেক বেশী।

একই আয়তে (আয়ত ২ : ১১৯) মদের সঙ্গে জুয়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে। জুয়া বলতে সাধারণভাবে কোন বিষয়ে কোন সুযোগ গ্রহণ করে সুবিধা লাভ করাকে বুঝায়। আর সীমিতভাবে বলা যায় যে জুয়া হলো সামান্য কিছুর বিনিয়য়ে হঠাৎ প্রচুর লাভ করার প্রচেষ্টা। দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেছেন যে জুয়া মানুষের দুটি মৌলিক স্বভাবকে আর্কর্ষণ করে, যেমন- লাভ করার আকাঙ্খা ও অনিচ্ছাতার রোমাঞ্চ।

মদের মত জুয়াতেও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। জুয়ার কিছু কল্যাণ রয়েছে, যেমন-

(১) জুয়াড়ি সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করে বিনা মেহনতে প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারে।

(২) সে নেহায়েত ভাগ্যগুণে আয় করে।

(৩) কেউ কেউ সামান্য পরিমাণ টাকা বাজি ধরে জুয়া খেলাকে চিন্তিবিনোদন বলে মনে করে।

প্রাচীন কাল থেকেই নামাভাবে জুয়ার মাধ্যমে আর্থিক লাভ করার প্রচেষ্টা সব দেশেই চলে আসছে যদিও কেউ কেউ তার প্রচণ্ড বিরোধিতাও করেছে। বর্তমানে প্রায় সব দেশেই জুয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন রয়েছে। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি এবং বাগড়া বিবাদ ও উচ্চজ্ঞলতা প্রতিরোধের জন্য আইনের প্রয়োজন। কারণ প্রাচীন কাল থেকেই জুয়ার ইতিহাস নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।<sup>১৭</sup>

জুয়ার ক্ষতিকর দিক যে অনেক বেশী তা নিম্নের বর্ণনা থেকে বুঝ যাবে :

(১) যদিও কোন জুয়াড়ি কখনও কখনও ভাল আর্থিক লাভ করতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত সে ক্ষতিগ্রস্তই হয়ে থাকে। জুয়াড়ি মাঝে মাঝে জিতে, তবে প্রায়ই হারে।

(২) মদ্যপানের মত জুয়াখেলাও একটি বদ অভ্যাস সৃষ্টিকারী সামাজিক অপরাধ। অন্তেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী মিঃ কেনা ((Kenna))<sup>২৮</sup> ঘোড় দৌড়ে সংগ্রহে কয়েক শিলিং বাজি ধরে এমন অংশ গ্রহণকারী এবং একই রাতে হাজার হাজার পাউন্ড নিয়ে জুয়া খেলে ব্রিটানির এ ধরনের জুয়াড়িদের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন। তিনি বলেন, জুয়া সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট জানা যায়নি। কেন মানুষ জুয়া খেলতে প্রবৃত্ত হয় এবং জুয়ার নেশা আর চিন্তিবিনোদনের মধ্যে সীমারেখা কোথায় তাও নির্ধারণ সম্ভব নয়। যথেষ্ট গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, জুয়ার নেশা মদের নেশার মতই একটা শারীরবৃত্তিক মানসিক রোগ। এ কথা সবাই জানে যে, মদ্যপানের মত জুয়াও এমন এক নেশা সৃষ্টি করে যে যথেষ্ট আর্থিক লোকসান হওয়া সত্ত্বেও জুয়া না খেলে কোন জুয়াড়ি বসে থাকতে পারে না।

(৩) মদখোরদের মত জুয়াড়িরা প্রায়ই শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হয় যখন তাদের নেশার ঘোক কম থাকে।

(৪) জুয়ায় হেরে প্রচুর লোকসানের ফলে অনেক স্বচ্ছ এবং সৰ্মাজে প্রতিষ্ঠিত পরিবার গৰীব হয়ে পড়ে।

(৫) অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে জুয়াড়ির পারিবারিক জীবন অসুস্থী হয় এমনকি ভেঙ্গেও যেতে পারে।

(৬) জুয়া খেলার জন্য টাকার অভাব হলে জুয়াড়ি টাকার জন্য তহবিল তসরুফ, চুরি, ঘোকাবাজি এবং নানাক্রপ অপরাধগুলক কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।

(৭) কোন যোগ্যতা ছাড়াই যে জুয়াড়ি ভাগ্য বলে প্রচুর অর্থ অর্জন করে সে সমাজের সেই সব লোক যারা সৎ জীবন যাপনের জন্য প্রাণপণ পরিশৰ্ম করে তাদের জন্য একটি খারাপ নমুনা।

(৮) জুয়ায় বা লটারিতে বিরাট অংকের অর্থ লাভ করা আর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোকা দিয়ে অনেক লোকের টাকা আঘাসাত করার মত অপরাধ।

(৯) সরকারি বা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লটারির ব্যবস্থা মানুষের পরোপকারের মত মহৎ গুণের সৃষ্টি করে না। বরং এতে মানুষকে লাভের জন্য, অর্থ লাভের প্রায় অসম্ভব প্রয়াসে আঘাসিয়োগ করে স্বীয় আঘাসাতারণার শিক্ষা দেওয়া হয়।

সুন্তরাঃ মদ ও জুয়া খেলায় কোন কল্যাণ নেই, তার চেয়ে অকল্যাণ যে অনেক বেশি কুরআনের বর্ণনায় তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

### তথ্যসূত্র

1. Badri, M. B. Islam and Alcoholism, American Trust Publications, p. 3, 1976.
2. Härger, R. N. The Pharmacology and Toxicology of Alcohol, J. Amer. Med. Asoc. Vol. 167 (August), p. 2199, 1958.
3. Hebbelinck, M., The Effects of a Moderate Dose of Alcohol on a Series of Functions of Physical Performance in Man. Arch. Intern. Pharmacodyn. Therapy. Vol. 120, p. 402, 1959.
4. Newman, H. and Fletcher, E. Effect of Alcohol on Vision. Am. J. M. Sc. 202, 723. 1941.
5. Goldberg, L. Alcohol and Road Traffic. Kugebergs Bektryckeri, Stockholm, p. 92. 1951.
6. Beazell, J. M. and Ivy, A. C. Influence of Alcohol on Digestive Tract, Quart. J. Stud. Alcohol; 1 : 45, 1940.

7. Newman, H. W., Emetic Action of Ethyl Alcohol. Am. Med. Assoc. Arch Int. Med. 94:417, 1954.
8. Cleave, T. L. Peptic Ulcer. John Wright and Sons, Ltd. 1962.
9. Gronman, A. Influence of Alcohol on Circulation, Quart. J. Stud. Alcohol; 3 : 5, 1942.
10. Thompson, G. N. Alcoholism, Thomas, Springfield, 1956.
11. Josephson, B. and Asplund, A. G. Effect of Acute Alcohol Poisoning on Liver Functions, Svenska Lak, 45: 1564, 1948, abstracted, Quart, J. Stud. Alcohol, 9:614, 1949.
12. Forbes, G. Effect of Alcohol on Psycho-Motor Reactions on Possible Index of Degree of Alcoholic Intoxication, Medico-legal J. 15-23, 1947.
13. Cammermeyer, J. and Gjessing, R. Acta Med. Scand 139: 358, 1951.
14. Durlacher, S. H. Meier, J. R. Fishers R. S, and Levith, W. V. Am, J. Path. 30: 633, 1954.
15. Leiber, C. S., Jones, D. P. Medesion, J. and De Carti, L. M. Trans, Assoc, Auner phycns, 76: 289, 1963.
16. Brussel, J. A., Alcoholism, Collier's Encyclopaedia, Vol. 1, p. 347, New York, 1956.
17. Cuaron, A. Q., Morning News, Dhaka, 27.6.60, 1960.
18. Forel, A.A.M.J., Insanity, 57:297, 1900.
19. Keller, M. and Efron, V. Quart, J. Stud, Alcohols, 16: 619, 1955.
20. Seneca, L. A. (4Bc-65 A. D.). Classics to Alcohol Literature, Seneca's Epistle LXXXIII: On Drunkenness, Quart. J. Stud. Alcohol., 3:301.
21. Spain, D. M., Bradess, V. A. and Eggston, A. A. Alcohol and Violent Death, J. Am. Med, Assocs, 146:334, 1951.
22. Hulton, I. E. Mental Disorders in Modern Life. William Heinemann Ltd. London, 1940.
23. Tashira, W. and Lipscombe, W. R. Quart, J. Stud, Alcohol, 24: 50C, 1963.
24. Dahlgren, K. G., Acta, Psychiat, Seand, 26: 297, 1951.
25. Kessel, N. and Grossman, G., Front M. J. 2:1671, 1961.
26. Edwards, G., Hosp. Med 2:272, 1967.
27. Walley, H. R., Gaming and Gambling, Collier's Encyclopaedia. Vol. 8, p. 562, New York, 1956.
28. Kenna, Morning News, July, 30th, Dhaka, 1960.

وَيُنَكِّلُونَكَ عَنِ الْجِبْرِيزِ فَلْ مَوْأِذِيٌّ فَأَنْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْجِبْرِيزِ<sup>۲</sup>  
وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرُنَّ فَإِذَا أَتَطْهَرْنَ فَأُنْزَلْنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ<sup>۳</sup>  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ<sup>۴</sup>

২ : ২২২ (হে নবী) লোকেরা আগনাকে স্ত্রীলোকের ঝতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এটি একটি অসুস্থতা বিশেষ। সুতরাং এ সময়ে নারীদেরকে একলা ছেড়ে দাও এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহর হৃকুম মতো তাদের সঙ্গে মিলিত হও। নিচয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা পছন্দকারীদেরকে ভালবাসেন।

প্রাণবয়স্ক নারীদের প্রতি মাসে ৫-৭ দিন পর্যন্ত জরায়ুর রক্তক্ষরণকে মেয়েদের ঝতুস্মাব বলা হয়, যা গর্ভকালীন অবস্থায় বন্ধ থাকে। যদিও এটি একটি স্বাভাবিক নিয়ম তবুও ঝতুস্মাব, প্রস্তাব বা মলত্যাগের মত নিরাপদ বা বিপদমুক্ত নয়। কুরআনের বর্ণনা মতে ঝতুস্মাব একটা যন্দু অসুস্থতা বিশেষ যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমর্থিত।

(১) বিখ্যাত স্ত্রীরোগবিশারদ উইলফ্রিড শ'১ লিখেছেন, “ঝতুস্মাবের সময় বিশেষ করে তলপেটে সামান্য অসুস্থতা বোধ হতে প্রায়ই দেখা যায়।” কোন কোন কুমারী মেয়ের প্রথম ঝতুস্মাবের সময় প্রচুর ব্যথা হয় এবং কারো কারোর বেলায় সারা জীবনই ঝতুকালীন সময়ে কিছু ব্যথা অনুভব করেন।

(২) ডাঃ জোয়ান প্রাহাম<sup>২</sup> লিখেছেন, “ যেহেতু ঝতুস্মাবের সময় রোগ বিস্তার এবং রোগজীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে তাই একে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যসম্মত বলা যায় না।”

(৩) ডাঃ ক্যাথারিন ডাল্টন<sup>৩</sup> একজন বৃটিশ মহিলা ডাক্তার। বিটিশ যুক্তরাজ্যে তিনি ১৯৫৯-৬১ সালে হাসপাতাল, হোস্টেল এবং জেলখানায় যুবতী মহিলাদের কর্মকাণ্ডের উপর ঝতুস্মাবের প্রভাব নিয়ে গবেষণা চালান। তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে তিনি বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ঝতুস্মাব শুরুর পূর্বে এবং স্বাবের সময় মেয়েদের শারীরিক সুস্থতা এবং যোগ্যতা যথেষ্ট হ্রাস পায়। ডাঃ ডাল্টন আরো লক্ষ্য করেন যে, এ সময় উদাসীনতা, অমনোযোগিতা, খেলাধূলায় আগ্রহের অভাব এবং বেশী কথা বলার প্রবণতা ২৬% থেকে ৩৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যেসব মেয়ে স্বভাবত

অপরাধগ্রবণ, এ সময় তাদের অপরাধ করার প্রচেষ্টা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি আরো লিখেছেন, ৬ষ্ঠ প্রেডের ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক ১১ জন বালিকাকে ক্লাস মনিটর নিযুক্ত করা হয়েছিল যারা অপরাধের শাস্তি দেওয়ার অধিকারী ছিল। লক্ষ্য করা গেছে যে, এই মনিটরগণ তাদের ঝতুস্বাবের সময় তাদের শাস্তি দেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তারা স্নাবের সামান্য পূর্বে এই শাস্তির পরিমাণ বাড়ায় এবং স্নাবের পুরো সময় আরো বাড়ায় এবং ঝতুর পর আবার স্বাভাবিক হয়।

উপরের গবেষণালক্ষ ফলাফল দেখে ডাঃ ডাল্টন প্রশ়ি তুলেছেন যে, যদি ঝতুর সময় সকল মহিলাদের এ ধরনের প্রতিক্রিয়া সত্য হয় তাহলে মেয়েদেরকে বিশেষ করে শিক্ষিকা, ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রশাসকের পদে তাদের নিযুক্তি কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ের ডাঃ আরডেলি<sup>৪</sup> ৭২৯ জন হাঙ্গেরীয় মহিলা ক্রীড়াবিদের উপর তাদের ঝতুস্বাবের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, টেনিস এবং নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাকালে তাদের ক্রীড়ার মান ঝতুস্বাবের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

উপরে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে ঝতুস্বাবকে ‘অসুস্থতা বিশেষ’ বলা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং এই সময় সকল মহিলাদের উচিত শারীরিক পরিশ্রম ও জীবাণু সংক্রমণ থেকে সাবধান থাকা।

ঝতুর সময় আল্লাহ তা‘আলা যৌন মিলন নিষিদ্ধ করেছেন, এটাও চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে যুক্তিসঙ্গত।

ঝতুস্বাবের সময় জরায়ুর মুখ, যা অন্য সময় মিউকাস জাতীয় জিনিষ দিয়ে বঙ্গ থাকে, খুলে যায় যেন স্নাবের রক্ত বের হতে পারে। স্নাবের পর জরায়ুর ভেতরের দেয়ালে যে অতিরিক্ত কোষ বৃদ্ধি হয় তা গর্ভধারণ না হলে নষ্ট হয়ে রক্তের আকারে বের হয়। গর্ভধারণ করলে কোন স্নাব হয় না।

ঝতুর সময় যেহেতু জরায়ুর মুখ খোলা থাকে, তখন যৌন মিলন হলে, বাইরে থেকে রোগজীবাণু প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া যদি যৌন পথে পূর্ব থেকেই রোগ জীবাণু থেকে থাকে তাহলে সেই জীবাণু জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এই জীবাণু প্রবেশ ভীষণ ক্ষতির কারণ হতে পারে এই জন্য যে, জরায়ুর দুপাশের ফেলোপিয়ন টিউবের মাধ্যমে জরায়ুর সঙ্গে পেটের ভিতরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ফলে যদি স্তৰীর যোনিপথে জীবাণু সংক্রমণ থাকে যেমন গনোরিয়া ও সিফিলিস, তবে যৌন মিলনের ফাঁকে সেই রোগ জীবাণু জরায়ুর দুই ফেলোপিয়ন টিউব দিয়ে তলপেটে প্রবেশ করে মহিলাদের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যেমন এন্ড্রোমেট্রাইটিস, সালপিনজাইটিস,

পেরিটোনাইটিস এবং পেলভিক সেলুলাইটিস ইত্যাদি। যদি ঐ মহিলা ট্রাইকোমোনা ভেজাইনালিস (*Trichomonas vaginalis*) নামক পরজীবীর আক্রমণে লিউকোরিয়া রোগে আক্রান্ত থাকে তবে যৌন মিলনের কালে পুরুষ যৌন সাথীর মৃত্রনালীতে একই রোগ ট্রাইকোমোনাল ইউরেথ্রাইটিস (*trichomonal urethritis*) হতে পারে। এছাড়া রোগাক্রান্ত পুরুষ ঝুতুস্বাবের সময় যৌন মিলনে সহজেই নারীকে যৌন রোগে সংক্রমিত করতে পারে।

একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে, যৌন মিলন একটি উন্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। তাই সে সময় যথেষ্ট স্বাস্থ্যবিধিসম্মত নিয়ম পালন করা সম্ভব হয় না। আর ঝুতুর সময় যেহেতু স্বাবের জন্য জরায়ুর দেয়াল উন্মুক্ত থাকে এবং জরায়ুর মুখও খোলা থাকে তখন যৌন মিলনে নারী দেহে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী।<sup>৫</sup>

ডাঃ গ্রাহাম বলেছেন, ঝুতুস্বাবের সময় যৌন মিলন নিষিদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ মনঃস্তান্ত্বিক নয় বরং স্বাস্থ্যবিধি সম্মত। এছাড়া স্বাবের সময় রক্ত বের হতে থাকে সে সময় যৌন মিলন কুরুচির পরিচায়ক এবং তা কোন ভদ্রোচিত কাজ নয়। সুতরাং সুরুচির স্বার্থেও এ সময় যৌন মিলন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

ইসলামে স্বাবের রক্তকে অপবিত্র ঘোষণা করেছে কিন্তু ঝুতুমতী মহিলাকে নয়। সে সময় শুধু যৌন মিলন নিষিদ্ধ কিন্তু তাই বলে তাদেরকে অপবিত্র মনে করা উচিত নয়, যেমন কোন কোন সমাজে তেমন করা হয়।

সুতরাং এ ব্যাপারে কুরআনের সকল বিধি-বিধান বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্য বিধিসম্মত।

### তথ্যসূত্র :

- Shaw, W., *Text Book of Gynaecology*, Churchill, London, p. 106, 1948.
- Graham, J., *Any Wife or Any Husband*, Heinemann, London, p. 44, 1955.
- Dalton, K., *Porit, Med. J.*, 1:148, 1959.
- Erdelyi, G. T., *Time*, New York, p. 40, Dec, 12, 1960.
- Muazzani, M. G., *Quran-e-Biggan*, Adhunik Prokashani, Dhaka, p. 81, 1981.

## نَسَادُ كُلُّ حَرْثٍ لَكُمْ ۝ قَاتِلًا حَرْثَكُمْ أُنْ شَتَّمْ ۝ وَقَاتِلُوا إِلَيْكُمْ ۝

২ঃ ২২৩ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্রের মত, তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর নিজেদের ক্ষেতে গমন কর এবং তোমাদের আজ্ঞার জন্য (ভাল কাজ) পূর্বেই প্রেরণ কর (নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করো) ....।

ভূমিকর্ষণ হিসাবে স্ত্রীগণ : এই আয়াতে স্ত্রীগণকে স্বামী কর্তৃক ভূমিকর্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

একজন কৃষকের নিকট চাষের জমি অতি মূল্যবান সম্পদ। কারণ এটা তার জীবিকার ব্যবস্থা করে এবং তাদ্বারা মানসিক শান্তি লাভ হয়। সেই জমিতে সে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা চাষাবাদ করতে পারে কিন্তু যদি সে সাবধান না হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তা হলে জীবনে দুঃখ নেমে আসবে। জমিতে বীজ বপনের পূর্বে তাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে যেমন জমি চাষ করা, জমির আগাছা দূর করা, প্রয়োজনীয় পানি সেচ দেয়া এবং সার প্রদান করা ইত্যাদি। নতুনা জমির উর্বরতা নষ্ট হবে এবং খুব কম ফসল উৎপন্ন হবে।

একজন ভাল চাষী তখনই জমিতে বীজ বপন করে যখন জমিকে সেজন্য পুরোপুরি তৈরি করা হয় এবং উপযুক্ত বা যথাসময়ে সে বীজ বপন করে; কারণ সে জানে যে শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফসল হবে না।

এমনিভাবে একজন স্বামী যৌনমিলনের পূর্বে জেনে নেবে যে স্ত্রী শারীরিক ও মানসিকভাবে এ জন্য প্রস্তুত কিনা অর্থাৎ বীজ গ্রহণে রাজী কিনা। স্ত্রী যখন অপবিত্র অবস্থায় অর্থাৎ ঋতুমতী থাকে বা অসুস্থ থাকে অথবা স্বাতান প্রসবের পর স্বাব (নেফাস) বন্ধ হওয়া পর্যন্ত যা প্রায় ৪০ দিন হতে পারে। এই সব বিষয়ে সাবধান হয়ে স্বামী যেভাবে বা যখন ইচ্ছা যৌন মিলনে লিঙ্গ হতে পারে।

এ বিষয়ে আল্লামা ইউসুফ আলী তাঁর কুরআনের তাফসীরে লিখেছেন -

“যৌন জীবন কোন লজ্জাজনক কাজ নয় অথবা এটাকে অবহেলা করাও উচিত নয়, আবার এতে বাড়াবাড়িও করা ঠিক নয়। এটাকে চাষীর জমি চাষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সে বীজ বপন করে ভাল ফসল তুলবার নিয়তে, তবে সে চাষ করার ব্যাপারে নিজস্ব সময় ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। সে অসময়ে বীজ বপন করে না, অথবা এমনভাবে চাষাবাদ করে

না যাতে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। সে বৃক্ষিমান ও বিজ্ঞ এবং বাঢ়াবাঢ়ি করে না। মানুষের জীবনে এই ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি একে অন্যের দায়িত্বোধ থাকতে হবে। আর সবার উপরে মনে রাখতে হবে যে, এই যৌন জীবনেরও একটি আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে। আমাদের আত্মার কথা কখনও ভুললে চলবে না এবং মনে রাখতে হবে যে, আমাদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

وَالْمُطْلَقُتُ يَكْرَضُنَ بِأَنْفُسِهِنَ مُلْكَةُ قُرْدَوْ وَلَا يَجُلُّ لَهُنَ أَنْ يَكْلُمُنَ  
مَا حَلَّنَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنُّ يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

২ : ২২৮ যে সব স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া হয়েছে তারা যেন তিন মাসিক  
ঝর্না পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাদের গর্ভে যা  
কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের উচিত নয়, যদি  
সত্যিই আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাস থাকে।

ইন্দুৎ : এই আয়াত অনুযায়ী একজন তালাকপ্রাণ মহিলা তিন ঝর্নাব  
পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবে অন্য বিবাহ করতে পারবে। এটা নিশ্চয়ই (নিঃসন্দেহে)  
বৈজ্ঞানিক যাতে মহিলার পুনর্বিবাহের পর সন্তান প্রসব হলে সন্তানের পিতৃত্ব  
নিয়ে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি না হয়। ইসলাম সন্তানের প্রকৃত পিতৃত্বের উপর  
যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে।

গর্ভধারণ করলে নারীর ঝর্নাব বন্ধ হয় যাকে আমেনোরিয়া (amenorrhoea) বলে। এটাই গর্ভধারণের সর্বপ্রথম চিহ্ন। যাদের ঝর্নাব  
যথাসময়ে না হয়, যখন তখন বা অনিয়মিত হয় অথবা একেবারে স্নাব বন্ধ  
হওয়ার কাছাকাছি বয়স তাদের বেলায় স্নাব বন্ধ হয়ে যাওয়া আর নিয়মিত স্নাব  
হয় এমন নারীদের মত একার্থবোধক নয়। কোন যুবতী তার ঝর্নাব শুরু  
হওয়ার পূর্বে অথবা কারো স্বাভাবিকভাবে স্নাব বন্ধ অবস্থায় যেমন সন্তান প্রসবের  
পর অথবা জননীরোধ বড় সেবন বন্ধ করার পরও গর্ভধারণ হতে পারে। এছাড়া  
গর্ভের প্রথম অবস্থায় গর্ভ নষ্ট না হয়েও রক্তস্নাব হতে পারে (যা placenta বা  
'ফুল' গাঠিত হওয়ার সময় হতে পারে) তবে তা ঝর্নাব নয়। এ ধরনের স্নাবের  
জন্য লোকেরা একে গর্ভ নাই বলে মনে করতে পারে। তাই ইসলামী আইনে পর  
পর তিন ঝর্না পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তালাকপ্রাণ স্ত্রীর গর্ভধারণ নাই এ সম্পর্কে  
কোন সন্দেহ থাকবে না এবং তার পরবর্তী স্বামীর সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে  
কোন দ্বিধা থাকবে না। আর গর্ভ থাকলে মহিলাকে সন্তান প্রসব, পর্যন্ত অপেক্ষা

করতে হবে তা হলেও সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে অশ্ব থাকবে না। তিনি মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করলে মাঝে মাঝে সামান্য রক্তপাত হলেও গর্ভ থাকলে তার অন্যান্য লক্ষণ ধরা পড়ে যাবে। এছাড়া তিনি ঝাতুকাল অপেক্ষা না করলে প্রথম স্বামীর সন্তানের উপরও দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান হতে পারে যাকে superfecundation বা superfactuation বলা হয় যদিও তা খুব কমই হয়ে থাকে। সুতরাং ইসলামী বিধান পালন করলে এসব সমস্যা থাকবে না। মিশ্রবর্ণের বিয়েতে সাদা বা কালো বাচ্চা নিয়ে কোনরূপ আইনগত সমস্যারও সৃষ্টি হবে না।

নারী গর্ভধারণ করেছে কিনা, প্রথম অবস্থায় সেই নারী ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না, তাই আল্লাহ্ সত্য গোপন করতে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে নিষেধ করেছেন। এসব নিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষাদি করাও বেশ ঝামেলা। আর গর্ভ বেশীদিনের হলে তাকেও গোপন করতে পারবে না। তাড়াতাড়ি বিবাহের জন্য কোন মহিলা তার গর্ভধারণ গোপন করতে পারে তাই আল্লাহ্ এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন এবং মিথ্যা বলায় বড় শুনাহ বলে ঘোষণা করেছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি বন্ধ করা।

#### তথ্যসূত্র :

1. Clayton , S. G., Lewis, T.L.T, and Pinker, G.m Obstetrics, 13th edn., Arnold p. 45, 1980.
2. Muazzam M. G., Quran-e-Bigyan, Adhunik Prakashani, Dhaka, 1981.

٢٢٣ - وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامْلَيْنِ  
لَمْ أَرَأَدْ أَنْ يُتَّمِّرَ الرَّضَاعَةُ :

২৪ ২৩৩ যে পিতা চাই যে তার সন্তান পূর্ণ সময়কাল দুধ সেবন করক, তখন মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর কাল দুধ সেবন করাবে।

আর যদি তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে অন্য কোন মেয়েলোকের দুধ সেবন করাবার ইচ্ছা করে থাক তবে তাতে তাদের কোন দোষ হবে না, অবশ্য যদি নিয়ম মত মূল্য ধার্য করে তা আদায় করা হয়।

মায়ের দুধ পান করার সময়কাল : সকল শন্যপায়ী জন্মুর বেলায় নবজাতকের জন্য মায়ের শনে দুধ তৈরি হওয়ার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটে। মানুষ সহ সকল শন্যপায়ী জীবের বেলায় সন্তানদের বেশ কিছু দিন পর্যন্ত একমাত্র খাদ্যাই হচ্ছে মায়ের দুধ। কিন্তু ৭ম শতাব্দীর আরবে সন্তান পরিবারের মায়েরা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো অসম্মানজনক মনে করতো যেমন এই কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত আধুনিক সমাজেও মনে করা হতো। নকল থাদ্যের তুলনায় মায়ের বুকের দুধে অনেক উপকার রয়েছে যা সম্প্রতি চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ অনুধাবন করে শন্য দুধ পান করাবার জন্য তাকিদ দিচ্ছেন। সন্তান প্রসবের পর মায়ের শনে দুধ তৈরি হয় একে lactation বলে। সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় দুধ তৈরি বন্ধ থাকে কারণ প্লাসেন্টা (Placenta)-র ইন্ট্রোজেন, হাইপোথেলামাস এবং পিটুইটারী এঞ্চুর সন্মুখভাগের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব দূর হয়ে যায় এবং প্রোল্যাকটিন মারফত শনে দুধ তৈরি হয়। তবে প্লাসেন্টা (জরায়ুর ফুল) জরায়ু থেকে পৃথক হয়ে বের হয়ে যাওয়ার বা অকেজো হবার পূর্বে নয়। শনে দুধ সৃষ্টি শুরু হলে দুধের প্রবাহ শিশুর চোষণ বা শনের বোটাকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে জারি থাকে। হাইপোথেলামাস প্লাষের স্নায়ুর মাধ্যমে শিশুর শন চোষার দ্বারা প্রোল্যাকটিন, হোথ হরমোন এবং ACTH (adrenocorticotropic hormone) তৈরি হয় এবং যৌন হরমোনসমূহ (gonadotrophins) তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। যদি শনের বোটা রীতিমত উদ্বৃত্তি হতে থাকে তাহলে চার বৎসর পর্যন্ত শন দুধ প্রবাহ জারি থাকতে পারে।

শনের বোটা থেকে দুধ শনের নালীর চারপাশের myoepithelial কোষগুলোর কুঞ্চনের ফলে বের হয় যার জন্য প্রয়োজনীয় অঞ্জিটোসিন এর প্রভাব

ଯା ତନେର ବୋଟାର ଉଦ୍ଦିପନେର ଫଳେ ହାଇପୋଥେଲାମାସ ଓ ପିଟୁଇଟାରୀ ଗ୍ରାହେର ସମ୍ମୁଖଭାଗ ଥିକେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଅସ୍଱ିଟୋସିନ୍ ଓ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବେର ପର ଜରାୟକେ ବିଶେଷଭାବେ କୃତିତ କରେ ଏବଂ ଏର ଜନ୍ୟ ସ୍ତନ୍‌ପାନ ବା ତନ ମର୍ଦନ ସାହାୟ୍ୟ କରେ । ଏହି କୁଞ୍ଚନେର ଫଳେ ଯେ ବ୍ୟଥା ହୁଏ ତା ଶିଶୁର ତନ ଚୂଷାର ଫଳେ କମେ । ତବେ ଏହି କୁଞ୍ଚନେ ଜରାୟର ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଓ ଜରାୟର ଫୁଲ ବେର କରତେ ଏବଂ ଜରାୟକେ ଆବାର ସାଭାବିକ ଆକାରେ ଫିରେ ଯେତେ ସାହାୟ୍ୟ କରେ ।

ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବେର ପର ପ୍ରଥମ କରେକଦିନ ତନ ଥିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଏକ ରକମ ଆଠାଲୋ ପଦାର୍ଥ colostrum ବେର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତବୁ ଶିଶୁକେ ଯଥାରୀତି ତନ ଚୂଷତେ ଦିତେ ହେବେ ଯାତେ ଶିଶୁ ଓ ମାୟେର ମଧ୍ୟେ ମେହେର ବନ୍ଧନ ଗଡ଼େ ଉଠେ ଏବଂ ଦୁଧ ପ୍ରବାହିତ ହେତେ ସାହାୟ୍ୟ କରେ, ଆର ଶିଶୁର ତନ ଚୂଷତେ ଶିଥେ । ୨ କଲେଟ୍ରାମ ଏକ ପ୍ରକାର ପାତଳା, ହଲଦେଟେ ଦୁଧର ମତ ପାନୀୟ ଯାତେ ପ୍ରାୟ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମିଷ (protein) ଥାକେ ଯାର, ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟାଗ୍ୟ ଅଂଶରେ ହଲୋ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ଗ୍ଲୋବିଟିଲିନ (immunoglobulin = Ig) ଯାତେ ମାୟେର ରଙ୍ଗେର ଏନ୍ଟିବାଡ଼ି (antibodies) ଶୁଳ୍କ ବର୍ତମାନ ଥାକେ । ଏତେ ଦୁଧର ଚେଯେ ବେଶୀ ଖଣ୍ଜି ପଦାର୍ଥ, ଅଛି ଚର୍ବିଜାତୀୟ ଓ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥାକେ । ତାଇ ଏହି କଲେଟ୍ରାମ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜନ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ । କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେଓ କୃତିମ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ ଛିଲ ଯାର ଜନ୍ୟ ଦାୟୀ ଛିଲ ବ୍ୟବସାୟୀଦେର ବିଜ୍ଞାପନେର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଡାକ୍ତାର, ନାର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାରା ହସ୍ତ ପିତା ମାତାକେ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶ ଦିତେ ପାରିତେନ ତାଦେର ଅନୀହା । ଏର ଜନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଧାରଣ ପଦ୍ଧତିର ପରିବର୍ତନ ଓ ଦାୟୀ । କାରଣ ଆଧୁନିକ ଜୀବନେ କୃତିମ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଶନ ବେଶୀ ସହଜ ବଲେ ମନେ କରା ହେତୋ । ତବେ ବର୍ତମାନକାଲେ ଗବେଷଣାଯ ପ୍ରମାଣିତ ହେଯେ ଯେ, ମାୟେର ବୁକେର ଦୁଧ ଶିଶୁର ଜନ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୃଷ୍ଠିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏତେ ଶିଶୁକେ ରୋଗଜୀବାଣୁ, ବିଶେଷ କରେ ପେଟେର ଅସୁଖ ଏବଂ ହାଇପାର ସେସିଟିଭିଟି ଜାତୀୟ ରୋଗ ଥିକେ ରଙ୍ଗା କରତେ ସାହାୟ୍ୟ କରେ । ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗ ଥିକେ ମୁକ୍ତ ଥାକାର କରେକଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଯେଛେ । ଯେମନ : ମାୟେର Ig A ଏବଂ lysozymes ହୁଏ ଜୀବାଣୁକେ ଯେମେ ଫେଲେ ଅଥବା ତାଦେରକେ ଅନ୍ତରେ ଗାୟେ ଲେଗେ ଥାକତେ ବାଧା ଦେଇ; ମାୟେର ଦୁଧର lactoferrin ଖଣ୍ଜି ଲୌହ ଦ୍ରୁତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରତେ ସାହାୟ୍ୟ କରେ । ଫଳେ ରୋଗଜୀବାଣୁ ନିଜେଦେର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିର ଜନ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋହକଣା ପାଇ ନା ଏବଂ ମାୟେର ଦୁଧ ଉପକାରୀ lactobacillus bifidus ଜୀବାଣୁକେ ବୃଦ୍ଧି ପେତେ ସାହାୟ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବାଣୁକେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରତେ ବାଧା ଦେଇ ଯଦିଓ ଏସବ ଗରମ ଦୁଧ ପାନ କରଲେ ଯେ କ୍ଷାରକ (alkaline) ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାତେ ସହଜେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ମାୟେର ଦୁଧର IgA hypersensitivity ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିତେ ବାଧା ଦେଇ ଏବଂ ଗରମ ଦୁଧର ପ୍ରୋଟିନ ଏର -ଏନ୍ଟିବାଡ଼ି ତୈରି ହେଯାଏ ରୋଧ ହୁଏ ।

আধুনিক বিজ্ঞান এখন মায়ের দুধের উপকারিতার কথা জোর দিয়ে বলছে। অথচ ৭ম শতাব্দীর পবিত্র কুরআনে শিশুকে মায়ের দুধ পান করাতে হ্রফুম দেওয়া হয়েছে।

মায়ের দুধের আরো অনেক উল্লেখযোগ্য উপকারিতা রয়েছে। স্তন্যপান শুধু যে শিশুকে সর্বোত্তম পুষ্টি সরবরাহ করে তাই নয় বরং এটা মা ও শিশু উভয়ের মধ্যে একটা আরামদায়ক সম্পর্ক সৃষ্টি করে যা পরস্পরের জন্য কল্যাণের কারণও বটে। স্তন্যপান করিয়ে মায়ের যে আনন্দ লাভ হয় তার জন্য মা শুধু সত্তানের প্রয়োজনেই সময়মত দুধ পান করায় না বরং মা ও স্তন্যপানের দুর্লভ মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকে। এর ফলে সবচেয়ে বড় ফায়দা হলো এই যে, মা তার শিশুর মায়ায় পড়ে যায়। এমনিভাবে মা ও শিশুর সম্পর্ক নিকট হয় এবং মা প্রথম মাসগুলোতে সত্তান থেকে আলাদা থাকতে চায় না এবং মায়ের অবিরাম উপস্থিতি শিশুকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় এবং শিশুর প্রাথমিক জীবনে মায়ের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহানুভূতি পেতে সাহায্য করে।

শিশুর মানসিক উন্নতির জন্যও স্তন্যপানের উপকারিতা রয়েছে। মনোবিজ্ঞানী ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, অনেকের মানসিক ব্যাধি এবং শিশু অপরাধের মূল কারণ হলো শিশুকালের নিরাপত্তার এবং ভালবাসার অভাব। শিশু মায়ের কোলে ও বুকে নিরাপদ মনে করে এবং মায়ের শরীরের কোমল স্পর্শ পেয়ে পুলক অনুভব করে।

গরুর দুধে শিশুর হজম ক্ষমতার বেশি চর্বি-জাতীয় বস্তু থাকে। তাই গরুর দুধ যথেষ্ট পাতলা করে দেওয়া উচিত যাতে সব প্রয়োজনীয় উপাদানের পরিমাণ সঠিক মানে চলে আসে। এছাড়া দুধ ফুটানো বা প্যাস্টোরাইজ করলে ভিটামিন সি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। মায়ের দুধ শিশুর প্রয়োজনের জন্য সুষম যাতে থাকে যথেষ্ট পুষ্টি, ভিটামিন এবং প্রতিরোধমূলক আমিষ। এতদ্বারা মায়ের দুধের তাপ শিশুর জন্য আদর্শ। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, স্তনের সৌন্দর্য রক্ষার জন্যও তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড করাই উত্তম।<sup>১২</sup>

গর্ভাবস্থায় অনেকগুলো এমাইনো এসিড প্রস্তাবের সঙ্গে নির্গত হয় বিশেষ করে হিস্টিডিন ও থ্রিওনীন।<sup>১৩</sup> গোটা গর্ভকালেই থ্রিওনীন নিষ্কাশন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর হিস্টিডিন নির্গমণ চার মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণে উপনীত হয় এবং এরপর শেষ পর্যন্ত একই পরিমাণে নির্দিষ্ট থাকে।<sup>১৪</sup> স্তন্যপান কালে এসবের নির্গমণের পরিমাণ খুব শীঘ্ৰ হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত গর্ত-পূর্ব অবস্থারও নিম্নে নেমে যেতে পারে।<sup>১৫</sup>

ଗର୍ଭପାତ (abortion) ହଲେ ୪ ଥିକେ ୫ ସଞ୍ଚାହ (ଗଡ଼େ ୨୨-୨୩ ଦିନ) ପର ଝତୁମ୍ରାବ ଶୁରୁ ହୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଝତୁତେଇ ଡିଷ୍ଟ କ୍ଷରଣ ହୟ (ovulation) ପ୍ରାୟ ୭୫-୮୦% କ୍ଷେତ୍ରେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାଭାବିକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବେର ପର ଡିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଟନ ଓ ଝତୁମ୍ରାବ ହୋଯା ଶନ୍ୟ ପାନ ସମୟରେ ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଯେ ସବ ମାଯେରା ଶନ୍ୟ ପାନ କରାଯା ନା ତାଦେର ଝତୁମ୍ରାବ ୬-୮ ସଞ୍ଚାହ ପର ଶୁରୁ ହୟ ଏବଂ ତିନ ମାସେର ମଧ୍ୟେ ୯୦% ମହିଳାର ଯଥାରୀତି ମ୍ରାବ ହୟେ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ଶନ୍ୟଦାନକାରୀ ମାଯେଦେର ବେଳାୟ ଆରଓ ଦେଇତେ ହୟ । ଶନ୍ୟଦାନ ଓ ଡିଷ୍ଟ କ୍ଷୁରଣ ଏକଟି ଅନ୍ୟଟିର ବିପରୀତ । ଏର କାରଣ ହତେ ପାରେ ଯେ, prolactin ଏବଂ gonadotrophins ଏକ ସଙ୍ଗେ ନିଃସୃତ ହତେ ପାରେ ନା ଅଥବା prolactin ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋଫିନ ନିଃସରଗେ ବାଧା ଦେଇ । ଏମନେ ଧାରଣା କରା ହୟ ଯେ, ଶନ୍ୟଦାନକାରୀ ମହିଳାଦେର ଡିହକୋଷ (ovary) ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ । ଶନ୍ୟଦାନେ ଓଭାରିର ଇନ୍ଟ୍ରୋଜେନ ତୈରୀ ବାଧାପ୍ରାଣ୍ତ ହୟ ବଲେଇ ଏ ସମୟ ଜରାଯୁର ଆକାର ସ୍ଵାଭାବିକ ହତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମୋଟକଥା ଶନ୍ୟଦାନ କରଲେ ଝତୁମ୍ରାବ ଦେଇତେ ଶୁରୁ ହୟ ।

ଶନ୍ୟଦାନ ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଲସିତ କରେ । କାରଣ ଅନେକେର ବେଳାୟ ଶନ୍ୟଦାନେର ସମୟକାଳ ୨ ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାତେ ପାରେ । ଖୁବ ଅଛି ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାର (୧୦-୩୦%) କ୍ଷେତ୍ରେ ଝତୁମ୍ରାବ ୩-୬ ମାସେର ମଧ୍ୟେଇ ଶୁରୁ ହତେ ପାରେ । ଶନ୍ୟଦାନକାରୀ ମହିଳାର ଝତୁମ୍ରାବ ହଲେଓ ପ୍ରଥମ ଦିକେ ମ୍ରାବ ଖୁବ ଅନିୟମିତ ହୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬୦% କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଝତୁତେ ଡିଷ୍ଟ କ୍ଷୁରଣ ହୟ ନା । ଏସବ ତଥ୍ୟାଦି ସତ୍ତ୍ଵେଓ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ, ଶନ୍ୟଦାନ କରଲେ ସତାନ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହାସ ପାଇ । ଏଠା ଏଥିନ ସର୍ବଜନ ବୀକୃତ ଯେ ଶିଶୁକେ ବୁକେର ଦୁଧ ପାନ ନା କରାଲେ ଝତୁମ୍ରାବ ଓ ଗର୍ଭଧାରଣ ଶିଶୁ ହୟେ ଥାକେ । ଯଦି ଗର୍ଭନିରୋଧ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ ନା କରା ହୟ ତବେ ଶନ୍ୟଦାନକାରୀ ମାଯେରା ୭-୧୦% କ୍ଷେତ୍ରେ ଯାରା ଶନ୍ୟ ଦାନ କରେ ନା ତାଦେର ୭୫%, ୬-୭ ମାସେର ମଧ୍ୟେ ଆବାର ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରେ ଥାକେ ।

ସୁତରାଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଧ ଖାଓଯାବାର କୁରାନେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ପରିବାର ପରିକଳ୍ପନାଯ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତାହାଡ଼ା ମାଯେର ସାନ୍ତ୍ଵନ ପୁନରୁଦ୍ଧାରେର ଜନ୍ୟଓ କମପକ୍ଷେ ତିନ ବର୍ଷ ସମୟ ଲେଗେ ଯାଇ । ଦେଇତେ ହଲେଓ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଆବାର ଶନ୍ୟପାନେ ଫିରେ ଆସଛେ ଯା ମା ଓ ଶିଶୁ ଉଭୟର ଜନ୍ୟ କଳ୍ପନାକର ।

ଇସଲାମ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସମାଜେ ସଞ୍ଚାତ ପରିବାରେ ମାଯେରା ତାଦେର ସତାନଦେର ଜନ୍ୟ ଦୁଧ-ମାଯେର ବ୍ୟବହାର କରାନେବେ । ଆମାଦେର ମହାନବୀ (ସା)-କେଓ ଦୁଧ-ମା ବିବି ହାଲିମାର ଶନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ପାନ କରିଯେଛେ । ଯଦି ପିତା-ମାତା ଉଭୟେ ରାଜି ହୟ ତବେ ଇସଲାମ ଏତେ ସମ୍ମତି ଦେଇ । ଏ ବ୍ୟବହାରର ଶିଶୁର କୌଣ ସାନ୍ତ୍ଵନଗତ ଅର୍କଲ୍ୟାଗେର ଆଶଙ୍କା ନେଇ । କାରଣ ଯେ ମାଯେର ବଦଳେ ଦୁଧ-ମାଯେର ଶନ୍ୟର ଦୁର୍ଧିଇ ପାନ କରବେ ଯା ସବଦିକ ଦିଯେ ଏକଇ ମାନେର ହବେ ।

অবশ্য যদি কোন কারণে বিশেষ করে শনের রোগের জন্য বা দুধ-মায়ের অভাবে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হয় তাতে কোন গুনাহ হবে না। তাছাড়া ৩-৪ মাস বয়স হলে শিশুকে কিছু বাড়তি খাদ্যও দিতে হবে কারণ তখন শুধু মায়ের দুধ যথেষ্ট নয়। মায়ের দুধ পর্যাপ্ত না হলে পানি মিশিয়ে অবশ্যই গরুর দুধ বা ছাগলের দুধ দিতে হবে।

#### তথ্যসূত্র :

1. Jeffcoate, N. (Sir). *Principles of Gynaecology*, 4th edn, p. 119-123, Betterworths, London and Boston, 1975.
2. Clayton S. G. Lewis, T. L.T. and Pinker. G. *Obstetrics*, 13th edn, Arnold, p. 473, 1980.
3. Wallraff, E. B., Brodie, E. C. and Borden, A.L.J. *Clin Invest*, 29:1542, 1950.
4. Rullinger, V., Miller, S., Andrecovitz, M.E. And Perdue, G. M.; *Prow Soc. Exp. Biol. New York* 86:108, 1954.
5. Thompson, R.H.S. and King, E.J., *Biochemical Disorders in Human Disease*. 1st edn. 104, 581, J.H. Churchill, London, 1957.

## ۶۔ هُوَ الَّذِي يَخْرُجُ فِي الظَّهَارِ كَيْفَ يَشَاءُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَوْلَانَا يَعْزِيزُ الرَّحْمَنَ

৩ : ৬ তিনিই তো তোমাদের মায়ের গর্ভে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে  
তোমাদেরকে রূপ দান করেন। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন  
ইলাহ নাই। তিনি মহান ও মহাজ্ঞানী।

উপরের আয়াতে মানব আকৃতির ক্রমবিকাশের দুটি প্রধান জৈব বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে—গর্ভধারণ ও বিভিন্ন মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতি দান ও প্রকৃতির নির্দর্শন যা আল্লাহ্ নির্দেশে মাতৃগর্ভে সংঘটিত হয়।

যখন পিতার একটি ক্ষুদ্র শুক্রকীট মায়ের ডিষ্টে প্রবেশ করে তখনই একটি মানব শিশুর সৃষ্টি শুরু হয়। এই শুক্রকীট ও ডিষ্টের মিলন (fertilization) থেকে যে সৃষ্টি শুরু হয় তার ফলে শুধু যে মানব জাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তাই নয় এতেই রয়েছে মানুষের লিঙ্গ ও ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য। মানব সৃষ্টির প্রথম মাসে সংযোগিত ডিমাগুতে এক আকর্ষ্যজনক পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে দুটি কোষে এবং পরে ক্রমাগত বিভক্ত হতে হতে একটি হাত, পা, মাথা, হৃৎপিণ্ড ও শরীর সহ একটি ক্ষুদ্র মানব শিশুর রূপ নেয়।<sup>১</sup>

দ্বিতীয়ত মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কৌশলে মায়ের জরাযুতে যে অপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয় যার মাধ্যমে নবজাতকের আকৃতি, প্রকৃতি এবং আঙ্গুলের ছাপ পর্যন্ত এমনভাবে নির্ধারিত হয় যে, প্রতিটি মানুষের তাৎক্ষণ্যতা ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। প্রাণ-রসায়ন বিদ্যা এ বিষয়কে শুধু স্বীকারই করে না বরং এই অনৌরোধিক কর্মকাণ্ডের প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করে থাকে। প্রথমত মায়ের ডিষ্টে পিতার শুক্রকীট প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায় যদিও তার বাহ্যিক অঙ্গ প্রকাশিত হয় অনেক পরে। মানুষের প্রতিটি কোষে ৪৬টি ক্রোমোজম রয়েছে—২২ জোড়া সাধারণ ‘জিন’ এবং এক জোড়া লিঙ্গ নির্ধারক জিন, মোট ২৩ জোড়া।<sup>২</sup> একজন পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারক জিন হলো xy আর নারীর জিন xx। পুরুষের ক্ষেত্রে যত শুক্র কীট তৈরি হয় তার অর্ধেক x জিন, আর বাকি অর্ধেক y জিন। আর নারীর সব ডিষ্টেই একটি x জিনওয়ালা। সুতরাং পুরুষের শুক্রকীটের অর্ধেক x এবং বাকি অর্ধেক y (আয়াত ৫৩ : ৪৫-৪৬)।

যখন একটি ডিস্ট্রি<sup>y</sup> জিনওয়ালা শুক্রকীট দ্বারা গর্ভাধান হবে তা হলে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে তার লিঙ্গ হবে পুরুষ (xy)। আর যদি x জিনওয়ালা শুক্রকীট হয় তবে শিশু হবে মেয়ে (xx)। এই x অথবা y জিনওয়ালা শুক্র কীটের চয়নের ব্যাপারে মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই এবং সত্তান পুরুষ না মেয়ে হবে সেটা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই নির্ধারণ করেন।

মানব প্রকৃতির বাস্তব প্রকাশ লিঙ্গ-নির্ধারক কোষে আলাদা আলাদা এককে অবস্থান করে যাকে ১৯০৯ সালে বিজ্ঞানী জোহানসেন (Johannsen) জিন (gene) নামকরণ করেন। প্রত্যেক স্বাভাবিক ক্রোমোজম তার নির্দিষ্ট সংখ্যক 'জিন' ধারণ করে, আর যেহেতু সব ক্রোমজোমই জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাই প্রতিটি 'জিনের একটি সাথী' থাকে এবং এর একটি পিতা এবং একটি মাতা থেকে পৃষ্ঠীত। যখন উভয় জিন সমমানের হয় তখন তাদের প্রতাব সমানভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রায়ই একটি জিন অন্য জিনের তুলনায় শক্তিশালী হয় এবং অপর দুর্বল জিনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদিও একটি শিশু তার অর্ধেক জিন পায় বাৰা থেকে আর বাকি অর্ধেক মা থেকে-তবে সেও বাবা মায়ের প্রত্যেকের অর্ধেক জিন পায় সবটা পায় না। এখন বাবা-মায়ের জিনের কোন অংশ সত্তান পাবে তা আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ধারিত হয় (যা প্রাণ-রসায়নবিদগণের নিকট আকস্মিক)। এটাও আকস্মিক বা নেহায়েত লটারির মত যে কোন শিশু তার পিতা-মাতার বা পূর্ব পুরুষদের যে কোন জিনের উত্তরাধিকারী হতে পারে। অবশ্য এও আল্লাহরই বিধান। শিশু কোন বিষয়ে বাপের ও কোন দিকে মায়ের প্রকৃতি পেতে পারে, কেউ এর মাঝামাঝি আবার কেউ এর কোনটি নাও পেতে পারে।

যদিও উত্তরাধিকার খুবই রহস্যময় বলে মনে হয় তবুও প্রতি মানব শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তার মাত্গতেই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হয়। তাই প্রত্যেকে তার আকৃতি, আকার, রং এবং অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং যে কোন দুইজন সবদিক দিয়ে একেন্দ্র হয় না। এটা খুবই বিশ্বাস যে হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ পর্যন্ত বিভিন্ন লোকের বিভিন্নরূপ। তাই একে মানুষের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার বছ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যে কোন বর্ণের (race) লোকের মধ্যে কতগুলো মিল দেখা যায়। এইরূপ বিভিন্নতার বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে মিল রয়েছে তাতে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

କୋନ କୋନ ସମୟ ଗର୍ଭରୁ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମଗତ ଦୋଷ ଦେଖା ଦିତେ ପାରେ- ସେମନ ଜନ୍ମଗତ ହନ୍ଦପିଣ୍ଡେର ରୋଗ, କୁଦ୍ର ମୁଣ୍ଡକ, ଅତିରିକ୍ତ ଆଶ୍ଵଳ ଇତ୍ୟାଦି । କୋନ କୋନ କୋଷେ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ । ଆବାର କୋନ କୋଷେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ଏସବେଇ ମାନୁଷେର ନିୟକ୍ରମେର ବାଇରେ ସଦିଓ ଏସବେର କୋନ କୋନଟି ମାତୃଗର୍ଭେ ଥାକତେଇ ଆଲଟ୍ରାସୋନିକ scanning -ଏର ମାଧ୍ୟମେ ଜାନତେ ପାରା ଯାଏ । ତବେ ଏ ସକଳ ବିଭିନ୍ନତାଓ ଆଲ୍ଲାହୁ କର୍ତ୍ତକ ନିର୍ଧାରିତ ।

ଉପରେର ଆଲୋଚନା ଥେକେ ବୁଝା ଗେଲ ଯେ, ମାନବ ଶିଶୁ ମାତୃଗର୍ଭେ ଆଲ୍ଲାହର ଇଚ୍ଛାମତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଜିନ ସଂଯୋଜନେର ସଂଭାବନାର ମଧ୍ୟେ ଯେ କୋନ ରୂପ ଲାଭ କରେ ଥାକେ । ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର ଏଇ ରହସ୍ୟାବୃତ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମ୍ୟ ସଂଭାବନାସମ୍ମହ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ମହାନ ଆଲ୍ଲାହୁ ଯହାଜାନୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ । ସୁତରାଂ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ର ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରଜା ବଲେ ସୃଷ୍ଟି କରେନ ସଦିଓ ତା ଆମରା ବୁଝାତେ ସଫ୍ରମ ନାଓ ହତେ ପାରି ।

#### ତଥ୍ୟସୂର୍ତ୍ତ :

1. Moore, Keith, L., The Developing Human, 3rd edition, W. B. Saunders Co., pp. 1-91, 1982.
2. Welch, C.A. et al., Biological Science, Molecules to Man, Blue Version, Revised edition, Noughton Mifflin Co., Boston, p. 425, 1968.

٢٤- تُولِّيْهُ الْجَلَلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِّيْهُ النَّهَارَ فِي الْأَيَّلِ ' وَتُخْرِجُهُ الْعَنِّ مِنَ الْمَهَاجِرِ  
وَتُخْرِجُهُ الْبَيْتَ مِنَ الْجَنِّ ' وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩ : ২৭ তুমি রাতকে দিনের মধ্যে শামিল করে দাও আবার দিনকেও  
শামিল করে দাও রাতের মধ্যে। তুমি জীবন্ত জিনিস মৃত জিনিস  
থেকে বের কর এবং মৃত জিনিস বের কর জীবন্ত জিনিস থেকে  
এবং তুমি যাকে চাও বেহিসাব রিযিক দান কর।

দিবা-রাত্রির পরিবর্তন : আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করি যে, সক্ষ্য বেলায়  
রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রভাতে দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে। এই  
দিবা-রাত্রির আবর্তন নিম্নলিখিত কারণে ঘটে :

(১) পৃথিবীর নিঃস্ব কক্ষপথে দৈনিক আবর্তন যা আল্লাহর নির্দেশে সংঘটিত  
হয়।

(২) পৃথিবীর প্রায় গোলাকার আকৃতি এবং তার চারিদিকের বায়ুমণ্ডল  
(atmosphere) যা আল্লাহরই সৃষ্টি।

পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের ফলে দিবা রাত্রির পরিবর্তন সাধিত হয়। এ  
বিষয় ২ : ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর  
আকৃতি এবং বায়ুমণ্ডলের জন্য দিবা রাত্রির পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয় যাতে কিছুটা  
সময় লাগে যাকে আমরা গোধূলি বলি।

গোধূলির সময় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে একটা হালকা ও কোমল আলো  
কিছুক্ষণের জন্য চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, আবার প্রভাতে সূর্যোদয়ের (সুবহে  
সাদেক) প্রাঙ্কালেও একই অবস্থা হয়ে থাকে। এর কারণ হল সূর্যক্রিয় বায়ুমণ্ডলে  
পড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হয়ে পৃথিবীতে পৌছে। সূর্য দিগন্তের  $18^{\circ}$  ডিগ্রী  
নীচে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই গোধূলি বর্তমান থাকে।

এই গোধূলি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়কালের হয়ে থাকে। মেরু প্রদেশে  
বছরের বিভিন্ন সময়ে এর সময়কাল বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয়। তবে বিশ্ববরেখার  
আশে-পাশের সময়কাল প্রায় সময়নাই থাকে। পৃথিবীর উর্দ্ধে সূর্যের গতিপথ  
বিশ্ব রেখার উপর প্রায় অপরিবর্তিত থাকে এবং সূর্য দিগন্তের  $18^{\circ}$  ডিগ্রী নীচে  
নামার সময় তেমনই অপরিবর্তিত থাকে। গোধূলির সময়কাল বিশ্ব রেখার  
উপরে প্রায় এক ঘন্টা জারি থাকে। বিশ্ব রেখার উভয় ও দক্ষিণে সূর্যের গতিপথ

পরিবর্তিত হয় যার ফলে গোধূলির সময়কাল বেশ কম হয়। মেরু এলাকায় শ্রীমতালে সূর্য দিগন্তের নীচে নামে না। উত্তর মেরু অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণে শ্রীমতালীন সূর্য কখনো  $18^{\circ}$  ডিগ্রীর নীচে পর্যন্ত নামে না। যার ফলে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সারারাত গোধূলি থাকে।<sup>1</sup>

একথাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে গোধূলি সারা বৎসর একই সময়ে শুরু হয় না এবং এর জন্য দায়ী সূর্যের চারাদিকে পৃথিবীর বাংসরিক আবর্তন। পৃথিবী তার বাংসরিক আবর্তনকালে বিভিন্ন স্থানে সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করে এবং তাতে রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হয়। বছরে দুই দিন ২১ শে মার্চ এবং ২৩ শে সেক্টেক্সের দিবা রাত্রির সময় কাল এক সমান হয়ে থাকে। উত্তর গোলার্ধে ২২ শে জুন সবচেয়ে দীর্ঘ দিন এবং সবচেয়ে ছোট রাত আবার দক্ষিণ গোলার্ধে; ২২শে ডিসেম্বর সবচেয়ে ছোট দিন এবং সবচেয়ে বড় রাত। এর ফলে এসব এলাকায় গোধূলির সময়কাল কম বেশী হয়।

জীবিত ও মৃতের আবর্তনশীল পরিবর্তন ধারা-এই আয়তাংশের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য 'জীবিত' ও 'মৃত' এই দুটি শব্দের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি জানা প্রয়োজন। জীবিত বলতে এমন জীবকে বুঝায় যা স্বয়ং অজৈব অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি -যা এমন জীবকোষ সৃষ্টি করে যার মধ্যে এক প্রাণ বাহন রয়েছে এবং যার ফলে সে যাবতীয় জৈব কর্মকাণ্ড (metabolic activities) পরিচালনা করতে সক্ষম। মৃত বলতে এমন বস্তু বুঝায় যা অজৈব অণুর সমষ্টি যার মধ্যে জীবনের লক্ষণসমূহ পুষ্টি এবং বংশ বৃদ্ধি ইত্যাদি অবর্তমান। একমাত্র মহান আল্লাহই একটি অজৈব অণুর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে প্রাণ ফুঁকে দেন। তবে এই বিষয়টি এখনও আমাদের জ্ঞান-সীমার বাইরে। বর্তমান আলোচনায় জৈব ও অজৈব বস্তু কিভাবে আবর্তন করে সে বিষয়টি স্থান পাবে। এই বস্তুর আবর্তন একটি চিরস্তন প্রক্রিয়া যার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে :

পৃথিবীর একটি অংশ যাকে 'বাইয়োস্ফিয়ার' (biosphere) বলা হয় যার মধ্যে রয়েছে সমুদ্র, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গভীরতা সহ মহাদেশগুলোর উপরিভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন ভাগ। গাছপালা তাদের প্রয়োজনীয় জীবকোষের মধ্যস্থ মৌলিক উপাদানগুলো অজৈব অবস্থায় গ্রহণ করে বা সংগ্রহ করে তারপর সেগুলোকে বিভিন্ন জৈবকৃপে পরিবর্তন করে এবং তাদের কোষগুলোই প্রাণীর জন্য খাদ্য পরিণত হয়। গাছপালা ও জীবন শেষ হলে সকল জৈব অণুগুলো আবার অজৈব অণুতে পরিণত হয় যাকে জৈব বস্তুর ধাতুকরণ পদ্ধতি বলা হয়। এটা কাঠকে চুলায় জুলানো বা জঙ্গলে আগুন লেগে পুড়ে

যাওয়ার মাধ্যমে, প্রাণী ও বৃক্ষ জগতের শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘটে থাকে। এর জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় গাছপালা ও প্রাণীদেহের পচন, জীবাণু কর্তৃক সকল জৈব কোষের ধূংস, পচন এবং অক্সিডেশন পদ্ধতির। বস্তুর আবর্তনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সকল জীবের ৯৮% বস্তুই ধাতব বস্তু।

**কার্বন (Carbon) :** সবুজ পাতা সৌর শক্তিকে ফটোসিনথেসিস পদ্ধতিতে রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তিত করে। যখনই গাছ এই শক্তি ব্যবহার করে তার শ্বাস ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় যা বাতাসে বা পানিতে প্রবেশ করে। গাছপালা প্রাণীদেহের খাদ্য এবং সব জীব মৃত্যুর পর তাদের শরীরে জীবনব্যাপী সংগৃহীত কার্বন ত্যাগ করে।

**পানি ( $H_2O$ ) :** প্রাণীজগত ও মানুষ পানি পান করে, আর উন্নিদ জগত মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে। সকল জীবই কিছু পানি তাদের জীবকোষে সংগ্রহ করে যা পরে কোষের ক্ষয়ের ফলে আবার প্রকাশ পায়। মোটকথা সব জীব যত পানি গ্রহণ করে তার সবটাই বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে, উন্নিদ জগত পাতার মাধ্যমে আর প্রাণী জগত শ্বাস ক্রিয়ার মাধ্যমে, গাত্র থেকে বাস্পায়িত হয়ে এবং প্রাণীর বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে এই ক্রিয়া সাধিত হয়।

**নাইট্রোজেন (Nitrogen) :** গাছপালা মাটি থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ অথবা প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন জীবাণুর সহায়তায় নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে কাজ করে। এগুলোই গোটা প্রাণীজগতের জন্য নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে কাজ করে। বৃক্ষজগতের বিপরীতে প্রাণীকুল প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক বস্তু বর্জ্য পদার্থ হিসাবে নির্গত করে এমোনিয়া (ammonia), ইউরিক এসিড (uric acid) এবং ইউরিয়া (urea)-র আকারে।

**ক্যালসিয়াম (Calcium) :** প্রাকৃতিক জগতে শিলারাশির মধ্যে ক্যালসিয়াম ঘটিত যৌগিক পদার্থ খুব বেশী পরিমাণে থাকে যা দ্রবীভূত অবস্থায় প্রাণী কর্তৃক পানির সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। ভূমিতলের বৃক্ষরাজি মাটি থেকে ক্যালসিয়াম ধাতু সংগ্রহ করে। এই ক্যালসিয়াম প্রাণীর হাড় ও শামুকের শক্ত বহিরাবরণ এবং বৃক্ষরাজি তাদের কোষের দেয়াল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যখন প্রাণী ও বৃক্ষ মরে যায় তখন তাদের হাড় ও বহিরাবরণ মাটিতে জমা হয় অথবা সমুদ্র, হৃদ এবং বিভিন্ন জলাশয়ের তলদেশে জমা হয় এবং পরে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

**ফসফরাস (Phosphorus) :** এটা জৈব-প্রাণীসমূহ অজৈব ধাতু হিসাবে গ্রহণ করে। জীবের জীবস্তু কোষে ফসফরাস তীব্র শক্তসম্পন্ন ফসফেইট যৌগিক

পদার্থ এবং নিউক্লিক এসিড (nuclic acids) রূপে সংগৃহীত হয়। জীবকোষের মৃত্যু হলে এটা আবার অজ্ঞেব ফসফরাস হিসেবে ফসফেইট জাতীয় যৌগিক পদার্থ গঠন করে। এই প্রক্রিয়াকে হাইড্রোলাইসিস (hydrolysis) বলা হয়।

**সালফার (Sulpher)** : এটা জীব কোষের প্রধান অংশ হিসাবে এমাইনো এসিড, সিসটিন, মিথিওলিন এবং কিছু কো-এনজাইম রূপে অবস্থান করে। এগুলো পৃথিবীর বাইরের আবরণে প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং জীবজগতের নিকট প্রধানত দ্রবণীয় সালফেট রূপে গৃহীত হয়। বৃক্ষরাজি কর্তৃক তৈরি জৈব সালফার যৌগিক বস্তু, প্রাণী ও বৃক্ষ জগতের ক্ষুদ্র জীবাণুর পৃষ্ঠিসাধন করে যারা মৃত প্রাণী ও বৃক্ষকে তার ক্ষুদ্র অণু পরমাণুতে পরিণত করে যার ফলে নির্গত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

**ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)** : এটা সবুজ বৃক্ষরাজির 'ক্লোরোফিল' অণুর অংশবিশেষ যা মাটি থেকে সংগৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে তৃণভোজী প্রাণীর জীবকোষে তাদের খাদ্য অহংকারের মাধ্যমে প্রবেশ করে। গাছপালা ও প্রাণী দেহ থেকে ম্যাগনেসিয়াম আবার মৃত্যুর পর মাটিতে ফিরে আসে।

**উপাদানের অংশবিশেষ (Trace elements)** : দস্তা (জিঙ্ক), কপার (তামা), 'মলিবডেনাম' ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ খুব সামান্য মাত্রায় জীবকোষের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ায় অবশ্য প্রয়োজন হয়। এগুলো প্রধান প্রধান খাদ্যে ভেজাল হিসাবে এবং ধূলাবালির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। এদের আগমন ও নির্গমন অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতুর মতই যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এতে বুঝা যায় যে, কুরআনের 'মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃত' করার ঘোষণা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্ভত। সমস্ত মৌলিক পদার্থ অজ্ঞেব যা প্রাণী বা বৃক্ষ জগতে গিয়ে জৈব কোষের অংশে পরিণত হয়। আর প্রাণীর মৃত্যু এবং বৃক্ষরাজী ধ্বংস হলে সেইসব মৌলিক পদার্থ আবার মাটি এবং আবহাওয়ায় মিশে যায়।

### তথ্যসূত্র :

1. World Book of Encyclopaedia. Vol. 12, p. 342, 1966.

۹-۰. قَالَ رَبِّ أُنْ يَكُونُ لِي عَلَمٌ وَقَدْ بَلَغْنِي الْكِبَرُ وَأَنْزَلَنِي عَاقِرًا  
۰. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

৩ : ৪০ তিনি (জাকারিয়া আ) বল্লেন, হে প্রভু! আমি কী করে একজন পুত্র সন্তান লাভ করব যেখানে আমি ইতিমধ্যেই খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি আর আমার স্ত্রী হল বক্সা ? (তাঁকে উত্তরে) বলা হল : এমনই (হবে)। আল্লাহ যা চান তাই করেন।

হ্যরত জাকারিয়া (আ)-র বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান লাভ : হ্যরত জাকারিয়া (আ) পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা (দোয়া) করেন (আয়াত ৩ : ৩৮)। এর জবাবে আল্লাহ তা‘আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করে তাঁকে জানালেন যে, আল্লাহ তাঁর দোয়া করুল করেছেন এবং তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন যার নাম হবে ইয়াহইয়া। হ্যরত জাকারিয়া (আ) ফেরেশতার এই ঘোষণায় অবাক হয়ে গেলেন। কারণ তিনি ভোবেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে কোন সন্তান লাভ সম্ভব নয়। তাই তিনি বলে উঠলেন, “হে আমার প্রভু! বৃদ্ধ বয়স এবং আমার স্ত্রী বক্সা, এ অবস্থায় আমি কী করে পুত্র সন্তান লাভ করব ?” তখন তাঁকে বলা হল যে, তাই হবে কারণ এটাই আল্লাহর ইচ্ছা।

এ কথা সত্য যে, পুরুষের পক্ষে সন্তান জন্মান্তরের কোন বয়সের সীমারেখে নেই এবং অনেক বৃদ্ধ তাদের যুবতী বা কমবয়সী স্ত্রীদের মাধ্যমে সন্তান লাভ করেন। রিজ্ঞানীদের মতে বৃদ্ধ ব্যক্তিও স্ত্রী সঙ্গে সক্ষম এবং তার বীর্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শুক্রকীট থাকে তবে তার পক্ষে সন্তান জন্ম দান সম্ভব। এই আয়াতে হ্যরত জাকারিয়া (আ)-র কত বয়স ছিল তা বলা হয়নি। সুতরাং আমরা সহজেই মেনে নিতে পারি যে, তিনি বৃদ্ধ হলেও সন্তান জন্মান্তরে সক্ষম ছিলেন। হ্যাত্তলক<sup>১</sup> লিখেছেন, “পুরুষ মানুষের মধ্যে বার্দ্ধক্যেও যৌন ক্ষুধা ও যৌন সঙ্গের সামর্থ্য বজায় থাকে।” তিনি আরও বলেছেন, “এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে পুরুষের মধ্যে মেয়েদের রজোনিবৃত্তি (menopause)-র মত কোন অবস্থা হয় কিনা। যদি তেমন অবস্থা থেকেও থাকে তবে তা খুবই অস্পষ্ট, আর বাস্তব সত্য তো এই যে, শুক্রকীট তৈরি ও নির্গমনের কোন শেষ সময় নির্ধারিত নেই এবং বার্দ্ধক্যেও তা বজায় থাকতে পারে। একটি প্রতিবেদনে ১০৩ বছর বয়সেও পুরুষের একপ ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

স্ত্রীলোকদের বেলায় রজোনিবৃত্তি (খতুস্বাব বক্স হয়ে যাওয়া) সাধারণত ৪৫-৫৫ বছর বয়সে হয়ে থাকে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ৪৫-৫০ বছর বয়সে

ତରମୁ ହ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇ-ତିନ ବହର ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବନ୍ଧ ହ୍ୟେ ଯାଯ ।<sup>୨</sup> ତାଇ ରଜୋନିବୃଣ୍ଟି ହଲେ କୋନ ନାରୀ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରତେ ପାରେ ନା ।

ଉପରେର ବିବରଣ ଥିକେ ବୁଝା ଗେଲ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଜାକାରିଆ (ଆ)-ର ପକ୍ଷେ ସନ୍ତାନ ଉେଂପାଦନ ସମ୍ଭବ ଛିଲ ।

କିନ୍ତୁ କୁରାନେ ତାର ତାଁର ଶ୍ରୀର କୋନ ବସ୍ତେର ଉପ୍ରେସ ନେଇ, ସୁତରାଂ ତାଁର ବସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉେଂପାଦନେର ବସ୍ତେ ସୀମା ୫୫ ବହରେ ହତେ ପାରେ । ଯଦି ତାଇ ହ୍ୟ ତବେ ତାଁର ଗର୍ଭଧାରଣ କରା କୋନ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ନାହିଁ ।

ହ୍ୟରତ ଜାକାରିଆ (ଆ)-ର ନିକଟ ଏ ବିଷୟଟା ଅସମ୍ଭବ ବିବେଚିତ ହ୍ୟେଛିଲ । ତାର କାରଣ ତିନି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେନ ଯେ ତାଁର ଶ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ଛିଲେନ । ଏହି ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ମ ଏକଟା ଅଳ୍ପଟ ଅଭିଵୃତ୍ତି, କୋନରମ୍ପ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ଛାଡା ଏହି ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ମେର ଧାରଣ ନେହାୟେତ ଅନୁମାନେ ହତେ ପାରେ । ଯଦି କୋନ ମହିଳା ବିବାହେର ପର କରେକ ବହରେ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ ନା କରେ ତବେ ତାକେ ସାଧାରଣଭାବେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବଲା ହ୍ୟେ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ଏମନ ବହୁ ଘଟନା ରଯେଛେ ସେଥାନେ ବିଯେର ୧୦/୧୫ ବହର ପରର ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହ୍ୟେଛେ । ଏ ଧରନେର ମହିଳାଦେରକେ ସମାଜେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବଲେଇ ଧରା ହ୍ୟ । ସୁତରାଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ ହ୍ୟରତ ଇହାଇଇୟା (ଆ)-ର ଆଶ୍ରୀ ଯେହେତୁ ବିଯେର ବହୁ ବନ୍ଦର ପରର ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରେନ ନି ତାଇ ତାଁର ସ୍ଵାମୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଭେବେଛିଲେନ ଯେ, ତିନି ବନ୍ଧ୍ୟା । ଏ ଛାଡା ସ୍ଵାହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଵାମୀ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଅନେକ ସମୟ ସନ୍ତାନ ହ୍ୟ ନା ଯାଇ କୋନ କାରଣ ଖୁଜେ ପାଓଯା ଯାଯ ।

ନାରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ମେର ଅନେକଗୁଲୋ କାରଣେର ମଧ୍ୟେ ନିମ୍ନେର କରେକଟି କାରଣ ଉପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟୋଗ୍ୟ :

- (କ) ଡିବ୍ସ୍‌କ୍ରଣ ବ୍ୟତୀତ ଝାତୁନ୍ମାବ ଯା ଏକ୍ସିନ୍ୟାଲ ଏଷ୍ଟିର ଦୋଷେ ଏବଂ ଭିଟାମିନ B12 ଏର ଅଭାବେ ହତେ ପାରେ । ମେଯେଦେର ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ମେର ପ୍ରାୟ ଶତକରା ୪%-ଏର ଜନ୍ୟ ଦୟାମୀ ।
- (ଘ) ତଲପେଟେର ପ୍ରଦାହେର (pelvic adhesions) ଫଳେ ଯଦି ସେଥାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏମନଭାବେ ଜଡ଼ିଯେ ଯାଯ ଯାର ଫଳେ ପ୍ରକୃତିତ ଡିବ୍ସ ଫେଲୋପିଯାନ ଟିଉବେ ଯେତେ ବ୍ୟର୍ବ ହ୍ୟ ।
- (ଗ) ପ୍ରଦାହ ଅଥବା ଅଶ୍ଵାଭାବିକ କୁଞ୍ଜନେର (spasm) ଫଳେ ଉଭୟ ଫେଲୋପିଯାନ ଟିଉବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକଭାବେ ବନ୍ଧ ହ୍ୟେ ଗେଲେ ।
- (ଘ) ଶୁର୍କକୀଟ ବା ଜାଇଗୋଟ (zygote=ଡିବ୍ସ ଓ ଶୁର୍କକୀଟ ମିଳିତ ହଲେ) ଏହଙ୍ଗେ ଜରାୟୁର ଅପାରଗତା ଓ ଅକ୍ଷମ୍ଯାତା ।
- (ଙ) ଜରାୟୁର ସୃଷ୍ଟି ନା ହୁଏୟା ।

- (চ) যোনিপথ এবং জরায়ুর নিম্নভাগ যদি অতিরিক্ত স্বাবে, অতিরিক্ত অস্বযুক্ত এবং শক্ত হাইমেন (যোনি পথের পরদা) থাকার ফলে শুক্রকীট গ্রহণ করতে অক্ষম হয়।
- (ছ) শুক্রকীটের বিরুদ্ধে Spermazyintinin বা Spermatozoa-immobilization এন্টিবডি (প্রতিরোধক) তৈরি হলে। এরপ প্রতিরোধক বন্ধ্য নারীদের মধ্যে পাওয়া যায়, অথচ কোন কুমারী এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারীর মধ্যে পাওয়া যায় না।
- (জ) জরায়ুর টিউমার যেমন লিওমাইয়োমা ও এডিনোমাইওসিস হলে।
- (ঝ) সহবাসের ব্যর্থতা ঘটলে, ইত্যাদি।

সুতরাং গর্ভধারণ সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তাই বর্তমান আয়াতের আলোচনায় এ কথা বললেই যথেষ্ট যে মহান আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ইয়াহ্যুয়া (আ)-এর জন্মের নির্দেশ কার্যকর করেন যদিও তা আমাদের অসম্পূর্ণ শারীরবিদ্যা (physiology)র জ্ঞানে অসম্ভব না হলেও খুবই অনন্য ঘটনা। যে কোন বিরল ঘটনা যা সাধারণত ঘটে না তাও আল্লাহ ইচ্ছা করলেই হতে পারে।

#### তথ্যসূত্র :

- Ellis. H., Psychology Sex 8th edn., PAN Vooks Ltd. London, pp. 255-271, 1962.
- Jeffcoate, N. (Sir), Principles of Gynaecology, 4th edn. Butterworths, London and Boston, pp. 119-123, 1975.

۴۸۔ قَالَتْ رَبِّ أُبْنِي يَكُونُ مِنْ رَّبِّي وَلَرَبِّي سَنَنِي بَكُورٌ مَّا لَكَ كَذَّابُ اللَّهُ بِمَا لَكَ مُلْكٌ  
۰ مَا يَشَاءُ لِذِي أَنْفُسِي أَمْ إِنَّمَا يَكُونُ لَكَ كُنْ دَيْكُونُ

৩ : ৪৭ তিনি (বিবি মরিয়াম) বলেন, : হে প্রভু! আমার কী করে সত্তান হবে কারণ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শও করেনি? তিনি (ফেরেশতা) জবাব দিলেন : এটাই হবে, কারণ আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ফায়সালা করেন, তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও' অতঃপর তা হয়ে যায়।

কুমারী মাতার গর্ভে হ্যরত ঈসা (আ)-এর জন্ম : ফেরেশতা কর্তৃক তাঁর (মরিয়মের) গর্ভে পুত্র সত্তান হওয়ার সংবাদে বিবি মরিয়ামের অবাক হওয়া থবই স্বাভাবিক ছিল। কোন নারীকে কোন পুরুষ স্পর্শ পর্যন্ত না করলেও (যৌন সঙ্গম) সত্তান গর্ভে ধারণ করতে পারে এমন কথা সব সময়ই অসম্ভব বলে ইয়াহুদিদ্বা হ্যরত ঈসা (আ)-এর শুধু মায়ের সত্তান হিসাবে কখনই মেনে নেয়ানি। কিন্তু এই আয়তে আল্লাহ স্পষ্ট করে ঘোষণা করছেন যে, হ্যরত ঈসা (আ) কুমারী মাতার গর্ভেই জন্মেছেন আল্লাহর বিশেষ নির্দেশে যেহেতু আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোন জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম। কুরআনের ভাষায় ঈসা (আ)-এর জন্ম সর্বশক্তিমান আল্লাহর একটি নির্দেশন (sign) এবং মুসলমানগণ তাঁর এই অলৌকিক জন্ম স্বীকার ও বিশ্বাস করেন। এ ধরনের কুমারী মায়ের সত্তান জন্মান্দান মানুষের বেলায় আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী অসম্ভব এবং বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকেও এর সঠিক ব্যাখ্যা দান সম্ভব নয়। তবে এই বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে এবং বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পুরুষ ছাড়া শুধু শ্রী জাতীয় প্রাণীর সত্তান উৎপাদনের ব্যাপারে কিছুটা বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন। তাছাড়া, মহান সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহতা'আলা যখনই কিছু সৃষ্টি করেন তখনই তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন (laws)ও প্রয়োগ করেন। যদি আমরা পুরুষ ছাড়া সত্তান উৎপন্ন হওয়ার খবর নেই তবে দেখতে পাই যে এই বিশাল সৃষ্টি জগতে কুমারী মাতার গর্ভে জন্ম (virgin birth) বা পিতা ছাড়া জন্মের (parthenogenesis —parthos= virgin; genesis=origin) ঘটনা ঘটে থাকে।

প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগতে প্রধানত পুরুষ ও শ্রী জাতির যৌন মিলনে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। এর জন্য পুরুষ ও নারীর যৌন কোষ (sex cell বা gametes) এর মিলন প্রয়োজন হয়। তবে কোন কোন সময় প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে যৌন মিলন ছাড়াই নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই অযৌন

(asexual) সৃষ্টি সাধারণত এক কোষ বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীর (যেমন হাইড্রা, প্লাজমোডিয়া ও এমিবা) মধ্যে ঘটে থাকে। তবে এ সবকে পার্থেনোজেনেসিস বলা হয় না।

এ কথা স্বীকৃত যে প্রাণীর বেলায় একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত (matured) ডিস্কোষে (ovum) নতুন প্রজন্মের সৃষ্টির সকল প্রয়োজনীয় মাল মশলাই মওজুদ থাকে। কোন কোন সময় কোন কোন প্রাণীর বেলায় এবং বিশেষ অবস্থায় একটি স্ত্রী ডিস্কোষে কোন শুক্রকীট কর্তৃক উজ্জীবিত না হয়েও নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করে থাকে যাকে স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত কুমারী জন্ম (parthenogenesis) বলা হয়। এই অবস্থা নিম্নস্তরের প্রাণী, বিশেষ করে আর্থ্রোপেড (arthropeds) প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং পার্থেনোজেনেসিস হল যৌন মিলনের বিকল্প প্রজনন পদ্ধতি, যখন শুক্রকীটের মিলন ছাড়াই শুধু ডিস্কোষ থেকে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের প্রক্রিয়া দেখার জন্য গবেষণাগারে ডিস্কোষে শুক্রকীটের বদলে নানারূপ যান্ত্রিক বাসায়নিক, জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতিতে যেমন খোঁচা দিয়ে, বিভিন্ন প্রকার উভেজক পদার্থের সাহায্যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং নানারূপ তেজস্ত্বিক রশ্মি ইত্যাদির সাহায্যে উজ্জীবিত করা যেতে পারে।

প্রত্যেক প্রজাতির জীবকোষে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রমোজোম থাকে। যৌন জীবকোষ সৃষ্টির বেলায় এইসব জীবকোষে দুইভাগে ভাগ হবার সময় মেইওসিস (meiosis) অথবা রিডাকশন ডিভিশন (reduction division)-এর মাধ্যমে ক্রোমোজোমের সংখ্যাও অর্দেক থাকে একে হেপলয়েড সংখ্যা (haploid numbers) বলা হয়। প্রজননের সময় পুরুষ ও নারীর যৌন কোষের মিলনে যে ‘জাইগোট (zygote)’ তৈরি হয় তাতে উভয়ের অর্দেক সংখ্যক ক্রোমোজোম একত্রিত হয়ে আবার সেই প্রজাতির পূর্ণ সংখ্যক ক্রোমোজোমে পরিণত হয় (2 haploid= 1 diploid)।

প্রাকৃতিক জগতে নিম্নস্তরের প্রাণীর স্বাভাবিক কুমারী জন্মের বেলায় ডিস্কোষ বিভক্ত না হয়ে তাতে পূর্ণ সংখ্যক (diploid number) ক্রমোজোমই বর্তমান থাকে এবং সেই ডিস্কোষ থেকেই নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। অন্য এক প্রকার কুমারী জন্মের বেলায় ডিস্কোষের ‘রিডাকশন ডিভিশন’ ঘটে থাকে (monoploid ডিস্কোষ) এবং এই ডিস্কোষে ও যৌন প্রযুক্তি হোক বা না হোক (fertilization) ক্রমে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করে থাকে।

মনোপ্লয়েড (বিভক্ত) ডিস্কোষের সত্তান যৌন প্রযুক্তি না হলে পুরুষ হয় আর যৌন প্রযুক্তির পর (diploid) হলে নারী সত্তান হয়। এ ধরনের বৎশ বৃদ্ধির উদাহরণ মৌমাছি, পিপড়া, বোলতা জাতির প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এদের

ମଧ୍ୟେ ଯୌନ ମିଳନ ଓ ଯୌନ ମିଳନ ଛାଡ଼ା, ଉତ୍ସ ପ୍ରକାରେର ପ୍ରଜନନ ଘଟେ ଥାକେ । ଅଣ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ପୋକା ଯେମନ thrips ଏବଂ ପାନିର ପୋକା Rotifera ପ୍ରଜାତିର ମଧ୍ୟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାତି ଦେଖାଇ ଯାଇ ନା । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ସାଧାରଣତ କୁମାରୀ ଜନ୍ମେର ମାଧ୍ୟମେ ପୁରୁଷ ମୌମାଛି ଜନ୍ମ ଦେଇ । ଆବାର ଏରା ଯୌନ ପ୍ରୟୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଡିପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସବ କରେ ଯା ଥେକେ ତାଦେର କର୍ମୀ ବାହିନୀ (workers) ଓ ନାରୀ ମୌମାଛିର ଜନ୍ମ ହଇ ।

୧୯୦୦ ଈସ୍‌ଯା ସାଲେ କିଛୁମଂଧ୍ୟକ ବିଜ୍ଞାନୀ କୃତିମ କୁମାରୀ ଜନ୍ମ ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟ ପରିଷକ୍ଷା ଚାଲାନ ଅନେକଙ୍ଗଲୋ ମେରଦନ୍ତହିନୀ ପ୍ରାଣୀର ଉପର । ଗତ କମ୍ୟେକ ଦଶକ ପୂର୍ବେ (୧୯୬୦ ସାଲେର ଦିକେ) ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଖରଗୋସେର ଡିପ୍ଲାଇନ୍ କୃତିମ ଉପାୟେ ଉଜ୍ଜୀବିତ (ଯୌନ ମିଳନ ଛାଡ଼ା) କରା ସନ୍ତୋଷପୂର୍ବକ ହେଲାଇ । ଏଦେର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଇ ଏବଂ ଖୁବ ଅନ୍ତର୍ମଂଧ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରେ ଖରଗୋସେର ନତୁନ ବାଚା ଜନ୍ମ ଦେଇ ସନ୍ତୋଷପୂର୍ବକ ହେଲାଇ ।

ୟୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରେ ମେରିଲ୍ୟାନ୍ଡେର ବେଲ୍ଟ୍‌ଡିଲ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରେ ଗବେଷକଗଣ କିଛୁ ନତୁନ ଟାର୍କିର ଡିମ କୁମାରୀ ଜନ୍ମ ବଳେ ପ୍ରମାଣ ପେଇଥିଲେ । ଯଦିଓ ଏସବ ଡିପ୍ଲାଇନ୍ ଥେକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଚାର ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ କମ, ତବେ ଏକଟିର ବେଳାୟ କୁମାରୀ ଜନ୍ମପାଣ୍ଡଟ ଟାର୍କି ଆଯ ୧୬୧ ଦିନ ବେଚେଇଲା<sup>୫</sup> ।

ଖରଗୋସ ଛାଡ଼ା ଅଣ୍ କୋନ ମେରଦନ୍ତଭୀ ପ୍ରାଣୀର ବେଳାୟ କୁମାରୀ ଜନ୍ମ ଦେଖା ଯାଇ ନି । ମାନୁଷେର ବେଳାୟଓ କୋନ କୁମାରୀ ଜନ୍ମେର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଜାନା ନାହିଁ । ତବେ ଖରଗୋସେର ବେଳାୟ କୁମାରୀ ଜନ୍ମ (ପାର୍ଟେନୋଜେନେସିସ୍) ସନ୍ତୋଷ ହେଉଥାଇ ଏ କଥା ବଲା ଯାଇ ଯେ, ବ୍ୟାଭାବିକ କ୍ରମୋଜୋମ ବିଭକ୍ତି ଛାଡ଼ା ଶ୍ଵର୍କ୍ରିଟ ସଞ୍ଚାନ ଉତ୍ସପାଦନେ ଖୁବ ସାମାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଥାକେ । ତବେ ଏ କଥାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହେଇ ଯେ, ନତୁନ ପ୍ରଜନ୍ୟେର ଦୁଇକେର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ (symmetry) ଶ୍ଵର୍କ୍ରିଟେର ଡିପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶେର ଦିକ ଓ ହାନେର ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଅବଶ୍ୟ ଏସବ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରକମଫେର ହବାର ସୁଯୋଗ ରହେଇ । କାରଣ ପ୍ରଥମ ତ୍ତରେର ବ୍ଲାସଟୋମିଯାର (Blastomeres) ଏର ଯଥେଷ୍ଟ ନିଜକିର୍ଣ୍ଣଳି ରହେଇ (totipotent) ଯାର ଫଳେ ମେ ବିଭତ୍ତ ହେଯେ ଦୁଇ ବାଚା ତୈରୀ କରାତେ ପାରେ ଯେମନ ଏକ ଡିପ୍ଲାଇ ଜୋଡ଼ା ବାଚା (uniovular twins)<sup>୬</sup> ।

ସୁତରାଂ ଯେହେତୁ ମେରଦନ୍ତ ପ୍ରାଣୀତେବେଳେ କୁମାରୀ ଜନ୍ମ ସନ୍ତୋଷ ତାଇ ଏକଥା ଭାବରେ କୋନ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମାହୁ, ନିଜ ଜାତେର ପ୍ରାଣୀତେ ବ୍ୟବହରିତ କୁମାରୀ ଜନ୍ମେର ନିଯମ (law of parthenogenesis) ହ୍ୟାରତ ଦ୍ୱାରା (ଆ)-ଏର କୁମାରୀ ଜନ୍ମେର ଜନ୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଇଛନ୍ । ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତ୍ତରେର ବ୍ଲାସଟୋମିଯାର ଟୋଟିପୋଟେନ୍ଟ ବଳେ ଏକଇ ଡିପ୍ଲାଇ ଜୋଡ଼ା ସଞ୍ଚାନ ସୃଷ୍ଟି କରାତେ ପାରେ, ଏବଂ ଏକଟି ମନୋପ୍ଲ୍ୟୋଡ (monoploid) ଡିପ୍ଲାଇ, ଯୌନ ପ୍ରୟୁକ୍ତି ଛାଡ଼ାଇ ନତୁନ ପ୍ରଜନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାତେ

সক্ষম হয়, তা হলে বিবি মরিয়মের ডিস্কে ২৩টি ক্রোমোজমও বিভক্ত হয়ে হ্যারত ঈসা (আ)-এর কুমারী জন্ম সংভব করেছে। সুতরাং যদিও মানুষের বেলায় কুমারী জন্ম সংভব হয়নি তবুও এ যে জীব জগতে সংভব তা অঙ্গীকার করা যায় না। অবশ্য এ কথা আমাদের পক্ষে বলা সংভব নয় কিভাবে মহান আল্লাহ্ বিবি মরিয়মের ডিস্কে উজ্জীবিত করেছিলেন যার ফলে একটি পুরুষ মানব শিশুর জন্ম সংভব হয়েছিল। কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও প্রমাণ ছাড়া একটি আন্দাজ করা যেতে পারে যা নেহায়েতই একটি কল্পনা মাত্র। পাক কুরআন ও বাইবেলের মতে পুরুষের বেশে ফেরেশতাকে দেখে বিবি মরিয়াম চমকে উঠেছিলেন। যদি রঞ্জন রশ্মি (radiation) কুমারী জন্মের জন্ম ডিস্কে উজ্জীবিত করতে পারে তবে ফেরেশতা যেহেতু নূর বা আলোর সৃষ্টি তাহলে সেই ফেরেশতার উপস্থিতির ফলে কোনরূপ রশ্মি বিবি মরিয়মের ডিস্কে উজ্জীবিতও করতে পারে। এ হবে একটি অলৌকিক ব্যাপার তবে আল্লাহই ভাল জানেন।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের বর্তমান জীব-রাসায়নিক সীমিত জ্ঞানের আলোকে বিবি মরিয়মের গর্ভে হ্যারত ঈসা (আ)-এর কুমারী জন্ম ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

#### তথ্যসূত্র :

1. Bealy, R.A., Parthenogenesis and poly-ploidy in Mammalion Development. Cambridge Univ. Press, 1957.
2. Meyer, D.E., and Buchanan, R., Biological Sciences, 2nd ed., 1968; An Inquiry into Life, 474 Harcourt, Brace and World, Inc. New York.
3. Storer T.I., Usinger, R.L., Stebbins, R.C. and Nybakken, J. W., General Zoology. TMH edition : Tata McGraw Hill Publishing Co, Ltd, New Delhi, 199, 1975.
4. Miller, W. B., and Leth, C., High School Biology BSCS Green Version, 2nd ed., Rand McNally Co., Chicago, 603, 1963.
5. Warwick, R. and Williams, P. L. Gray's Anatomy, 35th edn. Longman, p. 22, 1973.

۸۳-أَفَعَيْرُ دِينِ اَللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنِ اِنْتَ مِنْهُوْ وَالاَخْرُونَ طَنْعًا وَكَرْهًا  
وَلَا يَنْهُوْ يُرْجُحُونَ ○

৩ : ৮৩ তারা কী চায় আল্লাহর দৈনের পরিবর্তে অন্য দীন? - যখন আকাশে  
ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই দ্বেষ্য অথবা অনিষ্ট্য  
তাঁর নিকট আজসর্মপণ করেছে! আর তাঁর দিকেই তারা  
প্রভ্যানীত হবে।

ইচ্ছায় হোক, কী অনিষ্ট্য হোক আল্লাহর নিকট মাথা নত করা :  
আমাদের জ্ঞান যতে, আমরা জানি যে, আকাশমণ্ডলী ও জমিনে নিহোক শ্রেণীর  
বস্তু ও জীব রয়েছে :

১. জড় পদার্থ, যথা- পরমাণু, অণু এবং এগুলো দ্বারা তৈরি বস্তুসমগ্রী ।
২. জড় অবস্থুগত জিনিস যথা- বিভিন্ন আকারে বিরাজমান শক্তি এবং প্রকৃতির  
নামান রকম বল ।
৩. জৈব পদার্থ যথা- মানুষ সহ উষ্ণিদ ও প্রাণীকূল ।

কুরআন আরো দু'ধরনের সত্ত্বার কথা বলে যথা- জীন ও ফেরেশতা যা  
আমরা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না ।

উপরে উল্লিখিত বস্তু ও সত্ত্বার মধ্যে ইলেক্ট্রনের মত সূক্ষ্মতমই হোক আর  
তারকা কিংবা নীহারিকার মত বিশালই হোক সকলেই আল্লাহ প্রদত্ত বা নির্ধারিত  
প্রাকৃতিক আইনানুযায়ী তাদের স্ব ক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করে । বিভিন্ন আকারের  
শক্তি এবং প্রাকৃতিক বলের ক্ষেত্রেও একই কথা বাটে, যেগুলো আল্লাহর  
নির্দেশিত আইন অনুসারে কাজ করে ।

শ্রেণী, প্রকৃতি এবং প্রকার ভেদ যাই হোক না কেন, সকলকেই এসব আইন  
যান্ত্য করতে হবে এবং এরা কেউই এসব আইন লংঘন করতে জানে না, যে  
কারণে এমন দৃষ্টান্ত থাকতে পারে, যেখানে প্রাকৃতিক আইন লঙ্ঘিত হয়েছে বলে  
মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয় ।

যেহেতু সকল আইনই আল্লাহর জানা, সব কাজ এ সকল আইন অনুসারেই  
সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং এ ধরনের কোন আইনের আপাত লজ্জনও স্ফটা কর্তৃক পূর্ব  
নির্ধারিত বিশাল এক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই চলছে, সেহেতু বুঝতে হবে  
যে, কোন আপাত লজ্জনের মধ্য দিয়েও বিশেষ কোন কাজ সম্পাদিত হচ্ছে ।

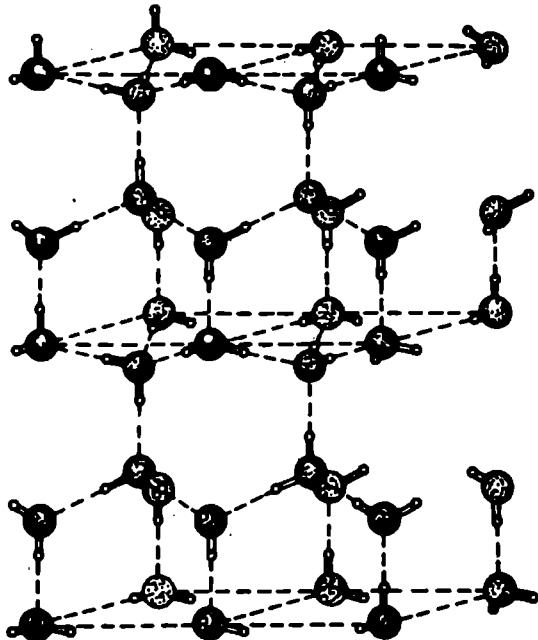
উদাহরণস্বরূপ পদার্থের নিউক্লিয়াসের ভিতরস্থ কণাসমূহের (তথা প্রোটন ও নিউট্রন) মধ্যে বিদ্যুৎ কণা বিনিয়ময়ের কথাই বিবেচনা করা যাক। তর ও শক্তির সম্পর্ক বিষয়ক সূত্র তথা  $E=mc^2$  থেকে আমরা জানি যে, একটি বিদ্যুৎ কণা বা মেসন (meson) তৈরির জন্যে প্রাপ্যতায় পরীক্ষাগারে বেগ বর্ধকের মধ্যে মেসন তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাইরের কোন অতিরিক্ত উভেজনা ছাড়াই নিউক্লিয়াসে শক্তি সরবরাহ করা হয় কিভাবে। দৃশ্যত  $\Delta E = 140$  মেভ পরিমাণে শক্তি সংরক্ষণ সূত্রের লংঘন করা হচ্ছে। এই লংঘনকে শুধু এভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এই শক্তি লংঘন এত মাত্রাতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ঘটে যা আমরা পরিমাপ করতে পারি না।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ঘটমান প্রক্রিয়া এবং শক্তি সংরক্ষণ লজ্জনকে বলা হয় কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন। মজার ব্যাপার হলো যে, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের অন্যতম আইন এই শক্তি সংরক্ষণ-এর লজ্জন কোন এলোপাতাড়ি বা বিশ্বংখলভাবে ঘটে না। শক্তি সংরক্ষণ লজ্জন সংযুক্ত হয়  $\Delta E \Delta t_{ch}$  (প্ল্যাক-এর প্রক্রিয়া) সূত্র অনুযায়ী, যা সূক্ষ্মতর জগত সম্পর্কে হাইসেনবার্গের অনিচ্ছিতা মতবাদের এক ধরনের প্রকাশ; সূত্র থেকে এই ধরনের ভ্রান্তি একটা সূত্রানুযায়ী ঘটে থাকে। আল্লাহর নির্ধারিত আইনের ধারার বাইরে কোন কিছুই ঘটতে পারে না।

বরফে পরিণত হলে পানির ঘনত্ব হ্রাস পাওয়াকে প্রকৃতির অনিয়ম বা বিশ্বংখলা মনে হতে পারে। সাধারণভাবে ঠাণ্ডা হলে যে কোন তরল পদার্থের ঘনত্ব বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত জমাট বাঁধনে ঘনত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে পানি যার ঘনত্ব  $4^{\circ} \text{ সে: গ্রে:}$  তাপমাত্রায় বরফে পরিণত হলে এর ঘনত্ব সর্বনিম্নে পৌছে যায়। বরফে রঞ্জন রশ্মি এবং নিউট্রনের বিচ্ছুরণ বা অপবর্তন বিষয়ক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, বরফের রয়েছে ক্ষতিকী গঠন যাতে প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণু অন্য চারটি অক্সিজেন অণুর দ্বারা চতুর্কোণাকারে ঘেরাও অবস্থায় থাকে (চিত্র-২)। অন্যান্য কঠিন গঠন কাঠমো বিশিষ্ট বস্তুর তুলনায় ভিন্নভাবে দুটি একটি উন্নত গঠন কাঠমো যা বরফের নিম্ন ঘনত্বের কারণ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই বিশ্বংখলা বা অনিয়মও একটা নিয়ম মেনে চলে। মানুষ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর অভূত কল্যাণের জন্যেই আল্লাহ এ নিয়মের প্রবর্তন করেছেন।

আমাদের জ্ঞাত যত জীব রয়েছে তার মধ্যে আল্লাহর পরিকল্পনানুযায়ী উন্নত কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে একমাত্র মানুষেরই রয়েছে উচ্চমান সম্পন্ন বুদ্ধিমত্তা এবং ইচ্ছা ও কর্মসম্পাদনের স্বাধীনতা। তাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর নির্দেশিত বিধান অনুধাবন করে তারা সচেতনভাবেই আল্লাহর অঙ্গিত উপলক্ষ্য করে এবং স্বেচ্ছায় সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।

କିନ୍ତୁ ଯାରା ସୁନ୍ଦିବୃତ୍ତିକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗତ ବ୍ୟାପାରେ ଆଲ୍ଲାହ କର୍ତ୍ତକ ମଞ୍ଚରକୃତ ସାଧିନତାର ଭାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଏବଂ ଖାରାପ କାଜେର ମାଧ୍ୟମେ ତାଦେର ଅନ୍ତରେ ରୋଗ ଏବଂ ସଭାବେ ବିକୃତିର ଜନ୍ମ ଦିଯେଛେ, ତାରା ନିର୍ବୋଧ ଏବଂ ଏତ ଉନ୍ନତ ଯେ ତାରା କଥାଯ କାନ ଦେଇ ନା, କିନ୍ତୁ ତାରାଓ ଶ୍ରଷ୍ଟାର ବିଶାଳ ପରିକଲ୍ପନାର ଅଧୀନ ।



ଚିତ୍ର-୨

ବରଫ କ୍ଷଟିକେର ଅଣ୍ଟନ । ଏଇ ଚିତ୍ରେ ପାନିର ଅଣ୍ଟନ ଅବାଧ । ପାନିର ଅଣ୍ଟନେ ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ରିଜେନ-ଅକ୍ରିଜେନ ଅକ୍ଷ ବରାବର ଏକଟି କରେ ପ୍ରୋଟନ ଆହେ । ଏରା ଦୁଟି ଅକ୍ରିଜେନ ପରମାଣୁର ମଧ୍ୟେ ହୁଏ ଏଟିର ନୟତ ଅନ୍ୟାଟିର କାହାକାହି (Pauling-ଏର ମତାନ୍ୟାମାରେ) ।

ମାନସିକଭାବେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହଲେଓ ଅସଂ କର୍ମଶୀଳରା ଆଲ୍ଲାହର ଇଚ୍ଛାର ନିକଟ ଆସସମର୍ଗଣ ନା କରେ ପାରେ ନା । ତାର ଦେହରେ ପ୍ରତିଟି କୋଷ, ଦେହଭାଗରଙ୍କ ସକଳ ଦୈହିକ କାର୍ଯ୍ୟବଳି, ତାର ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶୈସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁ- ସବକିଛୁଇ ଆଲ୍ଲାହର ଇଚ୍ଛାନ୍ୟାମୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଧାନ ଅନୁସାରେଇ ଘଟେ ଥାକେ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଉନ୍ନତ

মন ছাড়া তার সমগ্র সত্ত্বা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। অসৎ কর্মশীল লোকের পক্ষে তাকে প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহারের কারণেই উদ্ভৃত আচরণ করা সম্ভব।

এভাবে উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টিই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করে থাকে। কিন্তু চিন্তা ও কর্মে মানুষকে সীমিত স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে এবং এভাবেই সে সৃষ্টির সেরা জীব (আশরাফুল মখলুকাত) হিসেবে স্বাতঙ্গের অধিকারী হয়েছে। এই স্বাধীনতার কারণে মানুষ তার যেরকম ইচ্ছা সেরকম জীবন পদ্ধতি বেছে নিতে পারে। কিন্তু সীমিত জ্ঞানের কারণে, তার পক্ষে কোন ভাস্তু জীবন পদ্ধতি বেছে নেয়ার প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক। কাজেই, আল্লাহ তাঁর সীমাহীন করণা আর প্রজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর নবীগণের মাধ্যমে একটা দীন বা জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন যাতে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করতে পারি।

### তথ্য সূত্র ৪

1. Pauling, L., *The Nature of Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals*, Oxford Pub, Co. 3rd, Ed, p. 465, 1969.

١٤٦- قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبِيلٍ كُمْ سُنْ<sup>١</sup> فَيَرُوُا فِي الْأَرْضِ مَا نَظَرُوا كَيْفَ كَانَ  
 ۝ أَعْقَبَةُ الْكَلْبِينِ<sup>٢</sup>

৩ : ১৩৭ তোমাদের পূর্বে বহু বিধান গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী  
 ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশুয়ীদের কী পরিণাম!

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি : অত্র আয়াতে কুরআন অতীতের  
 জনগণের বিভিন্ন ধরনের জীবন পদ্ধতির উল্লেখ করে মু'মিনদেরকে পৃথিবী  
 পরিভ্রমণ করে স্বচক্ষে দেখতে বলা হয়েছে তাদের পরিণাম ফল যারা তাদের  
 জন্য আল্লাহর নির্ধারিত আইন ও বিধানাবলি অঙ্গীকার করেছিল অর্থাৎ সেগুলো  
 অনুসরণ করেনি। আরো অনেক আয়াতেই বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বপরিভ্রমণের তাকিদ  
 দেয়া হয়েছে। যেমন আয়াত ৩১:৩৭; ৬:৬,১১; ১২: ১০৯; ১৬:৩৬; ২২:৪৬;  
 ২৭:৬৯; ৩০:৯, ৪২; ৩৫:৪৪; ৪০:২১; ৪৭:১০। বর্ণিত উদ্দেশ্য হচ্ছে  
 অতীতকে জানা এবং যারা আল্লাহর বাণী অনুসরণ করেনি তাদের কী পরিণতি  
 হয়েছিল তা অবলোকন করা।

এ আয়াতগুলো কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী, দেশ কিংবা সময়কালের কথা বলে  
 না। মজার ব্যাপার হলো যে, ফারটাইল ক্রিসেন্ট (Fertile Crescent) হিসেবে  
 জনপ্রিয় এবং পরিচিত ভূখণ্ডটি অনেক সভ্যতার উত্থান ও পতন প্রত্যক্ষ করেছে।  
 এগুলোর কোন কোনটির কথা কুরআনে বিশেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং  
 এসব দৃষ্টান্ত আরবদের নিকট সহজে বোধগম্য ছিল। মিসর থেকে একটা রেখা  
 টানা হলে তা যদি ভূমধ্যসাগর বরাবর নিয়ে যাওয়া যায়, আরো এগিয়ে  
 ফিলিস্তিনী অঞ্চলসমূহ এবং সিরিয়া ঘুরে দজলা ও ফোরাত স্পর্শ করে  
 মেসোপটেমিয়া হয়ে পারস্য উপসাগরে পৌছা যায়, তাহলেই এই অর্ধচন্দ্র  
 (Crescent) হয়ে গেল। প্রায় চার হাজার বছর আগে ফারটাইল ক্রিসেন্ট  
 (অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতা অধ্যুষিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি অঞ্চল) নামের আরবীয় মরুভূমির  
 চার ধারের এই অঞ্চল বহু সভ্যতাকে বুকে ধারণ করেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের  
 মতে, প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে গ্রীসীয়-রোমক সংস্কৃতি পর্যন্তকার সকল  
 সভ্যতার কেন্দ্রভূমি এখানেই অবস্থিত।

মিসরের বিশাল বিশাল পিরামিড আর মেসোপটেমিয়ার বৃহদাকার মন্দির  
 যার সাথে রয়েছে সুউচ্চ চূড়া এবং জিগুরাস এসব কিছুই এতদঞ্চলের  
 প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার প্রমাণ। প্রাচীন মিসর শাসন করত ফেরাউন রাজবংশ।  
 আর দজলা ফোরাতের মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়া শাসন করত সুমার এবং আকাদ  
 রাজাগণ। কিন্তু কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবীর সকল জাতির লোকদের

মধ্যেই নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল (আয়াত ৫ : ৫১; ১০ : ৮৭; ১৩ : ৭; ১৫ : ১০; ১৬ : ৩৬; ১৭ : ১৫; ২৬ : ২০৮; ২৮ : ৫৯; ৩৫ : ২৪; ৩৫ : ৩৭)।

সূতরাং প্রথিবীর যে কোন যায়গায় বসবাসকারী একজন মুসলমানের জন্য এর অর্থ হবে যে, বিশেষত কুরআনে উল্লিখিত জাতিগুলো সহ অন্যান্য স্থানের জনগণের পাশাপাশি সে তার নিজ দেশের জনগণের একটি অংশ।

আল-কুরআন বিশ্বাসীদেরকে বলছে যে, তারা যেন নবী-রাসূলগণের প্রচারিত আল্লাহ'র বাণী অঙ্গীকারকারীদের পরিণতি অবলোকন করে। কুরআনের বর্ণনামতে, যেহেতু সকল জাতির নিকট নবী প্রেরিত হয়েছিলেন, সকল নবীর বক্তব্য এবং যে জাতির প্রতি তারা প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের সকলেরই অত্য আয়াতের তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধান করার কথা। তবে অতীত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। আমরা সব ঘটনা জানি না।

এমনকি আমরা যদি শুধুমাত্র কুরআন উল্লিখিত নবীগণের মধ্যেই আমাদেরকে সীমিত রাখি তথাপিও সমস্যা থেকে যায় যে, তাদের সকলের উপর নাযিলকৃত ওহী কি ছিল তা আমাদের জানা নেই। এমনকি তওরাত (তোরাহ) যবুর (সামস) এবং ইঞ্জিল (বাইবেল) ছাড়া অন্য কোন প্রক্ষিপ্ত কিংবা অনির্ভরযোগ্য আকারেও আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশ আমাদের হাতে নেই। হ্যরাত ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ) এবং তাদের গোত্রের নিকট নাযিলকৃত কিতাব বা ওহী যার কথা কোরআনের ৩৪৮৪ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে তাও আমাদের হাতে নেই।

শুধু একটা বিষয়ই আমাদের জানা যে, সকল নবীই শুধু যে শিরীক তথা অংশীবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন তা নয় বরং তারা সব রকম দুর্কর্মের বিরুদ্ধেই ছিলেন। আল্লাহ'র বাণী প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি বলতে যদি ধরা হয় পরিপূর্ণ ধৰ্মস, তাহলে অংশীবাদিতাকেই একমাত্র কারণ ধরে নেয়া কঠিন। কেননা, অনেক প্রাচীন অংশীবাদী জাতি আজও টিকে আছে। কাজেই অন্য আরো কারণ ধৰ্মস থাকতেই হবে।

কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূল এবং তারা যে সকল জাতির মধ্যে আল্লাহ'র বাণী প্রচার করে গেছেন তাদের কর্ম তৎপরতার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, যারা সম্পূর্ণ ধৰ্মস হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে : ১) হ্যরাত নূহ (আ) এবং হ্যরাত লূত (আ)-এর জাতি, ২) সাদ জাতি, ৩) ছামুদ জাতি, ৪) মাদিয়ান জাতি। এ সকল জাতি অংশীবাদিতা ছাড়াও আরো বিভিন্ন দুর্কর্মে লিপ্ত হয়েছিল যা কুরআনে বিধৃত হয়েছে। এ সকল দুর্কর্মের মধ্যে নৈতিক ঝুঁঠন বহু জাতির পতনের কারণ ছিল এবং এখনও বর্তমান, যা ইতিহাস থেকে জানা যেতে পারে।

ଯାହେକ ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେ ହୁଲେ ଇତିହାସେର ଆଶ୍ରୟ ନିତେଇ ହୁଯ, ଅଥଚ ଇତିହାସ କୋନ କୋନ ଦେଶେ କ୍ଷେତ୍ରେ ତ୍ରି: ପୃଷ୍ଠା ୨୦୦୦ ଥେବେ ୩୦୦୦ ସାଲେର ପିଛନେ ଯାଯ ନା । ଏ ସମୟରେ ପିଛନେର ତଥା ପ୍ରାଗ୍ରେତିହାସିକକାଳେର କଥା ଜାନତେ ହୁଲେ ଏକମାତ୍ର ତରସା ପ୍ରତ୍ତତସ୍ତ୍ର (archaeolog) ତଥା ମାନୁଷେର ଅତୀତକାଳେର ଦ୍ରବ୍ୟାସାମଧ୍ୟୀ ନିଯେ ଗବେଷଣା ଶାନ୍ତ୍ର (ଆରକାଇ (archai) = ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିସପତ୍ର, ଲୋଗୋସ (logos) = ବିଜ୍ଞାନ, ମତବାଦ) । ପ୍ରତ୍ତତସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଧାନ ଲଙ୍ଘ ହୁଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବଶେଷକେ ଇତିହାସେର ପ୍ରେସ୍କାପଟେ ହୁଅ କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ର ତଥା ଲିଖିତ ଦଲିଲପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗତ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଥେବେ କି ଜାନା ଯାଯ ସେ ତଥ୍ୟ ବେର କରେ ଆନା ।

ବିଗତ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରେ ଆମେରିକା, ଇଂଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଜାର୍ମାନୀର ପ୍ରତ୍ତତସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟଗନ ଉର୍ବର ଅର୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ତଥା ଫାରଟାଇଲ କ୍ରିସେନ୍ଟ ଦେଶଗୁଲୋତେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାଦି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଧୃତ ବିବରଣ୍ସମୂହକେ କଟଟା ସମର୍ଥନ କରେ ତା ଖତିଯେ ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ଐସର ଦେଶେ ପ୍ରତ୍ତତାତ୍ତ୍ଵିକ ଅନୁସଙ୍ଗାନ ଚାଲିଯେ ଯାଚେନ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଫଳାଫଳ ବାଇବେଲ/ କୁରାନେର ବିବରଣାଦିକେ ଯଥାୟ ଦୃଢ଼ିତଜ୍ଞିତେ ବୁଝାତେ ବେଶ ସହାୟକ ହେଁଥେ । ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ଥାନିକ ଓ ଉନ୍ନତ କଳାକୌଶଲର ସାହାଯ୍ୟେ ଅଧିକତର ଅନୁସଙ୍ଗାନେ ଆରୋ ବେଶୀ ନିର୍ଭଲଭାବେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ଵ ବେରିଯେ ଆସବେ ଏକଥା ନିଚିତଭାବେ ବଲା ଯାଯ ।

ଆସ୍ଥାନିକ ପ୍ରତ୍ତତସ୍ତ୍ରେ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନେର ନାନା ଶାଖାଯ ବ୍ୟବହର ଅନେକ ଆସ୍ଥାନିକ କଳାକୌଶଲ ପ୍ରୟୋଗ କରା ହେଁ, ଯଥା ୧) ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟା- ତେଜକ୍ରିୟ ଡେଟିଂ ଏବଂ ବାୟୁମତ୍ତ୍ତ୍ଵାଳୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫୀର ଜନ୍ୟେ, ୨) ରସାୟନଶାସ୍ତ୍ର-ରାସାୟନିକ୍ ଡେଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ତତାତ୍ତ୍ଵିକ ରସାୟନର ଜନ୍ୟେ, ୩) ଭୃତ୍ୱବିଦ୍ୟା, ୪) ଆବହାୟା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ତତାତ୍ତ୍ଵିକ ଅନୁସଙ୍ଗାନକାଳେ ପ୍ରାଣ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ତାରିଖ ସଠିକଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଁ ଥାକେ । ତେଜକ୍ରିୟ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ତତାତ୍ତ୍ଵିକ ହୁଅ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାତ୍ତଗୋଡ଼; କାଠ ଏବଂ ଛାଇୟେ ମଧ୍ୟେ ତେଜକ୍ରିୟ କାର୍ବନରେ (କାର୍ବନ ୧୪) ପରିମାଣ ପରିମାପ କରେ ଏଇ ବସ୍ତୁର ମୋଟାହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ଯାଯ । ପାରମାଣ୍ଵିକ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟା ଗବେଷଣାର by product ଏଇ ତେଜକ୍ରିୟ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ପ୍ରତ୍ତତାତ୍ତ୍ଵିକ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ବହୁାଂଶେ ବିପ୍ଳବୀଭାବକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେହେ । ଯଦିଓ ଏହି ଏକବାରେ ନିର୍ଭଲ ନମ, ତଥାପି ଏହି ପ୍ରତ୍ତତସ୍ତ୍ରେ ଏକଟା ନତୁନ ଦିକ ସଂଯୋଜନ କରେହେ ଏବଂ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକେ ଚାଲିଶ ହାଜାର ବହୁ ପିଛନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାରଣ କରେହେ । ଏହାହା ପଟାଶିଯାମ-ଆର୍ଗନ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ତାପାଲୋକ ପଦ୍ଧତିତେ ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତିଓ ଆଜକାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରା ହେଁ । ପଟାଶିଯାମ-ଆର୍ଗନ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁତ୍ତ ୨୦ ଲାଖ ବହୁ କିଂବା ସମ୍ଭବତ ତାରା ବେଶୀ ଆଗେକାର ପୂର୍ବ ଆକ୍ରିକାର ମାନୁଷେର ପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମବଶେଷ ଓ

তার শিল্পকর্মকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব করেছে। হাড়গোড়ের ফ্লোরিন উপাদানের বিশ্লেষণ হাড়-হাঙ্গিদের বয়স নির্ণয়ে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

মাত্র সাম্প্রতিককালে মিশর ও ইরাকের মত কিছু কিছু মুসলিম দেশ সেখানে প্রত্ত্বাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে হাত দিয়েছে। কিছু কিছু প্রচেষ্টা ইসলামের আথরিক যুগেই চালানো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বলা হয়ে থাকে, খলিফা মু'আবিয়া (৬৬১-৬৮০ খ্রি) শান্দাদের রাজপ্রাসাদ হিসেবে জনপ্রিয়তাবে পরিচিত প্রাসাদ এলাকায় প্রত্ত্বাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, যাকে কুরআনে (আয়াত ৮৯ : ৭) সুউচ্চ স্তুতিবিশিষ্ট ইরানের নগরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে, অতীত সম্পর্কে জানার জন্য পৃথিবী পরিভ্রমণে কুরআন বার বার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও এমনকি কুরআনে উল্লিখিত বিষয়সমূহ জানার জন্য কোন প্রচেষ্টাই চালানো হয়নি। অত্র আয়াত এ কথাই বলছে যে, মুসলমানদেরকে অতীতকে জানার চেষ্টা করতেই হবে। এটা তারা করতে পারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষত প্রত্ত্বাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

### ١٩- فِي خَلْقِ الْمُوتَّ وَالرِّزْقِ وَالْخَلَافِ الْبَلِيلِ وَالنَّهَارُ لَذِيْلٌ لِأَوْلَى الْكَلَابِ

৩ : ১৯০ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে নির্দর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য।

আসমান ও যমিনের সৃষ্টি : কুরআনের এই আয়াতটি দু'ভাগে ভাগ করে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথম অংশ তথা “আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে” কুরআনের ২ : ১৬৪ আয়াতের প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

দিন ও রাতের প্রভেদ : দ্বিতীয় অংশ তথা “দিবস ও রজনীর পার্থক্যের মধ্যে” ২ : ১৬৪ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

### ١٩١- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا كَفَرُوا كَعَلِ جَنُونَهُمْ رَبَّنَّ قَلْبَنَّ فِي خَلْقِ الْمُوتَّ وَالرِّزْقِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْجَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

৩ : ১৯১ যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়ে আল্লাহকে শ্রাণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সবকে চিন্তা করে এবং রলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব নির্বর্থক সৃষ্টি কর নি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্রিমাত্তি হতে রক্ষা কর।

ଏ ଆୟାତଟିର ଦୁ'ଟି ଦିକ ରହେଛେ । ସଥା : କ) ଆୟାତଟିତେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ବହେର ତାଂପର୍ୟ ଏବଂ ଖ) ଯେ ଧରନେର ଲୋକେରା ଏରାପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଥାକେ ।

ଏଥିମ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରା ଯାକ । ବସ୍ତୁତ ଉପରେ ଉତ୍କୃତ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଆଧୁନିକ ବାସ୍ତ୍ଵ ସଂସ୍କାନ ବିଦ୍ୟାର ଭିତ୍ତିଶକ୍ତିପ ଯା ଜୀବନ ଓ ପରିବେଶ ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରେ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନେର ତ୍ରମାବ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରସାରେ ମାନୁଷ ଶିଥାତେ ଶକ୍ତ କରେଛେ ଯେ, ଅକ୍ରତିତେ ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏମନ କିଛୁ ନେଇ ଯା ପ୍ରୟୋଜନାତିରିକ୍ତ କିଂବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ । ପ୍ରଥମତ ଆଜ୍ଞାହର ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଉପର ଭିତ୍ତିଶୀଳ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରେ ନ୍ୟନତମ ମୌତି ବା ସ୍ଵତ୍ର କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହେଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକବିଜ୍ଞାନେ ନ୍ୟନତମ ପଥ, ବଲବିଦ୍ୟାଯ ନ୍ୟନତମ ଶକ୍ତି ମତବାଦ ଇତ୍ୟାଦି । ସବକିଛିର ମଧ୍ୟ ଦିଯେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଗତାନ୍ତଗତିକ ଓ ସୁବିନ୍ୟାସ ଆକାରେର କଥା ଫୁଟେ ଉଠେ । ଦିତ୍ୟତ ସବ ରକମେର ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଏକ ମହାପରିକଳନାର ଛାପ ବିମୂର୍ତ୍ତ ହେଁ ଉଠେ ଯା ମାନୁଷକେ ତାର ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତରେର ଓ ବାଇରେର ଜିନିସେର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କେ ଚିନ୍ତା-ଭାବନା କରାତେ ଉତ୍ସୁକ କରେ । ରୋଗଜୀବାଗୁର କଥାଇ ଧରା ଯାକ । କୋଣ ଜୀବାଗୁଷ୍ଟିତ ରୋଗେ ଆକ୍ରମିତ ହେଲେ ଆମରା ତାବି, ଜୀବଗୁରା ସତିଇଁ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଉପଦ୍ରବ ବିଶେଷ । ଆମରା ଉପଲକ୍ଷି କରି ନା ଯେ, ଏବେ ଜୀବାଗୁର ଅନେକଙ୍ଗାଳୋ ଏମନ ଆହେ ଯାଦେର ଛାଡ଼ା ଆମାଦେର ଅନ୍ତିତ୍ତୁଇ ହେମକିର ମୁଖେ ପଡ଼ତ । ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଆମାଦେର ଅନେକ ଖାଦ୍ୟାସାମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ୟାଦନେ ଜୀବାଗୁର ଭୂମିକା ସୁପରିଚିତ । କିଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗେର ଜନ୍ମଦାନକାରୀ ଜୀବାଗୁ ଏବଂ ଭାଇରାସ ବାଦେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଲୋର ବିରୁଦ୍ଧ ମାନବ ଦେହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନ ଯଥାୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଡ଼େ ତୁଳତେ ପାରେ-ଅଗୁଜୀବେରା ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ବାସ୍ତ୍ଵ ସଂସ୍କାର ରକ୍ଷା ଯାଇବା ଅଭିନନ୍ଦ ତାଂପର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଅଧିକତ୍ତୁ, ଆଜକାଳ ଜ୍ଞାନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟାରିଂ ତଥା ବଂଶଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରକୋଶଲ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟେ ଅନେକ କଥା ବଲାବଲି ହଛେ । କିଛୁ ଏବ ବର୍ତମାନ ଆକାରେ ଜ୍ଞାନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟାରିଂ ଅର୍ଥ ଆମରା ଯା ଚାଇ ତା ଉତ୍ୟାଦନେ ଏ ସକଳ ଜୀବାଗୁକେ ବ୍ୟବହାର କରା । କାଜେଇଁ, ଆଜ୍ଞାହ ଯଦି ଏକଟି ଜୀବାଗୁକେ ଏକଟା ଜଟିଲ ପରିକ୍ଷାଗାର ବାଲିୟେ ଥାକେନ, ତାତେ ବିଶ୍ୱଯେର କିଛୁ ଥାକତେ ପାରେ ନା ।

ବସ୍ତୁତ ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ଆକାରେର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏକ କଥାଯ ବିଶ୍ୱଯକର । ଜୀବ ଜଗତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଯ ଯେ, କିଛୁ କିଛୁ ଜୀବବର୍ଗ ଦେଖିତେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ରୀ, ଆବାର କିଛୁ କିଛୁ ଆହେ ଯାରା ଦେଖିତେ ଶୁଣ୍ଣି । କତକ ଦିନେ ଚଲାଫେରା କରେ ଆର କତକ ରାତେ, କତକ ବିଶେଷ ଗର୍ବ ଛାଡ଼ାଯ ଆବାର କତକ ମେଜବାନ ଏବଂ କତକ ମେହମାନେର ମତ ଆଚରଣ କରେ । ବିଶ୍ୱଯକର ବ୍ୟାପାର ହଲୋ ଯେ, କେଟେଇ କମହିନ ନୟ । ଆରୋ ବିଶ୍ୱଯକର, ଏବେ ବର୍ଗେର ଦୈହିକ ଓ ଜୈବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ବ୍ୟାପାର କରିବାର ଜନ୍ୟେ ନୟ, ବରଂ ଏବେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଅନ୍ୟ ଦିଯେ ଅପରାପର ଜୀବେର ଅନ୍ତିତ୍ରେ ସାଥେ ଯୁକ୍ତ । ଆମାଦେର

জ্ঞানের বর্তমান স্তরে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে এই আন্তঃনির্ভরশীলতার বিষয়ে আমরা পুরোপুরি পরিচিত নই। এভাবে, আমরা যদি বিশেষ কোন প্রকার বর্গকে জ্ঞানের অভাব কিংবা বাহুবিচারহীন কর্মকাণ্ড দ্বারা ধ্রংস করি, তাহলে পরিণামে অন্য কিছু বর্গের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং বাস্তুসংস্থান তথাবহভাবে বিঘ্নিত হয়। সুতরাং যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন জীব কোন সমস্যা সৃষ্টি করে, তখন এদেরকে অবশ্যই ধ্রংস নয় নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

জীবনের আকার আকৃতির বৈচিত্র্যেরও কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন— কোন এক বর্গকে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বর্গের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে হতে পারে। সম্প্রতি বিশ্বে জ্ঞালানী সংকটের মুখে অনেকেই ভাবছেন যে, আমরা মানুষেরা সংক্ষিপ্ত অনেক উপকার পেতে পারি যদি আমরা বুঝি কিভাবে অণুজীবেরা তাদের শক্তি উৎপাদন, শক্তি সংপ্রয় ও ব্যবহার এবং শক্তি সংরক্ষণ ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করে। আরো সম্প্রতি, যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীগণ আশা করছেন যে, তারা ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ সমস্যার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবেন, যদিও তীক্ষ্ণদণ্ড প্রাণীরা (ইন্দুর) খাদ্য ধ্রংসকারী হিসেবে কুখ্যাত।

যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু ছত্রাকঘটিত রোগ বিশেষজ্ঞ ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের উপর গোপন পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করে ভাবতে শুরু করেছেন যে, ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিস্তৃত গবেষণা চালানোর মধ্য দিয়ে আমাদের খাদ্য সংরক্ষণ সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। ইঁদুরেরা কর্তনকৃত শস্যদানা, শীষ ইত্যাদি তাদের গর্তের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে রাখে। এতে বাতাসের প্রবাহ এবং তাপমাত্রার ভিন্নতা সৃষ্টি হয় যা ঐ শস্যদানার উপর এক ধরনের ছত্রাক জন্মাতে সাহায্য করে। ঐ ছত্রাক মাইকোটোক্সিন নামক এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে যা গোবরে পোকা কর্তৃক শস্য দানাগুলোকে এলোপাতাড়ি ছড়িয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে কীটনাশকের কাজ করে। শস্যবীজ এখানে সেখানে নিয়ে ইঁদুরেরা শুধু অন্যান্য কিছু কিছু ছত্রাকের বেড়ে ওঠা ত্ত্বাবিত্তই করে না, তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যেগুলো শস্যবীজ সরবরাহকে ধ্রংস করে। ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের শিল্পগত বৃদ্ধিমত্তার মধ্যে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ নামে পরিচিত প্রযুক্তি রয়েছে। সম্প্রতি প্রযুক্ত অন্য জীবদেহের সাহায্যে কীট দমন পদ্ধতির প্রতিফলন দেখা যায়। অতএব, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন কিছুই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। জীবজগত থেকে মাত্র শুটি কয়েক দৃষ্টান্তই এখানে পেশ করা হলো। এবার বস্তু জগত থেকে দু’একটা দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতির চারাটি বলের কথাই চিন্তা করি। এগুলো হচ্ছে : মাধ্যাকর্ষণ বল, দুর্বল আণবিক বল, ভৃড়ি-চুম্বকীয় বল এবং শক্তিশালী আণবিক বল। দুর্বল এবং ভৃড়ি-চুম্বকীয়

ବଲେର ତୃଡ଼ି-ଦୂର୍ବଳ ବଲେ ଏକିଭୂତ କରଣେ ପ୍ରଫେସର ସାଲାମ, ଓଯେନବାର୍ଗ ଏବଂ ଶ୍ରାଣୋର ସଫଲ ପ୍ରଟେଟୋର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଚାରଟି ବଲେର ସବତ୍ତଳୋକେ ଏକଟି ଏକକ ବଲେ ଏକିଭୂତ କରାର ପ୍ରଟେଟୋର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଭାବତେ ଅବାକ ଲାଗେ କେନ ଆହ୍ଲାହ୍ ବଲେର ଚାରଟି ତିନି ତିନି ପ୍ରକାଶେର ବ୍ୟବହାର କରେଛେ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ଦୂର୍ବଳ କ୍ରିୟା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛିଲ ? ହୁଏ, ଏର ଜବାର ଅଂଶତ ପାଓଯା ଯାବେ ତାରକାମତ୍ତ୍ଵାଲୀର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକିଯାର ମଧ୍ୟେ । ଦୂର୍ବଳ କ୍ରିୟା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କାରଣେ 'ବେଟା'ର ଧର୍ମ ସଟେ ଥାକେ ଯା ଏମନ ଏକଟା ପ୍ରକିଯା ଯାତେ ହୁଏ ଏକଟା ନିଉଟ୍ରନ, ଏକଟା ପ୍ରୋଟନ, ଏକଟା ଝଣାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏବଂ ଏକଟା ଏକଟା ନିଉଟ୍ରନାଟେ ରନ୍ପାତ୍ତରିତ ହୁଏ, ନୃତ୍ୟା ଏକଟା ପ୍ରୋଟନ, ଏକଟା ନିଉଟ୍ରନ, ଏକଟା ଧନାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏବଂ ଏକଟା ନିଉଟ୍ରନାଟେ ରନ୍ପାତ୍ତରିତ ହୁଏ । ଏଇ ପ୍ରକିଯାତେଇ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆମାଦେର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଁ ପୃଥିବୀତେ ଚଲେ ଆସେ । କାଜେଇ ଦେଖୁ ଯାଛେ ଯେ, ଦୂର୍ବଳ ବଲ ନା ଥାକିଲେ ଏ ଧରନେର କୋନ ପ୍ରକିଯା ବା ବ୍ୟବହାର ଥାକତ ନା । ବସ୍ତୁତ ଏକ ମହାଶକ୍ତିଧର ଆହ୍ଲାହ୍ ପାରେନ ଏରକମ ଏକ ଦୂର୍ବଳ ବଲ ଉତ୍ପାଦନ କରତେ ।

ଆବାର, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଛକେର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଯି ସେଇ, Be (ବେରିଲିୟାମ-୮) ଅନ୍ତିତ୍ତିଲୀଳ । କିନ୍ତୁ କେନ ? ଏଟା କି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଦୂର୍ଘଟନା । ନାକି କୋନ ଯହିଁ ପରିକଲ୍ପନା ? ପ୍ରମାଣ କରା ଯାଯି ଯେ, ଯଦି ବେରିଲିୟାମ-୮ ଶ୍ରିତ୍ତିଲୀଳ ହତ, ତାହେଲେ ଆମରା ଆଜ ଏଥାନେ ଥାକତାମ ନା (ଦ୍ରୁ : ଆୟାତ ୨ : ୧୧) । କାଜେଇ, ଏମନକି ବେରିଲିୟାମେର ଅନ୍ତିତ୍ତିଲୀଳତାଓ ମହାବିଦ୍ରେ ଅନ୍ତିଦ୍ରେ ଜନ୍ୟ ପ୍ରଟ୍ଟାର ଅସୀମ ହେକମତ ବା ପ୍ରଜାରାଇ ପ୍ରକାଶ । ଆପାତତ ଯା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ସେଟୋଔ ସ୍ଟାର ମହାପରିକଳ୍ପନାଯା ସବିଶେଷ ଶ୍ରଙ୍ଗତପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶ୍ରଷ୍ଟତାଇ ମହାବିଦ୍ରେ ଦିନ ଦିନ ଆରୋ ବେଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲାନୋର ସାଥେ ସାଥେ ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରା ସମ୍ଭବ, 'ପ୍ରଭୁ, ତୁମି ଏସବ କିଛୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବିହୀନଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କର ନି' (ଆୟାତ ୩ : ୧୯୧) ।

ଏଥନ ଦେଖୁ ଯାକୁ, କୋଣ ଧରନେର ଲୋକେରା ଏ ରକମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରତେ ପାରେ । ଶ୍ରଷ୍ଟତାଇ କୋନ ଅଞ୍ଜ-ମୂର୍ଖେର ପକ୍ଷେ ଏ ଧରନେର ଉଚ୍ଚାରଣ କରା ସମ୍ଭବ ନାୟ । ବସ୍ତୁତ ଆହ୍ଲାହ୍ ପରିତ୍ରକ୍ରାନ୍ତ କୁରାନେର ଆରୋକ ଆୟାତେ ସୋଷଣ କରେଛେ ଯେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିରାଇ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ବୁଝାତେ ପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଧରନେର ଉଚ୍ଚାରଣ କରତେ ପାରବ ସଥିନ ଆମରା ଚେଷ୍ଟା ଓ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନେର ଅଧିକାରୀ ହବ । ଆମାଦେର ଉଚ୍ଚତ ସନ୍ଦାସର୍ବଦୀ ହତଃକୃତଭାବେ ଆହ୍ଲାହକେ ଶ୍ରବଣ କରା-ଦାଙ୍ଡିଯେ, ବସେ ଏବଂ ଶ୍ରେ ଏବଂ ଏଭାବେଇ ତାର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରା । ଏ ଧରନେର ଚିନ୍ତାର ଆଗମନ ଘଟିଲେ ପାରେ ବିଜ୍ଞାନେର ଏକ ସତିନ୍ ସଂକ୍ଷତି ଥେକେ ଯା ମୁସଲମାନଦେର ଏକ ସମୟ ଛିଲ ସଥିନ ତାରା ମାନବ ଇତିହାସେର ପୌରବମ୍ୟ ଶିଖରେ ଆରୋହନ କରେଛି । କିନ୍ତୁ ତାରପର ବହୁଦିନ ଧରେ ମୁସଲିମଗଣ ବିଜ୍ଞାନଚର୍ଚା ଥେକେ ଦୂରେ ରଯେଛେ ଏବଂ ଆହ୍ଲାହ୍ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ନିଯିରେ

চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়েছে। এভাবে, উপসংহারে মনুষ্য করা যায় না, তিনি আয়াতের তৎপর মুসলমানদের পক্ষে ওধূমাত্র তর্ফে পূর্ণরূপ উপসংহার করা সম্ভব হবে যখন তারা নিজেদেরকে জোরালোভাবে বৈজ্ঞানিক কর্ম ওৎপন্ন করে নিয়ে দেওয়া করবে এবং আল্লাহর সৃষ্টির গোপন রহস্য উন্মোচন করতে চেষ্টা করবেন। উপনি, একমাত্র তখনই তারা আল্লাহর নিকট মাথা নত করে নদাতে পারবেন। 'তে প্রতি, তুমি এসব কিছু উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করনি' (আয়াত ৩৩: ১৯১)।

—**اللَّهُ أَكْبَرُ الْفَوْزُ بِكُوْرِ الْذِي خَلَقَهُ مِنْ نَفْسٍ فَأَحْلَى وَخَلَقَ مِنْهَا لَذْجَهَا  
وَبَئْتَ مِنْهَا بِجَلْأَ كَثِيرًا وَشَاءَ—**

৪ : ১      হে মানুষ ! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি নাফস থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার ভূত্তি সৃষ্টি করেছেন তারপর এই উভয় থেকে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীগোষ্ঠী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন .....।

এই আয়াতে আল্লাহতা'আলা মানব সৃষ্টির প্রাপ্তিক পটনারলি প্রকল্প করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে একটি নাফস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং গোটা মানবজাতি এই নাফস থেকে সৃষ্টি একই বশে।

এখানে নাফস শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অভিধানিক অর্থ আস্তা, মানুষ বা প্রাণী সত্ত্ব। তবে সাধারণভাবে এখানে নাফস বলতে প্রথম মানব হ্যারত আদম (আ)-কে বুঝায় বলে ধারণা করা হয়। পরে একই নাকলি বা হ্যারত আদম (আ) থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন। হ্যারত আদম (আ) থেকে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি সাধারণভাবে আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। যদি আদম ও হাওয়াকে একই উৎস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধরা হয় তাহলে বিবর্যটা অনেকটা বেঁধেন্ম হয়ে যায়। বাইবেলে হ্যারত আদম (আ)-এর পাঞ্জরের হাত থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন বলা হয়েছে যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রথম নর ও নারীকে একই উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে গোটা মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে ধরা হলে কোনই অসুবিধা নেই এবং কুরআনের আয়াতে এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পাচ্ছে।

সমগ্র মানবজাতি যে একই নর ও নারী থেকে উৎপন্ন এই কুরআনী ধরণ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্ভব। জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতি, বশে ও কর্ম হওয়া সত্ত্বেও মানব জাতি একটি প্রজাতি (species) যার নাম দেওয়া হয়েছে হোমোসেপিয়েন্স (homo-sapiens)। এনাটমি, ফিজিলোজি, বায়োকেমিস্ট্রি

হেমাটোলজি, জেনেটিকস্ ও ভ্রগ তত্ত্ব ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে তথা বিজ্ঞানে সভ্য জাতি  
এবং অসভ্য বনবাসী মানুষ একই প্রকার। তাই যদিও জ্ঞানি নর ও নৌকীর সৃষ্টি  
আজও বিজ্ঞানীদের নিকট রহস্যময় তবুও সকল মানুষ একই একই মাতা-পিতা-র  
বংশধর তাতে কোন সন্দেহ নাই।

একই নাফস থেকে আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি আমরা বৃক্ষ নাফস তবে বাদ  
হয়েরত আদম (আ) প্রথম নাফস হন তবে তার শরীর থেকে তার স্ত্রী বিবি  
হাওয়ার সৃষ্টি বোধগম্য নয়। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি সাপেক্ষে ভবিষ্যতে হয়তো এ  
বিষয়ে আরো আলোকপাত সম্ভব হতে পারে।

শুধু মা থেকে হয়েরত ঈসা (আ)-এর জন্মের মত আদম (আ)-এর শরীর  
থেকে বিবি হাওয়ার সৃষ্টির একটি সভাবনা ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য তুলে রাখা  
যায়। আমরা জানি অনেক সময় কোন মানব শিশুর শরীরে তার যমজ (twin)  
ভাই বা বোন টিউমার আকারে (যেমন টেরাটোমা) থেকে যেতে পারে। যেসব  
টিউমারে হাড়, মাংস ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায় কিন্তু তাতে আজ  
পর্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু পাওয়া যায়নি। পার্থেনোজেনেসিসের মত  
একটিবার সৃষ্টিকর্তা কি আদম (আ)-এর শরীরে বিবি হাওয়াকে টেরাটোমা  
আকারে সৃষ্টি করে শরীরের কোন অংশে রেখে দিয়ে পরে তা কেটে বিবি হাওয়ার  
জন্ম দিয়েছেন কিনা আল্লাহই জানেন। কিন্তু এ কল্পনা যথেষ্ট নয়। কারণ নবজাত  
শিশু হাওয়াকে লালন পালন কে করল? যা হোক এ কথাই উত্তম যে আমাদের  
বর্তমান জ্ঞানে হয়েরত আদমের (আ) শরীর থেকে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি বোধগম্য  
নয়। দু'জনই একই প্রকার জিনস্ ও উৎস থেকে সৃষ্টি ধরলে বুঝতে কষ্ট হয় না।

.....  
حُمِرَتْ عَلَيْكُمْ أَعْنَقُكُمْ وَبَشْكُورْ وَأَغْوِيَكُمْ وَعَنْبَكُورْ وَخَلْتُكُورْ وَبَنْتُ الْأَرْجَفْ  
وَبَنْتُ الْأَخْفَى وَأَقْهَكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُكُمْ وَأَخْوَكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأَهْفَتْ لِسَانَكُورْ  
وَرَبَّبَكُورْ الَّتِي فِي حُجُورِكُورْ مِنْ تَكَبَّلَ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ كَمْ لَوْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَاجِنَالْمَعْلَيْكُورْ وَحَلَّوْلْ أَبْنَانَكُورْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَكُورْ وَأَنْ  
بَسَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَمَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

৪ : ২৩ (বিবাহের জন্য) তোমাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে  
তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, ভগী, ফুফু, খালা, ভাইঝি,  
ভাঝী, এবং তোমাদের সেইসব ‘মা’ যারা তোমাদেরকে বুকের

দুধ পান করিয়েছে, আর তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাগণ যারা তোমাদের ঘরে লাগিতে পালিত হয়েছে, সেইসব স্ত্রীর মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু যদি বিবাহ হলেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তবে তাদের সঙ্গে বিবাহে তোমাদের কোন দোষ হবে না। আর তোমাদের উরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং একই সঙ্গে দুই বোনকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বে (এই আয়াত নাজিলের পূর্বে) যা হয়ে গেছে তা ছাড়। বস্তুত আল্লাহ স্ফীরশীল দয়ালু।

**নিষিদ্ধ বিবাহ :** মানব জাতির শুরুতে যখন তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় আবদ্ধ ছিল তখন নিজেদের রক্ত সম্পর্কীয়দের মধ্যেই বিবাহের প্রচলন ছিল। মানুষ বিভিন্ন সংবন্ধ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আরো উন্নত হওয়ার পর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ বন্ধনের প্রচলন হয় যদিও কোন কোন গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু রয়ে যায়। উপরের আয়াতে নির্দিষ্ট কতকগুলো ঘনিষ্ঠ আজীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এখানে মা, বোন, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগ্নী-ই শুধু নয় বরং রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও কিছু ঘনিষ্ঠ আজীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ করা হয় যার প্রধান কারণ নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন। এ ব্যাপারে আমাদের আলোচনা নিষ্পুরোজন। তবে ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কিত আজীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ হওয়ার বৈজ্ঞানিক যুক্তি এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যে কোন জনগোষ্ঠীতে মাঝে মাঝে ক্ষতিকর মিউটেশন (mutation) দেখা দেয়। 'জিনে'র (gene) এই বিবর্তন অনেক সময় সূত্র (recessive) থাকে তাই সহজে প্রকাশ পায় না। অনেক সময় এ সব সূত্র পরিবর্তন পরবর্তী প্রজননে হঠাৎ করে দূর হয়ে যায়। কিন্তু একই বৎশে বিবাহের ফলে একইরূপ সূত্র জিন বিবর্তনের মিলন হলে এই সমস্ত ক্ষতিকর প্রভাব বংশধরদের মধ্যে দেখা যায় যাকে বংশানুকরণিক বিষয়ন্তা (depression) বলা যায়। যত ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে তত বেশী এই বংশানুকরণিক দোষযুক্ত সন্তান জন্ম লাভ করার আশঙ্কা থাকবে।<sup>১</sup>

ইউরোপের কোন কোন রাজ পরিবারে নিজ বৎশে বিবাহ করার নীতি চালু থাকার ফলে, মানসিক দুর্বলতা, হিমোফিলিয়া এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি জাতীয় রোগ বংশানুকরণে দেখা যেতো।<sup>২</sup>

অপরপক্ষে রক্ত সম্পর্কহীন পিতা মাতার সত্তানদের মধ্যে উন্নত প্রজন্মের প্রমাণ রয়েছে। এসব উন্নতির মধ্যে আকার, মানসিক উৎকর্ষতা, শারীরিক বৃদ্ধির হার, প্রজনন ক্ষমতা, ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সভ্য জগতে কুরআনে বর্ণিত ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া মানব জাতির উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করবে।

### তথ্যসূত্র :

1. Gale, J. S. Population Genetics. Blackie and Sons Ltd. Glasgow, p. 32, 1980.
2. Rechardson, W. N. and Stubbs, T. H. Evolution, Human Ecology and Society, Mcmillan Publishing Co. Inc. New York, 1976.

٣٣- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الْمَصْلُوَةَ وَإِنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ  
وَلَا جُنُبًا لَا عَابِرُ سَيِّئِ الْحَاجَةِ تَفْسِلُوا

৪ : ৪৩ হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! নেশাথস্ত অবস্থায় নামায়ের কাছেও যেও না যে পর্যন্ত না তোমরা কী বলছ তা সঠিকভাবে জানতে পার। অনুরূপভাবে শারীরিক অপবিত্র অবস্থাতেও নামায়ের কাছে যাবে না যতক্ষণ না গোসল করে নেবে.....।

এখানে আল্লাহ নেশাথস্ত বা মাতাল অবস্থায় যখন সে কী বলে তা জানতে পারে না, নামায না পড়তে বা মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। ইসলামে নামাজ বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং এ সময় নামাযী কুরআনের যে সব আয়াত ও দোয়া পাঠ করবে তা বুঝে শুনে পাঠ করবে এটাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যদি কেউ নেশাথস্ত বা মাতাল হয় তখন সে কী বলে তা সে জানে না এবং এতে তার বুবাবার বিচার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

এই নিষেধাজ্ঞা মদ নিষিদ্ধ হওয়ার কর্মসূচির অংশ ছিল যা দ্বারা মানুষকে মদপান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। মদ হারাম করার পূর্ণ পদ্ধতি সূরা ২ : ২১৯ আয়াতের আলোচনার সময় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

- حَزَمْتُ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَةَ وَالَّذِمْ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخِنَقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالثَّطِينَةُ وَمَا كَانَ السَّبُعُ لِأَمْاَكِنَهُمْ وَمَا  
ذُبْحَ عَلَى النُّصُبِ وَمَا نَسْقَيْتُمُوا بِالرَّازِمَةِ ذِلِّكُ فَسْقٌ

৫ : ৪ . তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত জন্ম, রক্ত, শূকরেঃ, মাংস, সেই সব জন্ম যা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে যবেহ করা হয়েছে, যে সব প্রাণী গলায় ফাঁস পরে, আঘাত পেয়ে বা উপর হতে পড়ে গিয়ে অথবা শিংয়ের আঘাতে মরে গিয়েছে এবং কোন হিস্ত প্রাণী যার অংশ বিশেষ খেয়ে ফেলেছে তবে যদি তাকে জীবিত পেয়ে জবাই করা হয় তবে হারাম নয়। এবং যে প্রাণীকে কোন বেদিতে বলি দেওয়া হয়েছে (তাও হারাম) এবং হারাম করা হয়েছে লটারির তীর মেরে ভাগ করা গোশত্। এ সবই ফাসেকী ।...

ଏই ଆୟାତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେର ଗୋଶ୍ତ ହାରାମ ଘୋଷିତ ହେଯେଛେ ଯା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୂକର ମାଂସ ସମ୍ପର୍କେ ୨ : ୧୭୩ ଆୟାତେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଯେଛେ । ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଲୋ ସମ୍ପର୍କେ ନିଚେ ଆଲୋଚନା କରା ହଲ :

ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାରୋ ନାମେ ନିହତ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଶ୍ତ ହାରାମ । ଏର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହଲୋ- ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରା ଯେ ଯେହେତୁ ସବ କିଛୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଲ୍ଲାହ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଗୁଲୋଓ ଆଲ୍ଲାହର ତାଇ ଏହିସବ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରାର ଅଧିକାର ଅବଶ୍ୟ କାରୋ ନେଇ । ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିଜେ ହଲାଲ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବାଇ କରେ (ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ) ତାର ଗୋଶ୍ତ ଖେତେ ଅନୁମତି ଦିଯେଛେନ ତାଇ ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ଜୀବାଇ କରା ପ୍ରାଣୀର ଗୋଶ୍ତ ହଲାଲ । କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠିତ ଦେବ-ଦେବୀ ବା ପୌର ଦରବେଶଦେର ପ୍ରାଣୀର ଉପର କୋନ ଅଧିକାର ନେଇ ତାଇ ତାଦେର ନାମେ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରା ଜୁଲୁମେର ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ପଡ଼େ, ତାଇ ହାରାମ କରା ହେଯେଛେ ।

ଗଲାଯ ଫାସ ଲେଗେ ନିହତ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଶ୍ତ ହାରାମ । ଗଲା ଟିପେ ବା ଶ୍ଵାସ ରୋଧ କରେ ହତ୍ୟା କରାଓ ଏକଇ କଥା । ଏର ଫଳେ ପ୍ରବାହିତ ରଙ୍ଗ ବେର ହତେ ପାରେ ନା । ଏଇ ରଙ୍ଗ ବେର ହତ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କେ ୨ : ୧୭୩ ଆୟାତେ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଯେଛେ । ଶ୍ଵାସରୂପକ କରେ ହତ୍ୟା କରଲେ, ଅତିରିକ୍ତ  $CO_2$  ଗ୍ୟାସ ରଙ୍ଗେ ଜମା ହେଁ କ୍ଷତିକର ରାସାୟନିକ ବନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏ ଛାଡ଼ା ଜୀବାଇ ନା କରାର ଫଳେ ପ୍ରବାହିତ ରଙ୍ଗେର କ୍ଷତିକର ଯୌଗିକମୟୁହ (compounds) ଏବଂ ରୋଗ-ଜୀବାଣୁ ଥାକଲେ ତାଓ ବେର ହତେ ପାରେ ନା । ସୁତରାଂ ଶ୍ଵାସରୂପକ କରେ ନିହତ ପ୍ରାଣୀ ବା ପାଖୀର ଗୋଶ୍ତେ କ୍ଷତିକର ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରୋଗ-ଜୀବାଣୁମୟୁହ ଥାକେ ବଲେ ଉତ୍ସମ ବା ଉନ୍ନତ ମାନେର ଗୋଶ୍ତ ପାଓୟା ଯାଯ ନା । ଏରପାଇସ ବେଶୀ ଦିନ କ୍ରିଜେ ରାଖାଓ ନିରାପଦ ନଯ ।<sup>1</sup> ହତ୍ୟାର ପର ଗଲା କେଟେ ଦିଲେଓ ସକଳ ପ୍ରବାହିତ ରଙ୍ଗ ଆର ବେର କରା ସମ୍ଭବ ହୟ ନା ।

ପିଟିଯେ ବା ମାରାଅକ ଆୟାତେ ନିହତ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଶ୍ତ-

ଏଟା ଏକଟା ନିଷ୍ଠର ପଦ୍ଧତି ଯେମନ ଲାଠି ଦିଯେ ପିଟିଯେ, ମୁଗ୍ର ବା କୁଡ଼ାଲ ଦିଯେ ଆୟାତ କରେ, ବୁଲେଟ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକ୍ ଦିଯେ ହତ୍ୟା କରା ସବହି ଅତି ଅମାନବିକ । ତାଛାଡ଼ା ଜୀବାଇ ନା କରେ କଠିନ ଆୟାତେ ନିହତ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରବାହିତ ରଙ୍ଗ ବେର ହୟ ନା ବଲେ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଥେକେଇ ଯାଯ, କାରଣ ପ୍ରବାହିତ ରଙ୍ଗ ବେର କରତେ ହଲେ, ମନ୍ତିକେ ଅକ୍ରିଜେନେର ଅଭାବ, ହଂପିଗେର କମ୍ପନ ସ୍ଵାଭାବିକ ଏବଂ ଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ କ୍ରିୟାଓ ଚାଲୁ ଥାକତେ ହବେ । ଗଲାକଟା (ଜୀବାଇ କରା) ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ କୁଞ୍ଚନ ହତେ ଥାକେ । କାରଣ ମନ୍ତିକ ଅକ୍ରିଜେନ ଚାଯ ବଲେ ମାଂସ କୁଞ୍ଚିତ ହୟ ଅକ୍ରିଜେନ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ପାଠାତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଏହିସବ କୁଞ୍ଚନେର ଫଳେ ଶରୀରେର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେର ରଙ୍ଗ ଶିରା ଥେକେ ବେର କରା ସମ୍ଭବ ହୟ ଯା ପ୍ରବାହିତ ରଙ୍ଗେ ମିଶେ ହଂପିଗେ ଯାଯ ଏବଂ ସେଥାନ ଥେକେ ମନ୍ତିକେ ପାଠାତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ । କିନ୍ତୁ ଗଲାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରଙ୍ଗବାହୀ ଧରନି କେଟେ ଯାଓ୍ୟାର ଫଳେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଆର ମନ୍ତିକେ ପୌଛାଯ ନା । ମାଂସ କୁଞ୍ଚନ (convulsions) ହଲେଇ ବୁଝା

যাবে যে প্রাণী বেহশ হয়ে গেছে।<sup>১</sup> যেহেতু জবাইর ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় বলে প্রাণী সঙ্গে সঙ্গে বেহশ হয়ে যায়। তাই জবাই করা প্রাণী রক্ত ক্ষরণে কোন ব্যথা অনুভব করে না। এই মাংস কুঝন (convulsions) উন্নতমানের গোশ্ত সরবরাহে সাহায্য করে। কিন্তু তাতে গোশ্ত ব্যবসায়ীদের জন্য ক্ষতিকর। কারণ কসাইখানায় এই কুঝন বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কসাইদের অপেক্ষা করতে হবে এবং প্রাণী সম্পূর্ণ স্থির হলে তার চামড়া ছাড়ানো শুরু করা যাবে। এইটুকু সময় বাঁচাবার জন্য লোভী মাংস ব্যবসায়ীরা জবাই করার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডের ভিতরের প্রধান ন্যায়.... spinal cord-কে ছুরি ঢুকিয়ে কেটে দেয় যার ফলে মাংস কুঝন হয় না এবং সব প্রবাহিত রক্ত বের হয় না।<sup>২</sup> এরপ্রভাবে জবাই করা আর বলি দেওয়া একই কথা যা ইসলাম হারাম করেছে এবং স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী গোশ্ত নিম্নমানের হয়।

সুতরাং, মুসলমানদের জবাইয়ে প্রাণীর মাংস কুঝন হতে দেওয়া হয় যাতে সব প্রবাহিত রক্ত বের হয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-র স্পষ্ট নির্দেশ এই যে জবাই করার পর প্রাণী সম্পূর্ণরূপে স্থির না হওয়া পর্যন্ত যেন চামড়া ছাড়াতে শুরু না করে।

মুগ্র বা হাতুড়ি দিয়ে হত্যা করলেও একই অবস্থা হয় অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত বের হবে না। আধুনিক ইলেকট্রিক শকে প্রাণী হত্যার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কৃষি বিভাগের মাংস পর্যবেক্ষণ বিভাগ (Meat inspection branch) ১৯৫৩ সালে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :-

“ফেডারেল মাংস পরীক্ষকদের অধীনে ইলেকট্রিক শকে হত্যা করার পদ্ধতি বহু বছর পূর্বে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ফলে অনুমোদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এসব গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, ইলেকট্রিক শকে নিহত শূকর মাংসে গ্রীষ্মন সব পরিবর্তন দেখা যায় যা কোন কোন রোগের প্রভাব থেকে আলাদা করা সম্ভব হয় না।<sup>৩</sup>

১৯৫৫ সালে ডেনমার্কের বিচার বিভাগের একটি সার্কুলারে বলা হয়েছে, ইলেকট্রিক শক দিলে মাংসে রক্তক্ষরণ হয়, পরিপাকতন্ত্রে রক্তপাত হয়, মেরুদণ্ড ও কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যায়। মাংসের মধ্যে অতিরিক্ত রক্ত মাংসকে সহজে পচনশীল করে এবং স্বাদ নষ্ট করে দেয়। এ সমস্ত ইলেকট্রিক শক প্রাণীর বেলায় মাংসের অতিরিক্ত রক্ত বের করার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়।<sup>৪</sup>

১৯৫৮ সালে বৃটিশ সরকার আইন করে ইলেকট্রিক শকে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এর ফলে বৃটিশের বেকন (শূকর মাংস) ব্যবসা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।<sup>৫</sup> এছাড়া ইলেকট্রিক ‘শক’ মাংসে সহজে

ପଚନ ଧରତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏବଂ କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକେ ମାଂସେ ଲେକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଏବଂ ପରିମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଯ ଏବଂ ଏବଂ ଫଳେ ମାଂସେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସହଜେ ଥାନ କରେ ନିତେ ପାରେ । ୩

ଯଦି ଏକ ଆଘାତେ ମୁଠକ ଆଲାଦା କରା ହୁଏ (ଯେମନ ହିନ୍ଦୁଦେର ପଣ ବଲି ଦେଓଯାର ପନ୍ଦତି) ତାତେ ହଠାତ୍ କରେ ବୈଛାଧୀନ ମାଂସେ ତୌରେ କୁର୍ବନ ହୁଏ ଏବଂ ମାଂସ ଥିକେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜନୀୟ ପୁଣି ବେର ହେଁ ଯାଏ, ଆର ଲେକ୍ଟିକ ଏସିଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଯ । ବଲି ଦିଲେ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣୀର ହର୍ଷପିଣ୍ଡ ଓ ଫୁସଫୁସ ଥିମେ ଯାଏ ତାଇ ଦୂଷିତ ବସ୍ତୁମହ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରତ୍ଯରୁଷ ରକ୍ତ ବେର ହତେ ପାରେ ନା ବଲେ ମାଂସ ନିଷ୍ପମାନେ ହୁଏ । ଆର ଶରିଯତେର ଦୃଷ୍ଟିତେଓ ତା ନିଷିଦ୍ଧ ହେଁ ଯାଏ ।

**ସୁତରାଂ** ସବୁ ରକମ କଠିନ ଆଘାତେ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା ନିଷିଦ୍ଧକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରପେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ।

ଯଦି କୋନ ପ୍ରାଣୀ କୋନ ଏକଟି ଉଚ୍ଚତା ଥିକେ ପଡ଼େ ଗିଯେ ମରେ ଯାଏ ତବେ ତା ଘଟେ ଆଘାତ ପେଯେ, ଘାଡ଼ ଭେଙେ (ଶିରଦାଡ଼ା) ଗିଯେ, ବେହଶ ହେଁ ଗିଯେ ଆର ଯଦି ପାନିତେ ପଡ଼େ ଯାଏ, ତବେ ଡୁବେ ମାରା ଯାବେ । ଏକଥିମ୍ଭୁତ୍ୟ କଠିନ ଆଘାତେ ମୃତ୍ୟୁର ମତ ହେଁ, ଆର ଡୁବେ ଗେଲେ ଶ୍ଵାସରୁଦ୍ଧ ହେଁ ମାରା ଯାବେ, ଯା ଇସଲାମେ ନିଷିଦ୍ଧ ।

ଯଦି ଦୁଟି ପ୍ରାଣୀ ଲଡ଼ାଇ କରେ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଅଥବା ମାନୁଷ ଇଚ୍ଛେ କରେ ଯଦି ଲଡ଼ାଇ ଲାଗିଯେ ଦେଯ ଏବଂ ଏବଂ ଫଳେ ଏକଟିର ଆଘାତେ ଅନ୍ୟଟି ମାରା ଯାଏ ତାହଲେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଶ୍ତ୍ଵ ହାରାମ । ଏଭାବେ କୋନ ପ୍ରାଣୀକେ ନିଷ୍ଠାରଭାବେ ହତ୍ୟା କରା ହଲେ ଏବଂ ଗୋଶ୍ତ ପୂର୍ବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ କଠିନ ଆଘାତେ ନିହତ ବଲେ ହାରାମ ଗୋଶ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ହେଁ ।

ଯଦି କୋନ ହିଂସା ପ୍ରାଣୀ କାମଡ଼ ଦିଯେ କୋନ ପ୍ରାଣୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲେ ଫେଲେ ଏବଂ ଏବଂ ଫଳେ ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତବେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଶ୍ତ୍ଵ ହାରାମ । ତିନଟି କାରଣେ ଏଟା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ :

(୧) ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରାଣୀର କୋନ ବିଷକ୍ରିୟାଯ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାରା ଯେତେ ପାରେ,

(୨) ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବାଚବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଯ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମେର ଫଳେ ତାର ମାଂସେ ପ୍ରତ୍ୟର ଲେକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଜମା ହତେ ପାରେ; ଏବଂ

(୩) ଜ୍ବାଇ ନା କରାଯ ତାର ଶରୀର ଥିକେ ସକଳ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ବେର ହତେ ପାରେ ନା ।

କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବେଂଚେ ଯାଏ, ତାହଲେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀକେ ଜ୍ବାଇ କରେ ତାର ଗୋଶ୍ତ ଖାଓଯା ହାଲାଲ । ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣୀଟି ତଥନ ଓ ଜୀବିତ- ତାତେ ବୁଝା ଯାଏ ଯେ ଆଘାତଟି ଖୁବ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟେଛେ । ତା ଛାଡ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀଟି ଖାଦ୍ୟଭାବେ ମରେ

যাবে অথবা অন্য কোন হিংস্র প্রাণী তাকে হত্যা করবে। একপ অবস্থায় সেই আহত প্রাণীকে জবাই করে তার গোশ্ত খাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

এবার মুসলমানদের জবাই পদ্ধতি যা অবিকল ইয়াহুদিদের জবাই পদ্ধতির অনুরূপ- চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করা যাক। ইয়াহুদিদের পণ্ডি জবাই পদ্ধতিকে ‘সেচিতা’ বলা হয়।

ডাঃ লর্ড হোর্ডার এম ডি বলেন, ‘আমি যত্ন সহকারে ‘সেচিতা’র নিয়মগুলি লক্ষ্য করে দেখেছি যে এতে খুব সহজে এবং অল্প সময়ে পরিচ্ছন্নভাবে পণ্ডৰ গলার সকল রক্তবাহী ধর্মনী ও শিরা, শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীসহ সকল নরম বস্তুকে কেটে দেওয়া হয়। এর ফলে পণ্ডৰ সঙ্গে সঙ্গে বেহশ হয়ে যায়। এর চেয়ে ব্যথামুক্ত এবং স্বল্প সময়ে মৃত্যু সম্ভব নয়। জবাইর পর কয়েক সেকেন্ড প্রাণীটি কোন নড়াচড়া করে না। তারপর তার শরীর কুঞ্চিত হয় যা প্রায় এক মিনিট স্থায়ী হয় এবং তারপর থেমে যায়।<sup>18</sup>

এই বিশৃঙ্খলির ব্যাখ্যা খুবই স্পষ্ট। খুব ধারাল ছুরি দিয়ে খুব অল্পসময়ে গলার সমস্ত রক্তবাহী শিরা ও ধর্মনি কেটে দেওয়ার ফলে, তৃরিং প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে রক্তের চাপ খুব কমে যায় এবং প্রাণী সম্পূর্ণভাবে বেহশ (syncope) হয়ে পড়ে। জবাইর অল্পক্ষণ পর প্রাণীটি যে প্রায় ৯০ সেকেন্ড পর্যন্ত প্রবলবেগে নড়াচড়া করে তা ‘পিলেপটিকদের’ মত (অজ্ঞান অবস্থায়) যার কারণ মস্তিষ্কের রক্ত শূন্যতা (cerebral ischemia with complete anoxaemia)।

প্রাথমিক বেহশ অবস্থাতেই প্রাণীটি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় এবং কোন ব্যথা অনুভব করে না। জবাইর পদ্ধতি ও তার প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝা যায় যে, জবাই ছাড়া বর্তমানে প্রচলিত আর কোন উপায়ে হত্যার চেয়ে কম ব্যথা দিয়ে প্রাণী হত্যা সম্ভব নয়।

ডাঃ লিওনার্ড হিল এম ডি, এফ আর এস, পরিচালক ফলিত শারীর বিজ্ঞান বিভাগ (Applied physiology), ন্যাশনাল ইনসিটিউট অব মেডিসিনেল রিসার্চ, ইউকে, বলেন, ‘জবাইর পর প্রাণীর বেহশ অবস্থায় প্রবল কুঞ্চন ও নড়াচড়ার তুল অর্থ করা হয়ে থাকে। অজ্ঞানের নিকট যে কোনৱে নড়াচড়া বিশেষ করে যেসব উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হয়, সবই ব্যথার প্রতিফল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অথচ আমরা জানি যে গলা থেকে মাথা কেটে পৃথক করে ফেলার পরও প্রাণীদেহে এ ধরনের নড়াচড়া করে থাকে যদিও প্রাণীটি তখন মৃত। জবাইর পর গলার কেরোটিড ধর্মনী বিত্তক হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্ত সংক্রান্ত বক্ষ হয়ে যায় তা আমি কোনৱে অজ্ঞান না করে বাহুর ও ছাগলের জবাইও পরীক্ষা করে দেখেছি। উভয় ক্ষেত্রে ‘কেরোটিড’ ধর্মনী কেটে দেওয়ার

ফলে ମଣ୍ଡିକ ସଂଲଗ୍ନ କେରୋଟିଡ-ଏର ରଙ୍ଗଚାପ ଜବାଇର ଦୁ-ଏକ ସେକେନ୍ଡେର ମଧ୍ୟେଇ ଆୟ ଶୂନ୍ୟ ହସେ ଯାଇ ଅର୍ଥାଏ ମଣ୍ଡିକେ ରଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଲନ ବନ୍ଧ ହଲେ କେଉ କେଉ ଧାରଣା କରେନ ଯେ, carotid ଧରନୀଦୟ କର୍ତ୍ତିତ ହଲେଓ vertebral artery (ମେରନ୍ଦତେର ଡିତରକାର ଧରନୀଦୟ) ଦୁଟିର ମାଧ୍ୟମେ ଯଥେଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡିକେ ପ୍ରବେଶ କରେ ପ୍ରାଣୀର ଜାନ ରକ୍ଷାଯ ସାହାଯ୍ୟ କରାତେ ପାରେ କିନା ଏବଂ ତାର ଫଳେ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରା ସମ୍ଭବ କିନା । କିନ୍ତୁ ତାଓ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । ମାନୁଷ ଏବଂ ଶୂକର ଓ ଘୋଡ଼ା-ଗାଧାର ମତ ଗରୁ, ଭେଡ଼ା, ଛାଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ତୃଣଭୋଜୀ (ruminant) ହାଲାଲ ପ୍ରାଣୀର vertebral arteries ମଣ୍ଡିକେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା, ଏରା ମାଥାର ମାଂସେ ରଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଲନ କରେ ।<sup>୫</sup> ଏ ଛାଡ଼ା ଏ ସମ୍ମତ ଜବାଇକୃତ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସେ ବା ଅନ୍ତେ କୋନ ରୂପ ରଙ୍ଗପାତ ବା ଜଖମେର (bruise) ଚିହ୍ନା ପାଓଯା ଯାଇ ନା ।<sup>୬</sup> ସୁତରାଂ ମୁସଲିମ ଓ ଇଯାହୁଦିଦେର ଜବାଇ ପଦ୍ଧତି ସବଚେଯେ ମାନବୀୟ (humane) ଏବଂ ସବଚେଯେ କମ ବ୍ୟଥାଯ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା ବଲେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. Muzzam, M. G. Gurane Biggan (Science in Quran), (in Bengali), 1st edn. Rajshahi, pp 81-84, 1967.
2. Khan, G. M. Al-Dhabeh, Slaying Animals for Food in the Islamic Way, 1st edn, Ta Ha Publishers, London, p. 33. 1982.
3. Callow, E. H. Food Hygiene, Cambridge, p. 42, 1952.
4. Horder, Lord, Statement in Support of Jewish Method of Slaying Animals, 1950.
5. Hill, Leonard, Statement of Director, Dept. of Applied Physiology, NIMR, UK quoted by Khan, G. M. 1982.

لَا يَأْتِي الَّذِينَ أَنْتُمْ لَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُغَلِّبُونَهُمْ وَأَنْدَلَكُمْ إِلَى التَّرَافِقِ  
وَأَهْمَكُمْ بِهِ رُؤْسَكُمْ وَأَنْجِلَكُمْ إِلَى الْكَبَّنِ

৫ : ৬ হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো : যখন তোমরা নামায়ের জন্য উঠ তখন তোমাদের মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত কর এবং মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা দুটিও (ধৌত কর)।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য অস ধৌত করা ঈমানদারদের জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অযু বা গোসলের জন্য ব্যবহৃত পানিও পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ হতে হবে যার স্বাদ, গন্ধ এবং রং অবিকৃত থাকবে। উপরের আয়তে অযুর চারটি ফরজের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর সব কয়টিই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত। এ ছাড়া অযুতে কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া, কুলি করা, দাঁত মিসওয়াক করা, কান ও নাকের বহির্ভাগ পরিষ্কার করাকে মহানবী (সা) তাঁর সুন্নাত হিসেবে অনুসরণ করতে বলেছেন।

১। মুখমণ্ডল ধৌত করা : সব ঝুঁতেই মুখ ধোয়ার অভ্যাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং শরীর ও মনের সতেজতা (ক্লান্তি হরণ) আনয়নকারী। মুখমণ্ডল ও দুই হাত শরীরের সবচেয়ে বেশী আবরণ মুক্ত অংশ। তাই এগুলোতে সহজেই ধূলা-বালি ও রোগ জীবাণু লাগতে পারে। আর মানুষের তৃকে বিশেষ করে লোমকুপের গোড়ায় এবং ঘর্মগ্রস্তির মুখে স্ট্যাপলিলোকক্কাই, ট্রেপটোকক্কাই, কলিফর্ম ইত্যাদি ক্ষতিকর রোগ জীবাণু থাকতে পারে। হাতের আঙুলের ডগার মাধ্যমে বিশেষ করে চুলকানোর পর আঙুল, নাক, কানসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে এসব জীবাণু বিস্তার লাভ করে। এ ছাড়া অপরিষ্কার হাত খাদ্য ও পানীয়কেও জীবাণুযুক্ত করতে পারে। তবে সুস্থ তৃক এ সমস্ত জীবাণুর জন্য এক স্বাভাবিক প্রতিরোধক। কিন্তু তৃকে সামান্যতম ক্ষত হলে তার মাধ্যমে এসব জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে এবং এর ফলে পাঁচড়া, ফোঁড়া, কারবাঁকল, সেগুলাইটিস, সেপটিকেলিয়া, পায়োমিয়া ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

সুতরাং, প্রথমে হাত ধূয়ে পরে মুখমণ্ডল ধৌত করলে এসব রোগ থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। এ ছাড়া এ সঙ্গে চোখের ড্র-যুগল, চোখের পাতা,

ଗୋଫ, ଦାଢ଼ି, ଯା ସହଜେଇ ମୟଳାୟୁକ୍ତ ହତେ ପାରେ ତାଓ ହାତ ମୁଖ ଧୋଯାର ମାଧ୍ୟମେ ପରିଷାର ହୟେ ଯାଏ । ମୁଖମନ୍ତଳ ଅପରିଷାର ଥାକଲେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସହଜେଇ ମୁଖେ ପ୍ରବେଶ କରତେ ପାରେ । ମୁଖମନ୍ତଳେର ଘାୟ, ମୟଳା ଓ ଜୀବାଣୁ ତୁକେର ସଙ୍ଗେ ସେଂଟେ ଥାକତେ ସାହାୟ କରେ । ଏ ବିଷୟେ କୋନ ସନ୍ଦେହ ନେଇ ଯେ ନାମାଯେର ପୂର୍ବେ ଅୟୁର ମାଧ୍ୟମେ ହାତ ଓ ମୁଖମନ୍ତଳ ଧୋତ କରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ଭବ ।

ଯଦି କେଉ ଦିନେ ପାଁଚ ବାର ଅୟୁ କରେ ତବେ ତାର ହାତ ଓ ମୁଖମନ୍ତଳେର ମାଧ୍ୟମେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣେର ସଜ୍ଜବନା ଖୁବ କମ ଥାକେ ।

(୨) ଦୁଇ ହାତ କନ୍ତୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଯା : ବାଭାବିକ କାଜ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଶରୀରେର ଏହି ଅଂଶଟକୁ ପ୍ରାୟଇ ଖୋଲା ଥାକେ ଯାର ଫଳେ ଏ ଅଂଶେ ମୟଳା ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଲାଗତେ ପାରେ । ସୁତରାଂ, ଅୟୁର ସମୟ ଦୁଇ ହାତ କନ୍ତୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଯା ଓ (ଫରଜ) ବାସ୍ତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ।

(୩) ମାଥା ମାସେହ କରା : ଡିଜା ହାତେ ମାଥା ମାସେହ କରତେ ହୟ । ଆର ମାଥା ଓ ଚଳୁ ଅନେକ ସମୟ ଉନ୍ମୂଳ୍କ ଥାକେ ଯାର ଫଳେ ଚଳେର ମଧ୍ୟେ ମୟଳା ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଜମା ହତେ ପାରେ । ସୁତରାଂ ଡିଜା ହାତେ ମାଥା ମାସେହ କରଲେ ସେ ସବ ଦୂର କରା ସମ୍ଭବ । ତାଇ ଏଟାଓ ବାସ୍ତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ । ମାସେହ ଫରଜ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ଡିଜା ହାତେର ପେଛନ ଦିଯେ ଘାଡ଼ ମୁହଁ ନେଇଯାଓ ନବୀଜୀର ସୁନ୍ନାତ । ଏ ଛାଡ଼ା ଘୁମ ଥେକେ ଉଠେ ବା କର୍ମକାଳୀନ ହଲେ ଡିଜା ହାତେ ଘାଡ଼ ମାସେହ କରଲେ ମୁଖମନ୍ତଳ ବେଶ ସତେଜ ଲାଗେ ।

(୪) ଟାଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ପା ଧୋତ କରା : ଦୁଇ ପା ସବଚୟେ ବେଶୀ ଖୋଲା ଥାକେ ବିଶେଷ କରେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନ ଦେଖେ । ଏର ଫଳେ ଏହି ଅଂଶ ଖୁବ ମୟଳା ଓ ଜୀବାଣୁଯୁକ୍ତ ହତେ ପାରେ । ପରିଷାର ପରିଚନ୍ତା ପା ଥାକଲେ ଜାମାଯାତେ ନାମାଜ ପଡ଼ାର ସମୟ ମୟଳା ବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଛଡ଼ାତେ ପାରେ ନା । ସୁତରାଂ ଅୟୁର ସମୟ ପା ଧୋଇଯାଓ ବାସ୍ତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ।

ଖୁବ ବେଶୀ ଶୀତ ପଡ଼ିଲେ ବାର ବାର ଅୟୁ କରତେ ଗିଯେ ପା ଧୁତେ ହୟ । ଏଟା କଟକର ବଲେ ନବୀଜୀ (ସା) ଦିନେ ଏକବାର ଅୟୁ କରେ ଚାମଡ଼ାର ମୋଜା ପରେ ନିଯେ ୨୪ ଘଟାର ମଧ୍ୟେ ଅୟୁର ସମୟ ମୋଜାର ଉପର ମାସେହ କରାର ଅନୁମତି ଦିଯାଇଛନ । ଏତେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପା ଧୋତ କରା ହୟ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧିତ ହୟ ତାଇ ଏଟାଓ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ଭବ ।

ଏଭାବେ ଦେଖା ଯାଏ ଯେ, ଅୟୁର ଚାରଟି ଫରଜ କାଜଇ ବାସ୍ତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ।

۱۰- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَاتَلُوكُنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَلْمَنْ يَكُلُّ  
مِنَ الْأَطْوَافَ إِلَّا دَأْنَ يُكْلُكُ الشَّيْءَ إِبْنُ مَرْيَمَ وَآمِنَةُ دَمَنْ فِي الْأَرْضِ  
جَيْسِعًا وَلِنُوكُلُّكُ التَّمَوِّبِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُلُ مَا يَكُلُّ وَاللَّهُ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৫ : ১৭ নিচয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে : মরিয়ম পুত্র মসিহই আল্লাহ'। (হে মুহাম্মদ) বলে দিন, আল্লাহ যদি মরিয়ম পুত্র মাসিহ এবং তাঁর মা এবং সমগ্র পৃথিবীতে যা আছে সব কিছু ধ্বনি করতে চান তবে তাঁর এই ইচ্ছা হতে তাঁকে বিরত রাখতে সমর্থ এমন কে আছে? আল্লাহ তো আসমান ও যুৰীন এবং তাঁর মধ্যে অবশ্যিক সকল জিনিসেরই মালিক; তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন। এবং আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপরই শক্তি সম্পন্ন।

এখানে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) একজন মানুষ ছিলেন। তাই তাকে স্বয়ং আল্লাহ মনে করা কুফরী, যেমন অনেক কাফেরের জাতি তাদের মানুষরূপী তথাকথিত দেব-দেবতাদেরকে স্বয়ং দৈশ্বর বা ভগবান বলে থাকে। তারা কাউকে আবার ভগবান মানুষ রূপে পৃথিবীতে এসেছেন বলে দাবী করে। এসব দাবী যে মিথ্যা তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ এখানে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে এই মহাবিশ্বের সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। অথচ ঈসা (আ) বা মরিয়মের এই সৃষ্টির উপর কোন কর্তৃত্বই ছিল না। শুধু তাই নয় পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ মানুষের কর্তৃত্বের বাইরে। তাই মানুষ ঈসা (আ) কে আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা (বা তাঁর সন্তান) মনে করা কুফরী, আহাম্মকি ও বেওকুফি মাত্র। এ নেহায়েত অজ্ঞতার প্রমাণ।

আল্লাহ পৃথিবীসহ, সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের সব এলাকা আল্লাহর রাজ্য বলেও ঘোষণা করেছেন।

কারো রাজ্য বলতে বুঝা যায় যে সেই এলাকায় কেবল তাঁরই হকুম ও বিধান চলে। কুরআনের আসমান বলতে সকল মহাকাশ ও তাঁর মধ্যে যা আছে সবই বুঝায়, যেমন তারকানাজি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহসমষ্টি, পালসারস, কৃষ্ণ গহৰ (black-holes), নেবুলা, ছায়াপথসমূহ, কুয়াসারস (quasars) ইত্যাদি

সবগুলোর সমষ্টিকেই বুঝায়। এর কিছু কিছু মানুষ জানতে ও বুঝতে পেরেছে এবং মানুষের অজ্ঞান যে কত কিছু রয়েছে তা মানব কল্পনার বাইরে। এ সমস্ত কিছু একমাত্র তাঁরই দেওয়া নিয়মে চলে যাব উপর মানুষের কিছু মাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং মহাকাশ বা মহাশূন্য শুধুই আল্লাহর রাজ্য।

এমনিভাবে এই গোটা পৃথিবীটা আল্লাহরই রাজ্য। সৃষ্টি জগতের নিয়ম কানুন (laws of nature) যা মানুষ জানতে পেরেছে এবং যা জানতে পারেনি তার সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। পৃথিবীর সাতটি স্তর রয়েছে, যেমন :

(1) inner solid core, (2) outer liquid core, (3) mantle (4) plastic, partially molten region (asthenosphere), (5) cold, rigid region (lithosphere), (6) crust (যার গভীরতা ভূমিতল থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তল থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার), এবং (৭) বাযুস্তর (atmosphere)। এসব স্তরের যাবতীয় জৈব ও অজৈব বস্তু আল্লাহর দেওয়া আইনের অধীন এবং একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং পৃথিবীও একমাত্র আল্লাহরই রাজ্য।

এছাড়া পৃথিবীর বায়ু মণ্ডল (atmosphere) এর উর্ধ্বে রয়েছে পৃথিবীর ionosphere' যা সূর্যের X-ray এবং ultra-violet radiation থেকে সৃষ্টি। আইওনোফিয়ারের উর্ধ্বের এলাকার নাম magnetosphere সেখানে দ্রুত গতিশীল ইলেক্ট্রন ও প্রোটন আটকা পড়ে এবং অভ্যন্তর তাগে এর সীমা ইলেক্ট্রন, প্রোটন, অণু ও পরমাণুর সংঘর্ষে সৃষ্টি বাধা দ্বারা সীমাবদ্ধ। আর এর বহির্ভূতের নাম magnetosphere ওখানে পৃথিবীর চূম্বক শক্তির শেষ সীমা। এ সবই আল্লাহ আইনের অধীন। তাই মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এলাকাও আল্লাহরই রাজ্য।

## ٩٠- يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَنَا الْخَرَقَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَرْكَادَ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ النَّبِيِّنَ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ تُذَكَّرُونَ

৫ : ৯০ হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! (জেনে রাখ) যদি, জুয়া, পাথর ও তীর সবাই নাপাক শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা এসব পরিহার কর যেন তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।

মদ ও জুয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো সূরা বাকারার ২১৯নং আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ ধরনের পাথরে বলি দেওয়াও শয়তানী, আর তীর ছুড়ে গোশ্ত ভাগ করার নিয়ম জাহেলী যুগের এক ধরনের জুয়া হিসেবে প্রচলিত ছিল যা এই আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

## ۱- اَسْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ النُّجُومَ وَالنَّوَافِرَ

**৬ : ১** প্রশংসা আন্দাহরই যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন আলো ও অঙ্ককারের।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহ ২ : ১১৭, ২৪ ১৬৪ আয়াত এবং পরিশিষ্ট-১ ও ২-এ বিজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রতিটি শরেই সৃষ্টির পিছনে একজন মহাপরিকল্পক না থাকলে প্রকৃতিতে অন্য কোন কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় লক্ষ্য করে বিশ্বযানিকভাবে হতে হয়। অতি আলোচনায় অঙ্ককার ও আলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হবে এবং এসব থেকে সৃষ্টি জগৎ যে কত ব্যাপক উপকার বা সুফল লাভ করে তাও আলোচনা করা হবে।

আলো ও অঙ্ককারের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে দেসকারাটিস, নিউটন, ফ্রেসনাল ও ইয়ং এর মত স্বনামধন্য পদার্থ বিজ্ঞানীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৮৭৩ সালে বিদ্যুৎ ও চৌম্বকীয় সূত্র সমূহ সংযুক্ত করে বিখ্যাত ম্যাজ্ঞাওয়েলের সূত্র উপস্থাপন করা হয় যা আলোক তরঙ্গের সকল ধর্মবিশিষ্ট এক ধরনের তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং এই বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ আলোর গতিতে চলে। পরবর্তীকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেয় যাতে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের পূরো বর্ণালীটাই দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত, দৃশ্যমান আলো, অতিবেগোনী, ত্রুতি গামা ( $\gamma$ -Rays) রশ্মি ও রঞ্জনরশ্মি (X-Rays) সহযোগে গঠিত। আমাদের চক্ষু বর্ণালীর শুধুমাত্র দৃশ্যমান অংশের প্রতিই সংবেদনশীল। ১৯০৪ সালে প্ল্যান্ক প্রস্তাব করলেন যে, আলোকশক্তি শোষিত কিংবা নিষ্কিণ্ড হয় অসংলগ্ন প্রণালীতে। আলোর ক্ষেত্রে শক্তির পরিমাণগত ধারণা (অর্থাৎ ফোটন, যা আজ আলোর কণা হিসেবে আমাদের নিকট পরিচিত) ক্ষুদ্র বস্তু বিকিরণ, আলোক বিদ্যুৎ, কম্পটন ও রামান প্রভাবের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাণ্ড তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়। আলোর এই দৈত প্রকৃতি (অর্থাৎ তরঙ্গ প্রকৃতি ও কণা প্রকৃতি) সম্পর্কিত এই পটভূমিকামূলক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী বোহ্ৰ (Bohr) তার বিখ্যাত পরমাণু মডেল উপস্থাপন করেন যা প্রথমবারের মত আলোর নিষ্কেপণ ও শোষণ গুণগতভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়। এই মডেল মতে পরমাণু একটা ক্ষুদ্র সৌরজগতের মত দেখতে যাতে ইলেক্ট্রন নিউক্লিয়াস এক পরমাণু কেন্দ্রের চারধারে কতগুলো সুবিধাজনক কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। কোন কক্ষে যদি কোন

শূন্যস্থান থাকে, তাহলে পূরণকৃত কক্ষপথ থেকে ইলেক্ট্রন কিছু কিছু নিয়ম মেনে শূন্য কক্ষপথে লাফ দিতে পারে। নিম্ন কক্ষপথ থেকে উচ্চ কক্ষপথে এ ধরনের বৈদ্যুতিক লক্ষ আলোক কণার শোষণ ঘটায়। আর যদি ইলেক্ট্রন উচ্চ কক্ষপথ থেকে নিম্ন কক্ষপথে লক্ষ দেয়, তাহলে একটা অলোক কণা বেরিয়ে আসে। আলোকের উৎসের পূর্ণ অনুপস্থিতি কিংবা বন্ত কর্তৃক আলোর শোষণের ফলে অঙ্ককার সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিংবা অন্য কোন মাধ্যম যথা উত্তাপ প্রবাহ কিংবা অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা পরমাণুকে উন্মেষিত করা হলে পরমাণু নিম্ন কক্ষপথ থেকে উচ্চ কক্ষপথে লক্ষ দেয় যাতে উন্মেষিত পরমাণু তৈরি হয়। উন্মেষিত পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রন যখন নিম্ন কক্ষপথে লক্ষ দেয় এবং প্রাণ্ত শক্তি অবমুক্ত করে তখন আলোক সৃষ্টি হয়। বোহর উপস্থাপিত পরমাণুর এই সাদামাটা চিত্র শীঘ্ৰই সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রাণ্ত বিস্তারিত তথ্যাদি এবং উন্মুক্ত অস্থায়ী নিয়মসমূহকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অপর্যাণু প্রমাণিত হয়। Schrodinger সর্বাধিক ব্যাপকভাবে গৃহীত পরমাণু মডেল উপস্থাপন করেন যাতে বোহর-এর সুবিধাজনক কক্ষপথসমূহ হিতিশীল বস্তুতরঙ্গ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং তিনি শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ব্রোগলি (Broglie) কর্তৃক ইতিপূর্বেই বন্ত-তরঙ্গের ধারণাটি উন্মাপিত হয়েছিল। এই মডেলের সাহায্যে পদাৰ্থবিজ্ঞানের আলোর শোষণ ও উৎপাদন বিষয়ক শাখা তথা পারমাণবিক বৰ্ণলী বীক্ষণের সকল পরীক্ষাধীন ফলাফল ভালভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। এই পুনৰ্বিন্যাসকৃত মডেলে বোহর-এর পারমাণবিক মডেলকে একেবারেই গড়পড়তা চিত্র হিসেবে দেখা গেল এবং সকল অস্থায়ী বিধান ছিল স্বয়ংক্রিয় ফলাফল মাত্র। পারমাণবিক ও আনবিক বৰ্ণচিটা সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধান হয় অন্য একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আর তা হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। হাইজেনবার্গ, ডিৱাক এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ একই ফলাফল পেলে এই সমাধানে পৌছা যায়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গাণিতিক সংগঠন একেবারে নৈর্বাক্তিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ দু'টি প্রক্রিয়া একত্রে মিলিত হয়ে একটা অভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে উঠে ১, ২।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বড় বড় তাৎক্ষিক প্রচেষ্টা সঙ্গেও আলো আজও সর্বাধিক রহস্যময় বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। আলোর দৈত প্রকৃতি অর্থাৎ যে গুণের কারণে আলো কোন কোন ক্ষেত্রে তরঙ্গ প্রকৃতি প্রকাশ করে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কণা প্রকৃতির প্রকাশ ঘটায়- এই দ্বৈতাবস্থা কীভাবে সহাবহুন করে বোঝা মুশকিল। আপেক্ষিকতাবাদ মতে, আলোর গতিই সর্বোচ্চ এবং কোন কিছুই এই সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। আবার, আলোর গতি শূন্যস্থানে স্থির বা অপরিবর্তনীয়। কোন বন্ধুগত পদাৰ্থই তার স্থির অবস্থার ভৱ শূন্যে পরিবর্তন না করে অলোর গতিতে পৌছতে পারে না। আলোকশক্তি বহনকারী রহস্যময় কণা

ফোটনের ভর স্থির অবস্থায় শূন্য এবং গতি আলোর গতির সমান। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসসমূহ যখন সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে, তখন আইনষ্টাইনের বিখ্যাত ভর শক্তি সম্পর্কীয় সূত্রানুযায়ী প্রচন্ড পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হয় যা ঐ সূত্র অনুসারে ভর পার্থক্য এবং আলোর গতির বর্গের গুণদলের সমান। পারমাণবিক একীভবন প্রক্রিয়া তথা পারমাণবিক বোমার ক্ষেত্রেও এই একই সূত্রানুযায়ী শক্তি অবমুক্ত হয়ে থাকে।

কীভাবে তারকারাজি (সূর্য আমাদের নিকটতম তারকা) বিপুল পরিমাণ আলোকশক্তির বিচ্ছুরণ (অর্থাৎ  $E=Mc^2$  যেখানে,  $E$ =শক্তি,  $M$ = ভর এবং  $C$ = আলোর গতি- অনুবাদক) ঘটিয়ে লক্ষ কোটি বছর ধরে আলোক বিকিরণ করছে তা অত্যন্ত চিত্তার্কর্ক। তারকার ভিত্তে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসমূহ পরম্পরের সাথে একীভূত হয়ে কিছু মধ্যবর্তী পদক্ষেপের মাধ্যমে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করে। হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর গঠনকারী হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের চেয়ে কম। ভরের এই পার্থক্যাত পূর্বে উল্লিখিত ভর শক্তি সম্পর্ক সূত্রানুযায়ী বিপুল পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ থেকেই সৃষ্টি হয় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি যা আমাদের এই এই তথা পৃথিবীতে এসে পৌছায়। সূর্য যেহেতু পৃথিবীর নিকটতম তারকা, দিনের বেলা সূর্য থেকে আগত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বর্ণলীর দৃশ্যমান অংশ প্রাধান্য বিস্তার করে। দূরবর্তী তারকারাজি থেকে প্রেরিত আলো রাতের দৃশ্যমানতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। হাইড্রোজেন ব্যবহারের বর্তমান হার বজায় থাকলে বিজ্ঞানীগণের বিশ্বাস, সূর্য আগামী শত শত কোটি বছর ধরে আলো দিতে থাকবে।

ত্বরিত-চৌম্বকীয় বর্ণলীর দৃশ্যমান অংশ যা আমাদের নিকট আলো হিসেবে পরিচিত, অনুপম দর্শন অনুভূতির সৃষ্টি করে। দর্শন অনুভূতি হচ্ছে আল্লাহর দান। আলোর উপস্থিতিতেই উপ্তিদ সালোক সংশ্লেষ ঘটায়। এই প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল (উপ্তিদের সবুজ অংশসমূহ) আলোর উপস্থিতিতে বায়ুমণ্ডল থেকে শোষিত কার্বনডাই অক্সাইড ( $CO_2$ ) এবং মাটি থেকে শোষণকৃত পানি দ্বারা শর্করা ও পানি উৎপাদন করে। সালোক- সংশ্লেষ প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলে অঙ্গীজেন ও কার্বনডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। শর্করা বিভিন্ন একক ও মৌগ শর্করাসমূহ উপাদান আকারে গাছের মূল, কান্ড, পাতা ও ফলে জমা হয়। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবী নামক এই গ্রহে জীবনের টিকে থাকা ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সালোক সংশ্লেষ একটা অনুপম প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। আলোর অন্যান্য আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুফল আছে যা জীব জগৎ উপভোগ করে থাকে। উপ্তিদ বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেছেন যে, উপ্তিদে ফুল ফোটা এবং ফলোৎপাদন একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রাণ আলোর পরিমাণের ব্যাপারে খুবই

সংবেদনশীল। জীব বিজ্ঞানীগণও লক্ষ্য করেছেন যে, কিছু কিছু পাখি যৌন সঙ্গম করে সর্বাধিক সৌর তাপ থাকাকালীন সময়ে। আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন জলজ প্রাণীকুলকে দূরবর্তী বস্তু দেখতে সহায়তা করে যাতে তাদের জলে চলাচল ত্বরিত হয়। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এমন এক প্রক্রিয়া যা দ্বারা পানির ভিতর কোন বস্তু থেকে ছড়ানো আলো পানির ভিতরে পূর্ণ প্রতিফলন ঘটায়, এতে আলো প্রতিসারিত হয়ে বাইরে চলে যায় না, গেলে আলো পানির উপরিতলে ক্রটিপূর্ণ কিংবা উচ্চতর কোণে প্রবেশ করত। কিছু কিছু অণুর কারণে আলোর গতিপথের দিকে (মেরুকরণকৃত) আলোর তীব্রতার অসামঞ্জস্যপূর্ণ বন্টন পর্যবেক্ষণ করে বামমুখী এবং ডানমুখী অণুর পার্থক্য করা সম্ভব যেগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আলাদা হয়ে থাকে। জোনাকি এবং আলোকপোকা যে জীব প্রজ্জনন (তাপহীন নীলাভ আলো) দেহ থেকে নিষ্ক্রমণ করে থাকে তা যৌন সঙ্গমার্থে অপর লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে জৈবিক সুবিধা দিয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীগণ ত্বরিত চৃষ্টকীয় বর্ণালীর দৃশ্যমান এবং অপর অংশকে মানব জাতির সেবায় কাজে লাগিয়েছেন। লেসার (বিকিরণের উন্নতজিত নিষ্ক্রমণ দ্বারা আলো গুণিতকরণ) রশ্মি অর্থাৎ বর্ণালীর দৃশ্যমান অংশের এক ধরনের অত্যন্ত তীব্র অথচ চিকন আলোক স্তুতি-নির্ভুল শল্য চিকিৎসা যথা চোখের ছানি দূর করা, নিখুঁতভাবে ধাতু কর্তন, তার যোগাযোগ তথা আধুনিক যুদ্ধ বিধাই অস্ত্র ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সৌর বিজ্ঞানীগণ স্ময়মন্ডল উন্নতকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, হিমায়িতকরণ, রান্না বান্না এবং হাইড্রোজেন জ্বালানী উৎপাদনে নিয়মতাত্ত্বিকভাবে সৌরশক্তি সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। বিশেষভাবে নকশাকৃত পাইপে সূর্যালোকে উন্নত পানি শীতের দেশগুলোতে কক্ষ গরম করার কাজে লাগানো হয়। দৃশ্যমান আলো থেকে ফটোভোল্টাইক নামে পরিচিত এক ধরনের যন্ত্র দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। বিশেষ ধরনের হিমায়নযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের পরিবর্তে সূর্যালোককে হিমায়নের বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। সৌর চুল্লিতে জ্বালানি ছাড়াই সূর্যালোকের সাহায্যে খাবার রান্না করা যেতে পারে। ফ্রেস্নাল লেন্স দ্বারা সূর্যালোককে ঘণীভূত করে পানিকে তার গঠন উপাদান অস্ত্রিজেন ও হাইড্রোজেনে বিভক্ত করা যেতে পারে। হাইড্রোজেন যখন দহনক্রিয়ায় অংশ নেয়, তখন এটি পানিতে পরিণত হয়। কাজেই, হাইড্রোজেনই হচ্ছে সবচেয়ে অক্ষতিকর এবং দৃশ্যগুরুত্ব জ্বালানি। এক প্রকার শেওলাও পানি থেকে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন উৎপাদন করতে পারে (বাইওফটোলাইসিস বা জীবালোক সংশ্লেষণ নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়া)। হাইড্রোজেন ভবিষ্যতের একটি সম্ভাবনাময় জ্বালানি।

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর অদৃশ্যমান অংশও মানবজাতির সেবা করে যাচ্ছে। বেতার যন্ত্র এবং শুন্দি তরঙ্গের সাহায্যে বেতার ও তার যোগাযোগ সম্ভব করা হচ্ছে। ইনফ্রারেড তরঙ্গ রান্না বান্না এবং বাতজুরের চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মি চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয় এবং ধাতু, সংকর ও মূল্যবান পাথরের ত্রুটি বা ভেজাল নির্ণয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জৈব-বা উত্তিজ্ঞ পরিপূর্ণিত আবশ্যিকীয় উপাদান বিশ্লেষণ রঞ্জন রশ্মি ও শুরজ্যাতির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। রঞ্জনরশ্মির বিচ্ছুরণ কৌশল অনেক স্ফটিকের গঠনকাঠামো উদ্ঘাটন করেছে। তাদের মধ্যে ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিযিক এসিড) এবং প্রোটিনের গঠন আণবিক এবং পারমাণবিক স্তরে জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া অনুধাবন করা সম্ভব করে তুলেছে। আবার রঞ্জনরশ্মির বিচ্ছুরণ কৌশল ও শুধু তৈরির নকশা ও নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োগ করা হয়। রঞ্জন ও গামা উভয় রশ্মিই ক্যানসার নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গামারশ্মি ক্যান্সের মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থির ও চলমান দৃশ্য ধারণ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ত্বরান্বিত করে থাকে। বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেছেন যে আলোর বেগ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং স্পন্দন সংখ্যা শূন্য স্থানে স্থির থাকে। আলোর এই ধর্ম স্বল্প দৈর্ঘ্য এবং নভোমভলীয় দূরত্ব ও সময় মাপার সর্বাধিক নির্ভুল মানদণ্ড প্রদান করে। বর্তমানে দৈর্ঘ্য মাপার প্রাথমিক মানদণ্ড হচ্ছে আন্তর্জ্ঞাতিক প্রতীক মিটার বা আন্তর্জ্ঞাতিক ওজন ও পরিমাণ ব্যূরো কর্তৃক প্যারিসের সন্নিকটস্ট Saures-এ সংরক্ষিত আছে। এই আন্দর্শ মিটার হচ্ছে একটি দড়ের উপর স্বর্ণখচিত দু'টি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব; দুটি ৯০% ভাগ প্লাটিনাম এবং ১০% ভাগ ইরিডিয়াম ধাতুর তৈরী এবং এটি ০ ডিগ্রী সেঃ থেঃ তাপমাত্রা এবং ৭৬ সেঃ মিঃ পারদে রাখা হয়। যদিও এই সংকরাটির পুড়ে ক্ষয় হওয়া কিংবা বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ন্যূনতম, তথাপি ১৯৬০ সালে বিজ্ঞানীগণ ক্রোমিয়াম ৮৬ (K<sub>৩</sub>-৮৬) আইসোটোপ থেকে বিচ্ছুরিত একটি নির্দিষ্ট বেগনী তরঙ্গকে প্রাথমিক দৈর্ঘ্য মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণে সম্মত হন। বর্তমানে নয়ন ১ মিটার- ২০ ডিগ্রী সেঃ থেঃ ৩ তাপমাত্রায় অবমুক্তি থেকে শূন্যস্থানে বিচ্ছুরিত ক্রোমিয়াম ৮৬-এর বেগনী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ১৬৫০৭৬৩.৭৩ গুণ। ১৯৬৪ সালে সময়ের মান নির্ধারণ করা হয় পারমাণবিক ঘড়ির ভিত্তিতে যা একটি বিশেষ স্পন্দন সংখ্যার আলো বিচ্ছুরিত করে এবং চিরদিন অপরিবর্তিত থাকে। এর জন্য, Cs<sup>133</sup> দ্বারা বিচ্ছুরিত বিশেষ তরঙ্গের অনুরূপ স্পন্দন সংখ্যাকে মান সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এক সেকেন্ড মান সময় Cs<sup>133</sup> নির্গত তরঙ্গের ১১৯২৬৩১৭৭০ যার স্পন্দনের সময়ের সমান। বিশাল নভোমভলীয় দূরত্বসমূহ শূন্যস্থানে আলোর গতিকে একক ধরে নিয়ে মাপা হয়।

দৃষ্টিত্ব স্বরূপ, এক আলোকবর্ষ হচ্ছে এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে যা  $9.86056 \times 10^{13}$  সেঁ: মিটারের সমান এবং এক পারসেক সমান  $3.26$  আলোক বর্ষ।

অঙ্ককার দৃশ্যত সামান্য গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও আমাদের এই গ্রহে জীবন প্রতিয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষায় এর রয়েছে সুদূরপ্রসারী অভাব। নিজ অক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর সকল অংশেই রাত ও দিন বয়ে আনে, শুধুমাত্র মেরু অঞ্চল বাদে। পৃথিবীর যদি আহিকগতি না থাকত, তাহলে এর এক পাশ সূর্যের দিকে উন্নতু থাকত এবং অন্যপাশ ঢাকা থাকত অঙ্ককারে ছয় ছয়টি মাস। থায় ১২ ঘণ্টা সূর্যতাপের পর অঙ্ককারের আগমনে আলোক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায় যাতে বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাই অক্সাইডের অভাব এবং অক্সিজেনের আধিক্য না ঘটে, যা জীবনের জন্য অনুকূল বায়ুমণ্ডলীয় ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজন। ৬ মাস দীর্ঘ দিন ও রাত চরম জলবায়ুগত অবস্থা এবং আলোক সংশ্লেষণে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করত যাতে জীবনের পক্ষে টিকে থাকা এবং উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত। রাতের আলোক দিবাকালীন আগীকুলের জন্য বিশ্রামের সুযোগ এনে দেয়।

এ সকল আলোচনা থেকে আল্লাহ আলো ও অঙ্ককার প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতিতে চমৎকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। আলো কর্মের উদ্দীপনা জাগিয়ে এই গ্রহে জীবনের বৃক্ষি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। মানুষ ত্বরিত চুম্বকীয় তরঙ্গের পুরো বর্ণালীকে এর নানাবিধি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে নিজের কাজে লাগিয়েছে। রংধনুর রং, ঘনবন্টনের পত্ররাজির ভিতর দিয়ে চক্রচক্র করা পুকুরের ঢেউ খেলনার দৃশ্য এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের প্রাকৃতিক কবিতা আলোর মোহনীয়তা ও মহিমার সাক্ষ্য বহন করে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আলোকে প্রদান করা হয়েছে বেশ কয়েকটি মজার মজার বৈশিষ্ট্য যা সকল জৈব জীবনের ভিত্তি গঠন করে। আর এ কারণে বস্তুতই আলো ঘোষণা করছে : সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই, যিনি আলো ও আঁধার সৃষ্টি করেছেন।

### তথ্য সূত্র :

- Heitler, W., Elementary Wave Mechanics, Oxford University Press, 1961.
- Dirac, P. A. M., Quantum Mechanics, Oxford University Press, 1935.
- Driscold, Walter, G., Handbook of Optics, Mc Graw Hill, Inc. pp. 11-5, 1978.

## •مِنْ طَيْنٍ مُّكَفَّى أَجَلٌ•

৬ : ২ তিনিই তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর একটি  
সময় নির্দিষ্ট করেছেন।

বিজ্ঞানীগণ প্রদত্ত জীবনের সংজ্ঞা নিম্নরূপ : জীবন হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া  
বিশেষ যাতে রয়েছে কার্বন ভিত্তিক অণুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটার পর  
একটা রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া যা দ্বারা বস্তুকে একটা পদ্ধতির মধ্যে নেয়া হয়  
এবং ঐ পদ্ধতির বৃদ্ধি ও বংশানুক্রম রক্ষায় সহায়তা দিতে বস্তুকে ব্যবহার করা  
হয়। আর এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বর্জ্য বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। মানবদেহ গঠনকারী  
কোষসমূহ চার ধরনের প্রধান জৈব পদার্থের উপস্থিতির কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের  
অধিকারী। সেগুলো হচ্ছে : শর্করা, ম্লেচ্ছ, কোষ প্রাণকেন্দ্রীয় এসিড, এবং  
আমিষ; আর সাথে রয়েছে অজৈব বস্তুর এক বিন্যাস। জীবনের উৎপত্তি বা উন্নয়ন  
সম্পর্কিত সমস্যার আধুনিক বিষয়টাই হচ্ছে কেমন করে এ সকল জৈব বস্তু  
অস্তিত্ব লাভ করল তা নির্ধারণ করা। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীর  
প্রাথমিক যুগের ইতিহাস চলাকালীন সময়ে পৃথিবীর চতুর্পার্শ্বস্থ পরিবেশে  
প্রাকৃতিকভাবে যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেগুলোই  
জীবনের প্রথম স্পন্দনের উন্নেশ ঘটিয়ে থাকবে। পৃথিবীর আদিযুগীয় বায়ুমণ্ডলে  
ছিল প্রধানত মিথেন ( $CH_4$ ) এবং তৎসঙ্গে কিছু এমোনিয়া, হাইড্রোজেন আর  
জলীয় বাষ্প দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানীগণ ধারণা করেন যে, আদিযুগীয় বায়ুমণ্ডলের  
উপস্থিতিতে সাগরে প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত বজ্রপাত, সূর্য থেকে আগত  
অতিবেগুনী রশ্মি কিংবা মহাজাগতিক রশ্মিসমূহের ক্রিয়ায় এমাইনো এসিড (২৩  
টি আমিষের শর গঠন করে) এবং জৈব বস্তুর আরো কিছু আনুষঙ্গিক বস্তু তৈরির  
মধ্য দিয়ে এবং সেই সঙ্গে কিছু জৈব বস্তু সৃষ্টির দ্বারা জীবনের যাত্রা শুরু। এটাই  
primary broth তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত যা জোরালো সমর্থন লাভ করে যখন  
১৯৫৩ সালে এস এল মিলার একটি পানির পাত্রে হাইড্রোজেন, এমোনিয়া,  
মিথেন এবং জলীয় বাষ্পের একটি মিশ্রণ শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চার্জের ভিত্তি  
দিয়ে চালিয়ে বেশকিছু এমাইনো এসিড উৎপাদন করেন।<sup>১</sup>

থুব শীঘ্ৰই এই প্রাথমিক সৃষ্টিশালা প্রকল্পের ব্যাপারে সাংঘাতিক আগতি  
উত্থাপিত হয়। এমাইনো এসিড সৃষ্টি আমিষ ও ডিএনএ উৎপাদনের ব্যাখ্যা  
দিচ্ছিল না। ডিএনএ-র কেন্দ্রীয় প্রাণকেন্দ্রে থাকে বংশ বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধিপ্রাণ হবার  
সংকেতসমূহ। ক্রিক এবং ওয়াট্সনের প্রচেষ্টার কারণে ১৯৫৮ সালের মধ্যে

ଡିଏନେ-ର ପାରମାଣବିକ ଗଠନ-କାଠାମୋ ଜାନା ଯାଯ় । ଶୀଘ୍ରଇ ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଁ, ନତୁନ ଆମିଷ ତୈରିର ପ୍ରଥମ ଧାପ ଛିଲ ଡିଏନେ-ର ଉପର ଆରଏନେ (ରିବନିଉକ୍ଲିଯିକ ଏସିଡ) ନାମେ ଏକ ବିଶେଷ ଆକାରେ ସଂବାଦବାହକରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯାର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ଏକଟା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମିଷ ତୈରିର ଜନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ତଥ୍ୟାଦି । କୋଷ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରେ ରଯେଛେ ଏକଟାର ପର ଏକଟା ସାଜାନୋ ଏମାଇନୋ ଏସିଡ, ଯାଦେର ପ୍ରତିଟିଇ ସ୍ଵଳ୍ପଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିଉକ୍ଲିଯିକ ଏସିଡେର ସାଥେ ଆଟକାନୋ । ସଂବାଦବାହକ ଆରଏନେ ଏସେ ଯଥିନ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ହେଁ, ସ୍ଵଳ୍ପ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆରଏନେ ଅନୁସମୃଦ୍ଧ ତଥିନ ସଂବାଦବାହକ ଅଗୁର ଉପରେ ଯଥାୟଥ ଥାନେ ନିଜେଦେରକେ ଆଟକେ ରାଖେ ଏବଂ ଏଭାବେଇ ଏମାଇନୋ ଏସିଡେର ସଂତିକ ଅନୁକ୍ରମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିଶ୍ଚିତ ହେଁ ଯା ଏକଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମିଷ ତୈରିର ଜନ୍ୟ ଦରକାର ।

ଡିଏନେ-ର ପାରମାଣବିକ ଗଠନ ଏତ ଜଟିଲ ଯେ, ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନୀ ଅବିଶ୍ୱାସ କରଲେନ ଯେ, ଆଦିମ୍ୟୁଗୀୟ ସୃଷ୍ଟିଶାଲାୟ ଡିଏନେ-ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଁତେ ପାରେ, ଯେଥାନେ ଡିଏନେ-ର ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ଉପାଦାନେର ପାନିତେ ସଂୟୁକ୍ତ ହେଁଯାଂ ଛିଲ ଏକେବାରେଇ ଅସମ୍ଭବ । ବାର୍ନାଲଇ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏ ଧାରଣା ଦେନ ଯେ, ଜୀବନେର ପ୍ରଥମ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟିତେ କାଦାମାଟି ସବଚେଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେ ।<sup>୨</sup> ରାସାୟନିକଭାବେ କାଦାମାଟି କ୍ଷରେ କ୍ଷରେ ସଜ୍ଜିତ ବାଲୁକଣାର ପାତ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯାତେ ପ୍ରତିଟି ପାତେର ମଧ୍ୟେ ବାଯୁ ଚଳାଚଳ ଓ ପାନି ପ୍ରବାହେର ଜନ୍ୟ ରଯେଛେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫାଁକା ଥାନ । କାଦାମାଟିର ବୈଦ୍ୟତିକ କ୍ଷେତ୍ର ତାଦେର ଭିତର ଦିଯେ ଚଳାଚଳକାରୀ ଯେ କୋନ ଯୌଗେର ଉପର କିଛୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଫେଲେ ଥାକିତେ ପାରେ ।<sup>୩</sup>

ସମ୍ପ୍ରତି ନାସାର (ନ୍ୟାଶନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ୟାଲ ସ୍ପେସ ଅଥରିଟି) ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଧାରଣା ଦେନ ଯେ, କାଦାମାଟି ଆମିଷ ଓ ଡିଏନେ-ର ତୈରିତେ ଅନୁଘ୍ଟକ ହିସେବେ କାଜ କରେ । ମାଟିର ଜାଫରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆକାରେ ଶକ୍ତି ଜମା କରେ ରାଖିତେ ଏବଂ ଜୋଯାର ଓ ଭାଟା ଚଳାକାଲେ ସମ୍ଭବତ ସିକ୍ରିତା ଓ ଗୁରୁତାର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଚାପେର ମୁଖେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅବୟୁକ୍ତ କରତେ ପାରେ ।<sup>୪</sup> ଅବୟୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ତଥିନ ରାସାୟନିକ ବିକ୍ରିଯା ସ୍ଟାର୍ଟ୍‌ଅପ୍ ପ୍ରତ୍ୱତ ଥାକେ । କାଜେଇ, ନାସା ବିଜ୍ଞାନୀଗଣେର ମତେ, ମାଟିର ରଯେଛେ ଶକ୍ତି ଜମା କରେ ରାଖାର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ବିକ୍ରିଯା ଅନୁଘ୍ଟକରେର କାଜ କରାର ଅନୁପମ ଧର୍ମ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯା ସାରି ସାରି ଇମାରତକେ ସଂୟୁକ୍ତ କରେ ଆମିଷ ଓ ଡିଏନେ-ର ଉପକ୍ରତ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵରେ ପରିଣତ କରେ । ଯଦିଓ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଶେଷ କଥାଟା ଏଥନ୍ତି ବଲା ହୁଯନି, ଆଶା କରା ଯାଯି ଯେ, ଆରୋ ଅନୁସଙ୍ଗାନ ଏ ବିଷୟଟିକେ ଅଧିକତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ତୁଳବେ । ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଆଜ ବିଶ୍ୱାସ କରେନ ଯେ, ଜୀବନେର ପ୍ରଥମ ସ୍ପନ୍ଦନେର ଉତ୍ତର ତଥିନି ହେଁ, ଯଥିନ ଜଟିଲ ଏମାଇନୋ ଏସିଡ ଆର ଡିଏନେ-ର ସଂବାଦବାହକ ଆଦିମ୍ୟୁଗୀୟ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିଶାଲାୟ କ୍ଷରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବାର ଭିତର ଦିଯେ ଅଭିନ୍ଦନ କରି ଯାଯି । ସର୍ବାଧିକ ନାଟକୀୟ ଘଟନାଟି

ছিল জড় থেকে জীবনে উন্নতির আদিম ব্যাপারটি, যা স্পষ্টতই ঘটে যায় সাগর সৈকতের সূর্য-স্নাত কাদামাটিতে। এমিবার মত সরলতম এককোষী জীবদেহের সৃষ্টিতে কাদামাটি যে ভূমিকা পালন করে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে কুরআনের বক্তব্যের মিল রয়েছে। ডিএনএ- আমিষ চক্র আনবিক ক্ষেত্রে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ লাইনের মতই, যে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণই স্ব-উৎপাদনী টেপে (ডিএনএ) নিয়ন্ত্রিত। মানবদেহে এই প্রক্রিয়া প্রতিটি কোষেই চলতে থাকবে যাতে কোন ভুল-ক্ষটি ছাড়াই কর্মপক্ষে দু'হাজার বিভিন্ন আমিষ উৎপাদিত হতে পারে। কেননা, একটি মাত্র ভুলও স্বাভাবিকভাবেই মারাওক পরিণতি দেকে আনবে। যে সংগঠন ও প্রক্রিয়ায় আমিষের সংশ্লেষণ ঘটে তা লক্ষ্য করলে যে কেউ বিশ্বাসিভূত হয়ে পড়তে বাধ্য। যাহোক, সকল সৃষ্টির মহাত্ম মানব সৃষ্টি, যাৰ সাথে জড়িয়ে আছে জটিল জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া-এমিবার সৃষ্টি থেকে বহু দূরের ব্যাপার। অনুপম স্বয়ংক্রিয় সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সমৃদ্ধি প্রথম মানব ডিএনএ-র সৃষ্টি এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য, গন্তব্য এবং পরিকল্পনা ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট হত না। বস্তুত এসব কিছু শুধুমাত্র তখনই ঘটতে পারে যখন এসব কিছু ঘটাবার জন্যে কোন মহাপরিকল্পনাকারী থাকেন।

### তথ্যসূত্র :

1. Bernal J. D. Science in History; Vol. 3, Penguin, p. 986. 1969.
2. Bernal J. D. The Physical Basis of Life, Routledge and Kegan Ltd. London. 1952.
3. Alexander George, Reader's Digest. pp 34-38. January. 1983.
4. News Week. p. 50, April 15. 1985.

٤- أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ كُتِّبَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَهُ  
لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قِدَرًا إِذَا جَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْبًا أَخْرَى ۝

৬ : ৬ তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি; তাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি এবং তাদের উপর যুবলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম; অতঃপর তাদের পাপের দরুণ তাদেরকে বিনাশ করেছি এবং তাদের পরে আরেক মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।

অত্র আয়াতটি ৩ : ১৩৭ আয়াতের পুনরাবৃত্তি বিশেষ এই অর্থে যে, এটি বিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতীত ইতিহাসের দিকে যাতে তারা দেখতে পায় যে বহু ক্ষমতাধর ও সমন্বিতালী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তাদের পাপের কারণে।

ଆয়াতিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়নি কোন্ জাতি গোষ্ঠীগুলোকে ধৰ্সন করা হয়েছিল কিংবা তাদের পাপের প্রকৃতি যার জন্য তাদেরকে ধৰ্সনের মুখ্য পড়তে হয়েছিল । আজ আমাদের কাছে জ্ঞাত যে ইতিহাস তাতে লেখা রয়েছে বহু ঐতিহাসিক ও প্রাণৈতিহাসিক জাতির কথা যাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে । শুধুমাত্র ফারটাইল ক্রিসেন্ট (Fertile Crescent) নামে গুটিকয়েক প্রাচীন আবর দেশের কথা আল কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে যা আমরা ৩ : ১৩৭ আয়াতে আলোচনা করেছি ।

এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী এটাই প্রত্যাশিত যে, মুসলমানগণ জ্ঞান রাখবে ও প্রাচীনকালের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাদের কৃতিকলাপ সম্পর্কে, আর সচেতন হবে যে কারণে আল্লাহ নারাজ হয়েছিলেন যার পরিণতিতে তারা ধৰ্মসংক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।

١٠- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْنِ

୬ : ୧୧ ବଲ, ‘ପୃଥିବୀତେ ପରିଭ୍ରମଣ କର, ଅତଃପର ଦେଖ, ଯାରା ସତ୍ୟକେ  
ଅସ୍ତ୍ଵିକାର କରେଛେ ।

এ বিষয়টি ৩ঃ ১৩৭ আয়তে আলোচিত হয়েছে।

وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِحَنَاجِهِ إِلَّا مَأْمُونٌ  
أَمْثَالُكُمْ مَا لَرَتُنَا فِي السَّكَنِ مِنْ شَيْءٍ وَلَمْ يَأْتِ رَبِّهُمْ بِخَمْرٍ فَوْنَ

৬ : ৩৮ ড়-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই অথবা নিজ ভানার  
সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যা তোমাদের মত একটা  
উদ্বিষ্ট নয়। কিংবা কোন কিছুই আমি বাদ দেই নি; অতঃপর  
যৌবন প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকেই একত্রিত করা হবে।

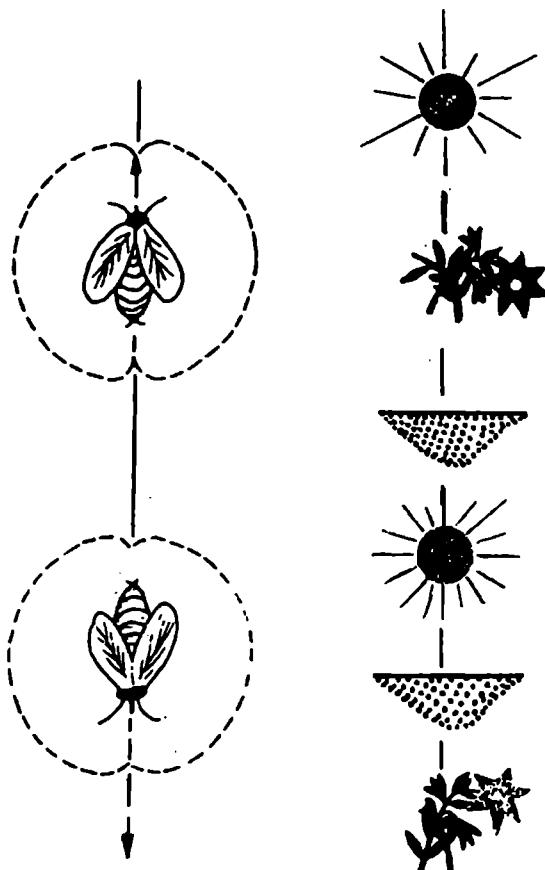
‘সম্প্রদায়’ বলতে কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ‘জীবদল’ কে বুঝায়। হাজার  
হাজার বছর ধরে চলে আসা প্রাণীদের স্থানান্তর, বৃক্ষ, বৎশবৃক্ষ এবং প্রাকৃতিক  
নির্বাচন সম্প্রদায় নামে জীবনের জটিল সম্পর্ক-জাল সৃষ্টি করেছে। এতে অন্তর্ভুক্ত  
রয়েছে বহু বর্গীয় জীবদেহ যারও জল এবং স্থলে নির্দিষ্ট পরিবেশে সম্পর্ক স্থাপন ও  
যোগাযোগ করে থাকে।

কিন্তু কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি স্পষ্টতই সেই সকল ব্যক্তির সম্প্রদায়ের  
কথা উল্লেখ করেছে যারা একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, পৃথিবীতে হামাগুড়ি দেয়  
কিংবা হাঁটে অথবা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। সরলতম সম্প্রদায় হচ্ছে এক জোড়া  
সঙ্গী। বৃহত্তর সম্প্রদায়গত ইউনিট হচ্ছে সেই সকল জনসংখ্যা যারা কম বেশী  
জটিল সামাজিক ব্যবস্থায় সংগঠিত। জীবনের পরিবেশ অনুকূল হলে জীবসদস্য  
গুণিত হয় এবং শীত্রাই একটা জনসংখ্যা গঠন করে। কোন পরিবেশে এর সদস্য  
সংখ্যা কত হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয়ের উপর। যথা : কোনু  
সময় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয়, খাদ্যের পরিমাণ, প্রাণী যায়গা বা স্থান,  
এবং শিকারজীবী প্রাণীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি। সম্প্রদায়গুলো আণুবীক্ষণিক  
জীবাণুই হোক কিংবা ইন্দুরই হোক অথবা হোক না মানুষ, সকলের জন্যেই  
একই বিধান থাটে। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ, পূর্ণ বয়স্ক নারী, শিশু এবং  
কিশোর-কিশোরী নিয়ে গঠিত হয় মেরুদণ্ডী প্রাণীকূলের সামাজিক কাঠামো।  
সামাজিক আচরণ আর যোগ্যতা-সক্ষমতার দ্বারা শ্রম বিভাজন প্রতিষ্ঠা করা হয়  
যার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় দলের নেতা, পথ প্রদর্শক, শাস্ত্রী এবং অভিভাবক।  
মানব সমাজেও একই রকম কাঠামো দেখা যায়, তবে তা একদম দৈবিক নয়,  
বরং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি শীল। একজন সৈন্য, একজন রাজনীতিক,  
একজন শিক্ষক, একজন চিকিৎসক, একজন প্রকৌশলী, একজন শিল্পী এবং  
আমাদের সমাজের অপরাপর সকল বিশেষজ্ঞ বাহ্যিকভাবে দেখতে একে অপরের  
মত হলেও তারা ভিন্নভাবে আচরণ করে থাকে। দল গঠনের দ্বারা অনেক

ଉପକାର ବା ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରା ହ୍ୟ । ଦଲীଯ କର୍ମକ୍ରମ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷକେ ବଂଶବୃଦ୍ଧିର ଜନ୍ୟେ ପରମ୍ପରେର ସାମାଜିକ୍ ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟିର ସୁଯୋଗ କରେ ଦେଇ । ଆର ଏ ସବେର ମୋଟ ଫଳାଫଳ ହିସେବେ ଆଶ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ, ପାନି ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ଚାହିଁଦା ପୂରଣେ ଦଲେର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ । କୋନ ସମାଜକେ ଯଦି ଏକଟା ଏକକ ସମ୍ଭା ହିସେବେ ଟିକେ ଥାକୁତେ ହ୍ୟ, ତାହଲେ ଏକେ ଦୃଷ୍ଟି, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସମ୍ଭବତ ଶାଦ ଏହି ତିନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ଦ୍ୱାରା ଏକଟା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଡ଼େ ତୁଳତେ ହବେ ଯାତେ ଏର ସଦସ୍ୟଦେର କାଜକର୍ମରେ ମଧ୍ୟେ ସମୟର ସାଧନ କରା ଯାଇ ।

ପୋକାମାକଡ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନେର କ୍ରମବିକାଶେର ସମସ୍ୟା ପ୍ରାଣୀ ଆଚରଣେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ମନୋମୁକ୍ତକର । ଦୃଢ଼ାତ୍ମକରପ, ଉଇପୋକାରା ତାଦେର ମଧ୍ୟକାର ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଦଲୀଯ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବାସା ତୈରି କରେ, ଏଦେର ବିଶେଷ ବିଶେଷ କର୍ମର ଉପର ପୁରୋ ଦଲେର ଟିକେ ଥାକା ନିର୍ଭର କରେ । ସମାଜେର ସଦସ୍ୟ ଜନ୍ୟାନକାରୀ ଶ୍ରୀ ଉଇୟେର ରଯେଛେ ବୃଦ୍ଧାକାର ପେଟ । କର୍ମିରା ହଞ୍ଚେ ବକ୍ଷ୍ୟା ପୁରୁଷ ଆର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରେର ଶ୍ରୀ ଉଇ ତାଦେର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଯେମନ : ଖାଦ୍ୟ ସଂଶୋଧ, ଆଶ୍ୟ ତୈରି ଓ ମେରାମତ କିଂବା ଛୋଟଦେର ଦେଖାନ୍ତନା କରା । ସମାଜେର ନିରାପତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ବେ ନିଯୋଜିତ ସୈନିକଦେର ରଯେଛେ ଆସ୍ତରକ୍ଷାମୂଳକ ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କୌଶଳ ତଥା କାମଡ୍ ମାରାର ଜନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୋରାଲୋ ଚୋଯାଲ ଏବଂ ଏମନକି ରାସାୟନିକ ବକ୍ତୁସମ୍ମହ ଯା ଛାଡ଼ିଲେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସେର ମତ କାଜ କରେ ।

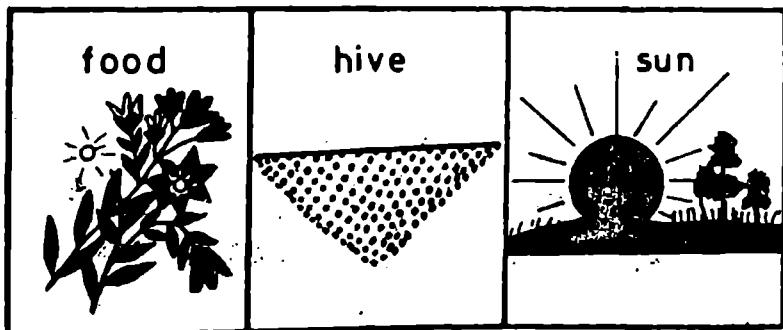
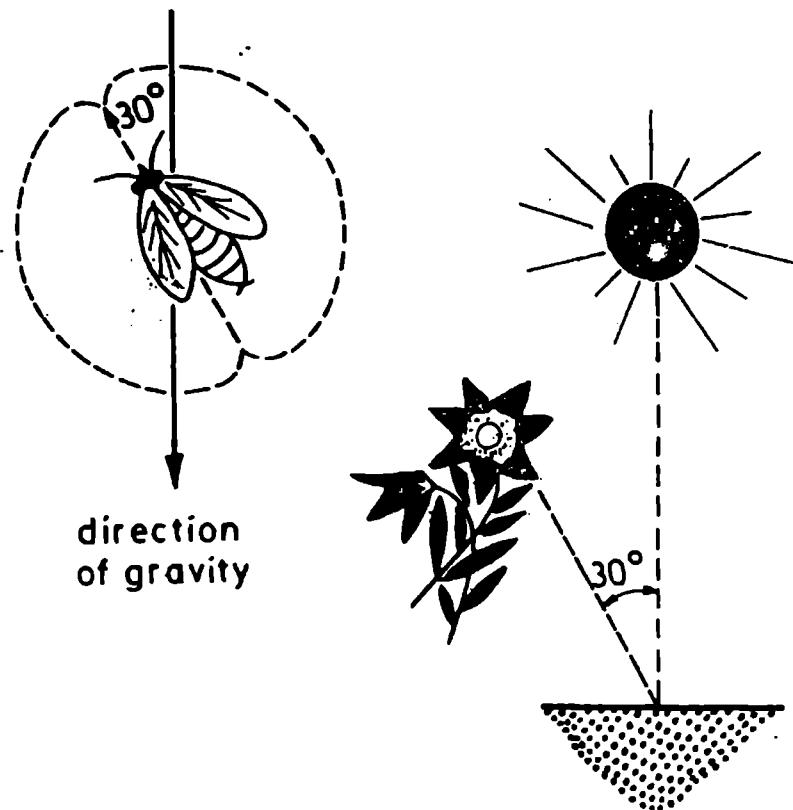
ମୌମାଛିରା ସାଧାରଣେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷକ ଦଲବନ୍ଦ ଆଚରଣେର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରେ ଥାକେ । ମାନବ ସମାଜେର ମତ ତାଦେରଙ୍କ ରଯେଛେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ-ଏଟା ସୁବିଦିତ । ମୌମାଛିଦେର ଏହି ଦିକଟା ସକଳେଇ ଅବହିତ ଏବଂ ମୌରାଣୀ, ପୁଂ-ମୁଖୁପ, ଶ୍ରମିକ ମୌମାଛିଓ ପରିଚିତ ନାମ । ଆମରା ତାହଲେ ଏ ସକଳ ବିଷୟେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବନ୍ଦ କରବ ନା, ଆମରା ବରଂ ମୌମାଛିଦେର ମଧ୍ୟେ ଯୋଗାଯୋଗେର ପଦ୍ଧତିଗତ ଦିକଟିତେ ପାଠକେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରବ । ମାନବ ସମାଜସମ୍ମହ ବିଭିନ୍ନ ଶୀକୃତ ଭାଷାଯ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ଥାକେ । ମୌମାଛିଦେର ସଦସ୍ୟରାଓ ଏକେ ଅପରେର ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ଥାକେ ତବେ ତା ନାଚେର ଭକ୍ତିମାଯ ଯାତେ ଥାକେ ଦୂ'ଟି ବିଷୟେର ତଥ୍ୟାଦି ଯଥା : ୧. କୋନ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ତିତ୍ବ, ଏବଂ ୨. ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଠିକାନା । ମୌମାଛି ଯଦି ସୋଜା ଚଲେ ଏବଂ ତାରପର ଘଡ଼ିର କାଟାର ଦିକେ ମୋଡ଼ ନେଇ, ଅତଃପର ଆବାର ସୋଜା ଚଲେ ଏବଂ ଖାନିକବାଦେ ଘଡ଼ିର କାଟାର ବିପରୀତ ନିକେ ମୋଡ଼ ନେଇ-ଯା ଚିତ୍ର ଓକ-ତେ ପରିକଳ୍ପିତଭାବେ ଦେଖାନ୍ତେ ହ୍ୟେଛେ, ତାହଲେ ଏହି ନାଚେର ଅର୍ଥ ହଲୋ ଆଶପାଶେ ଖାଦ୍ୟ ଆଛେ । ଏହି ନାଚ ଭକ୍ତିମାଯ ଖାଦ୍ୟ କୋନ ଦିକେ ରଯେଛେ ତା ନିର୍ଦେଶ କରା ହ୍ୟ ନିଷ୍ଠେକ ପଞ୍ଚାଯ । ମୌମାଛି ତାର ନାଚେର ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦିକେର ସାଥେ ତୁଳନା କରେ ଖାଦ୍ୟର ଦିକ ନିର୍ଦେଶ କରେ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦିକ ନିର୍ଦେଶ କରା ହ୍ୟେଛେ ମୌଚାକେର ଦେୟାଲ ଥେକେ ସୋଜା ଉପରେର ଦିକେ ଏକଟା ଖାଡ଼ା ବା ଉଲ୍ଲଷ୍ଟ ରେଖାର ମାଧ୍ୟମେ । ନର୍ତ୍ତକ ଯଦି ଖାଡ଼ାଭାବେ ଉପରେର ଦିକେ ଉଠେ



Direction of gravity

food	hive	sun

চিত୍ର ୩ (କ).



ଚିତ୍ର ୩ (୩).

যায় তার অর্থ সূর্য যেদিকে খাদ্যের স্থানও সেদিকে। খাদ্যের উৎস যদি সূর্যের ৩০° ডিগ্রী বাম বরাবর হয়, তাহলে নাচও হবে উল্লম্ব রেখার বাম বরাবর ৩০° কোণে। চিত্র ৩ খ।

অন্য মৌমাছিরা নর্তনশীল মৌমাছিটাকে দেখে এবং উল্লম্ব তথা সূর্যের অবস্থানের দিকের তুলনায় এর অবস্থানকে পর্যবেক্ষণ করে। অন্য মৌমাছিরা আরো অনুভব করে যে, উল্লম্বটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণের দিক। নর্তনশীল মৌমাছিটি যখন উড়ে চলে যায়, অন্য মৌমাছিরা তখন খাদ্যের সন্ধানে সূর্যের অবস্থানের তুলনায় একটা নির্দিষ্ট কোণে যাত্রা শুরু করে নাচের মধ্য দিয়ে যে দিকটি নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু সূর্যকে কোন বাধা যখন আড়াল করে রাখে তখন মৌমাছিরা কী করে? উদাহরণস্বরূপ, আকাশে মেঘ থাকতে পারে কিংবা সূর্য পাহাড়ের পিছনেও থাকতে পারে। এটি এবং এ ধরনের আরো সমস্যারও সমাধান আছে। অধিক বিস্তারিত জানার জন্য ভন ফ্রিস-এর গ্রন্থসমূহের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে রয়েছে মৌমাছির আচরণের উপর বিশাল গবেষণা কর্মের ফলাফল।

ঘটনাক্রমে, সুরা নাহল-এ (আয়াত ১৬ : ৬৯) আল্লাহ মৌমাছিদের নির্দেশিত পথের কথা উল্লেখ করেছেন যে পথে চলতে তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। মৌমাছির উপর পরিচালিত গবেষণাসমূহ এ সকল নির্দেশিত পথ সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করেছে যা মৌমাছিদের নাচশৈলী বা ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এভাবে; আলোচ্য আয়াতে প্রাণীজগতের সংঘ বা সম্প্রদায়গত দিকের যে ইঙ্গিত করা হয়েছে মৌমাছিরা তার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। মানব পরিবারের বাইরে সংঘবন্ধ আচরণের আরেক দৃষ্টান্ত হচ্ছে পিপীলিকা। পিপীলিকাদের সুশৃঙ্খল চলাচল কে দেখে নি, দেখে নি তাদের খাদ্য বিনিময় পদ্ধতি, তাদের শ্রম বিভাজন এবং বর্ধাকালের জন্য খাদ্য মজুত নীতি লক্ষ্য করে তাদের প্রশংসা করে নি? শ্রম বিভাজন এবং পিংপড়া পরিবারের সাংগঠনিক স্তর কাঠামো এক বিস্ময় বটে। ঠিক মানুষের মতই, মা-পিংপড়া সন্তানদের লালন পালন করেন; একইভাবে পিংপড়া-রাণী তার বংশধরদের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের প্রতি থাকেন নিরবেদিতপ্রাণ। তিনি তার মুখ থেকে শ্রেষ্ঠপদার্থ সম্বলিত লালা তরুণ শুয়ো-গোকার মুখে নিষ্কেপ করেন আর তারা দ্রুত বড় হয়ে যায়। প্রথম প্রজন্মের কর্মীরা (কর্মী কিংবা সৈন্য) পক্ষবিহীন, স্বাভাবিকভাবেই সন্তান জন্মানো অক্ষম। স্ত্রী-পিংপড়া মাটি ঝুঁড়ে পথ করে এগিয়ে যায় মাটির উপরিতল পর্যন্ত এবং তারা খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। পক্ষবিশিষ্ট পুরুষরা রাণীদের সাথে প্রথম এবং একমাত্র বৈবাহিক আকাশ ভ্রমণে যোন সঙ্গমের পর অন্যত্র আশ্রয় নেয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়। তারা এটি রাণীর নিকট নিয়ে আসে এবং রাণী তার শক্তি

পুনরুদ্ধারের পর ডিম পাড়ার কাজ অব্যাহত রাখে। ক্রমান্বয়ে কর্মীরা ছোটদের দেখাতার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত রাণী ডিম পাড়ার মেশিনে পরিণত হয়ে যায় আর কর্মীরা তাদের পেট থেকে খাবার ‘উগরাইয়া’ রাণীর উদ্দর ঠেসে ভর্তি করে দেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পিংপড়াদের সংঘগত অস্তিত্ব সত্যিই মানব সমাজের মতই একটা সমবায় প্রক্রিয়া বিশেষ।

পিংপড়েরা চমৎকারভাবে সমবায়ী উদ্যোগের শক্তি প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিজেদের আকারের তুলনায় অনেক বড় আকারের কোন খাদ্যশস্য বহন করে নিয়ে যায়। এটি এবং এর সাথে তাদের চরিত্রের আরো অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের সুসামঝস্যপূর্ণ সামাজিক জীবনের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে এবং আল্লাহর সৃষ্টি এবং অত্র আয়াতে উল্লিখিত বিভিন্ন আকারের জীবের মধ্যে মানুষের অনুরূপ সম্পূর্ণগত আচরণের আরেকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে।

## فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَغْنُى وَالْبَصِيرُ

৬ : ৫০ বল, অঙ্গ ও চক্ষুস্থান কি সমান?

দৃষ্টিশক্তি আল্লাহর এক বিরাট দান। যার দৃষ্টিরূপ দর্শনাঙ্গ আছে তিনি দেখতে পান, দূর থেকে কোন জিনিসকে চিনতে বা বুঝতে পারেন এবং তাদের নিজ নিজ রঙ, আকার-আকৃতি ও আয়তনের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারেন এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও মহিমা উপভোগ করতে সক্ষম হন। অধিকত্তু, তারা তাদের পথ দেখতে পান এবং ফলে দৃঢ় পদে চলাফেরা করতে এবং কাঞ্চিত গন্তব্যে পৌছতে পারেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তারা তাদের চারপাশে বর্তমান প্রচুর প্রাকৃতিক আলো নিজ সুবিধা বা উপকারার্থে ব্যবহার করতে পারেন।

অপরদিকে, একজন অঙ্গ ব্যক্তি অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিত কোন লোক সম্পূর্ণ অঙ্গকারে নিমজ্জিত থাকেন। তার চারপাশের আলো, রঙ এবং সৌন্দর্য সবই বৃথা। কেননা, এসব কিছু তার অভিজ্ঞতার বাইরের জিনিস। তিনি দেখতে পান না এবং প্রতিটি পদক্ষেপেই তিনি প্রতিবন্ধী।

এটা স্পষ্ট যে, একজন অঙ্গ ব্যক্তি এবং একজন চক্ষুস্থান লোক কখনও সমান হতে পারে না; তাদের মধ্যে অপরিমেয় ফারাক বিদ্যমান।

‘অঙ্গরা কি চক্ষুস্থানদের সমান হতে পারে’ বক্তব্যটির উপরেয়তা হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে ৪০ : ৫৮ আয়াতে (যারা অঙ্গ আর যারা চক্ষুস্থান তারা সমান নয়)। এখানে একজন অঙ্গ লোককে সেই ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে যিনি আধ্যাত্মিক দীপ্তি তথা আল্লাহর যে আলো বা নূর

সমগ্র বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে তা অনুধাবন ও ব্যবহার করতে অঙ্গম। এভাবে সে আল্লাহর হেদায়েত লাভ এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয় না। অপরদিকে, আল্লাহর খাটি বান্দারা তাদের ঈমান ও নেক আমলের গুণে আধ্যাত্মিক নূর গ্রহণ করার ক্ষমতা সাঠি করেন যা তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তির জন্য দেয়। তারা প্রতিটি জিনিসকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখেন, 'সোজা পথ' বেছে নেন ও অনুসরণ করেন এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক শরে উন্নীত হন।

## ٤٠-فَلْ مَنْ يُنْجِي كُفَّرَ مِنْ طَلْمَنِ الْبَرِّ وَالْبَرْ

৬ : ৬৩ বল, 'কে তোমাদেরকে ত্রাণ করে স্থলভাগের ও সমুদ্রের আঁধার হতে?'

অত্র আয়াতে স্থল ভূভাগ এবং সাগরে, অঙ্ককারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপদাপদ ও দুর্দশাসমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ধরনের অঙ্ককার ও তৎসংশ্লিষ্ট দুর্দশার বিবরণ নিম্নরূপ :

১. রাত্রির ব্যাপক-বিস্তৃত অঙ্ককার স্থল ও জলভাগ উভয়কেই ঢেকে ফেলে এবং বিশেষ করে ঘন অঙ্ককার হয় যখন চাঁদ দেখা যায় না। দৃঃতকারীরা রাতেই অধিক সক্রিয় থাকে এবং এর ফলে বেশ কিছু বিপদাপদ রাতেই ওৎ পেতে থাকে। অধিকতুল্য, যথেষ্ট সতর্ক না হলে অঙ্ককারে পথ হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি ও রয়ে যায়।

২. স্থলভাগ ও সাগরের উপর দিয়ে চলাচলরত ঘন, কালো মেঘ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে। এ কারণে হতে পারে ধৰ্মসাম্বাদ বন্যা, বজ্রপাতে ঘটতে পারে জীবন ও সম্পদের হানি এবং শিলাবৃষ্টি ডেকে আনতে পারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি।

৩. স্থলে ও সাগরে ঘন কুয়াশা জমে কখনও কখনও দৃষ্টিশক্তি কয়েক ফুটের মধ্যে সীমিত করে ফেলতে পারে এবং ঘটাতে পারে বার বার দুর্ঘটনা, মুখোযুখি সংঘর্ষ এবং চলার পথ থেকে বিচৃতি। এ রকম পরিস্থিতিতে সাগরবক্ষে চলমান জাহাজ এবং স্থলভাগে চলাচলকারী পথচারী ও যানবাহনের জন্য রয়েছে ভয়াবহ বিপদের হাতছানি।

৪. সামুদ্রিক ঝড়-বাঞ্ছা মেঘ সাথে নিয়ে যখন সাগর ও স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যায়, তখন সাগরের জাহাজ ও স্থলভাগের গাছপালা ও ঘরবাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে তছনছ করে দেয় এবং সেই সাথে ঘটায় ব্যাপক প্রাণহানি।

୫. ଡୃପୃଷ୍ଠର ଗଭୀର ଖାଦସମୂହରେ ଅନ୍ଧକାରେ ଅସତର୍କ ସଫରକାରୀର ଜନ୍ୟ ରଯେଛେ ଭୟାବହ ବିପଦ । ତାହାଡା, ଏ ଧରନେର ଅନ୍ଧକାର ଗହବରେ ତଳାୟ ଥାକତେ ପାରେ ଜମେ ଧାକା କ୍ଷତିକର ବିଷାଙ୍ଗ ଗ୍ୟାସ ।

୬. ଗଭୀର ସାଗରରେ ଆଧାର ମାନେଇ ଡୁବେ ମାରା ପଡ଼ାର ବିପଦ ।

୭. ସାଗରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗମାଲା ସାଗରବକ୍ଷକେ ବିକ୍ଷୁଳ କରେ ତୋଲେ ଯାର ନିଚେଇ ଥାକେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର । ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ନୌକା ଓ ଜାହାଜକେ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଶକ୍ତିତେ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ଧାକା ମେରେ ପାନିର ନିଚେ ତଳିଯେ ଦେଇ ।

୮. ଡୁଗର୍ଭେର ଗଭୀରେ ଆଧାରେଇ ରାଜତ୍ୱ ସେଥାନେ ଉଂପଣ୍ଡି ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟେର । କାରଣ ସେଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଅଗ୍ର୍ୟାଂପାତ ଘଟେ । ଏଭାବେ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେର ଏବଂ ମାତ୍ରାର ବିପର୍ଯ୍ୟ ହୁଲଭାଗ ଓ ସାଗରେର ଅନ୍ଧକାରେର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଆମ୍ବାହୁଇ ଆମାଦେରକେ ତାଁର କରଣ୍ୟ ଏ ସକଳ ବିପର୍ଯ୍ୟ ଥେକେ ବାଁଚିଯେ ରାଖେନ ।

‘وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالرُّصُنَ’<sup>۴۳</sup>

୬ : ୭୩ ତିନି ସଥାନୁପାତେ ଆକାଶମଞ୍ଜୀ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେହେନ ।

ବୃଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିସହାସହ ଆକାଶମଞ୍ଜୀ ଓ ପୃଥିବୀର ସରଦ୍ରାଇ ସଠିକ ଅନୁପାତେ ଚିହ୍ନ ବିଦ୍ୟମାନ । ଆମାଦେର ପୃଥିବୀତେ ବୃଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଓ ତାର ଉନ୍ନତିର ଜନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାକ୍ତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରା ହେଁବେ । ବିଶେର ସକଳ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଘଟନା ବା ବିଷୟାବଳୀ ଏବଂ ନଭୋମଞ୍ଜୀର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଟିକଯେକ ପ୍ରାକ୍ତିକ ନିୟମ ଏବଂ କ୍ରମକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଁବେ, ଯେମନ- ମୌଲିକ ପଦାର୍ଥର କଣାର ଭର ଏବଂ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଲିକ ବଲଗୁଲୋର ଶକ୍ତି । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରେ ବରଂ ଏକଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟ ବିରାଜ କରାରେ ।

ଦୁଃ୍ଟାନ୍ତସହନପ, ପାରମାଣବିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସାଥେ ଜଡ଼ିତ ରଯେଛେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନବିକ ବଲ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଲେର ଭାରସାମ୍ୟ । ପ୍ରଥମଟି ଦୁ'ଟି ପ୍ରୋଟନକେ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଆର ପରେରଟି ତାଦେରକେ ବିକର୍ଷଣ କରେ । ଆମରା ଏଇ କ୍ରିୟା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସାଥେ ଯେତାବେ ଜଡ଼ିତ ତାତେ ଏଇ ଭାରସାମ୍ୟ କୁରେର ମତ ପାତଳା ଆର ଚାକୁର ମତ ଧାରାଲୋ ବଲେ ପ୍ରତୀଯମାନ ହୁଏ । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନବିକ ବଲ ଯଦି ହତ ସାମାନ୍ୟ କିଛୁଟା ଦୁର୍ବଲ, ତାହଲେ ପରମାଣୁର ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ କଣାସମୂହ ଯୁକ୍ତ ହେଁ ପରମାଣୁର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ତୈରି କରାତେ ପାରନ୍ତ ନା । ଯାତ୍ର ଏକ ଧରନେର ପରମାଣୁ ପାଓଯା ଯାବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ (ଯାର ନିଉକ୍ଲିଯାମେ ଏକଟି ପ୍ରୋଟନ ଥାକେ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଲିକ ପଦାର୍ଥ ସଥା କାର୍ବନ, ଅକ୍ରିଜେନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯେଶ୍ଲୋ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନେର

অতিভূতি সভ্য হত না। অপরদিকে, শক্তিশালী আনবিক বলটি যদি আরো সামান্য খানিকটা শক্তিশালী হত, তাহলে মহাবিশ্বের সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হত এবং আর কোন হাইড্রোজেন থাকত না। আমাদের নিকট হাইড্রোজেন অপরিহার্য দু'ভাবে : হাইড্রোজেন জীবকোষ গঠনকারী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটা হচ্ছে সেই জ্বালানী যা সূর্য ও অন্যান্য তারকাকে কোটি কোটি বছর ধরে দীক্ষিয়ান রাখছে।

পরমাণু অভ্যন্তরস্থ কণাসমূহের বাস্তব ভরও গুরুত্বপূর্ণ। যদি প্রোটোনসমূহের ভর পরমাণুতে প্রদক্ষিণরত ইলেক্ট্রনসমূহের তুলনায় এক হাজার অট্টশত ছুটিশ গুণ ভাবী না হত তাহলে, রসায়ন বিজ্ঞান হত ভিন্ন রকম; বিশেষ করে জীবনের জন্য অপরিহার্য অগুসমূহ (যেমন আমিষ ও ডিএনএ) স্থিতিশীল হত না। পৃথিবী যদি শতকরা মাত্র কয়েক পয়েন্ট সূর্যের আরো কাছাকাছি হত, তাহলে এর অবস্থা হত শুরু গ্রহের ন্যায় অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের পুরু আবরণের অভ্যন্তরে এক আগুনে সেঁকা উৎপন্ন বস্তু। আর যদি মাত্র শতকরা একভাগ অধিক দূরবর্তী হত তাহলেই পৃথিবী স্থায়ীভাবে হয়ে পড়ত বরফে আচ্ছাদিত, ঠিক মঙ্গল গ্রহের মত।

যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রথম সেকেন্ডে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হার তুচ্ছ ও সামান্যতম মাত্রায় কম হত, তাহলে এখানে কোন জীবের ক্রমবিকাশ ঘটার বহু পূর্বেই মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত। বিপরীত পক্ষে, যদি ঐ সম্প্রসারণ হার একেবারেই সামান্যতম মাত্রায় বেশী হত, তাহলে সম্প্রসারণ এত ব্যাপক মাত্রায় ঘটত যে, এখানে মাধ্যাকর্বণীয়ভাবে আবদ্ধ কোন ব্যবস্থা (তথা ছয়াপথ, তারকা ইত্যাদি) গড়ে উঠতে পারত না। এভাবে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে আল্লাহ আকাশবঙ্গে ও পৃথিবীকে সঠিক অনুপাতেই সৃষ্টি করেছেন।

إِنَّ اللَّهَ فَالِئِي الْحَبْتُ وَالْئَوْيَيْ بِمُخْرِجِ الْحَقِّ مِنَ الْمُبَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمُبَيْتِ  
مِنَ الْجَيْ دِلِكُمُ اللَّهُ فَأَنِّي تُؤْكُونُ ○

৬ : ৯৫      আল্লাহই শস্যবীজ ও অঁচি অঙ্কুরিত করেন, তিনিই আণহীন থেকে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত থেকে আণহীনকে নির্গত করেন; এই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে?

শস্যবীজ ও শক্ত খেজুরবিচির পল্লবিত হওয়া : আলোচ্য আয়াতটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করে বিবেচনা করা যেতে পারে; যথা : ১. বীজের অঙ্কুরোদগম এবং ২. মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃত হওয়ার প্রাকৃতিক চক্র।

୧. ଏ ଅଂশେ ସର୍ବଶତିମାନ ଆଲ୍ଲାହୁ ପ୍ରକୃତିତେ ବିଦ୍ୟମାନ ଶିଳ୍ପ ମୈପୁଣ୍ୟେ ଏକଟା ଦିକେର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରଛେ ଯାତେ ଏମନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଯା ଆମାଦେର ନିକଟ ଦୃଶ୍ୟତ ଖୁବଇ ସାଦାମାଟା ମନେ ହୁଏ, ଯେମନ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମେ ବୀଜେର ଫେଟେ ବିଭକ୍ତ ହେଁ ଯାଓଯା । ବୀଜେର ଆବରଣ, ଏକଟି ଜ୍ରଣ ବା ଜାୟମାନ ଚାରାଗାଛ ଏବଂ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଲାକାଲେ ସମାବେଶେର ଜନ୍ୟ ବୀଜପତ୍ର କିଂବା ଏଭୋସ୍‌ପାର୍ମ ନାମେ ଏକଟା କଲାଯ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରଚୂର ପୁଣି ଉପାଦାନ ନିଯେ ବୀଜ ଗଠିତ । ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ଥେକେ ଆଲାଦା ହବାର ପର ବୀଜସ୍ତୁ ଜ୍ରଣକେ ନିଜ ଥେକେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏଯା ଶୁରୁ କରାର ଜନ୍ୟ ଭିତର ଓ ବାହିରେ ଉତ୍ତ୍ବ ରକମ ଅନୁକୂଳ ଅବଶ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନା ହୁଏଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଟା ସମୟ, କଥନ୍ତି କଥନ୍ତ ସୁମ୍ମତ ଅବଶ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କରାତେ ହୁଏ ।

ଖୁବଇ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିତେ କିଛୁ କିଛୁ ବୀଜେର ଭାଲ ଥାକାର ସଭାବନା ଅନିଦିତ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଆଚ୍ୟଦେଶୀୟ ପଥଫୁଲ (ନେଲାମବିଯାମ ନୁସିଫେରା) ଦୀର୍ଘଯୁତାର ଦିକ ଥେକେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଯାର ବୀଜ କାର୍ବନ-୧୪ ସନ ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରମାଣାନ୍ୟାୟୀ ସଫଳତାର ସାଥେ କୟାକେ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାବ୍ଦ ସୁଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟା ଟିକେ ଛିଲ । ୧୯୫୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମୁହଁ ଟୌକିଓର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକଟା ପାଟ କଯଳା ଥିଲି ଥେକେ ଉନ୍ଦାରକୃତ ଏ ରକମ ତିନଟି ବୀଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତକ ବିଶେଷ ଯହେର ପର ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ଘଟିଯେଛେ ଏବଂ ତାଦେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମନ୍ତିତ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେଛେ ।<sup>୧</sup> କିନ୍ତୁ ଏ ରେକର୍ଡିଓ ଭଙ୍ଗ କରେଛେ ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଲୁପାଇନ (ଲୁପିନାସ ଆର୍କଟିକାସ) ବୀଜ ୧୯୬୭ ମାର୍ଚ୍ଚାନ୍ତିରେ; କାନାଡାର ଉକୋନେର ଏକ ଜମାଟବୌଧା ଗର୍ତ୍ତ ଏହି ବୀଜ ପାଓଯା ଯାଇ, କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ତଥା ସନ ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷାଯ ଯାର ବୟବ କମପକ୍ଷେ ଦଶ ହାଜାର ବର୍ଷ । ଏ ସକଳ ବୀଜେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ନମୁନା ବୀଜ ୪୮ ଘନ୍ଟାର ମଧ୍ୟେ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ଘଟାଯାଇଥାଏ ।<sup>୨</sup>

ବୀଜେର ସୁମ୍ମତ ବା ସୁଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ସାଧାରଣ କାରଣେର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ଭାବରେ ଦୈହିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣପତା ଏବଂ ବୀଜାବରଣେର ପକ୍ଷେ ପାନି ଏବଂ କଥନ୍ତ କଥନ୍ତ ଅଭିଜନେର ସାଥେ ଅଭେଦ୍ୟ ହେଁ ପଡ଼ା । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ ଖେଜୁର ବିଚିର ରଯେଛେ ବିଶେଷଭାବେ କଠିନ ଓ ପ୍ରତରବ୍ଦ ଆବରଣ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ତଥନଇ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ଘଟାଯା ଯଥିନ ବୀଜାବରଣଙ୍କ ବାଧାଦାୟକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥମୟହ ବୃଦ୍ଧିପାତେର ଦରଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁଇୟେ ବା ନିଷ୍କାର୍ଷିତ ହେଁ ଯାଇ ଯା ମର୍ମଭୂମିତେ ଅନେକଦିନ ପର ପରଇ ଶୁଦ୍ଧ ଘଟେ ଥାକେ ।

ଅଧିକାଂଶ ବୀଜଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ, ଯାର ମଧ୍ୟେ ଶାଭାବିକଭାବେ ପାନିର ପରିମାଣ ଥାକେ ମୋଟ ଓଜନେର ମାତ୍ର ୫% ଥେକେ ୨୦% ଭାଗ । କାଜେଇ, ବିପାକ କ୍ରିୟାର ଜନ୍ୟ ଅପରିହାର୍ୟ ପାନି ଶୋଷଣ ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀଜେର ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । ପାନି ଶୋଷଣ ବଲତେ ବୁଝାଯ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତୁ ତଥା କାଠ, ଶିରିସ ଆଠା ଏବଂ ଦେଲୁଲୋଜେର ଦିକେ ପାନିର ଅଣୁର ଚଲାଚଲ ବା ପ୍ରବାହ, ଶେଷୋକ୍ତଟି ହଞ୍ଚେ ଉତ୍ତିଦ କୋଷ ପ୍ରାଚୀରେ ଉପାଦାନ ।

পানি শোষণ দ্বারা সৃষ্টি স্থিতিশক্তিগত চাপ বিশ্বয়করভাবে উচ্চমাত্রার হতে পারে। পানি শোষণকারী বীজের আকার তাদের মূল আকারের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে বেশ চাপ সৃষ্টি হয়ে বীজাবরণ ফেটে যেতে পারে। অধিকাংশ বীজ থেকে প্রথম যে দেহবস্তু বের হয় তাহলো জগ মূল যা ধনাঘাতকভাবে জিওট্রিপিক অর্ধাং মাটির ভিতরের দিকে বাড়ে এবং চারা গাছকে মাটির সাথে আটকে রাখে ও পানি শোষণ করে। এরপর গজায় অঙ্কুর যা ঝণাঝকভাবে জিওট্রিপিক অর্ধাং মাটি থেকে উল্টোদিকে বেড়ে উঠে। অঙ্কুরোদগমকালে বীজের অভ্যন্তরে জমাকৃত খাদ্য হজম হয় এবং বর্ধনশীল অংশগুলোতে পরিবাহিত হয়।

ঘটনাক্রমে, অত্র আয়াতে যে দু'টি বীজের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সুপ্তাবস্থার দুই প্রাত্তসীমার প্রতিনিধিত্বমূলক। শস্য বীজটি প্রতিনিধিত্ব করে খাদ্যশস্য দানার, যার রয়েছে অত্যন্ত পাতলা বীজাবরণ এবং ন্যূনতম সুপ্তাবস্থার সময়কাল, আর ভারী ও কঠিন দেয়াল বিশিষ্ট খেজুর বিচিটি সুপ্তাবস্থায় থাকে দীর্ঘ সময় ধরে।

২. দৃশ্যাত একটি মৃত বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমকে কখনও কখনও একটা নতুন উদ্ভিদের জীবনের সূচনা হিসেবে দেখা হয়। আবার বীজ গঠনের অর্থ একটি উদ্ভিদের জীবন-ইতিহাসের সমাপ্তি। এ বিষয়টি ২৪: ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সুপ্তাবস্থা কিংবা আপাত মৃত্যুর ব্যাপারটা অন্যান্য উদ্ভিদ দেহেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন— উষ্ণ জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া বৃক্ষরাজির ভূগর্ভস্থ কিংবা বায়ুস্থিত কান্ত। ড্যাফোডিল ও টিউলিপ গাছের কন্দ এক ধরনের শীত নির্দায় যাবার আগেই তাদের পাতা ও ফুল হারায়। একই অবস্থা পাতাখরা গাছের, যেগুলো শরৎকালে যখন তাদের বিপাক ক্রিয়াদি সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায় তখন তাদের সমস্ত পাতা বরায়। বসন্তের আবহাওয়ার আগমনে নতুন কর্মতৎপর বার্তা বয়ে আনে যাতে নতুন নতুন কুঁড়ি ও মুকুলে তরে উঠে বৃক্ষরাজি যা পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে পরবর্তী শীতকাল না আসা পর্যন্ত। কেননা, শীতকালের আগমনে সজীবতা হারিয়ে বৃক্ষরাজি হয়ে পড়ে নির্জীব। আর এভাবেই পূর্ণ হয় জীবন থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জীবনের প্রাকৃতিক চক্র।

### তথ্য সূত্র :

1. Went. F. W. The Plants. Time-life International (Netherland). p. 94, 1968.
2. Raven. R. H. Biology of Plants, 3rd ed. Worth Publishers inc, New York, p. 529. 1981.

فَالْيُّ الْإِصْبَاحُ وَجَعَلَ الْأَنِيلَ سَكِّنًا وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا  
ذِلِّكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

৬ : ৯৬ তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত আর গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।

তৃপ্তিষ্ঠ যে কোন স্থানে (যেকুন অঞ্চলসমূহ বাদে) রাত ও দিনের আবির্ভাব ঘটে পৃথিবীর নিজ অঙ্কের চারদিকে আঙ্কিক গতির কারণে। এই ঘূর্ণন চলাকালে যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর অর্ধাংশ সূর্যালোকে আলোকিত থাকে এবং যে সময়কাল ধরে এ অংশ আলোকিত থাকে তাকে এই অংশের দিন বলা হয়। একই সাথে, পৃথিবীর অপর অর্ধাংশ কোন সূর্যালোক পায় না, যার ফলে আঁধারে নিমজ্জিত থাকে। আর যে সময়কাল ধরে এই অংশ অঙ্ককার থাকে তাকে এই অংশের রাত বলা হয়। ঘূর্ণন যেহেতু চলতে থাকে সেহেতু একই স্থানে পর্যায়ক্রমে রাত ও দিন আসে। রাত্রি থেকে দিবসে সংক্রমণ এবং এর বিপরীত ক্রম ঘটে ক্রমাবর্যে, আকশিকভাবে নয়।

সূর্যরশ্মি যখন ক্রমাবর্যে রাতের অঙ্ককার ভেদ করতে থাকে এবং বলতে গেলে আঁধার কেটে ফেলে তখনই ঘটে ভোরের আবির্ভাব। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ পৃথিবী ও সূর্যকে যে সকল শক্তির অধীন করে দিয়েছেন সেগুলোর কারণেই উষা আসে। অন্য কথায়, আল্লাহই রাতের আঁধার কেটে ভোরের আগমন ঘটান।

দিবসের ক্লেশকর খাটুনির পর রাতে অঙ্ককারের আবরণে ব্যাপক নিরবতা-নিষ্ঠকৃতা নেমে আসলে আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করি। আমরা ঘুমিয়ে পড়ি এবং পরদিন সকাল বেলায় পরিপূর্ণ সজীবতার সাথে জেগে উঠি, ক্রান্তি তখন একদমই থাকে না। এর ফলে, আমরা নতুন উদ্যয়ে আগামী দিনটির মোকাবিলা করতে সক্ষম হই। কাজেই, আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ রাত্রি বানিয়েছেন আমাদের বিশ্রাম, উদ্যয় পুরুষাকার আর শান্তি-স্বত্ত্বের সময়কাল হিসেবে।

সূর্য ও চন্দ্র সময় গণনার জন্য ৪ আয়াতটির এ অংশে আল্লাহ বলছেন যে, সূর্য ও চাঁদকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কাজকর্মের সময় গণনার সুবিধার্থে। সময়ের তিনটি প্রাকৃতিক ইউনিট বা একক আছে, যথা : দিন, মাস ও বছর। দিন ও বছর পরিমাপ করা হয় সূর্যের আপাত গতির দ্বারা আর মাস গণনা করা হয়ে থাকে চাঁদের আপাত গতির দ্বারা। এক সৌর দিবস হচ্ছে সেই পরিমাণ

সময় যা সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে একবার আবর্তন করতে প্রয়োজন হয়। অন্য কথায়, একটি নির্দিষ্ট উল্লম্ব বিন্দুকে সূর্যের আপাত ত্রুটি পরস্পরায় অতিক্রমণের জন্য যে সময় লাগে সেই সময়। এই সময়টা হতে পারে দু'টি পরপর সূর্যোদয়ের মধ্যকার সময়, কিংবা সূর্যাস্তের অথবা মধ্যাহ্ন রেখা অতিক্রমণের সময়। বৈজ্ঞানিকভাবে সৌর দিবস বলতে সূর্যের পরপর দু'টি নিম্ন গমন মধ্যকার সময়কালকে বুঝায় অর্থাৎ কুবিন্দু বিশিষ্ট অংশে সূর্যের মধ্যাহ্নেরখা অতিক্রমণ। ধ্রুবতারার সাপেক্ষে পৃথিবীর আবর্তনকালকে বলা হয় নাক্ষত্র দিবস। এক নাক্ষত্র দিবস সৌর দিবস অপেক্ষা চার মিনিট ছোট এবং শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সৌর দিবস আবার দু'টি প্রাকৃতিক অংশে বিভক্ত, যথা : দিবাভাগ এবং নৈশভাগ। যে সময়কালে সূর্য দিগন্ত রেখার উপরে অবস্থান করে তা হচ্ছে দিন আর যে সময় ধরে সূর্য দিগন্ত রেখার নিচে থাকে তা-ই রাত। সাধারণভাবে মানুষ দিবাভাগে কাজকর্ম করে এবং নৈশকালীন সময়ে বিশ্রাম নেয়। দিনকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময় মাপার জন্য কৃত্রিমভাবে ঘন্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের মত উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

সূর্য যেহেতু ত্রাস্তিক্রমণ বরাবর বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গতিতে পরিক্রমণ করে বলে মনে হয়, সেহেতু একটা কল্পিত সূর্য আছে বলে ধরে নেয়া হয় (মান সূর্য নামে), যা বিশ্ববরেখা বরাবর একই গতিতে চলে বলে অনুমিত হয় এবং থুক্ত সূর্যের সারা বছরের গড় গতির সমান। মান সূর্যের পরপর দু'টি পরিক্রমণ তৃতীয় মধ্যকার সময়কাল মান দিবস হিসেবে পরিচিত। মান সূর্য অনুযায়ী পরিমাপকৃত সময় মান সময় হিসেবে পরিচিত।

চাঁদও একটি বিশিষ্ট সময় নিয়ন্ত্রক। চাঁদের কলা অব্যশ্যাবীরাপে অধিকাংশ ধর্মীয় কর্ম তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সূর্যের সাপেক্ষে চন্দ্রের কোন একটা নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে শূন্যমভলীতে প্রদক্ষিণ করতে করতে পুনরায় ঐ একই আপেক্ষিক অবস্থানে আসতে যে সময় লাগে অর্থাৎ পর পর দু'টি নতুন চাঁদের মধ্যবর্তী সময়কে (কিংবা অন্য কোন কলা) যাজকীয় মাস বলা হয়ে থাকে। যাজকীয় বা চান্দ্র মাস গড়পড়তা ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ২.৮ সেকেন্ড দীর্ঘ হয়ে থাকে। এটা আয়াদের পঞ্জিকা মাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চন্দ্রের নাক্ষত্র মাস বলতে বুঝায় সেই সময়কে যা চাঁদের শূন্যমভলে একটি নির্দিষ্ট তারকা পার হয়ে ঘুরে পুনরায় সেই একই তারকার নিকট চলে আসতে প্রয়োজন হয়। এটি গড়পড়তা ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট এবং ১১.৫ সেকেন্ড দীর্ঘ।

সময়ের তৃতীয় এককটির হিসাব হচ্ছে বছর। এটি সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তন গতি কিংবা রাশিচক্রের তারকাগুলোর মধ্যে সূর্যের আপাত গতি

ভিত্তিক। এটি চিহ্নিত হয় ঝুতু পরিবর্তন দ্বারা এবং রাতের আকাশে তারকাবাজির পরিবর্তনশীল নকশা এবং দিবাভাগে সূর্যের চলার গতিপথের পরিবর্তন দ্বারা। কোন ক্রিয়তারার সাপেক্ষে সূর্যের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ পূর্ণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাকে বলা হয় নাক্ষত্র বর্ষ এবং মহাবিষ্ণবীয় সময়কালকে (বসন্তকালে যখন দিন-রাতি সমান থাকে, অর্থাৎ ২১শে মার্চ) বলা হয় অয়নবৃত্তীয় বছর। এ দু'ধরনের বছরের মধ্যকার পার্থক্য ২০ মিনিট।

লক্ষ্য করা যায় যে প্রায় ১২টি যাজকীয় চান্দ্র মাসে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ ১২টি যাজকীয় চান্দ্র মাসে প্রায় এক নাক্ষত্র বছর হয়। আসলে বার চান্দ্র মাস (১২ যাজকীয় চান্দ্র মাস) এক নাক্ষত্র বছর অপেক্ষা ১১ দিন কম।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন সময় গণনার জন্য।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ الْجِئْمَمَ لِتَهْتَدُ دُبَيْهَا فِي طَلْمَتِ النَّرْ وَالْجَزْرِ  
قُلْ فَصَلَنَا الْأَيْتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

৬ : ৯৭ তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তাদ্বারা স্থলভাগ ও জলভাগের অঙ্ককারে তোমরা পথ খুঁজে পাও; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নির্দেশন বিশদভাবে বিবৃত করেছি।

বাতিঘর হিসেবে তারকারাজি :

অত আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, আসমানে তারকারাজি স্থাপন করা হয়েছে যেন তারা পথ দেখাতে পারে তাদেরকে যারা তারকারাজিকে চিনে এবং সঠিক পথ নির্দেশ করে তাদেরকে যারা সাগর ও মরুভূমির বিশালতা ও অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলে। এই নির্দেশনা যত্পাতি ও ছকের সাহায্যেও লাভ করা যায়, তাবার এগুলো ছাড়াও পাওয়া যেতে পারে।

যত্পাতি ও ছকের সাহায্য ছাড়া : পৃথিবীর যেহেতু নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তনশীল অক্ষটি যা উভয় দিকেই সম্প্রসারিত হবে ধরে নেয়া হয়, ডু-গোলকের দু'টি বিন্দুতে হেদ করে বলে মনে হয় যার একটি হচ্ছে উভয় মেরু এবং অপরটি দক্ষিণ মেরু। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে যদিও সমগ্র আকাশই আবর্তনশীল মনে হয়, এ দু'টি মেরু কিন্তু স্থিত থাকে; কাজেই, কেউ যদি মেরু কী তা চেনে, তার পক্ষে উভয় ও দক্ষিণ দিক জানাও সম্ভব। কিন্তু মেরুদ্বয়

যেহেতু কান্সনিক বিল্ড মাত্র, সে কারণে তাদের সঠিক অবস্থান জানা সম্ভব নয়। এ মেরুদণ্ডকে জানা সম্ভব যদি সেখানে বা তার কাছাকাছি কোন তারকা থাকে। উত্তর মেরুর নিকটে মেরু থেকে প্রায় এক ডিগ্রী দূরে আলফা উরসাই মাইনরিস নামে একটি দ্বিতীয় শ্রেণির তারকা রয়েছে। এটি জনপ্রিয়ভাবে পোলারিস অর্থাৎ ধ্রুবতারা বা মেরু তারকা হিসেবে পরিচিত যা উত্তর গোলার্ধের যে কোন স্থান থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। এই তারকাটি উরসা মাইনর বা হেট ভল্কুক গ্রহপুঁজের লেজের ঠিক উপর বরাবর অবস্থিত। কাজেই গ্রহপুঁজটি এবং এই তারকাটি যারা চেনে তারা সহজেই উত্তর দিক এবং তা থেকে অন্য সবাদিক চিনে নিতে পারে। দক্ষিণ মেরুতে এ ধরনের কোন তারকা নেই। তবে ক্রান্ত তথা দক্ষিণ ক্রস নামে পরিচিত একটি গ্রহপুঁজ এমনভাবে অবস্থিত যে, এর দীর্ঘতর হাতটি দক্ষিণ মেরুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কাজেই, দক্ষিণ গোলার্ধের লোকদের জন্য এই গ্রহপুঁজটি দক্ষিণ দক্ষিণ দিক নির্ণয়ে দিক নির্দেশ করে এবং এথেকে অন্যান্য দিকেরও সন্ধান দেয়।

অন্য আরেকটা বিষয়ও সুস্পষ্ট। ভূমতলীয় আকাশ যেহেতু আবর্তনশীল বলে মনে হয়, দৃশ্যত এর উপর আটকানো তারকাসমূহ পৃথিবীর চারদিকে ঘূরছে বলে অনুমিত হয় এবং একই তারকার দল নির্দিষ্ট কোন স্থানে অবস্থান করে। এভাবে বিটা টাউরি (আল নাথ), বিটা জেমিনোরিয়াম (পোলাঙ্গ), বিটা লিওনিস (ডেনেবোলা) তারকাগুচ্ছ সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং এ ধরনের আরো তারকাসমূহ মোটামুটি ঢাকা (বাংলাদেশ) বা এর আশপাশ দিয়ে বছরের বিভিন্ন দিনে ও সময়ে অতিক্রম করে যায়। একটা আলাদা তারকা নির্দিষ্ট একটা স্থান দিয়ে বিশেষ একটা দিনে এবং বিশেষ একটা সময়ে অতিক্রম করে। এভাবে বিটা জেমিনোরিয়াম প্রতি বছর ২৮শে মে সকাল ৯টায় মধ্যাহ্নরেখা পার হয়ে যায়। সাগর কিংবা মরুভূমির বিশালতায় বা অক্ষকারে শুধু যা করতে হবে তাহলো তার গন্তব্যের অবস্থানের দিক জানার জন্য তারকার দিকে তাকাতে হবে। তার যদি জানা থাকে তার গন্তব্যের উপর দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ তারকা অতিক্রম করে তাহলে তাকে শুধু ঐ তারাগুলোর অতিক্রমণ দিক জানতে হবে (যা তিনি ধ্রুবতারা পর্যবেক্ষণ করে পাবেন) এবং একটা তারা মাথার উপরে না আসা পর্যন্ত এদিকে চলতে থাকতে হবে এবং তাহলেই তিনি তার গন্তব্যে পৌছে গেলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কেউ যদি তারকা চিনে, তাহলে তারকাই তাকে সাগর ও মরুভূমির অক্ষকার ও বিশালতায় গন্তব্যের সন্ধান দেবে।

যন্ত্রপাতি ও ছকের সাহায্যে : সাগর ও মরুভূমির অক্ষকার ও বিশালতায় যন্ত্রপাতি ও ছকের সাহায্যে নিজের অবস্থান খুঁজে নেয়ার অন্যান্য আরো পদ্ধতি রয়েছে যা থেকে দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে।

ମେରୁର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେର ସ୍ଥାନେର ଅକ୍ଷାଂଶେର ସମାନ ଏକଥା ସବାରଇ ଜାନା । କାଜେଇ, ଏକଟା କୋନ ପରିମାପକେର ସାହାଯ୍ୟେ ମେରୁର ଉଚ୍ଚତା ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନେର ଅକ୍ଷାଂଶ ପାଓଯା ଯେତେ ପାରେ । ତବେ ମେରୁର ଅବସ୍ଥାନ ଜାନାଟାଇ ଦୁଇହ । ଧ୍ରୁବତାରା କିନ୍ତୁ ମେରୁମୁଠେ ଥାକେ ନା, ଥାକେ ମେରୁ ଥେକେ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ଦୂରେ । ଏହି ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଭୃପୃଷ୍ଠେର ଉପର ବିଶାଳ ବିଶ୍ଵତ୍ତ ଏଲାକା । କାଜେଇ କୋନ ସର୍ବୋକ୍ଷ ବିଶ୍ଵ ଦିଯେ ଅତିକ୍ରମକାରୀ ତାରକାର ବିଷୁବ ଲସ୍ (ତଥା ବିଷୁବ ରେଖା ଥେକେ ଐ ତାରକାର କୌଣିକ ଦୂରତ୍ବ) ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ପାଓଯା ଯାଯ । ଏଭାବେ ଐ ସ୍ଥାନେର ଅକ୍ଷାଂଶ ନିର୍ଣ୍ୟ କରା ଯାଯ । ଦ୍ରାଘିମାଂଶ ପରିମାପ କରା ହୁଯ ଗ୍ରିନଡ଼ାଇଚେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ରେଖା ଥେକେ ଏବଂ କୋନ ତାରକାର ଗ୍ରିନଡ଼ାଇଚ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମଣେର ମଧ୍ୟେ ସମୟେର ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଯ ତା ଦିଯେଇ ଦ୍ରାଘିମାଂଶ ବେର କରା ହୁଯ । ଏ ଦୁ'ଟୋ ସମୟେର ପାର୍ଥକ୍ୟକେ ସଥିନ କୌଣିକ ପରିମାପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରା ହୁଯ ତଥିନ ଐ ସ୍ଥାନେର ଦ୍ରାଘିମାଂଶ ପାଓଯା ଯାଯ । ଏଇ ଜନ୍ୟେ ଦରକାର ଏକଟା ଗ୍ରୀନିଚ ମାନ ସମୟ ଦାନକାରୀ ଘଡ଼ି ଆର ଏମନ ଏକଟା ବର୍ଷପଞ୍ଜି ଯା ଥେକେ ଏକଟା ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ତାରକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗ୍ରିନଡ଼ାଇଚ ଉତ୍ତର ଜାଯଗାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରାର ସମୟ ପାଓଯା ଯାଯ ।

ଆରୋ ଏକଟା ପଦ୍ଧତି ଆଛେ ଯା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତଲଭାଗ, ସାଗର କିଂବା ଆକାଶେର କୋନ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେର ଅବସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ୟ ବା ଶନାକ୍ତ କରା ଯାଯ ।

ଏ ପଦ୍ଧତିତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପରିଭାଷାଗୁଲୋ ବ୍ୟବହରିତ ହୁଯେ ଥାକେ :

୧. ଡେଡ୍-ରେକନିଂ ପଜିଶନ : ଗତିବେଗ, ଅତିକ୍ରମଣ ବା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣକାଲୀନ ସମୟେର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଅତିକ୍ରମଣେର ଦିକ ବା ଦିକସମୂହ ବିବେଚନା କରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ ପାଓଯା ଯାଯ ତା-ଇ ଡେଡ୍-ରେକନିଂ ପଜିଶନ ବା ଅବସ୍ଥାନ ହିସେବେ ପରିଚିତ ।

୨. ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ୟାଲ ବା ଭୌଗୋଲିକ ଅବସ୍ଥାନ : କୋନ ଏକ ମୁହଁରେ ନିର୍ବାଚିତ ତାରକାର ଠିକ ନିଚେ ଅବଶ୍ରିତ ଭୃ-ପୃଷ୍ଠେର ବିଶ୍ଵାଇ ଐ ତାରକାର ଭୌଗୋଲିକ ଅବସ୍ଥାନ ହିସେବେ ପରିଚିତ ।

୩. ଏୟାଜିଉମ୍ଡ ବା ଅନୁମିତ ଅବସ୍ଥାନ : ଡେଡ୍-ରେକନିଂ-ଏର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକଟା ଅବସ୍ଥାନ ଯା ସଞ୍ଚାର୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ ହିସେବେ ଅନୁମିତ ହୁଯ ତା-ଇ ଅନୁମିତ ଅବସ୍ଥାନ ହିସେବେ ପରିଚିତ ।

ପୁରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂକଷିତାକାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପଦ୍ଧତିପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟେ ଗଠିତ :

- ଏକଟି ଅନୁମିତ ଅବସ୍ଥାନ (ଧରା ଯାକ ଜାହାଜେର) ଡେଡ୍-ରେକନିଂ କିଂବା ଅନ୍ୟ କୋନ ପଦ୍ଧତିତେ ନିର୍ବାଚନ କରା ଯେତେ ପାରେ ।
- ଏକଟି ତାରକା (ବା ଅନ୍ୟ କୋନ ଯାକ ଜାହାଜାଗତିକ ବନ୍ଦୁ) ନିର୍ବାଚନ ଓ ଏର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାତେ ହେବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେର ସମୟ ଲିଖେ ରାଖିବେ ।

৩. প্রাণ উপাস্ত থেকে তারকার দিগ্বলয় তথা এই তারকার ভৌগোলিক অবস্থানের চাপ নির্ধারণ করতে হবে। অনুমিত অবস্থানে এই তারকার হিসাবকৃত উচ্চতা বের করতে হবে।
৪. পর্যবেক্ষণকৃত ও হিসাবকৃত উচ্চতাসমূহ তুলনা এবং মিনিটে বৃত্তচাপের পার্থক্য পরিমাপ করতে হবে। তারপর চাপের সাথে সমকোণে অবস্থান লাইন (গ্রীষ্ম লাইন) আঁকতে হবে।
৫. দ্বিতীয় আরেকটা তারকার ব্যাপারে একই রকম কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে হবে। দু'টি গ্রীষ্মলাইনের ছেদবিন্দুই (অবস্থান লাইনসমূহ) জাহাজটির সঠিক অবস্থান।

প্রশ্ন করা হতে পারে, তারকাসমূহ দৃষ্টিগোচর না হলে কীভাবে নৌচলাচল করা হবে। আল্লাহ্ মানুষকে অন্যান্য আরো কার্যপদ্ধতি দান করেছেন যা ঐ ধরনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

٩٩-رَهُوا لِنَّىٰ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاؤْ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا  
مِنْهُ خَضْرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّاً مُدَرَّكًا ۝ وَمِنَ الْجُلْفِ مِنْ طَلْعَهَا قَنْوَانٌ  
دَائِنَةٌ ۝ وَجَنَتٌ مِنْ أَغْنَابٍ وَالْأَزْيَسْوَنَ وَالرُّمَانَ مُشَبِّهًا ۝ وَغَيْرَ  
مُشَبِّهٍ ۝ انْظُرُوا إِلَىٰ تَمَرَّهُ إِذَاً أَشْرَوْيَنِعَهُ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ  
لَذَّاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

৬ : ৯৯ তিনিই আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তাদ্বারা আমি সর্বপ্রকার উত্তিদের চারা উধান করি; অতঃপর তাথেকে সবুজ পাতা উদগত করি, পরে তাথেকে ঘন সর্বিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি, এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলস্ত কাঁদি নির্গত করি। আর আঙুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও দাঙিষ্পত্র; এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও; শক্ত কর এর ফলের প্রতি যখন এগুলো ফলবান হয় এবং এর পরিপন্থতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্পদায়ের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে নির্দর্শন।

আল-কুরআনের এই অংশে, ইউসুফ আলী<sup>১</sup> যেমন বর্ণনা করেছেন, আক্ষরিক অর্থে এটি এত সুস্থাদু এবং আধ্যাত্মিক অর্থে এমন নিষ্ঠ বা প্রগাঢ় খোদায়ী

করণাসমূহ যা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সুবিধাজনকভাবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে :

১. আল্লাহ কর্তৃক আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, ২. সকল প্রকার সবুজ গাছপালা ও শস্য ফলদির বেড়ে উঠা, ৩. ঘন শস্যগুচ্ছের উৎপাদন, ৪. শীষ থেকে খেজুর গুচ্ছ ঝুলে থাকা, ৫. আঙুর বাগান, ৬. জলপাই, ৭. দাঢ়িয়ে ফল, ৮. এসবের প্রতিটি প্রকারগতভাবে একই রকম কিন্তু জাতে ভিন্ন ভিন্ন, ৯. পক্ষ ফল চশুর জন্য তৃণিদায়ক বা নয়ন জুড়ানো, এবং ১০. একটা অনুস্মারক যে, এ সকল প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে ঈমানদারদের জন্যে নির্দর্শন রয়েছে।

আসমান থেকে বৃষ্টি :

১. আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টি ২ : ১৬৪ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. সবুজ গাছপালা : বিষয়টি বৃষ্টিপাতের উপকারক প্রভাব সম্পর্কিত যার ফলে সবুজ গাছপালা বেড়ে উঠে। 'নাবাতা' = শব্দটি দ্বারা সাধারণভাবে গাছপালা বুঝান হয়ে থাকে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল সবুজ উত্তিদ যাদের রয়েছে সবুজ তত্ত্বরঞ্জক ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ যা তাদেরকে নিজেদের জন্য শর্করা জাতীয় খাবার তৈরি করতে সক্ষমতা প্রদান করে। তবে গাছপালার মধ্যে এমন কিছু ফলও অন্তর্ভুক্ত যারা পত্রহরিৎ বহিত, যেমন ছাঁচাক ও অণুজীব। পৃথিবীর সবুজ বেষ্টনী বা আবরণের মধ্যে বেড়ে উঠা এবং স্থায়িভু নির্ভর করে পানির বা আর্দ্রতার উপর যা অঙ্কুরোদগমের জন্য অপরিহার্য উপাদান এবং যা সালোক সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে এবং নতুন কুঁড়ি ও পল্লব উৎপাদন তৃরিকিত করে। উত্তিদ জগৎ অত্যন্ত বিশাল ও বিস্তৃত যাতে রয়েছে বৃক্ষরাজির মোট সাড়ে তিন লক্ষ বর্গ (species)। বিশাল এই উত্তিদ জগতকে ব্যাপক অর্থে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা : সপুষ্পক উত্তিদ এবং অপুষ্পক উত্তিদ যারা অন্যান্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে থাকে। সবুজ উত্তিদ আকার-আকৃতি ও গঠন-কাঠামোর দিক থেকে বহু প্রকারের হয়ে থাকে - আণুবীক্ষণিক এককোষী শৈবাল ক্লোরেলা থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়াস্থ ১৭০ মিটার উচ্চতা ও ১১ মিটারের অধিক ব্যাস বিশিষ্ট সপুষ্পক উত্তিদ রেড-উড পর্যন্ত। মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা এবং ঝুঁটির ছাতার মত ছাঁচাক আর আণুবীক্ষণিক অণুজীবের সবুজ তত্ত্বরঞ্জক ক্লোরোফিল না থাকায় শর্করা তৈরি করতে পারে না। এরা মৃত এবং পচনশীল বা ক্ষয়িক্ষ জৈব বস্তু খেয়ে জীবন ধারণ করে কিংবা ধ্বংসকারক বা ক্ষতিকর কীট হিসেবে জীবদেহের উপর নির্ভর করে। এ সকল অসবুজ উত্তিদের বৃক্ষিও আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল যা বৃষ্টিপাতের পর বৃক্ষি পায়।

**৩. শুচ বা ঝাড় শস্যদানা :** দানাদার শস্য বা খাদ্যশস্য তৃণ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষ ও গৃহপালিত জীবজন্মুর খাদ্যের সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এগুলোর মধ্যে থাকে প্রধানত শর্করা এবং সেই সাথে কিছু আমিষ এবং খানিকটা খনিজ লবণ ও খাদ্য প্রাণ। তথাকথিত এই দানাদার শস্য আসলে তৃণ পরিবারের বৈশিষ্ট্যমূলক ফল যার বীজাবরণ ফলের দেয়ালগাত্রের সাথে মিশে থাকে। দানা বিশিষ্ট শস্যের অধীনে অসংখ্য প্রকার শস্য রয়েছে যার মধ্যে আছে গম, চাল, বার্লি, জোয়ার, ভুট্টা, জই ও রাই প্রধান। অত্র আয়াতে ঝাড় শস্যদানার উল্লেখ অত্যন্ত যথাযথ। কেননা, খাদ্যশস্যের শীমে শস্যদানার বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক ঘন বাঁধন বা বিন্যাসের কারণে এটাই স্বাভাবিক।

**৪. খেজুর :** আরবীয় খর্জুর বৃক্ষ (ফিনিস্ক ড্যাক্টিলিফেরা) এক ধরনের ফলের গাছ। মধ্যপ্রাচ্যে সুপ্রাচীনকাল থেকে তথা কমপক্ষে খ্রিঃপূঃ তিন হাজার সাল থেকে এর চাষাবাদ হয়ে আসছে বলে রেকর্ড আছে। খেজুর গাছের শুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক এবং উত্তর আফ্রিকা, আরব, ইরাক এবং ইরানের অধিবাসীদের বেশ বড় অংশ বেঁচে থাকার জন্য এর ফলের উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। পুরুষ ও স্ত্রী খেজুর গাছ আলাদা এবং চাষীকে প্রতি ৫০ থেকে ১০০ স্ত্রীগাছের জন্য একটি মাত্র পুরুষ গাছ লাগাতে হবে। পুরুষ হোক কী স্ত্রী হোক, একটা ফুলের গুচ্ছে থাকে এক শতাধিক সরু সরু শীষ দ্বারা আবৃত শাখা যা ফুলগুলোকে কুঁড়ি অবস্থায় নিরাপদে রাখে। কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে ফলের মোট বা বাঁকের উন্ময়ন সাধন সম্ভব। অধিকাংশ চাষী শীষ থেকে ফুল-পূর্ব শাখাসমূহ বের হওয়ার সময় পুরুষ ফুলের গুচ্ছ কেটে স্ত্রী ফুলের থোকাপূর্ণ শাখাগুলোর ভিতর লাগিয়ে দিয়ে এটা করে থাকে। খেজুর গাছ চারা লাগানোর ৪-৫ বছর পর থেকে ফল ধরা শুরু করতে পারে এবং ১৫ বছর পর পরিপূর্ণ ফল ধরে এবং ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত ফল দেয়া অব্যাহত রাখে। একটা ভাল ফল গুচ্ছে ৪০টির মত সূত্র থাকে, যার প্রতিটিতে থাকে ২৫-৩৫টি খেজুর। পাকা ফলের ভারে এ রকম ঘন ও ভারী থোকা স্বাভাবিকভাবে গাছে ঝুলত্ব অবস্থায় থাকে যা না ফাটা পর্যন্ত চোখের জন্যেও আনন্দদায়ক। গাছ প্রতি গড়পড়তা বার্ষিক ১০০ পাউন্ড ফল হয় যা ভাল গাছের ক্ষেত্রে ১৫০ পাউন্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রায় হাজার জাতের খেজুরকে মোটের উপর তিনিটি বড় বড় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা : ১. নরম খেজুর যাতে ৬০% চিনি বা শর্করা থাকে যা প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট। ইরাকে এই খেজুর ব্যাপকভাবে জন্মানো হয় এবং চাপ প্রয়োগে সঙ্কুচিত করে বিদেশে রপ্তানী করা হয়ে থাকে। ২. মধ্যম বা অর্ধ-গুচ্ছ খেজুর যা নরম কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণের মত যথেষ্ট শর্করা বা চিনি যাতে থাকে না। এগুলো দ্রুত গুচ্ছ হয় না এবং সাধারণত গাছ থেকেই

সতেজ ଅବସ୍ଥା ଥାଓযା ହୁଏ । ୩. ଶୁଷ୍କ ଖେଜୁର ଯା ଏକଦମ ଶକ୍ତ ଏବଂ ଏମନକି ପାକା ଅବସ୍ଥାଯାଙ୍କ ଆଠାଲୋ ନାହିଁ । ଏଗୁଲୋକେ ଗାଛେଇ ଶୁକାତେ ଦେଇଯା ହୁଏ ଏବଂ ଗାଛେ ଯଥିନେ ଫଳ ଥାକେ ନା ତଥନ ଜମା କରେ ରାଖା ଯାଏ । ଖେଜୁର ଉତ୍ତପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳସମୟରେ ଏ ଧରନେର ଖେଜୁରର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ରଯେଇଛେ । ଏ ସକଳ ଖେଜୁରର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠି ମୂଲ୍ୟ ରଯେଇଛେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହାରେ ଚିନି ବା ଶର୍କରା ଉପାଦାନେ ଯାର ପରିମାଣ ନରମ ଖେଜୁରେ ୬୦% ଭାଗ ଥିଲେ କୌଣ କୌଣ ଶୁକନୋ ଖେଜୁରେ ୭୦% ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଯେ ଥାକେ । ଏଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ କିଛି ପରିମାଣ ଏ-୧, ବି-୧ ଏବଂ ବି-୨ ଖାଦ୍ୟପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିକୋଟିନିକ ଏସିଡ଼ ଓ ରଯେଇଛେ ।

**୫. ଆଶ୍ରୁ ବାଗାନ :** ଭିଟିସ ଭିନିଫେରା (*vitis vinifera*) ଏବଂ ଏର ଅନେକ ଜାତାକୁ ମରଦ୍ରାକ୍ଷା, ମଦ୍ରାକ୍ଷା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ କରେ ରାଖାର ମତ ଜାତ ତଥା କିଶମିଶ, ମନାକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଲତାନାର ଉତ୍ସ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଥିଲେ ଆଶ୍ରୁ ଅନ୍ୟତମ ଚାଷାବାଦକୃତ ଗାଛ ଯା ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରେ ହେଯ ସହମ୍ରାଧିକ ବହର ଧରେ ପରିଚିତ । ପ୍ରାଚୁର ଚିତ୍ରକର୍ମେ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରେର କବରଙ୍ଗନ୍ଧାନସମ୍ବୂହେ ଏର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ଅଞ୍ଚଳେ ଯା ସ୍ଵପ୍ରମାଣିତ ଯେଥାନେ ମଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୱତର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଚିତ୍ରିତ ହେଯେଇଛେ । ବିଭିନ୍ନ ଜାତେର ଆଶ୍ରୁକୁ ଯେ ସକଳ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଏ ତାହଲୋ : ମଦ୍ୟ ଆଶ୍ରୁ, ମରୁ ଆଶ୍ରୁ, ଘରେ ବା ବାଇରେ ଜୟାନୋ ଆଶ୍ରୁ, କାଳୋ ବା ସାଦା କିଂବା ଶୁକନୋ ଆଶ୍ରୁ । ମରୁ ଆଶ୍ରୁରେ ରଯେଇଛେ ବିଶେଷ ସ୍ଵାଦ, ରସାଲୋତା ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଏଗୁଲୋ ଅସର-ସବୁଜ ଥିଲେ ନୀଳାଭକୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗେ ହେଯେ ଥାକେ । ମଦ୍ୟ-ଆଶ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟେ କୌଣ କୌଣ ଜାତ ହଲୁଡାଭ ସବୁଜ, କତକଗୁଲୋ ଲାଲଚେ କାଳୋ, ନୀଳାଭ-କାଳୋ କିଂବା ସବୁଜ ଯାଦେର ଆବାର 'ସାଦା' ଓ ବଲା ହେଯେ ଥାକେ । ଶୁଷ୍କ ଆଶ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟେ ରଯେଇଛେ ମନାକ୍ଷା ଯା ଆଶ୍ରୁ ଗାଛେଇ ଶୁକନୋ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଚିବିହିନ୍ମ ସୁଲତାନା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଳୋ ଫଳଜାତ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ କିଶମିଶ । ଆଶ୍ରୁ ଗାଛ ଲତାନୋ କିଂବା ବେଯେ ଉଠା ଧରନେର ଗାଛ ଯାତେ ଖୁଟି ବା ମାଚାଯ ଭର ଦିଯେ ବେଡ଼େ ଉଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ହୁଏ । ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଦେଶମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ରଯେଇଛେ କେନନା ଆତ୍ମାଧଳେ ଆଶ୍ରୁ ଗାଛେର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଫଳୋତ୍ପାଦନେର ପକ୍ଷେ ରଯେଇଛେ ସହାୟକ ଜଲବାୟୁଗତ ପରିବେଶ ।

**୬. ଜଲପାଇ :** ମାନୁଷ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରାଯ ଜଲପାଇଯେର (ଅଲିଯା ଇଟ୍ରେରୋପିଆ) ମତ ଅନ୍ୟ କୌଣ ବୃକ୍ଷହି ଏତ ଘନିଷ୍ଠାବାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟେର ମାନୁଷେର କାହେ ଜଲପାଇ ସମ୍ବନ୍ଧି, ଖୋଦାୟୀ ରହମତ, ସୌନ୍ଦର୍ୟ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ଏ ଗାଛେର ଫଳ ପ୍ରାଚୀନକାଳ ଥିଲେଇ ଶୁଷ୍କ ଫଳ ହିସେବେଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୋଜ୍ୟ ତେଲେର ଉତ୍ସ ହିସେବେ ଓ ଶୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରେ ଆସନ୍ତେ । ଏର ତେଲ ବାତିତେବେ ବ୍ୟବହର ହେଯେ ଥାକେ, ତାହାଡ଼ା ପ୍ରଲେପ ହିସେବେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ୟବର୍ଧକ ହିସେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଭୋଜ୍ୟ ତେଲ ହିସେବେ ଜଲପାଇଯେର ବ୍ୟବହାରେ ମଧ୍ୟେ ରଯେଇଛେ ପ୍ରଧାନ ରାନ୍ନାବାନ୍ନାର କାଜେ, ସାଲାଦେର ଉପାଦାନ ହିସେବେ ଏବଂ ମାଛ ଚିନଜାତ କରାର କାଜେ । ଫଳ ପ୍ରଥମଦିକେ ଥାକେ ସବୁଜ ଏବଂ ପରେ ପାକଲେ

ঘন নীল বা লালচে বেগুনী রং ধারণ করে। পরিপূর্ণ হলে ফল সাধারণত লবণাক্ত পানিতে জারিত করা হয়। বিভিন্ন খাবারে জলপাইয়ের ব্যবহার অনেক, বিশেষত তৃমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের আঞ্চলিক রান্নাবান্নায়। গৃহে যত্নের সাথে পরিচর্যা করা হলে জলপাই পূর্বতন জাত বা বৎশের গাছের তুলনায় অধিকতর বড় আকারের এবং উচ্চ মাত্রার তৈল উপাদান সমৃদ্ধ ফল দিয়ে থাকে।

**৭. দাড়ির (পিটিনিকা গ্রানাটাম) :** আচীনকালে মেসোপটেমিয়া ও মিশরে দাড়িস্বর কদর ছিল অত্যন্ত উচ্চদরের। ইয়াছনী রাজা হ্যরত সোলায়মান (আ)-এর এক পরিপূর্ণ দাড়ির বাগান ছিল বলে কথিত আছে। দাড়ির বা ডালিম একটা শক্ত, ঘন বহিরাবরণ বিশিষ্ট জায়ফল বিশেষ, যা শক্ত বৃত্তাংশ দ্বারা আবৃত এবং যার ভিতরভাগ কয়েকটি আলাদা অংশে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি অংশে গোলাপী কিংবা রক্তিম অপ্র-মিষ্টি শাসে বসানো থাকে বেশ কিছু সংখ্যক বীজ। পক্ষ ফল উজ্জ্বল কমলা-লাল রং ধারণ করে। বীজের রস ঠাণ্ডা পানীয় তৈরিতে এবং এক প্রকার মদ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয় এবং বিপুল সংখ্যক বীজের কারণে ডালিম উর্বরতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

**৮. সদৃশ অথচ ভিন্ন :** একই বর্গীয় সকল সদস্য অন্য সকল বর্গের সদস্য থেকে শনাক্তযোগ্যরূপে আলাদা হয়ে থাকে যাতে বিভিন্নতার ধারাবাহিকতায় ছেদ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সদৃশ সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট প্রতিটি বর্গের অভ্যন্তরে সম্প্রদায় বা জাতের মধ্যে কিছু পরিমাণে ভিন্নতা থাকে যা সচরাচর আকৃতিক কিংবা কৃত্রিম উপায়ে সমগ্রোচ্চ বৎশ বৃক্ষের ফল। বিভিন্ন বৎশ বা জাতকে তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চিরস্থায়ী করা যেতে পারে যদি না তাতে অন্য বর্গীয় বৎশগতি বিবরণ কোন বস্তুর মিশ্রণ ঘটে যায়। এভাবে খাদ্যশস্য, খেজুর, আঙুর, জলপাই এবং ডালিমের আলাদা আলাদা বর্গ পরম্পর থেকে স্বতন্ত্র। অথচ তাদের প্রত্যেকের বর্গীয় শ্রেণী-বিন্যাসের ভিতরে বিভিন্নতা রয়েছে; এর প্রতিটি জাত আবার ফলান্বের সময় আকার, ফলের উৎপাদন এবং পরিপক্ষ হতে যে সময় লাগে তা দিয়ে চিনতে পারা যায়। ফলবান গাছের মধ্যে বিভিন্ন বর্গ কিংবা জাতের ফলের রসের এবং ফল ও বীজের মধ্যকার তেলের উপাদানের মধ্যেও আবার আকার, আকৃতি, রং, সার বা ঘনত্ব, স্বাদ ও স্বাগের বিভিন্নতা ঘটে থাকে।

**৯. পক্ষ ফল :** পাকা ফলে যে আকর্ষণীয় রঙ বৈচিত্র্য দেখা যায় তা উদ্ভিদ কোষ রসে একক বা যুক্তভাবে বিভিন্ন অনুপাতে বিদ্যমান বিভিন্ন উদ্ভিদ তত্ত্বরঞ্জক বস্তুর উপর নির্ভরশীল। পত্রহরিৎ হচ্ছে সেই তত্ত্বরঞ্জক যা কিছু কিছু জাতের আঙুরে সবুজ রং দিয়ে থাকে। তবে এটি উদ্ভিদে যে হাজার হাজার তত্ত্বরঞ্জক পাওয়া যায় তন্মধ্যে অন্যতম মাত্র।

ক্যারোটিনয়েড নামে পরিচিত দ্বিতীয় আরেক ধরনের তত্ত্বাঙ্গক লেবু-হলুদ থেকে শুরু করে টমেটো পর্যন্ত লাল রঙের কমপক্ষে ৬০ ধরনের ঘোগের মধ্যে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় আরেক রং পরিবার রয়েছে যারা তৈরি হয় এছেসিয়ানিন তত্ত্বাঙ্গক দ্বারা যাদের রং গাঢ়তার দিক থেকে একেবারে ফিকে লাল থেকে টকটকে লাল পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছেসিয়ানিন গ্রুপের রংগুলো কোষরসের অস্তিত্বা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তারা অঙ্গে লাল, নিরপেক্ষ অবস্থায় বেগুনী এবং ক্ষারীয় মাধ্যমে নীল, খাঁটি লাল রং অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষক এবং পাখি ও মানুষসহ শন্যপায়ীদের আকৃষ্ট করে। কাজেই, এটা কোন সমাপ্তন নয় যে, অধিকাংশ পাকা ফলের রঙেই লালের এত আধিক্য ও প্রভাব। ধরে নেয়া যায়, বীজ ছড়িয়ে দেয়ার কাজে সহায়তার জন্যেই এ সকল রঞ্জক পদার্থ পাখি ও জীবজন্মকে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে। ফল পাকার সাথে রঙের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ এই সংকেতই দেয় যে, ফল ভক্ষণের জন্য প্রস্তুত। পাখি, অন্যান্য জীবজন্ম এবং মানুষ কর্তৃক ফল ভক্ষণ বীজের বিস্তার ও উদ্ভিদ জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একটা মাধ্যম বিশেষ।

১০. কুরআনের এই অংশে সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা সচরাচর আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং সেই সাথে আমাদেরকে গভীর পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে সর্বশক্তিমানের কর্মণার বিষয়ে। সবুজ গাছপালা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে, শস্যদানা এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদনে বৃষ্টির গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহের উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে, বিশেষ করে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, কীভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি ফল বর্গ অসংখ্য জাতসহ মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন এবং পাকা ফলসমূহের আকর্ষণীয় রং শুধু যে তারা ভোগের জন্য প্রস্তুত স্টেটারই ইঙ্গিত করে তা নয় বরং এ প্রক্রিয়ায় তাদের বর্গকে চিরস্থায়ী করার জন্য তাদের বীজকেও ছড়িয়ে দেয়া হয়। সত্যিই আল্লাহর এ সমস্ত নির্দেশন মু'মিন পুরুষ ও নারীকে আহবান করে তারা যেন আল্লাহর দান নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে এবং তাঁর প্রদত্ত রিয়িকের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে।

### তথ্য সূত্র :

1. Yusuf Ali. A., The Holy Quran\_Text, Translation and Commentary. p. 318, 1938.
2. Raven. P. H. and Evert. R. F., Biology of Plants. 3rd ed., Worth Publishers Inc. New York. p. 341, 1981.
3. Masefield, G. B., Wallis, M., Harrison, S. G. and Nicolson. B. E. The Oxford Book of Food plants. Oxford University Press, p. 106, 1969.

## ١٠-بَدْيُ التَّمْرِ وَالْأَرْضِ

৬ : ۱۰۱ তিনিই আস্মান ও যমীনের স্তুতি ।

এ আয়াতটি ২ : ۱۱۷ ও ২ : ۱۶۸ আয়াতদ্বয়ের আলোচনায় বিবেচনা করা হয়েছে ।

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُذَكَّرِ إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ  
لَا مَا اخْطَرْتُمُ تُحَرِّمُ إِنَّمَا كَثِيرُ الْيَضْلُونَ يَأْفَوْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِلِينَ ۝

৬ : ۱۱۹ তোমাদের কী হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা আহার করবে না? যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন, তবে তোমরা নিরূপায় হলে তা ব্যতোন্ত । অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের বেয়াল-খুশী ধারা অবশ্যই অন্যকে বিপর্যাপ্তি করে; তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

আল্লাহ এ আয়াতে আল্লাহর নামে নিঃহত জন্মুর গোশত খাওয়ার হ্রুমের যথার্থতা প্রতিপন্ন করছেন যেহেতু তিনি নিষিদ্ধ খাদ্য সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যা ২ : ۱۷۳ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

وَقَالَ الْإِنْسَانُ فِي بُطُونِهِ هُلْ وَالْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِنَا كُوْنُنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۝  
وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً تَهْمُنْهُ هُنْ كَذَّابُونَ سَيِّئُونَ هُمْ وَصَنْفُهُمْ ۝ إِنَّهُ حَكِيمٌ  
عَلِيمٌ ۝

৬ : ۱۳۹ এবং তারা বলে : এই জন্মুগ্নির গর্ভে (পেটে) যা কিছু আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্ধারিত (রাক্ষিত) এবং আমাদের

আবীদের জন্য এটা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি বাচ্চাটি মৃত প্রসব হয় তবে তা নারী পুরুষ সবাই খেতে পারবে। এইসব কথা যারা রচনা করেছে এর প্রতিফল আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দেবেন, নিঃসন্দেহে তিনি বিজ্ঞ এবং সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

এখানে জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে বহু কুসংস্কারের একটি যা আল্লাহ একে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন।

ওরা কোন মানত করা প্রাণীর বেলায় ঘোষণা করত যে এই প্রাণীর পেটে যে বাচ্চা আছে তা শুধু পুরুষরাই খাবে মেয়েরা এর অংশ পাবে না। কিন্তু যদি মৃত বাচ্চুর প্রসব করে বা প্রসবের পর মরে যায় তবে তা নারী পুরুষ উভয়েই খেতে পারবে।

বলাবাহ্ল্য এটা একটা হাস্যকর ও নিন্দনীয় সংক্ষার যা নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। তাই আল্লাহ এই আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جِبِلٍ مَعْرُوفًا ۝ وَغَيْرَ مَعْرُوفٍ شَتِيٍّ كَالْخَلَلِ وَالرُّزْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكُلُهُ وَالثَّئِسُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٖ كُلُّوْمَنْ تَسْرِمَ إِذَا أَنْسَرَ  
رَأْنَوْ حَتَّىٰ يَوْمَ حَصَادِهِ ۝ وَلَا تُنْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ النَّسِيفَينَ ۝

৬ : ১৪১ তিনিই শতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও দাঢ়িয়াও সৃষ্টি করেছেন— এরা একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন এসব ফলবান হয় তখন এদের ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে এসবের জন্য দেয় কর প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ, তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

অধিকাংশ বৃক্ষেরই দৃঢ় খাড়া কান্দ থাকে যা শাখাপ্রশাখা ও পাতার ভার বহন করে। কিন্তু কতক গাছের আবার থাকে দুর্বল কান্দ যা শাখা-প্রশাখার ভার সচরাচরের মত সোজাভাবে বহন করার মত যথেষ্ট দৃঢ় নয়। স্বাভাবিকভাবেই, এ সকল গাছ মাটির উপর নুইয়ে বা লুটিয়ে থাকে। কিন্তু জীবন ধারণার্থে আলোতে পৌছবার জন্য এদেরকে অন্যান্য অনুষঙ্গী গাছের প্রত্যেকের সাথে বিশেষ পদ্ধায় অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ গাছের উপর নির্ভর করে কিংবা তার উপর ভর দিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। শেকড় গেড়ে মাটি থেকে নিজকে উপরে

তোলার পর এরা কুণ্ডলী পাকাতে পারে কিংবা যে গাছের উপর ভর দিয়ে উঠছে সেটারই মাথায় উঠে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ কাজে আকর্ষি, কঁটা বা আঙ্টা নামে পরিচিত বিশেষায়িত অসের সহযোগিতা গ্রহণ করে। এ ধরনের গাছ চাষাধীন থাকলে গাছের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে খুঁটি, মাচা এবং বিভিন্ন প্রকারের জাফরি কার্বন চালনি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গাছের মধ্যে রয়েছে আঙ্গুর গাছ, বিভিন্ন প্রকার শিম, মটর, অনেক জাতের লাউ ইত্যাদি। যেসব গাছের নিজের ভার বহন করার মত দৃঢ় কান্ড আছে তাদের মাচার দরকার হয় না।

**বিভিন্ন প্রকার শস্য :** এজিওস্পার্ম তথা সপুষ্পক উদ্ভিদ আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস। দু'টি উদ্ভিদ পরিবার আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ববহু। এদের প্রথমটি হচ্ছে তৃণ পরিবার; আর আমাদের সকল খাদ্যশস্যই এ পরিবারের সদস্য যার উপর মানবজাতির অধিকাংশই তাদের প্রধান খাদ্যের জন্য সর্বদাই নির্ভর করে এসেছে। এ পরিবারের প্রধান প্রধান সদস্যের মধ্যে রয়েছে : গম, বালি, ধান, এবং ভূট্টা। এরা হচ্ছে শর্করা প্রদানকারী সুবিধাজনক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। অন্য যে পরিবারটির উপর মানুষ ব্যাপকভাবে নির্ভর করে সেটি হচ্ছে মটর পরিবার। এটি ডাল প্রদান করে থাকে যা উচ্চ আমিষ উপাদানের কারণে মূল্যবান। অধিকতু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গোলাপ পরিবার গুরুত্বপূর্ণ যা আপেল, নাশপাতি, কুলবরাই, চেরী, খুবানি, বাদাম, পীচ (জাম জাতীয় ফল বিশেষ) ইত্যাদি ফল প্রদান করে থাকে। সরিষা পরিবার দেয় বাঁধাকপি ও গুলকপি (শালগম) জাতীয় সজি এবং সরিষাদানা ও মূলার মত হরেক রকম শাকসজি। গ্রীষ্মমন্দণীয় অঞ্চলে তাল-খেজুর পরিবার গুরুত্বপূর্ণ যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে খেজুর, নারিকেল, সাগু, তাল, সুপারি এবং পাম অয়েল ইত্যাদি। এ সকল পরিবার বা গোত্র ছাড়াও আরো কিছু গোত্র রয়েছে যেমন বেগুন গোত্র যা চোখে পড়ার মত হরেক জাতের খাদ্যশস্য দিয়ে থাকে যথা : আলু, টমেটো, এবং মরিচ। আর কমলা গোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে রয়েছে সাইট্রাস ফলসমূহ যা 'সি', ভিটামিন সমৃদ্ধ। সপুষ্পক উদ্ভিদের আরো কিছু গোত্র রয়েছে যা খাদ্যশস্য হিসেবে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ভিটাসি' গোত্রীয় আঙ্গুর, 'ওলিয়াসি' গোত্রীয় জলপাই 'কনভোলভুলাসি' গোত্রীয় মিষ্টি আলু এবং 'পিটনিক্যাসি' গোত্রীয় দাঢ়িয় ফল বা ডালিম।

**উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত রিযিকসমূহের মুষ্টিমেয় কয়েকটি হাতে গোনা দৃষ্টান্ত মাত্র।**

**জলপাই, দাঢ়িয় সদৃশ অথচ ভিন্ন :** এ বিষয়টি ৬ : ৯৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

۱۳۵- ﴿فَلَمْ يَأْتِهِنَّ أَذْرِقَ إِنْ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعَمُهُ لَا أَنْ يَكُونَ  
مَيْسَرًا أَوْ دَمًا مَشْلُوشًا أَوْ لَحْمَ خَبْرِنَّ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فَنَقًا أَهْلَ لَغْيٍ  
اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِرٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

৬ : ۱۸۵ (হে মুহাম্মদ) বঙ্গন যে আমার নিকট যে অহী এসেছে তাতে এমন কোন কথা পাই না যা খাদ্য বস্তুকে হারাম ঘোষণা করে তবে যদি মৃত প্রাণী হয়, প্রবাহিত রক্ত কিংবা শূকরের মাংস হয় তবে তা নিষিদ্ধ। কারণ সেটা নাপাক জিনিস অথবা যদি সেটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে হত্যা করা হয় তবে তাও নিষিদ্ধ। তবে কোন ব্যক্তি যদি নিতান্ত বাধ্য হয়ে থায়, কোনরূপ নাফরমানির ইচ্ছা ছাড়া এবং প্রয়োজনের বেশী (গেট পুরে) না থায় তবে নিষ্যাই তোমাদের রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

হালাল প্রাণী যবেহ করার পদ্ধতিতে যে সব প্রকারের হত্যা নিষিদ্ধ এবং সব খাদ্য হারাম যেমন মৃত প্রাণীর রক্ত, শূকরের মাংস এবং বলি দেওয়া প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে ۲ : ۱۷۳ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আয়াতে রক্ত বলতে যে প্রবাহিত রক্ত বুঝায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সুতরাং যবেহ করার সময় যে রক্ত বের হয় তাই হারাম। এতে বুঝা যায় যে গোশ্চত ও বিভিন্ন অংশে (যেমন ফুসফুস, যকৃৎ, পিল্হা ইত্যাদি) রক্ত থেকে গেলে তা হারাম হবে না।

﴿وَكَذَلِكَ مِنْ قَرْنَيْرَوْ أَفْلَكَنَّا بِمَاهَةَ هَبَسْتَنَابِيَّا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾

৭ : ৪     কত জনপদকে আমি ধ্রংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর আপত্তি হয়েছিল রাত্রিতে অথবা দিনহরে যখন তারা ছিল বিশ্রামরত।

অত্র আয়াতে আল কুরআন এমন সব শহরের কথা বলছে যেগুলোকে রাতের বেলায় কিংবা মানুষ যখন বিকেল বেলায় বিশ্রামরত থাকে সে সময়ে ধ্রংস করা হয়েছিল।

কোন্ কোন্ শহর ধৰ্স করা হয়েছিল, ধৰ্সপ্রাণ সেই লোকেরাই বা কারা কিংবা কী কারণে এই শান্তি নেমে এসেছিল- এসব কিছুরই উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য ঐ সূরায় জাতি এবং শহর-নগর ধৰ্সের কারণ হিসেবে বিভিন্ন অপরাধের উল্লেখ রয়েছে। যথা ৪- ১. হযরত নূহ (আ)-এর আমলে (আয়াত ৭ : ৬৪) প্রাবন দ্বারা; ২. আদ জাতির ধৰ্স (আয়াত ৭ : ৬৫) নেমে এসেছিল বড়-বড়া দ্বারা (আয়াত ৫৪ : ১৯, ৬৯ : ৬-৭); ৩. ছামুদ জাতি ধৰ্স হয়েছিল (আয়াত ৭ : ৭৮) ভূমিকম্প এবং তৎসঙ্গে ঘৰ্ষিবাত্যা দ্বারা (আয়াত ৫৪ : ৩১); ৪. হযরত লৃতের (আ) জাতি ধৰ্স হয়েছিল গৃক বৃষ্টি ও ভূমিকম্প দ্বারা (আয়াত ৭ : ৮৪, ১১ : ৮২); এবং ৫. মাদিয়ানবাসী (আয়াত ৭ : ৯১) ভূমিকম্প দ্বারা ধৰ্সপ্রাণ হয়েছিল।

যেহেতু যে সকল স্থান হযরত নূহ (আ) এবং হযরত লৃত (আ)-এর এলাকা হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে সে সকল স্থান বাদে অন্য কোথাও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয়নি, সেহেতু কুরআনে উল্লিখিত এ সকল ঘটনাবলীর স্থান এবং ধৰ্সের মাত্রা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

তৃতৃবিদগ্ধণের মতে, নূহ (আ)-এর সময়কার প্রাবনটি পারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চারশ' মাইল দীর্ঘ এবং একশ' মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট এলাকা গ্রাস করেছিল। মানব বসতির চিহ্ন আছে এমন ডৃ-স্তরের বয়স হিসেব করে তারা মনে করেন যে, সেই মহাপ্রাবন সংঘটিত হয়েছিল প্রিয়পূর্ব চার হাজার সালের দিকে।<sup>১</sup>

হযরত লৃত (আ)-এর কওমের ধৰ্সকৃত শহরের নাম সূরা নজরের ৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে 'আল মু'তাফিকা' যা কিন্তুতে 'মাহবেকা' এবং বাইবেলে 'সডের্ম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।<sup>২</sup>

সম্প্রতি লৃত (আ)-এর জাতির শহর হিসেবে পরিচিত সডোম ও গোমোরাহ শহরে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয় এবং বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে পৌছা গেছে যে, এ সকল শহরে ডেড্সি তথা মৃত সাগরের যে অংশে ধীরে ধীরে পানি বাঢ়ছে তার নিচে রয়েছে এবং তাদের ধৰ্স সম্পন্ন হয়েছিল খ্রি: পৃঃ ১৯০০ সালের দিকে এক মহা ভূমিকম্পের দ্বারা যার সাথে ছিল বিক্ষেপণ, বিদ্যুতের চমকানি, প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রবাহ এবং প্রচও অগ্নিকাণ্ড।<sup>৩</sup>

খ্রি: পৃঃ ৭১৫ সালের সার্বোনীয় শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, পূর্ব ও মধ্য আরবের জাতিসমূহের মধ্যে ছামুদ ছিল আসিরীয়দের অধীন। ছামুদের পতন হয়েছিল সম্ভবত আগ্নেয়গিরির প্রচও বিক্ষেপণের কারণে। যার ফলে আরবে 'হাররা' নামে কমবেশী ব্যাপক-বিস্তৃত লাভাক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল।<sup>৪</sup>

এগুলো ছামুদ ও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বছ হারানো শহর সম্পর্কে তথ্যাদি দিয়ে যাচ্ছে। এ সকল হারিয়ে যাওয়া শহরের মধ্যে সুপরিচিত কয়েকটি নিম্নরূপ :

বেবিলন ও নিনেভেহ, পাকিস্তানের হরঞ্জা ও মহেনজোদারো, ইতালীর পমপেই,

শ্রীলঙ্কার পলুন্নারুম্বা, এশিয়া মাইনরের হিট্টিস-এর রাজধানী হেলুসাস, মায়াসের (গুয়াতেমালা ও ইউকাতান উপদ্বীপ) চিচেন-ইত্বা, ইনকাসের উরবাথার মাকচু পিয়েচা। পাকিস্তানের মহেনজোদারো এবং ইতালীর পমপেই বাদে এ সকল শহরের ধ্রংসের কারণ আজও জানা যায়নি।

পুরুষ, নারী এবং শিশুদের অসম বা এলোমেলোভাবে জড়ানো কঙ্কাল, তরবারি কিংবা কুঠারের আঘাতে কাটাচিহ্ন- মহেনজোদারোতে আবিষ্কৃত এ ধরনের নিদর্শনাদি প্রমাণ করে যে, শহরটি আক্রান্ত হয়েছিল এবং মানুষকে সতর্ক না করেই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। শহরটিকে সামরিক আক্রমণ দ্বারা কজা করে পরে ধ্রংস করে দেয়া হয়।<sup>৫</sup>

৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ শে আগস্ট ভিসুভিয়াসের এক ভয়াবহ অগ্ন্যৎপাতের দ্বারা পমপেই শহর ধ্রংস হয়েছিল। মহান রোমক বিজ্ঞানী ঐতিহাসিক প্রাইনীর ভাগ্নে প্রাইনী দ্য ইয়েংগার এ ঘটনার একটা সুস্পষ্ট ও চিত্রবৎ বিবরণ দিয়েছেন। প্রাইনী দ্য ইয়েংগার ঐ সময় পম্পেই থেকে অন্ন দূরে মিসেনামে ছিলেন। তিনি লেখেন : ২৪ শে আগস্ট বিকেল প্রায় ১টার দিকে আমার মা ঢাইলেন যে আমার মামা (প্রাইনী) যেন লক্ষ্য করেন, আকাশে একটা অস্বাভাবিক আকার ও বাহ্যরূপ বিশিষ্ট মেঘ দেখা যাচ্ছে। মেঘটি ভিসুভিয়াস পর্বত থেকে উথিত হয়েছিল। এটি এই মুহূর্তে সাদা আবার পরের মুহূর্তে কালো এবং দাগ বিশিষ্ট দেখাচ্ছিল। যেন ঐ মেঘের সাথে ছিল মাটি আর অঙ্গার। এরপর সেই অঙ্গার ঘন থেকে আরো ঘন হয়ে নিচে পড়তে শুরু করল এবং তারপর ঝামাপাথরও পড়লো।”

জুনিয়র প্রাইনী এবং তার মা ক্ষতিগ্রস্ত হননি কিন্তু তার মামা প্রাইনী ঘটনাটা দেখতে গিয়ে ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং ছাই-ভষ্মে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান। তেজে পড়া ভবনের নিচে পম্পেই ভিলার দেয়ালে তিনি বিধ্বস্ত হন যা অষ্টাদশ শতকে (১৭৮৪ খ্র.) ভূতত্ত্ববিদ্গঞ্চ মাটি খুঁড়ে বের করেন। কেউ একজন দেয়ালে লিখে দিয়েছিলেন : ‘সড়োম গোমোৱুৱাহ।’<sup>৬</sup>

### তথ্যসূত্র :

1. Keller, W., *The Bible as History*, p. 51.
2. A Short Encyclopaedia of Islam.
3. Keller, W., *The Bible as History*, p. 95.
4. A Short Encyclopaedia of Islam.
5. The Epic of Man, Time-Life International (Netherland) N. V., p. 85, 1963.
6. Cottrel, L. *Lost Cities*, p. 147-152.

## ٤٠- وَلَقَدْ مَكَّلْمَنِي الْأَرْضُ وَجَعَلَنَا الْكَوْفَنِيْنَا مَعَلِمِيْنَ كَلِيلًا مَا نَلَمَ كُلُّونَ

৭ : ১০ আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় কর্তৃত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি  
এবং এতে তোমাদের জীবিকার ব্যবহাও করেছি; তোমরা খুব  
অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাক।

এই আয়াতে উল্লিখিত কর্তৃত বস্তুতই অত্যন্ত চিন্তা উদ্বেককারী। এ প্রসঙ্গে  
একটি মজার প্রশ্ন হলো যে, এই কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার আসনটি কোথায়।  
ব্যাপারটা যে তাই এ সত্য থেকেই তা স্পষ্ট হয় যে, মাত্র একশ বছর আগেও  
মানুষ উড়তে জানত না, আর আজ মানুষ শুধু যে পৃথিবীর চারদিকে মাত্র কয়েক  
ঘণ্টায় ঘূরে আসছে তা নয়, সে আন্তঃগ্রহ ভ্রমণেও পাড়ি জমাছে। মাত্র ৫০  
বছর আগেও মানুষ নিদিষ্ট কোন জীবাণুর কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় জানত  
না আর আজ সেই একই জীবাণুকে মানুষ মানব জাতির কল্যাণে কাজে  
লাগাছে। এত অল্প সময়ে এত কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। এ সমন্ত ঘটনাই প্রমাণ  
করে যে, আল্লাহ মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদ মানবজাতির সেবায় কাজে লাগানোর  
বেশী বেশী ক্ষমতা দান করেছেন। এই কর্তৃত অবশ্য জ্ঞান থেকেই উৎসারিত।  
কেননা, জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি। ভাবাবেই আল্লাহ জ্ঞানকে কর্তৃত্বের ভিত্তি বা পীঠিকা  
করেছেন এবং মানুষকে জ্ঞান অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। এর সাথে রয়েছে এ  
সত্য যে, আল্লাহ আদম (আ)-কে যে জ্ঞান দান করেছিলেন সে জ্ঞানই তাকে  
ফেরেশতাদের উপর প্রেষ্ঠিত্ব দান করেছিল এবং মানুষকে বলা হয়েছে আল্লাহর  
খলিফা বা প্রতিনিধি। ন-ই, আল্লাহর খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে কাজ করতে  
হলে এবং প্রকৃতিকে জয় করতে হলে মানুষকে তার সাধ্যমত জ্ঞান তালাশ  
করতে এবং আল্লাহর সত্ত্বের জন্য সেই জ্ঞানকে উপকারী কাজে লাগাতে হবে।  
আল্লাহর ভয়েই মানুষকে জ্ঞানের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে।  
মানুষ যতই বেশী বেশী জ্ঞানের তালাশ করতে থাকে ততই সে আবিষ্কার করে  
কত বিচিত্রভাবে আল্লাহ মানুষের রিযিকের ব্যবহা করে রেখেছেন। হাজার হাজার  
অঙ্গুলীয় এবং অন্যান্য আরো প্রাকৃতিক নিমিত্তকে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন  
পূরণের জন্য লাভজনকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। একদিকে মানুষ  
যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ গ্রহণ করতে শিখেছে এবং উন্নত ফলমৌল  
জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে শিখেছে,  
তেমনি অন্যদিকে সে উপলব্ধি করতেও ওরু করেছে যে, আল্লাহর এক হাজার  
একটা জিনিসের মধ্যে মানুষের রিযিক ছড়িয়ে রয়েছে। এখন তাকে যা করতে

হবে তাহলো এটুকুই যে, তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে। এটা ঠিক যে, পৃথিবীর সম্পদ ক্রমাগতে ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, নিত্য নতুন সম্পদ ও প্রযুক্তি মানুষের করায়তে আসছে। সাগরের বিশাল সম্পদ সঞ্চাবনায় এখনো হানা দেয়া বাকী। অবশ্য, স্থরণ রাখতে হবে যে, মানুষ যখন প্রকৃতির উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং পরিবেশের উপর বর্ধনশীল হারে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং যখন তার জীবনের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম খুঁজে পায় তখন তার সর্বময় ক্ষমতাবান এবং সর্বক্ষমাশীল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যাওয়া চলবে না, যিনি জ্ঞানাবেষণকারীদেরকে হামেশাই জ্ঞান দান করে যাচ্ছেন। কখনই এক মুহূর্তের জন্য মানুষের চিন্তা করা বন্ধ করা চলবে না যে, কী বিশাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে কর্তৃত্ব দান করেছেন এবং তার প্রয়োজন পূরণের সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

۱۱. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ تُرْصُورُكُمْ فَلَمَّا أَنْتُمْ كُلُّكُمْ إِنْجَدُوا لِأَدْمَرٍ فَجَهَدُوا إِلَيْهِ ۝  
إِنْلِيْسٌ ۝ لَمْ يَكُنْ مِّنَ الْعَبْدِيْنِ ۝

৭ : ১১ আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি; অতঃপর তোমাদের ক্লপদান করি এবং অতঃপর ফিরিশতাদেরকে আদমের নিকট নত হ'তে বলি; ইবলিস ছাড়া সবাই নত হয়। যারা নত হ'ল সে তাদের অস্তর্জুত হ'ল না।

মানুষ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে জগের বৃক্ষ সাধনের বিষয়টি ৩ : ৬ আয়াতের প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

۱۲. قَالَ مَا مَنْعَلَكَ أَلَا تَبْجِدُ إِذْ أَمْرَنِكَ ۝ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۝ خَلَقْنِي مِنْ تُرْصُورٍ ۝ خَلَقْنِي  
مِنْ طِينٍ ۝

৭ : ১২ তিনি বললেন ‘আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কোনু জিনিস তোমাকে নিবৃত্ত করল যে তুমি নত হলে না?’ সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ কর্ম দ্বারা’।

আগুন থেকে শয়তানের সৃষ্টির বিষয়টি বিজ্ঞানের বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ডিএনএ এবং আমিষ সৃষ্টিতে কাদামাটির ভূমিকা ৬ : ২ আয়াতের অধীনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তি প্রয়োগে দেখানো হয়েছে কীভাবে সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়ে খোদায়ী করণ কাজ করে যা ছাড়া কোন জৈব জীবনই উদ্ভব হতে পারত না।

وَقَدْ لَهُمَا يُمْرُرُونَ فَلَمَّا دَأَتِ السَّجْرَةُ بَرَثُ لَهُمَا سُوَافَهُمَا وَطَرِيقًا يَخْصُصُنَ  
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَلَوْدِ

৭ : ২২ এজাবে সে তাদেরকে প্রবক্ষনা ঘারা অধঃপতিত করল। তারপর যখন তারা সেই বৃক্ষের ফলের আবাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাহান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যান-পত্র ঘারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শাগল।

অত্র আয়াত থেকে হ্যরত আদম (আ)-এর আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আয়াতের এ অংশটি বলছে যে, এই সময় থেকে আদম (আ) তার উলঙ্গতা ঢাকার তাকিদ অনুভব করলেন এবং যেহেতু কাপড় বোনার মত অন্য কোন লোক ছিল না, সেহেতু তিনি তার গুণাঙ্গ ঢাকার জন্য গাছের পাতা ব্যবহার করেন। নৃ-বিজ্ঞান থেকে জানা যায় যে, গাছের পাতা ও বাকল পরিধান করার প্রথা পুরোপুরীয় যুগের শৈৱাংশের মানুষের মধ্যে প্রথম প্রচলন হয় যারা এক লক্ষ থেকে চাল্লিশ হাজার বছরের মধ্যে বাস করত। কাজেই দুমান করা যায় যে, অস্তত পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আদম (আ)-এর আবির্ভাব ঘটে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِذْ قَلَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُنَا مِنْ جُوْلَانِ سُوَافَهُمَا وَلِيَاسُ الشَّفْوَى  
ذَلِكَ حَسْبُهُ ذَلِكَ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ لَعَلَمْنَاهُ مَنْ كَرِزَنَ

৭ : ২৬ হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাহান ঢাকবার এবং বেশভূতার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোকৃষ্ট। এটি আল্লাহর নির্দর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

যৌন অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত লজ্জার বিষয়টি উপলক্ষি করার পর মানুষ একে অন্যের কামুক দৃষ্টি থেকে আড়াল করার তাকিদ অনুভব করল। প্রাথমিক পর্যায়ে গাছের পাতা যথাযথভাবে সেলাই করে অঙ্গ ঢাকার কাজটা সারা হয়। আল্লাহই তার মধ্যে এই তাকিদ সৃষ্টি করেন এবং তার মধ্যে উচ্চতর মেধা এবং উষ্ণাবনী শক্তি ও দান করেন যা প্রয়োগ করে সে ক্রমাবর্যে তার ব্যবহারার্থে উন্নত ও টেকসই কাপড় বোনার জন্য আঁশ এবং সৃতা আবিকারে সফলকাম হয়।

কাজেই যে পোশাক এক সময়ে ছিল যেনতেন রকমের আবরণী মাত্র, তা মানুষের সৌন্দর্যবোধ এবং নতুন নতুন ধারণা গড়ে উঠার সাথে একটা অলংকার ভূষণে পরিণত হয় যা স্পষ্টতই দু'টো উদ্দেশ্য পূরণ করে, যথা-১. শান্তিদায়ক উত্তাপ আর কনকনে শীতের মত চরম জলবায়ুগত অবস্থা থেকে সুরক্ষা, এবং ২. বিভিন্ন উপলক্ষ ও পরিবর্তনশীল ঝুতুর উপযোগী অধিকতর আকর্ষণীয় ডিজাইন ও বয়নের উত্তর ঘটিয়ে দেহের শোভাবর্ধন।

କାଳକ୍ରମେ ଜୟକାଳୋ ଭୂଷଣ ହିସେବେ ପୋଶାକ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟଭାବେ ମାନୁଷେର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବେ ଏକଟା ଅଂଶ ହେଁ ପଡ଼େ । ଆଲ୍ଲାହର କରଣାକେ ଜାନାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିନି ମାନୁଷକେ ନତୁନ ନତୁନ କଳାକୋଶଳ ଉଡ଼ାବନେର ଶକ୍ତି ଦିଯେଛେ; ଆଜକେର ପୋଶାକାଦି ଏମନ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ଏବଂ ମାନେ ପୌଛେଛେ ଯା କାରକାର୍ଯ୍ୟର ସାଥେ ଉପ୍ରୋଗିତା ଓ ଆରାମକେ ଯୁକ୍ତ କରେଛେ ।

٥٣- لَمْ يَرَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنِّةٍ أَكْيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى  
عَلَى الْعَرْشِ سَيُقْسِمُ الْأَيَّلَاتِ حَتَّىٰ يَطْلُبَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَالظَّمَنُ وَالقَمَرُ وَالشَّجَوْمُ  
مُسْكَنُرِبٍ يَا مَرِيٌّ إِلَدَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَدْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ○

১ : ৫৪ তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাচীন হন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে এদের একে অপরকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি, যা তারই এজ্ঞাধীন, এসব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সজ্জন ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ।

ଛୟ ଦିନେ ଆକାଶମଳ୍ଲୀ ଓ ପୃଥିବୀର ସୁଷ୍ଠି

ଆয়াতটির এ অংশে আল্লাহ্ বলছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। আল কুরআনের অন্যান্য অংশে একদিনকে এক হাজার দিন (আয়াত ২২ : ৮৭) এবং পঞ্চাশ হাজার দিন (আয়াত ৭০ : ৪) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোধা যায় আল্লাহ্‌র নিকট একদিন অর্থ একটা সময়কাল, যা দীর্ঘও হতে পারে আবার হতে পারে ত্রুটি। কাজেই এ আয়াতে আসলে যা বুঝান হয়েছে তা হলো : আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ছয় (সময়কালে কিংবা) পর্যায়ে। বিষয়টি সৃষ্টিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব দ্বারা সম্বন্ধিত হয়েছে।

মহানিনাদের পর সেই আদিযুগীয় অগ্নিগোলক বিক্ষেপিত হয়ে তীব্র বিকিরণ সাগরে নিয়মিত প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেক্ট্রনের দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও শীতলায়মান গ্যাসীয় মেঘে পরিণত হয়। প্রথমে বিকিরণের চাপ সুষম সম্প্রসারণ বজায় রাখে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাইড্রোজেন পরমাণু ও সেই সাথে কিছু হিলিয়াম সহযোগে গঠিত বস্তু ঝাড় বা গুচ্ছ গঠন শুরু করে। সেই গ্যাসীয় গুচ্ছ বা বৃদ্ধুদ পরম্পর থেকে দূরে উড়তে থাকে, যদিও আলাদা আলাদা গুচ্ছে বস্তু নিজের অভিকর্ষের কারণে সংকুচিত হতে থাকে। এ সময় দু'টি বিপরীতমুখী বল বৃদ্ধুদটির উপর ক্রিয়া করে : একটি হচ্ছে সম্প্রসারণ বল এবং অপরটি হচ্ছে অভিকর্ষ বল যা একে সংকুচিত করার চেষ্টা করে। অভ্যন্তরভাগে প্রচন্ড আলোড়নপূর্ব গতির কারণে সম্প্রসারণশীল গ্যাসীয় বৃদ্ধুদটি বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যথা : গোলাকার, ডিশাকার এবং পেঁচানো ইত্যাদি। প্রথম পর্যায়ে এভাবেই গঠিত হয় ছায়াপথসমূহ। আর এর মধ্য দিয়েই সমান্ত হয় আকাশমন্ডলী সৃষ্টির প্রথম পর্যায় বা দিন। এতে সময় লাগে প্রায় ১৫ কোটি বছর।

ছায়াপথ তথা সংকোচনশীল গ্যাস-গুচ্ছগুলো তেজে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে স্ফুর্দ্ধ স্ফুর্দ্ধ অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সকল প্রতিটি অংশ সংকুচিত হতে হতে দ্রুততর বেগে ঘূরপাক খেতে থাকে এবং সমতলবিশিষ্ট হতে থাকে। কিন্তু গ্যাসের ঘনীভূত ও আরো স্ফুর্দ্ধ স্ফুর্দ্ধ গুচ্ছ বা বৃদ্ধুদে পরিণত হওয়া অব্যাহত থাকে। নীহারিকা নামীয় গ্যাস ও ধূলিকণা দ্বারা গঠিত প্রায় গোলাকৃতি এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল এই মেঘ থেকেই সৃষ্টি হয় তারকামন্ডলী ও সৌরজগৎ। আর্বর্তনশীল এই নীহারিকা সংকুচিত হতেই থাকে এবং রেখে যায় চাকতিস্থিত বস্তুর বৃদ্ধুদ বা বলয় যা শেষ পর্যন্ত গ্রহে পরিণত হয়। এভাবেই সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত হয় তারকা মন্ডলী, গ্রহ, নক্ষত্র আর উপগ্রহসমূহ। এর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় দু'ধাপে বা দু'দিনে সঙ্গ আকাশের সৃষ্টি প্রক্রিয়া। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সময় লাগে প্রায় একশ' কোটি বছর।

আমরা আজ যে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি এটির সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় চারটি ভৃত্যাত্ত্বিক যুগে, অর্থাৎ প্রি-ক্যাম্ব্ৰিয়ান যুগ, প্যালিওযোয়িক যুগ তথা জীবাশ্ম বা প্রত্ন যুগ, মেসোযোয়িক যুগ তথা মধ্যজীবীয় বা দ্বিতীয় ভৃত্যাত্ত্বিক যুগ এবং সেনোয়োয়িক যুগে। প্রি-ক্যাম্ব্ৰিয়ান যুগে ঘূরপাক খাওয়া নক্ষত্রমন্ডলীর গ্যাসীয় বৃদ্ধুদ হিসেবে যাত্রা শুরু করে পৃথিবী এক তরল অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এবং কালক্রমে একটা কঠিন বহিৱাবৰণ গঠন করে। তখন এই

গ্রহটিকে ঘিরে ছিল ঘন বাষ্পীয় বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল হতে থাকার সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পকণা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিতে পরিণত হয় এবং নদ-নদী ও সাগর সৃষ্টি করে। এভাবে সৃষ্টি পৃথিবীপৃষ্ঠ পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, অগ্নিগিরি আর লাভা ক্ষেত্রের এক অনুর্বর প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য গঠন করে। এ প্রক্রিয়ায় সময় লাগে প্রায় একশ' কোটি বছর। শেষের ১০ কোটি বছরে সৃষ্টি হয় এককোষী জীব, অমেরুন্দভী প্রাণী এবং আদিমযুগীয় জলজ উদ্ভিদ সমূহ। এটাই হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায় বা প্রথম দিন।

দ্বিতীয় পর্যায় তথা প্যালিওযোগিক যুগে সাগরের উপরিতলে উঠানামা করার প্রবণতা বিরাজ করে যাতে ভূ-ভাগে নিয়মিত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এরপর সাগরের জলভাগ কমে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগ বৃদ্ধি পায়। এটাই ছিল ব্যাপকভাবে পর্বত সৃষ্টি আর অগ্নিগিরির তৎপরতার সময়কাল। এ সময়কালের শেষাংশে মহাদেশীয় সম্প্রাবহের কারণে পৃথিবী বেশ আনন্দলিত হয়। এ যুগের স্থায়িত্বকাল প্রায় চলিশ কোটি বছর। এ যুগেই উত্তর হয় মাছ, উভচর প্রাণী এবং সরীসৃপের মত মেরুন্দভী প্রাণীকুলের। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে পৃথিবী সৃষ্টির দ্বিতীয় দিবস বা পর্যায়ের।

ভূতাত্ত্বিক মধ্যজীবীয় যুগই হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় দিন বা তৃতীয় পর্যায়। এ যুগে স্থলভাগের অধিকাংশ স্থান জুড়েই ছিল মরুভূমি আর জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত মালা। সাগর পুনরায় স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয়। স্থলভাগের অধিকাংশ স্থানেই ছিল বনজঙ্গল কিংবা ত্রুদ ও নদীসহ জলাভূমি। এ সময়কালে ডাইনোসরের অস্তিত্ব ছিল এবং এরাই সে সময়ে পৃথিবীতে আধিপত্য করত। এ যুগ বা সৃষ্টির পর্যায় ১৫ কোটি বছর স্থায়ী হয়।

সেনোয়োগিক যুগ তথা পৃথিবী সৃষ্টির চতুর্থ পর্যায়ই হচ্ছে আজকের যুগ। প্লেট টেকটোনিক্স তথা ভূপৃষ্ঠের বহিরাবরণের শক্তিশালী বা প্রচন্ড আনন্দলনের ফলে আল্পস ও হিমালয় পর্বতমালার গঠন সম্পন্ন হয়। এর ফলে বিভিন্ন মহাদেশ ও মহাসাগর বর্তমান আকার ধারণ করে। এ সময়কালে বরফ যুগের অস্তিত্ব দেখা যায়। ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ে স্তন্যপায়ী জীব কুলের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়। এ যুগের পূর্ণতা ঘটে মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

এভাবেই ছয়টি পর্যায়ে বা ছয় দিনে সমাপ্ত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি।

দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যার পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি যে, পৃথিবীর বর্তমান প্রাক্তলিত বয়স প্রায় পাঁচশ কোটি বছর। আবার মহাবিশ্বের প্রাক্তলিত

বয়স দেড় হাজার কোটি বছর। কুরআনের ভাষ্যমতে পৃথিবী সৃষ্টি হয় দু'দিনে আর মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয় ছয় দিনে এবং পৃথিবীর বয়স থেকে দিনের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ধরে নিলে এক দিনের দৈর্ঘ্য হয় আড়াইশ কোটি বছর। এ হিসাব অনুযায়ী ছয় দিনের অর্থ দাঢ়ায় দেড় হাজার কোটি বছর যা মোটামুটিভাবে মহাবিশ্বের বয়সেরই সমান!

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বয়স সম্বত বর্তমানে যা হিসেব করা হয়ে থাকে তা থেকে ভিন্ন হবে; কিন্তু তাদের অনুপাত ঠিকই কুরআনের ইঙ্গিত মোতাবেক অপরিবর্তিত থাকবে। যাই হোকনা কেন, সময়কাল হিসেবে দিনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

তিনি রাতকে আবরণী হিসেবে দিনের উপর টেনে দেন : গোলাকার পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের ফলে কীভাবে দিন ও রাত হয় তা ৩ : ২৭ আয়াতের আলোচনায় বলা হয়েছে। সূর্য দিগন্তেরেখার নিচে চলে যায় বলে মনে হলে রাত নেমে আসে এবং এর অঙ্ককার ধীরে ধীরে দিনের উজ্জ্বল্যকে গিলে ফেলে, মনে হয় যেন দিনের উজ্জ্বল মুখমতলের উপর আন্তে আন্তে রাত (এর আবরণ) টেনে দেয়া হচ্ছে।

তিনিই সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র আর তারকামণ্ডলী, এ সবকিছুই তার কর্তৃতাধীন বিধান দ্বারা পরিচালিত : মহাজাগতিক বন্ধুসমূহের সৃষ্টির জটিলতা আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে তা ২ : ১১৭, ২ : ১৬৪ আয়াতেয় এবং পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২-এ আলোচনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিধানের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা গেছে যার দ্বারা মহাশূন্যে এদের কার্যাদি, ক্রিয়া-কর্ম এবং গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সূর্য : সূর্য সৌর ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সকল গ্রহ সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে থাকে। সম্পূর্ণ শতকে কেপ্লার সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তনশীল গ্রহসমূহের চলার গতি নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্যাত সূত্র বের করেন। প্রথম সূত্রটি এ রূপ : 'গ্রহগুলোর কক্ষপথসমূহ হচ্ছে উপবৃত্তাকার যাতে সূর্য থাকে প্রতিটি উপবৃত্তের একটি ফোকাসে বা রশ্মিকেন্দ্রে।' দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয় : 'সূর্যের সাথে প্রতিটি গ্রহ যে রেখা দ্বারা সংযুক্ত (তাকে রেডিয়াস ভেষ্টের বলা হয়ে থাকে) তা মহাশূন্যে সমান সময়ে সমান স্থান জুড়ে থাকে।' কেপ্লারের তৃতীয় সূত্রটি যাকে কখনও কখনও সদৃশ সূত্র বলা হয়ে থাকে তা এরূপ : 'কোন গ্রহের নক্ষত্র সময়ের বর্গ সূর্য থেকে তার গড় দূরত্বের ঘন-এর সাথে আনুপাতিক।' এ তিনটি

ସୂତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଲପେର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କରେନ ନିଉଟନ । ତିନି ଏ ତିନଟି ସୂତ୍ର ଥେକେ ଉପଲବ୍ଧି କରେନ ଯେ, ଗ୍ରହଶଳୋକେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରଦିକେର କକ୍ଷପଥେ ଟେନେ ରାଥେ ଅଭିକର୍ଷ ନାମେ ଏକ ଧରଣେ ବଲ । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣେର ସୂତ୍ର ତିନି ଏତାବେ ଦଁଡ଼ କରାଲେନ : ‘ମହାବିଶ୍ୱେର ପ୍ରତିଟି କଣା ଅନ୍ୟ ସକଳ କଣାକେ ଏମନ ଏକଟା ବଲ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରେ ଯା ତାଦେର ଭରେ ଗୁଣଫଳେର ସାଥେ ସରାସରି ଆନୁପାତିକ ଏବଂ ତାଦେର ମଧ୍ୟକାର ଦୂରତ୍ତେର ବର୍ଗେର ସାଥେ ବ୍ୟନ୍ତ ଆନୁପାତିକ ।’ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌର ଜଗତେର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରକାନ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିଧାୟ ଏଟି ନିଜ ଅବଶ୍ଵାନେ ଅବଶ୍ଵାନ କରେ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମୂହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁତ ଓ ସଠିକଭାବେ ଏ ସକଳ ସୂତ୍ର ମେନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରଦିକେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ ଆସଛେ ଅତୀତେର ଲକ୍ଷ କୋଟି ବଢ଼ିବ ଧରେ ଏବଂ ସୌର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯତଦିନ ଟିକେ ଥାକବେ ତତଦିନ ତା ଅବ୍ୟାହତ ଥାକବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛାଯାପଥେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମହ ଛାଯାପଥ କେନ୍ଦ୍ରେର ଧନୁକ ରାଶିର ଦିକେ ଥ୍ରତ୍ତି ପ୍ରତି ସେକେନ୍ଦ୍ରେ ଆଡାଇଶ’ କିଲୋମେଟାର ଧୀରଗତିତେ ଆବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆବାର ନିଜ ଅକ୍ଷେର ଚାରଦିକେଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରଗତିତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣରତ । ଏଟା ଏକଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୂଳକ ଘୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେ ରଯେଛେ ବିଭିନ୍ନ ଗତିବେଗ । ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନେର ଗ୍ରହଶଳିନୀ ସମୟ ସ୍ର୍ଯାଳୋକୀୟ ଦ୍ରାଘିମା ବୃଦ୍ଧିର ସାଥେ ସାଥେ ବିଶ୍ୱବରେଖାତ୍ତ୍ଵ ୨୭ ଦିନ ଥେକେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣେ ୬୦° ଜିହ୍ଵୀ ଦ୍ରାଘିମାଯ ୩୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଢେ ଯାଯ । ବର୍ଗାଲୀ ବୀକ୍ଷଣିକ ପରିମାପ ଥେକେ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକାଳ ମେନ୍ଦ୍ର ଅବଧି ବାଡ଼ିତେ ଥାକେ ।

କେପ୍ଲାରେର ତୃତୀୟ ସୂତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥେକେ ଗ୍ରହମୂହେର ଆପେକ୍ଷିକ ଦୂରତ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ଯାଯ । ଏଇ ପଦ୍ଧତିତେ ଦୂରତ୍ତ ଯେହେତୁ ଅନୁପାତ ହିସେବେ ଆସେ, ସେହେତୁ ସୌରଜଗତେର ଅଭ୍ୟାସରୁତ୍ତ ଦୂରତ୍ତ ପ୍ରୟାରାଲାକ୍ରମ ବା ଲସ୍ବନ ପଦ୍ଧତିତେ ସଠିକଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହତେ ହବେ । ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ପୃଥିବୀ ଥେକେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତ୍ତକେ କାଜେ ଲାଗାନୋ ହୁଏ । ଆମେରିକାର ଦିନ-ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ନୌବର୍ଷପଞ୍ଜି ଥେକେ ଏ ଦୂରତ୍ତଟି ପାଓଯା ଯାଛେ ଚୌଦ୍ଦ କୋଟି ଛିଯାନବରଇ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବିମ୍ବ ୧୦୦୦୦୦ କିମ୍ବିମ୍ବ ଅର୍ଧାର୍ଧ ପୃଥିବୀର ଭରେର ତିନ ଲାଖ ବର୍ତ୍ତି ହଜାର ନମ୍ବର ଶତ ଶତ ଶତ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂଳତ ୩ : ୧ ଅନୁପାତେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ହିଲିଆମେ ଗଠିତ ଯାତେ ଆହେ ଶତକରା ୧% ଭାଗ ଲୋହେର ମତ ଭାରୀ ଧାତୁ ।<sup>୨</sup>

ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥେକେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାପ ଓ ଆଲୋକଶକ୍ତି ପେଯେ ଥାକେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତ୍ବ ବିକିରଣକୃତ ତାପଶକ୍ତି ଟିଫାନ୍-ଏର ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ସୂତ୍ରଟି ହଙ୍ଗେ : ‘ଏକଟି କୃଷି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବିକିରଣକୃତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ତାର ତାପମାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଖାତେର ଆନୁପାତିକ ।’

ফটোক্ষিয়ার নামে পরিচিত সূর্যের দৃশ্যমান বহিঃপৃষ্ঠারের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় স্টিফানের সূত্র এবং ওয়েইন-এর নামে আরেকটি সূত্র যা একুপঃ ‘সর্বাধিক তীব্রতাবিশিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উচ্চতম তাপমাত্রার ব্যন্ত আনুপাতিক।’<sup>১</sup> এভাবে নির্ণীত সূর্যের তাপমাত্রা ধরা হয় গড়পড়তা ৬০০০ কেলভিন। ফটোক্ষিয়ারের উপরিস্থিত কম্যেক হাজার কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে বলা হয় ক্রোমোফিলিয়ার। এর উপরে রয়েছে সৌর জ্যোতির্বলয় যা সৌরব্যাসার্ধের দশগুণব্যাপী বিস্তৃত। এই জ্যোতির্বলয় থেকেই ইলেকট্রন ও প্রোটন আকারে পদার্থ তীব্রবেগে বেরিয়ে আসে যাকে বলা হয় সৌর ঝড়। পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলের বাইরে যে পরিমাণ সৌর বিকিরণ গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় সৌর প্রভবক, যার গড়পড়তা পরিমাণ সূর্যের দিকে সমকোণ ধরে দাঁড়ায় ১.৯৬ ক্যাল/মিনিট /বর্গ সেঃ মিঃ তল।<sup>৩</sup> স্টিফান-এর সূত্র দ্বারা নির্ণীত সূর্য কর্তৃক বিকিরণকৃত শক্তির পরিমাণ  $3.85 \times 10^{26}$  জোল/ সেকেন্ড। সূর্যের মূল কেন্দ্রস্থলে শক্তি উৎপাদিত হয় তাপাগবিক সংশ্লেষণ (কার্বন চক্র) দ্বারা যাতে কার্বন পরমাণু কেন্দ্র প্রোটনের সাথে একীভূত হয়ে বিভিন্ন মাধ্যমিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে কার্বন ও হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্র তৈরি করে। চার লক্ষ কিঃ মিঃ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট সূর্যের বাকী এলাকাগুলোতে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে রঞ্জাস্টের প্রোটন-প্রোটন বিক্রিয়া দ্বারা শক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে। আইনস্টাইনের ভর- শক্তি সম্পর্ক দ্বারা সমাধান করে পাওয়া যায় যে, প্রতি সেকেন্ডে প্রায়  $4.28 \times 10^9$  অর্থাৎ ৪২,৮০,০০০ মেট্রিক টন সৌর পদার্থ শক্তিতে রঞ্জাস্টিরিত হচ্ছে। এই হারে ভর হারাতে বা কমতে থাকলে সূর্য দশ হাজার কোটি বৎসরাধিককাল ধরে আলো ও তাপ বিকিরণ করতে থাকবে।

সূর্যের বহিঃপৃষ্ঠালে (ফটোক্ষিয়ার) অনেক দাগ দেখা যায় যেগুলো অপেক্ষাকৃত গাঢ়। সৌরদাগসমূহ ঘন বা কাল দেখা যায় এ কারণে যে, আশপাশের এলাকার তুলনায় ঐসব স্থান কম বিকিরণ দেয়। সৌরদাগের সাথেই থাকে পৃথিবীর তুলনায় তিন হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী চৌম্বক-ক্ষেত্র। সৌরদাগ থাকে জোড়ায়-জোড়ায়; প্রায়শই একটি থাকে নিচে, কোথায় তা দেখা যায় না। যদি উভয় দাগই দেখা যায়, তাহলে তারা বিপরীত মেরুবিশিষ্ট। সূর্যের ঘূর্ণনের কারণে সৌরদাগগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ধারমান বলে মনে হয়। কোন এক সৌরদাগ চক্রে, একই গোলার্ধস্থ (উত্তর ও দক্ষিণ) সকল সৌরদাগ হয় সমমেরুবিশিষ্ট এবং অন্য গোলার্ধের সৌরদাগসমূহের থাকে বিপরীত মেরু। একই গোলার্ধস্থ সৌরদাগসমূহের মেরুজুতা প্রতিটি ধারাবাহিক চক্রে একটি

ସୌରଦାଗ ମେରତ୍ୟୁକ୍ତତା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୟେ ଥାକେ । ଦେଖା ଯାଏ ଯେ, ସୌରଦାଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦାଗଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଦିନ-ଦିନ ଏବଂ ବହୁ-ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୟେ କଥନ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାଯ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବଂ ଅତ୍ୟପର ନୃନତମ ସଂଖ୍ୟାଯ ନେମେ ଆସେ । ଗଡ଼ପଡ଼ତା ୧୧ ବହୁରେ ଏ ଧରନେର ଏକଟା ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟ, ଯଦିଓ ବିରାମକାଳେ ୭ ଥିକେ ୧୫ ବହୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୟେ ଥାକେ ।

ଏଗାରୋ ବହୁରେ ଏକଟି ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାର ପର ବିପରୀତ ମେରବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀ ସୌରଦାଗଗୁଲୋ ଆରେକଟି ଏଗାରୋ ବହୁର ଚକ୍ରେର ଜନ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୟ । ଏଭାବେ, ସମମେରବିଶିଷ୍ଟ ସୌରଦାଗଗୁଲୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ନୃନତମ ପୁନରାବିର୍ଭାବେର ସତ୍ୟକାର ସମୟକାଳ ହଛେ ବାଇଶ ବହୁ ।

କେନ୍ଦ୍ରତ୍ତଳେର ଘୂର୍ଣ୍ଣନେର କାରଣେ ସୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୌଷକ କ୍ଷେତ୍ରମୁହେର କର୍ମକାଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଲୋର ଉତ୍ତବେର ମୂଳ ନିୟାମକ । ସୌରଦାଗମ୍ଭେ ସୌର କର୍ମକାଳେର ମଧ୍ୟେ ସର୍ବାଧିକ ସୁମ୍ପଟ ହଲେଓ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆରୋ ଅନେକ ଧରନେର ସାମୟିକ କର୍ମତଂପରତା ରଯେଛେ । ସୌରଦାଗମ୍ଭେର ଉପରେ କ୍ରୋମୋଫିଯାରେ ରଯେଛେ ପ୍ଲ୍ୟାଜ୍ ନାମୀଯ ଆରେକଟା ଅନେକ ବୃଦ୍ଧକାର ବିକ୍ଷୁଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ । ସ୍ଥୋପଯୁକ୍ତ ସହାୟକ ସନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସନ୍ତ୍ରାଂଶସହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛବି ନିଲେ ପ୍ଲ୍ୟାଜ୍ ଦେଖତେ ଏକଟି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ତାଲି-ତାଙ୍କିର ମତ ଲାଗେ । ସମୟ ସମୟ ପ୍ଲ୍ୟାଜେ ମୂଳତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ଏକଟା ସଂକଷିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀତ୍ର ଆଲୋକ ବିକ୍ଷେରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରା ଯାଏ । କ୍ରୋମୋଫିଯାରେ ଉପରେ କର୍ମକାଳେର କେନ୍ଦ୍ରତ୍ତଳ ଜ୍ୟୋତିରବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୟେ ଥାକେ ଘନୀଭୂତ ଆକାରେ ଯା ଆଶପାଶେର ତୁଳନାୟ ଅଧିକ ଘନ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତର ବଳେ ମନେ ହୟ । ସୋଜା, ବାଁକାନୋ ଏବଂ ଫାଁସ ଆକୃତିର ଗ୍ୟାସ କାଠାମୋ ପ୍ଲ୍ୟାଜ୍ ଥିକେ ଜ୍ୟୋତିରବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୟ । ପ୍ରାନ୍ତୀମାଯ ସଥିନ ଏରା ଅତୁର୍ଜ୍ଜ୍ଵଳ ବନ୍ତୁର ମତ ଲାଗେ ତଥନ ଏଦେରକେ ବଳା ହୟ ଅଭିକ୍ଷିଷ୍ଟ ବନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ସଥିନ ଏରା ଚାକତିତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୟ ତଥନ ଏଦେରକେ ବଳା ହୟ ସୂତ୍ର ବା ଆଁଶ । ଏ ସକଳ ଅଭିକ୍ଷିଷ୍ଟାବହ୍ନା ଓ ସୂତ୍ର କୁଡ଼ି ଥିକେ ଚଲିଶ ହାଜାର କିଣମିଃ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ପାଁଚ ଥିକେ ଦଶ ହାଜାର କିଣମିଃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ହତେ ପାରେ ।<sup>8</sup>

ଚାଁଦ : ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ମହାଜାଗତିକ ଥତିବେଶୀ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଚାଁଦ ଆମାଦେର କାହିଁ ଥିକେ ଗଡ଼େ ମାତ୍ର ଦୁଲାଖ ଆଟକ୍ରିଶ ହାଜାର ଆଟଶ ସାତାନ୍ନ ମାଇଲ ଦୂରେ । ପୃଥିବୀ-ଚାନ୍ଦ ଜଗନ୍ମହାଶୂନ୍ୟେ ଏକତ୍ରେ ଚଲେ; ବୈରି ସେନ୍ଟାର (bary centre) ନାମେ ଏକଟା ସାଧାରଣ ଭରକେନ୍ଦ୍ରେର ଚତୁର୍ଦିକେ ଏରା ଘୂର୍ଣ୍ଣଯାମାନ । ବୈରିକେନ୍ଦ୍ରଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରଦିକେ ଏକଟା ଉପବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥେ ଆବର୍ତନ କରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ଚାଁଦ ଏଟିର ଚତୁର୍ଦିକେ ଆବର୍ତନଶୀଳ ଥାକେ । ପୃଥିବୀର ଭର ଓ ବୈରିକେନ୍ଦ୍ର ଥିକେ ଏର ଦୂରତ୍ତେର ଗୁଣଫଳ ଚାଁଦେର ଭର ଏବଂ ବୈରିକେନ୍ଦ୍ର ଥିକେ ଏର ଦୂରତ୍ତେର

গুণফলের সমান। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে চাঁদের যে ভর পাওয়া যায়, তা পৃথিবীর ভরের ১/৮১.৩% ভাগ অথবা ১.২৩% ভাগ। এটা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য যে, কেপ্লারের সূত্র উপরের বেলায় যেমন থাটে, তেমনি চাঁদের ক্ষেত্রেও সমান উপযোগী।

চাঁদের রয়েছে এক জটিল আবর্তন গতির সমাহার। এটি নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তন করে। তেমনি এটি পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করে এবং এর সাথে সাথে এটি সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে। সৌরজগতের সাথে সাথে এটি আবার ছায়াপথ কেন্দ্রের চারদিকেও আবর্তনশীল। এটি যুগপৎ ঘূর্ণশীল, অর্থাৎ এটির নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের সময়কাল পৃথিবীর চারদিকে আবর্তনের সময়ের সমান। কাজেই, এটি পৃথিবীর দিকে একই মুখ বা পাশ করে থাকে।

এটি যখন পৃথিবীর চারদিকে ঘূরতে থাকে তখন এর যে দিকটা পৃথিবী ও সূর্যের দিকে ফিরে থাকে সেই দিকটা বা পিঠটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় এবং সূর্যালোকিত থাকে। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান চাঁদের যে সকল অংশ আলোকিত থাকে তাদেরকে বলা হয় চন্দ্র কলা। যখন চাঁদের অর্ধাংশ সূর্যালোকিত থাকে এবং সেই অংশই আবার পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান হয় অর্থাৎ পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যবর্তী হয় তখন হয় পূর্ণিমা। এক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে, পৃথিবী যে ঢায়া ফেলে চাঁদ তার ভিতরে চলে আসে, তবে চন্দ্রগহণ সংঘটিত হয়। আবার চাঁদ যখন সূর্য আবার পৃথিবীর মধ্যবর্তী হয়, তখন চাঁদের সূর্যালোকিত অংশ পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান হয় না অর্থাৎ তখন চাঁদ দেখা যায় না। এটাই হচ্ছে নতুন চন্দ্র কলা। এ ক্ষেত্রে যদি চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কোন অংশের উপর পড়ে, তখন ঘটে সূর্যগ্রহণ যা পৃথিবীর ঐ অংশ থেকে দেখা যায়।

চাঁদ জোয়ার-ভাটার কারণ ঘটায়। পৃথিবীর আবর্তন চলাকালীন সময়ে চাঁদের কাছের দিকের সাগরের পানি নিচের শক্ত মাটি অপেক্ষা চাঁদের অধিকতর নিকটবর্তী থাকে বিধায় চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল নিচের মাটির তুলনায় পানির উপর বেশী শক্তিশালী হয়। এভাবে সাগরের পানি ফুলে উঠে এবং জোয়ার আসে। অথচ, পৃথিবীর উল্টোদিকের সাগরের পানি নিচের শক্ত মাটি অপেক্ষা চাঁদ থেকে অধিকতর দূরবর্তী হওয়ায় পানির নিচে অবস্থিত শক্ত মাটির উপর চাঁদের আকর্ষণ বেশী; অর্থাৎ পানির নিচ থেকে শক্ত মাটিকে টানা হচ্ছে। কাজেই, পানি মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জোয়ার ঘটায়। দিনে একবার পৃথিবীর পূর্ণ আবর্তনকালীন সময়ে দু'বার জোয়ার উঠে, একবার যখন সাগর থাকে চাঁদের দিকে এবং আরেকবার যখন চাঁদ থেকে দূরবর্তী স্থানে থাকে। সূর্য

ও জোয়ার ঘটায়। সূর্য ও চন্দ্র যখন পৃথিবীর একই পাশে কিংবা উল্টো পাশে থাকে তখন উচ্চতম জোয়ার বা ভরা কটাল তথা বসন্ত জোয়ার উঠে। পৃথিবী থেকে দেখলে চাঁদ ও সূর্য যখন ৯০° ডিগ্রী কোণের দূরত্বে অবস্থান করে তখন নিম্নতম জোয়ার তথা মরা কটাল আসে।

পৃথিবী যদি নিজ অঙ্গে আবর্তনশীল না হত, তাহলে চান্দ্র জোয়ার স্ফীতি ঘটত চাঁদের দিক বরাবর রেখায়। পৃথিবীর আবর্তনের কারণে পৃথিবীর জোয়ার স্ফীতি পৃথিবী- চাঁদ রেখা পার হয়ে আগে চলে যায়। কারণ, জোয়ার স্ফীতি তৈরি হওয়া ও তা ভাটায় রূপান্তরিত হতে কিছু সময় দরকার হয়। আর এ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর আবর্তন জোয়ার স্ফীতিকে পৃথিবী-চাঁদ রেখা থেকে দূরে নিয়ে যায়। চাঁদের টান বা আকর্ষণ পৃথিবীর ঘূর্ণনগতিকে শ্রথ করে দেয়। ফলে, দিন দীর্ঘ হয়। একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীর সময়কাল চন্দ্রের-পৃথিবীর চারদিক প্রদক্ষিণ করার সময়কালের সমান হবে। তখন পৃথিবী একই পার্শ্ব বা পিঠ চাঁদের দিকে মুখ করে থাকবে এবং চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার আসবে না। অবশ্য তখনও সূর্যের দ্বারা জোয়ার সংঘটিত হবে। এতে পৃথিবীর আবর্তন গতি এমনকি আরো বেশী ধীর হয়ে আসবে এবং দিনকে মাসের চেয়েও দীর্ঘ করে ফেলবে। কৌণিক গতিবেগের সংরক্ষণ নীতিতে পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের আবর্তন গতি দ্রুততর হবে। এভাবে বেড়ে যাবে চাঁদের বেগ। পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘূর্ণনকাল কমতে থাকলে কেপলারের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী তাদের মধ্যকার দূরত্বও কমে আসবে। এভাবে চাঁদ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আস্তে আস্তে পৃথিবীর দিকে চলে আসবে এবং পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হবে। শেষ পর্যন্ত চাঁদ পৃথিবীর এত নিকটবর্তী হবে যে, চাঁদের পৃথিবীর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী দুই অর্ধাংশের উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণীয় টানের পার্থক্যই চাঁদকে আক্ষরিক অর্থে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এ ঘটনা যখন ঘটবে, তখন চন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ অন্তত আংশিকভাবে হলেও পৃথিবীর চতুর্পার্শে একটা কণা-বলয়ের রূপ ধারণ করবে।<sup>১৫</sup>

**তারকাম্বলী :** আল্লাহ্ তারকারাজির জন্যে কিছু কিছু বিধান দান করেছেন যা তারা খুঁটিনাটিসহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পালন করে থাকে।

তারকারা দীপ্তিমান গ্যাসীয় বস্তু যা তাদের কেন্দ্রস্থলে আগবিক একীভবনের দ্বারা শক্তি উৎপন্ন করে থাকে। নির্দিষ্ট একটা পরিমাণের কম ভর হলে সৌরভরের ০.০৫ গুণ। কোন বস্তুর কেন্দ্রীয় চাপ ও তাপ একীভবন ক্রিয়ার সূত্রপাতের পক্ষে অপ্রতুল। কোন তারকার ভর নির্ধারণ করে ঐ তারকার দীপ্তিমানতা, তাপমাত্রা, আকার এবং এর ত্রুম্বিকাশ পদ্ধতির উপর। পরিষিষ্ট-১-এ বিভিন্ন ভরবিশিষ্ট

তারকার ক্রমবিকাশ স্তরসমূহের বিষয় ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। তারকাসমূহ নিজ নিজ নির্ধারিত পথে আবর্তন করে থাকে এবং এরা একে অপর থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। প্রক্রিয়া সেটাউরি নামের তারকাটি আমাদের সূর্যের নিকটতম তারকা, যা ৪.২৭ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। সূর্য একটা সাধারণ তারকা ছাড়া আর কিছু নয়।

নিউটন বা পাল্সার-এর ক্ষেত্রে তারকার ব্যাস শত শত কিলোমিটার, খেত বামনদের ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র কিলোমিটার। আমাদের সূর্যের মত তারকার ক্ষেত্রে লক্ষ কোটি কিলোমিটার। আর অতি দৈত্যাকার তারকার ক্ষেত্রে 'ক্যেকশ' কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। একটা তারকার আকার তার জীবনের শেষ দিকে যখন সে লাল দৈত্য শুরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, সাংঘাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এমন তারকা রয়েছে যাদের ঔজ্জ্বল্য সময়ের সাথে পার্থক্য হয়ে থাকে। এরা পরিবর্তনশীল তারকা হিসেবে পরিচিত। এ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ হাজার পরিবর্তনশীল তারকা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দীনিতির পার্থক্য হওয়ার সময়কাল কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। পার্থক্যের পরিমাণগত সীমা তথা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাত্রার ফারাক অত্যন্ত ব্যাপক। পরিবর্তনশীল তারকাদের তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যথা : স্লান তারকা, মিটমিট তারকা ও মহাপ্লাবন তারকা।

তারকাদের নির্গত আলোর রং অনুযায়ী তারকাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং এথেকে তাদের তাপমাত্রা অনুযায়ীও শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে যা ওয়েন-এর স্থানচ্যুতি সূত্র থেকে নেয়া হয়েছে। সূত্রটি এরূপ : 'তীব্রতম বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উচ্চতম তাপমাত্রার সাথে ব্যন্ত আনুপাতিক। এর অর্থ হলো যে, কোন বস্তু যতই উত্পন্ন হতে থাকে, ততই বিকিরণের চূড়া পরিবর্তিত হয়ে নীল রং ধারণ করে।' এই পদ্ধতি অনুযায়ী উত্পন্নতম থেকে শীতলতম অবস্থায় বর্ণালী প্রতীকগুলো দাঢ়ায় O, B, A, F., G, K, M. বর্ণালীর পুঁজানুপুঁজ ও ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হতে আরো অধিক উপবিভাগ রয়েছে। 'O' তারকাসমূহের তাপমাত্রার পার্থক্য হয়ে থাকে ৩০ হাজার থেকে ৬০ হাজার কেলভিন ডিগ্রী পর্যন্ত; এ ধরনের তারকা অপেক্ষাকৃত খুবই কম দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। কেননা, এদের জীবনকাল বা স্থায়িত্বকাল হয় অন্ত সময় মাত্র। 'B' তারকাসমূহ খানিকটা শীতল। এদের তাপমাত্রা থাকে ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের মধ্যে। 'A' তারকাসমূহ আরো শীতল, সাড়ে

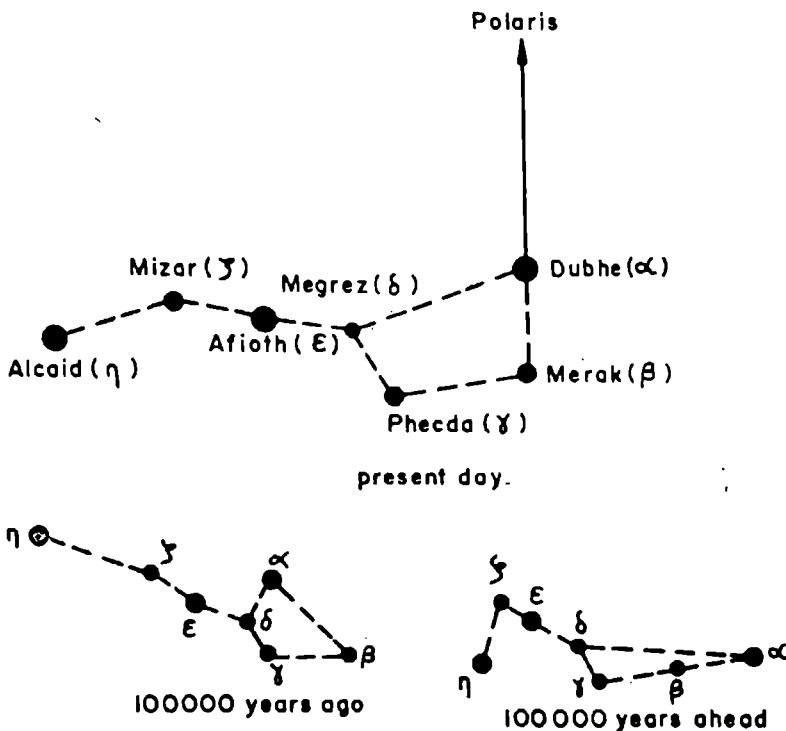
সাত হাজার থেকে ১০ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের মধ্যে। 'F' তারকাসমূহের তাপমাত্রা থাকে ৬ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের উপর এবং সাড়ে ৭ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের নিচে। 'G' তারকা তথা আমাদের সূর্যের বর্ণালী ধরনের তারকার তাপমাত্রা ৫ হাজার ডিগ্রী কেলভিন। 'K' তারকাসমূহ অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মাত্র সাড়ে ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের মধ্যে। 'N' তারকারা আরো শীতল, সাড়ে তিনি হাজার ডিগ্রী কেলভিনের নিচে। এদের বায়ুমণ্ডল এত শীতল যে, তেঙ্গে আলাদা না করা অবস্থায় অণুগুলো অস্তিত্বামান থাকতে পারে।<sup>১৬</sup> আরেক শ্রেণীবিভাগে তারকাদের উজ্জ্বল্য নির্দেশ করার জন্য একটা উজ্জ্বল্য পরিমাপক ব্যবহার করা হয়েছে। আলোকমিতির বিপরীত বর্গ সূত্র যার আলোক তীক্ষ্ণতা আলোক উৎস থেকে দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে কমবেশী হয়ে থাকে। এই সূত্রটি সকল নিশ্চিত মাত্রা হিসাব করতে ব্যবহৃত হয়। নিশ্চিত মাত্রাসমূহ এবং বর্ণালী ধরনসমূহের উপাস্তসমূহ যে সময়ে সংগ্রহ করা হচ্ছিল সে সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সালের দিকে ডেনমার্কের এন্জার হার্টজস্প্রাং এবং যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি নোরিস লক্ষ্য করলেন যে, উপরোক্ত বিষয় দু'টোকে সম্পর্কিত করে একটা নকশাচিত্রে রেখাচিত্রকৃত বিন্দুসমূহ স্বতন্ত্র দলে পড়ে গেল। একটা তাপমাত্রা (কিংবা বর্ণালী শ্রেণী) বনাম উজ্জ্বল্য নকশা হার্টজস্প্রাং রাসেল রেখাচিত্র (এইচ-আর রেখাচিত্র) হিসেবে পরিচিত যাতে তারকারাজিকে দেখানো হয় কর্ণরেখার উপরের বাম থেকে নিচের ডান বরাবর। এভাবে দেখা যায় যে, উত্তপ্ততম তারকাগুলো শীতলতর তারকাসমূহের চেয়ে উজ্জ্বলতর। অধিকাংশ তারকাই এই দলে পড়ে যাকে বলা হয় প্রধান অনুক্রম বা 'বামন তারকা। বামনদের ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই। এরাই হচ্ছে স্বাভাবিক ধরনের তারকা। সূর্য হচ্ছে 'G' ধরনের বামন। কিছু কিছু তারকা আছে যেগুলো অত্যুজ্জ্বল অর্থাৎ প্রধান অনুক্রম তারকার চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল। এ সকল তারকাকে তাদের উজ্জ্বল্যের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে অতি দৈত্য, উজ্জ্বল দৈত্য এবং দৈত্য নামে অভিহিত শ্বেত বামন নামক অনুজ্জ্বল বস্তুর শ্রেণীভুক্ত তারকাসমূহের অবস্থান নিচে এবং প্রধান অনুক্রমের বামে। এইচ-আর শ্রেণীকরণের গুরুত্ব স্পষ্ট কেননা, এটি তারকাদের জীবন ও মৃত্যুকে তুলে ধরে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সূর্য বর্তমানে এর প্রাথমিক স্তরে রয়েছে যখন হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্র হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্রে একীভূত হয়ে শক্তি সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু 'অল্প কয়েকশ' কোটি বছরের মধ্যে সূর্যের কেন্দ্রস্থলস্থ হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্র নিঃশেষ হয়ে গেলে একটা সময় আসবে যখন দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে উজ্জ্বলতর ও রক্তিমতর হয়ে

উঠবে। শেষ পর্যন্ত এটি স্ফীত হবে এবং বুধ ও শুক্র গ্রহকে গ্রাস করে পৃথিবী পর্যন্ত পৌছে যাবে। এই অবস্থায় সূর্য হবে অস্বাভাবিক মাত্রায় উজ্জ্বল এবং পৃথিবীর সবকিছুকেই ধ্বংস করে দেবে। এর সুবিশাল দীপ্তিমানতা অসাড় হয়ে পড়বে এবং পৃথিবীস্থ সবকিছু পুড়ে অঙ্গার করে ফেলবে।<sup>৭</sup>

একটা তারকার আবর্তনগতি ছাড়াও আরো দু'টো গতি রয়েছে, যথা : নিজস্ব গতি ও রশ্মিগত গতি। দৃষ্টিরেখার সাথে লম্বভাবে দৃশ্যত কৌণিক গতিকে বলা হয় 'প্রোপার' বা নিজস্ব গতি। অধিকাংশ তারকার ক্ষেত্রেই এই গতি খুবই সামান্য এবং উপেক্ষণীয় হিসেবে বিবেচিত। বার্ণর্ড-এর তারকার রয়েছে সর্বোচ্চ নিজস্ব গতি যার পরিমাণ বার্ষিক ১০.৩ ইঞ্চি। হাজার হাজার বছর পর নিজস্ব গতির দিক পার্থক্যের কারণে একটা তারকাগুচ্ছের (নক্ষত্রপুঁজি) আকৃতি লম্বলীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এভাবে, সপ্তর্ষিমন্ডলের দু'টি তারকা তথা মেজর ধূরে এবং আলকেইডের গতির পরিমাণ ও দিক গুচ্ছটির অন্য পাঁচটি তারকা থেকে আলাদা বিধায় তাদের আকৃতি অবিরত এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এক লক্ষ বছর আগের এবং এখন থেকে দশ লক্ষ বছর পরের সপ্তর্ষিমন্ডলের আকৃতিগত পার্থক্য চিত্র-৪ এ দেখানো হল।

দৃষ্টিরেখা বরাবর তারকার যে গতি সেটাই তার রশ্মিগত গতি। এটি ডপ্লার-এর ইফেক্ট দ্বারা পরিমাপ করা হয়। গ্রহপুঁজের আকৃতির উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। প্রায় ৬০% ভাগ তারকার রশ্মিগত গতি আছে যার পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ২০ কিলোমিটার।

তারকামন্ডলী মহাশূন্যে এলোপাতাড়িভাবে ছড়ানো নয়, বরং তারা গুচ্ছকারে অবস্থান করে। তারকাগুচ্ছ প্রধানত দু'ধরনের : ছায়াপথভুক্ত তারকাগুচ্ছ এবং বটিকাকৃতি তারকাগুচ্ছ। বটিকাকৃতি গুচ্ছে রয়েছে ছায়াপথভুক্ত গুচ্ছের তুলনায় অধিক বয়ক তারকামন্ডলী। ছায়াপথভুক্ত তারকামন্ডলীর বর্ণালীস্থ লাল রেখাসমূহের গবেষণা করে বিজ্ঞানী হাব্ল ১৯২৯ সালে তার বিখ্যাত সূত্র ঘোষণা করেন। সূত্রটি হচ্ছে 'একটি ছায়াপথের শিথিলতার গতিবেগ এর দূরত্বের সাথে আনুপাতিক।' এ সূত্র থেকেই মহাবিশ্ব সৃষ্টিকালীন সেই মহানিনাদ বা মহাবিক্ষেপণ থেকে কত সময় পার হয়েছে তা হিসেব করা যায়। আর এটি সংঘটিত হয়েছিল দেড় হাজার কোটি বছর আগে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-২)



চিত্র-৪ : সপ্তর্ষমন্ডলের সাতটি প্রধান তারকার আকার : এক লাখ বছর আগের, বর্তমানের এবং দশ লাখ বছর আগের।

উপরোক্ত আলোচনা স্পষ্টভাবে মহাশূন্যে চন্দ্র, সূর্য এবং তারকামন্ডলীর কার্যাবলী, কর্মকাণ্ড, ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য এবং গতি নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন বিধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সূর্য, চন্দ্র ও তারকামন্ডলীর সুবিশাল এই মহাবিশ্বের এমন পুজ্যানুপুজ্য পরিকল্পনা, সংগঠন এবং শৃঙ্খলা দেখে অভিভূত হতে হয়। মহাবিশ্বে আসলেই কোন বিশৃঙ্খলা নেই, বরং মহাবিশ্ব সৃষ্টার নিয়ন্ত্রিত বিধান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

**তথ্যসূত্র :**

1. Huffer, C. M., Trinklein, F. E. and Bunge, M., An Introduction to Astronomy, Holt, Rinehart and Winston Inc, New York, p. 62, 1973.
2. Ibid. p. 214
3. Ibid. p. 220.
4. Ibid p. 228.
5. Ibid p. 181.
6. Passachaff, Contemporary Astronomy, W. B. Saunders Co London. p. 25, 1977.
7. Ibid. pp. 37-38.
8. Ibid. p. 519.

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّبْعَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ  
سَحَابًا شَفَالًا سُقْنَةً لِيُلَمِّ مَيْتَ فَأَنْزَلَنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا  
الشَّرَبَاتَ كَذَلِكَ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَكُمْ تَرَكُونَ ○

৭ : ৫৭ তিনিই নিজ অনুগ্রহের প্রাক্তালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। ঘন মেঘ যখন একে বহন করে নিয়ে যায় তখন আমরা তাকে নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে তাথেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তারপর এর দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এভাবেই মৃতকে জীবিত করে থাকি যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর।

বায়ুপ্রবাহ হচ্ছে গতিশীল বাতাস যা উচ্চতর বায়ুচাপ এলাকা থেকে নিম্নতর বায়ুচাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। আল্লাহর নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী (আয়াত ১৫ : ৫) এই সকল চাপ বায়ুমভলে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বল দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আবহাওয়াবিদ্যার ক্ষেত্রে বিউফোর্ট ক্ষেল বায়ুপ্রবাহের প্রবাহগতিভিত্তিক বারো রকম শ্রেণীবিন্যাস করে থাকে। এর মধ্যে চারটি ব্যাপক শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. মলয়ানিল (অর্থাৎ শান্ত বায়ু প্রবাহ) যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রথম ছয় শ্রেণীর বায়ুপ্রবাহ যা ঘন্টায় ১-৩ মাইল বেগে প্রবাহিত হালকা বাতাস থেকে তীব্র বায়ুপ্রবাহ পর্যন্ত হয়ে থাকে (গতিবেগ ঘন্টায় ২৫-৩১ মাইল);
২. প্রবল বাত্যাপ্রবাহ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে পরবর্তী চার ধরনের বায়ুপ্রবাহ : মূদু বাত্যা (গতিবেগ ঘন্টায় ৩২-৩৮ মাইল) থেকে পূর্ণ বাত্যা (ঘন্টায় ৫৫-৬৩ মাইল) পর্যন্ত,
৩. বাঢ় ঘন্টায় ৬৪-৭৫ মাইল গতিবেগ সম্পন্ন;
৪. বাঞ্ছা- গতিবেগ ঘন্টায় ৭৫ মাইল ও তার উর্দ্ধে।

অত্র আয়াতে حِلَال (রিয়াহা)-র অর্থ করা হয়েছে 'শান্ত বায়ু', কেননা এ শব্দগুলো সেই বায়ু প্রবাহের নির্দেশ করে যেগুলো মনোরম এবং সেসব বায়ু নয় যেগুলো অত্যন্ত তীব্র বা প্রচন্ড যার বেলায় কুরআনে ব্যবহৃত যথাযথ শব্দ হচ্ছে (দেখুন আয়াত ৬৭ : ১৭)।

২ : ১৮৪ আয়াতের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় বায়ু : ক) মেঘকে বিভিন্ন স্থানে বয়ে নিয়ে যায়; খ) দূষিত বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে তদন্তলে সতেজ ও নির্মল বায়ু বয়ে আনে;

গ) ফুলের পরাগধানী থেকে গর্ভমুড়ে পুষ্পরেণু বহন করে পরাগায়নে সাহায্য করে যা শেষ পর্যন্ত বর্ধিত পরিমাণে ফলোৎপাদনে সহায়ক হয়; এবং ঘ) বায়ুমণ্ডলে এক ধরনের তাপমাত্রার ভারসাম্য আনয়ন করে।

উপরে উল্লিখিত উপকারী ফলগুলোর মধ্যে মেঘকে বিভিন্ন স্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়াটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত জলভারাক্রান্ত মেঘ যখন বায়ু তাড়িত হয়ে শুষ্ক অনুর্বর ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করে (দেখুন ২ : ১৬৪ আয়াত, কীভাবে বৃষ্টির ফেঁটা গঠিত হয় ও মাটিতে পড়ে), তখন ‘মৃত ধরিত্বী’ আল্লাহর ইচ্ছায় প্রাণ ফিরে পায় এবং উর্বর ও সুন্দর হয়ে উঠে। আর সব রকমের শস্য ও ফসলাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

এটা পরিকার যে, বায়ু প্রবাহের অনুপস্থিতিতে : ক) অনুর্বর ভূমি উর্বর হত না কেননা বৃষ্টির পানি সেখানে পৌঁছত না, খ) বাতাস হয়ে পড়ত বদ্ধ ও নিচল এবং দূরিত, গ) ফলের উৎপাদন ব্যাহত হয়ে পড়ত, এবং ঘ) বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার ভারসাম্য একেবারেই নষ্ট হয়ে যেত।

তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন এই সুসংবাদই সে প্রদান করে যে, আল্লাহর করুণা ও রহমত বহু রকম উপকারী ফল আকারে শৈঘ্ৰই আসছে। এভাবে, ‘বায়ুপ্রবাহ সুসংবাদ বহনকারী’ হিসেবে কাজ করে থাকে।

٨-وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَانٌ بِرَأْذِنِ رَتِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا  
نَكِيدًاً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

৭ : ৫৮ এবং উৎকৃষ্ট ভূমি-এর ফসল এর প্রতিপাদকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠোর পরিশ্রম না করে কিছুই জন্মায় না; এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

‘আল-বালাদুত তৈয়েব’ (الْبَلْد طَيِّب) কথাটার অর্থ হলো, উত্তম ভূমি অর্থাৎ সেই মৃত্তিকা যাতে রয়েছে উপযুক্ত ভৌতিক গুণাবলী, পর্যাপ্ত জৈব ও অজৈব পুষ্টিসমূহ এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি আর যথাযোগ্য গ্যাসীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কোন মাটিতে যদি অন্যান্য উপাদান যথা : তাপ, আলো এবং বৃষ্টিপাত কিংবা সেচ সঠিক অনুপাতে বর্তমান থাকে, তাহলে উপরোক্তরপে বর্ণিত মাটিতে সবুজ গাছপালা জন্মে এবং উত্তম মানের পণ্য দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়। কিন্তু বিশুষ্ক ও অনুর্বর ভূমি এমনকি উপযুক্ত তাপ এবং পর্যাপ্ত আলো ও

ପାନିର ସରବରାହ ଥାକା ସତ୍ରେ ଓ ଆଶାବ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ଦିତେ ପାରେ ନା । ଏ ଦୁ'ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟକେ ନିମ୍ନରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ଯେତେ ପାରେ ।

ମୃତ୍ତିକା ଖନିଜ ଯୌଗେ ଆକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨୨ ଟି ସ୍ଥିତିଶିଳ ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଲିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଏ ସକଳ ଖନିଜ ଯୌଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତେ ଓ ଜନବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୀପାଦନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ମୃତ୍ତିକାଙ୍କ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଖନିଜ ପଦାର୍ଥସମ୍ମହିତ ଆକାରେ ଭିନ୍ନ ହୁୟେ ଥାକେ ଯାର ଉପର ଭିତ୍ତି କରେ ମୃତ୍ତିକା କଣାକେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥେ ମୋଟା ବାଲି, ଚିକନ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଲି, ପଲି ଓ କାଦା ଏ ସକଳ ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ କରା ହୁଁ । ବିଭିନ୍ନ ଆକାରେ କଣାର ମିଶ୍ରଣଇ ମାଟିର ଗଠନବିଭାଗ ନିର୍ଧାରଣ କରେ ଥାକେ । ମାଟିର ଶକ୍ତ ଅଂଶ ଅଜେବ ଓ ଜୈବ ଉତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯାର ଅନୁପାତ ଏକେକ ମାଟିତେ ଏକେକ ରକମ ହୁୟେ ଥାକେ । ମୃତ୍ତିକା କଣାସମୂହେର ମଧ୍ୟକାର ଶୂନ୍ୟ ଥାନେ ବାଯୁ ଓ ପାନି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକେ; ଏ ଦୁ'ଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପିଦ୍ଦେର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଫଳଦାନ ନିର୍ଧାରିତ ହୁୟେ ଥାକେ । ମୃତ୍ତିକାର ରାସାୟନିକ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣାବଳୀ ମାଟିକେ ଅଜେବ ପୁଣି ଉତ୍ପାଦନ, ପାନି ଏବଂ ଉଚ୍ଛହାରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନେ ପ୍ରୋଜନ୍ନୀୟ ଅବଶ୍ରାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରତେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେ ଥାକେ । ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଜେବ ରାସାୟନିକ ପୁଣିଇ ଜୀବଦେହସମଟି ଓ ତାଦେର ପରିବେଶହିତ ଜୀବଦେହସମୂହେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଜଟିଲ ଚକ୍ରକାରେ ବିଭିନ୍ନ ହୁୟେ ଥାକେ । ଏଭାବେ, ମୃତ୍ତିକା ବୃଦ୍ଧିପୁଣି ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରପୁଣି ନାମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିନ୍ୟାସିତ ୧୩୨ ମୌଲିକ ପଦାର୍ଥର ଭାରସାମ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରବରାହ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ଥାକେ ।

.. ଅବିରାମ ଚାଷାବାଦେର ଫଳେ ମାଟିର ପୁଣି ଉତ୍ପାଦନେ ଏକଟାନା ଘାଟତି ପଡ଼ିବି ଥାକେ, ଯା ଫସଲ ଉତ୍ପିଦ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରେର ଫଳେ କମତେ ଥାକେ । ମୃତ୍ତିକାର କ୍ଷୟ, ନିଷାଶନ କିଂବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉପରିଭାଗ ଧର୍ମ ହଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସମୂହ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁୟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଓ ନାଇଟ୍ରୋସ ଅକ୍ସାଇଡେ ପରିଣିତ ହୁୟେ ବାୟୁତେ ଫିରେ ଆସେ । କ୍ଷୟ, ଦୂରଣ ଓ ନିଷାଶିତ ପାନିର ଘାଟତିର ମାଧ୍ୟମେ ବିପୁଲ ପରିମାଣ ଫସଫରାସ ନଦୀ ଓ ବାରଣାୟ ଗିଯେ ପଡ଼େ । ଜୀବଦେହଓ ତାଦେର ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ଵାଭାବିକ ପୁଣିଚକ୍ରସମୂହେର ଉପର ମାନୁମେର ବୈରୀ କର୍ମତ୍ତ୍ଵରତାର ରଯେଛେ ମାରାଦ୍ୱାକ ପ୍ରଭାବ । ସଦି ସାର ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷତି ପୁଷ୍ଟିରେ ଦେଯା ନା ହୁଁ ତାହିଁ ଜମି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନେର ଅନୁପ୍ରୁକ୍ତ ହୁୟେ ପଡ଼େ । ଜଟିଲ କ୍ଷେତ୍ରସମୂହେ ମୃତ୍ତିକା ଥାକେ ବିଶେଷ, ଅନୁର୍ବର ଯାତେ କୋନ ବୀଜେର ଅନୁରୋଦଗମ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ସମ୍ଭବ ହୁୟ ନା । ଇଥିଓପିଯାର ବ୍ୟାପାରାଟି ସାମ୍ପ୍ରତିକକାଳେର ଏକଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ।

ଉତ୍ତମ ମୃତ୍ତିକା ଥେକେ ଉତ୍ତମ ଆଲ୍ଲାହର ନେଯାମତସମୂହ ଏବଂ ଅନୁର୍ବର ଭୂମିର ବନ୍ଦ୍ୟାତ୍ମେର ମଧ୍ୟେ ବସ୍ତୁତ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ରଯେଛେ ଏମନ ନିର୍ଦ୍ଦଶନସମୂହ ଯାର କାରଣେ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି ତାଁର ରହମତେର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର କୃତଜ୍ଞ ଥାକା ଉଚିତ ।

٥- بَلْ بُوْلَهُ كَأْجِيْنَهُ وَالذِّيْنَ مَعَهُ فِي الْقَلَبِ وَكَغْرِفَنَا الْبَرِّنَ كَلْبُنَا  
 بِأَيْتَنَا إِنَّهُمْ كَلْبُنَا قَوْمًا عَمِيْنَ ۝

৭ : ৬৪      অতঃপর তারা তর্কে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা তরণীতে ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করি, এবং যারা আমার নির্দশন প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। তারা ছিল এক অঙ্ক সম্প্রদায়।

অত আয়াতে আল্লাহর নির্দশন অঙ্গীকারকারীদের শান্তি স্বরূপ এক মহাপ্লাবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের শান্তি নৃহ নবীর (আ) অনুসারীদের উপর আরোপ করা হয়েছিল। কীভাবে এই প্লাবন সংঘটিত হয়েছিল অত আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়নি।

মহাপ্লাবনের বিবরণ পাওয়া যায় ১১ : ৪০, ২৩ : ২৭ এবং ৫৪ : ১১, ১২ আয়াতসমূহে। প্রথম দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে : 'চুল্লি উখলে পানি বের হল', ৫৪ : ১২ আয়াতে বলা হয় : 'আমরাই মাটি থেকে পানির বরণা প্রবাহ উখলে দিলাম' এবং ৫৪ : ১১ আয়াতে বলা হয় : 'আমরাই আসমানের দ্বার খুলে দিলাম যাতে প্রবাহিত হল পানির স্তোত্রধরা।' এসব আয়াতের বক্তব্য একসাথে বিবেচনা করা হলে যা দাঁড়ায় তাহলো : প্লাবনটি সংঘটিত হয়েছিল (১) বৃষ্টি, এবং (২) মাটির নিচ থেকে উখলে উঠা পানি দ্বারা।

অনেক জাতিগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যেই একটা ব্যাপক ও ধ্রংসাত্মক মহাপ্লাবনের কথা নানাভাবে ও ভাষ্যায় কথিত আছে। আল কুরআন, বাইবেল ও তওরাতে যদিও নৃহ নবীর (আ) যামানায় একটা প্লাবন হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, তথাপি কোন কিতাবেই এ প্লাবনের সঠিক তারিখ ও স্থানের উল্লেখ নেই। এ সকল কিতাবে প্লাবনের একই কারণ উল্লিখিত হয়েছে তথা : বৃষ্টির পানি এবং মাটির তলা থেকে উখলে উঠা পানি। এ তিনটি ধর্মের পেক্ষাপটে পৃথিবীর প্রতিবেশিক ইতিহাসকে প্লাবন-পূর্ব এবং প্লাবনোন্তর সময়কাল এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কুরআনের বর্ণনার ভিত্তিতে এটা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, নৃহ (আ)-এর নৌকা যে যায়গায় এসে থেমেছিল বা আটকে গিয়েছিল তা ছিল জুনি পর্বত (আয়াত ১১ : ৪৪) এবং বাইবেল পূর্বভাগ জেন ৯ : ৪ মতে, এটি ছিল আরারাত পর্বত। হযরত নৃহ (আ) ছিলেন দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের লোক। ভূতত্ত্ববিদ্গণ বিভিন্ন কারণ অনুসারে প্লাবনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন, যথা : ১) নদী বন্যা, ২) গলিত তুষার বন্যা, ৩) বরফ তৃপীকৃত হওয়ার কারণে বন্যা, ৪) হিমবাহ, ৫) ভূমিধস,

୬) ଉଲକା ସୃଷ୍ଟ ଉପଦ୍ରବଜନିତ ବନ୍ୟ, ୭) ଅ-ଉଷ୍ଣମନ୍ଦଲୀୟ ମହାସାଗରେର ଝଡ଼, ୮) ବେଳୋର୍ମି ତଥା ଶ୍ରଚୂତି କିଂବା ଅନ୍ୟ କୋନ କାରଣେ ମହାସାଗର ତଳେର ଆକଷିକ ଆଲୋଡ଼ନ ଅଥବା ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଆକଷିକ ଅଗ୍ର୍ୟେତାରେ କାରଣେ ସଂଘଟିତ ପ୍ଲାବନ ।<sup>୨</sup>

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଭୂତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ ଏମିଲିଆନି ଏବଂ ତାର ସହକର୍ମୀଗଣତ୍ତ୍ଵରେ ଖ୍ରି: ପୃଃ ୧୬୦୦ ସାଲେ ଉପକୂଳୀୟ ପ୍ଲାବନେର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରମାଣେର ବିବରଣ ତୁଲେ ଧରେଛେ । ଉପକୂଳୀୟ ବନ୍ୟ ଦୁ' ଧରନେର । କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘଟେ ଉକ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ଵଖଳାର କାରଣେ ଆର ବାକୀଗୁଲୋ ଘଟେ ଭୂକଷ୍ପନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାର କାରଣେ ।

ହିମବାହୀୟ ଚକ୍ର ଏବଂ ସାଗରତଳେର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଚେର ଦିକେ ନେମେ ଯାଓଯା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଗରେର ଉପରିତଳେର ଉଚ୍ଚତାଯ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯେଛେ । ଫେଯାରବିଜ୍ ୪-ର ମତେ, ବିଗତ ମହାପ୍ଲାବନ ଚଲାକାଲେ ହିମବାହୀୟ ସିକି ଶତାବ୍ଦୀତେ ସାଗର ଶ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତା ୧୦୦ ମିଟାର ବୃଦ୍ଧି ପେଯେଛି । ଦଜଳା ଓ ଫୋରାତ ଉପତ୍ୟକାଯ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତ୍ୱାତ୍ମିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣାଦି ଏବଂ ମିସିସିପି ଉପତ୍ୟକାଯ ପ୍ରାଣ ଭୂତତ୍ୱିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣାଦି ୬୦୦୦ ବହୁ ଆଗେ ସଂଘଟିତ ଚରମ ଦୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରୂହ ଓ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷକ ପ୍ଲାବନେରେଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଯ । ଯତଦୂର ଜାନା ଯାଯ, ପ୍ରଥମ ଯେ ଐତିହାସିକ ପ୍ଲାବନଟି ରେକର୍ଡ କରା ହୁଏ ସେଟି ଛିଲ ଖ୍ରି: ପୃଃ ୨୨୯୭ ସାଲେ ଚୀନେର ହୋଯାଂ ହୋ ନଦୀର ବନ୍ୟ । କୁରାନେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ଲାବନେର କାରଣ ଛିଲ ୧) ବୃଷ୍ଟିର ପାନି ଏବଂ ୨) ମାଟିର ନିଚ ଥିକେ ଉଥିଲେ ଉଠା ପାନି । ଆର ଆଧୁନିକ ଭୂତତ୍ୱିକ ଶ୍ରେଣୀବିନ୍ୟାସେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ବନ୍ୟାର କାରଣ ମିଶ୍ର ତଥା : ୧) ନଦୀତେ ବନ୍ୟ ଏବଂ ୨) ଉକ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିକ୍ଷେପ ବା ଉତ୍ତେଜନା । ନଦୀର ବନ୍ୟାଇ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଯା ଯେ କୋନ ଝାତୁତେଇ ଘଟିତେ ପାରେ । ଏ ଧରନେର ବନ୍ୟାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ କାରଣେର ମଧ୍ୟେ ରହେଇ : ଭାରୀ ବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଲକ୍ଷଣୀୟଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି । ଏଇ ପ୍ରକାରେର ବନ୍ୟାର ଆଗାମ ଆଭାସ ପାଓଯା ସଭ୍ବ । ୧୦୦ ବର୍ଗମାଇଲ ଏଲାକା ପାନି ବିଧୌତକାରୀ ମାଝାରି ଆକୃତିର ନଦୀର କ୍ଷେତ୍ରେ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ରେକର୍ଡେର ଉପର ଭିତ୍ତି କରେ ବନ୍ୟାର ପୂର୍ବଭାସ ଦେଯା ସଭ୍ବ । ଅଧିକତର ବୃହତ୍ ଅନ୍ଧଳ ବିଧୌତକାରୀ ଦୀର୍ଘତର ନଦୀର କ୍ଷେତ୍ରେ ଆରୋ ବେଶୀ ସଠିକ ପୂର୍ବଭାସ ଦେଓଯା ସଭ୍ବ । ନୁହ ନବୀ (ଆ) ଆଙ୍ଗାହର ନିକଟ ଥିକେ ପ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନେର ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାବନେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱାଣୀ କରେଛିଲେନ, ଯେ ସମ୍ପର୍କେ ୭ : ୬୨, ୧୧ : ୩୭ ଏବଂ ୨୩ : ୨୭ ଆୟାତତ୍ୱ ଥିକେ ସିନ୍ଧାନ୍ତେ ପୌଛା ଯାଯ । ୫୪ : ୧୧, ୧୨ ଆୟାତଦୟର ମତେ, ପ୍ରଥମେ ଏସେଛିଲ ବୃଷ୍ଟି ଆର ତାରପରେଇ ଉକ୍ତ ବିକ୍ଷେପ । ଉକ୍ତ ବିକ୍ଷେପ ହେଁ ଥାକେ ଭୂ-କଷ୍ପୀୟ ବିକ୍ଷେପ ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଭୂମିକଷ୍ପ, ସାଗରତଳୀୟ ବିକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଏମିଲିଆନିର ମତେ, ବିଗତ ୬ ହାଜାର ବହୁ ଧରେ ଗଡ଼ପଡ଼ତା ସାଗରତଳୀୟ ଉଚ୍ଚତା ଆପେକ୍ଷିକଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତି ରହେଛେ । ବିଗତ ୬ ହାଜାର ବହୁରେ ସାଗରତଳୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ବର୍ତ୍ତମାନେର ୧୦ ଥିକେ ୧୨ ଫୁଟ ବେଶୀ ବା କମ ଉଚ୍ଚତାଯ

বেশ-কম হয়েছে। ১১০০ থেকে ১৬৫০ বছরের শব্দবিজ্ঞান থেকে মনে হয় সাগরতলের উচ্চতায় কমবেশী হওয়ার সময়কাল হবে প্রায় ৫৫০ বছরের এক চক্রের মত।

জীবাশ্ম রেকর্ড, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং একাড়ীয়, সুমেরীয়, বেবিলনীয় এবং নিনেভীয় তথ্য প্রমাণাদির কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনার সাথে এত মিল পাওয়া যায় যে, এই প্লাবনের সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বিভিন্ন বর্ণনার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। বিশেষত স্যার লিওনার্ড উলীর 'উর অফ দ্য শ্যালডিস'-এর প্রকাশনার পর থেকে।<sup>৫</sup>

মেসোপটেমীয় নদী-উপত্যকার অন্যান্য প্রধান শহর যথা কিশ, ফারে এবং নিনেভে-তেও প্লাবন শর দেখা যায়, যদিও এদের কোনটাকেও সময় দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করা যায় না। অন্য কথায়, মেসোপটেমীয় প্লাবনের সাক্ষ্য প্রমাণ নিছক দজলা ও ফোরাতের স্থানীয় প্লাবনকেই নির্দেশ করে। আল কুরআন নৃহ-নবীর (আ) অনুসারীদের সাথে মহাপ্লাবনকে সম্পৃক্ত করেছে (৭ : ৫৯, ২৫ : ৩৯ আয়াত দৃঃ), অর্থাৎ প্লাবনটি ছিল স্থানীয়, বিশ্বব্যাপী নয়।

আধুনিক জ্ঞানের আলোকে দেখলে প্লাবনটির কুরআনে বিধৃত বর্ণনায় এমন কিছু নাই যা কোন বিষয়গত সমালোচনার জন্ম দিতে পারে।<sup>১</sup>

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সত্য বেরিয়ে আসে। যথা : ১. নৃহ (আ) নবী আল্লাহর নির্দেশে একটা সুবিশাল 'নৌকা' নির্মাণ করেছিলেন; ২. প্লাবনটি সংঘটিত হয়েছিল সংযুক্ত ভূতাত্ত্বিক ও উক্তা বিক্ষোভের কারণে; ৩. নৃহ (আ) আল্লাহর নির্দেশনায় বিপর্যয়কর প্লাবনটির আগাম পূর্বাভাস দিতে পেরেছিলেন; ৪. আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানসমূহ মেসোপটেমিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে এমন একটা মহাপ্লাবন সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করে যা কুরআনের অধিকাংশ মুফাস্সির সেই মহাপ্লাবনের সংঘটনস্থল বলে গ্রহণ করে থাকেন।

নৃহ (আ)-কে জাহাজ নির্মাণ প্রকৌশলের অগদৃত বিবেচনা করা যায়। তাঁর অনুসারীগণের পক্ষে জাহাজ নির্মাণে কোন অভিজ্ঞতা থাকাটা সম্ভব ছিল না, কেননা, তারা কোন সমুদ্রগামী জাতি ছিল না। এমনকি আধুনিক কম্পিউটার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও আবহাওয়াবিদগণ বন্যা সম্পর্কে সঠিক-নির্ভুল দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস দান দুরহ ব্যাপার বলে মনে করেন। বিশেষত এই আবহাওয়াগত সমস্যার ক্ষেত্রে জড়িত বহুসংখ্যক স্থিতিমাপের দৃষ্টিতে সত্য বিশ্বয়কর যে, হযরত নৃহ (আ) নির্ভুলভাবেই প্লাবনের পূর্বাভাস লাভ করেছিলেন এবং এটা তাঁর পক্ষে তখনই সম্ভব হয়েছে যখন তিনি আল্লাহর নিকট

থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আল কুরআন ‘চৌদশ’ বছর আগে এ ঘটনা রেকর্ড করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানসমূহ দ্বারা যার সত্যতা নিশ্চিত হয়।

### তথ্য সূত্র :

1. Bucaile. M., The Bible, the Quran and Science, p. 218, 1985.
2. Encyclopaedia Americana, American Corporation International, Connecticut, 1979.
3. Emiliani, C., et al Paleo Climatological Analysis of Late Quarternary Cores from North Western Gulf of Mexico, Science, 1, p. 1085, 1975.
4. Farbridge, R. W., The Changing Level of the Sea, Scientific American, pp. 1-11, 1960.
5. Wolley, L., Ur of the Chaldees, Vol. II, 1954.

۷۔ وَلُوطَاطِإِذْ قَالَ لِغَوْمِيَةَ أَتَأْتُونَ الْفَاجِحَةَ مَا سَبَقُكُلُّهُ،ْ يَأْمُنْ تَحْبُّقَنَ  
الْعَلَيْنَ ۝

۸۔ إِنَّكُلُّ شَاهِنَّوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ ۝

۷ : ۸۰ এবং লৃতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্পদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুর্কর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।'

۷ : ۸۱ 'তোমরা তো কাম-ত্পুরি জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন করছ, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্পদায়।'

۷ : ۸۰ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, হ্যরত লৃত (আ)-এর অনুসারীরা যৌনবিকৃত জাতি ছিল, তাদের অধিকাংশ পুরুষই আল্লাহর অনুমোদিত অন্য বা বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌনক্রিয়ার স্থলে পুরুষের সাথে সমকামিতা পছন্দ করত। আল্লাহ আরো বলছেন যে, লৃত জাতির আগে বিশ্বের কোন জাতি বা গোষ্ঠীই এ ধরনের পাপ কাজে লিঙ্গ হয়নি। ইহুদিদের বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে, লৃত (আ)-এর অবদেশ সোডোম এবং গোমোরারাহ নামে পরিচিত ছিল এবং যৃত সাধারণের দক্ষিণ প্রান্তভাগে অবস্থিত ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। এ ধরনের যৌন বিকৃতি প্রধানত পুরুষদের সমলিঙ্গ যৌনকর্ম বা পায়ুকাম নামে পরিচিত।

পাঁচটীন এশীরীয়, মিশরীয়, ক্যাটগাগনিয়ান, সিথীয়ান, নরমান, রোমক এবং গ্রীক জাতিসমূহের মধ্যে এই যৌন বিকৃতির ব্যাপারটা জানা ছিল। কোন স্থানেই তবে এটা না ছিল কোন সাধারণে প্রচলিত ব্যবস্থা আর না ছিল চিরন্তন কোন চর্চারীতি। কুরআনের ভাষ্যমতে, সোডোম ও গোমোরাহবাসীরা এদিক দিয়ে ছিল অদ্বীয়।

লৃত জাতির লোকদের অসচরিত্রার প্রকৃতি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে এবং ۷ : ۸۰ আয়াতে অসচরিত্রা দ্বারা পুরুষ সমকামিতার দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমকামিতাকে আল্লাহর নির্দেশিত সীমার লংঘন হিসেবে ঘৃণ্যন্তিনাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান সমলিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি যৌন অনুভূতিকে যৌন বিকৃতি হিসেবে গণ্য করে এবং এটি নানাভাবে তথা যৌন বিপর্যয়, উল্টো যৌনানুভূতি এবং অধিক সাধারণে সমকামিতা হিসেবে পরিচিত।

ମଧ୍ୟୟୁଗେ ଇଉରୋପେ ସମକାମିତା ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛିଲ ସାମରିକ ଶିବିର ଏବଂ ମଠ ବା ଆଶ୍ରମସହ କିଛୁ କିଛୁ ସୀମାବନ୍ଦ ଗୋଟୀର ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ପ୍ରାୟଚିତ୍ର ବିଧାନ ଗଛେ ସର୍ବଦାଇ ଏଟିର ଉତ୍ତରେ କରା ହେଁ ଥାକେ । କୋଲିୟାର୍ସ-ଏର ବିଶ୍ୱକୋଷେ ବ୍ରାସେଲ୍‌ସ୍ୱୀଳିଖନେନ ଯେ, ସମକାମିତା ସାଧାରଣଭାବେ ପଞ୍ଚାଦମୁଖୀ ମାନସିକ ଗୋଲଯୋଗ, ମାନସିକ ବ୍ୟଧିଗ୍ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ, କିଛୁ କିଛୁ ମଦ୍ୟପାଯୀ ଓ ମାଦକାସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଚିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମୂହେ ବସବାସକାରୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଦେଖା ଯାଇ । ଫ୍ରେଡ ସମକାମିତାକେ ପ୍ରୟାରାନଇୟା ବା ମନ୍ତ୍ରିକ ବିକୃତି ଏବଂ ମାଦକାସଙ୍ଗର ସାଥେ ସମ୍ପ୍ରକ୍ରମ କରେଛେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲକରେ ସାଥେ ମୌନ ସଂସଗକାରୀ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ଧରନେର ସମକାମିତା ଦେଖା ଯାଇ ତାର ନାମ ଦେଇ ହେଁବେ ‘ପିଡାର୍ୟାସଟି’ ପାଶତ୍ୟ ଦେଶଗୁଲୋତେ ସାମ୍ପ୍ରତିକକାଲେ ପୁରୁଷ ସମକାମିତା ଅନେକ ପ୍ରଚାର-ପରିଚିତି ପେଇସେ ଏବଂ କିଛୁ କିଛୁ ଦେଶେ ଏଟି ବେଶ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟତାଓ ଲାଭ କରେଛେ । ବିଗତ ଦଶକ ଥିକେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟର ସମକାମିଦେର ମଧ୍ୟେ ଏଇଡସ AIDS-(ଏକୋଯାର୍ଡ ଇଞ୍ଚିଟନ ଡେଫିଶିଆର୍ସି ସିନଟ୍ରୋମ) ନାମେ ଚିକିତ୍ସା ଅଯୋଗ୍ୟ ଏକ ଧରନେର ରୋଗେର ଖବର ପାଓଯା ଗେଛେ ଯା ବହସଂଖ୍ୟକ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯେଛେ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ସମସ୍ତ ଇଉରୋପ ଓ ବିଶ୍ୱର ଅପରାପର ଅଂଶେ ଏଇଡସ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଏଟି ଏକଟି ଭାଇରାସଜନିତ ରୋଗ ଯା ସଂକ୍ରମଣେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା କମିଯେ ଫେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣନାଶକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଁ । ଏଇଡସ ପ୍ଲେଗ ରୋଗେର ମତ ମାନବ ଜୀବନେର ଜନ୍ୟେ ବିରାଟ ହମକି ହିସେବେ ବ୍ୟାପକତା ଲାଭ କରେଛେ (ପରିଶଷ୍ଟ-୩ ଦେଖୁନ) ।

#### ତଥ୍ୟ ସୂତ୍ର :

1. Brussels, J. A. Collier's Encyclopaedia, Vol. 17, New York. p. 499, 1956.

٦-٨. وَمُهْلِكًا عَلَيْهِمْ مَكْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

৭ : ৮৪ তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।

এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, লৃত (আ) নবীর অনুসারীদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল, যারা ছিল পাপী। না সেই বর্ষণের প্রকৃতি, আর না তার পরিণতির কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ আয়াতে। এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে সেই সকল আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যাতে নূহ (আ)-এর সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলি বিধৃত হয়েছে। আরো দশ দশটি আয়াত রয়েছে যাতে এ ঘটনাটির বিবরণ পাওয়া যায়। এ আয়াতগুলো হচ্ছে : ৭ : ৪; ১১ : ৮২; ১৫ : ৭৩, ৭৪; ২১ : ৭৪; ২৭ : ৫৮; ২৯ : ৩৪; ৩৭ : ১৩৬; ৫১ : ৩৩; ৫৪ : ৩১।

এমন কোন স্থান বা দেশের উল্লেখ নেই যেখানে এই লোকেরা বাস করত এবং এ সকল ঘটনা ঘটেছিল, শুধুমাত্র দু'টি আয়াত ছাড়া যাতে বলা হয়েছে যে, এটি ছিল সেই কাফেলা চলার পথ যা আরবরা কুরআন নাখিলের সময়ে ব্যবহার করত। বাইবেলে হ্যারত লৃত (আ) নবীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'আচমকাই প্রভু সোডোম ও গোমোরাহতে গুরুক বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাদেরকে ও সেখানকার লোকজন এবং জমিতে যা কিছু জ্যোছিল সব কিছুসহ সমগ্র উপত্যকা ধ্বংস করে দেন। (সৃষ্টিতত্ত্ব ১৯ : ২৪, ২৫)। সোডোম ও গোমোরাহর বিষয়টি ৭ : ৪ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘটনাটি সম্পর্কে প্রাণ কুরানের এগারোটি আয়াতের মধ্যে তিনটি শুধুমাত্র বৃষ্টির (বর্ষণ) কথাই বলে, বর্ষণের প্রকৃতি এবং এর পরিণতি সম্পর্কে কিছু বলে না। দু'টি আয়াতে (আয়াত ১১ : ৮২ এবং ১৫ : ৭৪) বলা হয় যে, কঠিন ইটের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। একটিতে (আয়াত ১৫ : ৭৪) বলা হয়েছে যে, শহরগুলো উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ ভূমিকম্প হয়েছিল। আরেক আয়াতে (আয়াত ৫১ : ৩৩) বলা হয়েছে যে, মৃত্তিকা প্রস্তর পাঠানো হয়েছিল। দু'টি আয়াতে (আয়াত ১৫ : ৭৩ ও ৫৪ : ৩১) বলা হয় যে, প্রচন্ড বিক্ষেপণের শব্দ সমগ্র এলাকাটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

٩-١٠. فَأَخْذَ تِلْمِعَ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُنُونِ

৭ : ৯১ অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তাদের প্রভাত ইল নিজগৃহে অধোমুখে পতিত অবস্থায়।

এ আয়াতে ভূমিকম্প দ্বারা জীবন ও সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভূমিকম্প কর্তৃক ধ্বংসাত্মক ক্ষয়ক্ষতির বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক ভূমিকম্পে সান ফ্রান্সিসকোতে আড়াই লাখ লোক মারা যায়। ১৯৩৪ সালে বিহারে সংঘটিত ভূমিকম্প এবং কোয়েটায় সংঘটিত আরেক ভূমিকম্পেও হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটে।

ভূপৃষ্ঠের কাঁপুনি বা ঝাঁকুনিগত আন্দোলনই হচ্ছে ভূমিকম্প। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটির তীব্রতা শুধুমাত্র সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে উপলব্ধি করার মত। সামান্য ভূকম্পন থেকে শুরু করে ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনকারী বিরাট আলোড়ন পর্যন্ত হয়ে থাকে যা জীবন ও সম্পদের প্রভৃতি ধ্বংস দেকে আনে। ভূমিকম্পের ভূগর্ভস্থ উৎপত্তিস্থলকে বলা হয়ে থাকে কেন্দ্রবিন্দু, আর কেন্দ্রবিন্দুর সোজা ভূপৃষ্ঠস্থ বিন্দুকে বলা হয়ে থাকে উপকেন্দ্র।

১৯৩৫ সালে সি এফ রিখ্টার ভূমিকম্প মাপার জন্য রিখ্টার ক্ষেলের প্রবর্তন করেন। এই ক্ষেল ভূমিকম্পের মাত্রা M-কে নির্মোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে : এম = লগ<sub>10</sub>(এ/এও), যেখানে এ (A) হচ্ছে উপকেন্দ্রের একশ' কিলোমিটার দূর থেকে ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি, এও (A<sub>0</sub>) হচ্ছে এক মিলিমিটারের এক সহস্রাংশ বিস্তৃতি। ৫ কিংবা ততোধিক বিস্তৃতি বিশিষ্ট ভূমিকম্প বিভিন্ন ভবন কাঠামো ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট মারাত্মক ভূ-আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকে।

খুবই স্বল্প স্থায়িত্ব এবং মাঝারী তুরণের কারণে ৫.০-এর কম মাত্রায় ভূ-আলোড়ন ধ্বংসাত্মক হয় না। ইতিপূর্বে অনুমান করা হত যে, শিলাস্তরের স্তরচূড়তি সৃষ্টিকারী ভূগর্ভস্থ আলোড়ন কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে প্রদত্ত ঝাঁকি থেকেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

আগেয়গিরির কার্যকলাপ চলাকালে গ্যাস কিংবা লাভা দ্বারা, অথবা পর্বতগুহার ছাদ ভেঙ্গে পড়া থেকেও ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বিগত বিশ বছরে ভূবিজ্ঞানে এক বিপুব সাধিত হয়েছে যা আমাদের এই গ্রহ সম্পর্কে নতুন ধারণা এনে দিয়েছে। এই বিপুবের ফলে যে সকল বল মহাদেশের আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের সম্প্রবাহ বজায় রাখে সেগুলো সম্পর্কে অধিকতর ধারণা দান করেছে। আমাদের গ্রহটির ভূ-পৃষ্ঠাটি বেশ কিছুসংখ্যক শীতল, শক্ত, একশ কি.মি. পুরু শিলাময় ভূ-ফলকের টুকরায় বিভক্ত। এগুলো এসথেনেস্ফিয়ার নামে পরিচিত একটা উষ্ণ, অপেক্ষাকৃত নমনীয় এবং অংশত গলিত অঞ্চলের উপর ভাসছে। ফলকগুলো ধীরে ধীরে বার্ষিক ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার গতিতে চলে এবং

এগুলো দৃশ্যত বহিরাবরণে তাপ সঞ্চালন গতি এবং অভিকর্ষ দ্বারা তাড়িত। ভূতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, কিছু পরিমাণে নতুন নতুন শিলা বহিরাবরণ থেকে সমুদ্রতলস্থ পর্বত শ্রেণীর ধার ঘৰে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে এবং পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ছে এবং নতুন ভূত্বক গঠন করছে যা মহাদেশের দিকে এগিয়ে আসছে। সমুদ্রতলস্থীতি নামীয় এই প্রাকৃতিক ঘটনাই ভূ-ফলকের সম্পূর্ণ ঘটিয়ে থাকে। অধিকাংশ ভূভাগীয় ঘটনাই সংঘটিত হয় যখন ভূ-ফলকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদগীরণ, পর্বত গঠন ইত্যাদি ভূফলকসমূহের ব্যাপক অথচ ধীরগতিসম্পন্ন সংঘর্ষের ফলেই ঘটে থাকে। যদি তারী মহাসাগরীয় শিলার একটা ফলক অধিকতর প্রবর্মান কোন মহাদেশীয় শিলা ফলকের সাথে ধাক্কা খায়, তাহলে এটি ঐ ধাক্কার চাপে ভিতরের দিকে বসে যায়। এটি ভিতরে ঢুকে যেতে থাকলে উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত গলে উপরের দিকে উঠে যায় এবং আগ্নেয়গিরির মধ্য দিয়ে বিস্ফোরিত হয়। দুটি মহাদেশীয় ভূ-ফলকের মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাঁধে, তখন সংঘটিত হয় ভূমিকম্প। মারাওক অবস্থার ক্ষেত্রে মহাদেশসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় গড়ে উঠে রকি এবং হিমালয় পর্বতমালার মত বিশাল ভঙ্গিল পর্বতমালা। কাজেই, ভূ-ফলকসমূহের চাপ যখন তাদের দৃঢ়তাকে ছাড়িয়ে যায় তখনই ফলকসমূহের বহির্দেয়ালে ভূমিকম্প ঘটে। তখন ভূত্বকে ফাটল দেখা দেয় এবং ফলকসমূহ সরে যায় যাতে চাপ এতটা কমে যায় যে, তা শিলাগুলোর পক্ষে সহজীয় হয়।

প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে ভূতলের বলতে গেলে গোটা দুই অঞ্চলে; একটি হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের রেখা বরাবর তথা এশিয়া মাইনর, হিমালয় পর্বতমালা এবং পূর্বভারতীয় দ্বিপপুঞ্জে যা ইউরো-এশিয়ান, আরব, অস্ট্রে-এশিয়া এবং ফিলিপাইন ভূ-ফলকের সীমারেখা। অপ্রতি পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা বরাবর যা প্রশান্ত মহাসাগরীয়, উত্তর আমেরিকার এবং দক্ষিণ আমেরিকার ভূ-ফলকের সীমারেখা।

—فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِمُ الظُّفَرَأَنَّ وَالْجَرَادَ وَالْفَعْلَلَ وَالْحَسَقَادَعَ وَالدَّمَائِيتَ  
—مُفَضَّلٌ —فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْزِيَنَ○

৭ : ১৩৩ অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্রিট করি। এগুলো হচ্ছে স্পষ্ট নির্দেশন; কিন্তু তারা দাঙ্গিকই রয়ে গিয়েছিল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

অত্র আয়াতে মূসা (আ) এবং তার অনুসারীদের নিকট আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি প্রেগ তথা মহামারী রোগব্যাধি বা চরম দুর্দশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূসা (আ) কর্তৃক বারংবার সতর্কবাণী দেয়ার পরও কৃত ওপন্ত্যের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ্ এ সকল মুসিবৎ পাঠিয়েছিলেন যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

‘আততুফান’ (الطفافان) অর্থ অবিরাম বর্ষণ, সেই সাথে বড়-বঝঁঝা। এ সকল প্রাকৃতিক ঘটনা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাধারণ ব্যাপার, যা এখনে আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরকার পড়ে না। তেমনি, ‘কুম্হাল’ (قمل) অর্থ কীট, মুষিকাদি তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরভূক পোকা যেগুলো মানুষের অসুবিধা ঘটায় ও সেই সাথে রোগবালাইকে আশ্রয় দেয় এবং রোগজীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে জোকের কথা উল্লেখ্য, যা সাংঘাতিক শারীরিক অসুবিধা সৃষ্টি করে কিংবা উদ্ভিদের পোকার কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের নাশকতামূলক তৎপরতা কোন কোন অবস্থায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় যা তাদের দ্রুত বর্ধনে সহায়ক এবং এখনে সেগুলো আর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করা হল না।

পঙ্গপাল : পঙ্গপাল অর্থপৃটোর শ্রেণীর ইন্সেষ্টা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। বিঁধি পোকা এবং ফড়িং এ জাতীয় প্রাণী যাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জোরালো চিবন-চোয়াল, এবং লাফানোর জন্যে বড় আকারের পেছনের পা। এরা দেখতে ঠিক বড় ঘাস ফড়িং এর মত। বহু সংখ্যকের একসাথে উপস্থিতিতে এরা সঙ্গলিঙ্গ হয়ে পড়ে, অর্থাৎ দলবদ্ধ হতে চায়। এরা দিনের বেলা লাখ লাখ এমনকি অনুকূল বায়ু প্রবাহ এবং তাপগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে বহু লক্ষ সংখ্যা বিশিষ্ট বিশাল ঝাঁকে এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যায়। এই ঝাঁক মাটি থেকে বেশ উঁচু পর্যন্ত এমনকি সম্ভবত এক হাজার মিটার কিংবা তারও বেশী বিস্তৃত হয়ে থাকে।<sup>1</sup> ঘন্টায় ১০ থেকে ২৫ কিলোমিটার গতিতে এমন বিশাল সংখ্যক পঙ্গপালের ঝাঁক যখন আসে তখন এরা আকাশ কালো বা অঙ্ককার করে ফেলে। এরা সবুজ গাছপালার সন্নিকটে উন্মুক্ত স্থানে ডিম পাড়ে এবং অনুকূল অবস্থায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশাল সংখ্যায় বংশ বিস্তার ঘটায়। ‘সিন্টোসেরা গ্রেগ্যারিয়া’ নামীয় মরম্ভূমির পঙ্গপাল পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত দেখা যায় এবং উত্তরে ইরান থেকে দক্ষিণে কেনিয়া পর্যন্ত এদের বসবাস অঞ্চল বিস্তৃত।

‘লোকস্টা মাইথেটরিয়া’ নামে অতিথি পঙ্গপাল অনেক বেশী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের অবস্থান আফ্রিকা থেকে পূর্বে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।<sup>1</sup> নিকটপ্রাচ্যে পঙ্গপাল সর্বদাই প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান, বছরের ঝাঁকে ঝাঁকে কিছু সময় বাদে এদের দেখা যায়। দর্শন ও রাসায়নিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে এরা

এদের খাদ্য এবং খাদ্যের অবস্থান নির্ণয় করে থাকে। এরা প্রাচীন মিশরে<sup>১</sup> আবাদকৃত বহু রকম শস্যের উপর চড়াও হত, যেমন : গম, বালি, রাই এবং শণ। পঙ্গপালের পূর্ণ আহারের পরিমাণ এর দেহের ওজনের শতকরা প্রায় ১৫% ভাগ। সারাদিন ধরে খাদ্য খাওয়ার সুযোগ পেলে এরা দৈনিক নিজ দেহের ওজনের সমান শস্য খেয়ে ফেলতে পারে। ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বিস্তৃত এক বাঁক পঙ্গপাল দিনে মোট ২ হাজার টনের মত সবুজ শস্য সাবাড় করে ফেলে।<sup>৩</sup> এভাবেই, পঙ্গপাল বিশেষত আফ্রিকা ও এশিয়ায় খাদ্য শস্যের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে থাকে এবং ফেরাউনের মিশরে এরাই দুর্ভিক্ষের কারণ ঘটিয়ে থাকবে এটা সুনিচিত।

**ব্যাঙ :** প্রাচীন মিশরে ক্ষতিকারক পোকা হিসেবে ব্যাঙ অপরিচিত ছিল না। নদ-নদীসমূহ পৃতিগন্ধময় হয়ে পড়লে কিছু রাসায়নিক পদার্থ এবং পোকাজীবন যুক্ত হয়ে ব্যাঙের বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফেরাউনের সময়কালে সহসাই যে ব্যাঙের সংখ্যা বেড়ে যায় তার কারণ হতে পারে এই যে, নিম্নে আলোচিত লোহিত জোয়ারে পানি দূষণের কারণে জল সাপের মত ব্যাঙ শিকারী প্রাণীর ব্যাপক মড়কের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটেছিল।

**রক্ত :** স্পষ্টতই এটি 'লোহিত জোয়ার' নামে এমন এক প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে সম্পর্কিত যা প্রাচীন কাল থেকেই পরিচিত এবং যার পুনরাবৃত্তি ঘটতে ঘটতে বর্তমানকাল পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। সাগরের পানি যখন বিশেষত ডাইনোফ্রাগেলেটস সহ ভাসমান জীবাণুসমূহে ভরে যায়, যার মধ্যে রয়েছে রক্তিম কিংবা বাদামী রঞ্জকতন্ত্র, তখন পানি স্থচ্ছতা হারিয়ে লাল হয়ে যায়। আর এথেকেই সৃষ্টি হয় 'লোহিত জোয়ার' যা প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের অনেক অংশেই পরিচিত। মিশরের লাগোয়া লোহিত সাগরের মত কিছু কিছু পরিবেশ এতই সাধারণ যে, এই নাম অনুসারেই এর নামকরণ পর্যন্ত হয়ে গেছে।<sup>৩</sup> যে সমস্ত কারণে 'লোহিত জোয়ার' ঘটে থাকে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করা হয় না, পৃষ্ঠি স্তর, নকশা অঙ্কন ধাতুর উপস্থিতি, পয়ঃপ্রণালী নিঃসরণ, সাগরের লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং আলো-এসব কিছুই কোন ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিরূপ অবস্থায় ডাইনোফ্রাগেলেটসমূহ পানির তলায় চলে যায় এবং নতুন উদ্যমে তৎপর হওয়ার মত অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রামার্থ স্থ স্থ পুঁজকোষ সৃষ্টি অবস্থায় থাকে। কিছু কিছু ডাইনোফ্রাগেলেট যে বিষ উৎপাদন করে থাকে তা অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায় জৈববিষ। এতে মাছ সরাসরি

ବିଷାକ୍ତ ହୟେ ପଡ଼ତେ ପାରେ । ଚିଥି ବା କାକଡା ଜାତୀୟ ଖୋଲବିଶିଷ୍ଟ ମାଛ ଏତୋଳେ ଦ୍ୱାରା ସରାସରି କ୍ଷତିଗ୍ରହଣ ନା ହଲେଓ ଏଦେର ସଂଖ୍ୟାତ ବିଷ ମାନୁବେର ଭକ୍ଷଣେର ପକ୍ଷେ ବିପଞ୍ଜନକ । ୧୯୭୨ ସାଲେ ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ନିଉ ଇଂଲ୍ୟାନ୍ଡ କୋଟ୍ ସର୍ବଥମ ଲୋହିତ ଜୋଯାର - ଏର ଅଭିଭବତା ଲାଭ କରେ ଯାତେ 'ଗୋନିଆଉଲ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟାଭ୍ୟାଟ୍' ତଥା ଡାଇନୋଫ୍ଲ୍ୟାଗଲେଟ ଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ଖୋଲବିଶିଷ୍ଟ ମାଛ ଖୟେ ବିଷକ୍ରିୟାଯ ୨୬ ଜନେର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟେ । ଲୋହିତ ଜୋଯାର ଏକଟା ପୌନଃପୁନିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମସ୍ୟା । ୧୯୭୪ ସାଲେ ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର ପଞ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ୧୮୪୪ ସାଲେର ପର ପଞ୍ଚିମ ବାରେର ମତ ଲୋହିତ ଜୋଯାରେ ବିଧିଗ୍ରହଣ ହୟ, ଯାତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମରା ମାଛ ସାଗର ସୈକତ ଜୁଡ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଯେ ଶ୍ରୂପେର ମତ ଗାଦାଗାଦି କରେ ଥାକେ । ୫ ହାସ୍ଟିଂସ୍ ୫ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେନ ଯେ, ନୀଳ ନଦୀ ସଥିନ ଜୁନ ମାସେ ପାନିତେ ଭରେ ଉଠେ, ତଥିନ ଏର ପାନି ବିବରଣ ହୟେ ଯାଯ ଏବଂ ଆଗଷ୍ଟ ମାସେ ସଥିନ ପାନି କାନାୟ କାନାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟ ତଥିନ କ୍ରମେଇ ପାନି ଧୂସର ଲାଲ ରଂ ଧାରଣ କରେ । ବ୍ୟାପାରଟି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକିଇ ନିଶ୍ଚିତ କରେଛେ ଯାରା ବଲେଛେନ ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ପାନି ଥେକେ ଅସହ୍ୟ ରକମ ଦୂର୍ଘକ ବେରିଯେ ଆସେ । ଏହି ଦୂର୍ଘକ ଏବଂ ସେଇ ସାଥେ ଲୋହିତ ଜୋଯାରେର ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ନିଶ୍ଚଯଇ ଫେରାଉନେର ଆମଲେ ନୀଳନଦୀର ପାନିକେ ମାରାଦ୍ୱାକଭାବେ ଦୂର୍ବିତ କରେଛିଲ ଯା ମାନୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ସାନ୍ତ୍ରେର ଉପର ବିପର୍ଯ୍ୟକର ପ୍ରଭାବ ଫେଲେଛିଲ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. Chapman, R. F. A Biology of Locusts. Edward Arnold (Publishers) Ltd. London. pp. 1-65. 1976.
2. The Holy Bible, Exodus 10 : 22-24.
3. Carson, R., The Sea. Granada Publishing, London. 1976.
4. Raven, P. and Evert, R. F., Biology of Plants, 3rd ed., Worth Publishers, Inc., New York. p. 280. 1981.
5. Hastings, J., Dictionary of the Bible, 2nd ed.. T. and T. Clarke. Edinburgh. p. 755.

۱۵۸- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ الْأَمَاوَتِ وَ  
الْأَرْضِ لَهُ الْإِلَهُ الْأَكْبَرُ مَنْ يُمْنِي وَيُمْيِنُ فَإِنَّمَا يَأْتِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْكَوْنِي الْأَعْظَمُ الَّذِي  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالْكِبُرُوَةُ لَعَلَّ كُمْ تَهْتَدُونَ ۝

৭ : ১৫৮ হে মুহাম্মদ বলুন, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি  
সেই আল্লাহর প্রেরিত নবী যিনি জমীন ও আসমানের  
বাদশাহীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ নন।  
তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা  
ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত উচ্চী নবীর প্রতি  
যিনি নিজে আল্লাহ ও তাঁর সকল বাণীকে মেনে চলেন। সুতরাং  
তোমরা আনুগত্য কর যেন তোমরা সরল সঠিক পথের সঙ্কান  
লাভ করতে পার।

পৃথিবী, মহাকাশ ও তার মধ্যবর্তী সরকিছুর মালিক যে একমাত্র আল্লাহ এই  
কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ২ : ১১৭ আয়াতের সঙ্গে এবং পরিষিষ্ট ১  
ও ২ এর মধ্যে।

আর আল্লাহ যে হায়াত, মউতের মালিক তাও ২১ : ৩০ আয়াতে বিস্তারিত  
আলোচনা করা হয়েছে।

۱۵۹- وَقَطَعْنَاهُمُ الْأَنْتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَّا دَأْوَ حِينَأَلِي مُوسَى إِذَا سَتَقَهُ  
قَوْصَأَةَ أَنِ اضْرِبْ بِتَعَصَّلَكَ الْجَحْرَ فَإِلْجَبَسَتْ مِنْهُ الْأَنْتَاعَشْرَةَ عَيْنَأَنْ دَلْ عَلَمْ كُلُّ  
أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ

৭ : ১৬০ আমরা তাদেরকে (ইয়াহুদী) বারোটি পরিবারে ভাগ করে ব্যতুন  
দলে পরিণত করেছিলাম। মূসার জাতির লোকেরা যখন তার  
নিকট পানি চাইলো তখন আমরা তাকে নির্দেশ দিলাম একটি  
প্রস্তর শিলের উপর তোমার লাঠি ধারা আঘাত কর। অতঃপর  
সেই শিলার বুক থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হল এবং  
প্রত্যেকটি দল পানি নেওয়ার জন্য নিজ নিজ জায়গা ঠিক করে

নিলো। এবং আমরা তাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিলাম এবং তাদের জন্য ‘মারা’ ও ‘সালওয়া’ প্রেরণ করলাম (এবং বল্লাম) : ‘খাও সেই পবিত্র জিনিস সমৃহ যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি। এবং আমাদের উপর তারা কোন জুলুম করে নি বরং তারা নিজেদের উপরই জুলুম করেছিল।

লাঠির আঘাতে পানির ঝর্ণা বের হওয়ার ঘটনা ২ : ৬০ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

মেঘের ছায়া : মরঢ়ুমির উন্মুক্ত এলাকায় সূর্যের আলো সরাসরি বালির উপর পড়ে এবং তার ফলে বালি শৈত্রী খুব উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। উত্তপ্ত বালি তাপ বিকিরণ করে বাতাসকেও উত্তপ্ত করে তোলে এবং গ্রীষ্মকালে এই উত্তাপ সহের সীমার বাইরে যেতে পারে। তখন মেঘের ছায়াও পরম আরামদায়ক হয়ে যায় এবং ছায়ার নিচের বালি যথাশীল্প তাপ হারায় যার ফলে বালি আরামদায়ক ঠাড়া হয় এবং সূর্যের তাপ সহের সীমায় আসে। সুতরাং উন্মুক্ত মরঢ়ুমিতে মেঘের ছায়া আল্লাহর খাস রহমত হিসেবেই বিবেচিত হয়। সিনাই উপত্যকায় ইসরাইলীদের উপর এমনি মেঘের ছায়া দেওয়ার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

মারা ও সালওয়া : এসব বিষয়ে ২ : ৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

۱۴-وَلَذِنَّقَنَا الْجَبَلَ نُوقَهُمْ كَانُوا ظَلَّةً وَظَنَّوْا أَنَّهُ وَاقْعُدَهُمْ حَلْزُونًا  
أَيْنَكُمْ بِقُرْبٍ وَلَذِكْرُ زِيَادَةٍ لَعْلَكُمْ تَتَفَقَّنُ

৭ : ১৭১ স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করি, আর তা ছিল যেন এক চন্দ্রাত্প; তারা ভেবেছিল যে এটি তাদের উপর পড়ে যাবে; বললাম ‘আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাক্ওওয়ার অধিকারী হতে পার।

কোন কোন মুফাস্সির এ আয়াতের ভাষাস্তরে শব্দটির অর্থ করে থাকেন উর্ধ্বে তুলে ধরা যার অর্থ দাঁড়ায় যে এটি একটি অলৌকিক ঘটনা। অবশ্য শব্দটি দ্বারা ভূক্ষপনও বুঝানো হয়ে থাকে যে অর্থটা আল্লামা ইউসুফ আলী এবং এম. পিকথল কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে। পর্বতের পাদদেশে বসবাসকারী জনগণের ভূমিক্ষে থেকে সৃষ্টি ভূক্ষপনের কারণে একটা আতঙ্কজনক, ভীতিপূর্ণ এবং মনোরম অভিজ্ঞতা থাকে। মহাদেশীয় ভূখণ্ডগত গঠন কাঠামো বিষয়ে বর্তমান

সর্বশেষ জানের দ্বারা ভূমিকাপ্রের কারণ জানা যায়।<sup>১</sup> মহাদেশীয় ভূখণ্ডের সংযোগস্থলসমূহ ভৃত্যকের দুর্বলতম স্থান যেখানে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ, ভূমিকম্প এবং পর্বত গড়ে উঠার মত ঘটনাসমূহ ঘটে থাকে। সর্বাধিক সাধারণ ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে যখন ভূ-অভ্যন্তরে ভূতাত্ত্বিক বলের চাপে হঠাতে করেই শিলাসমূহ ভেঙ্গে যায়। শিলাসমূহ স্থিতিস্থাপক এবং মহাদেশীয় ভূখণ্ডগত বলের দ্বারা আকৃতি পরিবর্তনকালে শিলার মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হয়। চাপ তখন এমন পর্যায়ে পৌছে যে তা ভূ-ভৃকের দুর্বল অংশ তথা শুরচুতির শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন শুরচুতির বিপরীত বা উল্টাপার্শ্বসমূহে হঠাতে স্থানচ্যুত হয়ে স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ উৎপন্ন করে যা ভূ-অভ্যন্তরে ছাড়িয়ে পড়ে; আর তার ফলেই সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের। পানি ভূ-ভৃক অভ্যন্তরস্থ উৎপন্ন ম্যাগমা তথা গলিত শিলার সংশ্পর্শে আসার কারণে ভূ-ভৃকের সর্বাধিক দুর্বল স্থানসমূহে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়। প্রচন্ড আলোড়িত গ্যাসচার্জপূর্ণ ম্যাগমা উৎপন্ন স্থানসমূহে খেজোরে উপরের দিকে উঠে যায় এবং এই উচ্চ চাপ ভূ-ভৃকের পক্ষে যখন সামান্য দেয়া সম্ভব হয় না তখন তা ভেঙ্গে-গুড়িয়ে বা ফেঁটে যায় কিংবা স্থানচ্যুত হয়। মারাওক আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তাও ভূমিকম্পের সৃষ্টি করতে পারে, এর কারণও মহাদেশীয় ভূ-ফলকগত ভূমিকম্পেরই অনুরূপ, অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের ভূপৃষ্ঠে ছাড়িয়ে পড়া। ভূগর্ভস্থ গভীর গিরিখাদ এবং খনির বিঘন্ত হয়ে পড়া, ভূমিদস এবং রাসায়নিক কিংবা আণবিক যন্ত্রাদির ব্যাপক বিস্ফোরণেও আকস্মিকভাবে ভূকম্পনের সৃষ্টি হতে পারে।<sup>২</sup>

ভূমিকম্প ভূত্যকে শুরচুতির কারণ ঘটায় যা আনুভূমিক ও কখনও উল্লম্ব গতির সাথে কয়েক মাইল গতীর এবং শত শত মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। ১৯০৬ সালে সানফ্রান্সিসকোর ভূমিকম্পে বিশ ফুট আনুভূমিক বিচরণ ছিল যাতে পূর্বাংশ দক্ষিণে সরে গিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে মনটানা, হেবেগেনের রেড কেনিয়াম্বু ভূমিকম্পে একটা এলাকা বিশ ফুট উপরে উঠে গিয়েছিল। সানফ্রান্সিসকোতে ১৯৭১ সালে বিচলন ছিল ছয় ফুট উপরের দিকে এবং আনুভূমিকভাবে হয় ফুট বামে। মহান প্রকৃতিবিদ জন মুর 'ইওসেমাইট ভ্যালী'তে ১৮৭২ সালের ওয়েনেন্য ভ্যালী ভূমিকম্পে তার অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন: 'স্টিটোনেজ রক নামে কয়েক হাজার ফুট উচু একটা ভাসা চূড়া বিশিষ্ট শিলাময় ধামের প্রদেশে শিবির স্থাপন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন : মার্চ মাসের এক প্রদানে কৃতিত্ব ভোর আড়াইটায় আমি একটা প্রচন্ড ভূকম্পনে জেগে উঠলাম... ; মাস ও ইতিপূর্বে আর কখনও এ ধরনের বাড়ের অভিজ্ঞতা আমার ইরণি, সেই অনুত্ত শিহরণ জাগানে; বিচলনের কথা কখনও ভুলবার নয়। আমি তখন কৃত থেকে আনন্দিত ও ভীত অবস্থায় দৌড়ে বেরিয়ে আসলাম'

এবং চিৎকার করে বললাম : ‘এক মহান ভূমিকম্প !’ বুরতে পারছিলাম যে, আমি কিছু শিখতে যাচ্ছি। ধাক্কা বা ঝাঁকুনিগুলো এত প্রচন্ড ও বিভিন্নধর্মী ছিল এবং এত দ্রুত একটা পর একটা ঘটছিল যে, হাঁটতে গিয়ে আমাকে সতর্কতার সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়েছিল যেন কোন জাহাজের ডেক বা পাটাতনে ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে চলছি। অসভ্ব লাগছিল যে, বিশেষত উপত্যকাস্থ উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। আমার ভয় হলো যে, আমার শয়নকক্ষের উপরের দিকে অবস্থিত সেচিনেল শিলার খাড়া খাড়া অংশগুলো ঝাঁকুনি খেয়ে নিচে পড়ে যাবে। আমি একটা বৃহৎ হলুদ পাইন গাছের পশ্চাতে আশ্রয় নিলাম এ আশায় যে, এটা অন্তত বহিমুখে ছুটত্ব ছেট আকারের শিলা খন্ডের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে। দু’এক মিনিটে ঝাঁকুনিগুলো অধিক থেকে অধিকতর প্রচন্ড হয়ে পড়ল, সেই সাথে আনুভূমিক চাপের আকস্মিক দমক এবং কয়েকটা মোচড় এবং দুমড়ানো, বিস্ফোরক এবং উৎক্ষেপক ঝাঁকি শুরু হয়ে গেল’।<sup>৩</sup>

মুর-এর বিবরণীর মধ্যদিয়ে ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে পর্বত পাদদেশে বসবাসকারী লোকের অভিজ্ঞতাই ফুটে উঠেছে। তাদের মনে হতে পারে যে, ভূমিকম্প পর্বতকে ঝাঁকানি দিচ্ছে এবং ভূকম্পনের ভয়াবহতা দ্বারা পর্বতকে তাদের উপর ফেলে দেয়ার উপক্রম করতে পারে। সুউচ্চ পর্বতের দোলা চলাকালে পর্বতচূড়ার পাদদেশে বসবাসকারী লোকদের মাথার উপর চলে আসতে পারে এবং ক্ষণিকের জন্যে হলেও এটাকে শামিয়ানার মত মনে হতে পারে। ভূকম্পনের ফলে পর্বতচূড়া স্থায়ীভাবে কাত হয়েও যেতে পারে।

### তথ্য সূত্র :

1. Bolt Bruce, A., Earthquakes and Volcanoes, Scientific American, W.H. Freeman and Company, San Francisco, 1980.
2. Rupert Furneaux, Volcanoes, Penguin Books, England, 1974.
3. Oakeshott, Gordon B., Volcanoes and Earthquakes, McGraw Hill Co. New York, 1976.

هُمْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ  
وَأَنْ عَنِّي أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقْرَبَ أَجْلَهُمْ فَيَأْتِي حَدِيبَيْشَ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

। ৪ ১৮৫ তারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত  
সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে এবং এ  
সম্পর্কেও যে সম্ভব তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী, সূতরাং  
এরপর আর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে!

এ আয়াতটি অত্যন্ত চিন্তাভাবনা উদ্দেককারী এবং এ সত্যের দিকে দৃষ্টি  
নিবন্ধ করে যে, আল্লাহই ক্ষুদ্রতম কণা থেকে বিশালতম এই মহাবিশ্ব পর্যন্ত  
সমস্ত কিছুই যথার্থতা সহকারে ও খুটিনাটি পর্যন্ত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন যা  
তাঁরই নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিশাল এই  
মহাবিশ্ব, ছায়াপথ, নীহারিকা, তারকামন্ডলী ও গ্রহ নক্ষত্রসমূহকে নিয়ন্ত্রণকারী  
বিধানসমূহ পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পদার্থ বিজ্ঞানীদের দ্বারা আবিষ্কৃত আণুবীক্ষণিক জগতের পরমাণু, নিউট্রন,  
ইলেক্ট্রন এবং অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র কণার মধ্যে কোন গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য  
করা যায় না। এ সকল ক্ষুদ্রতাক্ষুদ্র কণা একটা জটিল বিধানসমষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত  
এবং এরা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত বিশেষ পদ্ধতিতে আচরণ করে থাকে  
(বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।

উদ্ভিদ ও প্রাণী সমৰয়ে গঠিত জীবজগত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাকৃতিক  
বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। (১) এরা অত্যন্ত সু-শৃঙ্খল ও সংগঠিত।  
আকার ও আকৃতি নির্বিশেষে প্রতিটি জীবদেহ জীবকোষ দ্বারা গঠিত যাদের  
প্রতিটিরই রয়েছে দু'টি প্রধান অংশ যথা : ক- সাইটোপ্লাজম নামক আঠালো  
পদার্থ, এবং খ-নিউক্লিয়াস বা কোষকেন্দ্র। সাইটোপ্লাজম কোষ অত্যন্তরে  
সংঘটিত সকল রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; কোষ  
কেন্দ্র গঠন নিয়ন্ত্রণ করে এবং এটি হচ্ছে ক্রোমোজম এবং ডিএনএ-র অবস্থান  
স্থল। (২) প্রতিটি জীবদেহই পরিবেশ থেকে খাদ্য আহরণ করে থাকে যার  
প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৌরশক্তির ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। এই  
শক্তি সবুজ গাছপালার পত্রহরিতের অণুতে ধরে রাখা ক্ষুদ্র একটা তগ্নাংশ  
গতিশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা জীব ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিপাক  
ক্রিয়ার উৎপত্তি ঘটায় এবং এসব কিছুও আবার তাপীয় গতির সূত্রানুসারে কাজ

করে থাকে। দৃষ্টান্তব্রহ্মপ, তাপীয়গতির প্রথম সূত্র মতে, শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু এটি সৃষ্টি কিংবা ধ্রংস করা যায় না। উদ্ভিদে শক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর তখনি ঘটে যখন আলোকশক্তি উদ্ভিদপত্রে গিয়ে পৌছায়। শোষিত আলোর একটা অংশ তাপ হিসেবে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু কিছু অংশ আবার পত্রহরিৎ অগুহ্য ইলেক্ট্রনসমূহকে উত্তেজিত করে এবং এরা শেষ পর্যন্ত কার্বনডাইঅক্সাইডকে শর্করায় রূপান্তরের শক্তি যোগান দেয়। এই শর্করার মধ্যে উক্ত মাত্রায় শক্তি থাকে যা এর গঠনকারী উপাদান তথা কার্বনডাইঅক্সাইড এবং পানি অপেক্ষা অনেক বেশী। উপর্যুক্ত সময়ে, উদ্ভিদ ভক্ষণকারী পশু দ্বারা শর্করা ভেঙে যায় যাতে শর্করা অণুতে রাসায়নিক কিংবা সুষ্ঠু শক্তির ত্বাস ঘটে। অক্সিজেন যুক্ত হওয়ায় চিনি থেকে সুষ্ঠু শক্তি হারানোর ফলে অন্যান্য যৌগের মধ্যে সুষ্ঠু শক্তির বৃদ্ধি ঘটতে পারে। (১) প্রাণীরা এবং অ-স্বৰূজ গাছপালা জৈব পদার্থ ভক্ষণ করে কিংবা অন্যান্য গাছপালা কিংবা মৃত যা জীবিত জীবজন্মের উপর নির্ভর করে শক্তি আহরণ করে থাকে। (২) সব জীবই তার পরিবেশ তথা আলো, তাপ, পানি, অভিকর্ষ এবং রাসায়নিক বস্তুর প্রতি সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয়। (৩) এরা পরিবেশের সাথে এমনভাবে খাপ খাইয়ে চলে যে, তারা দক্ষতার সাথে তাদের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে পারে। (৪) সকল জীবদেহই একটা নির্দিষ্ট দৈহিক ত্বরণ পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বংশ বিত্তার করে : (ক) অণু (অর্থাৎ ডিএনএ অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি), (খ) ক্রোমোজমসমূহ (কোষ বিভাজনে সংখ্যা বৃদ্ধি), (গ) কোষসমূহ (বিভাজিত হয়ে কলা পেশী গঠন), ব্যক্তি (তাদের যৌন ও অযৌন বংশবৃদ্ধি)। প্রতিটি ডিএনএ অণুর নিজের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা ছাড়াও একটা প্রগাঢ় অবরুণশক্তি রয়েছে এবং বিশাল সংখ্যক সংকেত ও নীলনীলা মজূত করে রাখে বা সে উপর্যুক্ত সময় ও স্থানে নির্গত করে একটি দেহের সমস্ত কোষ ও কাঠামো গঠনের সূত্রপাত করে, সেগুলোর বৃদ্ধি ঘটায় এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সমস্ত জীবনকালে প্রতিটি মৃহূর্তে তাদের কার্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। (৫) এরা নবজাতকের মধ্যে ডিএনএ-র মাধ্যমে তথ্য স্থানান্তর করে দেয় এবং এতাবে বংশগতির ধারা অব্যাহত রাখে।

অত্র আয়াতে আমাদেরকে শুধু মহাবিশ্বের বিশাল নকশা এবং শৃঙ্খলা নিয়েই গভীর চিন্তাভাবনা করতে বলা হয়নি, বরং উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী ক্রোমোজমস্থ জীন-এর সীমাহীন বিন্যাস ও সংযুক্তির উপরেও গভীরভাবে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। এই প্রচল বিভিন্নতা সত্ত্বেও স্রষ্টার কিছু কিছু স্পষ্ট বিধান

দ্বারা পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার সাথে প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় বৎসরগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। বস্তুত সেই আল্লাহরই প্রশংসা যিনি নিয়ন্ত্রক অণু তথা জীবনের বৎসরগতির নীলনক্তা স্বরূপ ডিএনএ সৃষ্টি করেছেন।

### তথ্য সূত্র :

1. Edwards N.A. and Hassall K.A. Cellular Biochemistry and Physiology, McGraw Hill Kogarusha Ltd. Tokyo, p. 112. 1971.

٨٨- يَتَعَذَّرُكُمْ عَنِ السَّاعَةِ أَيُّانَ مُرْسِمَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ  
لَا يُجْلِيهَا لَوْقَهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ شَفِّلُتْ فِي الْكَمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ لَا بَغْتَةً

৭ : ১৮৭ তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই রয়েছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন, এই ঘটনাটা হবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এক ত্যক্তির ঘটনা। আকশ্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর এসে পড়বে।

মহাবিশ্ব, ছায়াপথসমূহ, তারকামণ্ডলী, গ্রহ নক্ষত্র এবং আমাদের সৌর জগতের সৃষ্টি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিবরণাদি পরিশিষ্ট-১ ও ২-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। একটা তারকার জীবন কাহিনী, এর জন্ম, সময়ের সাথে সাথে ক্রমবৃদ্ধি এবং এর মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ও স্থানে আলোচনা করা হয়েছে (আরো দেখুন ৭ : ৫৪ আয়াত)। সূর্য একটা জি' বামন ধরণের শ্রেণী বিভাগকৃত তারকা। 'কয়েকশ' বিলিয়ন বছরের মধ্যে সৌরকেন্দ্রস্থ হাইজ্রেজেন নিউক্লিয়াসসমূহ একীভূনের কারণে নিঃশেষ হয়ে গেলে হঠাৎ করেই সূর্য সম্প্রসারিত হয়ে পড়বে এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল ও লালবর্ণ ধারণ করবে। শেষ পর্যন্ত এটি স্ফীত হয়ে নিকটবর্তী বুধ ও শুক্র গ্রহসমূহকে গিলে ফেলবে এবং পৃথিবীর নিকট পৌঁছে যাবে। এ সময়ে সৌর জগতের অভিকর্ষ বলে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে যার ফলে ব্যাপক টালমাটাল অবস্থা ও কম্পন শুরু হবে। এ সময় সূর্য এত উত্তপ্ত হয়ে পড়বে যে, এটি পৃথিবীস্থ সবকিছু পুড়ে ছাই করবে এবং পরিবর্তন করে ফেলবে। আমাদের গ্রহের সকল ধরনের প্রাণের এ রকম পরিণতি ১৪০০ বছর আগেই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের আজকের জ্ঞান দ্বারা বিষয়টি নিশ্চিত হতে দেখে 'মু'মিনদের মনে আনন্দানুভূতি জাগায় আর কাফিরদের বিশ্বাসের ভিত্তি গুঁড়িয়ে দেয়। বস্তুত এতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, কুরআন মূলতই এক ঐশী গ্রন্থ।

٨٩- قَوْلَذِيْ حَلَقْلَمَرْ مِنْ نَفِيسٍ وَلَحِيَّ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
فَلَمَّا تَأْتَشَهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا قَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَلْقَتْ دُعَوَالَهُ رَهْمَهَا  
لِينْ لَتَبَتَّنَا صَالِحًا لِنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِّرِينَ ০

৭ : ১৮৯ তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সংগিনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক লম্ব গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে; গর্ভ যখন শুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, ‘যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাংশ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবোই।’

নারী ও পুরুষের জোড়া থেকে মানব জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে ৪ : ১ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াতে ‘লম্বভার’ বলতে গর্ভধারণের প্রথম পর্যায়কে বুঝানো হয়েছে, যখন নারী কোন বাড়তি ভার অনুভব করে না। গর্ভধারণের এই অবস্থা ৩-৪ মাস চলতে থাকে। ২০তম সন্তানের মধ্যে মা ও রুম্ভার অনুভব করতে শুরু করে। আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতে খুব সুন্দরভাবে সে অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَلْيَطْرُ عَيْنَيْنَا جَرَارَةً  
○ مِنْ السَّمَاءِ أَوْ أَئْتَنَا بِعَدًّا أَبِ الْيَوْمِ ○

৮ : ৩২ শ্মরণ কর, তারা বলেছিল, ‘হে আল্লাহ! এটা যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্ম্মন্দ শান্তি দাও।’

অবিশ্বাসী মক্কাবাসীরা তাছিল্যভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিল যেন তাদের অবিশ্বাসের জন্য শান্তি হিসেবে তাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করা হয়— এ আয়াতে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে কোন বিশেষ ধরনের পাথরের কথা বলা হয়নি। হিজারাহ ( حجّار ) শব্দটি ৯টি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে ( ২ : ২৪, ৭৪; ৮ : ৩২; ১১ : ৮২; ১৫ : ৭৪ ; ১৭ : ৫০; ৫১ : ৩৩; ৬৬ : ৬; ১০৫ : ৪ )। তন্মধ্যে একটি আয়াতে মাটি ( طين ) থেকে, তিনটি আয়াতে ( سجيل ) ‘সিজিল’ থেকে পাথর বর্ষণের কথা বলা হয়েছে এবং বাকী পাঁচটি আয়াতে সাধারণভাবে শুধুমাত্র পাথরের কথা বলা হয়েছে। আভিধানিক অর্থে পাথর (stone) হচ্ছে ক্ষুদ্র অথবা মাঝারী আকারের শিলাখন্ড বা কঠিন খনিজ বস্তু (ধাতব বস্তু নহে)। সিজিল ( سجيل ) থেকে আসা পাথর অথবা এমনকি ভূমিজাত পাথর সম্পর্কে তফসীরকারীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ

କେଉଁ ମନେ କରେନଁ ଯେ ପାଥରଗୁଲୋ ଛିଲ ବାଇବେଳେର ବର୍ଣନାର ଅନୁରପ ଗନ୍ଧକ ବା ସାଲଫାରଜାତ, ଆବାର ଅନ୍ୟରା ମନେ କରେଛେ ଯେ ସେଗୁଲୋ ଛିଲ ତାପଦଙ୍ଘ କାଦାମାଟି । ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଶିଳ୍ପ ବା ପାଥର ସମ୍ପର୍କେ ୨ : ୬୦ ଆଯାତ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁବେ । ଶାନ୍ତି ହିସେବେ ପାଥର ବର୍ଷଣେର କଥା ତିନଟି (ଆଯାତ ୧୧ : ୮୨, ୧୫ : ୭୪ ଏବଂ ୫୧ : ୩୩) ଆଯାତେ ଉତ୍ତରେ କରା ହେଁବେ । ନବୀ ହ୍ୟାତ ଲୃତ (ଆ)-ଏର ଉତ୍ସତରେ ଉପର ଏହି ଶାନ୍ତି ଆରୋପିତ ହେଁଛି । ୭ : ୮୪ ଆଯାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଳେ ଆମରା ଏ ବିଷୟେ ଆଲୋଚନା କରେଛି ।

ଆକାଶ ଥିକେ କିଭାବେ ପାଥର ବର୍ଷିତ ହେଁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କେ ବର୍ଣନା କରା ହୟନି । କେବଳମାତ୍ର ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଥିକେ ଅଗୁଣପାତ ଘଟିଲେ କିଂବା ଉକ୍କାପାତର ମାଧ୍ୟମେଇ ଏକପ ପାଥର ବର୍ଷଣେର ଘଟନା ସଭ୍ବ । ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଥିକେ ଅପୁଣପାତ ଘଟିଲେ ପାଥରସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଧରନେର ବସ୍ତୁ ଉତ୍କଷିଷ୍ଟ ହେଁ ଚାରପାଶେ ବର୍ଷିତ ହେଁ ଥାକେ ।

୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ସାନଡା ପ୍ରଣାଲୀତେ ଓଲନ୍ଡାଜ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବଭାରତୀୟ ଦୀପପୁଣ୍ୟର ଜ୍ଞାକାଟୋଯା ଦୀପେ ବିଶେଷ ଧରନେର ଅଗୁଣପାତ ଘଟେଛି । ଏହି ଅଗୁଣପାତର ଫଳେ ଥାଯ ଏକ ମାଇଲ ଘନକ୍ଷେତ୍ର-ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳା, ଧୂଲିର ଆକାରେ ବାୟୁମନ୍ଦଲେର ଥାଯ ୧୫ ମାଇଲ ଉପରେ ଉଠେଛି । ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଦୀପପୁଣ୍ୟର ମାଟିନିକ ଦୀପେର ପୋଲି ପାହାଡ଼େ ଓ ଅନୁରପ ଅଗୁଣପାତ ଘଟେଛି । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗୁଣପାତେ କୋନ ଲାଭା ଛିଲ ନା, ଏତେ ଛିଲ ମେଘ ସଦ୍ଧ ଗ୍ୟାସ ଓ ଧୂଲିକଣାର ବିଶାଲ ଆନ୍ତରଣ, ଯାର ଫଳେ ସେନ୍ଟ ପିଯାର ଶହରଟି ୨୮୦୦୦ ବାସିନ୍ଦାସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଧ୍ଵଂସ ହେଁ ଯାଯ ।

ଯତଦୂର ଜାନା ଗେଛେ ମହାଶୂନ୍ୟେ ସୌରଜଗତେର ବାଇରେ ଥିକେ ଆଗତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉକ୍କାପିନ୍ଦେର ମାତ୍ର ଅର୍ଧେକ ସୌରଜଗତେ ଏସେ ପୌଛେ, ତବେ ଏ ସକଳ ଉକ୍କାପିନ୍ଦେର ସଠିକ ସଂଖ୍ୟା କର ତା ଜାନା ଯାଯନି । ଏ ସକଳ ଉକ୍କାର ଥାଯ ଅର୍ଧେକ ପ୍ରତି ସେକେବେ ୪୨ କିଃ ମିଃ(୨୬ ମାଇଲ) ବେଗେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁ ମନ୍ଦଲେ ଛୁଟେ ଆସେ । ବାଦବାକୀ ଉକ୍କାର ଗତିବେଗ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମନ୍ଦଲେର ଦିକେ ଛୁଟେ ଆସା ଉକ୍କାର ଗତିବେଗେର ଚାଇତେ ଅନେକ ବେଶୀ । ନାକ୍ଷତ୍ରିକ (Sideriolite) ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟେର ଉକ୍କାସମୂହ ଧାତୁ ଓ ସିଲିକେଟ ଜାତୀୟ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଁ ଥାକେ ।

ଅଧିକାଂଶ ଉକ୍କା ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗେ ମିହି ଧୂଲାର ଆକାରେ ପତିତ ହୟ । କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗେ ପ୍ରତି ସେକେବେ ବହୁ ମାଇଲ ବେଗେ ଛୁଟେ ଆସା ଶତ ଶତ ଟମ ଓଜନେର ଏ ସକଳ ବସ୍ତୁ ବାୟୁ ତରଙ୍ଗେ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପନେ ଯେ କୀରପ ପ୍ରଭାବ ଫେଲେ ତା ଧାରଣାରେ ଅତୀତ । ଆରିଜୋନାଯା ଉକ୍କାପାତରେ ଫଳେ ସୃଷ୍ଟ ବିଶାଲ ଆକାରେର ଗର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇବେରିଆୟ ଉକ୍କାପାତରେ ଫଳାଫଳ ଥିକେ ଏର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନା ଗେଛେ ।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় হোবা নামক ৬০ টন ওজনের উচ্চা হচ্ছে এ যাবত জানা সবচেয়ে বড় উচ্চা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব সাইবেরিয়ায় ‘সিখোলা আলিন’ নামে ২৩ টন ওজনের একটি উচ্চাপিণ্ড পতিত হয়েছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসের নরটন অঞ্চলে প্রায় ১০০ খন্ড পাথরের সমন্বয়ে যে উচ্চাপাত হয়েছিল তার একেকটি টুকরার ওজন ছিল প্রায় এক টন। সৌভাগ্যবশত বড় আকারের উচ্চাপিণ্ড খুব কমই দেখা যায়। এরূপ উচ্চাপিণ্ডের পতনের ফলে পুরো একটি শহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

إِنَّ عَدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ حَقَّ الْحُبُولِ  
وَالْأَرْضُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّتِينُ الْقَيْمُمُهُ فَلَا تَنْظِلُوهُ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَلَا يَنْلُو الْمُشْرِكُونَ كُلُّ قَوْمٍ كُلُّ قَوْمٍ دَاعِلُمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الشَّيْقِينَ ○

৯ : ৩৬ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারোটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান, সূত্রাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা অংশীবাদীদের সাথে সর্বাঙ্গক যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গক যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

এই আয়াতের দুটি অংশ আছে, এগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে কিছুটা সম্পর্কিত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। ‘আল্লাহ’ তা ‘আলার দৃষ্টিতে মাসের সংখ্যা ১২ এ কথাটি হচ্ছে প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশে আছে, ‘তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন’।

২ : ১৮৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রাকৃতিকভাবে সময়ের তিনটি একক রয়েছে। এগুলো হলো দিন, মাস ও বছর। প্রথম একক ‘দিন’ হলো পৃথিবীর নিজ কক্ষপথে একবার সম্পূর্ণরূপে আবর্তিত হওয়ার সময়। এই আবর্তনের হিসাব সূর্যকে মধ্যক ধরে করা যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে এই সময়কে বলা হয়ে থাকে গড় সৌর দিবস (mean solar day)। এই সময়কে আবার সরাসরি ২৪টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, প্রতি ভাগের নাম গড় সৌর ঘণ্টা। এ

କେ ପୁନରାୟ ମିନିଟ ଓ ସେକେଣ୍ଡେ ଭାଗ କରା ହେଁଛେ । କୋନ ସ୍ଥିର ତାରକାକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେଓ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନେର ସମୟ ହିସାବ କରା ଯେତେ ପାରେ, ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ଏଇ ସମୟକେ ବଲା ହୟ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଦିବସ । ଏଥାନେ ଯେ ଦୂ'ଧରନେର ଦିବସେର କଥା ବଲା ହଲୋ, ଦୈର୍ଘ୍ୟେ ଦିକ ଥେକେ ତାରା ସମାନ ନୟ । ଏକଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ ହୟ ଥାକେ, ୨୩ ଘନ୍ଟା ୫୬ ମିନିଟ ୪ ସେକେଣ୍ଡେ ଅର୍ଥାଂ ଗଡ଼ ସୌର ଦିରସ ଅପେକ୍ଷା ୪ ମିନିଟ କମ । ସାଧାରଣଭାବେ ଏକଟି ଗଡ଼ ସୌର ଦିବସକେଇ ଦିନ ବଲା ହୟ ଥାକେ ।

ସମୟେର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ହଲୋ ମାସ । ଏଇ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ଚାନ୍ଦ ପୃଥିବୀକେ ଏକବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରେ । ଏଇ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣେର ହିସାବ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ମଧ୍ୟକ ଧରେଓ କରା ଯାଯ । ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ତାକେ ବଲା ହୟ synodic lunar month ବା ସିନୋଡିକ ଚାନ୍ଦ ମାସ । ଚାନ୍ଦେର ଏଇ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣେର ହିସାବ କୋନ ସ୍ଥିର ନକ୍ଷତ୍ରକେ ସଲ୍ପକିର୍ତ୍ତ କରେଓ କରା ଯାଯ । ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ତାକେ ବଲା ହୟ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଚାନ୍ଦ ମାସ (sidereal lunar month) । ଏ କ୍ଷେତ୍ରେଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାର ମାସେର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନୟ । ଏକଟି ସିନୋଡିକ ଚାନ୍ଦମାସ ଗଠିତ ହୟ ଥାକେ ୨୯.୫୩୦୫୯ ଦିନେ ଏବଂ ଏକଟି ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଚାନ୍ଦ ମାସ ଗଠିତ ହୟ ୨୭.୩୨୧୬୬ ଦିନେ ।

ସମୟେର ତୃତୀୟ ଏକକ ହଲୋ ବଚର । ବାହ୍ୟତ ଏଇ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଏକବାର ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରେ ଥାକେ । ଏଇ ହିସାବ ମହାବିଷୁବ ରେଖାକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେଓ କରା ଯେତେ ପାରେ, ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ଏଇ ସମୟକେ ବଲା ହୟ ଜ୍ଞାନିଯ ବଚର । ସମୟ ତଥନ ଝାତୁର ସାଥେ ତାଳ ମିଲିଯେ ଚଲେ । ଏଇ ଆବର୍ତ୍ତନେର ହିସାବ ଯଦି ସ୍ଥିର ନକ୍ଷତ୍ରେର ସାଥେ ସଲ୍ପକିର୍ତ୍ତ କରେ ନିରାପଣ କରା ହୟ, ତବେ ତାକେ ବଲା ହୟ ନାକ୍ଷତ୍ର ବଚର । ଏଇ 'ସମୟ' ତାରକାରାଜିର ସୌର-ଉଦୟ (heliacal rising)-ଏର ସାଥେ ସାମଙ୍ଗସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ଚଲେ । ଏଇ ଦୂ'ଧରନେର ବଚରରେ ମଧ୍ୟେ ସମ-ଦୈର୍ଘ୍ୟେର ନୟ । ଏକଟି ଜ୍ଞାନିଯ ବଚର ଗଣନା କରା ହୟ ୩୬୫.୨୪୨୧୯ ଦିନେ ଏବଂ ଏକଟି ନାକ୍ଷତ୍ର ବଚର ଗଣନା କରା ହୟ ୩୬୫.୨୫୬୩୬ ଦିନେ । ସେହେତୁ ଏଇ ଦୂ'ଧରନେର ବଚରରେ ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟବଧାନ ଥୁବଇ କମ ଏବଂ ତାରକାରାଜିର ସୌର ଉଦୟ ଝାତୁର ସାଥେ ସାମଙ୍ଗସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ଚଲେ, ତାଇ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରେ ଲୁକ୍କକ ତାରକାର ସୌର ଉଦୟକେ ନୀଳ ନଦେ ଆସନ୍ତ ବନ୍ୟାର ଇଞ୍ଜିତବାହୀ ମନେ କରା ହତୋ ।

ସମୟେର ଏଇ ତିନଟି ଏକକ ନିଯେ ପ୍ରଧାନ ଅସୁବିଧା ହଲୋ, ସାଧାରଣଭାବେ ବେଳପ ବଲା ହୟ ଥାକେ ଯେ ୩୦ ଦିନେ ମାସ ଏବଂ ୧୨ ମାସେ ବଚର ହୟ ଥାକେ । ବିନ୍ତୁ ତାଦେର ଏଇ ସଲ୍ପକ ଅତଟା ସହଜ ନୟ । ଉପରେର ଆଲୋଚନାଯ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ, ସିନୋଡିକ ହେବ ଅଥବା ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ହୋକ ୧୨ ଚାନ୍ଦ ମାସେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଏକବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରତେ ପାରେ ନା । କହିପଥେର କିଛୁ ଅଂଶ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥେକେ ଯାଯ । ତାଇ ୧୨

চান্দ্র মাসে স্পষ্টতই একটি সৌর বছর হয় না, যা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় চান্দ্র বছর। সময়ের সাথে সাথে এই ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। বহু বছরে এই ব্যবধান আরো অনেক বড় হয়। ফলে চান্দ্রমাস ও সৌর ঝুরুর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষায় বড় ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়। প্রাচীনকালেও এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যবধান পূরণের লক্ষ্যে কোন কোন বছরে অতিরিক্ত হিসেবে ১৩তম মাস অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হতো। কোন কোন সভ্যতায় এটা করা হতো কিছু নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে এবং কোন সভ্যতায় করা হতো রাজার খেয়াল খুশী অনুসারে। অনুরূপ কারণে ভারতবর্ষে যে মাসে দু'বার নতুন চাঁদ দেখা যেত সে মাসকে বলা হতো অধিমাস এবং ১৩তম মাস হিসাবের জটিলতা এড়ানোর জন্য সে মাসকে পূর্ববর্তী মাসের বর্ধিত অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অপরদিকে আসুরবাণীপাল গ্রন্থাগারে প্রাণ্ড মৃত্তিকা ফলকে উৎকীর্ণ বিবরণে বলা হয়েছে যে, 'হামুরাবী' (রাজত্বকাল ২১২৩ খ্রি. পূ. থেকে ২০৮১ খ্রি. পু) ঘোষণা করেন যে যেহেতু বছরটি শুভ নয়, সেহেতু 'উলুলু'-এর পরবর্তী মাসকে বলা হবে দ্বিতীয় 'উলুলু'। এভাবে ঐ বছরকে ১৩ মাসে গণনা করা হয়। যদিও সৌর অথবা চান্দ্র হিসাবে সময় গণনা করা যায়, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জোর দিয়ে বলেছেন যে, যে পদ্ধতিতেই সময়ের হিসাব করা হোক না কেন মাসের সংখ্যা ১২ থাকতে হবে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে উল্লেখিত 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি' প্রসঙ্গে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে ছয়টি সময়ে (দিনে)। নীল আমন্ত্রণ ও অন্যান্য নভোচারী কর্তৃক চাঁদ থেকে নিয়ে আসা মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, চাঁদ এবং পৃথিবীর মাটির বয়স একই। সুতরাং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে এবং মাস সৃষ্টি করছে।

—۱۶—  
إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ الْأَمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يُنْهِي وَيُبْيِنُ ‏وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ ذَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ

৯ : ১১৬ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহরই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই।

এ বিষয়ে ২ : ১৬৪ আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

وَآتَا الْذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَرَأَهُمْ يُجْزِيُّهُمْ وَمَا أَنْوَاهُمْ كُفَّارٌ<sup>১২৫</sup>

৯ : ১২৫ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তা তাদের কলুম্বের সাথে আরো  
কলুষ যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়।

এই আয়াতে অন্তরের রোগ বলতে মনের রোগ বা মানসিক রোগের কথা  
বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় قلب (কলুব) বলতে সাধারণ পরিভাষা অনুসারে  
দৈহিক মন এবং বিমূর্ত মন এই উভয় সম্মাকেই বুবানো হয়ে থাকে। কুরআনে  
সাধারণ অর্থে قلب বলতে মনকে বুবানো হয়েছে।

অল্ল কিছুদিন আগেও মনের অসুখ হতে পারে বলে বিজ্ঞানের জানা ছিল না।  
ভিয়েনার চিকিৎসা বিজ্ঞানী জোসেফ ব্রেনার এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েড ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে  
চিকিৎসা বিজ্ঞানে মনোরোগের বিষয়টিকে তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে (১৮৯৬  
খ্র.) ফ্রয়েড মানসিক চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতির বিকাশ ঘটান। মজার ব্যাপার  
হলো আধ্যাত্মিক অর্থে হলেও পবিত্র কুরআন ১৪০০ বছরেরও আগে মানসিক  
ব্যাধি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে।

إِنَّ رَبَّكَمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

১০ : ৩ নিচ্যই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও  
পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন.....

৭ : ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

سَرَّا لَنَا مِنْ حَكْمِ جَوَيْنَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدِلُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَغَيْرُهُمْ بِالظَّلَمِ<sup>১</sup>

১০ : ৪ তাঁরই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহর প্রতিশ্রূতি  
সত্য। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অঙ্গিতে আনেন, অতঃপর এর  
পুনরাবর্তন ঘটান। যারা মু'মিন.....

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে তিনিই এই বিষের স্তো  
এবং এর মাঝে সকল প্রকার জীবনের স্তোও তিনি। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর

স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ২ : ১১৭ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বুকে প্রথম জীবন কণার স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ২ : ২৮ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর আদি উৎস সম্পর্কে পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

**সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অঙ্গিত্বে আনেন, অতঃপর এর পুনরাবর্তন ঘটান**

আয়াতে **يَعْلَمُ** শব্দটির বাহ্যিক অর্থ অপেক্ষা এর ব্যাপক প্রায়োগিক অর্থ রয়েছে। বিভিন্ন তাফসীরকারী 'পুনরাবর্তন' অথবা 'পুনরঃপাদন' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যদি শব্দটির প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে এই আয়াতের অর্থ হবে মৃত্যু। পরবর্তী জীবনে সৃষ্টি পরবর্তী পর্যায়, যা আমাদের বর্তমান আলোচনার আওতায় পড়ে না।

অপরাদিকে শব্দটির মধ্যে যদি 'পুনরঃপাদন' বা প্রজনন কথাটি নিহিত আছে বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে নিম্নে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে যথাযথ বলে মনে হবে :

সজীব ও নির্জীব বস্তুর ঘার্থে পার্থক্যের ক্ষেত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রজনন ক্ষমতা। এ্যামিবা ও ব্যাকটেরিয়ার মতো নিম্নপর্যায়ের জীব-কোষের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরল। এক্ষেত্রে কোনোরূপ যৌন সংযোগ ছাড়াই fission (সমবিভাজন) পদ্ধতিতে কোষটি সমান দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রতিটি ভাগ একটি পূর্ণাঙ্গ এ্যামিবা বা ব্যকটেরিয়ারূপে বিকাশ লাভ করে। উচু পর্যায়ের প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্য থাকে। এদের সন্তান-সন্ততি জননালাভ করে পুরুষ ও নারী পিতামাতার যৌন কোষের মিলনের মাধ্যমে। মাঝে মাঝে মৌমাছির মত কিছু কীট পতঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায় এবং এমনকি পুরুষ পিতার অনুপস্থিতিতেও (parthenogenesis যৌন সংসর্গ ব্যতীত সন্তান জন্ম গ্রহণ করা) নবজাতকের আগমন ঘটতে দেখা যায়।

উভিদের ক্ষেত্রে তিনি পদ্ধতিতে প্রজনন ঘটে থাকে, যেমন (ক) যৌন সংসর্গের মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী জননকোষ বা যৌন কোষের দ্বারা, (খ) অযৌন জননসঙ্গের মাধ্যমে, এবং (গ) গাঢ়পালার কোন প্রকার অঙ্গজ বিন্দুরের মাধ্যমে।

সকল প্রকার জীবন সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার একটি মহাপরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যকাশ ঘটে, তাহলে সৃষ্টি প্রত্যেক প্রজাতির জীবনকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত স্থায়ী করে রাখে। আর একাজটি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে উপরোক্তবিত্ত প্রজনন পদ্ধতির সুনিপুণ প্রক্রিয়ায় যা আল্লাহ তা'আলার এই বিশ্বয়কর পরিকল্পনার বাস্তব প্রতিফলন মাত্র।

هـ-هُوَ الَّذِي جَعَلَ لِلنَّاسِ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْرَةً مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَزَّذَ  
الْتِبْيَانَ وَالْحَسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَضِّلُ الْأَيْتَ  
لِقَوْمٍ تَعْلَمُونَ ۝

১০ : ৫ তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মন্দিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এ সকল নির্বর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্পদায়ের জন্য তিনি এ সকল নির্দর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে চাঁদ এবং সূর্য দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে কিরণ দিয়ে থাকে। বিজ্ঞান দেখেছে এটি বাস্তব সত্য। সূর্যের কেন্দ্রে সংঘটিত পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি শক্তির সাহায্যে সূর্য কিরণ দিয়ে থাকে। অথচ চাঁদ কিরণ দেয়। চাঁদের উপরিভাগে সূর্যালোকের প্রতিফলন থেকে।

এই আয়াতে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মন্দিল বা চাঁদের বিরতিস্থল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে আমরা বছর গণনার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। এখন আমরা দেখব মন্দিলসমূহ বলতে কী বুঝানো হয়েছে। চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। স্থির তারকারাজির সাথে সম্পর্কিত করে হিসাব করলে সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করতে প্রয়োজন হয় ২৭.৩ দিন। এই প্রদক্ষিণকালে মনে হয় যে প্রতিদিন চাঁদ তার কক্ষপথে অবস্থিত একগুচ্ছ তারকাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এভাবে ২৭.৩ দিন অনুসারে চাঁদের কক্ষপথকে স্থির নক্ষত্রে প্রতিটি গুচ্ছের ভিত্তিতে ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতি অংশে তারকা গুচ্ছ চাঁদের কক্ষপথের যে জায়গায় অবস্থান করে তাদের একেকটিকে বলা হয় মন্দিল বা চাঁদের বিরতিস্থল। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে একে বলা হয় নক্ষত্র। মন্দিল গঠনকারী প্রতিটি তারকাগুচ্ছের আলাদা চেহারা এবং নাম আছে। ২৭টি মন্দিল বা চান্দ্র নিবাসের ২৭টি চেহারা আছে। এভাবে চাঁদের বিভিন্ন পর্যায় যা আমরা একটি বর্ধমান চাঁদ থেকে আরেকটি বর্ধমান চাঁদ পর্যন্ত ২৭টি মন্দিলে দেখতে পাই\* যা সময় গণনা এবং বছর নির্ধারণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।\*\*

\* মন্দিল সমূহের নাম পরিশিষ্ট-৪ এ দেখানো হয়েছে।

\*\* জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে সূর্যের প্রথম মন্দিলে দ্বিতীয়বার প্রবেশের সময় দ্বারা একটি সৌর নাক্ষত্রিক বছর গঠিত হয়। ১২টি চান্দ্রমাস (প্রতি চান্দ্র মাসে চন্দ্র ২৭টি মন্দিল অতিক্রম করে) দ্বারা গঠিত সময়কে বলা হয় চান্দ্র বছর।

بِرَبِّنِي فِي اخْتِلَافِ الْيَوْمِ وَالَّهُمَّ إِنَّمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ لِذِي  
الْعُوْدَىٰ وَلِغَارِيَةِ الْمَوْتِ ۝

১০ : ৬      নিচ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহু আকাশমণ্ডলী ও  
পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নির্দশন রয়েছে মুওাকী  
স্প্রদায়ের জন্য ।

২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে দিন ও রাতের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা  
করা হয়েছে ।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ ‘আল্লাহু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি  
করেছেন’- এর প্রতি খোদাতীরুদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এগুলোকে  
তাঁর নির্দশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । তাই তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি  
মনোনিবেশ করতে আহবান করা হয়েছে এবং সেগুলো বুঝার চেষ্টা করার জন্য  
অনুরোধ করা হয়েছে । একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে সৃষ্টির রহস্য  
উন্মোচন করতে সক্ষম হবে এবং সন্তুষ্ম ও বিস্ময়ে তাদের মন পরিপূর্ণ হয়ে  
উঠবে । তারা আরো অনুধাবন করবে যে সকল সৃষ্টি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে  
মানব জাতির জন্য কল্যাণকর ।

۝ دَعُونَاهُمْ فِيهَا سُجَّنَ الْهُنُّ وَ تَعْيَّثُهُمْ فِيهَا سَلَّمُ وَ أَخْرُ دَعُونَاهُمْ  
أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১০ : ১০      সেখানে তাদের ধৰনি হবে, ‘হে আল্লাহ ! তুমি মহান, পবিত্র !  
এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’ এবং তাদের  
শেষ ধৰনি হবে ‘প্রশংসা’ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর  
ଆপ্য ।

১ : ২ আয়াতের আলোচনাকালে একটি প্রসঙ্গ উথাপিত হয়েছিল, সেখানে  
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে । উক্ত  
আলোচনায় **علم** (জগত) শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে বিশেষভাবে  
গুরুত্বারূপ করা হয়েছে ।

۱۳- وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا الْفُرُونَ مِنْ كُلِّكُمْ لَنَا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا ۝ كَذَلِكَ تَعْزِيزُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝

১০ : ১৩ তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্রংস করেছি যখন তারা  
সীমা অতিক্রম করেছিল। স্পষ্ট নির্দর্শনসহ তাদের নিকট তাদের  
রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না।  
এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, অতীতে বহুজাতি এবং বৎশ ধ্রংস হয়েছে এ  
কারণে যে তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দর্শনসহ নবীগণ আসা সন্ত্রেও তারা তাদের  
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং মন্দ কাজ থেকেও বিরত থাকেনি। যে সকল  
জাতি অথবা গোত্র ধ্রংস হয়েছে তাদের নাম অথবা যে সকল মন্দ কাজের জন্য  
তারা শাস্তি পেয়েছে অথবা সে সকল নবীগণের নাম যাদেরকে তারা অমান্য  
করেছে তার উল্লেখ করা হয়নি। তবে যে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের মাধ্যমে ধ্রংস  
কার্য সম্পন্ন করা হয়েছিল সে সম্পর্কে ৩ : ১৩৭ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা  
হয়েছে।

۱۴- وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَإِحْدَى فَإِنْ شَاءُوا

১০ : ১৯ মানুষ ছিল একই জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে....

এই আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ২ : ২১৩ আয়াত প্রসঙ্গে প্রদান করা  
হয়েছে।

۱۵- هُوَ الَّذِي يُسَيِّدُ كُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا كُشِّفَ فِي الْفَلَكِ ۝ وَجَرِينَ  
بِهِمْ بِرِيحٍ يُحْبِي بَعْضَهُمْ وَكُوْخُواهُمَا جَاءَهُمْ بَارِئٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ  
مَكَانٍ ۝ وَظَاهِرًا أَكْهُمْ أَجْبَطَ زِرْمٍ ۝ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ  
أَجْبَعُتُمْ ۝ مِنْ هُنْ

১০ : ২২ তিনিই তোমাদেরকে জলে স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন  
নৌকারোহী হও এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে

অঞ্চল হয় এবং তারা এতে আনন্দিত হয়। অতঃপর এগুলো  
বাত্যাহত এবং সবদিক হতে তরংগাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা  
পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ  
চিত্ত হয়ে আল্লাহকে ডেকে বলে : তুমি আমাদেরকে এ হতে  
ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

এই আয়াতে সাগরে নৌভর্মণের কথা বলা হয়েছে। যখন অনুকূল বাতাস থাকে তখন নৌ ভ্রমণ হয় স্বচ্ছন্দ এবং আরোহীরা থাকে আনন্দিত। কিন্তু যখনি প্রতিকূল ঝড়ে বাতাস শুরু হয়, নৌযানের চারদিকে ঢেউয়ের আধাতে নৌযান আন্দোলিত হতে থাকে তখন আরোহীরা বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে আগ্রাহ তা আলার নিকট কানাকাটি করতে থাকে।

ନୌଧାନ ଚାଲନାର କଳାକୋଶିଳ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ୨ : ୧୬୪ ଆୟାତ  
ପ୍ରସଂଗେ ପ୍ରଦାନ କରା ହୁଯେଛେ ।

٥- لِئَلَّا مَثُلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كُنَّا، أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلطَ بِهِ تَبَآءُ الْأَرْضِ  
مِنَّا يَا أَكْلُ النَّاسُ وَالْكَعَامُ حَتَّى إِذَا أَخْدَبَ الْأَرْضَ زُخْرُفَهَا وَالْأَيْنَتْ وَطَلَقَ  
أَفْلَهَا أَنَّهُمْ قَدْرُونَ عَلَيْهَا، أَتَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا بِمَا عَلِمْنَاهَا حَصِيدًا  
كَانَ لَهُ تَغْنُ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَضِّلُ الْأَيْتَ لِلْعُوْمِيَّةِ عَلَرُونَ

১০ : ২৪ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি  
যা দ্বারা ভূমিজ উড়িদ ঘন সমীবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা হতে  
মানুষ ও জীব-জুন্ম আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার  
শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং এর অধিকারীগণ  
মনে করে যে এটা তাদের আয়ত্তাধীন তখন দিনে অথবা রাতে  
আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মল করে  
দেই, যেন ইতিপূর্বে এর অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি  
নির্দর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের  
জন্য। এই আয়তে আমাদের পার্থিব জীবনকে আকাশ থেকে  
বারি বর্ষণের দ্বারা জন্মানো উড়িদের সাথে তৈলনা করা হয়েছে।

বৃষ্টির ফোটা মাটিতে নেমে আসে আকস্মিক করণার বারিপাত হিসেবে, মাটির সাথে মিশে একে সিঁক করে এবং উর্বর করে ভোলে। অসংখ্য ধরনের

ଶାକ ସବଜି, ଶମ୍ବ ଓ ଫଳ ଫଳାଦି ଜନ୍ମାୟ ଯା ଆହାର କରେ ମାନୁଷ ଓ ଗବାଦି ପଞ୍ଚ ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ । ଏ ଛାଡ଼ା ଏଭାବେ ଉତ୍ତିଦେର ବିଷ୍ଟାର, ତାଦେର ପାତା, ଫୁଲ ଓ ଫଲେର ବିଚିତ୍ର ରଂଘେର କାରଣେ ପୃଥିବୀ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଓ ମହିମାୟ ସୁଶୋଭିତ ହେଁ ଉଠେ । କୃଷକରା ଭାବତେ ଥାକେ ଏସବ ତାଦେର ମେଧା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ । ତାରା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଭାବେ ଏସବ କିଛୁ ତାଦେର ଆୟତାଧୀନ । କତ ଭାତ ଧାରଣା ! ତିନିଇ ଆଲ୍ଲାହ ଯିନି ମେଘ ଥେକେ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରେରଣ କରେନ (ବୃଷ୍ଟିର କଣ୍ଗା ଗଠନ ଏବଂ ଉତ୍ତିଦେର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କେ ୨୪୧୬୪ ଆୟାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଁ) । ଫଲେ ବୀଜ ଅଙ୍ଗୁରିତ ହୟ, ବୃଦ୍ଧି ପାଯ ଏବଂ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧାରଣ କରେ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା, ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲାରାଇ ରୟେଛେ ଏସବେର ଉପର ଏକଛତ୍ର କ୍ଷମତା । ଯଦି ତିନି ଇଚ୍ଛା କରେନ ତବେ ସବ କିଛୁ ନିମେଷେ ଧ୍ୱଂସ ହୟ ଯାବେ । ପ୍ରଚନ୍ଦ ତୁଷାରପାତ, ଶିଲାବୃଷ୍ଟି, ଘର୍ଣ୍ଣିବଡ଼, ବନ୍ୟା, ପଞ୍ଜପାଲେର ଆକ୍ରମଣ, ଭୂମିକମ୍ପ ଅଥବା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଥେକେ ଅଗ୍ରତ୍ୟାପାତ ଏମନିକି ଗାଛପାଲାର କୋନ ମଡ଼କ ବା ରୋଗ ଆକଷିକତାବେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଶ୍ୟକ୍ଷେତ ଓ ଫଲେର ବାଗାନକେ ବିଧିଷ୍ଟ କରେ ଦିତେ ପାରେ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ଯଥିନ ଏରାପ ଧ୍ୱଂସେର ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେନ ତଥିନ ମାନୁଷେର ଚରମଭାବେ ହତାଶ ହେଁଯା ଛାଡ଼ା ଆର ଉପାୟ ଥାକେ ନା ।

ଅନୁରପଭାବେ ଆମରା ଆମାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନେ ନିରବଚିନ୍ତନଭାବେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲାର କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ତ ଥାକି, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଆମରା ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତେର ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ବିକାଶ ଘଟେଇ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ସନ୍ତାଯ ପରିଣତ ହେଁ । ଆମରା ନିରଲସ ଚେଷ୍ଟାଯ ଆବିଷ୍କାର କରି, ଗଡ଼େ ତୁଳି ମଜବୁତ ଘରବାଡ଼ି, ନିର୍ମାଣ କରି ପରିକଳ୍ପିତ ଶହର ଓ ନଗର, ନଦୀକେ ବଶେ ଆନି, ମହାଶୂନ୍ୟ ଜୟ କରି, ଆମରା ରଚନା କରି ଶିଳ୍ପକଳା, କବିତା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ; ଏସବ କିଛୁଇ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ୟର ଉପକରଣ ଏବଂ ଏଗୁଲୋ ସକଳକେ ଆମନ୍ଦ ଦାନ କରେ । ଅଜ୍ଞତାବଶତ ଏ ସବେର ଜନ୍ୟ ଆମରା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ଏବଂ ଭାବି ଯେ ଆମରା ସ୍ୟାଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମାଦେର ଯା କିଛୁ ଆଛେ ଓ ଅର୍ଜନ କରେଛି ସବକିଛୁ ଆମାଦେର ଆୟତାଧୀନ । ଅଥଚ ଯିନି ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଜୀବନ ବିଧାନ ତୈରି କରେ ଦିଯେଛେନ, ଜୀବନ ଧାରଣେ ସୁଯୋଗ କରେ ଦିଯେଛେନ, ମେଧା ଓ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ କରେଛେନ, ଶ୍ରବଣ, ଦର୍ଶନ ଓ ଅନୁଭବ କରାର ମତୋ ଅମୂଲ୍ୟ ନିୟାମତ ଦାନ କରେଛେନ ଯେଗୁଲୋ ଛାଡ଼ା ଆମାଦେର କୋନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସନ୍ତୋଷ ହତେ ନା, ତାଁର କଥା ଚିନ୍ତା-ଭାବନା କରା କି ଆମାଦେର ଉଚ୍ଚି ନୟ ! ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ଯଦି ତାଁର କ୍ଷମା ଓ କରୁଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେ ନେନ, ତାହଲେ ଆମାଦେର ସକଳ ପ୍ରକାରେର ଅର୍ଜନ ଧୂଲିସାଂ ହୟ ଯାବେ । ଅତ୍ୟବ ମାନୁଷ ବିଜ୍ଞାନେ ଦ୍ୱାରା ଯତ ଅଗ୍ରଗତିଇ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ନା କେନ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣେର ନିୟମା ଓ ସର୍ବମୟ କ୍ଷମତା ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲାର ହାତେ ।

۳۱- كُلُّ مَنْ يَرِزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَكْنِيْلُكُ التَّمَعُ وَ الْأَبْصَارُ  
وَ مَنْ يُخْرِجُ النَّحْيَ مِنَ الْبَيْتِ وَ يُخْرِجُ الْبَيْتَ مِنَ الْبَيْتِ وَ مَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ  
تَسْبِيْلُوْنَ اللَّهُ ۝ قُلْ أَفَلَا تَتَعَقَّلُونَ ۝

১০ : ৩১ বল, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ  
সরবরাহ করে, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে  
জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে  
নির্গত করে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ! বল, তবুও কি  
তোমরা সাবধান হবে না?

উজ্জিদায়নে এবং মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বৃষ্টির অনকূল প্রভাব সম্পর্কে  
৬ : ৯৯ এবং ৭ : ৫৮ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন  
প্রকারের খাদ্য সামগ্ৰী যে পর্যাপ্তরূপে দিয়ে থাকেন তার একটি বিবরণ সহলিত  
ব্যাখ্যা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির প্রতি তাঁর কিছু বিশেষ  
অনুকম্পার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসমূহ এ অর্থে অনন্য যে,  
বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর আধুনিকতা খুবই উঁচু মানের এবং পূর্ণাঙ  
সৃষ্টিকৌশল আজও অজ্ঞাত। আল্লাহ তা'আলা এখানে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা  
করেছেন যে শ্রবণ ও দৃষ্টি ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণে এবং এই ঘোষণার  
সাথে মানুষের এ যাৰং প্রাণ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে একমত পোষণ করে।

এবারে আমরা শ্রবণ ও দর্শন যন্ত্রের গঠন কৌশল সম্পর্কে বুঝার চেষ্টা  
কৰো।

কান : কানের তিনটি কাজ যথা : শ্রবণ, ভারসাম্য রক্ষা ও গতি। অঙ্গটি  
তিন অংশে বিভক্ত, ক) বহিঃকর্ণ, এই অংশটি auricle বা কর্ণছত্রের সাথে  
কর্ণকুহুর দ্বারা কর্ণপটেহের (ear drum) বা পর্দার সাথে সংযুক্ত।

(খ) মধ্য কর্ণ : এটি কর্ণপটহ (tympanic membrane drum) থেকে  
অন্তঃকর্ণ (internal ear) পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ যা একটি নালিকা দ্বারা গলবিলের  
(throat) সাথে সংযুক্ত, এই নালিকাটির নাম হচ্ছে ইউষ্টেশিয়ান (eustachian) নালিকা। (গ) অন্তঃকর্ণ : এই অংশটি গঠিত হয়েছে গোলক  
ধৰ্মাদ্বার মতো জটিল ল্যাবিৰিনথ (labyrinth) দ্বারা যা মন্তিকের ভেষ্টিবুলে  
ককলিয়ার (vestibulocochlear) স্নায়ু (৮ম স্নায়ু) পর্যন্ত পৌছেছে।

শ্রবণের জন্য বহিঃকর্ণ জরুরী নয় যদিও বহিঃকর্ণের কর্ণছত্র (pinna) শব্দ গ্রহণের চুঙ্গি হিসেবে কাজ করে।

**মধ্যকর্ণ :** কর্ণপটহ বা পর্দা বহিকর্ণের একটি নালিকার (external acoustic meatus) শেষ প্রান্তে আড়াআড়িভাবে অবস্থান করে। মধ্য কর্ণস্থ গহ্বরের গভীরতা প্রায় ৮ মিঃ মিঃ  $\times$  ৪ মিঃ মিঃ এবং এতে তিনটি অস্থি বা হাঁড় আছে যথা ম্যালিয়াস (হাতড়ীর মতো), ইনকাস (নেহাইয়ের মতো), টেপিস (ঘোড়ার জিনের পা-দানির মতো)। এগুলোকে একত্রে বলা হয় (auditory ossicle) অডিটোরী অসিকল। এগুলো কর্ণগহ্বরের ভিতরে কর্ণপটহ ও কোর্ডা টিমপানি (chorda tympani) তন্তীর সাথে ভিতরের দিকে আড়াআড়িভাবে যুক্ত। তিনটি স্ফুট্রাকার হাঁড়ের শিকল আড়াআড়িভাবে কর্ণপটহকে কোর্ডা টিমপানি তন্তী দ্বারা অন্তঃকর্ণের সাথে সংযুক্ত করে। কানের পর্দায় আঘাতকারী বায়ুতরঙ্গকে অসিকল এক ধরনের যান্ত্রিক গতিশীলতায় রূপান্তর করে কর্ণের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থকে প্রভাবিত করে। (উল্লিখিত তরল জাতীয় পদার্থের উপর বায়ু তরঙ্গ সরাসরি খুব সামান্যই প্রভাব ফেলতে পারে।)

ইউল্টেশিয়ান নালিকা গলা (throat) থেকে বাতাস আসতে দেয় এবং এভাবে কানের পর্দার উভয় পার্শ্বের চাপের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেলে বধিরতা দেখা দিতে পারে এবং এই নালিকা দ্বারা যে কোন সংক্রমণ মধ্যকর্ণ পর্যন্ত পৌছতে পারে।

**অন্তঃকর্ণ :** এই ঝিল্লিময় ল্যাবিরিন্থ (membranous labyrinth) দু'ভাগে বিভক্ত। অগ্রভাগ শুন্দ শুন্দ অস্থিময় স্যাকিউল (sacule) এবং ককলিয়ার নালিকা (cochlear duct) দ্বারা গঠিত এবং এটি শ্রবণ ক্ষমতার সাথে যুক্ত। ককলিয়ার নালিকায় পেঁচানো অর্গান অব কর্টি (organ of Corti) থাকে যেখানে শব্দ তরঙ্গসমূহ চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। অতঃপর এই শব্দগুলো ককলিয়ার তন্তীতে প্রেরিত হয়। এই তন্তীগুলো হচ্ছে ভেষ্টিবুলোককলিয়ার তন্তীর শাখা বিশেষ যা সূতার মতো তন্তীসমূহ (filament) দ্বারা অর্গান অব কর্টি বা পেঁচানো কর্ণকুহরের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। পেঁচানো কর্ণকুহরে থাকে দু'সারি দন্ত এবং কয়েক সারি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মসৃণ লোমযুক্ত কোষ। এই দন্তসমূহ ও লোমকোষগুলো সম্বত বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীত ধ্বনির সাথে সম্পর্কিত।

**শ্রবণ ক্রিয়া :** যখন বাতাসের শব্দ তরঙ্গ কানে পৌছে এবং কানের পর্দায় আঘাত করে তখন এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে তাকে আবার বাইরে টেনে আনে। এভাবে শব্দের দ্বিমুখী গতি সঞ্চারিত হয়। এই গতির ফলে মধ্যকর্ণের অসিকল শিকলের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়। আর এই গতিশীলতার ফলে

স্টেপিসের পা-দানীর মতো অংশের সাথে অন্তঃকর্ণের পেরিলিফের সংযোগ স্থাপিত হয়। সবশেষে এই গতি অর্গান অব কর্টি (organ of Corti)-এর সূত্রবৎ তত্ত্বসমূহে (nerve filaments) পৌছায়, যা শ্রবণতন্ত্রীকে প্রভাবিত করে এবং এর ছাপ মন্তিক্ষের কেন্দ্রে পৌছে দেয়।

### শ্রবণ সম্পর্কিত দুটি তত্ত্ব আছে যথা :

(১) হেলমহজ (Helmholtz)-এর তত্ত্ব অনুসারে কর্ণকুহরকে একটি পিয়ানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি মনে করেন যে প্রতিটি শব্দ কর্ণকুহরের সংশ্লিষ্ট অংশে কম্পনের সৃষ্টি করে।

(২) অপর তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, শব্দ সমগ্র কর্ণকুহরে কম্পনের সৃষ্টি করে, মন্তিক্ষের শ্রবণ কেন্দ্র উক্ত শব্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ও উপলব্ধি করে।

দর্শন প্রক্রিয়া : রেটিনা (অক্ষিপট) হলো একটি স্নায়ুময় কাঠামো এবং অক্ষি গোলকের সর্বাপেক্ষা ভেতরের শর অপটিক স্নায়ু (optic nerve) ষ্঵েতম্বল (sclerotic) কৃষ্ণম্বল (choroid) কে ভেদ করে, অতঃপর অক্ষিপট আবরণে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে থাকে রক্তবাহিকা, রঞ্জক ও স্নায়ুকোষ সমূহ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে দেখা যাবে যে অক্ষিপট প্রায় দশটি শরের সমবর্যে গঠিত। সবচেয়ে বাইরে আছে রঞ্জক কোষের শর, যা চোখের অভ্যন্তরে আলো ছড়িয়ে পড়াকে প্রতিরোধ করে। পরবর্তী শর হলো দণ্ডাকৃতি (rods) কোষ ও মোচাকৃতি (cones) কোষ, এতে আলোকরশ্মি গৃহীত হয় এবং তার প্রতিফলন চক্ষু স্নায়ুর (optic nerve) মাধ্যমে মন্তিক্ষের পশ্চাত্তাগে অবস্থিত নির্ধারিত স্থানে প্রেরণ করে, যেখানে সে আলোর বাস্তবতা উপলব্ধ এবং বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়। বিস্তারিত জানার জন্য ২ : ২০ আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

দুটি চক্ষুস্নায়ুতে প্রায় বিশ লক্ষ আঁশ (filaments) আছে। এগুলোর অধিকাংশ মধ্য মন্তিক্ষের (thalamus) পাশে অবস্থিত একটি বংশগতি নিরূপক পিণ্ডে (geniculate body) এসে শেষ হয়েছে। এই পিণ্ডের প্রতিটি আঁশে মন্তিক্ষের পশ্চাত্তাগের দৃশ্যমান এলাকায় ৫০০০ নিউরন সমৃদ্ধ প্রান্তভাগ বা টার্মিনাল আছে। এ সকল নিউরনের প্রতিটির সাথে আবার প্রায় ৪০০০ অন্যান্য নিউরনের সংযোগ আছে। মানুষের অক্ষিপটে প্রায় ৬৫ লক্ষ মোচাকৃতি (cones) কোষ এবং প্রায় ১১ কোটি ৫০ লক্ষ দণ্ডাকৃতি (rods) কোষ আছে। দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে চোখকে ক্যামেরার সাথে তুলনা করা যায়।

চোখের পিছনে একটি উল্টা প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়। মন্তিষ্ঠ কী কৌশলে তা থেকে বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার ধারণা তৈরি করে তা আজও মানবীয় জ্ঞানের অতীত রায়ে গেছে।

শ্রবণ ও দর্শন উভয় অতি জটিল কলা কৌশল, আর এগুলো সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের অনুসরণে। স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য দু'টি বিষয় অপরিহার্য। এগুলো ছাড়া জীবনের বহুদিক অনাবিক্ষ্ট থেকে যাবে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এসবের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এগুলোকে তিনি মানব জাতির জন্য তাঁর বিশেষ করুণার নির্দর্শন হিসেবে তুলে ধরেছেন। শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিইন্ন কারো পক্ষে আল্লাহ তা'আলার বাণী পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

‘এবং কে সকল বিষয় শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে?’ আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নির্কট থেকে বহু বহু দূরে অবস্থিত তারকারাজি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র বস্তু কণিকাসহ বস্তু জগতের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এ সম্পর্কে ৭ : ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে এবং পরিশিষ্ট-৩-এ আলোচনা করা হয়েছে। জীব জগতের সকল কিছুও আল্লাহ তা‘আলার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে (আয়াত ৭ : ১৮৫)।

٣٤- قُلْ هَلْ مِنْ شَرٍّ كَيْفَ مَنْ يَبْدَعُ الْحَلَقَ ثُمَّ يُعِينُهُ • قُلْ اللَّهُ يَبْدَءُ وَالْخَلْقَ  
ثُمَّ يُعِينُهُ فَإِنَّمَا تُؤْتُونَ

১০ : ৩৪ বল, তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদের মধ্যে এমন কেউ কী  
আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে এর পুনরাবর্তন  
ঘটায়? বল, ‘আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন ও পরে এর  
পুনরাবর্তন ঘটান।’ সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য-বিচ্ছুত  
হচ্ছে?

ସୁନ୍ଦିକେ ଅନ୍ତିତ୍ରେ ଆନା ଓ ତାର ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କେ ବିଶ୍ଵାରିତଭାବେ ଜୀବାର ଜନ୍ୟ  
୧୦ : ୪ ଆୟାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖନ ।

وَهُوَ الَّذِي يَنْهَا مِنَ التَّمَرُّدِ وَالْأَرْضِ الْأَدَانَ وَعَدَ اللَّهُو حَقٌّ وَلِكُنَّ الظَّاهِرُ  
لَا يَغْلِبُونَ ۝

১০ : ৫৫ সাবধান ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা  
আল্লাহরই । সাবধান ! আল্লাহর প্রতিশ্রূতি সত্য, কিন্তু তাদের  
অধিকাংশই অবগত নহে ।

এই বিষয়ে ৫ : ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে ।

**٥٩-ْمَنْ أَرَى إِيمَانَ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ بِكُفُورِ قَوْمٍ رِّزْقٌ لَّمْ يَعْلَمُونَهُ حَرَماً وَ حَلَّاً  
فُلَّا اللَّهُ أَذْنَ لَكُفُورَ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَرَّوْنَ ○**

১০ : ৫৯ বল, ‘তোমরা কী ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদেরকে যে  
জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু  
হারাম করেছ? বল, আল্লাহ কী তোমাদেরকে অনুমতি  
দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ?

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা কুসংস্কারবশত কিছু  
খাবারকে হারাম করেছিল সে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । অন্যান্য জাতি  
সমূহের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে প্রযোজ্য । ইসলাম  
হারাম খাদ্য ও পানীয়ের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছে । অথচ ইসলাম-পূর্ব যুগে  
আরবরা ধর্মগ্রন্থের অনুমোদন ছাড়াই কিছু কিছু খাদ্যকে হারাম অথবা হালাল  
ঘোষণা করতো । তবুও কিছু কিছু হারামকে তারা ঐশী নির্দেশ হিসেবে গণ্য  
করতো, অথচ সে সম্পর্কে তাদের হাতে কোন প্রমাণ ছিল না । ৬ : ১৩৯ আয়াত  
প্রসঙ্গে এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ।

**٦٠-وَمَا كَوْنَ فِي شَاءْ وَمَا كَتَلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْبَانٍ وَ لَا تَعْمَلُونَ صِنْ عَيْلٍ  
إِلَّا كُلَّا عَيْنِكُ شَهُودًا إِذْ تَغْيِيصُونَ فِيْكُوْ وَ مَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ  
فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي النَّمَاءِ وَ لَا أَصْفَرِ مِنْ ذِلِّكَ وَ لَا أَبْلَدِ إِلَّا فِي كَثِيرِ مُمْنِيْنَ ○**

১০ : ৬১ ভূমি কোন কাজে রত হও এবং তৎ সম্পর্কে কুরআন হতে যা  
আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদের  
পরিদর্শক- যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও । আকাশমণ্ডলী ও  
পৃথিবীর অণু পরিমানও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নেই  
এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছু নেই যা সুস্পষ্ট  
কিতাবে নেই ।

ଏই ଆଯାତେ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ର ଯେ କୋନ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କେ ଏମନ କି ବିଶାଳ ଅଥବା କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ତୁ ଯେଗୁଲୋ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନେର ଆଡ଼ାଲେ ରଯେ ଗେଛେ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ତା'ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନେର କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରେଛେ ।

ଆଯ ତିନ ହାଜାର ବଚ୍ଛରେତ୍ରେ ଆଗେ ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ଡେମୋକ୍ରିଟୋସ ଏଇ ଧାରଣାର ଶଚନା କରେଛିଲେ ଯେ, ବନ୍ତୁ ଏୟାଟମସ୍ (atmos) ଅର୍ଥାଏ ଅଦୃଶ୍ୟ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ୧୮୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଡାଲଟନ କର୍ତ୍ତକ ବନ୍ତୁର ଆଧୁନିକ ପାରମାଣବିକ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମତ ଚଲେ ଆସିଛି । ଏୟାଟମ (atom) ଶବ୍ଦଟି ଲ୍ୟାଟିନ ଏୟାଟମସ୍ (atmos) ଥିକେ ନେଯା ହେଯେଛେ । ଡାଲଟନେର ମତେ ଯେ କୋନ ଉପାଦାନ ବହସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବିଭାଜ୍ୟ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ୧୮୧୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଏଭାଗାନ୍ଦ୍ରୋ ମଲିକିଟୁଲ (molecule) ବା ଅଣୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣାର ସୂଚନା କରେନ । ମଲିକିଟୁଲ ଗଠିତ ହୁଏ ବା ତତୋଧିକ ପରମାଣୁର ସମସ୍ତରେ । ଲର୍ଡ ରାଦାରଫୋର୍ଡ ୧୯୧୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ତା'ର ବିଖ୍ୟାତ ଗବେଷଣାର ମାଧ୍ୟମେ ପରମାଣୁ ଗଠିତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉଦୟାଟନ କରେନ । ଏ ଥିକେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଯ ଯେ, ଏକଟି ପରମାଣୁ ଗଠିତ ହେଯ ପୁଣ୍ଡିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନେ ଘରେ ଥାକା ଏକଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଘନ ନିଟ୍ରକ୍ଲିଯାସ ବା ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା । ପରମାଣୁ ସମ୍ପର୍କେ ଯତ ବେଶୀ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲାନେ ହେଯେଛେ ତତ ବେଶୀ କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁ ଧରା ପଡ଼େଛେ । ୧୯୫୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେର ମଧ୍ୟେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଏକଶ'-ଏରା ବେଶୀ ଉପ-ପରମାଣୁ ଆବିଶ୍କାର କରେନ । ଏଥାନେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେନ ଯେ, ସକଳ ବନ୍ତୁ ଲେପଟନ (leptons -ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ମିଉଓନ୍ସ ଓ ନିଉଟ୍ରିଓନ୍ସ) ଓ କୋଯାର୍କସ (quarks) ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । (ବିଭାଗିତ ପରିଶିଷ୍ଟ-୩ ଦ୍ୱାରାବ୍ୟ) ।

ବନ୍ତୁର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଗଠନକାରୀ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଯ ସମ୍ପାଦିତ ଗବେଷଣା କର୍ମସମୂହେର ମାଧ୍ୟମେ ଜ୍ଞାନେର ନବ ନବ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ନୋଚିତ ହେଯେଛେ । ଏ ସକଳ ବନ୍ତୁ କଣାର ଓଜନ ଅବିଶ୍ଵାସ୍ୟଭାବେ କମ ଅର୍ଥାଏ ଏକଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନେର ଭର ୯.୧୦୭  $\times$  ୧୦ $-୨୮$  ଗ୍ରାମ ମାତ୍ର । ଏ ସକଳ କଣିକା ୪୮ ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରେର ମାଥେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରେ । (ପରିଶିଷ୍ଟ-୩-ଏ ବିଭାଗିତ ଦ୍ୱାରାବ୍ୟ) । ସଂଗ୍ଠନ, ସଥାର୍ଥତ ଓ ଶୃଜନା ବିଷୟେ ଏମନିକି ଉପ-ପାରମାଣବିକ ଶ୍ରରେଓ ମାନୁଷେର ବର୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଅଭୀବ୍ରତ ଚମଞ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟେ ବିକଶିତ ହେଯେଛେ । ସୁତରାଂ ଏତେ ଅବାକ ହେଯାର କିଛୁ ନେଇ ଯେ ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଙ୍ଗଳେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେନନି, ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ବନ୍ତୁ ଓ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଏ ସକଳ କଣିକାର ସଂଗ୍ଠନେରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଦିଯେଛେ । ଅନୁସନ୍ଧାନ କୌଶଳେର ଯେନିପ ଅବିରାମ ଉନ୍ନତି ହେଚେ ତାତେ ଏଓ ହତେ ପାରେ ଯେ, ଆଜ ଯା ଯା ସଭ୍ବ ହେଯେଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନେ ବନ୍ତୁର ଉପର ଆରୋ ଗଭୀରତର ଅନୁସନ୍ଧାନ

করা হবে। আজ আমরা যে ক্ষুদ্রতম বস্তু কণার কথা জানতে পেরেছি, তার চাইতেও ক্ষুদ্রতর বস্তুকণা সম্পর্কে সন্ধান পাওয়া যাবে। তবে কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য একমাত্র মহান স্তুতি আল্লাহ তা'আলারই জানা আছে।

$$10^{-28} \text{ ग्राम} = \frac{1}{1,10000000000000000000000000000000} \text{ ग्राम}$$

**هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ لِتَعْلَمُونَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۝ إِنْ فِي ذَلِكَ  
أَدَىٰ بَيْتٌ لِتَعْمَلُوا مَعْمَلًا ۝**

୧୦ : ୬୭ ତିନିଇ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ରାତ, ତୋମାଦେର ବିଶ୍ଵାମୀର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଦିନ,  
ଦେଖାର ଜନ୍ୟ । ଯେ ସମ୍ପଦାଯ କଥା ଶୋନେ ନିଶ୍ଚଯାଇ ତାଦେର ଜନ୍ୟ  
ଏତେ ଆହେ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ।

ଆମାଦେର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରାପିତ ହେଯଛେ ବିଶ୍ରାମ ଓ କାଜେର ପାରମ୍ପରିକ ବଦଲେର ମାଧ୍ୟମେ । ଆମରା ଯେ ପୃଥିବୀତେ ବସିବାସ କରି ତାତେ ରାତେର ପରେ ଦିନ ଏସେ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ପରିବେଶକେ ଅନୁକୂଳ କରେ ଦେଯ ।

দিনের বেলায় সূর্যালোকের কারণে চারদিকে পূর্ণরূপে আলোকিত থাকে বিধায় সকল কিছু আমাদের জন্য দৃষ্টিশাহ্য থাকে (আলোকরশ্মি কীভাবে আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করে সে সম্পর্কে ২ঃ২০ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে) এবং আমরা দিনের বেলায় নানাবিধি পার্থিব কার্যবলী দক্ষতার সাথে সম্পাদনে সক্ষম হই। সন্ধ্যার দিকে আমরা ঝাউত হয়ে পড়ি এবং বিশ্রাম কামনা করি। সূর্যস্তরের সাথে সাথে অন্ধকারের আবরণে রাতের আবির্ভাব ঘটে, বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে এবং আমাদের নিদ্রার জন্য আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি হয়, আমরা আবার সবল হয়ে উঠি। রাত ও দিনের পার্থক্য সম্পর্কে ২ঃ১৬৪ আয়াত প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٤٣- كَلَّذْبُونَ لَكِبِيَّنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلَنَهُمْ خَلِيفَ دَاعِرَقَنَا  
الَّذِينَ كَلَّذْبُونَا يَأْتِنَا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَالِيَّةُ السُّنْدَرِيَّنَ ○

১০ : ৭৩ আর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে; অতঃপর তার সাথে যারা  
তরণীতে ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং তাদেরকে  
স্থলাভিষিক্ত করি ও যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল

তাদেরকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে?

এই আয়াতে নবী হ্যরত মুহ (আ)-এর সময়ের প্রাবণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই আয়াত প্রসঙ্গে বন্যা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

۹۱-وَالْيَوْمَ نُنْهِيُكُمْ بِبَيْدَنِكُمْ لِتَكُونُنَّ لِسْنَ خَلْفَكُمْ أَيَّهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الثَّابِسِ عَنِ اتِّيَّنَا لَغَفْوَنَ

১০ : ৯২ আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নির্দর্শন হয়ে থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নির্দর্শন সংস্কারে অনবধান।

যখন হ্যরত মুসা (আ) তাঁর নবুওতী মিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে ফিরআউনকে বুঝাতে ব্যর্থ হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইলীদেরকে নিয়ে মিশর ত্যাগ করার জন্য তাকে উপদেশ দিলেন। সে অনুসারে হ্যরত মুসা (আ) তার লোকজন নিয়ে চলে যাওয়ার সময় পানির বাধার (নদী অথবা সাগর) সম্মুখীন হলেন। অতঃপর আল্লাহর মেহেরবাণীতে পানির মধ্যে তৈরি হয়ে যাওয়া পথ অতিক্রম করলেন। ফিরআউন তার সৈন্যদল নিয়ে বনি ইসরাইলীদের পিছু ধাওয়া করে যখন সাগর বা নদীর তীরে এসে পৌছলো তখন দেখলো যে পলায়নকারীরা পানিতে তৈরি হওয়া পথের মাঝামাঝি রয়েছেন। ফিরআউন এই অলৌকিক পলায়নের কথা অগ্র-পশ্চাত না ভেবে তার দলবলসহ বনি ইসরাইলীদের পশ্চাত ধাবন করলো। বনি ইসরাইলীরা যখন অপর তীরে পৌছলো ফিরআউন ও তার সঙ্গীরা তখন মাঝপথে, তারা সেখানে আল্লাহর দেয়া শান্তি হিসেবে ডুবে মারা গেল। ডুবে মরার সময় ফিরআউন আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন, 'কী! এখন, ইতিপূর্বে তো অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অভ্যর্তৃক্ত ছিলে।' (আয়াত ১০ : ৯১) তখন উপরোক্ত আয়াত নাফিল হলো, যেখানে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণকারীদের পরিণাম সম্পর্কে নজির হিসেবে তিনি ফিরআউনের দেহকে সংরক্ষিত রাখবেন।

ঐ ঘৃটনায় কোন্ ফিরআউনের মৃত্যু হয়েছিল সে সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কিছু সংখ্যক ফিরআউনের মমি পাওয়া গেছে এবং সেগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূসা (আ)-এর সময়ের ফিরআউনের পরিচয় সম্পর্কে পদ্ধিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু সংখ্যক পদ্ধিতের মতে তৃতীয় তুতমোজেস-এর পুত্র এবং অষ্টাদশ রাজবংশের (১৫৮৭-১৩৭৫ খ্রিঃ পৃঃ) দ্বিতীয় আমনহোতেপ-এর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন মূসা (আ)-এর সময়ের ফিরআউন। কিন্তু অন্যান্যরা মনে করেন যে, উনিশতম রাজ বংশের (১৩৭৫-১২০২ খ্রিঃ পৃঃ) দ্বিতীয় রামসেস ছিলেন অত্যাচারী ফিরআউন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ফিরআউন মারনেপতাহ-এর সময়ে হিজরত (বনি ইসরাইলীদের) সংঘটিত হয়েছিল। এই তিনজন ফিরআউনের মমি ও এখন শনাক্তকৃত। মূসা (আ)-এর সময়ের ফিরআউনকে চিহ্নিত করার জন্য কুরআন বিশেষজ্ঞগণকে পরবর্তী গবেষণায় এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে আমরা বাইবেল বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর নির্ভর করে থাকতে পারি না। বাইবেলের মতে হিজরতকালীন ফিরআউন পানিতে ডুবে মারা যায়নি। যেহেতু কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উক্ত ফিরআউনের দেহকে সংরক্ষিত রাখা হবে, তাহলে তার মমি অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। এও হতে পারে যে ডুবে মরে যাওয়া ফিরআউনের উত্তরাধিকারী ঐ সময়ের প্রচলিত প্রথা অনুসারে মৃতদেহ সংরক্ষণের (মমি আকারে) ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য এখনো বহু পিরামিড খননের অপেক্ষায় আছে।

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُسُرُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَهَا وَ  
مُسْتَوْدَعَهَا ۝ گلু ফি ڪتبِ مُبِينٍ

১১ : ৬      ভূগূঢ়ে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থাতি সম্পর্কে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।

সাধারণভাবে ৪। শব্দের অর্থ হলো বিচরণশীল প্রাণী যা শুধুমাত্র পশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদিও কিছু কিছু গাছপালা সম্পর্কের পথে স্থানান্তর শক্তি রাখিত নয়। পশু ও উদ্ভিদরাজ্যে উভয়েরই কিছু কিছু ব্যক্তিক্রম আছে, কোয়েলেন্টারেটস (coelenterates) তথা ওবেলিয়া (obelia)-এর মতো প্রাণীরা স্থির, যদিও

তাদের জীবন চক্রের অন্তত একটা পর্যায়ে তারা গতিশীল থাকে। অপরদিকে নিম্নস্তরের কিছু কিছু আণবীক্ষণিক আকারের সবুজাত সচল শৈবাল (algae) ও ব্যাকটেরিয়া আছে। উঁচু স্তরের কিছু উত্তিদের জীবন চক্রের কোন কোন পর্যায়ে (জনন কোষের গতিশীলতা) এই গতিশীলতা দেখা যায়। সুতরাং ‘বিচরণশীল প্রাণী’ বলতে এখানে ব্যাপকার্থে প্রাণী জগত ছাড়াও স্থানান্তর ক্ষমতার অধিকারী উত্তিদও অন্তর্ভুক্ত।

খাবার খাওয়ানোর তৎপরতা ছাড়াও প্রতিটি প্রজাতির পাখি ও অসংখ্য শুদ্ধাতিক্ষুদ্র জীবকোষসহ বিভিন্ন প্রাণী অগণিত উৎস থেকে তাদের প্রয়োজন মতো খাদ্য পুষ্টি গ্রহণ করে। এ কাজ তারা শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই করে না, সে সাথে তাদের বাচ্চাদের জন্যও খাবার যোগান দেয়। যখন খাবারের ঘাটতি দেখা দেয় অথবা পরিবেশগত উপাদানগুলো বিরুপ হয়ে উঠে, যেমন অত্যধিক গরম অথবা ঠাণ্ডা দেখা দিলে প্রাণীকূল নতুন এলাকায় স্থানান্তরে গমন করে, যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পাওয়া যায় এবং আবহাওয়া প্রতিকূল থাকে না। বস্তুত পৃথিবীতে যত প্রজাতির পাখি আছে তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পাখি বিভিন্ন মাত্রায় স্থানান্তর গমন করে থাকে, তাদের সংখ্যা প্রায় হাজার হাজার লক্ষ। গ্রীনল্যান্ডের গাঙ্গচিল প্রতিবছর সুমেষঝ থেকে আনুমানিক ১০০০০ মাইল উড়ে গিয়ে কুমেরঝতে পৌছে। চড়ুই, রবিন ও কোকিল ইত্যাদি পাখি খাবারের সঙ্গানে অথবা ডিম পাড়ার জায়গার খোঁজে দূরে কিংবা কাছে স্থানান্তরে গমন করে থাকে।

মূল বাসস্থান ত্যাগের সঠিক সময়, অস্থায়ী বাসস্থানে যাওয়ার প্রকৃত পথ এবং পুনরায় স্থায়ী বাসস্থানে কোন পথে প্রত্যাগমন করবে ইত্যাদি পাখিদের সহজাত প্রবৃত্তি আল্পাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত নিয়মে বায়ুমন্ডলীয় চাপ, ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার মাটন পাখি (mutton bird) আকাশে বিশাল চক্র তৈরি করে দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া থেকে উত্তর দিকে উড়ে যায়। অতঃপর লক্ষ লক্ষ পাখির এই বিশাল ঝাঁক উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল হয়ে তাদের ক্ষুদ্র দ্বীপে ফিরে আসে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের শেষ দিকে একই সন্ধ্যায়<sup>১</sup>। এরপ আরো দুটি উদাহরণ হলো : সামুদ্রিক সীগল ও বক পাখি একটি নির্দিষ্ট তারিখে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে উপকূলবর্তী পাহাড়ী এলাকায় আসে ডিম পাড়ার জন্য এবং সাইবেরিয়া ও অন্যান্য এলাকা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে জলচর পাখি বাংলাদেশের হাওর এবং বিলে (বিস্তীর্ণ জলমগ্ন এলাকা) আগমন করে। একই ধরনের উদাহরণ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যেমন কৃষ্ণ

হরিণ ও হাতিদের মধ্যে দেখা যায়। তারা খাবারের সকানে দল বেঁধে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে। পাথি ও অন্যান্য প্রাণীর স্থানান্তর গমনের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে তাদের গমনাগমনের পথ, গন্তব্যে পৌছানো এবং চলে যাওয়ার সঠিক সময় ইত্যাদি সম্পর্কে মাত্র চলতি শতাদ্বী থেকে মানুষ জানতে শুরু করেছে।

স্থানান্তর গমন ও খাদ্য প্রবাহের এই জটিল ও বহুমুখী প্রক্রিয়ার সাথে কোন-একটি সম্পদায়ের সকল জীবকোষের পারম্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত, যা রক্ষাকর্তা সর্বজ্ঞাতা ও সকল প্রাণীর লালনকারী আল্লাহ্ তা'আলার মহাপরিকল্পনার আরেকটি রূপায়ন।

#### তথ্যসূত্র :

- Peterson, R. T. *The Birds* ; Time-Life International (Netherland)  
N. V. p. 101, 1968.

۷۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَبْعَ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ  
لَيَنْبُوْكُمْ أَيْمَانُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

۱۱ : ۹      তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর  
আরশ ছিল পানির উপরে, তোমাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ তা  
পরীক্ষা করার জন্য.....

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টির বিষয়ে ইতিপূর্বে ۷ : ۵۴ আয়াত  
প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

۸۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْبُرُ قُلْنَا أَخْيَلْ فِيهَا

۱۱ : ۴۰ অবশ্যেই যখন আমার আদেশ আসলো এবং উনান উথলে  
উঠলো, আমি বললাম, এতে উঠিয়ে নাও .....

সূরা হুদ-এর ৩৬-৪৯ আয়াতে নবী হয়রত নূহ (আ) কর্তৃক কিশতি নির্মাণ  
করা, এ ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, বিশ্বাসীদের প্রতি প্রজাতির প্রাণীর  
একটি করে জোড়া রক্ষা করা, প্লাবনের প্রশমন, কিশতি জুনী পাহাড়ে স্থির হওয়া  
এবং অবশ্যে পৃথিবীতে মানুষের বসতি স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা  
হয়েছে।

۹۔ وَقَالَ ازْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِلِهَا إِنَّ رَبِّنِي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

۱۱ : ۴۱ সে বলল, ‘এতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি,  
আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হুদ-এর ৪১ নং আয়াতে হয়রত নূহ (আ)-এর অনুসারীদেরকে তার  
তৈরি নৌকায় তা’সে ভাসমান অথবা বিশ্বল অবস্থায় থাকুক না কেন,  
আরোহণের জন্য আদেশ করা হয়। অতএব এটা অনুমিত হয় যে এমনকি প্লাবন  
গুরুর পূর্বে অথবা নৌকাটি ভাসানর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি হলে লোকজন  
নৌকায় আরোহণ করতে শুরু করে। আবার নৌকাটির ভাসমান অবস্থায় পানি  
ভেঙ্গে অথবা সাঁতার কেটে তারা নৌকায় ঢুকতে থাকে।

وَهِيَ تَبْرُئُ بِهِمْ فِي مَوْجَةٍ كَلْبِيَّاتٍ وَكَانَ فِي مَغْزِلٍ يُبَشِّرُ  
أَكْبَرَ مَعْنَى وَلَا يَكُنْ مَعَ الْكُفَّارِ ۝

১১ : ৪২ “পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল;  
 নৃহ (আ) তাঁর পুত্র, যে অন্য সকলের নিকট থেকে প্রথক ছিল,  
 তাকে আহবান করে বলল, ‘হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে  
 নৌকায় ওঠ এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়ো না।’

এই আয়াতে পর্বত সদৃশ ঢেউ-এর কথা বলা হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ-এর  
 দু'টি প্রধান শ্রেণী রয়েছে। খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (এক তরঙ্গ শীর্ষ  
 থেকে অন্য তরঙ্গ শীর্ষের দূরত্ব) এক সেন্টিমিটারেরও কম, আবার বড় ও দীর্ঘ  
 ঢেউসমূহের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক একটি ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। প্রধানত  
 ভূ-উপরিস্থিত প্রবল চাপ থেকে উত্তৃত একটি বেগ থেকে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ-এর  
 সৃষ্টি। পক্ষান্তরে দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ ঢেউসমূহ কেবল মাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে  
 তাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। ঢেউ-এর এই মুখ্য বিভাজনের বাইরে  
 অভিকর্ষ দারা সৃষ্টি ঢেউ দু'টি স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের অধীনে ঘটে। গভীর পানির ঢেউ  
 অগভীর পানির ঢেউ থেকে আলাদা এবং এই দু'টি অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব দাড়  
 করান হয়েছে। অগভীর পানি বলতে কী বোঝায় তা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর  
 করে। কোন বড় জলাধার বা হ্রদে সৃষ্টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিকর্ষ ঢেউ গভীর পানির  
 ঢেউয়ের মত পানির উপরিভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তবে তাদের গভীরতা থাকে  
 মাত্র এক বা দুই ফুট। যেহেতু ঢেউগুলি অধিকতর অগভীর পানির মধ্য দিয়ে  
 চলে তাই তাদের গতিবেগ হ্রাস পায়। এই ঢেউসমূহ যে শক্তি ধারণ করে তা  
 একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং এর ফলে ঢেউয়ের উচ্চতা  
 বৃদ্ধি পায়। অগভীর পানির তরঙ্গমালা স্বীয় আকৃতি পরিবর্তন ব্যতীত তৈরি হতে  
 পারে না। দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী নিচু স্থান থেকে ঢেউয়ের শীর্ষ দেশ অধিকতর  
 দ্রুত বেগে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধরে ফেলে। ঢেউয়ের সম্মুখভাগ  
 খাড়া হয়ে ওঠে এবং শেষে ভেঙে পড়ে। খাড়া তাক বিশিষ্ট সমুদ্র সৈকতে বড়  
 বড় ঢেউ ভেঙে পড়ে খুবই ধ্বংসাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে।

পর্বত প্রমাণ ঢেউয়ের এই বর্ণনা থেকে এটা মনে হয় যে নৃহ (আ)-এর  
 এলাকার মহাপ্লাবনের গভীরতা খুব বেশী ছিল না, বরং গভীর পানির ঢেউয়ের  
 ধ্বংসকারী আঘাতের ন্যায় এগুলো ছিল ক্ষুদ্র অভিকর্ষ ঢেউয়ের প্রচল প্রবাহ।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلْقَنِ مَاهِلْكَهُ وَيَسَّارَهُ أَفْلَقَنِ وَغَيْضَ الْمَاهَهُ وَقُضَى الْأَمْرُ  
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بَعْدَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ○

১১ : ৪৪ এরপর বলা হ'ল, ‘হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস কর এবং  
হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।’ এরপর বন্যা প্রশংসিত হ'ল এবং কাজ  
সমাপ্ত হ'ল, নৌকা জুড়ি পর্বতের উপর স্থির হ'ল এবং বলা  
হ'ল, ‘সীমালজনকারী সম্পদায় ধ্বংস হোক’।

এই আয়াতে মহাপ্লাবন প্রশংসনের এবং জুনী পর্বতে নৌকা স্থিত হওয়ার  
বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

জুনী পর্বতের অবস্থান নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। তুরক, ইরাক ও সিরিয়ার  
সীমান্তবর্তী বোহতান নামক একটি তুর্কী জেলায় বেশ উচ্চ একটি পর্বত আছে।  
আরারাত মালভূমির বিশাল পর্বতরাজি এই জেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।  
জাবাল জুনীর সন্নিকটবর্তী অঞ্চলই বর্তমান কালের স্মৃতিময় ও কাহিনী সমৃদ্ধ  
সেই স্থান যেখানে নৃহ (আ)-এর সময়কার মহাপ্লাবন এবং নৌকা থেকে  
অবরোহণের পর তাঁর জীবন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

নৃহ (আ)-এর নৌকার অবস্থানস্থল হিসাবে আরারাত পর্বতের উপর  
বাইবেলে উল্লেখিত কাহিনীর সাথে আরারাত পর্বতমালার একটি স্ফুর্দুতর চূড়া  
সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বাসের সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে।

وَيَقُولُ إِنَّمَا تَعْفِرُ فَارِيَكُهُ شَرْتُوْبَرَالِهِ بِرِسْلِ التَّمَاءِ عَلَيْكُهُ قِدْرًا  
وَبَزَدَهُ كُحُّ قُوَّةٍ إِلَى قَوْيَكُهُ وَلَا تَسْتَوْلُوا بِغَرْبِيَّ ○

১১ : ৫২ হে আমার সম্পদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা  
প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের  
জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি  
দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে  
মুখ ফিরিয়ে নিও না।

এই আয়াতে আকাশ শব্দটি বৃষ্টি ভারাক্রান্ত মেঘমালার আকাশের পরিবর্তে  
গ্রহণ করা যেতে পারে। কোন কোন ভাষ্যকার আরবী ‘শব্দ সামা’কে মেঘ হিসাবে  
ব্যাখ্যা করেছেন।

আকাশে মেঘের সৃষ্টি এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত আয়াত নং ২ : ১৬৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণের ফলে মৃত ধরিত্বা কিভাবে পুনরজীবিত হয়ে ওঠে এবং সবুজ তৃণাদি উৎপন্ন হয়। এর ফলে নানারকম শাক-সবজি, শস্য ও ফল জন্মে। এ সকল উৎপন্ন ফসলাদি মানুষ ও প্রাণীকুলকে বাঁচিয়ে রাখে। ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় এই শব্দ সমষ্টির আমরা দুই প্রকার অর্থ করতে পারি। প্রথমত সহজে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তি মানুষকে স্বাস্থ্যবান অর্থাৎ শারীরিকভাবে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে; দ্বিতীয়ত ঐ উর্বর অঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং নিজদেরকে একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত করে। তবে এজন্য কর্মদক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের যথাযথ পরিচর্যার প্রয়োজন।

۵-ه مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ رَبِّنِي وَرَبِّكُمْ مَّا مِنْ دَارِي إِلَّا هُوَ أَخْذُنَا صَيْهَتَهَا  
أَعْلَمُ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

১১ : ৫৬ আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর,  
এমন কোন জীবজন্ম নেই, যে তাঁর পূর্ণ আওতাধীন নয়; আমার  
প্রতিপালক আছেন সরল পথে।

আরবী “দারবাতিন” শব্দের অর্থ প্রাণীকুল যাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের সামর্থ্য রয়েছে। তবে বহুতর অর্থে আল্লাহ সৃষ্টি সকল জীবজন্মকে বুঝান হয়েছে। এখানে চলমান জীবজন্মের শিরোপারি কেশগুচ্ছ ধারণ ভাষার বাগবৈশিষ্ট্যের বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত এবং এই উপমাটি ‘অশ্বের কেশগুচ্ছ’ নামক বাক্যাংশ থেকে গৃহীত হয়েছে। কেশগুচ্ছ ধারণ একটি আরবী বাগধারা, এর অর্থ পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। যে ব্যক্তি অশ্বের মাথার উপর কেশগুচ্ছ ধরে রাখতে পারে, অশ্বের উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে ধরা হয়।

প্রাণীজগতের এই বিপুল বৈচিত্র্য তা তারা ভূমির উপর বিচরণকারী বন্য জন্ম বা পাখী, জলজ প্রাণী, কৌটপতঙ্গ যাই হোক না কেন, পৃথিবীতে জীবনধারণকারী সবকিছুই তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ নির্দেশিত বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাণীকুলের স্বীয় আবাসস্থল গড়ে তোলা, খাদ্যের উৎস খুঁজে বের করা, প্রতিরক্ষা কৌশল আয়ত্ত করা, স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করা এবং প্রজনন রীতি মেনে চলা- এ সবই এই বিধানের

অন্তর্ভুক্ত। নিখিল সৃষ্টি সংক্রান্ত সর্বজনীন এই বিধানাবলির কোন লংঘন হলে তা ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধন করে এবং আল্লাহর মঙ্গলকর পরিকল্পনা দারণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জীবকে তত্ত্ববিধান ও পূর্ণ পর্যবেক্ষণে রাখেন। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান লংঘনের কারণে যে ক্ষতি ও বিপর্যয় ঘটে তাও আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত নিয়মেই হয়ে থাকে।

وَإِلَىٰ شَوَّدَ أَخَاهُمْ صَلِّيْ ۝ قَالَ يَقُوْمٌ اعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝  
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْتُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُهُ لِمَ تُؤْبِلُ إِلَيْهِ ۝ إِنَّ رَبِّنِيْ  
قَرِيبٌ بِقُرْبِيْ ۝

১১ : ৬১ ছামুদ জাতির নিকট তাদের ভাতা সালিহকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে ভূমি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটেই, তিনি আহবানে সাড়া দেন।

মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি- এই ভাবধারাটি সূরা আনআম-এর ২নং আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে ‘আরদ’ শব্দটি ‘জিন’ এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে যা সূরা আনআম-এর ২নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। উভয় শব্দ মানব সৃষ্টিসহ পৃথিবীতে জীবনের আঙ্গিক উৎপত্তি সম্পর্কে দিক নির্দেশ করে।

প্রাচীন যুগের মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সাথে বাস করত। তারা কখনও কখনও প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি গুহা এবং ঝুলত উঁচু পাহাড়কে অঙ্গুয়ী বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করত। তারা পশু শিকার কিংবা গাছগাছড়া থেকে খাদ্য অর্বেষণের জন্য দলবদ্ধভাবে বিচরণ করত। কিভাবে খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে ও জীবজন্মকে পোষ মানাতে হয় তার কৌশল বর্তমান কালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১০,০০০ বছর আগে তারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এই আবিষ্কার তাদেরকে সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে ও বৃহৎ সংখ্যায় একত্রে বসবাসের সুযোগ করে দেয়। প্রথম

মৌসুমের ফসল স্বাভাবিকভাবে ভাল মানের হয়। কিন্তু দুই বা তিন মৌসুম পর জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় এবং এ সকল গোষ্ঠী যায়াবর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। ফলে এক সময়কার ফসল উৎপাদনকারী ভূমি দীর্ঘদিন পতিত পড়ে থাকে এবং যতদিন পর্যন্ত তারা পূর্বের ভূমিতে ফিরে না আসে ততদিন এরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকে। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে এভাবে বড় আকারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভিবাসন হলে অনেকে স্থায়ী ভাবে থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির উত্তর হয়।

#### তথ্যসূত্র :

1. Went, F.W. The plants, Time-life International (Netherland) N. V. Amsterdam, p. 169, 1968.

## ○۔ لَأَنَّ الَّذِينَ كَلَمُوا الْحَيَاةَ فَإِنَّمَا يَرَوْنَ مَا جَاءُوكُمْ

১১ : ৬৭ অতঃপর যারা সীমালজ্জন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল; ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

এই আয়াতে ছামূদ গোত্রের লোকদের শাস্তির বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। এই গোত্রের লোকদের মধ্যে নবী সালিহ (আ) ধর্মপ্রচার করেন। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট স্তু উটকে হত্যা না করার জন্য সালিহ (আ) সকলকে সতর্ক করে দিলে তারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে এবং আল্লাহর নিকট থেকে তাদের উপর শাস্তি নেমে আসে। অ্যাসিরীয় নৃপতি সারগোন-এর নামে ৭১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের একটি খোদাই করা শিলালিপিতে ছামূদ জাতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এদেরকে আরব দেশের পূর্ব ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বলে অভিহিত করা হয়। অ্যাসিরীয় বিবরণী ও টলেমি ও প্লিনি'র মত কালজয়ী গ্রন্থকারদের মতানুসারে ছামূদ গোষ্ঠী উভর আরবে বিশেষ করে লোহিত সাগরের নিকটবর্তী হেজায প্রদেশের উভরাঙশে বসবাস করত। হেজায রেলপথের বরাবরে বর্তমান কালের দুমাত আল-জানদাল নামে এই এলাকাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ছামূদ গোত্র ঘনিষ্ঠভাবে লিহয়ান গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তারা এই লিহয়ান গোত্রের পূর্ব পুরুষ ছিল। আনুমানিক ৪০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ছামূদ গোত্রের প্রতিন ও লিহয়ান রাজ্যের অবসান এই সময়ে ঘটে।

পরিত্র কুরআনের ১৩টি সূরার নিচের আয়াতসমূহে ছামূদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে; (১) ৭ : ৭৩-৭৯; (২) ১১ : ৬১-৬৮; (৩) ২৫ : ৩৮; (৪) ২৬ : ১৪১-১৫৯; (৫) ২৭ : ৪৫-৫৩; (৬) ২৯ : ৩৮; (৭) ৪১ : ১৩-১৭; (৮) ৫১ : ৪৩-৪৫; (৯) ৫৪ : ২৩-৩১; (১০) ৬৯ : ৪-৮; (১১) ৮৫ : ১৭-২০; (১২) ৮৯ : ৯-১৪; (১৩) ৯১ : ১১-১৫।

ছামূদ গোত্রের উপর নেমে আসা শাস্তির ধরণ ছিল- (১) ভূমিকম্প আয়াত ৭ : ৭৮, (২) ঝড়-ঝঞ্চা/ মহাধ্বনি আয়াত ১১ : ৬৭, ৫৪ : ৩১ (৩) বজ্রপাত/ বজ্র আয়াত ৪১ : ১৩, ১৭; ৫১ : ৪৪, (৪) বজ্র-বিদ্যুৎ আয়াত ৬৯ : ৫। এই সকল বিপদাপদ একত্রিত করলে এই তথ্য পাওয়া যায় যে সে সময় এক ডিয়াবহ ভূমিকম্প/ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত হয় এবং তার সাথে বজ্রপাত ও বিদ্যুতের বিক্ষেপণ ঘটে।

সূরা আরাফ-এর ৭ : ৯১ আয়াতে ভূমিকম্প সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

পৃথিবীর কঠিন ভূত্তকের মধ্যে একটি মন্তবড় ছিদ্রপথের চারদিক ঘিরে যে চোঙাকৃতির পর্বত রয়েছে তাকে আগ্নেয়গিরি নামে অভিহিত করা হয়। আগ্নেয়গিরি লাভাসহ নানা প্রকার খড় পদার্থ দ্বারা গঠিত। অতি উচু তাপমাত্রায় এর মধ্যস্থ পদার্থসমূহ গলিত হয়ে তরল আকারে প্রবাহিত হয় অথবা প্রচল বিক্ষেপণমূলক অগ্ন্যৎপাতের মাধ্যমে ভূঅভ্যন্তরস্থ পদার্থসমূহ বাইরে বেরিয়ে আসে। আবার এই উভয় অবস্থা একই সাথে ঘটতে পারে। আগ্নেয়গিরিকে ঢেশে শেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা- (১) বিক্ষেপণমূলক; (২) নির্গমনমূলক; এবং (৩) মধ্যম প্রকার। (১) বিক্ষেপণমূলক আগ্নেয়গিরি থেকে শক্ত পদার্থের খনাংশ ও গ্যাস নির্গত হয়। এসব পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বাধা সৃষ্টিকারী পদার্থ থাকে এবং তা প্রায়ই আংশিক তরল অবস্থায় নির্গত হয়। লাপিলি (Lapilli) অথবা ধূলিকণাও এসব পদার্থের মধ্যে থাকে। ধূলিকণাকে প্রায়ই ছাই হিসাবে উল্লেখ করা হয়। (২) নির্গমনমূলক আগ্নেয়গিরির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামান্য বিক্ষেপণ অথবা কোন বিক্ষেপণ ছাড়াই তরল লাভ নীরবে বহিগত হয়। (৩) মধ্যম প্রকারের আগ্নেয়গিরি থেকে কখনও কখনও প্রচল বিক্ষেপণ হয় এবং এর সাথে সাথে লাভার স্রোত নেমে আসে। প্রচল বিক্ষেপণমূলক অগ্ন্যৎপাতের একটি উদাহরণ হচ্ছে ডাচ পূর্ব ভারতের (ইন্দোনেশিয়া) স্যান্ড প্রণালীতে অবস্থিত ‘ক্রাকাতাও’ আগ্নেয়গিরি। ১৮৮৩ সালে এক অগ্ন্যৎপাতের ফলে এক ঘন মাইল শিলাখন্ড ধূলি আকারে বায়ুমণ্ডলের ১৫ মাইল উচ্চতায় উঠেছিল। আর ওয়েষ্ট ইন্ডিজের মার্টিনিক দ্বীপের মাউন্ট পিলো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত ঘটে ১৯০২ সালে। মাউন্ট পিলীর অগ্ন্যৎপাতে কোন লাভার স্রোত ছিল না, কিন্তু প্রচল উন্নাপ বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ও ধূলিকণার এক বিরাট মেঘের সৃষ্টি হয় যা সেন্ট পিয়ের (st. Pierre) শহরকে ধ্বংস করে দেয় এবং শহরের ২০,০০০ জনসংখ্যার প্রায় সবাই মৃত্যুবরণ করে।

এই আয়তে কেবলমাত্র মহানাদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ধারণা হয় যে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত কিংবা বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়ের সময়ে যে প্রচল শব্দের সৃষ্টি হয় তারই প্রসঙ্গ এখানে এসেছে।

### তথ্যসূত্র :

- Ali, A. Y., The Holy Quran, p.360, 1975.
- Scientific Encyclopaedia, Von Nostrand Company Inc., New York, 1947.

○ ۴۰- قَالَتْ يُونِيْلَكِي رَالِدُ وَأَنَا عَبُورُ وَهَذَا بَعْلُ شِينْغَا إِنْ هَذَا الْكَثُرُ عَجَيْبٌ  
○ ۴۱- قَالُوا أَنَّكُحِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبِرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ  
إِنَّهُ حَيْيٌ عَجَيْبٌ ○

১১ : ৭২-৭৩ সে বলল, ‘কী আশ্চর্য! সন্তানের মা হব আমি, যখন আমি  
বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত  
ব্যাপার!’ তারা বলল, ‘আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ  
করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর  
অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সশ্মানার্হ।’

এই ঘটনার চিকিৎসা শাস্ত্রের দিকটি নিয়ে ৩ : ৪০ নং আয়াতে ইতোমধ্যে  
আলোচনা করা হয়েছে। রজঃনিবৃত্তির পর একজন রজঃনিবৃত্ত স্ত্রীলোকের  
সন্তানধারণের সভাবনা বর্তমান বিজ্ঞানের ধারণার বাইরে।

○ ۴۲- وَجَاءَهُ قَوْمٌ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ الشَّرَّاَتْ قَالَ يَقُولُونَ  
هُوَ لَهُ بَنَانِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَالْكَوَافِرُ وَلَا تُخْزِنُونَ فِي كَنْيَفِيْنَ أَلَيْسَ مِنْكُمْ  
رَجُلٌ رَشِيدٌ ○

১১ : ৭৮ তার সম্প্রদায় তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে ছুটে আসল, এবং পূর্ব থেকে  
তারা কুকর্মে লিষ্ট ছিল। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! এরা  
আমার মেয়ে, তোমাদের জন্য এরা পরিত্ব। সুতরাং আল্লাহকে  
ভয় কর এবং আমার অতিথিদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে  
আমাকে হেয় কোর না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ  
নেই?’

সমকামিতার পরিণাম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা আয়াত ৭ : ৮০,৮১ ও  
পরিশিষ্ট-৩ এ আলোচনা করা হয়েছে।

○ ۴۳- قَلَّتَا جَاهَةً أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا جَاهَةً فَنِ سِعْيَنِ  
لَكَنْضُورَ ○

১১ : ৮২ অতঃপর যখন আমার আদেশ আসল তখন আমি জনপদকে  
উচ্চিয়ে দিলাম এবং ওদের উপর ক্রমাগত প্রস্তর কংকর বর্ষণ  
করলাম।

এই আয়াতটি নবী লৃত (আ)-এর সময়কার ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে।  
এই ঘটনা আয়াত ৭ : ৮৪ তে আলোচিত হয়েছে। তাপে শুকিয়ে যাওয়া শক্ত  
মাটির ঢেলা তাদের উপর বর্ষণ করা ছাড়াও এটা বলা হয়ে থাকে যে ঐ  
সম্প্রদায়ের বসবাস স্থলের ভূমি উচ্চিয়ে দেওয়া হয়। এর অর্থ হচ্ছে সেখানে  
প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়।

وَلَنَا بَعْدَ أَمْرُنَا بِتَبْيَنِ شَعَيْبًا وَالْبَيْنَ امْتُوا مَعَهُ بِرْحَمَةِ فَنَأَوْ أَخْنَتْ  
الْبَيْنَ طَلْمُو الْصَّيْبَىٰ وَنَاصِبُو رَافِ دِيَارِ هُرْجِيْبِينَ ۝

১১ : ৯৪ যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি শু'আয়ব ও তার সঙ্গে  
যারা ইমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা  
করেছিলাম, অতঃপর যারা সীমালজ্বন করেছিল মহানাদ  
তাদেরকে আঘাত করল, ফলে তারা স্ব স্ব ঘরে নতজানু অবস্থায়  
শেষ হয়ে গেল;

এই আয়াতে মাদিয়ান অঞ্চলের অধিবাসীদের শাস্তি প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা  
দেওয়া হয়েছে। হয়রত শু'আয়ব (আ) মাদিয়ান অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতেন। নবী  
শু'আয়ব (আ) ও মাদিয়ানের লোকদের নিয়ে যে ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছে তা  
আয়াত ৭ : ৮৫-৯৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত ৭ : ৯১ এ ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে এই আয়াতে  
মহানাদ-এর উল্লেখ রয়েছে। এতে ধারণা করা হয় যে ভূমিকম্পের সময়ে সৃষ্ট  
উচ্চ শব্দের বিষয়ে এখানে বর্ণিত হয়েছে। -

শব্দের প্রতি মানুষের কানের স্বাভাবিক সংবেদনশীলতার পরিসীমা হচ্ছে ২০  
হার্টজ থেকে ২০,০০০ হার্টজ পর্যন্ত। অবশ্য মানুষ ভেদে এর বিভিন্নতা রয়েছে।  
২০ হার্টজ-এর নিচের শব্দকে নিচু ধ্বনিতরঙ্গ এবং এর পরিসীমা ২০,০০০  
হার্টজের উপর হলে তাকে অতি উঁচু ধ্বনিতরঙ্গ বলে।<sup>১</sup>

যদি উঁচু ধ্বনি তরঙ্গের চাপ চারদিকে বিদ্যমান (স্বাভাবিক গড়) চাপের  
মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে গহ্বর সৃষ্টিকারী একটি অবস্থার উভব হয়। যদি এই

গহৰ একটি উপযুক্ত ব্যাসার্ধের বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারে তাহলে চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃত্তচির সম্প্রসারণ ঘটে। তারপর যদি চাপ কমতে শুরু করে তাহলে এই বৃত্ত অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং দ্রুত এর ডিয়াশক্রি লোগ পায়। এই শক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার সময় গহৰের মধ্যকার ব্যাস অতি উঁচু মাত্রায় চাপ দিয়ে সংক্ষেপণ করা হয়। এ রকম সংক্ষেপণকৃত চাপের পরিমাপ নিয়ে দেখা গেছে যে তা বায়ুমন্ডলের চাপের চেয়ে কয়েকশত গুণ বেশী। অভিঘাত তরঙ্গের তাপ বিকিরণ দ্বারা এই অতি উচ্চ মাত্রার চাপ ভারযুক্ত হয়। আর, এর রয়েছে ভয়াবহ ধৰ্মস্কারী ক্ষমতা।

#### তথ্যসূত্র :

1. Encyclopaedia Britannica, vol. 17, p. 19.

١٢٣- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ الْيَنِيلِ إِنِّي أَحَسَّنْتِ يُدْهِبَنَ  
الشَّيْءَاتِ ذَلِكَ ذَكْرٌ لِلذِّكْرِينَ

১১ : ১১৪ সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রাত্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে।  
সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ  
করে এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।

এই আয়াতে উল্লেখিত দিনের দু'প্রাত্ত বলতে স্পষ্টভাবে সন্ধ্যা বেলার কথা  
বলা হয়েছে যখন রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করে, আর যখন দিন রাতের মধ্যে  
প্রবেশ করে তখন সকালের সূচনা হয়। দিন রাতের এই বিবর্তন ক্রমান্বয়িক  
দিনের এই দু'প্রাত্তের সংঘঠনের কারণ আয়াত ৩ : ২৭ এ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা  
হয়েছে।

এই আয়াতে উল্লেখিত রাতের অভিগমনের অর্থ হতে পারে বিলম্বিত  
অপরাহ্ন ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত সন্ধ্যাকাল। কিন্তু আরবী 'জুলাফাম্‌মিনান্নায়াল' শব্দ  
সমষ্টিকে পিকথল ও অন্যান্য কিছুসংখ্যক ভাষ্যকার রাতের কিছু বিভাগ হিসাবে  
ব্যাখ্যা করেছেন। তাহলে সূর্যাস্তের পর পরই (মাগরিবের সালাতের সময়)  
রাতের প্রারম্ভিক অংশকে এটা সূচিত করবে এবং পরবর্তী অংশ হবে মধ্যরাতে  
পূর্বেকার সময় (ঈশার সালাতের সময়)।

١٢٤- وَلِلَّهِ عَيْنِبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ  
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

১১ : ১২৩ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদ্যশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং  
তাঁরই নিকট সকল কিছু প্রত্যানীত হবে। সুতরাং তার  
'ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। তোমরা যা কর সে  
সমস্কে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।

আল্লাহ এই আয়াতে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে সকল গোপন  
ও অপ্রকাশ্য বিষয় তাঁর এখতিয়ারভূত। এই প্রসংগে এ বিষয়ের উল্লেখ করা  
প্রয়োজন যে ধ্যানুষ স্বভাবতই দৃশ্যমান বস্তুর অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিচার  
করে কোন বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে এমন  
বহুসংখ্যক গুণ বিষয় রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসার বাইরে থেকে যায়।

মানব সভ্যতার ঘটনাকালে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে বহু বিষয় আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এখনও বহু বিষয় অনাবিকৃত রয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে আমরা নিয়ন্তুন বিষয়াদিকে অভিক্রম করে চলেছি। কিন্তু তা আমাদের এই সত্য অনুধাবন করায় যে কোন বিষয়ের 'শেষ কথা' বলে কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ আমরা অণু, পরমাণু, প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেক্ট্রনের কথা বলতে পারি এবং অবশেষে কোয়ার্ক (প্রাথমিক কণা বিশেষ) ও লেপটন (leptons)-এর বিষয়ও আসে যা পদার্থের মৌলিক গঠনমূলক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আর এসব বিষয় আবিকৃত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের নিরন্তর অনুসন্ধিৎসার কারণে। যদি কোন পদার্থের একটি মৌলিক গুণ আবিকৃত হ'ল তো অতিসূক্ষ্ম পরিসরে আরেকটির অভ্যন্তর ঘটে। এভাবে উপ-আণবিক বিষয়াদির গবেষণার ক্রমান্বয় উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিলে এটা চিন্তা করা ভুল হবে যে এই পৃথিবীর যাবতীয় গোপনীয় বিষয়ের আবরণ ইতোমধ্যে উন্মোচিত হয়েছে বা ভবিষ্যতে উন্মোচিত হয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রচেষ্টার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, একটি রহস্যের সমাধান হলে আরেকটি নতুন রহস্য এক কদম পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। এই একই পর্যবেক্ষণ দূর মহাশূন্যের বিশয়কর বস্তুসমূহের বেলায়ও সত্য হতে পারে। এই আয়াতে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে প্রকৃতির জটিল রহস্য উন্মোচনে আমরা যত কঠিন সংগ্রামই করি না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, তবুও সর্বদা কিছু অদৃশ্য বিষয় থেকে যাবে যার অবস্থান হবে মানব জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসার বাইরে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে আমরা বিরত থাকব। বস্তুত তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে জানা ও চিন্তা করার জন্য আমাদের উপর বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে নিরন্তর এই চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু একই সময়ে আমরা যদি বর্তমান আয়াতটির তাৎপর্য অনুধাবন করি যেমন আল্লাহ সকল অদৃশ্য ও অপ্রকাশ্য বস্তু সম্পর্কে জানেন যা মানুষ তার অদম্য অনুসন্ধান প্রবৃত্তি সন্ত্রেণ এই প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটবে না, তা হলে আল্লাহর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যাবে এবং আমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর পছন্দনীয় ইবাদতে নিবেদিত হতে পারব।

٢٤-قَالَ تَرْزُّعُونَ سَبْعَ سِينِينَ دَأْبًاٖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَنَذَرُوهُ فِي سُلْطَانِهِ  
○ لَا قَلِيلًاٖ قَعَادًا تَكُونُونَ

১২ : ৪৭ ইউসুফ বলল, 'তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, তারপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তার মধ্যে যে সামান্য

পরিমাণ তোমরা আহার করবে, তাছাড়া সমস্ত শীষসহ শস্য  
রেখে দেবে;'

এই আয়াতে এটাই নির্দেশ করা হয়েছে যে শস্যের দানা যদি শিষ-এর সাথে  
লাগান অবস্থায় থাকে তাহলে শিষ ছাড়া শস্যের দানা স্তুপ করে রাখার চেয়ে তা  
অধিকতর ভাল অবস্থায় থাকে। বর্তমানে সকল বিশেষজ্ঞ একমত পোষণ করেন  
যে Triticum dicoccum (এক প্রকার আবাদকৃত গম) প্রাচীন মিসরে  
চাষাবাদ হ'ত এবং দুর্ভিক্ষের সময় ইউসুফ (আ)-এর দশ ভাই মিসর থেকে শস্য  
কেনার জন্য গিয়েছিলেন। গমের দানা শিষ থেকে আলাদা করার পর সংরক্ষণের  
পূর্ব পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করে। কারণ, এই সময়ে শস্যদানা  
ব্যাপকভাবে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ও পরজীবী ছত্রাকের সংক্রমণের সমুদ্ধীন  
হয়। শস্যের ক্ষতিকারক গুবরে পোকা ও শুড়ওয়ালা কীটপতঙ্গ গুদামজাত করা  
শস্যের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধন করে। পক্ষান্তরে Alternaria ও Fusarium  
প্রজাতির ছত্রাক গুদামজাতকৃত খাদ্যশস্য আক্রমণ করে তার প্রভৃতি ক্ষতিসাধন  
করে। গুদামে রক্ষিত খাদ্যশস্যে কীটপতঙ্গ জন্মায়, আর ছত্রাক জন্মায়  
খাদ্যশস্যের উপর। তবে উভয় ক্ষেত্রে তাদের বাঁচা ও বৃদ্ধি নির্ভর করে খাদ্যশস্যে  
কতটুকু অর্দ্ধতা রয়েছে তার উপর। অক্ষত ও উন্নত অবস্থায় রয়েছে এমন শস্যের  
উপর সাধারণত কীটপতঙ্গের আক্রমণ হয় না, কিন্তু ভিজা, সেঁতসেঁতে শস্য খুব  
দ্রুত এদের জন্ম ও বংশবৃদ্ধি হয়। আর এরূপ শস্য ভাঙা শাঁষে পূর্ণ থাকে।

ক্ষেত থেকে কেটে নেওয়া শস্য যদি শীষযুক্ত থাকে এবং ঝুলিয়ে রাখা যায়  
তাহলে শস্যের গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে,  
মাড়াই করার পর গুদামজাতকৃত শস্যের চেয়ে এরূপ শস্যের সুবিধা বেশী।  
প্রথমত পরিপক্ষ শস্য গমের ক্ষেত্রে অবশ্য এক বীজ বিশিষ্ট, ক্ষতিকর  
পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে শস্যের চারদিকের দেওয়াল ও বীজের অঙ্গত  
আবরণী দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। পাকা শস্যের এই দেওয়াল ও আবরণী একত্রিত  
হয়ে বীজের ভূগ ও অঙ্গত সংরক্ষিত খাদ্যশক্তিকে আবদ্ধ করে রাখে। শস্যের  
এই বহিরাবরণ শস্য মাড়াইকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে। শস্য  
ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভিতরের শস্যদানা অনাবৃত হয়ে পড়ে যার ফলে এরূপ শস্যে অতি  
সহজে পোকার সংক্রমণ ঘটে। আবার ফসল মাড়াইয়ের সময় শস্যদানা ক্ষতিগ্রস্ত  
না হলেও শীষ থেকে শস্য ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় শস্যের চারদিকের প্রতিরক্ষা  
দেয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হতে পারে এবং সেখান দিয়েই শস্য দানার উপর  
কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত শস্য যখন  
শিষে লাগান থাকে তখন সাধারণভাবে গমের আঁচি উর্ধ্বমুখী করে রাখা হয়।

এই পদ্ধতিতে গমের শীষে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং ক্রমশ মাটির উপরস্থ আর্দ্রতা শুকিয়ে যায়। এভাবে পোকা মাকড়ের আক্রমণ উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয় না। শীষে এভাবে শস্য রেখে দিলে তা অনেক বছর ধরে সংরক্ষণ করা যায়। শস্য সংরক্ষণের বিষয়ে মিসরবাসীদের পরামর্শ প্রদান নবী ইউসুফ (আ)-এর এই বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাদশাহৰ স্বপ্নের তাৰীহৰ ব্যাখ্যা এবং সাত বৎসৰ ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়াৰ ভবিষ্যত্বাণী সম্পর্কে বৰ্ণনা দেন।

مَوْتُكُلٌ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَقِّى عَلَى يُوْسُفَ وَابْيَضَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَزْنِ لَهُ كَلِيلٌ

১২ : ৮৪ যে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, ‘আফসোস ইউসুফের জন্য।’ শোকে তার চক্ষু দু’টি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট ছিল।

মিশর থেকে ফিরে আসার পর ইউসুফ (আ)-এর সৎ ভাইয়েরা দ্বিতীয়বার যখন তাদের পিতাকে অবহিত করল যে তার কনিষ্ঠ পুত্র ও ইউসুফের ছেট ভাঙ্গ বিন ইয়ামিন কথিত চুরির দায়ে মিশরে আটক আছে তখন ইয়াকুব (আ) এই সংবাদ অবগত হয়ে দার্শণভাবে ব্যথিত হলেন এবং ‘পুত্র ইউসুফকে হারানৰ শোক নতুন করে জেগে উঠল। তিনি তাদের নিকট থেকে চলে গেলেন এবং যেহেতু এই বৃক্ষ বয়সে তার কিছুই করার ছিল না বলে তাকে এই দুঃসহ মানসিক যাতনা ও দুঃখ ভোগ করতে হ’ল। উপরোক্ত আয়ত অনুযায়ী দীর্ঘকালব্যাপী তার এই দুঃসহ দুঃখ নিজের মনে গোপন করে রাখার ফলে ইয়াকুব (আ)-এর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা এখন স্বীকৃত যে প্রচল মানসিক আবেগ ও উদ্বেগ সাময়িকভাবে শারীরবৃত্তীয় বৈকল্যের সৃষ্টি করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে মানসিক বিকারজাত শারীরিক ব্যধি বিষয়ক বিশৃঙ্খলা (psychosomatic disturbances) বলে। বলা হয়ে থাকে যে দুঃখ যদি অক্রম মাধ্যমে বের হওয়াৰ কোন পথ খুঁজে না পায় তাহলে তা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঁদার কারণ হতে পারে। এছাড়া, ‘যখন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গোপনীয়, অস্তঃস্থ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাৰ ও কঠিন চাপমূলক অবস্থার নিরসনেৰ জন্য কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ কৰা হয় তখন মানসিক-স্নায়বিকভাবে পীড়িত ব্যক্তিত্বে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আৱ তখন রোগী উত্তেজনা অথবা উদ্বেগেৰ কাৱণে সৃষ্টি বিশৃঙ্খলার মনস্তাত্ত্বিক কোশলেৰ সাহায্য ব্যৱিৱেকে স্বীয় শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে না। অনেক মনস্তাত্ত্ববিদ অতঃপর

মানসিক উদ্বেগকে স্নায়বিক পীড়ার একটি সর্বজনীন শক্তিশালী উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন।' মানসিক-স্নায়বিক পীড়া বিষয়ক পরিভাষাটিকে এরূপ বিষয়ের সাথে যুক্ত করা হয়। অন্যান্য শারীরিক বিশৃঙ্খলার (যেমন angina pectoris, hypertension, migraine, peptic ulcer, ulcerative colitis, diabetes mellitus, asthma, anorexia, impotence, frigidity ইত্যাদি) ন্যায় মানসিক স্নায়বিক পীড়াজনিত বৈকল্যের সংবেদী লক্ষণসমূহ সাধারণত শরীরের ক্রিয়ামূলক অসামর্থ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেগুলো! বেশ ঘন ঘন ঘটতে দেখা যায় তার মধ্যে anaesthesias, paresthesias এবং বিশেষ সংবেদী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈকল্য অন্যতম, যেমন অঙ্গত্ব বা বধিরতা।। তাই এটা সম্ভব যে গভীর শোক অবদমন করার ফলে মানসিক-স্নায়বিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে তা নবী ইয়াকৃব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি করে।

অঙ্গত্বের পরিবর্তে 'শ্বেতবর্ণ' শব্দের ব্যবহারও কৌতুহল উদ্দীপক। চক্ষুর খেত বর্ণ ধারণ সাধারণত চক্ষুর কেরাটাইটিস (keratitis) রোগের বেলায় ব্যবহৃত হয়। চক্ষুর কর্ণিয়াতে আলসার হলে কিংবা ছানি পড়লে এই রোগ হতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থা হচ্ছে শরীরের সাময়িক ক্রটি যা চিকিৎসা সাপেক্ষ। কিন্তু এসব রোগের কোনটাই মনের অবদমিত দুঃখের সাথে সম্পর্কিত নয়। অবদমিত শোক অনেক সময় সাময়িক অঙ্গত্বের সৃষ্টি করতে পারে যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু শ্বেতবর্ণধারণকারী চক্ষু হচ্ছে পরিকার চক্ষুর বিপরীত, তাই সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা সাময়িক অঙ্গত্বকে বুঝানর জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছেন।

### তথ্যসূত্র :

1. Kolb, L. C. Noyis, Modern Clinical Psychiatry, 7th edn. oxford & IBH Pub. Co. India, PP 413-458. 1970.

وَلَقَدْ أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَنَّهُ عَلَى وَجْهِهِ قَلْتَ دَيْمِيرًا، قَالَ أَنَّكَ أَفْلَى لَكُمْ  
لَئِنْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

১২ : ৯৬ অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিতি হ'ল এবং তার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর নিকট থেকে জানি যা তোমরা জান না?’

পূর্ববর্তী ১২ : ৮৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দীর্ঘস্থায়ী ও অতি প্রচন্ড অবদমিত শোকের কারণে নবী ইয়াকুব (আ)-এর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। ১২ : ৮৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত চোখের সাদা হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সাময়িক অঙ্গুত্ব যার সমর্থন ১২ : ৯৬ নম্বর আয়াতে পাওয়া যায়। যখন ইউসূফ (আ)-এর সুসংবাদ এবং তৎকর্তৃক প্রেরিত জামাটি নবী ইয়াকুব (আ)-এর কাছে প্রেরণ করা হ'ল তখন তার দীর্ঘদিনের স্থায়ী শোক দূরীভূত হয়ে গেল। তাঁর দীর্ঘদিনের হারিয়ে যাওয়া পুত্রের হঠাতে সন্ধান পাওয়ার সুসংবাদ তাঁকে পরম আনন্দ দান করে এবং সাময়িক অঙ্গুত্বের কারণ মনস্তাত্ত্বিক স্নায়বিক বৈকল্য দূরীভূত হয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁর পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

٥- وَكَبَّنْ مِنْ أَيْمَنِي فِي الْمَهْوَتِ وَالْأَرْبَسِ يَرْتَوْنَ عَلَيْهَا وَهُنْ عَنْهَا مُغَرِّضُونَ ۝

১২ : ১০৫ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে যারা আল্লাহর সৃষ্টি নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করে এবং যে নিদর্শনসমূহ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করে তাহলে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে। অবশ্য অনেকে এ সকল নিদর্শন দেখার পরও উদাসীন থাকে। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের (আয়াত) মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না বলে তাদের মধ্যে উদাসীনতার সৃষ্টি হয়। এটা একটি চমকপ্রদ বিষয় এই যে আল্লাহর নিদর্শনাদির (আয়াত) যথাযথ মর্ম বুঝতে হলে বিজ্ঞানের উপর গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। আরও কৌতুহল উদ্দীপক ঘটনা হ'ল এই যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার অধিকাংশ নিদর্শনসমূহ ১৮টি সূরা ও ৪২টি আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল আয়াতের সবই

বিজ্ঞানতত্ত্বিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।<sup>১</sup> উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, জীবনহীন জড় পদার্থ থেকে জীবনের সৃষ্টি একটি নির্দর্শন, তেমনি জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গীর সৃষ্টি, সৃষ্টির আদি কারণ, মানুষের বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতা, মানুষের মনে ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি, সবুজ লতা-পাতা গুল্মের জন্ম ও তাদের পাতার সালোক সংশ্লেষ (photosynthesis) প্রভৃতি অসংখ্য নির্দর্শন মানুষের মনে প্রতিফলিত হতে পারে। আর মানুষ যখন জীবন্ত বা জীবনহীন বস্তুর গঠন প্রণালী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার মহাপরিকল্পনা জানার ও বুঝার চেষ্টা করে তখন আল্লাহ সৃষ্টি নির্দর্শনাদি সম্বন্ধে জান লাভ করতে পারে। এরপে বলা সংগত<sup>২</sup> নয় যে বর্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা আল্লাহর নির্দর্শনাদি সম্পর্কে জ্ঞান আর্জন করেছি। তবে এটা অবশ্যই সত্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমাবয় অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের পক্ষে কিছুসংখ্যক নির্দর্শন উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় (আয়াত ২ : ১৬৯) ইরশাদ করেছেন কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ যাদের ইলম আছে (ইলমের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞান) তাঁর নির্দর্শন সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবেন। তাই জ্ঞানার্জন সুস্পষ্টভাবে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নির্দর্শনসমূহ বুঝতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ এই সংক্রান্ত গতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। গতি নিয়ন্ত্রকারী বিপরীত বর্গীয় সূত্র মাত্র তিন শতাব্দীরও কিছু বেশী সময় পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কেবল গত শতাব্দীতেই মানুষ জানতে পেরেছে যে বিভিন্ন শক্তির একই ধরনের বিপরীত বর্গীয় সূত্র (Inverse Square Law) পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের চারদিকে থাকা ইলেক্ট্রনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি চমৎকার নিয়মের অধীনে এভাবে অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র পর্যায়ের বস্তুর যে বিন্যাস সাধিত হয় তা বাস্তবিকই আল্লাহর একটি নির্দর্শন। বিজ্ঞানের চর্চা ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার এ সকল নির্দর্শনের মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। এরপর আরেকটি উদাহরণ যেমন কীভাবে বৃষ্টির সৃষ্টি হয় তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এটা সকলের জানা আছে যে, জীবন ধারণের জন্য পানির প্রয়োজন সর্বাধিক। কিন্তু সেই পানি পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়নি। তাহলে যার হাতের কাছে পানি পাওয়ার সুযোগ নেই সে কীভাবে কৃষি ও অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহার করতে পারবে? বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন থেকে অবশ্য একটি উত্তর পাওয়া যায়। আমরা জানি যে পানির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা রয়েছে যথা কঠিন (বরফ), তরল (পানি) ও গ্যাসীয় (বাষ্প)। পদার্থের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন solid state physics-এর একটি চমকপ্রদ

বিষয় এবং পানির ক্ষেত্রে যদি এরূপ পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সাধিত না হ'ত তাহলে পানির লক্ষ কোটি কগার (যার ওজন লক্ষ লক্ষ কিলোগ্রাম) পক্ষে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে বাস্পীভূত হয়ে যাওয়া এবং অবশেষে দূরবর্তী কোন অঞ্চলে মেঘ ও বৃষ্টিরূপে পতিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সত্যিই এভাবে বৃষ্টির বর্ষণ ঐ ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নির্দেশন হিসেবে গ্রহণীয় যে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু জানে। এরূপ নির্দেশন দ্বারা প্রকৃতি ভরপুর। তবুও মানুষ এসব নির্দেশন সম্পর্কে উদাসীন এবং আল্লাহর মোজেজার অব্যবহৃত থাকে। আজকাল জীব-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানে যে একটি কোষের সৃষ্টি হচ্ছে জীবনের একটি মাত্রা যা নিজেই একটি অলৌকিক ঘটনা বা মোজেজা এবং আল্লাহ তা'আলার একটি স্পষ্ট নির্দেশন। এভাবে বিশ্বে ভরা এই মহাবিশ্ব আল্লাহর সৃষ্টিতে বিদ্যমান নির্দেশনাদি সম্পর্কে জানার জন্য মানব সমাজকে আহবান জানায়। এ সকল নির্দেশনের প্রতি সাধারণ পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়, আল্লাহর নির্দেশন সমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হলে আল্লাহর সৃষ্টির বিশ্বকর বিষয় মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ সকল বিষয় পরিব্রত কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে এবং মানুষ প্রতিনিয়ত এ সবেরই সাক্ষাৎ লাভ করে।

### তথ্যসূত্র :

1. Ali, Akbar M. Science in the Quran, Malik Library, Dhaka P. 57, 1976.

٤٠٩  
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ  
أَنَّمَا تَسْيِيرُهُ فِي الْأَرْضِ فَيُنَظِّرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ حَيْثُ لِلَّذِينَ آتُوهُمْ أَنْقَعُواْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

১২ : ১০৯ তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই প্রেরণ করেছিলাম, যাদের নিকট ওহী পাঠাতাম। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখেনি? যারা মুস্তাকী তাদের জন্য পরলোকই শ্রেষ্ঠ; তোমরা বোঝ না ?

এই আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে ঐ সকল নোকের করণ পরিণতি দেখার জন্য আহবান জানান হয়েছে যারা তাদের নিকট প্রেরিত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আয়াত ৩ : ১৩৭ এ এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

٤١-أَنَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عِنْدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ  
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَعْجِزُ إِلَّا جِيلٌ مُسْكِنٌ ۗ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْأُبَيْتَ  
لَكُمْ بِإِلَيَّ رَجْعٌ رَّبِّكُمْ تُرْكِبُونَ ۝

১৩ : ২ আল্লাহই উর্ধ্ব দেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন স্তুত ছাড়াই তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন; অত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নির্দশনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপাদকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

‘তিনিই আল্লাহ যিনি কোন স্তুত ব্যতিরেকে আকাশমন্ডলীকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন’— আয়াতের প্রারম্ভের এই গৃঢ় বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই সুদূরপ্রসারী শুরুত্ব বহন করে। একটি স্তুতের কাজ হচ্ছে ভূমিতলের উপর কোন ভারী বোঝা উপরে তুলে ধরা। আমাদের নিকট আকাশ যেমন ভাসমান বলে

প্রতীয়মান হয় তেমনি পৃথিবীর চারদিকে পরিবাণ বায়ুমণ্ডলের বাইরে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, জ্যোতিষ্মণ্ডলী মহাশূন্যের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই আয়াত সুস্পষ্ট ও দ্যৰ্থহীনভাবে ঘোষণা দেয় যে মহাবিশ্বে ভাসমান নক্ষত্রপুঁজি, গ্রহ, উপগ্রহ সমূহের একটা ভার রয়েছে যা ১১শ' শতাব্দীতে আল-বিরুনী প্রকাশ করে গিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে কুরআন নাখিল হওয়ার প্রায় ১২০০ বছর পর নিউটনের মাধ্যকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের ফলে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন যেমন আমরা জানি যে মহাকাশে বিরাজমান গ্রহ, উপগ্রহ বা কোন জড় বস্তু একটি শক্তি দ্বারা পরম্পরাকে আকর্ষণ করছে। এই শক্তি ঐ সকল বস্তুর ভর-এর সমানুপাত বিশিষ্ট এবং বস্তুসমূহের পারম্পরিক দূরত্বের বর্গায়তনের প্রতি উল্টোভাবে সমানুপাতিক। মহাকাশে বিরাজমান এ সকল গ্রহ, উপগ্রহ, জ্যোতিষ্মণ্ডলী ভেঙ্গে পড়ে না কিংবা পরম্পরের মধ্যে কোন সংঘর্ষের সৃষ্টি করে না। কারণ, নিরস্তর কক্ষপথ পরিত্যাগ থেকে উত্তৃত একটি ভারসাম্য পূর্ণ কেন্দ্রাতিগ শক্তি এরূপ কোন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। স্পষ্টতই কেন্দ্রাতিগ শক্তিদ্বারা মাধ্যকর্ষণ শক্তির ভারসাম্যকরণ এই আয়াতে উল্লেখিত অদৃশ্য স্তরের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা ৭ : ৫৪ সংখ্যক আয়াতে পর্যালোচিত হয়েছে।

একটি বিষয়ে সকলের ধারণা থাকা উচিত যে কুরআন কোন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যখন অবতীর্ণ হয় তখন মানব সভ্যতার তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি যে এই আয়াতে বিশ্লেষিত মাধ্যকর্ষণ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির সূত্র বা তত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য জানতে পারবে। প্রায় ১২০০ বছর পর আবিস্তৃত মাধ্যকর্ষণ সূত্র ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির তত্ত্ব এই আয়াতে স্পর্শিত অদৃশ্য স্তরের অবস্থাতিকে সত্য বলে স্বীকার করে। বাস্তবিকই সৃষ্টির এ সকল নির্দর্শন বুঝতে পারলে তা মু'মিন বালাদের মনে পরম আনন্দ সৃষ্টি করে।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ نَبَاتًا رَوَاسِيًّا وَأَنْهَرًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الْتَّمَرُوتِ  
جَعَلَ فِيهَا رُوْجَينَ لَهُنِّي يُغْثِي النَّيْلَ النَّهَارَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِقَوْمٍ  
يُتَفَكَّرُونَ ۝

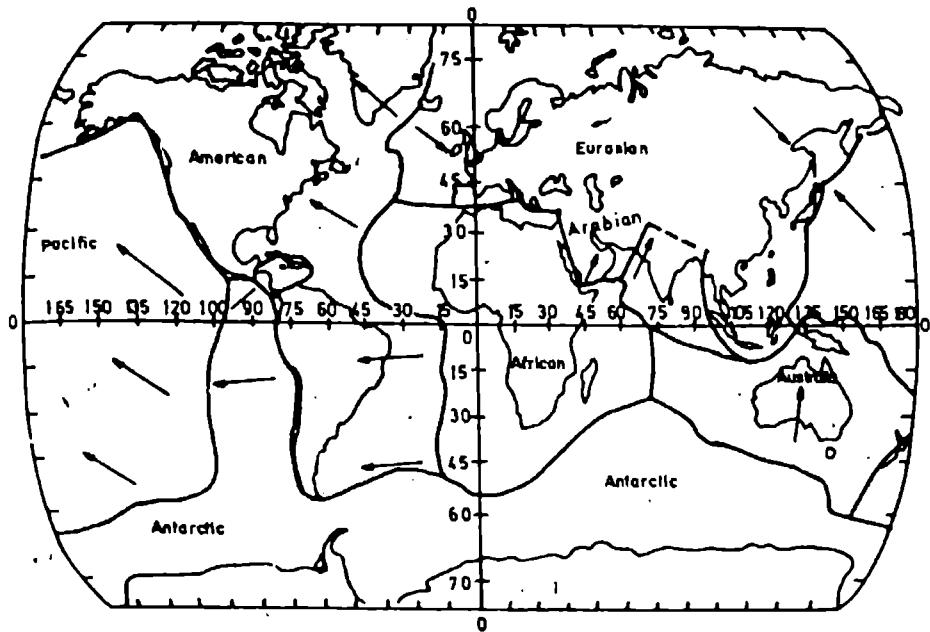
১৩ : ৩      তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক অকার ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায়

জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। চিনাশীল  
সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে।

### পৃথিবীর বিজ্ঞার

বিগত ২৫ বছরে পৃথিবী সংক্রান্ত বিজ্ঞানে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এর ফলে এই এহ সম্পর্কে নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে। মহাদেশ গঠনে যে শক্তি কাজ করছে সে সম্পর্কে জানার পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার পিছনে এই বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহের উপরিভাগ শীতল, খুবই দৃঢ়, ১০০ কিলোমিটার গভীরতা বিশিষ্ট কিছুসংখ্যক lithospheric plate দ্বারা বিভক্ত। এই সকল plate aestheospheric নামে অভিহিত এবং তুলনামূলকভাবে নমনীয় ও আংশিকভাবে দ্রৌপুরুত্ব এলাকায় ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। এই plate সমূহ চলমান এবং গতি এত ধীর যে বছরে ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। পর্বতময় এই plate সমূহ তাপ সঞ্চলন গতি দ্বারা তাড়িত হয়ে এবং মাধ্যকর্ষণ শক্তি ও পৃথিবীর স্বীয় কক্ষপথে ঘূর্ণনের ফলে স্থান পরিবর্তন করে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে সমুদ্রের তলদেশে বিস্তৃত শৈলশ্রেণীর দৈর্ঘ্য বরাবরে নতুন নতুন পর্বতের উথান ঘটছে এবং তারা পৃথিবীর বহিরাবরণ গঠন করত পাশে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। আর ভূতত্ত্ব হিসেবে পরিচিত এই বহিরাবরণ মহাদেশীয় প্লেইটের (continental plates) দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। 'সমুদ্রতল সম্প্রসারণ' (seafloor spreading) নাম অভিহিত এই অনন্যসাধারণ ঘটনাটি lithospheric plate সমূহের প্রবাহ তাড়নার সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত নানাভাবে পৃথিবীর সম্প্রসারণ ঘটায়। এরপ সম্প্রসারণের আর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের সমতলতা যা আয়ত ২ : ২২ এ আলোচিত হয়েছে।

প্লেইটের গঠন সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের এই ক্রম অগ্রসরতা দ্বারা Pangea নামক থাচীন এক অতি বৃহৎ মহাদেশ দু'টি মহা মহাদেশ যথা Laurasia ও Gondwana-এর মধ্যে পরিব্যঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে তা পৃথিবীর বর্তমান ৫টি মহাদেশের আকার ধারণ করে।



চিত্র-৫ : মহাদেশীয় প্লেইট-এর গঠন সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য : মহাদেশীয় টুকরো বিশিষ্ট ধোধা।

পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক দ্বারা গঠিত একাধিক প্লেইটের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয় তখন অধিকাংশ পার্থিব ও ভূতাত্ত্বিক বিশ্বাখলার সৃষ্টি হয়। নতুন পর্বতশ্রেণীর গঠন তৎসহ ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত প্রভৃতি প্লেইটসমূহের মধ্যে মূদু সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। দু'টি মহাদেশীয় প্লেইটের সংঘর্ষে ভূমিকম্প হয়। সংঘর্ষের মাত্রা মারাত্মক পর্যায়ের হ'লে মহাদেশগুলো কুণ্ডিত হয় এবং প্রচুর ভাঁজ বিশিষ্ট পর্বতের উত্থান ঘটে।

### পর্বতমালা

প্রধানত পরম্পরার সংযুক্ত হয়ে অথবা নির্দিষ্ট ক্রমবিন্যাসের আকারে পৃথিবীতে পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল পর্বতশ্রেণী মহাদেশসমূহের প্রান্তে সীমানা তৈরী করেছে এবং দ্বীপমালার আকারে সাগরে ও মহাসাগরে গিয়ে শেষ হয়েছে। পর্বত শ্রেণীর এরপ বিন্যাসে ধারণা করা যায় যে, এর অংশ বিশেষ মহাসাগরে ডুবত অবস্থায় রয়েছে। এভাবে একটি পর্বত শ্রেণী ভূমধ্যসাগরের উপকূল ধরে এশিয়া মাইনর, ভারত, বার্মা (মিয়ানমার) বরাবর বিস্তৃত হয়েছে এবং এর অংশ বিশেষ সমুদ্রে তলিয়ে রয়েছে। তারপর পূর্বদিকে ইন্দ্রিজ বা পূর্ব ভারতীয়

দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করে উত্তর দিকে চলে গিয়েছে এবং এর ফলে এয়ালিউশিয়ান (Aleucian) দ্বীপমালার উত্তর হয়েছে। এরপর দক্ষিণদিকে পরিব্যাণ্ড হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করত নিউজিল্যান্ড অবধি গিয়েছে। এ্যানটার্কটিকার অপরদিকে সম্প্রতি একটি পর্বতশ্রেণী আবিস্তৃত হয়েছে এবং তা নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর সাথে যুক্ত হয়েছে। এ্যানটার্কটিকা হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ (Andes) পর্বতমালার সাথে সংযোগ ঘটেছে। তারপর সেখান থেকে সমুদ্র উপকূল বরাবর উত্তর আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা এভাবে একটি সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত পর্বতশ্রেণী দ্বারা সীমানা তৈরি করা হয়েছে। আবার পাইরেনীজ (Pyrenees) হতে পামির মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ইউরেশীয় পর্বতশ্রেণী ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর ও পারস্য উপসাগরের তীর ধরে অগ্রসর হয়েছে। পর্বতশ্রেণীর এরূপ একটি ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর বিদ্যমান সকল পর্বতের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে দেখা যেতে পারে। এভাবে সমগ্র পৃথিবী পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে, আর পর্বতসমূহ এর উপর শক্তভাবে দাঢ়িয়ে আছে। মহাদেশীয় প্লেইটের সীমানাতে পর্বতের সৃষ্টি। উপরে উল্লেখিত প্রথম পর্বত শ্রেণী ইউরেশীয় প্লেইট, আরবদেশীয় প্লেইট, অস্ট্রেলীয়-ভারতীয় প্লেইট ও এ্যানটার্কটিকা প্লেইটের সীমানায় সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটি শ্রেণী প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেইট, উত্তর আমেরিকার প্লেইট ও দক্ষিণ আমেরিকার প্লেইটের সীমাতে উত্তৃত হয়েছে। অন্যান্য পর্বতশ্রেণী সমূহকেও ভিন্ন প্লেইটের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। (আয়ত নং ৭ : ৯১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

পর্বতসমূহ শক্তভাবে দাঢ়িয়ে আছে, কারণ, তারা খুবই শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর শক্ত বহিরাবরণ অথবা কঠিন ভূত্বকের গভীরতা সমন্বিত থেকে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ এবং মহাদেশীয় সমতল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫ কিঃ মিঃ নিচে বিস্তৃত রয়েছে। আর হিমালয়ের মত বিশাল পর্বতমালার ক্ষেত্রে এই গভীরতার পরিমাণ প্রায় ৮০ কিঃ মিঃ। এভাবে পর্বতশ্রেণীসমূহ অতি শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত।

### নদ-নদী

পৃথিবীর প্রাচীন ভূকাঠামোগত দৃশ্যাবলীর মধ্যে নদ-নদী ও জলপ্রবাহ অন্যতম। একটি নদীর উত্তর সাধারণ ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ভূতাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়া অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত গতিশীল শক্তি প্রবহমান পানির ভারসাম্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তা জলবায়ুতে পরিবর্তন

ଘଟାଯ । ଝଡ଼-ଘେଣ୍ଠା, ପ୍ଲାବନ ପ୍ରତ୍ତି ଭୂତାତ୍ତ୍ଵିକ ଘଟନାବଳୀ ଏକଟି ନଦୀର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତେ ଏକ ଚରମ ସଂକଟମୟ ବାଁକ ହିସେବେ ବିଶିଷ୍ଟତା ଲାଭ କରେ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମ ତରଳ ଅବସ୍ଥାଯ ପାନିର ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ କୋଟି ବଚର ଆଗ ହେଁଛିଲ, ଆର ଏଟା ସନ୍ତବ ହେଁଛିଲ ବିଶେର ଆଦିୟୁଗ (archaeozoic era—ଜୀବନେର ଅନ୍ତିତ୍ତମାନତାର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ) ଥେକେ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗେର ବିଭାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଖନ ଅତିମାତ୍ରାୟ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଶୀତଳ ହତେ ହତେ ତାପମାତ୍ରା ହିମାଂକେର ନିଚେ ନେମେ ଗିଯେଛିଲ । ବାୟୁମନ୍ଡଲେର ଗ୍ୟାସ ଘନୀଭୂତ ହୟେ ବାଷ୍ପ ତୈରୀ କରେ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ଥେକେ ପାନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟେ । ଆର ଏଇ ପାନି ବୃଷ୍ଟିର ଆକାରେ ପୃଥିବୀତେ ବର୍ଷିତ ହୟ । ପାନି ସୃଷ୍ଟିର ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କେ ଯତ୍ନୁକୁ କଲ୍ପନା କରା ସନ୍ତବପର ହୟ ତା ହଚ୍ଛେ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ବିଶାଳାକୃତିର ପର୍ବତମାଲାର ଉପର ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଗତିର ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷଣେର ଏକଟି ଚିତ୍ର ଆଁକା ଯାଯ ଯା ସେ ସମୟ କ୍ରମାବୟେ ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗେର ଗଠନ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ । ବୃଷ୍ଟିର ପାନି ବିଭିନ୍ନ ଖାତ ଦିଯେ ପ୍ରବାହିତ ହୟେ ସଖନ ଶୀତଳ ହୟ ତଥନ ଗର୍ତ୍ତର ଓ ଖାଜେର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏଭାବେ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୟ ଏବଂ ଏକଇ ସାଥେ ପାନିର ଅବିରାମ ପ୍ରବାହେରେ ସୂଚନା ହୟ ଯାର ମଧ୍ୟେ ନଦୀ ହଚ୍ଛେ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ।

ସମସ୍ତ ମହାଦେଶ ଜୁଡ଼େ ବିନ୍ତ୍ତୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଓ ନଦୀଗୁଲୋକେ ସର୍କା ଫିତାର ନ୍ୟାୟ ଜଡ଼ିଯେ ଥାକତେ ଦେଖା ଯାଯ । ଜାଲେର ନ୍ୟାୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ଏ ସକଳ ଜଳପ୍ରବାହ ପ୍ରକୃତିର ସବଚେଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକେ ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଭୂ-ଉପରିଭାଗେର ପାନି ନିଷ୍କାଶନେର ପଥ ହିସେବେ ତାରା ପୃଥିବୀର ଜଳଚକ୍ରେର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସଙ୍ଗେର କାଜ କରେ । ପାନିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଆବର୍ତନକାରୀ ଏଇ ପ୍ରବାହ ଏକବାର ସମୁଦ୍ରେ, ହରେର ଓ ପ୍ରବହମାନ ଭୂ-ଉପରିତଳେର ପାନିର କ୍ରମାଗତ ବାଞ୍ଚିଭବନ ଏବଂ ଆର ଏକବାର ବୃଷ୍ଟିର ଓ ଜଳଶ୍ରୋତର ମାଧ୍ୟମେ ଗଠିତ ହୟ । ଭୂ-ଉପରିଭାଗ ଦିଯେ ପାନି ନଦୀ ଓ ଜଳଶ୍ରୋତର ଆକାରେ ବୟେ ଚଲେ । ବରଫ, ପାନି ଓ ବାଷ୍ପେର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଏକଟି ଅତି କୌତୁଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦ୍ଧତିତେ ପର୍ବତାଦି ଓ ନଦୀମୂଳକେ ପରମ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ କରେ । ପର୍ବତମୂଳର ମାଥାଯ ବରଫେର ମୁକୁଟେର ନ୍ୟାୟ ଗଠିତ ବରଫ ଗଲେ ଗିଯେ ନଦୀର ଓ ଜାଲେର ନ୍ୟାୟ ବିନ୍ତ୍ତୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାର ସାଥେ ମିଶେ ଯାଯ ଏବଂ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟ ହିସେବେ ନଦୀତେ ଗିଯେ ମିଶେ । ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗେ ଅବସ୍ଥିତ ସକଳ ଜଳଶ୍ରୋତର ବାଞ୍ଚିଭବନ ପାନିର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣାକେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏଡିଯେ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମେଘେର ଆକାରେ ଦେଶ ଥେକେ ଦେଶାତ୍ମରେ ନିଯେ ଯାଯ । ସେ ଜଳଶ୍ରୋତ ଥେକେ ବାଷ୍ପେର ସୃଷ୍ଟି ହେଁଛିଲ ସେଥାନ ଥେକେ ବହୁଦୂରେ ଗିଯେ ବୃଷ୍ଟିର ଆକାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠେ ପତିତ ହୟ ଏବଂ ତାରା ଘନୀଭୂତ ହୟେ ପର୍ବତେର ଶୀର୍ଷେ ଅବସ୍ଥିତ ବରଫେର ପୁନଃ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସାଧନ କରେ । ଏଭାବେ ବରଫ, ପାନି ଓ ବାଷ୍ପେର ଏବଂ ପୁନଃ ପାନି ଓ ବରଫେର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ

বিবর্তন পর্বত ও নদীর মধ্যে একটি জলচক্রের ধারার সৃষ্টি করে যা এই আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। যদি কেউ কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটি নদীর গভীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তাহলে দেখা যাবে যে এর অস্তিত্ব তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত পানির প্রাপ্যতা, ভূপৃষ্ঠে পানি নিষ্কাশনের পথ এবং ভূপৃষ্ঠের ক্রম নতিমাত্রা।

যখন থেকে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি চারদিকে ছড়িয়ে আবর্তন করতে শুরু করেছে তখন থেকেই জলপ্রবাহ ক্রমাগত মহাদেশসমূহের ক্ষয়সাধন করে চলেছে। অধিকস্তু, অতি প্রাচীনকাল থেকে নদীসমূহ বারবার উঁচু; নিচু ও ভূত্তকের অংশ বিশেষের ঢালু হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার উপলক্ষে পরিণত হয়েছে। সমুদ্রের অগ্রসরমানতা ও অপসরণতা, মহাদেশসমূহ ও মেরুদ্বয়ের অবস্থানের পরিবর্তন এবং তৎসহ গরম ও শীত এবং ডেজা ও শুকনো আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রণাধীনে তাদের থাকতে দেখা যায়।

অতীতে আমাদের প্রাচীন পূর্ব পুরুষেরা নদী-নালার প্রতি আকর্ষণবোধ করত। কারণ এ সকল জলপ্রবাহ পানোপযোগী পানি ও খাদ্য হিসাবে মাছের যোগান দিত। তাছাড়া যায়াবর জাতির একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এ সকল নদী-নালা ব্যবহৃত হ'ত। প্রাচীন মানুষ নদীর স্রোত, বন্যা, নদীর গতিপথ পরিবর্তন প্রভৃতির অনুকূল উপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া, এ সকল নদীর প্রশস্ততা, গভীরতা ও বিপুল পরিমাণ জলরাশি তাদেরকে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত এবং নদ-নদীসমূহ সব সময়ই তাদের কাছে বিপদ হিসেবে গণ্য হত। নদী যত বড় হ'ত ততই তা তাদের কাছে অন্ত ও অবোধগম্য বলে বিবেচিত হত।

প্রকৃতির সরাসরি বিরোধিতা করে মানুষ তার ক্ষমতাহীনতার অবস্থান থেকে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং এজন্য লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পিপাসা নিবৃত্ত করা, পানি সংগ্রহ ও মাছ ধরার প্রাথমিক সুবিধাদির বাইরে মানুষ ধীরে ধীরে জানতে ও শিখতে পারে এবং কালক্রমে এ সকল জল প্রবাহকে নানাবিধ ব্যবহারের জন্য কাজে লাগায়। অতি অগ্রসরমান প্রাচ্য সভ্যতার উন্নয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদ-নদীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সেচকার্যে পানির ব্যবহার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে বাঁধ নির্মাণ এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। জাহাজযোগে মালামাল পরিবহনের জন্য প্রধান প্রধান নদীপথের সঙ্কান ও উন্নয়ন, পদ্মবন্ধে চলাচলের জন্য কাঠের সেতু থেকে প্রিন্সেস্ড্য কংক্রিটের চমৎকার বাঁকানো সেতুর ব্যবহারে বিবর্তন, পানি প্রবাহ দ্বারা চালিত মিলের চাকা থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টারবাইনের ব্যবহার,

ପାରମାଣ୍ଵିକ ରିଏୟାଷ୍ଟରେ ଶୀତଳତାଦାନକାରୀ ବସ୍ତୁ ହିସାବେ ବ୍ୟାପକହାରେ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ଜନ୍ୟ ଶିଳ୍ପେ ବ୍ୟବହତ ପାନି ପ୍ରଭୃତି ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉତ୍ପାଦନମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାଥେ ନଦୀ ସିନିଷ୍ଟଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରଯେଛେ । ନଦୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିତ୍ୟକାଜେ ଏଇ କ୍ରମବର୍ଧମାନ ବ୍ୟବହାର ମାନବଜାତିର ଇତିହାସେ ସବଚେଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟେର ଅନ୍ୟତମ ଅଂଶେର ଗଠନ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନେ ନଦୀ-ପ୍ରକୌଶଳ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୁକ୍ଷିଗତ ଅଗ୍ରଗତିର ମଧ୍ୟେ ଏମନ କିଛୁମିଂଖ୍ୟକ ପ୍ରୟୁକ୍ଷି ରଯେଛେ ଯା ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ସାଧନେ ବିଶେଷଭାବେ ପ୍ରଗମନ କରା ହ୍ୟ । କଥନ୍ତି କଥନ୍ତି ପାନିର ବିରାଟାକାର ଆଧାର ନିର୍ମିତ ହ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ପାନିବିଦ୍ୟୁଃ ଉତ୍ପାଦନରେ ଜନ୍ୟ ଏରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରା ହ୍ୟ । ଆଧୁନିକ ନଦୀ ପ୍ରକୌଶଳ ବିଦ୍ୟାର ଆଦର୍ଶ ନମୂନା ହଛେ ତଥାକଥିତ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାର ମଧ୍ୟେ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସମୂହେର ଉତ୍ସବନ ଏକଟି ମାତ୍ର କମପ୍ଲେକ୍ସ୍ନେ କରା ସଭବ ହ୍ୟ । ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯୌଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଛେ ଏକଟି ବିଶାଳ ଆଧାରେ ନଦୀର ପାନି ଆଟକେ ରାଖା ଯାତେ ନୌଚଲାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ସବନ ସାଧିତ ହ୍ୟ, ଅନୁର୍ବର ଏଲାକାଯ ପାନିବିଦ୍ୟୁଃ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ କରା ଯାଯ ଏବଂ ସେଚକାର୍ଯେ ନଦୀର ପାନିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରା ସଭବପର ହ୍ୟ । ମାନବ ଜାତିର ଅସଂଖ୍ୟ ଉପକାରେର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ।

### ତିନି ସକଳ ଫସଲେର ମଧ୍ୟେ ଦୁ'ଟି ପତି-ପତ୍ରୀର ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ

ଆଯାତେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ‘ଜାଓଜାୟ ନିମନାଇନେ’ ଶବ୍ଦ ସମାଚିର ଅର୍ଥ ହଛେ ଏକଟି ଜୋଡ଼ାର ଉଭୟେଇ ଅଥବା ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଟା ଏରାପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଉତ୍କିଦାଦିର ଫଳ ଉତ୍ପାଦନରେ କ୍ଷମତା ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗେର ଅବଶ୍ତୁତିର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ । ପ୍ରକୃତିର ସବ୍ଲଙ୍ଘ ରହସ୍ୟରେ ମଧ୍ୟେ ଜୀବ ଜଗତେ ଦୁ'ଟି ଲିଙ୍ଗେର ଅବଶ୍ତୁତି ଏବଂ ଜନ୍ୟଗତଭାବେ ଏକଇରାପ ଦେହ ଗଠନେର ଅବିରାମତା ବଜାୟ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରଜନନେର ବିଷୟଟି ଆମାଦେର ଗଭୀର ଚିତ୍ତାର ଦାବୀ ରାଖେ । ଯଦିଓ କୋନ କୋନ ଉତ୍କିଦେ ପ୍ରଜନନ ବ୍ୟକ୍ତିରେକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିଯାର ମାଧ୍ୟମେ ଜୀବନେର ଅବିରାମ-ସ୍ଥାଯିତ୍ବ ଦେଓଯା ସଭବ । ଅବଶ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନ କୋଷେର ସଂମିଶ୍ରଣେ ସାଭାବିକ ପ୍ରଜନନ କାଜ ସମ୍ପନ୍ନ ହ୍ୟ ଏବଂ ଜନ୍ୟେର ଧାରା ବଜାୟ ଥାକେ । କୋନ କୋନ ଉତ୍କିଦେ ଫୁଲ ଜନ୍ୟେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଲ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିଯାର ମାଧ୍ୟମେ ଫୁଲ ଥେକେ ଫୁଲ ତୈରି ହ୍ୟ । ଫିଲିଙ୍ ଫୁଲେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରତିଟି ଫୁଲେର ପୁଂକେଶର ଓ ଗର୍ଭପତ୍ର ନାମେ ପରିଚିତ ପୁଂ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନ କୋଷ ରଯେଛେ ।

ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏକଲିଙ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଟି ଫୁଲ କେବଳମାତ୍ର ପୁଂକେଶର ଅଥବା ଗର୍ଭପତ୍ର ଧାରଣ କରେ । ପୁଂକେଶର ପରାଗ ତୈରି କରେ ଏବଂ ଗର୍ଭମୁନ୍ତ ନାମେ ଅଭିହିତ ଗର୍ଭପତ୍ରେର ଆଗା ଏହି ପରାଗ ଗ୍ରହଣ କରେ । ତାରପର ବାତାସ, କିଟପତନ୍, ପାଥି, ପାନି ପ୍ରଭୃତିର

সাহায্যে যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে পরাগ মিলন বলে। পরাগ রেণু গর্ভন্তের উপর অংকুরিত হয়ে সূচ্ছাতিসূচ্ছ নলের আকারে অবয়ব গঠন করে যা গর্ভমুক্ত ও নিচের কোষসমূহ তৈদ করে এবং পরিশেষে একপ অংকুরিত একটি পরাগ রেণু ডিস্কোষে ডিস্কের সাথে মিলিত হতে সক্ষম হয়। পরাগনলিকা শেষ পর্যন্ত দু'টি পুঁ নিউক্লিয়াস নির্গত করে যার সাথে ডিস্কের মধ্যে দু'টি স্ত্রীজনন কোষের মিলনের ফলে উত্তিদের বীজ ও ফলের সৃষ্টি হয়। এভাবে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি ফলকে গর্ভাধান করা বলে এবং একটি ফলের জন্ম বলতে উত্তিদাদির মধ্যে পুঁ ও স্ত্রী জনন কোষের পূর্ব উপস্থিতি রয়েছে বলে ধরা যায়। কিন্তু গর্ভাধান ব্যতিরেকে কোন কোন চাষকৃত উত্তিদে ফল জন্মে যেমন কলা অথবা অঙ্গবৃক্ষিকারী হরমোন প্রয়োগ করেও ফলাদি সৃষ্টি করা যায়। ফল উৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে এগুলো হচ্ছে ব্যতিক্রম। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দু'টি জননকোষ একত্রিত হয়ে ফলের জন্ম দেয় এবং এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে এ সকল ব্যতিক্রম আমাদের বোধশক্তির বাইরে।

ঘটনাক্রমে যে সকল উত্তিদে একলিঙ্গ বিশিষ্ট ফুলের (যেমন শ্রীলংকা ও ভারতে জাত তাল ও খেজুর) জন্ম হয়, সেখানে পুঁ গাছ কেবলমাত্র পরাগ সরবরাহ করে। এই পরাগ ভিন্ন গাছে অবস্থিত স্ত্রী ফুলকে ফলবতী করে এবং এর ফলে ফলের জন্ম হয়। এরপ গাছের ফল থেকে জন্ম নেওয়া আপাতদৃষ্টিতে অভিন্ন বীজের মোট সংখ্যার মধ্যে কোন কোনটি পুঁ উত্তি তৈরি করার জন্য অংকুরিত হয় এবং অন্যগুলো স্ত্রী উত্তিদের জন্ম দেয়।

যদি 'যাওজায়'নিস নাইন' শব্দ সমষ্টি দু'জোড়া অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে আয়াতটির আরেকটি বিকল্প ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে এবং তা হবে এমন একটি চমকপ্রদ বিষয় যা 'angiosperms' নামে অভিহিত অভ্যন্তর প্রকৃতির উত্তিদৰ্গকে বুঝায়। এই উত্তিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বীজ ফলের অভ্যন্তরে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। পুঁঃ ডিস্কের মধ্যে পরাগনলিকার ডগা ফেটে গিয়ে দু'টি পুঁজনন কোথ মুক্ত করে দেয়। এরমধ্যে একটি স্ত্রী ডিস্কের সাথে মিলিত হয়ে zygote (দু' জননকোষের মিলনের ফলে উৎপন্ন) তৈরি করে। অপরটি ডিস্কের মধ্যে অবস্থিত ভূগ থলির দু'টি পরম্পর বিরোধী কোষের সাথে মিলিত হয়ে triploid endosperm nucleus গঠন করে। এই zygote ভূগে পরিণত হয় এবং endosperm undeun থেকে endosperm এর উৎপত্তি হয় যা ক্রন্তের পরিপূর্ণির জন্য ভাস্তব হিসাবে বিবেচিত হয়। দু'বার একীভূতকরণ অর্থাৎ

ডিস্কের সাথে একটি পুঁ জননকোষ এবং অন্য আর একটি পুঁ জননকোষ দু'টি বিপরীতধর্মী কোষের সাথে মিলিত হলে তাকে দ্বৈত গর্ভাধান বলে এবং এটা ফলজ উত্তিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমান আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ে পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে। অতএব, প্রতিটি ফলের উৎপাদনে (যৌন মিলন ছাড়া অন্য পদ্ধতির মাধ্যমে যে সবের উৎপাদন হয় তাদের ব্যতিরেকে) পুঁ ও স্ত্রী জনন অঙ্গের দু'জোড়ার মিলনের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে।

### তিনি দিন দ্বারা রাতকে আবৃত করেন

কিভাবে পৃথিবী স্থীয় অক্ষের উপর ঘূর্ণনের ফলে দিন ও রাতের সৃষ্টি হয় তা আয়াত ৩ : ২৭ এ বর্ণিত হয়েছে। এই আবর্তনে সূর্য যখন দিগন্তের নিচে চলে যায় তখন রাতের সূচনা হয় এবং এর অঙ্ককার ক্রমান্বয়ে দিনের আলোকে গ্রাস করে। এটা এমন যেন রাতের অঙ্ককার পর্দা দিনের উজ্জ্বল মুখায়বের উপর ক্রমশ টেনে দেয়া হয়।

۲-وَفِي الْأَرْضِ قَطْعَهُ مُبَجُورَتُ رَجَنَتُ قَرْنَنْ أَعْنَابٍ وَرِزْغٍ وَخَيْلٍ صَنْوَانْ وَغَيْرُ  
صَنْوَانْ يُسْقَى بِمَاءٍ قَاحِدٍ وَنُعَصَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنْ فِي  
ذَلِكَ لَا يَبْتَلِ لَقَزْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

১৩ : ৪ পৃথিবীতে রয়েছে পরম্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড; তাতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্য ক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে, এবং ফল হিসাবে তাদের কতকক্ষে কতকের উপর আমি প্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নির্দর্শন।

### পৃথিবীতে এলাকাসমূহ পরম্পর সন্নিহিত

আরবী 'কাতঅ' 'শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'কেটে টুকরো টুকরো করা'। পৃথিবী যে tectonic plates এর বেশ কিছু সংখ্যক অংশে বিভক্ত তা আয়াত ৭ : ৯১-এ আলোচনা করা হয়েছে।

## দ্রাক্ষক্ষেত্রসমূহ সদৃশ, এবং সদৃশ নয়

আরবী ‘ছেনওয়ানুন’ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এবং এর বাগধারাগত অর্থ হচ্ছে চাচাত, খালাত, মামাত, ফুপাত ভাই বা বোন, ছেলে অথবা বৈপিত্র ভাই অর্থাৎ একই মায়ের গর্ভের এবং আক্ষরিক অর্থে এটা একই ধরনের ভাব প্রকাশ করে। এভাবে ‘গায়ের ছেনওয়ানুন’ শব্দের অর্থ পূর্বোক্তটির বিপরীত অর্থাৎ একই মায়ের গর্ভের নয়। আয়াতে উদ্ভৃত তিনটি উদাহরণের প্রত্যেকটির অধীনে উদ্ভিদের প্রতিটি প্রজাতির গঠন কাঠামোর মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রজাতি রয়েছে যা অন্য প্রজাতির অনুরূপ। কিছু অন্য আরও কিছু সংখ্যক প্রজাতি অবশিষ্টদের থেকে আলাদা।

এই পার্থক্য নিরূপণকারী কৌশল সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বোঝাপড়া থাকা আবশ্যিক এবং আয়াতে বিধৃত অর্থের মূল বৈশিষ্ট্য আমরা হস্তয়স্থ করতে পারি। ফল টক হওয়ার অর্থ এ্যাসিডের উপস্থিতি, মিষ্টার কারণ হচ্ছে ফলের কোষসমূহ চিনি দ্বারা পূর্ণ থাকে; এবং esters. নামে অভিহিত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ থেকে সৌরভের সৃষ্টি হয়। পানি ছাড়া এ্যাসিড ও এ্যালকোহলের সংমিশ্রণে ester তৈরি হয়। ফল পাকার জন্য যে রাসায়নিক পদার্থটি কাজ করে তাকে protopectin বলে। এই উপাদানটি কোষের অসংখ্য ছিদ্রহীল দেয়ালকে ধরে রেখে একত্রে মিশে গিয়ে pectin উৎপন্ন করে। আর এই pectin ফলটিকে নরম ও ময়দাতুল্য করে তোলে।<sup>১</sup> যে জৈব রসায়ন কারণসমূহ প্রতিটি প্রজাতির ফলের গুণাগুণের মূলগত পার্থক্য নিরূপণ করে তা বংশগত উপাদানের পার্থক্যের কারণে হয় এবং এই উপাদান ফলের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। জিন আচরণের চলতি তত্ত্ব অনুযায়ী এটা কোষের অস্তর্গত অসংখ্য নিউক্লিয়াসের ডিএনএ অণুর ভিত্তি সমূহের স্পষ্ট পরিণতি মাত্র। এই পরিণতিসমূহ একটি নিয়মাবলি তৈরি করতে এ্যামাইনো এসিডকে একত্রিত করে গঠিত এনজাইমকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। এই এনজাইমই দেহের একটি অঙ্গের প্রাণরসায়ন সম্পর্কিত উপাদানকে নির্ধারণ করে।<sup>২</sup> অধিকতর বৃহৎ ও বেশ জটিল কার্বোহাইড্রেট অণুর মধ্যে গুকোজ অণুকে সংশ্লেষণ করার জন্য এনজাইমের প্রয়োজন হয়। আমরা ফল ও খাদ্যশস্য থেকে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে থাকি।

আয়াতে উল্লেখিত প্রথম উদাহরণ যথা আঙুরের বাগানে যে আঙুর উৎপাদিত হয় তা *Vitis vinifera* প্রজাতির। এছাড়া আবাদকৃত কিছু সংখ্যক নতুন প্রজাতির আঙুরও দেখা যেতে পারে এবং তার প্রত্যেকটার গঠন, আকার,

ବର୍ଣ୍ଣ, ରସପୁଷ୍ଟତା, ସ୍ଵାଦ, ଗନ୍ଧ ଓ ମିଷ୍ଟତାର ଦିକ ଦିଯେ ଏକେ ଅପର ଥେକେ ଆଲାଦା । ଏ ସମ୍ମତ ଆଙ୍ଗୁରକେ ସାଧାରଣଭାବେ ଆହାରେର ଶେଷ ପଦ ହିସେବେ ଖାଓୟାର ଆଙ୍ଗୁର, ମଦ ତୈରିର ଆଙ୍ଗୁର, କିଶମିଶ, ମନାଙ୍କା ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରେଣୀତେ ବିଭକ୍ତ କରା ଯାଇ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ‘ଯାରା’ ବପନକୃତ ମାଠକେ ନିର୍ଦେଶ କରେ । ଏଇ ମାଠେ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଫସଳ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଥା ଗମ, ବାଲି, ଧାନ, ଭୁଟ୍ଟା ଜନ୍ମେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫସଲେର ଜନ୍ୟ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଓତାଯ ବହସଂଖ୍ୟକ cultivar ଥାକେ ଯା ସୁର୍ବାଦ ଓ ପୃଷ୍ଠିଗୁଣେ ଏକେ ଅପରକେ ଛାଡ଼ିଯେ ଯାଇ । ତୃତୀୟତ ଖେଜୁର ଗାହେ (ଯାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ phoenix dactylifera—ଆରବଦେଶୀୟ ଖେଜୁର ଯା ବୁନୋ ଖେଜୁର P. sylvestris ଥେକେ ଆଲାଦା) ଯେ ଫଳ ଧରେ ତା ମୃଣତା ଓ କୋମଲତାଯ, ଚିନି ଧାରଣ କ୍ଷମତାଯ, ସ୍ଥିଯ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖେର ଦାବୀ ରାଖେ । ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟେ ଫସଲେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ନାନାରକମ ଶ୍ରେଣୀ ରଯେଛେ ଯା ତାର ନିଜେର ଗୁଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏମନ କି ଯଦିଓ ସେ ସକଳ ଫସଳ ପାଶାପାଶି ଏଲାକାଯ ଏକଇ ପାନି ସେଚେର ଆଓତାଯ ଜନ୍ମେ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. Steingas, F.A Learner's Arabic-English Dictionary, Beirut, 1972.
2. Went, F. W. The Plants, Time-Life International (Netherland), pp.56-58, 1968.
3. Miller, W. B. and Leth, C. (eds) BSCG Green Version, High School Biology, Rand Mc Mally and Co. p. 666, 1967.

۷۔ اللہ یعْلُمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٍ وَمَا تَغْيِيْصُ الْأَرْجَالُ وَمَا تَزَدَّادُ  
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِسْقَدًا

১৩ : ৮ প্রতিটি গর্ভবতী নারী (তার ডিতরে) যা কিছু বহন করে চলেছে  
এবং (তার) জরায়ু (সন্তানের) যা কিছু বাঢ়ায় বা কমায় তার  
সবই আল্লাহ তা'আলা জানেন, তার কাছে প্রতিটি বস্তুরই  
একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে।

**আল্লাহ তা'আলা জানেন যা জরায়ুর অভ্যন্তরে হাস বা বৃদ্ধি পায়**

এখানে আল্লাহ ঘোষণা করছেন যে তিনি সকল লুকানো বস্তু এমন কি  
স্ত্রী-লোকের জরায়ুর মধ্যে যা রয়েছে সে সম্পর্কে জানেন। তিনি আরও ঘোষণা  
করেন যে জরায়ুর অভ্যন্তরে ভূগের বৃক্ষে কোন ঘাটতি বা বাড়ির  
ব্যাপারে তিনি সচেতন থাকেন। এ ছাড়া জরায়ুর অভ্যন্তরস্থিৎ তাঁর সৃষ্টিতে  
পরিমাপের সঠিকতা বিদ্যমান।

স্ত্রীজনন কোষের একটি পরিপক্ষ ডিশ্বাগু একটি শুক্রাগু দ্বারা নিষিক্ত হয়ে  
যখন zygote গঠন করে তখন গর্ভাধান শুরু হয়। যখন এই zygote বা সমৃদ্ধ  
ডিশ্বাগু জরায়ু মধ্যস্থ নলিকার মধ্য দিয়ে যায় তখন কোষের বিভক্তি শুরু হয় এবং  
পঞ্চম দিনে একটি blastocyst গঠিত হয়। ষষ্ঠ দিনে blastocyst জরায়ুর  
দেয়ালে (endometrium) ভূগাবস্থিত দণ্ডে গিয়ে নিজেকে স্থাপন করে। অতঃপর  
নিজের প্রবেশ ৯ম দিনে সম্পূর্ণ হয়। দু'সন্তানের মধ্যে এর আকার দাড়ায়  
দু'মিলিমিটারে এবং তখন একে ভূগ বলে। ৬ষ্ঠ সন্তান পর্যন্ত ভূগটিকে আকারগত  
দিক দিয়ে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। এরপর এটা মানব  
দেহের স্পষ্ট অবয়ব নিতে শুরু করে। আর তখন একে মানব দেহের পূর্ণ ভূগ  
নামে আখ্যায়িত করা হয়।<sup>১</sup>

সাধারণত একটি শুক্রাগু দ্বারা স্ত্রী ডিশ্ব নিষিক্ত হওয়ার সময় থেকে গর্ভধারণ  
শুরু হয় এবং প্রায় ৩৮ সন্তান পর শেষ হয়। অথবা নিষিক্ত হওয়ার ২৬৬ দিন  
পর বা প্রায় ৪০ সন্তান কিংবা শেষ রজ়স্তাবের (LMP)<sup>২</sup> ২৮০ দিন পর এর  
সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই সময় কালের হাস-বৃদ্ধিতে জটিলতার  
সৃষ্টি হয় (মানব দেহের গঠনগত ক্রটি সম্পর্কে বিজ্ঞারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট-৪  
দ্রষ্টব্য)।

### | জরায়ু মধ্যস্থিত ক্রটিসমূহ

১. Zygote এর কমপক্ষে ১৫% প্রধানত ক্রোমোজম সংক্রান্ত  
অস্বাভাবিকতার কারণে আপনা-আপনি গর্ভপাত ঘটে। প্রকৃতিগতভাবে এরপ

ଗର୍ଭପାତ ଛାଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୧୨% ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗତଭାବେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହତେ ପାରେ, ଏର ବିପରୀତେ ସ୍ଵାଭାବିକ ହାର ପ୍ରାୟ ୨-୩% ମାତ୍ର ।

**୨. ଜନ୍ମଗତ ବିକଳାଙ୍ଗତା :** ଜନ୍ମଗତ ବିକଳାଙ୍ଗତାର କାରଣେ ଶିଶୁ ଭୂମିଷ୍ଟ ହୋଯାର ସମୟ ପ୍ରାୟ ୨୦% ଶିଶୁ ମାରା ଯାଯ ।<sup>୩</sup> ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁର ୨.୭% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ହତେ ଦେଖା ଯାଯ ଏବଂ ଆରା ଓ ୩% ଶିଶୁର ଶୈଶବକାଲେ ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଯ । ଏ ସମୟ ଜନ୍ମେର ପ୍ରାୟ ଏକ ବଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତେ ଦେଖା ଯାଯ ।<sup>୪</sup>

(କ) ଜନ୍ମଗତ କାରଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଯାର ଉଦାହରଣ ହଚ୍ଛେ : ଟାର୍ନାର ସିନଟ୍ରୋମ (Turner Syndrome) କମ କ୍ରୋମଜୋମ ବିଶିଷ୍ଟ hypodiploid, ସାଧାରଣତ ୪୫ ଓ ଡାଉନ ସିନଟ୍ରୋମ (Down Syndrome) ଅତିରିକ୍ତ କ୍ରୋମଜୋମ ବିଶିଷ୍ଟ hyperdiploid, ସାଧାରଣତ ୪୭ । Mutant gene ସମୂହ ବ୍ୟାପକ ଅଙ୍ଗ ବିକୃତିର କାରଣ ଘଟାତେ ପାରେ ଯେମନ ବେଟେ ଶରୀର, ବଡ଼ ମାଥା, କୁଁଜୋ ପିଠ (thoracic kyposis), lumbar lordosis ଓ ତଳପେଟେର ଅସ୍ଵାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି (achondroplasia) ।

(ଖ) ଜରାୟର ମଧ୍ୟେ ମାନବ ଜ୍ଞାନ ଯଦିଓ ସୁରକ୍ଷିତ ତବୁଓ ବାଇରେର ଅନେକ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକେ ଯା ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଯାର ଉପଲକ୍ଷ ତୈରି କରେ । ଏଗୁଲୋକେ ଅଙ୍ଗ ବିକୃତି ବଲେ । ଏସବ ନିମିତ୍ତ ବା କାରଣ ହଚ୍ଛେ ହରମୋନ, ଉପକ୍ଷାର (ନିକୋଟିନ), ସୁରା (ଅୟାଲକୋହଲ), ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପଦାର୍ଥ (ଅନ୍ତିବାଯୋଟିକ୍-ଟେଟ୍ରାସାଇଫିନ୍ ଓ ଟ୍ରେପ୍‌ଟୋମାଇସିନ), ଘନୀଭୂତକରଣ ବିରୋଧୀ ଦ୍ରବ୍ୟ (anticoagulants-Warfarin), ମାଂସ ପେଶୀର ପ୍ରବଳ ଆକ୍ଷେପ ବିରୋଧୀ ଉପାଦାନ anticonvulsants (tridione, paradigmone), antineoplastic agents (aminoperin), corticosteroids (cortisone), କୟେକଟି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ (ମାଛେର ସାଥେ ସଂଯୋଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଛାକେର ମଧ୍ୟେ organic mercury), ସ୍ନାୟୁର ଉତ୍ୱେଜନା ପ୍ରଶମନକାରୀ ଓସୁଧ (thalidomide, lithium carbonate, diazepam), ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓସୁଧ ଯେମନ LSD (Lysergic Acid Diethylamide), ବଡ଼ମାଆୟ alicylaties, ପଟାସିଯାମ ଆଇଓଡାଇଡ, ରେଡିଓ ଅ୍ୟାକଟିଭ ଆଇଓଡାଇନ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ (Rubella Virus, Herps Simplex Virus, CMV (cytomegalovirus), Toxoplasma Gondii, Treponoma Pallum (ସିଫିଲିସ ରୋଗ ଘଟାଯି), ରଞ୍ଜିବିଜ୍ଞୁରଣ (Radiation)<sup>୧୦</sup> ର୍ୟାଡ-ଏର ଉପର ବିଜ୍ଞୁରଣ ପ୍ରକଟିତ ହୋଯା) ।

ଯେ ସକଳ ଅନୁଘଟକ ଦ୍ୱାରା ବିକଳାଙ୍ଗତା ସଂଘଟିତ ହୟ ତା ହଚ୍ଛେ- ବହିଃତ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜରାୟ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମେର ସ୍ଵାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଯା (IUGR), ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ନା ହୋଯା, microcephaly (କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରେର ମାଥା),  
www.lcsbook.info

সংযোগ স্থলের অস্বাভাবিকতা, কাঠামোগত ত্রুটি (skeletal defects), ফেটে যাওয়া তালু (cleft palate), হৃদযন্ত্র সম্পর্কিত ত্রুটি (cardiovascular defects), phocomelia (সীল মাছের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ), amelia (অঙ্গবিহীন), micromelia (ক্ষুদ্র অথবা প্রাথমিক পর্যায়ের অঙ্গ, কাটা ঠোট, চোখের ক্ষয়ক্ষুতা, hydrocephaly (বড় মাথা), microphthalmia (ক্ষুদ্র চক্ষু), চক্ষু ছানি, ঘুরোমা, অঙ্গত্ব, বধিরতা, জন্মগত হৃদরোগ, রেচনতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের অঙ্গবিকৃতি, তালুতে বড় ধরনের ফাঁক, থ্যাবড়ান নাক, Hutchinson's teeth (দাঁতের মধ্যে বড় আকারের ফাঁক, খেঁটার আকারের দাঁত, খাঁজকাটা উপরের দাঁত), শরীরের সম্মুখভাগ উঁচু হওয়া ইত্যাদি।<sup>২</sup>

(গ) প্রজননগত ও বহিঃস্থ কারণসমূহ একত্রিত হয়ে যে বিকলাঙ্গতার সৃষ্টি হয় তাকে বহু কারণ সম্মিলিত উত্তরাধিকার নামে অভিহিত করা হয়। এরপ উত্তরাধিকার প্রাণিতে বংশগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যেমন তালু ফাটাসহ বা তালু ফাটা ছাড়া বিচ্ছিন্ন ঠোট, spina bifida cystica-এর ন্যায় স্নায়ু নলে ত্রুটি (মেরুদণ্ড দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এর নিচের প্রান্তে cyst গঠন করে), anencephaly (মন্তিক্ষবিহীন), pyloric stenosis (পাকস্থলী থেকে অন্তে প্রবেশের দ্বার সংকোচন), জন্ম থেকে নিতম্বের অঙ্গ বিকৃতি ইত্যাদি।<sup>৩</sup>

(ঘ) প্রাথমিক পর্যায়ের ভূগ ও পূর্ণতাপ্রাণ্ত ভূগের গঠনে কখনও কখনও অস্বাভাবিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যথা ক্ষয়প্রাণ্ত ভূগ (ভূগের থলিতে কোন ভূগ না থাকা) বক্ষ দেয়ালের অনুপস্থিতি, এবং এমন কি শোখরোগের ফলে জ্বরের অংগগতি সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়ে শরীরে পানিপূর্ণ পুঁজকোষের সৃষ্টি হয় যা জ্বরের মারাত্মক রূপান্তর ঘটায় (chorion epithelioma)।

(ঙ) মায়ের ভয়ানক অপুষ্টি ও ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ ভূগের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করতে পারে এবং এর ফলে শিশুর ওজন কম হওয়ার আশংকা থাকে।

### জরায়ুর মধ্যস্থিত বৃদ্ধি

১. গর্ভাধানের স্থিতিকালের বৃদ্ধি হতে পারে। প্রায় ৮% থেকে ১২% ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার সময় স্বাভাবিক থেকে ২-৩ সপ্তাহ বেশী লাগতে পারে।

২. মাত্রাতিরিক্ত ওজন বিশিষ্ট শিশু। একটি নবজাত শিশুর স্বাভাবিক ওজনের মাত্রা ২৫০০ গ্রাম থেকে ৩৪০০ গ্রাম হয়ে থাকে। ডায়াবেটিকে আক্রান্ত শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী ওজনের হয়। এরপ ওজন ৪৫০০ গ্রাম পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরিশিষ্ট-৫ এ দেখা যেতে পারে।

୩. ଯମଜ ଶିଶୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ଗର୍ଭଧାନ ।

୪. ସଂୟୁକ୍ତ ଯମଜ ଶିଶୁ- ଯମଜ ଶିଶୁ ଏକେ ଅପରେର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ଥାକେ, ଯେମନ thoracopagus (ବୁକେର ସାଥେ ବୁକ ସଂୟୁକ୍ତ ଥାକେ), cephalothoracopagus (ମାଥା ଓ ବୁକେର ସାଥେ ସଂୟୁକ୍ତ), Siamese twins (ଏକତ୍ର ଜୋଡ଼ା ଯମଜ ଶିଶୁ- ଏରା ଶାରୀରିକଭାବେ ସଂୟୁକ୍ତ ଥାକଲେଓ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ) ଏବଂ ପରଜୀବୀୟ ଭୂଣ (parasitic foetus) (ଭୂଣେ ଏକାଂଶ ସ୍ଵାଭାବିକ ଶିଶୁର ସାଥେ ସଂୟୁକ୍ତ ଥାକେ) ।

୫. Polydactily- ହାତ ଓ ପାଯେର ଅତିରିକ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଆଙ୍ଗୁଳ ।

ଏତାବେ ଜରାୟୁର ମଧ୍ୟେ ଭୂଣେର ହିତିକାଳ ଓ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନୟନ ବିବେଚନା କରଲେ ବହୁ ଧରନେର ଘାଟତି ଓ ଅତି ବୃଦ୍ଧି ହତେ ଦେଖା ଯାଇ ଏବଂ ଏସବଇ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ଜାନେନ ଯଦିଓ ମାନବିକ ତ୍ରୁଟିର କାରଣେ ଅନେକ ବିକଳାଙ୍ଗତାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଜନ୍ମଗତ ଅଙ୍ଗ ବିକୃତିର ଜନ୍ମପୂର୍ବ ଆବିକ୍ଷାରେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏବଂ ଭୂଣେର ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନେର ବିଷୟେ ମାନୁଷ କୋନ ଏକଟା ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ତାଦେର କିଛୁଟା ଜାନତେ ପାରେ ଏବଂ ଏମନ କି ଗର୍ଭ ଭୂଣେର ଅବସ୍ଥାନ ଜାନାଓ ସଭବ । କିନ୍ତୁ ତିନ ମାସକାଲୀନ ଗର୍ଭବସ୍ଥାଯ ତା ଏଥନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନା ସଭବ ହୁଏନି । ତାଛାଡ଼ା ଏଟା ଜାନାର ଜନ୍ୟ ବିଶେଷ ଧରନେର ପରୀକ୍ଷା-ନୀରିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ (ଯେମନ amniocentesis, foetoscopy, ultrasonography) ଏବଂ ଏଗୁଲୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଓ ବ୍ୟାୟ ବହୁଳ । ସାଧାରଣେର ବ୍ୟବହାରେର ଜନ୍ୟ ଏ ସକଳ ପରୀକ୍ଷାର ସୁପାରିଶ କରା ହୁଏ ନା ।

### ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲାର କାହେ ସବକିଛୁଇ ପରିମିତ

ଭୂଣେର ମାଥା, ବୁକ ଓ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟେକେର ଆକାର ସବକିଛୁଇ ବେଁଚେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ଆନୁପାତିକ ଓ ଉପଯୋଗୀ । ଏକଟି ବଡ଼ ମାଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁର ଜନ୍ମପଥ ଦିଯେ ଭୂମିଷ୍ଟ ହେଉଯା କଠିନ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାରେର ଶରୀର ଓ ଦୀର୍ଘ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କୋନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ବ୍ୟତିରେକେ ଜରାୟୁତେ ଧାରଣ କରା ସଭବ ନାହିଁ । ଏକମେ ଜରାୟୁତେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ସବକିଛୁଇ ସଠିକ ପରିମାପେର ଯା ମାନବ ଶରୀର ଗଠନେର ଜନ୍ୟ ସ୍ଵାଭାବିକ ମାତ୍ରା ।

(୧) ମସଗ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିତେ ଅନୁପାତେର ବିଷୟାଟି ଦୁ'ଧରନେର : ଏକଟି ପଦ୍ଧତିର ଅନୁପାତ ତାର ନିଜବ୍ୟ ପରିବେଶେ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କଯୁକ୍ତ; ଓ

(୨) ଏକଟି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିର ମଧ୍ୟେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବା ଉପାଦାନେର ଅନୁପାତ । ଏଥାନେ ଅନୁପାତେର ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଷୟାଟି ଅଧିକତର ପ୍ରାସାରିକ । ଏଟା ଅନୁଧାବନ କରା ଦ୍ରୁତବିକିଇ ଚିନ୍ତାକର୍ଷକ ଯେ ମାନବ ଶରୀରେର ଗଠନମୂଳକ ସ୍ଵ ସ୍ଵ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାଦେର

প্রাসঙ্গিক অবস্থান, আকার, গুণগত উন্নতি, কর্মকাণ্ড ও পারম্পরিক সম্বয়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত মেনে চলে। উদাহরণ হরুপ মানব শরীরের কিছু সংখ্যক শারীরস্থানিক অবস্থানের জ্যামিতিক পৃথকীকরণ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্থিরীকৃত একটি প্যাটার্ন অনুসরণ করে চলে এবং Fibonacci সংখ্যা ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ..... তে এটা আবিস্তৃত হয়েছে। ৬ বস্তুর অনুপাত ও পরিমাপের প্রশংস্তি পরিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের ২৫ : ২ আয়াতে এ বিষয়টির উপর কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

### তথ্যসূত্র :

1. Thomson, W.A.R. Black's Medical Dictionary, 33rd. edn. Adam & Charles Black, London, p 370, 1981.
2. Moore, K. and Azindani, A. M.A. The Developing Human with Islamic additions, 3rd. edn. Daral-Qibla for Islamic Literature, Saudi Arabia, p 94, 1988.
3. Mac Vicar, J. : Antenatal detection of foetal abnormality : Physical Methods, Brit. M. J, 32 : 4, 1976.
4. McKeown, T. : Human Malformations, Introductins, Brit. M. J., 32 : 1, 1976.
5. Thomson, J. S. and Thomson, M.W, : Genetics in Medicine, 3rd. edn. W. B. Saunders Co. Philadelphia, pp 344-347, 1980.
6. Huntley, H. E. The Divine Proportion, Dover Publication, Inc. N.Y, 1970.

## ○ هُوَ الَّذِي يُرِنُكُمُ الْبَزَقَ خَوْفًا وَ طَعَمًا وَ يُنْشِئُ التَّحَمَّابَ التَّعَالَ ○

১৩ : ১২ তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে  
এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ;

বজ্র : ২ : ১৯নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বজ্র হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে  
একটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক প্রবাহের নির্গমন। মেঘে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি হয়ে মেঘের  
জলকণাতে জমা হতে থাকে এবং শেষে ধনাত্মক ও ঝগাত্মক বিদ্যুৎ প্রবাহ পৃথক  
হয়ে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহী মেঘপুঁজি তৈরি করে। মেঘে গড়ে তোলা একপ  
বিদ্যুৎ শক্তি এত বড় হয়ে উঠে যে মধ্যবর্তী বায়ু তাদেরকে আর পৃথক করতে  
পারে না। তখন একটি মন্ত্র বড় স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎবাহী মেঘের ধনাত্মক ও ঝগাত্মক  
এলাকা দিয়ে চলে যায়। এই স্ফুলিঙ্গ সম্পূর্ণভাবে একটি মেঘের অভ্যন্তরে ঘটতে  
পারে, অথবা একটি মেঘ থেকে আরেকটি মেঘে লাফিয়ে যেতে পারে, কিংবা  
মেঘ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে। এ সকল স্ফুলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে  
এরা তীব্র আলোর ঝলকানি ও প্রচন্ড শব্দের সৃষ্টি করে এবং একেই আমরা  
বজ্রধনি নামে অভিহিত করি। বজ্রের বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত এবং দ্রুত  
চারদিকে বিস্তার লাভ করে এর পরিপার্শকে উত্তপ্ত করে তোলে। বাতাসের এই  
হঠাতে ব্যাপ্তি শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে একটি বিরাট বিস্ফোরণকারী শব্দের জন্য দেয়  
যা আমরা বজ্রের গর্জন হিসেবে শুনতে পাই।

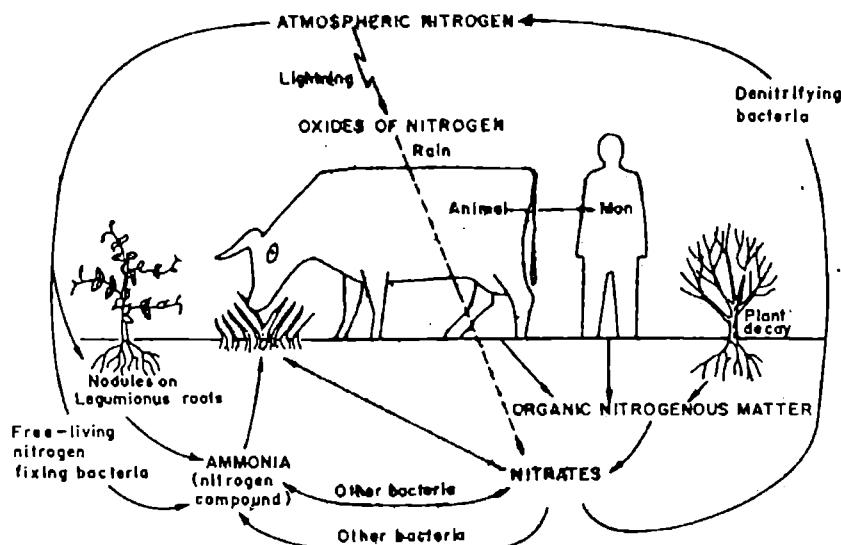
বজ্রভূতি : স্থরণাত্মিকাল থেকে মানুষ বজ্র বিদ্যুৎকে ভীষণ ভীতির সাথে  
দেখে আসছে। এর তীব্র আলোর ঝলক ভীতিকরভাবে চোখ ঝলসে দেয় এবং  
আলোর ছ্বটা এতই তীব্র যে চোখের শৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে অক্ষ করে দেয়  
(আয়াত ২ : ১৯, ২০)।

অধিকস্তু, মেঘ ও পৃথিবীপৃষ্ঠের মধ্যে সংঘটিত বজ্র জীবনহানির কারণ ঘটায়  
এবং মৃত্যু হয় তাৎক্ষণিক। এতে সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। কারণ,  
বজ্রপাতের স্তুলে প্রচণ্ড তাপের জন্য চার পাশের সব কিছু পুড়ে যায়।

**বজ্র বিদ্যুৎ আশার স্তুল হিসেবেও গণ্য হয়**

১৯শ' শতকের শেষার্দের পূর্ব পর্যন্ত বজ্র বিদ্যুতের অতি উপকারী ফলাফল  
সম্পর্কে জানা ছিল না। বিজ্ঞানীবর্গ আবিষ্কার করেন যে, বজ্র বিদ্যুৎ বাতাসে  
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে পরম্পর একত্রিত করে এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড  
গঠন করে। মাটিতে পড়া বৃষ্টির ফোটা এই অক্সাইড বহন করে নিয়ে আসে এবং  
দ্রব্যভূত নাইট্রোজেন কমপাউন্ডের আকারে গাছপালার জন্য নাইট্রোজেন সরবরাহ  
করে। এই নাইট্রোজেন উত্তিদের বৃক্ষ ও পুষ্টির জন্য দরকারী। প্রফেসর জে এইচ

উড-এর<sup>১</sup> মতানুসারে 'বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড়ের সময় গঠিত নাইট্রোজেন অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে গিয়ে নাইট্রিক অ্যাসিডের খুবই তরল একটি দ্রবণ তৈরি করে। এভাবে বাতাসের এক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অকার্যকর নাইট্রোজেনের উপাদান নাইট্রোজেন কমপাউন্ডে রূপান্তরিত হয় এবং উদ্ধিদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য মাটিতে সঞ্চিত থাকে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে একটি অঞ্চলে পরিমিত বৃষ্টিপাত হলে সেখানে প্রতিবছর প্রতি একরে ৫-৭ পাউন্ড নাইট্রোজেন নাইট্রিক অ্যাসিড হিসাবে জমা হয়। নিচের নকশায় (চিত্র-৬) নাইট্রোজেন চক্রের একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যাবেঃ'



চিত্র- ৬ : নাইট্রোজেন চক্র

এভাবে দেখা যায় যে বজ্র বিদ্যুতের এরপ উপকারী অবদান ব্যতীত নাইট্রোজেন চক্রের এই অন্যতম উৎস বজায় রাখা সম্ভবপর হ'ত না এবং পরিণামে উদ্ধিদ জগত ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ভৌতিক বজ্র-বিদ্যুৎ সূক্ষ্ম উপকারক হিসাবে উদ্ভৃত হয় এবং তা আল্লাহর মহান করুণা ভিন্ন আর কিছু নয়।

আকাশে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘের গঠনঃ এ বিষয়টি ২ঃ ১০নং আয়াতে সর্বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

1. Wood, J. H. General College Chemistry, Terresy, p. 377.
2. The Reader's Digest Great Encyclopaedia Dictionary, p. 1460, 1966.

١٤- وَلَيَسْجُنُ الرَّعْلُ بِحَمْبَىٰ ۖ وَالْكَوْكَةُ مِنْ خِنْفَتَهُ ۖ وَيُرِسِّلُ الضَّاعِقَ  
فِي صَيْنِبٍ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي النَّوْءِ هُوَ شَدِيدُ الْبَحَالِ ۝

১৩ : ১৩ বজ্জনিয়োষ ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্জপাত করেন। এবং যাতে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন; তবুও তারা আল্লাহ সম্বক্ষে বিতর্ক করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।

**বজ্জপাত আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে**

বজ্জপাতের গঠন সম্পর্কে ২ : ১৯নং আয়াতে ব্যাখ্যাদান করা হয়েছে। বজ্জ সৃষ্টিতে তিনটি বিষয় নির্ণয়যোগ্য : (১) মেঘ থেকে ভারী বিদ্যুতের সঞ্চারণ, (২) প্রচন্ড উত্তাপের সৃষ্টি, ও (৩) আলোর চোখ ধাঁধানো বালকানি। বজ্জপাত নামে অভিহিত প্রচন্ড শব্দ বাতাসের হঠাৎ সম্প্রসারণ এবং এর পরপরই প্রবল সংকোচনের ফলে সৃষ্টি হয়। এর প্রত্যেকটি বিষয় যেন এক একটি ভীতি উৎপাদনকারী বিশ্বয়। তৈরি আলোর বালকানি থেকে বজ্জের গর্জন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা'র ইচ্ছানুযায়ী নানাপ্রকার ফলাফল সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের কঠোর আজ্ঞানুবর্তিতায় এসব ঘটে। এর বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় অচিত্যনীয়।

এভাবে আমরা বলতে পারি যে বজ্জপাত আল্লাহকে মহিমাবিত করে এবং সর্বক্ষণ ও সর্বত্র তাঁর সুমহান সত্ত্বার সার্বভৌম ক্ষমতা ও মহাত্ম ঘোষণা করে। এই সূরার ১২ নং ও ১৩ নং আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে বারকুন (বজ্জ বিদ্যুৎ) ও রূভাদুন (বজ্জপাত) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। বাস্তবিকই আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে বজ্জ বিদ্যুতের সাথে ক্ষতিকর প্রভাব জড়িত, কিন্তু বজ্জপাতের সাথে নয়। কারণ, বজ্জের প্রচন্ড শব্দ তায়ের সৃষ্টি করলেও সাধারণত মারাত্মক দুর্দশার কারণ হয় না। অধিকস্তু বজ্জ বিদ্যুতের তৈরি বালকানি ও বিদ্যুৎ এত প্রচন্ড গতিতে সঞ্চারিত হয় যে তা প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করে, পক্ষান্তরে বজ্জের গর্জন ধরনি বাতাসে কেবল মাত্র প্রতি সেকেন্ডে ১১৯০ ফুট পর্যন্ত যেতে পারে।

١٥- وَلَيَسْجُدُ مَنْ فِي الْكَمُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ۖ وَظِلْلَاهُمْ  
بِالْغَدْرِ وَالْأَصَالِ ۝

১৩ : ১৫ আল্লাহর প্রতি সিজদাহ অবনত হয় ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়  
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং তাদের  
ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়।

‘অবনত’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মাটির উপর উপড় হয়ে থাকা এবং তা  
আনুগত্যের নির্দেশ হিসেবে করা হয়। এর অতিন্দ্রীয়বাদী ব্যাখ্যা আমাদের  
আলোচনার এখতিয়ার বহির্ভূত। সিজদাবনত হওয়া স্মষ্টির প্রতি আনুগত্যের  
তাৎপর্য তুলে ধরে এবং তা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক সবই আল্লাহ নির্ধারিত  
বিধানাবলি অনুসারেই হতে হবে। অতঃপর, বস্তুজগত ও প্রাণীজগত উভয়ের জন্য  
এই বিষয়টি সবিস্তারে ৭ : ৫৪নং আয়াত ও পরিশিষ্ট-৪ এ আলোচিত হয়েছে।  
ছায়া তৈরি হয় যখন আলো অঙ্গু বস্তুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না।  
ছায়ার দু’টি অংশ- প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া। প্রচ্ছায়া হচ্ছে প্রধান স্পষ্ট অংশ, আর  
বাইরের অঙ্গু অংশটিকে উপচ্ছায়া বলে। ছায়ার গঠন আলোর রৈখিক বিস্তারকে  
প্রতিপাদন করে। সকালে ও সন্ধ্যায় কোন বস্তুর ছায়া সবচেয়ে দীর্ঘ হয় এবং স্মষ্টা  
কর্তৃক নির্ধারিত ভৌত বিধান মেনেই এটা সম্ভবপর হয়।

فَلْ مَنْ زَرَبِ الْأَمْوَاتِ وَالْأَرْضِنَ قُلْ اللَّهُ ۝ قُلْ أَفَاخْتَدِنَكُمْ مِنْ دُفْنَةِ أَوْلَادِكُمْ  
لَا يَنْلَوْنَ لَدَنْقُرِمْ نَفَّعًا وَلَا ضَرًا ۝ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَنْعَمُ وَالْبَصِيرُ ۝  
أَمْ هَلْ يَسْتَوِي الظَّلَمُ وَالنُّورُ ۝ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرْكًا ۝ خَلَقُوا كَلْبَلَهُ  
فَتَكَابِةُ الْحَلْقِ عَلَيْهِمْ ۝ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۝ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْغَفَّارُ ۝

১৩ : ১৬ বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?’ বল, ‘তিনি  
আল্লাহ।’ বল, ‘তবে কী তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ  
আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি  
সাধনে সক্ষম নয়?’ বল, অঙ্গ ও চক্ষুঘান কি সমান অথবা  
অঙ্গকার ও আলো কি এক?’ তবে কী তারা আল্লাহর এমন  
শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে  
কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভাস্তি ঘটিয়েছে! বল, আল্লাহ সকল  
বস্তুর স্মষ্টি; তিনি এক, পরাক্রমশালী।

## আল্লাহর প্রভু ও সংরক্ষণকারী

এই নিখিল বিশ্বে দু'টি বিষয় রয়েছে যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এর প্রথমটি আল্লাহর বিশ্বাধিপতিত্ব এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সংরক্ষক হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। এ বিষয়টি আয়াত ১৪২ এ কিছুটা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হচ্ছে আল্লাহর শরীককারীদের এরূপ দায়িত্ব অর্পণ করা যে আল্লাহর সৃষ্টি সমতুল্য কোন কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা তাদের রয়েছে এবং স্বয়ং আল্লাহই সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। মানুষের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক অবদানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে মানুষের জীবনের ভিত্তি হিসেবে অণু সম্পর্কিত ধারণার এক বৈপ্লাবিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জীবনের বংশগতির পরিকল্পনা হিসাবে ডিএনএ (DNA) অণু (Deoxyribonucleic acid) ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। বার্তাবাহী RNA (Ribonucleic acid)-এর ব্যবহারও প্রায় বিশটি এ্যামাইনো এ্যাসিডের মধ্য থেকে বিভিন্ন প্রোটিনের সমন্বয়ের জন্য RNA হস্তান্তরের বিষয়টিও জানা গিয়েছে। যদিও মানুষ জীবনের এ সকল অণুর কিছু সংখ্যককে সমন্বয়ের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করছে, কিন্তু একটি কোষের সৃষ্টি যা জীবনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত তা এখনও বহু দূরের বিষয়। এমন কি যদিও আমরা জানতে পারি কীভাবে একটি কোষের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলো গঠিত হয় তবুও এ সকল উপাদানের একত্র সন্নিবেশ জীবন গঠন করতে পারবে না। এ সকল কোষের বিষয় মেনে নিয়েও মানুষ একটি কোষের বেড়ে ওঠার সঠিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়েছে। যদিও টেস্ট টিউব গাছ (চিস্যু কালচার) ও টেস্ট টিউব শিশু হাল আমলে জীবতাত্ত্বিক গবেষণার সম্মুখভাগে খুবই ধোপদূরস্ত পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে তবুও মানুষের এ সকল সাফল্য নতুন কোন সৃষ্টি নয় এবং আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টির সাথে তুলনীয় হতে পারে না। আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা মানুষ জীবন ও পরিবেশ সৃষ্টির অনেক গুণ রহস্য হয়ত জানতে পারে, কিন্তু তাকে কখনও জীবন ও বস্তু সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এক মুহূর্তের জন্য হলেও আল্লাহর অংশীদার হিসেবে গণ্য করা যাবে না। মানুষ ক্ষুদ্রের এই জগতে অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, যেমন যৌগিক পদার্থ, উপাদান, অণু, পরমাণু, নিউক্লিয়াস (প্রাণকেন্দ্র), ইলেক্ট্রন, প্রটোন, নিউট্রন, কোয়ার্ক (quark) ইত্যাদি। মানুষ যত গভীরভাবে বস্তুর প্রাণ নিয়ে গবেষণা করছে ততবেশী আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে যে প্রকৃত বাস্তবতা অনেক বেশী সূক্ষ্ম এবং তা মানুষের জানার বাইরে। মানুষ অনেক কিছুই জানতে পেরেছে শুধু এটা বোঝার জন্য যে সে যা জেনেছে তা যা এখনও জানতে পারেনি তার ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। এ যাবৎ

যত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে মানুষ তা নিয়ে মাইক্রোচিপস থেকে আরম্ভ করে মহাকাশযান পর্যন্ত সব বিস্তারকর সরঞ্জামাদি তৈরি করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষের ভূমিকা কথনও আল্লাহর অংশীদার হিসেবে দেখা যাবে না। আল্লাহর সৃষ্টির পিছনের এই জ্ঞান অফুরন্ত এবং মানুষ তার সীমিত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাদিতে অনুসৃত প্রণালীসমূহ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের অংশ বিশেষে সীমিত আকারে প্রবেশ করতে পারে মাত্র। যেহেতু মানুষ মুষ্টিমেয় সংখ্যক বস্তু সৃষ্টি করতে পারে এ জন্য তাকে আল্লাহর অংশীদার হিসেবে গণ্য করার প্রশ্নটি একেবারে অবাস্তব। আল্লাহ্ হচ্ছেন সার্বভৌম স্বষ্টা।

۴۷-أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَذْيَهُ بِقَدْرِ هَا فَأَخْتَلَ السَّيْلُ رَبَدًا إِلَيْهَا  
وَمَنَّا يُؤْكِلُونَ عَلَيْهِ فِي التَّارِبَةِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ رَبَدَ قِشْلَةً كَذَلِكَ يَضْرِبُ  
اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَإِذْ هُبْ جُفَاءً وَمَنْ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمِنْكُمْ  
فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْنَالُ

১৩ : ১৭ তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরের আবর্জনা বহন করে, এরপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে আগনে উন্নত করা হয়। এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপর্যুক্ত উপর্যুক্ত দিয়ে থাকেন।

## বৃষ্টিবিন্দুর বর্ষণ

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টি ২ : ২২ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

## পানির প্রবাহ

যখন দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, তখন বৃষ্টির পানি নালা, ডোবা, পুকুর, খাল, বিল, নদী, হৃদ ও ভৃপৃষ্ঠের অন্যান্য নিচু জায়গা ভরে গিয়ে উপচিয়ে পড়ে। এ সকল জায়গা তাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পানি প্রহণ করে। পানির পরিমাণ নির্ভর করে জলাধারের আয়তনের উপর এবং এ সকল জলাধারের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহের গতির উপর পানির নিঃসরণ নির্ভর করে।

ଏକପ ବନ୍ୟ ପରିଷ୍ଠିତିତେ ଆରେକଟି ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀୟ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅବଶ୍ଵ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବଳ ପାନି ପ୍ରବାହେର କାରଣେ ଫେନାର ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ଏଇ ନିତାନ୍ତରେ ଅନୁଲୋଦ୍ୟୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାନି ଥେକେ ଓଜନେ ହାଲକା ଏବଂ ପାନିର ଉପର ଭେଦେ ଥେକେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରୋତେର ତୋଡ଼େ ବେରିଯେ ଯାଯ । ଆର ଏର ନିଚେ ଥାକେ ପରିଷାର ପାନି ଯା ଉପରେର ମୟଲା-ଆବର୍ଜନା ଥେକେ ମୁକ୍ତ ଥାକେ । ଏଇ ଆଯାତେ ଆଲ୍ଲାହର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁକଷ୍ପାକେ ବୃଦ୍ଧିର ସାଥେ ତୁଳନା କରା ହେଁଛେ । ଆଲ୍ଲାହର ଏଇ ରହମତ ଅବିରାମଭାବେ ସକଳେର ଉପର ବର୍ଷିତ ହେଁଛେ । କିନ୍ତୁ ଏର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୟ । ଆଲ୍ଲାହର ରହମତେର ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରବେ ରହମତ ପ୍ରହଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତାର ଉପର । ରହମତେର ଏହି ପ୍ଲାବନ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୟଲା ଆବର୍ଜନାକେ ଭାସିଯେ ନିଯେ ଯାଯ । ଅହଙ୍କାର ଓ ମିଥାର ଫେନା ଯତଇ ଉପରେ ଉପରେ ବଡ଼ କରେ ଦେଖା ଯାକ ନା କେନ, ତା ଅତି ଦ୍ରୁତ ଶୂନ୍ୟେ ମିଲିଯେ ଯାଯ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଟିକେ ଥାକେ ।

### ଆକରିକ ଖନିଜ ପଦାର୍ଥ ଥେକେ ଲୋହା, ସୋନା ଓ ରୂପାର ନିଷ୍କାଶନ

ଏଇ ଆଯାତେ ତୈଜସପତ୍ର ତୈରିର ଜନ୍ୟ ଯେ ଧାତୁ ଯେମନ ଲୋହା ବ୍ୟବହତ ହୟ ମେ ପ୍ରସଂଗେ ଗାଁଜଲାର ରୂପକଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଁଛେ ଏବଂ ତେମନି ଅଲଂକାରାଦି ତୈରିତେ ଯେ ଧାତୁର ଯେମନ ସୋନା ବ୍ୟବହାର ହୟ ତାର କଥା ବଲା ହେଁଛେ । ଏ ସକଳ ଧାତୁର ଆକରିକ ଖନି ନାନାବିଧ ଧାତୁର ସଂଘିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକେ । ଏଇ ମିଶ୍ରିତ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଥେକେ ଅପ୍ରୋଜନୀୟ ଅଂଶ ଆଲାଦା ସରିଯେ ଫେଲିତେ ହୟ । ତାରପର ଏକେ ପ୍ରୋଜନୀୟ ପରିମାଣ ଉତ୍ତାପ ଦିଯେ ଗଲିଯେ ଫେଲେ ଏର ମୟଲା ଆବର୍ଜନା ଗାଁଜଲା ହିସେବେ ଉପରେ ଭେଦେ ଉଠେ ।

ଆକରିକ ଥେକେ ଲୋହା ନିଷ୍କାଶନେ<sup>1</sup> ଜନ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆକରିକକେ ପାନି ଦିଯେ ଧୁଯେ ପରିଷାର କରେ ନିତେ ଥିବେ ଏବଂ ତାରପର ଏର ସାଥେ କୋକ କଯଲା ଓ ଚନ୍ଦାପାଥର ମିଶାତେ ହବେ । ଏଇ ମିଶନକେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗଲାନର ଚଲ୍ଲିତେ (blast furnace)  $1500^{\circ}$  ଡିଗ୍ରୀ ସେନ୍ଟିଟ୍ରେଡେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରା ହବେ । ଏଇ ତାପେ ଲୋହା ଗଲେ ଯାବେ ଏବଂ ଧାତୁମଲ ନାମେ ଅଭିହିତ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥସମୂହ (କ୍ୟାଲସିଯାମ ସିଲିକେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧାତବ ପଦାର୍ଥ) ଓଜନେ ହାଲକା ହେଁଯାର କାରଣେ ଗଲେ ଯାଓଯା ଲୋହାର ତରଲେର ଉପର ଭେଦେ ଉଠେ । ଧାତୁମଲ ତଥନ ଉଠିଯେ ଫେଲା ହୟ ଏବଂ ଏଭାବେ ଲୋହା ବିଶ୍ଵନ୍ତ କରେ ତୈଜସପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଜନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତୈରିତେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୟ ।

ସୋନା ନିଷ୍କାଶନେର ବେଳାୟ ୨ ସୋନାର ଆକରିକ (gold telluride) ସୋଡ଼ିଆମ ସାଯାନାଇଡ୍ରେ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରୁବଗେର ସାଥେ ମିଶାନ ହୟ ଏବଂ ଏଇ ମିଶନ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଘନ୍ତା

যাবৎ ক্রমাগত আন্দোলন ও বায়ুপূর্ণকরণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এভাবে গলিত অবস্থায় গোল্ড সায়ানাইড (gold cyanide) গঠিত হয় এবং তারপর পরিশৃঙ্খতকরণ বা একপাত্র থেকে আরেক পাত্রে ঢেলে ঢেলে আকরিকের নিকৃষ্ট অংশ পৃথক করে উঠিয়ে ফেলা হয়। তারপর এটা একটি শূন্য প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে বায়ুশূন্য করা হয়। সোনাকে তখন দস্তার চূর্ণ সহযোগে থিতান হয়, আর এই থিতানে দ্রব্যাদির মধ্যে সোনা ও কিছু পরিমাণ রূপা থাকে। এরপর যে দস্তা থেকে যায় তা সরিয়ে ফেলার জন্য দস্তাকে গলান হয়। ফলস্বরূপ সোনা-রূপা মিশ্রিত যে সংকর ধাতু (সাধারণত ৭০-৯০% সোনা-রূপা থাকে) পাওয়া যায় তা নাইট্রিক এ্যাসিড বা উত্তপ্ত ও গাঢ় সালফিউরিক এ্যাসিড দিয়ে পরিশোধন করা হয়। সালফিউরিক এ্যাসিড রূপাকে দ্রবীভূত করে, কিন্তু সোনাকে গলাতে পারে না (এই তরল পদার্থ হালকা হওয়ায় উপরে ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং নিষ্কাশিত হয়ে যায়), অথবা গলিত ধাতুতে ক্লোরিন মিশ্রিত করে রূপাতে রূপান্তরিত করা এবং তারপর সিলভার ক্লোরাইড তৈরি হয় যা বর্জ্য হিসেবে সরিয়ে ফেলা হয়।

#### তথ্যসূত্র :

1. World Book of Encyclopaedia, Vol. 6, England, pp. 555-570, 1966.
2. McGraw Hill, Encyclopaedia of Science and Technology, Vol. 6, p.260, 1971.

۱۹- ﴿اَلْفَرَّارَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ  
ذَيْنَاتٍ مُخْلِقٍ جَدِيدٍ﴾

১৪ : ১৯ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথা নিয়মে সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন,

### সত্যের উপর জগত সৃষ্টি

এই বিশ্বজগত সুস্পষ্টভাবে সত্য বলে ঘোষণা করে যে আল্লাহ তা'আলা নির্ভুলতার সাথে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমরা এই সত্যকে সকল সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

এটা উল্লেখ করা বেশ চমকপ্রদ যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সত্যকে খুঁজে বের করা যে জন্য পবিত্র কুরআনে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টতই 'তাফাক্কুর' অর্থাৎ প্রকৃতির বিধানাবলি নিয়ে গভীর চিন্তা ও তাদের উন্মোচন প্রত্যেক মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। বিজ্ঞানের ইতিহাস এই সত্য প্রতিপাদন করে যে মানুষ যখন প্রকৃতির গোপন রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছে তখন জীবন্ত ও জড় পদার্থের নিয়ন্ত্রণকারী বিধানসমূহ অবলোকন করে সে চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়েছে। এই বিধানাবলি সত্যের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয় যা আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। এই সত্যের অর্থ হতে পারে পদার্থের সকল বৈশিষ্ট্য যথা গঠন, আকার, অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামো, রঙ, বস্তু বিশেষের গন্ধ ও অন্যের সাথে এর মিথ্যের প্রভৃতি প্রকাশ করে দেওয়া। এর আরও অর্থ হতে পারে যে বস্তুর গঠনে নিয়ম যে কাজ করে অথবা বস্তুর অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অনুপাত কিংবা প্রকৃতির বাস্তববিদ্যার প্রেক্ষাপটে একটি বস্তুর সাথে অন্য আরেকটি বস্তুর অনুপাত সম্পর্কে মানুষ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যের কিছুটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। যত বেশী সত্যের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে ততবেশী সে স্মষ্টার ও তাঁর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলতার শক্তি ও সহনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে। অপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এই যে প্রকৃতিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভবপর হয়। তাই আল্লাহু শুধুমাত্র জড় পদার্থ বা জীবন্ত প্রাণী তাঁর সত্যের আওতায় সৃষ্টি করেননি এবং যে সত্য তাদের বিন্যাসের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত, তিনি এই সত্যকে মানবজাতির কল্যাণ ও সুবিধা প্রদানের জন্যও দান

করেছেন। অতএব, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে মানুষ আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে তাঁর সৃষ্টির সত্যানুসন্ধানে নিজেকে পরমানন্দে ব্যাপ্ত রাখবে।

۲۲-أَللهُ الَّذِي خَلَقَ النَّمَوْتَ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ النَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ

الْمَرْأَتِ رِثْقًا لِكُنْزٍ وَسَخْرَةً لِكُمْ الْفُلْكَ لِتَعْبُرَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

وَسَخْرَةً لَكُمُ الْأَنْفَرَ

১৪ : ৩২ তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদী সমূহকে।

### আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আয়াত ২ : ১৬৪ ও পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

### আকাশ থেকে বৃষ্টির বর্ষণ

কীভাবে বৃষ্টিবাহিত মেঘদল (cumulo-nimbus clouds) আকাশে গঠিত হয়, বর্ষণের আকারে কীভাবে বৃষ্টির ফোটা পৃথিবীতে নেমে আসে, কীভাবে বৃষ্টির পানি মৃত পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার করে উষ্ণ ভূমিকে উর্বর করে তোলে এবং পৃথিবীতে উদ্ভিদ জীবনকে কীভাবে বাঁচিয়ে রেখে বিভিন্ন প্রকার ফসল ও ফলাদি উৎপন্ন করে তা সবই ২ : ২২ ও ২ : ১৬৪নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

### খাদ্য হিসাবে ফলের উৎপাদন

উদ্ভিদ কোষের কার্যক্রমে পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা পরিণামে ফল উৎপাদনের কাজে লাগে, তা ২ : ২২ নং আয়াতে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

### মানুষের কল্যাণে নদীর ব্যবহার ও জাহাজের জলপথে পরিক্রমণ

আয়াতের এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে জাহাজ তৈরি করিয়েছেন এবং তিনি নদীসমূহকে মানুষের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আয়াত ২ : ১৬৪-এর প্রসংগে সমুদ্র ও নদীতে জাহাজ ও নৌকা চলাচলের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠে সৃষ্টি বিভিন্ন গিরিখাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্বাভাবিক জলপ্রবাহ হচ্ছে নদী এবং নদীসমূহ নিজেরাই তাদের চলার পথ তৈরি করে নিয়েছে। নদী তার বিভিন্ন শাখানদী, উপনদী এবং পানি ধারণক্ষম এলাকা বা অববাহিকার মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে। ফলস্বরূপ এই দাঢ়ায় যে বৃষ্টি ও বরফ থেকে পানি নদী, গিরিখাত ও অববাহিকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিচের দিকে নেমে যায়। উচু ভূমি থেকে নিচু ভূমির দিকে পানি প্রবাহের এই চলার পথে খাতগুলো পানিপূর্ণ হয়ে নিচে প্রবল স্নোতের সৃষ্টি করে এবং ক্রমানয়ে বড় আকার ধারণ করে। তারপর এই প্রবাহিত পানির ধারা নিজেই নিজের পথ তৈরি করে নিয়ে একটি সমন্বিত পানির নেট-ওয়ার্ক সৃষ্টি করে। যদি কোন বৃষ্টি বা বরফ না থাকত, অথবা ভূপৃষ্ঠ যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের এক সমতলে অবস্থিত হত কিংবা তাপমাত্রা যদি হিমাংকের নিচে নেমে যেত তাহলে নদীর কোন অস্তিত্ব থাকত না।

একটি নদী যে পরিমাণ পানি ধারণ করে তা নির্ভর করে কী পরিমাণ বৃষ্টি এর অববাহিকায় বর্ষিত হয়ে জলস্নোত তৈরি করছে তার উপর। গড়ে মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় এক-পঞ্চাংশ মাত্র প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট পানি বাঞ্পীভবন ও উঙ্গিদারির মাধ্যমে বাঞ্পাকারে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রবাহিত পানির পরিমাণ ও দ্রুততার সাথে নিঃসরণ ভূ-সংস্থান ও ভূপৃষ্ঠের উচু নিচু অবস্থার দ্বারা খুব বেশী প্রভাবান্বিত হয়। প্রচন্ডবেগে পানি নিচে নেমে যাওয়ার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে খাড়া ঢল ও অপ্রবেশ্য ভূখণ্ড পানির দ্রুত নিঃসরণকে সহযোগিতা করে এবং জলস্নোতের ধারা ঐ সকল এলাকায় দ্রুততার সাথে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। প্রবেশযোগ্য ভূখণ্ডে পানির প্রচন্ড প্রবাহ মাটিতে শোষিত হওয়ার ফলে বাঞ্পীভবনে পানির হ্রাস হয়ে যাওয়া করে যায়। অবশেষে ভূগর্ভস্থ পানি বিভিন্ন বর্ণার মাধ্যমে নদীর স্নোতের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

একটি নদীর পানির মোট নির্গমন হচ্ছে কোন জলপথের আড়াআড়িভাবে ছেদনকৃত আরেকটি জলপথ থেকে প্রবাহিত পানির মোট পরিমাণের সমান। অতি সেকেন্ডে ঘনফুট হিসাবে পানি নির্গমনের সময়ের ইউনিট নির্ধারণ করা হয়।

কোন একটি জলস্নোতের নির্দিষ্ট কোন স্থানে সময়ে সময়ে পানি নির্গমনের বিভিন্নতা দেখা যায় এবং এটা নির্ভর করে অববাহিকাতে দ্রুত বৃষ্টির বর্ষণ ও বর্ষণকৃত বৃষ্টির নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার উপর।

নদীর তলদেশে পলি পড়তে শুরু করে যখন নির্দিষ্ট আকারের ক্ষুদ ক্ষুদ্র বস্তুকে চালনা করার সর্বনিম্ন পরিমাণ গতি নদীর স্রোতে না থাকে। যখন নদীর পানি উপচিয়ে পড়ে অর্থাৎ প্লাবিত হয় তখন নদীর বিস্তৃত হওয়ার কারণে স্রোতের বেগ কমে যায়। ফলে নদীর পানিবাহিত বস্তু নিচে পড়তে থাকে। পক্ষান্তরে অস্বাভাবিকভাবে সংঘটিত বড় বড় বন্যা উর্বর ও উন্নত জমির গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। কারণ, বন্যা-প্লাবিত ভূমিতে প্রচুর বালু পড়ে জমি অনুর্বর করে দেয়।

যে নদীতে ভূমিক্ষয় ও পলিমাটি জমার মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকে তাকে একটি নির্দিষ্ট গ্রেডভুক্ত করা বা সমতার অবস্থার বলে বলা হয়ে থাকে। গ্রেডভুক্তির এই ধারণা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, পানি নির্গমনের আকার অথবা ধারণ ক্ষমতার কোন পরিবর্তন সাধিত হ'লে তা নির্গমনের পথ তথা নদীর আয়তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং সম্ভবত এই পরিবর্তনকে মানিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে নদীর ঢালও কাজে লাগে।

নদীর খাতের বাহ্যিক গঠনে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় কাজ করে, (১) নদীর স্রোত ধারার একটি সোজাপথ থেকে সরে আসার পরিমাণ, ও (২) বহু গতে প্রবাহিত স্রোতধারার বিপরীতে একটি একক খাতে প্রবাহিত পানির পরিমাণ।

সরলরেখার মত সোজাসুজি বয়ে যাওয়া নদী বিরল। এর পরিবর্তে, অধিকাংশ স্রোতধারা কম বেশী এঁকে বেঁকে চলে। খুব বেশী আঁকা বাঁকা গতির নদীকে সর্পিল গতির নদী বলে এবং এর এক একটি বাঁককে সর্পিল বাঁক নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ ধরনের নদীর উদাহরণ হচ্ছে তুরস্কের মিয়ানডার নদী (Meander River)। নদীর তীর যখন পানিতে পূর্ণ থাকে তখন নদীর পানি নির্গমণের আকার অনুযায়ী নদীর সর্পিল বাঁকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততার ব্যত্যয় ঘটে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এটা সঠিকভাবে জানা যায় না যে নদী বাঁক খায় কেন। কিন্তু একবার বাঁক খাওয়া শুরু করলে এই বাঁক খাওয়ার প্রবণতা চলতেই থাকে। নদীর পাশাপাশি বাঁকগুলো একত্রে মিশে গেলে তা বাঁক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং নদীর দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিয়ে বলদের গলায় পরানর হাঁসুলি আকারের হৃদে (oxbow lake) পরিণত করে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে নদীর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এই কিছুদিন আগেও অধিকাংশ আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য নদীপথের মাধ্যমে সম্পাদিত হ'ত। নদী সন্নিহিত উপত্যকা সাধারণত ঘনবসতিপূর্ণ হয়। কারণ, সেখানে উর্বর ভূমি, সমতল ভূখণ্ড ও মালামাল পরিবহনে কিছু সহজাত সুবিধা থাকে।

ମାନୁଷେର ଘରେର କାଜେ ଓ ଶିଳ୍ପେ ବେଶ ବଡ଼ ଧରନେର ପାନିର ସରବରାହ ନଦୀ ଥେକେଇ ସଂଘର୍ତ୍ତ ହେଁ ଥାକେ । ନଦୀର ପାନି ଆଟକେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳେର ଅର୍ଥନୀତିକେ ଦାରୁଣଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଦିଯେଛେ । ନଦୀର ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ହିସେବେ ସକଳ କୃଷିକାଜେର ଉପଯୁକ୍ତ ଜୟିତେ ସବଚେଯେ ବେଶୀ ଫ୍ରେଶ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଅନେକ ଉତ୍ସନ୍ତ ଦେଶେର ପ୍ରୋଜନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାର ଅଧିକାଂଶରେ ପାନିର ଶକ୍ତି ଥେକେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଯଦିଓ ନୌ ଚଲାଚଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନଦୀର ଅଧିକତର ଆୟନ୍ତସାଧ୍ୟ ବିଷୟ, ତବୁও ଗୃହକାଜେ ଓ ଶିଳ୍ପେ ବ୍ୟବହାରେର ଜନ୍ୟ ପାନିର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବତ ନଦୀ ଥେକେ ଆହରିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧାର ଶୀର୍ଷେ ଅବହୁନ କରିବେ । ନଦୀର ପାନିତେ ଏକ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟକ ଜଲଜ ପ୍ରାଣୀ ଥାକେ ଯେମନ ମାଛ, ଶାମୁକ, ଚିଂଡ଼ି, କାକଡ଼ା, ଗଲଦା ଚିଂଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି । ଶରୀରେ ପ୍ରୋଟିନେର ଚାହିଦା ମେଟାନର ଜନ୍ୟ ଏସବ ପ୍ରାଣୀଜ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଧାନ ଥାଦ୍ୟ ହିସେବେ ବ୍ୟବହର ହୁଏ । ଏ ଛାଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ପଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନେଓ ତାଦେର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।

ସମ୍ପ୍ରତିକକାଳେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିପୁଲତାଯ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାହିଦାର କାରଣେ ନଦୀର ନ୍ୟାୟ ପାନି ସମ୍ପଦେର ପ୍ରୋଜନୀୟତା ବହୁଗୁଣେ ବୃଦ୍ଧି ପେଯେଛେ । ତାଇ ପାନି ସଂରକ୍ଷଣକଳ୍ପେ ନଦୀର ଉପର ବାଧ ଦେଓୟାର ଦରକାର ହେଁ ପଡ଼େଛେ । ନଦୀର ବିପୁଲ ଜଲରାଶିକେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଦୀର ଉପର ବାଧ ନିର୍ମିତ ହଚେ ଯାତେ ମେଚ କାଜେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନେ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ, ନୌଚଲାଚଳେ, ଜନସାର୍ଥେ ପାନିର ସରବରାହେ, ଶିଳ୍ପକାଜେ ଓ ଚିତ୍ରବିନୋଦନେ ପାନିର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । କୋନ କୋନ ବାଧ ଉପରୋକ୍ତ ମାତ୍ର ଦୁ'ଏକଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଧ ବାଧ ବହୁବିଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଁ ଥାକେ ।

ପ୍ରଯାଣିକାଶନେର ଜନ୍ୟଓ ସାଧାରଣତ ନଦୀର ବ୍ୟବହାର ହେଁ ଥାକେ । ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖା ଗିଯେଛେ ଯେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୋର୍ନତ ଦେଶ ତାଦେର ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟ ନଦୀତେ ନିଷ୍କାଶନ କରିଛେ, ଏର ଫଳେ ମାରାଅକ ପରିବେଶଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଦିଯେଛେ ।

ନଦୀତେ ଜଲଜ ଉତ୍ତିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ରଯେଛେ ଯା ଖୁବ କମି ଭେସେ ଓଠେ ଓ ମୋତତାଡ଼ିତ ହୁଏ । ଏସବେର କାର୍ଯ୍ୟକର ଚଲାଚଳ କଥନ ଓ ନିର୍ଦେଶମୂଳକ ହୁଏ ନା । ଏ ସକଳ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଲଜ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ (plankton) ନାମେ ପରିଚିତ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. Encyclopaedia Britannica, Vol. 15, pp. 867-891, 1978.

وَسَخْرَ لَكُمُ الْسَّنَسَ وَالْقَمَرُ دَآبِينٌ وَسَخْرَ لَكُمُ الْأَيْلَ وَالْهَارُ ۝

১৪ : ৩৩ তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা  
অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে  
নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাতকে তাঁর নির্ধারিত বিধান মেনে চলতে এবং এভাবে মানুষের উপকারে আসতে বাধ্য করেছেন। কুরআনের ৭ : ৫৪ আয়াতে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির আয়াতটির অনুবাদ করেছেন এভাবে “তিনি সূর্য, চন্দ্র, রাত ও দিনকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।” বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। চন্দ্র ও সূর্যের মত মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ কিংবা দিন ও রাতের মত প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ কখনই মানুষের অধীন থাকে না। এরা শুধুমাত্র আল্লাহরই অধীন। তারা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ পথে চলে এবং তাঁরই পরিকল্পনা মাফিক মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে।

৩৩-يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضِ وَالشَّمْوُتُ وَبَرْزُوا إِلَيْهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

১৪ : ৪৮ যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং  
আকাশমন্ডলী এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সম্মুখে, যিনি  
এক, পরাক্রমশালী।

অত্র আয়াতে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের যে পরিবর্তনের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা হাশর তথা রোজ কিয়ামতের প্রাক্কালে যে অবস্থা বিরাজ করবে সে সম্পর্কিত। বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নে আলোচিত পৃথিবী ও মহাবিশ্বের তিনটি সম্ভাব্য পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা যায়।

পৃথিবী আজ যেমন আছে অতীতেও তেমন ছিল না, ভবিষ্যতে তেমন থাকবে না। যুগ যুগ ধরে অবিরাম পরিবর্তিত হয়ে চলেছে পৃথিবী। আকাশমন্ডলী তথা মহাবিশ্বের ব্যাপারেও একই কথা থাটে।

এক হাজার বা দু'হাজার কোটি বর্ষ আগে কোন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য কিংবা কোন তারকা বা ছায়াপথের অস্তিত্ব ছিল না। ছিল শুধুমাত্র একটি অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উন্নত আদিযুগীয় অগ্নিগোলক যার মধ্যে ছিল মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও শক্তি। অগ্নিগোলকটি প্রচল শব্দে বিস্কোরিত হয় এবং দ্রুত

সম্পସାରଣଶୀଳ ଏବଂ ଶିତଲାୟମାନ ପ୍ରୋଟନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଓ ନିଉଡ଼ିନ ଗ୍ୟାସେ ପରିଣତ ହୟ । ସମଯେ, ଏହି ଗ୍ୟାସଙ୍କୁ ଛାଯାପଥ ଗଠନ କରେ । ଏ ସକଳ ଛାଯାପଥ ପରମ୍ପରା ଥିବା ଆଲାଦା ହୟ ଦୂରେ ସରେ ଯେତେ ଥାକେ ; ଏକଇ ସାଥେ ପ୍ରତିଟି ଆଲାଦା ଛାଯାପଥରେ ଭିତରକାର ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଲଜନିତ କାରଣେ ସନ୍ଧୁଚିତ ହେତେ ଥାକେ । କିଛିକାଳ ପରେ, ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗତି ସଙ୍କୋଚନଶୀଳ ଛାଯାପଥକେ ଚର୍ଣ୍ଣ-ବିଚର୍ଣ୍ଣ କରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ବୁଦେ ପରିଣତ କରେ ଯା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀହାରିକାପୁଞ୍ଜ ଗଠନ କରେ । ଏ ଧରନେରଇ ଏକଟା ଛୋଟ୍ ବସ୍ତୁ ହେଚେ ସୌର ନୀହାରିକା । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଜନିତ କାରଣେ ଯତଇ ଏଟା ସନ୍ଧୁଚିତ ହେତେ ଥାକେ ତତଇ ଦ୍ରୁତତର ବେଗେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ କରତେ ଥାକେ । ଏଭାବେଇ ସଙ୍କୋଚନଶୀଳ ନୀହାରିକା ଆରୋ ବେଶୀ ସନ୍ଧୁଚିତ ହେତେ ଓ ଦ୍ରୁତତର ବେଗେ ଘୂରତେ ଥାକଲେ ଏଗୁଲୋ କିଛି କିଛି ପଦାର୍ଥର ଫୁଟକି ବା ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ହେଡେ ଦେଯ ଯେଗୁଲୋ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହରେ ଆକାର ଧାରଣ କରେ, ଆମାଦେର ପୃଥିବୀ ଏ ଧରନେରଇ ଏକଟି ଗ୍ରହ । ଆର ଏଭାବେଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆମାଦେର ଏହି ପୃଥିବୀ ।

ଜନ୍ମକାଳେ ପୃଥିବୀ ଛିଲ ଏକଟା ଉତ୍ତଣ ଗୋଲାକାର ଗ୍ୟାସେର ଫୁଟକି ବା ବୁଦ୍ବୁଦ୍ । ଶିତଲ ହେତେ ଥାକଲେ ଏର ଉପରିଭାଗେ ଏକଟା ତ୍ଵକ ବା ତ୍ତର ଗଠିତ ହୟ । ଏଭାବେ, ଐ ସମଯେ ପୃଥିବୀତେ ଛିଲ ଏକଟି ମାତ୍ର ବିଶାଳ ମହାଦେଶ ଯାକେ ଆଜ ବଲା ହୟ ପ୍ଯାଙ୍ଗେଆ (Pangaea) । ଆର ଛିଲ ଏକଟି ମାତ୍ର ମହାସାଗର ଯାକେ ବର୍ତମାନେ ପ୍ଯାଞ୍ଚାଲୋସା (Panthalossa) ନାମେ ନାମକରଣ କରା ହୟ । କିଛିକାଳ ପର, ଏହି ବିଶାଳ ମହାଦେଶ ଦୁ'ଟକରୋ ହୟ ଦୁ'ଟି ସୁପାର ମହାଦେଶେ ପରିଣତ ହୟ ଯାକେ ବର୍ତମାନେ ଲାରେସିଆ (Laurasia) ଏବଂ ଗନ୍ଦୋଯାନାଲ୍ୟାନ୍ (Gondwanaland) ନାମେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରା ହୟ ଥାକେ । ଭୂତାତ୍ତ୍ଵିକ ଗଠନଶୀଳୀ ଏବଂ ମହାଦେଶୀୟ ସମ୍ପ୍ରବାହେର ଫଳେ ପୃଥିବୀ ତାର ବର୍ତମାନ ଆକୃତି ଧାରଣ କରେ । ଭୂତାତ୍ତ୍ଵିକ ଗଠନଶୀଳୀ ଏବଂ ମହାଦେଶୀୟ ସମ୍ପ୍ରବାହ ଚଲତେ ଥାକଲେ ପୃଥିବୀର ବର୍ତମାନ କାଠାମୋ ଏକଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୟ ନତୁନ କାଠାମୋ ଗଡ଼େ ଉଠିବେ । ଏଭାବେ ପୃଥିବୀ ଭୋଗୋଲିକଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୟ ନତୁନ ଏକ ପୃଥିବୀତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବେ ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନେର ସୂତ୍ରାନ୍ୟମୀ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୟ ଯାବେ । ଛୟଶ' କୋଟି ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକଟା ରକ୍ତିମ ଦୈତ୍ୟକାର ତାରକାୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବସବାସେର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୟ ପଡ଼ିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଲାଲ ଦୈତ୍ୟକାର ଅବସ୍ଥାର ଶ୍ୟାମିତ୍ତକାଳ କରେକଶ' ମିଲିଯନ ତଥା ପ୍ରାୟ ଶତ କୋଟି ବର୍ଷରେ ମତ ହେତେ ପାରେ ବଲେ ଧାରଣା କରା ହୟ ଥାକେ । ଦୀର୍ଘତମ ଆକାର ଧାରଣ କରା ଅବସ୍ଥା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପରିଭାଗ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ରର କକ୍ଷପଥ ଗିଲେ ଫେଲିବେ ଏମନିକି ତା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛେ ଯେତେ ପାରେ । ପୃଥିବୀ ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଥାକେ ତାହଲେ ପୃଥିବୀ ଜୁଲେ ପୁଡ଼େ ଅନ୍ଦାର ହୟ ଯାବେ ।

পৃথিবীর জীবমন্ডলেও পরিবর্তন আসবে। পৃথিবী পৃষ্ঠে জীবনের আবাসভূমি এই জীবমন্ডল, ভূত্বক, মহাসাগরসমূহ এবং বায়ুমন্ডল নিয়ে গঠিত। পৃথিবীর জন্মালগ্ন থেকে শুরু করে এখন থেকে সাড়ে তিনশ' কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। এরপর প্রথমে এককোষী জীবের উদ্ভব ঘটে। ক্রমে আদিমযুগীয় জলজ উদ্ভিদ এবং অমেরংদভী প্রাণীর আবির্ভাব হয়। তারপরই আসে মেরুদণ্ডী প্রাণী আর উভচর প্রাণীকুল। ডাইনোসরের মত বিশালদেহী সরীসৃপ পনের কোটি বছর পৃথিবীতে আধিপত্য করে। শেষতক আবির্ভাব ঘটে মানব প্রজাতির যারা এখনও ভূ-পৃষ্ঠের উপর সর্বোচ্চ আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে। সূর্য বিশাল রাঙ্গিম দৈত্যাকার পর্যায়ে পৌছলে পৃথিবীর জীবমন্ডল অদৃশ্য হয়ে যাবে। এভাবে পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক রূপ ধারণ করবে।

এবার আকাশমন্ডলীর পরিবর্তন বিবেচনা করা যাক। এটা একটা ব্যাপকভাবে গৃহীত সত্য যে, মহাবিশ্বের দু'টি বিপরীতধর্মী বল কাজ করছে। এর একটা বিকিরণ চাপে সৃষ্টি আর অপরটি মাধ্যাকর্ষণজনিত সংকোচনের কারণে জন্ম লাভ করেছে। কাজেই এ দু'টি বলের মধ্যে ভারসাম্যই নির্ধারণ করে মহাবিশ্বের অবস্থা, অর্থাৎ মহাবিশ্ব এখনকার মত অনিদিষ্টকাল ধরে সম্প্রসারিত হতে থাকবে কিনা।

সম্প্রসারণের হারহাস পেতে পারে কিংবা শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে, তথাপি পৃথিবী উন্মুক্ত (তথা সম্প্রসারমান) থেকে যাবে। কিংবা পরিবর্তিত অবস্থায় সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে। সঙ্কোচণ প্রভাবশালী হবে এবং মহাবিশ্ব নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে উচ্চ ঘনত্বের অন্য একটা অবস্থায় গিয়ে উপনীত হবে। সম্প্রসারণ ঠেকানোর মত মহাবিশ্বের যদি যথেষ্ট পদার্থের অভাব ঘটে, তাহলে ছায়াপথগুলো পরম্পর থেকে আরো দূরে চলে যাবে এবং মহাবিশ্বের একক প্রতি শক্তির পরিমাণ একটানা কমতেই থাকবে। এর পরিণতিতে অবস্থা দাঁড়াবে সকল বস্তুর হিম শীতল মৃত্যু যাতে তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি চলে আসবে। বিপরীত পক্ষে, মহাবিশ্বের ঘনত্ব যদি যথেষ্ট বেশী থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে সম্প্রসারণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে যাবে এবং তখন মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে উচ্চ ঘনত্বের অপর এক একক অবস্থায় পরিবর্তিত হবে (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট-৩ দেখুন)। উপরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পরিবর্তন সম্পর্কে যে আলোচনা পেশ করা হল তা কুরআনে প্রকৃত ইঙ্গিতের সাথে উত্তমভাবে মিলে যায়।

## ٥-٣ ﷺ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيْنَهَا لِلنَّظَرِينَ

১৫ : ১৬ আকাশে আমি ইহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে করেছি  
সুশোভিত দর্শকদের জন্য।

সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে সূর্য বছরে একবার আকাশ  
পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করে বলে মনে হয়। পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের এই বার্ষিক  
আপাত পরিক্রমণ পথ একটা বিশাল বৃক্ষ তৈরি করে যা ক্রান্তিবৃক্ষ হিসেবে  
পরিচিত।

বিষুব রেখার চারদিকে ক্রান্তিরেখার উভয় পার্শ্বে  $90^{\circ}$  ডিগ্রী বিস্তৃত যে বন্ধনীর  
মত এলাকা ঢলে গেছে তাকেই বলা হয় রাশিচক্র। দৃশ্যত এতে আছে সূর্য, চন্দ্র  
ও গ্রহসমূহের বার্ষিক পরিক্রমণ পথ। সকল সভ্যতায় এই বন্ধনীকে বারোটি  
ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ভাগই  $30^{\circ}$  ডিগ্রী প্রশস্ত। প্রতিটি অংশেই  
তারকাসমূহ একত্রে স্থাপিত হলে রাশিচক্রের চিহ্ন নামে পরিচিত ছবি তৈরি করে  
বলে অনুমান করা হত।

### বারোটি রাশির চিহ্ন

ক্রম	গ্রীক	বাংলা	আরবী
১.	এরিজ	মেষ রাশি	হামাল
২.	ট্যুরাস	বৃষ রাশি	ছাউর
৩.	জেমিনি	মিথুন রাশি	জাওয়া
৪.	ক্যানসার	কক্ষ রাশি	সার্তান
৫.	লিও	সিংহ রাশি	আসাদ
৬.	ভারগো	কন্যা রাশি	আয্যা
৭.	লিব্রা	তুলা রাশি	মিয়ান
৮.	ক্ররপিও	বৃশ্চিক রাশি	আকরাব
৯.	স্যাগিটারিয়াস	ধনু রাশি	কাউস
১০.	ক্যাপ্রিকরনাস	মকর রাশি	জেদি
১১.	একুয়ারিয়াস	কুণ্ঠ রাশি	দালওয়া
১২:	পিসিজ	মীন রাশি	হত

অত্র আয়তটিতে ‘যাইয্যান্না’র অনুবাদ করা হয়েছে সুদর্শন। যাইয্যান্না শব্দটি  
‘তায়ীন’ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যার মূলগত অর্থ সাজান, বা অলঙ্কৃত

করা। কাজেই, যাইয়্যান্নাহা লিন্নায়িরিন অর্থ আমরা দর্শকদের জন্য একে (আসমান) সাজিয়েছি। আসমানকে দীপ্তিমান বস্তু দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে যেগুলো ওধূমাত্র রাতেই দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবীতে কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে স্বাভাবিক গতানুগতিক সাজসজ্জা বহু দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। রাত্রিকালীন আকাশের বিশালতা ও চমৎকারিত্ব তারাই যথাযথভাবে উপলক্ষ্য করেন যারা উপলক্ষ্য করার ক্ষমতা রাখেন, যদি তা প্রতি রাতের ঘটনা না হয়ে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্য হত।

## ٧-الْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَالْقِنَّا فِيهَا رَوَاسِيٌّ وَأَكْهَنَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُنَوْزُونَ

১৫ : ১৯ পৃথিবীকে আমি বিস্তৃতি করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্বাত করেছি সুপরিমিতভাবে।

### পৃথিবীর বিস্তার

বিষয়টি ২ : ২২ এবং ১৩ : ৩ আয়াতদ্বয়ের আলোচনা উপলক্ষ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

### পর্বতমালা স্থাপন

বিষয়টি ১৩ : ৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

### সুপরিমিতভাবে বস্তুর সৃষ্টি

বিষয়টি ১৩ : ৮ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

## ٨-فَلَنْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا عِنْدَنَا خَرَائِئُهُ وَمَا نُنْزَلَهُ لَا يَعْدُ رَمْغَلُونَ

১৫ : ২১ আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর অনিশ্চেষযোগ্য ভাস্তার এবং আমি তা পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।

এ আয়াতের তিনটি শুরুত্তপূর্ণ দিক রয়েছে, যথা- ১. আমাদের চারপাশে যা কিছু ধনদৌলত বা সম্পদ আমরা দেখি সেগুলোর ভাস্তার রয়েছে আল্লাহর নিকট, ২. এ সবগুলি সম্পদ তিনি আমাদের নিকট পাঠান প্রয়োজনানুযায়ী, এবং ৩. তিনি এ সবকিছু পাঠান বিধান ও পরিকল্পনানুযায়ী। এ সকল বিষয়ে আল্লাহর দাবিসমূহ

ପ୍ରଥମେ ଆମାଦେର ନିକଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ୍ୟ ନା । କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଚିନ୍ତା ଏସବେର ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ତାତ୍ପର୍ୟକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ତୋଳେ ।

ପ୍ରଥମ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜିଜ୍ଞାସା କରା ଯାଯ ତାହଲୋ- ପୃଥିବୀତେ କୋନ୍ ଜିନିସଗୁଲୋକେ ଧନଦୌଲତ ବିବେଚନା କରା ଉଚିତ । ସୋନା, ରଙ୍ଗା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନାଦି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ହାଁକତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ବେଚେ ଥାକା ଓ ଅନ୍ତିତ୍ରେ ଧାରାବାହିକତାର ଜନ୍ୟ ଏଗୁଲୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ ବିଧାୟ ଏଗୁଲୋକେ ଦୌଲତ-ସମ୍ପଦ ବିବେଚନା କରା ଯେତେ ପାରେ ନା । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିତେ ପାନି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ହଛେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ ଯା ଜୀବନେର ଟିକେ ଥାକା ଓ ଉନ୍ନତିର ଜନ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ୟ । ଏଇ ପଟ୍ଟଭୂମିତେ ଅତ୍ର ଆୟାତେର ତାତ୍ପର୍ୟ ଅନୁଧାବନ କରା ଅନେକ ସହଜ ହ୍ୟ ଯାଯ । ସମ୍ପଦ ଶାକ-ସଜି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯା ସାଲୋକ ସଂଶୋଷଣେର କାରଣେଇ ପାଓୟା ସନ୍ତୋଷ । ଏଟି ଏମନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାତେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ନାମକ ଉତ୍ତିଦେର ସବୁଜ ତତ୍ତ୍ଵରଙ୍ଗକ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାନି ଥେକେ ପ୍ରାଣ ଶର୍କରା ଏବଂ ବାୟୁ ଥେକେ ପ୍ରାଣ କାରବନ ଡାଇଅକ୍ରାଇଟ୍‌ର ମଧ୍ୟେ ସଂଶୋଷଣ ଘଟାଯ । ଆମାଦେର ଆମିମେର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ଭେଡା, ଛାଗଲ, ଗର୍ଜ, ଉଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ମ ସଜି ଜଗତେର ଉପରେଇ ବେଚେ ଥାକେ ଏବଂ ବୁକ୍ଳିପ୍ରାଣ ହ୍ୟ । ସୂର୍ଯ୍ୟତାପେ ବିପୁଲ ପରିମାଣ ସାଗରେର ପାନି ବାଷ୍ପକାରେ ଆକାଶେ ଜମା ହ୍ୟ ଯା ମେଘ ଆକାରେ ବାୟୁତାଡ଼ିତ ହ୍ୟ ହେଲେ ତୁଳଭାଗେ ଚଲେ ଆସେ । ଏହି ମେଘ ଆବାର ତୁଳଭାଗ ଓ ସାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାଯ ତାପ ପ୍ରଦାନେର କାରଣେ ସୃଷ୍ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟର ଦରନ ପାନିତେ ପରିଣତ ହ୍ୟ । ମେଘ ଥେକେ ବାରି ବର୍ଷଣ ଏବଂ ପାହାଡ଼ଚାନ୍ଦ ବରଫେର ଶର ଗଲେ ଯାଓୟାଯ ସୃଷ୍ଟି ହ୍ୟ ମିଠା ପାନିର ଉତ୍ସ । ଜୀବୀ ବାଷ୍ପ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଚାନ୍ଦ ପୌଛିଲେ ସେଥାନେ ଠାଭାର ପ୍ରଭାବେ ଘନୀଭୂତ ହ୍ୟ ବରଫେର ଶର ସୃଷ୍ଟି ହ୍ୟ । କାଜେଇ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଛି ଯେ, ଜୀବନକେ ଟିକିଯେ ରାଖାର ସକଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରଇ ମୂଳେ ରଯେଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥେକେ ବିକିରିତ ବିପୁଲ ପରିମାଣ ଶକ୍ତି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପାଗବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ଉତ୍ସାଦିତ ବିପୁଲ ପରିମାଣ ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରେ ପୃଥିବୀତେ । ପ୍ରତି ମେରେ ପ୍ରାୟ ବିଯାନ୍ତିଶ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସୌର ପଦାର୍ଥ ତାପଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ହାରେ ପଦାର୍ଥକ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଥାକଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶ ହାଜାର କୋଟି ବଂସରାଧିକକାଳ ଧରେ ତାପ ଓ ଆଲୋ ବିକିରଣ କରବେ ବଲେ ଧରେ ନେଯା ଯାଯ । ଆରୋ ବିନ୍ତାରିତ ଏବଂ ସୌର ତତ୍ପରତାର ବିଧାନ ଓ ମହାପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେ ହଲେ ୭ : ୫୪ ଆୟାତେର ଆଲୋଚନା ଦେଖା ଯେତେ ପାରେ ।

ପୃଥିବୀ ଯେ ପରିମାଣ ସୌର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ ତା ସକଳ ଜୀବକେ ଟିକିଯେ ରାଖାର ପ୍ରକ୍ରିୟାମୂଳ୍ୟ ବଜାଯ ରାଖାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭାବ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ । ଯଦି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ପରିମାଣ ତାପ ବିକିରିତ ହତ ତାହଲେ ଏ ଗ୍ରହଟ ଅଧିକତର ଶୀତଳ

হত এবং আমাদের পক্ষে জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ত। অনুরূপভাবে অত্যধিক শক্তির বিকিরণ পুরো গ্রহটিকে একটি বালির স্তুপে পরিণত করত।

মাটির নিচে আটকে পড়া সমস্ত জীবাশ্ম এবং হাইড্রোকার্বন (তেল ও গ্যাস) শক্তিসমূহ সৌর শক্তির কার্যক্রম দ্বারাই উৎপাদিত হয়েছে। বিদ্যুতের চমক বাযুতে উৎপাদিত হয়েছে। বিদ্যুতের চমকানি বাযুতে নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রাইডসমূহ তৈরি করে আর বৃষ্টির পানি এগুলোকে দ্রবণ আকারে মাটিতে নিয়ে আসে যা উদ্ভিদ কর্তৃক সার হিসেবে ব্যবহারযোগ্য।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি তা দ্বারা সত্যিই আমরা আলোচ্য আয়াতটিকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারি।

وَأَرْسَلْنَا التِّبْيَخَ لِوَاقِعِ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْقَلَبَ كُلُّهُ  
وَمَا أَنْتُمْ كُلُّهُ بِغَنِينَ ۝

১৫ : ২২ আমি বৃষ্টি গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দেই; এর ভাওয়ার তোমাদের নিকট নেই।

উর্বরতার অনুষ্টক হিসেবে বায়ু প্রবাহের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ৭ : ৫৭ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বায়ু এক পুরুষ ফুলের পরাগরেণু অন্য স্ত্রীপুষ্পের গর্ভমুণ্ডে বহন করে নিয়ে পরাগায়নে সাহায্য করে থাকে।

বৃষ্টির পানি কিভাবে আকাশ থেকে নিচে নেমে আসে তা ২ : ১৬৪ আয়াতের আলোচনায় বলা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ قَرْنَ حَمَّا مَسْنُونٌ ۝

১৫ : ২৬ আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠন্ঠনে মৃত্তিকা হতে।

وَلَذِّقَ رَبُّكَ لِلنَّعْكَةِ إِذِنَ خَالِقٍ بَشَرًا قَرْنَ صَلْصَالٍ قَرْنَ حَمَّا مَسْنُونٌ ۝

১৫ : ২৮ স্বরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠন্ঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করছি।

মানুষ সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট আকার প্রদত্ত শুকনা ও কাদা মাটি কী ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে ৬ : ২ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

○-فَلَمَّا سَوَّيْتُهُ وَلَخْتُ فِيهِ مِنْ رُزْقٍ نَعْوَالُهُ سَعْدَيْنَ ۝

১৫ : ২৯ যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার জুহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবন্ত হয়ো।

বিষয়টি ১৩ : ৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

○-قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا بَشِّرُوكَ بِعِلْمٍ عَلَيْنَا ۝

○-قَالَ أَبْكِرُونَعْنَى عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنِي الْكَبِيرُ فَيَمْتَبِّرُونَ ۝

○-قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنْطِينَ ۝

১৫ : ৫৩-৫৫ তারা বলল, তয় করো না। আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিছি।

সে বলল, তোমরা কী আমাকে শুভ সংবাদ দিছ আমি বার্ধক্যগত হওয়া সত্ত্বেও ? তোমরা কী বিষয় শুভ সংবাদ দিছ ?

তারা বলল, আমরা সত্য সংবাদ দিছি। সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।

এ সকল আয়াতে আল্লাহর নবী হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘরে তাঁর বয়োবৃন্দকালে এক পুত্র সন্তান জন্মের বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরেশতাগণ এই সুসংবাদ দিলে হ্যরত ইবরাহীম (আ) বিশ্বিত হন। তিনি অবাক হলেন এই ভেবে যে, তাঁর এরকম বয়োবৃন্দ অবস্থায় কী করে এটা সম্ভব হয়। ফেরেশতাগণ জওয়াবে বলেন যে, সংবাদটা আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে, অতএব এটা সত্য। অতএপর ইবরাহীম (আ) তা বিশ্বাস করেন।

বয়োবৃন্দকালে সন্তান জন্মান্তরের বিষয়টি ইতিমধ্যে ৩ : ৩৯-৪০ আয়াতে হ্যরত যাকারিয়ার (আ) ঘরে হ্যরত ইয়াহইয়া (আ)-এর জন্মের আলোচনাকালে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শতাধিক বছর বয়সেও সন্তান জন্মান্তরের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। আধুনিক জীববিজ্ঞানগত জ্ঞান অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান জন্মান্তরের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে।

۶- فَأَخْزَنَّاهُمُ الْعَصِيرَةُ مُشْرِقِينَ ۝

۷- فَجَعَلْنَا عَالِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ رِجَارَةً مِنْ سِخْنِيلٍ ۝

۸- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ لِلْمُتَوَمِّنِينَ ۝

۹- وَإِنَّهَا لِبَسِيَّنِيلْ مُقْلِمُو ۝

۱۰- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

১৫ : ৭৩-৭৭ অতঃপর সূর্যেদয়ের সময়ে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল  
এবং আমি জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং  
তাদের উপর প্রস্তর-কঙ্কর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে  
নির্দর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।

তা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই  
মু'মিনদিগের জন্য রয়েছে নির্দর্শন।

৭৩ ও ৭৪নং আয়াতে হ্যরত লৃত (আ)-এর অনুসারীদের উপর তাদের  
অশ্বাভাবিক ঘৌন আচরণের কারণে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল সেদিকে ইঙ্গিত  
করে। আল্লাহ্ শাস্তি স্বরূপ তাদের উপর বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প এবং প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ  
করেন। ৭ : ৮৪ এবং ৭ : ৯১ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্প  
বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫ : ৭৬ আয়াতটি ঘটনাস্থল সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। ৭ : ৪৪ আয়াতের  
ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

۱۱- وَمَا خَلَقْنَا التَّعْوِيْفَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَمْهُمُ الْأَدَالَ بِالْحَقِّ ۝  
۱۲- وَلَئَنَّ السَّاعَةَ لَازِمَةٌ  
۱۳- قَاصِفَةُ الصَّفَرِ الْجَيْنِيلَ ۝

১৫ : ৮৫ আকাশমন্ডলী ও পথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি  
অথবা সৃষ্টি করি নি। এবং কিয়ামত অবশ্যজ্ঞাবী; সুতরাং তুমি  
পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।

পথিবী, আকাশমন্ডলী এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে সেগুলোর  
সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ২ : ১১৭ ও ১৬৪ আয়াতদ্বয় এবং পরিশিষ্ট-২ এ  
দেয়া হয়েছে। ৩ : ১৯১ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃতিক  
ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি সৃষ্টিরই রয়েছে নির্দিষ্ট ভূমিকা। অনেক  
মুফাস্সির মনে করেন আয়াতটির শেষাংশ যেগানে বলা হয়েছে 'আর সেই সম-

অবশ্যই আসছে' এর অর্থ এই সৃষ্টি জগতের ধৰ্মস দিবস। যাহোক, এর আরেকটা সুদূরপ্রসারী ফলাফল এই হতে পারে যে, এমন একটা সময় আসছে যখন মানুষ প্রকৃতিতে বিদ্যমান পরিবেশগত ভারসাম্যসমূহ উপলব্ধি করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে প্রতিটি আলাদা আলাদা সৃষ্টির র্থথাযথ উদ্দেশ্য। আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রকৃতিতে বর্তমান নানান সম্পদের উপর প্রচন্ড চাপ পড়েছে। মানুষ নজিরবিহীনভাবে গাছ কর্তন করে চলেছে তার জুলানী ও অন্যানী গৃহস্থালী কাজের প্রয়োজনে। ফলে, বদ্ধিপ অঞ্চলগুলোতে বন্যা আরো বেশী ক্ষতি করছে এবং আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি একেবারে অস্থির ও খেয়ালী হয়ে উঠেছে। বাছবিচারহীনভাবে জীবজন্ম ও গাছগাছালী ধৰ্মস করা হচ্ছে। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈরি হচ্ছে যা মারাঘৰক হৃষক সৃষ্টি করছে এবং অনেক ক্ষেত্ৰে বহু শিল্পান্বত দেশ সামুদ্রিক বা জলজ জীবন ধৰ্মস করে দিচ্ছে। জার্মানীৰ ব্লাক ফেরেন্ট শিল্প-রাসায়নিক দ্রব্যাদিৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৱৰ্ণনপে ধৰ্মস হয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকগণ সম্পৃতি আবিষ্কার কৱেন যে, শিল্প কাৰখনা কৰ্ত্তক উৎপাদিত সিএফসি গ্যাস আৰ্কটিক অঞ্চলে ওজোন স্তৰেৱ জন্য হৃষক হয়ে পড়েছে। ওজোন স্তৰ অতিবেগুনী রশ্মিৰ ক্ষতিকাৰকতা থেকে পৃথিবীৰ জীবনকে নিৱাপন রাখে। পাশাত্যে প্ৰকৃতিৰ সাথে মিলে মিশে বসবাসেৱ আন্দোলন জোৱদাৰ হচ্ছে। পৰীক্ষা-নিৰীক্ষার নামে পারমাণবিক বিস্ফোৱণ প্রকৃতিৰ জন্য মারাঘৰক হৃষক হয়ে পড়েছে। রাশিয়া এবং ইউএসএ-তে কয়েকটি পারমাণবিক চুল্লিতে সংঘটিত দুঘটনা জীবনেৱ উপৰ মারাঘৰক হুঁশিয়াৰি ও হৃষকি সৃষ্টি কৱেছে। জান-বিজ্ঞানেৱ অগ্রগতিৰ সাথে সাথে আমৱা বিভিন্ন জীব ও অনুজীব এবং তাদেৱ পৰম্পৰেৱ উপৰ নিৰ্ভৱশীলতাৰ উপকাৰী দিকসমূহ অবগত হচ্ছি (বিজ্ঞানিত জানার জন্য দেখুন ৩ : ১৯১ আয়াত প্ৰসঙ্গে আলোচনা)। বন্তুত সময় এসে উপস্থিত হলৈই কুৱানেৱ দাবী স্পষ্টৱৰ্ণনপে প্ৰকাশ লাভ কৱে।

### ○ ﴿اَنَّ رَبَّكَ مُوَلَّىٰ الْعَالَمِينَ﴾

১৫ : ৮৬ তোমাৱ প্ৰতিপালকই মহা-সৃষ্টা, মহাজ্ঞানী।

আয়াতটি অত্যন্ত স্পষ্টভাৱে বলছে যে, আল্লাহই সুদক্ষ, সুনিপুণ সৃষ্টিকৰ্তা যিনি সৰ্বজ্ঞানী। আল্লাহই যে সৰ্বময় ও সুনিপুণ সৃষ্টা তা ইতিপূৰ্বে অন্যান্য আয়াতেৱ আলোচনা প্ৰসঙ্গে ব্যাখ্যা কৱা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বৰূপ, জগৎসমূহেৱ অধিপতি এবং পালনকৰ্তা হিসেবে আল্লাহই ধে প্ৰধান পাৰিকল্পক এ বিশয়টি ১ : ২ আয়াতেৱ আলোচনায় ব্যাখ্যা কৱা হয়েছে। ৩ : ১৯১ আয়াত প্ৰসঙ্গে আলোচনা কৱা হয়েছে

যে, কোন কিছুই খামাখা সৃষ্টি করা হয়নি। ১৪ : ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ কিছু কিছু জিনিস সৃষ্টি করতে পারলেও তা সত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি জগতের তুলনায় তেমন কিছু নয়। আর আল্লাহর সৃষ্টি বিন্দুমাত্র ঢটি থেকেও মুক্ত। আল্লাহই সর্বসেরা সৃষ্টিকর্তা।

## ○-خَلَقَ النَّمْوَتَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقٍِّ تَعْلَمُ عَكَائِبُ شَرْكُونَ

১৬ : ৩ তিনি যথাযথ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

এ আয়াত বলছে যে, আল্লাহ যথাযথ উদ্দেশ্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমরা যদি শব্দটির শুধু অর্থ করি ‘খেলাছলে নয়’ কিংবা ‘উদ্দেশ্যবিহীন নয়’, তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাঢ়ায় ৩ : ১৯১ আয়াতের মতই যেখানে আল্লাহ চান যে মানুষ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করুক এবং দেখুক যে আল্লাহ কোন কিছুই অথথা সৃষ্টি করেননি। পরবর্তী আয়াতটি জীব ও জড় বস্তুর গঠন প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যাতে বিধানগত এক্য এবং পর্যবেক্ষণকৃত জীবদেহসমূহের অস্তিত্বের প্রতি বাস্তব্য বিদ্যা সংক্রান্ত প্রভাবের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেখা যায় যে, জ্ঞানের শাখা-শাখাখা দ্রুত বিস্তৃতি লাভের সাথে সাথে বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টি জগতে এক মহাপরিকল্পনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করছেন। এক মহানিয়ন্ত্রকের দ্বারা প্রকৃতির শক্তিসমূহ সংগঠিত না হলে জীবন ও বস্তু আমরা যেভাবে জানি সেভাবে টিকে থাকতে পারত না।

## ○-خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

১৬ : ৪ তিনি (আল্লাহ) মানুষকে একটি ফোটা থেকে সৃষ্টি করেছেন অথচ সে এখন স্পষ্ট তর্ক বিতর্কে লিঙ্গ।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব শিশু এক বিন্দু জলীয় পদার্থ থেকে সৃষ্টি। আয়াতের নৃত্বাতিন শব্দের অর্থ সাধারণভাবে পুরুষের শুক্রকে ধরা হয়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ ফোটা বা বিন্দু, তাই এর দ্বারা মেয়েদের পরিপক্ষ ডিম্বযুক্ত রক্ত মিশ্রিত সেই পানীয় বস্তুও হতে পারে যা পরিপক্ষ ডিম্ব ডিম্বকোষ থেকে ফেটে বের হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর স্পষ্ট উক্তি রয়েছে যে তিনি বলেছেন, ‘নৃৎফা’ দু’প্রকার একটি পুরুষের, আর একটি মহিলার। জনেক

ইয়াহুদী মহানবী (সা)-কে প্রশ্ন করেছিল, ‘হে মুহাম্মদ? মানুষ কীভাবে সৃষ্টি?’ মহানবী (সা) জবাব দিলেন, ‘হে ইয়াহুদী! সেই দুটি বস্তু থেকে সৃষ্টি ‘পুরুষের ‘নৃৎফা’ এবং নারীর ‘নৃৎফা’, (আল মুস্নাদ, ইমাম আহমদ)। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কুরআনে ‘নৃৎফা’ বলতে পুরুষের শুক্রকীট এবং নারীর পক্ষ ডিখাণুকে বুঝায়। ভাবতে অবাক লাগে যে ৭ম শতাব্দীর কুরআনে এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা মানুষ বহু শতাব্দী পরে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৭-এ দেখুন।

هُوَ الْأَنْعَامُ حَلَقُواٰ لَكُمْ فِيهَا دَفٌ ۚ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

১৬ : ৫ তিনি আন'আম সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক।

এ আয়াতে আল্লাহ গবাদিপণ থেকে যে সকল উপকার পাওয়া যায় সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আন'আম-انعام (শব্দটি - نعم - এর বহুবচন) বলতে সকল গরু-ছাগলকে একত্রে বা সমষ্টিগতভাবে বুঝান হয়ে থাকে। কুরআনে উল্লিখিত শব্দ আন'আম-انعام দ্বারা সকল গৃহপালিত চতুর্পাদ জন্মকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ এই শ্রেণীর মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল প্রাণীর নিকট থেকে আমরা যে সকল উপকার পেয়ে থাকি তন্মধ্যে আল্লাহ বিশেষভাবে দু'টির কথা উল্লেখ করেছেন, যথা এদের চামড়া ও মাংস। দেফ্টন (،-ف-) শব্দটির অর্থ গরম কাপড় যা উটের লোম থেকে পাওয়া যায়, যদিও উট থেকে প্রাণ্ত অন্যান্য জিনিস তথা খাদ্য, দুঁপ্তি ও পোশাকাদিকেও দেফ্টন শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। উটের লোম ছাড়াও ভেড়ার পশমও সারা বিশেষ পোশাক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভেড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্ম থেকে প্রাণ্ত পশম সম্পদ তথা পশমী কোট যে আমাদের উষ্ণতা এনে দেয় তার প্রধান কারণ হলো এসব জন্মুর কোঁচকানো চুল যা থেকে পশম নামক পেঁচানো পশমী তত্ত্ব পাওয়া যায়। এ থেকে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের পোশাক যা আমাদেরকে উষ্ণ রাখে, তথা পুলোভার, জাম্পার, মোজা, মাফলার, হাতমোজা এবং অন্যান্য সকল পশমী জিনিসপত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাতকৃত পুরো চামড়াটাই পশম সমেত গরম কোট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এসব ছাড়াও, সকল বয়সের লোকদের জন্য চামড়ার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে যথা এছাদির কভার বা আচ্ছাদন, কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্রের কভার ইত্যাদি। শীতের দেশগুলোতে চামড়ার পোশাক খুবই উপকারী। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া আর উটের মাংস উন্নত মানের আমিষের উত্তম উৎস।

এ সকল জীবজন্তু থেকে আমরা আরও যে সকল উপকারিতা পেয়ে থাকি তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য;

১. গরু ও মহিষ শরণাত্তীতকাল থেকে কৃষক কর্তৃক জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি বৈজ্ঞানিক উন্নতির এ যুগেও বিশ্বের এক বৃহৎ অংশে গাতী, বলদ, মহিষ, ঘোড়া এবং উট কৃষি জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. বলদ ও উট কখনও কখনও মালামাল ও যাত্রী বহনের কাজে লাগানো হয়; বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত উপমহাদেশসহ সমগ্র উন্নয়নশীল বিশ্বে গরুর গাড়ী একটা পরিচিত দৃশ্য বটে।

৩. কুয়ো থেকে পানি তুলতে এবং তেল উৎপাদনে তেলবীজ ভাসাতে বলদ ব্যবহার করা হয়।

৪. ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতে ধানের গাছ থেকে ধান এবং গমের শীষ থেকে গম আলাদা বা মাড়াই করতে বলদ ব্যবহার করা হয়।

৫. গবাদিপশুর মলমূত্র বিশেষত গরুর গোবর বিশ্বব্যাপী সার হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে গোবর একটা সাধারণ জুলানী।

৬. গুটিবসন্তরোধক চিকিৎসা হিসেবে গো-টিকা তৈরিতে বাচ্চুরকে ব্যবহার করা হত।

৭. গবাদিপশুর শিং চিরুনী, হাতল এবং সাজ-সজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

وَتَحِيلُ الْقَالَكُمْ إِلَى بَلْدٍ لَمْ تَكُونُوا بِلِفْيِهِ لَا يُشِّقُ الْأَنْفُسُ  
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

১৬ : ৭ এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

অতি আয়াতটি ৫নং আয়াতেরই চলমানতা বা সম্প্রসারিত রূপ যা মানুষের জন্য গবাদি পশুর উপকারিতা ব্যাখ্যা করে। মানুষ যখন পশুকে গৃহে পালন করা শিখে, ঠিক তখন থেকেই সে এ সকল জন্মকে এক স্থান/দেশ থেকে অন্য স্থান/দেশে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগিয়ে আসছে। কাজেই, আধুনিক পরিবহন পদ্ধতি যখন ছিল না, সে সময় গৃহপালিত পশুই ছিল একমাত্র পরিবহন মাধ্যম। এমনকি আজও উটই ভারবাহী জন্ম হিসেবে মরুবাসীদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। মধ্য এশিয়ার বল্কীয় উট এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার আরবী উট এখনও তাদের খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রশংসনীয় ক্ষমতার কারণে মরু অঞ্চলে যোগাযোগের বিশ্বস্ত মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। তাদেরকে যথার্থেই বলা হয়ে থাকে মরু জাহাজ। ঘোড়া, গাধা, খচর এবং হাতিকে একই কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে উঁচু নিচু এবং পার্বত্যাঞ্চলে। পোষা কুকুর এবং বলগা হরিণও জুতসই ভারবাহী পশু হিসেবে কাজ করে থাকে এবং এরা হিমশীতল মেরু অঞ্চলে কঠিন পরিবেশে পরিভ্রমণ করে। তিব্বতীয় চমরী গাই এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুভীয় মেষ হচ্ছে গৃহপালিত পশুর আরো দু'টো দৃষ্টান্ত যারা পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এ সকল এবং আরো অনেক গৃহপালিত পশু ছাড়া পরিবহনের ক্ষেত্রে, যেখানে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম পাওয়া যায় না, মানব জীবন শোচনীয় হয়ে পড়ত। একমাত্র আল্লাহর সীমাহীন কৃপা ও দয়ায়ই মানুষ তার জীবনমান উন্নয়নে আল্লাহর প্রদত্ত এই উপহার উপভোগ করছে।

○**وَالْخَيْلَ وَالْبَيْفَالُ وَالْحِمَيرُ لِرَزْكٍ بُهَا وَزِينَةٌ وَمَخْلُقٌ مَا لَأَنْتَ عَلَمُونَ**

১৬ : ৮ তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচর ও গর্দন এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।

১৬ : ৭ আয়াতে গৃহপালিত জন্মকে সাধারণভাবে ভারবাহী পশু হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে বিশেভাবে যে সকল পশুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : ঘোড়া, গাধা ও খচর যাদেরকে শুধু যে যানবাহন হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে তা নয়, বরং কিছু কিছু ভাল জাতের ঘোড়া তাদের সুদর্শন চেহারা, উজ্জ্বলতা ও দ্রুতির কারণে প্রদর্শনী এবং দৃশ্যাভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জন্মসমূহ যখন একমাত্র পরিবহন মাধ্যম ছিল তখন থেকে এ পর্যন্ত ভূমি, পানি ও আকাশপথে যোগাযোগের জন্য মানুষের উত্তীর্ণিত

যাস্ত্রিক কৌশলে চোখ ধাঁধানো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী, আণবিক শক্তিচালিত জাহাজ এবং সুপারসনিক মহাকাশযান যা শব্দ অপেক্ষা অধিকতর গতিসম্পন্ন। এগুলো আধুনিক পরিবহনের কয়েকটি মাত্র দ্রষ্টান্ত যা আধা শতাব্দী আগেও অজ্ঞাত ছিল। বর্তমান মহাকাশযুগে শুধু পৃথিবীতে নয়, পৃথিবীর বাইরে মহাকাশেও নিরাপদ, দ্রুত এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। মানুষের উত্তোলনী দক্ষতার দ্বারা ভবিষ্যতে আরো যে সকল উন্নয়ন ঘটবে তা আসলে সর্বজ্ঞত, সর্ববিজ্ঞ আল্লাহই সৃষ্টি হবে যার সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই।

○ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُوَالِي كُلَّ مُقْنَنٍ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسْبِّحُونَ

১৬ : ১০ তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উত্তি যাতে তোমরা পশ্চ চারণ করে থাক।

আসমান থেকে বৃষ্টিপাতের বিষয়টি ২ : ২২ ও ২ : ১৬৪ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ৬ : ৯৯ আয়াতের আলোচনায় গাছপালা শস্যফলাদির বৃদ্ধিতে বৃষ্টির উপকারী প্রভাবসমূহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান আয়াতটিতে জোর দেয়া হয়েছে চারণভূমির ব্যাপারে যাতে থাকে লতাগুল্মের আধিক্য যা পতিত জমিকে ঘাস, লতা-পাতায় ভরে তোলে এবং বিপুল সংখ্যক বীজ উৎপাদন করে। নির্দিষ্ট কিছু কিছু ঘাস ভালভাবেই এই শুণে ভূষিত এবং এদের কিছু কিছু আবার বর্ধনসাধক মাধ্যমে দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। ভেড়া, ছাগল, উট ও গরু মহিষসহ সকল চারণ জন্মেরই পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। আর চারণভূমির উপর প্রভাবটাই হলো যে, অধিকতর স্বাদু বা রুচিকর এবং পুষ্টিকর খাবারগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে রাখালরা তাদের জন্মগুলোকে সেদিকেই তাড়িয়ে নেয় যেদিকে সরবরাহ বর্তমান অর্থাৎ যুরোপের সুউচ্চ পার্বত্যাঞ্চলসমূহ, এবং তুরকের ইয়্যায়লাস (পার্বত্য চারণ ভূমি) রয়েছে। গৃহপালিত জন্মের খাবার পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের বসতি এলাকায় তথা আর্দ্র সমভূমি, মরুভূমি এলাকা, সমুদ্র সৈকত এবং পাহাড়ে বিশাল বিশাল প্রাকৃতিক তৃণভূমি সারাবিশ্বেই ছড়িয়ে আছে— যেমন ৪ : উত্তর আমেরিকার তৃণভূমি, দক্ষিণ আফ্রিকার নিষ্পাদপ স্যাভান্না প্রান্তের ইত্যাদি। এ সকল তৃণভূমি তাদের বিপুল বৃদ্ধির জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল।

॥ بِيُنْهَىٰ لِكُفُّارِ الْأَرْضِ وَالْمُرْسَلُونَ وَالْخَيْلَ وَالْأَغْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الْجَمَارَاتِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْلَةً لِقَوْمٍ يَتَفَهَّمُونَ ۝

১৬ : ১১ তিনি তোমাদের জন্য তার ধারা জ্ঞান শস্য, যায়তুন, খর্জুর, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্পদায়ের জন্য রয়েছে নির্দর্শন।

এ আয়াতটি হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর চলমানতা যাতে আমাদের পানির সরবরাহ এবং সবুজ গাছপালার বৃদ্ধিতে বৃষ্টিপাতের শুভ প্রভাব আলোচিত হয়েছে। বৃষ্টিপাতের অধিকতর শুভ ফল তথা সরবরকম ফলফলাদি যথা শস্যদানা, জলপাই, খেজুর এবং আঙুর উৎপাদনের বিষয়টি ৬ : ৯৯ আয়াতে সবিভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۴- وَسَخْرَىٰ كُبُرُ الْبَلَى وَالنَّهَارُۚ وَالثَّمَسُ وَالقَسْرُ وَالْجُوْفُ مُسْخَرُّ بِهَا مِرْءَةٌ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْلَةً لِقَوْمٍ يَتَفَهَّمُونَ ۝

১৬ : ১২ তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে, আর নক্ষত্রাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্পদায়ের জন্য রয়েছে নির্দর্শন।

দিন ও রাত, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজি থেকে মানুষ যে সকল উপকার পেয়ে থাকে তা ৬ : ৯৭, ৭ : ৫৪, ১০ : ৬৭ এবং ১৪ : ৩৩ আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যে সকল বিধানাবলি এসব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এরা আল্লাহর আদেশে যেসব সেবাদান করে তা বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য করে এবং এগুলো বস্তুতই তাদের জন্য ‘নির্দর্শনাবলি’ বটে।

۱۵- وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا كُلُّ أُوْلَئِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْلَةٌ  
لِقَوْمٍ يَتَدَكَّرُونَ ۝

১৬ : ১৩ এবং বিবিধ প্রকার বস্তুও যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নির্দর্শন সেই সম্পদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

চোখ ধাঁধানো বর্ণবৈচিত্র্যমণ্ডিত বিশাল প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শকের নিকট এক আনন্দের বিষয়। এই নামনিক আনন্দ ছাড়াও রঙ-এর ভৌতিক উপলক্ষি বস্তুত আল্লাহ'র যিকিরকারীগণের জন্য এক 'নির্দর্শন' স্বরূপ বটে। নিউটন সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এই উপলক্ষির ব্যাপারে প্রথম একটা বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নিউটন কাঁচের প্রিজমের সাহায্যে সাদা আলোকে এর সাতটি গঠন-উপাদানে বিভক্ত করে ছড়িয়ে দেন। এগুলো হচ্ছে : বেগুনী, আকাশী, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল (VIBGYOR)। নিউটনই ছিলেন সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী যিনি গুণগতভাবে ধারণা দেন যে, বাছাই প্রতিফলন ও শোষণের কারণেই প্রাকৃতিক বস্তুর বিভিন্ন রঙ দৃষ্টিগোচর হয়। এ সকল গুণগত পর্যবেক্ষণ পরবর্তীকালে একটি তলের সকল রঙের প্রতিফলন মাপার যন্ত্র স্পেক্ট্রোফটোমিটার উদ্ভাবনের পথ নিশ্চিত হয়।

বর্তমানে আমরা জানি যে, বাছাই প্রতিফলনের কারণে ধাতব বস্তুর তলীয় রং দেখা যায়। একই বস্তুসমূহ যেহেতু বাছাই শোষণ গুণসম্পন্ন সেহেতু তারা কোনকিছুর ভিত্তির দিয়ে প্রেরিত আলোতে বিভিন্ন রং প্রদর্শন করে। কাজেই, কোন বস্তুর রং নির্ভর করে আপত্তিত আলোর প্রকৃতির উপর। সকল রং প্রতিফলনকারী লিলিফুল সাদা আলোতে রাখলে সাদা দেখায়, লাল আলোতে রাখলে লাল দেখায়, নীল আলোতে রাখলে নীল দেখায় এবং সবুজ আলোতে রাখলে সবুজ দেখায়। নীল বস্তু যেহেতু নীল রং প্রতিফলিত করে, সেহেতু এটি নীল বা সাদা আলোতে রাখলে নীল দেখায়। কালো বস্তু কোন রং প্রতিফলিত করে না। এটি সকল রং শোষণ করে নেয় এবং সে কারণে কালো দেখায়।

ধাতব পদার্থের তুলনায় অস্বচ্ছ অধাতব পদার্থে দৃক-ব্যবস্থা কিংবা দেহ রং উপাদান অধিকতর জটিল। অধিকাংশ অস্বচ্ছ অধাতব পদার্থের রং ঐ পদার্থের অভ্যন্তরে আলোক ছড়িয়ে পড়া ও শোষণের সংযুক্তির কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ছড়িয়ে পড়ার সাথে আকাশে আলোক ছড়ানোর মিল রয়েছে। অধি আণুবীক্ষণিক কণা বায়ুমণ্ডলে বাছাইভাবে ছড়ায়। এটি Rayleigh-এর বিস্তার নামে পরিচিত যাতে ছড়িয়ে পড়া তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ক্ষমতা হিসেবে বিপরীতক্রমে পরিবর্তন হয়ে থাকে। নীল রং-এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল রং-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক বেশী হৈব। সূতরাং লালের তুলনায় নীল রং বেশী ছড়ায় হেতু আকাশ নীল দেখায়। সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তকালে সূর্য থেকে আগত আলো তার হৈব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য উপাদান হারিয়ে ফেলে, কেননা আলো সূর্য থেকে

বায়ুমণ্ডলে সুদীর্ঘ স্মষ্টি হয়ে আমাদের দিকে আসার পথে বাছাই পার্শ্বপথ ছড়ানোর ঘটনা ঘটে। কাজেই সূর্যের কাছাকাছি আকাশকে লাল দেখায়। এ ধরনের বাছাই ছড়ানো এবং শোষণই অস্বচ্ছ এবং অধাতব বস্তুর রং-এর কারণ। পৃথিবীর খনিজ পদার্থেরও রয়েছে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক রং। মনিমুক্তার মধ্যে যে চমক দেয়া রং দৃষ্টিগোচর হয় তাতে দৃশ্যমান বর্ণালীর বেগুণী থেকে গাঢ় লাল পর্যন্ত সবক'টি রংই রয়েছে। পান্না এবং পদ্মরাগমনির রংসমূহ সৃষ্টি হয় খনিজ পদার্থের মধ্য দিয়ে চলাচলকারী সাদা আলোর কিছু কিছু দৈর্ঘ্যের বাছাই ছড়ান ও শোষণের মধ্যে সংযুক্তির মাধ্যমে। রং আসে বাছাইভাবে ছড়ান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে। কিছু কিছু খাঁটি ক্ষারীয় হ্যালাইড স্ফটিক তথা সোডিয়াম ক্লোরাইড ( $\text{NaCl}$ ) ক্লোরাইড ( $\text{KCl}$ ) ইত্যাদি বর্ণালীর দৃশ্যমান অঞ্চল জুড়ে স্বচ্ছ। এ সকল স্ফটিক রঙিন করা যেতে পারে রং-কেন্দ্র সৃষ্টির মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে অপদ্রব্যাদি কিংবা দৃশ্যমান আলোক শোষণকারী স্ফটিকের ভিতরকার ফাঁকা স্থান। জীবজগতে পরিদৃষ্ট রংসমূহ অনেকটাই নান্দনিক আবেদন এবং উচ্চ বৈজ্ঞানিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে, জীবজগতের রঞ্জায়ন এবং জীবদেহে এর গুরুত্বের ভৌতিক ও রাসায়নিক ভিত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য রয়েছে। পালকের বা চুলের শুভ্রতার কারণ হলো সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ আপতন যা বায়ুমণ্ডল দ্বারা সৃষ্টিভাবে বিভক্ত গঠন উপাদানের পৃথকীকরণ থেকে উদ্ভৃত হয়ে থাকে, যেভাবে তুষার সাদা রং ধারণ করে।

নিঃসরণ কিংবা তলানী জমা পূর্ণরূপে ছড়ানোর কারণ হতে পারে যে কারণে সাদা রং প্রদত্ত হয় মাছের আঁইশে এবং নানান জাতের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীবর্গ, তীক্ষ্ণ কটকযুক্ত সামুদ্রিক শামুকজাতি, প্রোটোজোয়া ইত্যাদির কঙালের ক্যালসিয়াম কার্বনেটে। সাদা আলোর স্বীয় বর্ণালী গঠন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হওয়া সংঘটিত হয় প্রাণীর দেহ কাঠামোতে প্রধানত যখন আপত্তিত আলোকরশ্মি ভিতরে প্রবেশ করে এবং একটার পর একটা পাতলা স্তরবিশিষ্ট ফিলোর মধ্য দিয়ে পুনঃ প্রতিফলিত হয় যা বাধার সৃষ্টি করে, যেমন— অনেক প্রজাপতির পাখনার আঁইশে, মৌমাছির, ময়ূর এবং রাঙা পাখির পালক ইত্যাদিতে, সরীসৃপের বহিঃ তুকে, মুক্তার শুক্রিপূর্ণ বহিঃপৃষ্ঠে এবং শামুকের কঠিন আবরণে। সরাসরি সূর্যালোকে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীর চুলের উজ্জ্বল চমক দেখা যায় বাধাপ্রাণ রঙের কারণে যাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পালক দ্বারা আলোক নিজের ভাঙা ভাঙা উপাদানে প্রতিফলিত হয় এবং যা প্রতিটি আলাদা আলাদা চুলকে চারপাশে ঘিরে ফেলে। প্রাণীজগতে যে নীল রঙের প্রদর্শনী লক্ষ্য করা যায় (অর্থাৎ চোখের

নীল রঙ) বহু ক্ষেত্রে তার কারণে সূক্ষ্মভাবে বিচ্ছুরিত আঠালো ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিফলিত আলো ছড়ায়। প্রাণীদেহে এমন বিভিন্ন তত্ত্বের রঞ্জক পদার্থ রয়েছে যেগুলো আলোর অংশ বিশেষের বাছাই শোষণ এবং অক্ষেলিত অংশের প্রতিফলন কিংবা প্রেরণ দ্বারা বিভিন্ন রকম আলোক তৈরি করে। প্রাণীদের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণপরিচিতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে তথা : নাইট্রোজেনীয় রঞ্জক (অর্থাৎ ক্যারোটিনয়েডস, এনথ্রাকুইনান্স, ক্রোমোলিপয়েডস ইত্যাদি) এবং নাইট্রোজেনীয় রঞ্জক (অর্থাৎ রক্তের টেরাপাইরলিক রঞ্জক চামড়া, চুল ইত্যাদির ঘন মেলানিন ইত্যাদি)।

প্রাণীদের মধ্যে যে নানান রং-এর বাহার দেখা যায় তা অনুকৃতি নামে পরিচিত লুকানো পদ্ধতির কারণেই সম্ভব হয় যা প্রাণীদেরকে তাদের শক্তি কিংবা শিকারের কাছ থেকে নিজেদের আড়াল রাখতে সহায়ক। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের বনজঙ্গলে প্রত্যেক প্রকার গাছের কাণ্ডের রয়েছে বাদামী এবং লাল থেকে সাদা পর্যন্ত নিজস্ব বিচ্ছিন্ন বর্ণ। এ সকল রং-এর উপর আশ্রয়গ্রহণকারী পোকারা তাদের শক্তদের নিকট থেকে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখার জন্য তাদের আবাসের রং তৈরি করে নেয়। রঞ্জক অক্ষিপট এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে সূর্যরশ্মি থেকে নিরাপদ রাখে। সাদা পাখির পালক অথবা মানবদেহে সাদা রং তাপ বিকিরণ শুরুগতি করতে বুবই গুরুত্বপূর্ণ বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ার দেশগুলোতে তাপ সংরক্ষণে অপরিহার্য। অনুরূপভাবে, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে মানবদেহেও কৃষ্ণবর্ণ তাকে বাইরের প্রচণ্ড তাপ থেকে নিজ দেহকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। কিছু কিছু পুরুষ পাখি যেমন যয়ুর তার উজ্জ্বলতার রংকে যয়ুরীর সাথে তাব জমাতে কাজে লাগায়।

ক্রোরোফিল হচ্ছে মূলত তত্ত্বরঞ্জক যা অধিকাংশ উষ্ণিদকে সবুজ রং দান করে, আর এই রংই প্রকৃতিতে প্রভাবশালী। অন্যান্য উষ্ণিদ তত্ত্বরঞ্জকের ভূমিকা যেমন ক্যারোটিনয়েডস- যা হলুদ থেকে লাল রং দেয় এবং এনথোসিয়ানিনস- যা লাল ও নীলের নানারকম মাত্রা দেয়। ইতিমধ্যে ৬ : ৯৯ আয়াতের আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে। ফুলের উজ্জ্বল রং পরাগায়নকারী পোকা ও পাখিদের আকৃষ্ট করে যারা পরাগায়ন সম্পন্ন করে থাকে। পাকা ফলের বিভিন্ন রঙ পাখিদের আকৃষ্ট করে যা ফলের ছড়িয়ে পড়ায় সহায়ক হয়। ১,২,৩

বিশ্বয়ের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন জাতের মধ্যেও বিশেষত মানুষের মধ্যেও রং-এর বৈচিত্র্য আছে এমনকি যমজ শিশুর মধ্যেও। এ ধরনের রং

ବୈଚିତ୍ର୍ୟେର ରହସ୍ୟ ଲୁକିଯେ ରଯେଛେ ମେଇ ‘ଜିନ’-ଏର ଭିତର ଯା ଡି.ଏନ.ଏ (ଡିଆର୍ଜିରାଇବୋ ନିଉକ୍ଲାଇକ ଏସିଡ) ତଥା ଜୀବନେର ନୀଳ ନକ୍ଷାର ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ଆଲ୍ଲାହର ସୃଷ୍ଟ ବନ୍ତୁର ମଧ୍ୟେ ଖୁବ୍ ପାଓଯା ବର୍ଣ୍ଣବୈଚିତ୍ର୍ୟେର ଉଂସ ଏବଂ ଏ ସବେର ପ୍ରତିଟି ଯେ କାଜ କରେ ତା ଅନୁଧାବନେର ମଧ୍ୟେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟିଇ ‘ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ରଯେଛେ ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ଯାରା ଆଲ୍ଲାହର ଯିକିର କରେ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. P.J. Darrogh, A. J. Gaskin, and J. V. Saunders, *Scientific Americana*, April, 1976, p. 84.
2. *Encyclopaedia Britannica*, pp. 52-74.
3. G.B. Deodlhar, *Introduction to Optics*, Indian Press Private Ltd. 1957.
4. C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, 5th edition, Wily Eastern Ltd. New Delhi, 1977.

وَمُؤْلَدَنِي سَخَرَ الْمَغَرِبَ إِنَّا كُلُّنَا مِنْهُ لَحْيَانَا طَرِيْا وَتَسْكِرُجُوا مِنْهُ جَلِيْرَه  
تَلْبِسُونَهَا وَئِرَى الْفَلَكَ مَوَاضِعَ فِيهِ وَلَتَبَقُّو امْنٌ فَضْلِهِ  
وَلَعْلَمُ تَشْكِرُنَ ۝

১৬ : ১৪ তিনিই যিনি তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা থেকে নৃতন তাজা গোশ্ত আহরণ করে খেতে পার এবং তা থেকে সৌন্দর্য শোভার এমন সব জিনিস তোমরা বের করে নেবে যা তোমরা পরিধান কর। তোমরা দেখেছ যে, নৌকা, জাহাজ নদী-সমুদ্রের বুক বিদীর্ণ করে চলাচল করে। এসব কিছু এ জন্য যে, তোমরা তাঁর মহা অনুগ্রহ সঞ্চান করে নেবে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে।

এই আয়াতে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় :— (১) পানি তাজা গোশ্ত সরবরাহ করে; (২) মনিমুক্তা ইত্যাদি অলঙ্কার সমূহ আহরণ করা হয়; এবং (৩) সমুদ্রের জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদির সাহায্যে মানুষের কল্যাণ লাভ হয়।

এর তৃতীয় অংশটুকু ২ : ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সাগর ও মহাসাগর পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭১% ভাগ দখল করে রয়েছে এবং এটা পৃথিবীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই পানি এবং নদী, নালা, হৃদ ইত্যাদি, বরফ ও মাটির নীচের ভূগর্ভস্থ পানিসহ সবগুলোকে বলা হয় পৃথিবীর hydrosphere,<sup>১</sup> বা ‘পানিবৃত্ত’। বর্তমানে সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ করে বছরে প্রায় ৬,০০,০০,০০০ (৬ কোটি) টন খাদ্য অর্জিত হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে সমুদ্রের খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষমতা এর বহু শত গুণ বেশী। যে পদ্ধতিতে সমুদ্র থেকে খাদ্য আহরণ করা হয় তা ক্রটিপূর্ণ এবং মানুষ যেহেতু মাত্র কয়েক প্রকার মাছ থেকে পছন্দ করে তাই এই পদ্ধতি আরও বেশী ক্রটিপূর্ণ। সমুদ্রের সব রকম মাছ থেকে আমিষ সংগ্রহ করা হলে এই অপর্যাঙ্গতার হাস হবে। এই সংগ্রহীত আমিষ (protein) সংরক্ষণ ও বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের সুব্যবস্থা হলে অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। এক পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে যে মাছ থেকে মানুষের দৈনিক আমিষের প্রয়োজন মিটাতে মাথাপিছু মাত্র এক পেনি খরচ হবে। আর সমুদ্র থেকে বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টন খাদ্য আহরণ সম্ভব<sup>২</sup>।

বৈজ্ঞানিকদের মতে— সমুদ্রের খাদ্য উৎপাদন প্রণালী নিম্নরূপ : সমুদ্রের সমস্ত জীবের জীবন সূর্যতাপের উপর নির্ভরশীল যা সরাসরি অতি সূক্ষ্ম ভাসমান জীবাণু (phytoplankton) কর্তৃক খাদ্য পরিণত হয়। এই phytoplanktonকে সমুদ্রের অতিক্ষুদ্র প্রাণীসমূহ খাদ্য হিসাবে খেয়ে ফেলে

ଏବଂ ଏଇ ଜୀବାଣୁଗୁରୁଲୋ ସମୁଦ୍ରେର ସନ୍ତୁରଣଶୀଳ ଏକ ଧରନେର ଜୀବେର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରେ ଥାକେ । ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ତଳାନି ଓ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାନିର ନୀଚେ ଅବଶ୍ଵିତ ପ୍ରାଣୀଗୁରୁଲୋର ଖାଦ୍ୟ ସରବରାହ କରେ । ଆର ସମୁଦ୍ର କିନାରେର ପ୍ରାଣୀଗୁରୁଲୋର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାଗେର ପ୍ରବହମାନ ନିକାଶନେର ମଧ୍ୟେ ପାଓୟା ଯାଇ । ସମୁଦ୍ର ପାଡ଼େର ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ପଚନ ଥେକେ phytoplankton ଏର ଖାଦ୍ୟ ସରବରାହ ହୁଯେ ଥାକେ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେର ମାଛ ଛାଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ରକମେର ଝିନୁକ ଓ ଶୁକ୍ତି, ଶାମୁକ ଓ ଅମେରଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ଖାଦ୍ୟ । ରୋମକଦେର ଆମଳ ଥେକେ ଏଗୁଲୋର ଚାମ ହୁଯେ ଆସିଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଥେକେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏସବ ସଂଘର୍ଷିତ ହୁଯେ ଥାକେ ।

ଉପରେର ଆଯାତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଲଙ୍କାର ବଲତେ ସମୁଦ୍ରେର ମୁକ୍ତା ଓ ପ୍ରବାଲକେ ବୁଝାଯ । ମୁକ୍ତା ଦୁଇ ଢାକନା ବିଶିଷ୍ଟ ଝିନୁକସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁକ୍ତିତେ ତୈରି ହୁଯ । ମୁକ୍ତା ତୈରି ସନ୍ଧମ ଝିନୁକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏଗୁଲୋ ସାଧାରଣତ ଟୀଷ୍‌ଟ ଉଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ରେର ପାନିତେ ପାଓୟା ଯାଇ । ଆର ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଶାମୁକ-ଝିନୁକ ଶୀତଳ ପାନିତେ ପାଓୟା ଯାଇ । ଝିନୁକେର ଶରୀରେ ପ୍ରବେଶକୃତ ବାଇରେ କୋନ ବସ୍ତୁର ଶ୍ଫତି ଥେକେ ରକ୍ଷାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଯ ମୁକ୍ତା ତୈରି ହୁଯ । ବାଇରେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁରୁଲୋ କୋନ ପରଜୀବୀ ବା ପାଥର କଣା ହତେ ପାରେ । ପ୍ରଥମେ ଏକଟି ନରମ ପରଦା ଏଇସବ ବସ୍ତୁକେ ଆବୃତ କରେ ଫେଲେ ପରେ ପରତେ ପରତେ ମୁକ୍ତାର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ଜୟା ହତେ ଥାକେ । ମୁକ୍ତାର ଶୁକ୍ତି ସକଳ ଉଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ସମୁଦ୍ରେ ପାଓୟା ଯାଇ ଏବଂ ମୁକ୍ତାର ପ୍ରାଚୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଛିଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା । ମିସିସିପି ନଦୀତେଣ ମୁକ୍ତା ଉଷ୍ଣପନ୍ଥକାରୀ ଶୁକ୍ତି ପାଓୟା ଯାଇ । ଏହି ମିଠା ପାନିର ମୁକ୍ତା ଅତି କୁଦ୍ର ଏବଂ କ୍ରତିଯୁକ୍ତ ହୁଯେ ଥାକେ ।

ପ୍ରଜନ୍ମର ପର ପ୍ରଜନ୍ମ ଧରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନାବିକ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ସମୁଦ୍ରେର ନୀଚେ ପ୍ରବାଲ ତୈରିର ରହସ୍ୟ ବୁଝାତେ ପାରେ ନି । ଏଗୁଲୋ ବିଶ୍ଵେର କିଛୁଟା ଉଷ୍ଣମନ୍ଦିରୀ ଏଲାକାର ସମୁଦ୍ର coral ଜାତୀୟ ଏକ ରକମ ପ୍ରାଣୀର କଙ୍କାଳ ଥେକେ ସୃଷ୍ଟି । ଏଇ କଙ୍ଗାଳଗୁରୁତ୍ବ ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଶକ୍ତ ପ୍ରବାଲ ଥେକେ ଅଲଙ୍କାର ତୈରି କରା ହୁଯ । ସବଚେଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରବାଲ ହଲ Red coral ବା corallium rubrum, ଯା ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାସାଗରେ ପାଓୟା ଯାଇ ।

ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାମୁକ ଓ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ concs, volutes, murex shells, scallops, ଏବଂ Owties ବା କଡ଼ି । ୨ କଡ଼ି ତାର ଚକ୍ରକେ ପିଠେର ଜଳ୍ୟ ବିଦ୍ୟାତ । ଏଦେର ପାର୍ଶ୍ଵ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଥ୍ୟେର । ଏସବାବ ଅଲଙ୍କାର ହିସେବେ ବ୍ୟବହରିତ ହୁଯ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର ୫

1. Encyclopaedia Britannica, Vol. 13, pp. 482, 409, 501.
2. R.T. Abbott, Encyclopaedia Americana, Vol. 24, pp 691-93.

١٥- وَالْقُلُّ فِي الْأَرْضِ رَوَابِعٌ أَنْ تَمْيِيدَ كُفَّرٍ وَأَنْهُرًا وَسَهْلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১৬ : ১৫ তিনি যমীনের পর্বতের নোঙরসমূহ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন যেন সে তোমাদের সহ দুলতে না পারে। তিনি নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং বাভাবিক পথও বানিয়েছেন যেন তোমরা হিদায়াত পেতে পার।

এই বিষয়টি ১৩ : ৩ আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

١٦- وَعَلِمْتَ وَبِالْتَّجْزِيَةِ هُنْ يَهْتَدُونَ ۝

১৬ : ১৬ যিনি বহু নির্দশন (যমীনে) স্থাপন করেছেন (মানুষের পথ দেখাবার জন্য) আর তারকার সাহায্যেও মানুষ পথের সঙ্কান পায়।

এ বিষয়টি ৬-৯৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

١٧- وَإِنْ تَعْذُّلُوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَوْ مُتَحْصُّنُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৬ : ১৮ তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তবে তা কখনও পারবে না, তবে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

এ বিষয়ে ১ : ১৪ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

١٨- إِنَّمَا تَوَلَّنَا إِثْمُكُمْ إِذَاً أَرْدَفْتُمْ أَنْ تَقُولُنَّ لَهُ كُنْ فَكَيْكُونُ ۝

১৬ : ৪০ কোন জিনিসকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে আমাদের জন্য এ ছাড়া আর কিছুই বলতে হয় না যে, হয়ে যাও আর অমনি তা হয়ে যায়।

এই মহাবিশ্ব আদিযুগীয় এক শক্তিপুঞ্জের প্রচও বিক্ষেপণের ফল, যা অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত এবং অতি ক্ষুদ্র ছিল। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যই কুরআনের দাবী ‘হও’ বললে ‘হয়ে যায়’ কথার প্রমাণ। এ বিষয়ে পরিশিষ্ট-২ এ হস্তানচনা করা হয়েছে। একথাও মনে রাখতে হবে যে কোন সৃষ্টির বেলায় মহ... গোহ ‘হও’ বললে তার সৃষ্টি শুরু হয় এবং আল্লাহরই নির্ধারিত নিয়মে ও সময়ে তা সংষ্টিত হয়।

এখানে আমরা বলার কারণ যে সকল ক্ষমতার অধিকারীকে বছক্তন বলাই নিয়ম।

১৫-۴۸-**أَوْلَئِكُمْ قَوْالِيٌّ مَا خَلَقَنِي اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالشَّمَاخِ  
وَهُمْ لَا يُحِرْفُونَ**

১৬ : ৪৮ ওরা কী লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্টি বস্তুর প্রতি, যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদা বনত হয়?

জীবন্ত বা জড়বস্তুর ছায়া পর্যন্ত যে আল্লাহ নির্ধারিত বিধান ও নিয়মের অনুসারী তা সূরা ১৩ : ১৫-তে বর্ণিত হয়েছে। ছায়ার বিপরীতমুখী দিক পরিবর্তন দৃশ্যত সূর্যের গতির কারণে হয়ে থাকে। ছায়ার এই দিক পরিবর্তনের গতির একটা নির্দিষ্ট বিন্যাসকে কৌশলে সূর্য ঘড়িতে সময় ও মৌসুম নির্ণয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। এমনিভাবে ছায়াও স্রষ্টার বিধান সাপেক্ষ। আর ছায়ার এই আনুগত্য স্রষ্টার উদ্দেশ্যে ছায়ার প্রচল্য সিজদা বিশেষ।

১৫-۴۹-**وَلَمْ يَهْمُدْ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ**

১৬ : ৪৯-৫০-**۵-يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فُوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ**

১৬ : ৪৯-৫০ আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীব জন্ম আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশতাগণও; তারা অহঙ্কার করে না। তারা ডয় করে তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের প্রতিপালককে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে।

৭ : ৫৪ আয়াত ও পরিশিষ্ট ৪-এর আওতায় সকল জীবন্ত বা জড়বস্তু স্রষ্টা নির্ধারিত বিধিবিধান সাপেক্ষ এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সকল জীবন্ত বা জড় বস্তু স্রষ্টা নির্ধারিত বিধিবিধান অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে স্রষ্টার প্রতি তাদের শুন্দা নিবেদন করে থাকে।

○-٥- وَلَمَّا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبِرْ أَفْغَيْرَ اللَّهِ يَتَعَقَّنُونَ

১৬ : ৫২ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তারই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তারই প্রাপ্য। তোমরা কি আল্লাহু ব্যতীত অপরকে ডয় করবে?

আকাশ থেকে নিচে ধরণীতে বৃষ্টিপাত ও ‘মৃত’ মৃত্তিকায় আকাশ থেকে ঝরানো বৃষ্টি দিয়ে ঐ মৃত্তিকায় প্রাণ পুনঃসঞ্চারের বিষয়টি ইতিমধ্যেই ২ : ১৬৪ আয়াতের আওতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

○-٦- وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا شَاءَ فَلَخَيْأَهُ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا أَنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْ  
لَقَوْمٍ لَمْ يَسْعُنَ

১৬ : ৬৫ আল্লাহু আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা তিনি ভূমিকে এর মৃত্যুর পর পুরুজ্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে নির্দেশন রয়েছে, যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য।

আকাশ থেকে বারিবর্ষণ ও মৃত্তিকা তথা ধরণীর ‘মৃত্যুর’ পর এতে বারিপাতের মাধ্যমে পুনঃপ্রাণসঞ্চারের বিষয়টি ইতিমধ্যে আয়াত ২ : ১৬৪-এর আওতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

○-٧- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً لَنْ تَنِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرِثَّ وَدَوْرِ  
لَبَّا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّرِبِ بَيْنِ

১৬ : ৬৬ অবশ্যই গবাদি পশুর মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে।

তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুঃখ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

এই আয়াতে আল্লাহ গবাদি পশু থেকে আমাদের খাদ্য হিসেবে দুধ প্রদানের রহমতের বিষয় বর্ণনা করেছেন। সকল মানব শিশু শিশুকালে তাদের পুষ্টি আহরণ করে থাকে মায়ের বুকের দুধ থেকে। পরবর্তীকালে তাদের জন্য পুষ্টির জোগান আসে গবাদি পশুর দুধ থেকে।

ଦୁଧ ସକଳ ଶନ୍ତ୍ୟପାରୀ ପ୍ରାଣୀର ଜନ୍ମେର ପର ବେଶ କିଛୁକାଲେର ଜନ୍ୟ ସ୍ଵାଭାବିକ ଥାଏଁ । ଦୁଧ ମାନୁଷେର ପୁଣିର ଜନ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ସବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏଁ । ଦୁଧେ ରଯେଛେ ଉଚ୍ଚମାନେର ପ୍ରାଣୀଜ ଆମିଷ, କ୍ୟାଲସିଯାମ (ଅନ୍ତିମ ଓ ଦାଁତ ଗଠନେର ଜନ୍ୟ ଜରୁରୀ) ଏବଂ ନାନା ଭିଟାମିନ ଯେମନ, ଭିଟାମିନ ଏ, ଥାୟାମିନ, ରିବୋଫ୍ଲ୍ୟୁଭିନ, ଭିଟାମିନ 'ସି' ଓ 'ଡ଼ି' ରଯେଛେ । କାଁଚା ଦୁଧେର ପ୍ରତି ୧୦୦ ମିଲିଲିଟାର ପରିମାଣ ଥିଲେ ୬୭ କ୍ୟାଲୋରି ପାଓୟା ଯାଏ । ଏହି ପରିମାଣ ଦୁଧେ ସାଧାରଣତ ୮୭% ପାନି, ୩.୩% ଆମିଷ (ପ୍ରୋଟିନ), ୩୬% ଶ୍ରେଷ୍ଠଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ୪.୭% ଶ୍ରେଷ୍ଠସାର ବା ଶର୍କରା ଓ ୦.୧୨% କ୍ୟାଲସିଯାମ ଥାକେ । ଦୁଧ ତାପ ପେଲେ ତା ଥିଲେ କେବଳ ଭିଟାମିନ ସି ଓ ଥାୟାମିନ ନାହିଁ ହୁଏ ତବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଟାମିନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥାକେ ।

ପ୍ରାତିମନ୍ୟ ଦେହକଳା ବିନ୍ୟାସ ଶତ ଥିଲେ ଦୁଧ ଉତ୍ସବଦିତ ହୁଏ । ଶତରେ ତତ୍ତ୍ଵମୟ ଦେହକଳା ଲତିଗୁଲୋକେ ମେଦମୟ ଦେହକଳାର ସାଥେ ସଂୟୁକ୍ତ କରେ । ଶତରେ ପ୍ରାତିମନ୍ୟ ଅଂଶଟି (ବାଂଟ) ଅନେକ ଲତି ଦିଲେ ଗଠିତ । ଏ ଗୁଲୋତେ ରଯେଛେ ବହୁ ଲତିକାର ସମାବେଶ ସେଗୁଲୋ ଆନ୍ତରକଳା, ରଙ୍ଗବାହୀ ନାଲି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଗଠିତ । ପ୍ରତିଟି ଲତିକାଯ ରଯେଛେ ଗୋଲାକାର ଏକଞ୍ଚଳ ବାୟସ୍ତଳୀ ଯା ଦୁଃଖୋପାଦକ ନାଲିର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଶାଖାଗୁଲୋର ଦିଲେ ଉନ୍ନତ । ଏହି ଦୁଃଖୋପାଦି ଶାଖାଗୁଲୋ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ ଏକେକଟି ଦୁଃଖ ଉତ୍ସବଦକ ନାଲି ହିସେବେ ଗଠିତ ହୁଏ ଯା ପ୍ରାତିର ଏକଟି ଲତି ଥିଲେ ବେରିଯେ ଆସେ । ଆର ଏହି ସବ ନାଲି ଦିଲେଇ ଦୁଧ ବାଂଟେ ପୌଛାଯ ।

ଶ୍ରୀଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶତରେ ଗଠନ ଓ ବିକାଶେ ଐ ପ୍ରାଣୀ ବା ପଞ୍ଚର ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ନାନା ଧରନେର ତାରତମ୍ୟ ଘଟେ । ଜନ୍ମେର ସମୟ ଶ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶତରେ ଗଠନ ଶତରେ ଗଠନ ଦୁଃଖୋପାଦି ନାଲି ଥାକିଲେ ଓ କୋଣୋ ବାୟସ୍ତଳିକା ଥାକେ ନା । ବୟଃସନ୍ଧିକାଳେ ଡିହିକୋଷେର ଇନ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନେର ପ୍ରଭାବେ ନାଲିଗୁଲୋର ଶାଖା ବିଭାଗ ଘଟେ ଓ ନାଲିଗୁଲୋର ପ୍ରାତିଦିନେ ବହୁକୋଣବିଶିଷ୍ଟ, ଦାନାବନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର, ଶକ୍ତ ବଲଯ ବା ଗୋଲାକାର କୋଷ ଗଠିତ ହୁଏ ଯା ପରବର୍ତ୍ତିକାଳେ ବାୟସ୍ତଳୀତେ ପରିଣିତ ହୁଏ । ଗର୍ଭକାଳେ ନାଲିଗୁଲୋର ଲକ୍ଷଣୀୟ ଶାଖା ବିଭାଗ ଘଟେ ଏବଂ ଗର୍ଭତ୍ସନ୍ତ ଶାବକେର ଆଚ୍ଛାଦନୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଓ ପ୍ରଜେଟେରନ ହରମୋନେର ପ୍ରଭାବେ ବାୟସ୍ତଳୀ ଓ ନଲିକା ଗହର ଥିଲେ ନଲିକା ଅବଧି ନାଲି ଗଠିତ ହୁଏ । ମେଦ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠଜାତୀୟ ଦେହକଳା ଏବଂ ଶତ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାହ ବେଢ଼େ ଯାଏ । ସୁବିନ୍ୟାସ ବାୟସ୍ତଳୀଗୁଲୋ ଥିଲେ କୋଷମୂହେର କ୍ଷରଣ ତୃପରତା ଗର୍ଭର ଶେଷ ମେଯାଦେର ଦିଲେ ବେଢ଼େ ଯାଏ । ଶାବକ ପ୍ରସବେର ପର ଏଭାବେ ପ୍ରଥମ ଯେ ଦୁଧେର ନିଃସରଣ ହୁଏ ଥାକେ ତାକେ ଶାଲ ଦୁଧ ବଲେ । ପ୍ରକୃତ ଦୁଧେର ନିଃସରଣ ଶୁରୁ ହୁଏ ପ୍ରସବେର କଯେକଦିନ ପର ଥିଲେ । ଆର ଏହି ଘଟେ ଇନ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଓ ପ୍ରଜେଟେରନେର କମ ମାତ୍ରାର କାରଣେ । ଏହି ଦୁଇ ହରମୋନେର ମାତ୍ରା କମାର ସାଥେ ସାଥେଇ ପାଇଁ ପିଟିଉଟାରି ପ୍ରାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲତିକା ଥିଲେ ଦୁଧ କ୍ଷରଣ ଶୁରୁ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରାତିର ଦୁଧ ନିଃସରଣକେବେଳେ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଥାକେ ।

গবাদি পশুসহ সকল শন্যপারী প্রাণীর ম্যামাৰি গ্ল্যান্ড বা স্তনঘাস্তি দুধ উৎপাদনে সক্ষম। এই দুধ বায়ুস্থলী কোষ থেকে নিঃসরিত হয়। আৱ এই প্রতিগুলোৰ জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি আসে রক্ত থেকে। রক্তপ্রবাহ আসে বক্ষ, অন্তর্বক্ষ পঞ্জরাস্থি অঞ্চলেৰ ধৰণী থেকে। দুধেৰ উপাদানগুলো স্তনে প্ৰবাহিত রক্ত থেকে পাওয়া যায়। এভাবে গবাদি পশুৰ দুধে রয়েছে তাদেৱ খাদ্য- খড়ি বিচালি থেকে প্রাণ উপাদানসমূহেৰ সমাবেশ। খাদ্য গ্ৰহণ ও তা পৱিপাকেৰ পৰ খাদ্যেৰ অব্যবহৃত অংশ বৰ্জ্য বা মল-মৃত্ত (গোৱৰ-চোনা) হিসেবে বেৱিয়ে যায়। খাদ্য থেকে বিশেষিত উপাদানগুলো রক্তে প্ৰবেশ কৱে ও শেষাবধি হৃৎপিণ্ডে পৌছায়। বায় নিলয় থেকে রক্ত অক্সিজেন দারা পৱিপুক্ত বা যিন্তিত হয়ে বিশেষিত পুষ্টি উপাদানসহ দেহেৰ বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়। এভাবে পুষ্টি উপাদানগুলো স্তনঘাস্তিতে পৌছে যায়। সেখানে বায়ুস্থলী কোষগুলো দুধ উৎপাদনেৰ জন্য উকুত্পূর্ণ উপাদানগুলো রেখে দেয়। রক্ত প্ৰবাহিত হয় শিৰাপ্ৰশালাতে ও এমনি কৱে তা আৱাৰ হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। গোটা চিত্র পৰ্যালোচনা কৱলে দেখা যাবে কুৰআনে যেভাবে বৰ্ণিত আছে সে তাৰে বৰ্জ্য (গোৱৰ) ও রক্তেৰ মধ্য থেকে দুধ তৈৰি হয়ে থাকে। স্তনঘাস্তিসমূহ থেকে উৎপাদিত এই দুধ এক বিশ্বাকৰ বস্তু। এই কোনো প্রাণীৰ দুধই হোক না কেন, তা মানবশিশু থেকে পশুপাখিৰ শাবক সকলেৰ ব্যাপার্থ প্ৰয়োজন ছেটানোৰ জন্য নিখুঁত কৱেই তৈৰি। যেমন, দ্রষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, গৱৰ দুধে মানব মাতার দুধেৰ ২ তুলনায় দ্বিগুণ আমিষ (প্ৰোটিন), চার গুণ ক্যালসিয়াম ও পাঁচগুণ ফসফেল রয়েছে।

দুধ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া এক বিশ্বাকৰ রাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰাপ্ৰবাহ মানুষেৰ এ পৰ্যন্ত জানা মতে অন্যতম সবচেয়ে জটিল প্ৰক্ৰিয়া বিশেষ। হিসেবে কৱে দেখা গেছে যে, এক আউস দুধ<sup>২</sup> তৈৰিৰ জন্য আনুমানিক ৪০০ আউস রক্ত স্তনে প্ৰবাহিত হওয়াৰ প্ৰয়োজন পড়ে। অবশ্য, রক্তেৰ উপাদানগুলো দুধেৰ উপাদানেৰ তুলনায় একেবাৰেই আলাদা অৰ্থাৎ রক্তেৰ অ্যামিনো অ্যাসিড দুধেৰ জটিল প্ৰোটিন বিন্যাস থেকে একান্ত ভিন্ন। রক্তে গুকোজ বা শৰ্কৰা দুধেৰ শৰ্কৰা তথা ল্যাকটোজ থেকে অনেকখানি ভিন্ন প্ৰকৃতিৰ। আৱ রক্তেৰ স্নেহাঙ্গ বা ফ্যাটি অ্যাসিড দুধেৰ স্নেহজাতীয় পদাৰ্থ থেকে একেবাৰেই ভিন্ন।

### তথ্যসূত্র :

1. W.A.R. Thompson, Black's Medical Dictionary, 33rd edn., Adams and Charles Black, London. P. 598, 1981.
2. J.D. Katchiffe. Reader's Digest Book of the Human Body, The Reader's Digest Association Ltd. London, 1964. p. 367.

٦- وَمِنْ شَرِّ إِعْنَابٍ تَتَحَذَّرُ مِنْهُ سَكِّرًا وَرُمْبَقًا حَسَنًا  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

১৬ : ৬৭ এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙুর হতে তোমরা মাদক পানীয় ও উভয় খাদ্য গ্রহণ করে থাক; এতে অবশ্যই বোধগতিসম্পন্ন মানুষের জন্য রয়েছে নির্দশন।

খেজুর ও আঙুর- এই দুটি ফল যেগুলির বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা আরবদের উভয় পুষ্টি যোগাতো।

খেজুর গাছ (ফিনিস্ক ড্যাকটাইলিফেরা) তালজাতীয় (পাম) প্রজাতির গাছ। খেজুর গাছ উষ্ণ ও উষ্ণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জন্মায়। তালজাতীয় যতো প্রজাতির গাছ আছে সেগুলোর মধ্যে উপকারিতার দিক থেকে একমাত্র নারকেলের পরেই খেজুর গাছের স্থান।

খেজুর গাছ উভয় আফ্রিকা ও আরব অঞ্চলের দেশজ। আনুমানিক চার হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলে খেজুর গাছ জন্মায়। খেজুর ফল লম্বা কাঁদির ছড়ায় গুচ্ছাকারে ঝুলে থাকে। খেজুর সুমিষ্ট, এর পুষ্টিকর শাঁস একটি খাঁজ কাটা শক্ত আঁটির চারধারে লেগে থাকে। ১০-১৫ বছর বয়সী খেজুর গাছে ফল আসে ও আর এই ফলন ১০০ থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। খেজুর পশ্চিম এশিয়া ও উভয় আফ্রিকার অঞ্চলবিশেষের অধিবাসীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে খেজুর ছিল আরবদের প্রধান খাদ্য। স্পেনীয়রা প্রথমবারের মতো খেজুর গাছ আমেরিকা তথা নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যায়। খেজুরের পুষ্টিমূল্য সম্পর্কে আয়ত ৬ : ৯৯-এর আওতায় আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও আমাদের উপমহাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে খেজুর গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতের খেজুর ভারতীয় খেজুর বলে পরিচিত। অবশ্য এই জাতের খেজুরে তেমন শাঁস বা খাদ্যবস্তু থাকে না। তবে এই সব খেজুর গাছের কাণ্ডের ওপরের দিকে চেঁচে ও কেটে পরিষ্কার করে এক ধরনের সুমিষ্ট তরল রস পাওয়া যায়। খেজুর গাছ থেকে এই রস টপ টপ করে ফেঁটার আকারে পড়ে এবং খেজুর গাছের সাথে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা মাটির পাত্রে এই রস সংগ্রহ করা হয়। এই রস অত্যন্ত মিষ্টি ও সজীবকারক পানীয়। তাপে জ্বাল দিয়ে এই রস থেকে শুড় তৈরি করা হয়।

দ্রাক্ষাকুণ্ড (ভাইটিস ভিনিফেরা) বা আঙ্গুর গাছ আসলে লতিয়ে ওঠা একজাতীয় উক্তিদ। এ থেকে আঙ্গুর পাওয়া যায়। আঙ্গুরের চাষ করা হয় পৃথিবীর উত্তরভাগের গোটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল জুড়ে। আরবের মুন্দুরানগুলোতেও দ্রাক্ষা চাষ হয়ে থাকে। মানুষ যতোকিছু উক্তিদের বাগান গড়েছে সবচেয়ে গোড়ার দিকে সেগুলোর মধ্যে দ্রাক্ষাবাগিচা মানুষের অন্যতম প্রথম প্রয়াস। মানবেতিহাসের অনেক গোড়া থেকেই২ তোজনকালে মূল তোজের সাথে ফল, কিশমিশ, মনকা ও মদ হিসেবে পরিবেশনার কথা সুপরিজ্ঞাত।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, খেজুর ও আঙ্গুর ফল পুষ্টিদায়ক খাদ্য ও পানীয়। আরবী শব্দ **سَكَر** (সাকর) এই আয়াতে মাদক পানীয় বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের পানীয় খাবীরায়ন প্রক্রিয়ায় খেজুর ও আঙ্গুর থেকে তৈরি করা হতো। অবশ্য আরবীয়রা ‘নাবিজ’ (نَبِيْজ) নামে অভিহিত সুরামুক্ত এক ধরণের পানীয় খেজুর থেকে তৈরি করে। খেজুর কয়েকদিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে এই পানীয় তৈরি করা হতো। পাকা আঙ্গুর, শুকনো তথা কিশমিশ ও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কুরআনের এই আয়াতটি মহানবীর (সা) মদিনায় হিজরতের পরে ও মাদকপানীয় নিষিদ্ধ করার আগে নায়িল হয়। অবশ্য আল্লাহ এই দুটি ফল সম্পর্কে উক্ত তথ্যাদি দান করেছেন। আঙ্গুরের রসে রয়েছে গুকোজ যা পরিপাকক্রিয়া ছাড়াই সরাসরি রক্তে বিশেষিত হয়। তাই আঙ্গুরের রস পৃষ্ঠি উপাদানের শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ উৎস। খেজুর থেকে তৈরি নাবিজও পুষ্টিকর পানীয়। তবে আঙ্গুর সুরা তৈরির সর্বোত্তম উপকরণ। সূরা ২ : ২১৯ আয়াতের আওতায় সুরার ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিক্রিয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

### তথ্যসূত্র :

1. U.P. Hendrick, Date Palm, Collier's Encyclopaedia, 6, Vol. P.F. Collier and Sons Co., New York, 1956, pp. 290-91.
2. U.P. Hendrick, Grapes, Collier's Encyclopaedia, Vol.9, 1956, p.265.

وَأَذْخِرْنَاهُ إِلَى النَّحْيِ أَنَّ الْجَنَّى مِنْ أَنْجَنِيَّا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَا يَرَشُونَ<sup>٦٨</sup>  
 ۱۹- تَمَّ كُلُّ مِنْ كُلِّ الشَّرْتِ فَإِنَّكِنْ سُبْلَ رَهْبَتْ دُلَّا<sup>٦٩</sup>  
 يَمْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ  
 أَنْ فِي ذَلِكَ لَذَّةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَلَّزُونَ<sup>٧٠</sup>

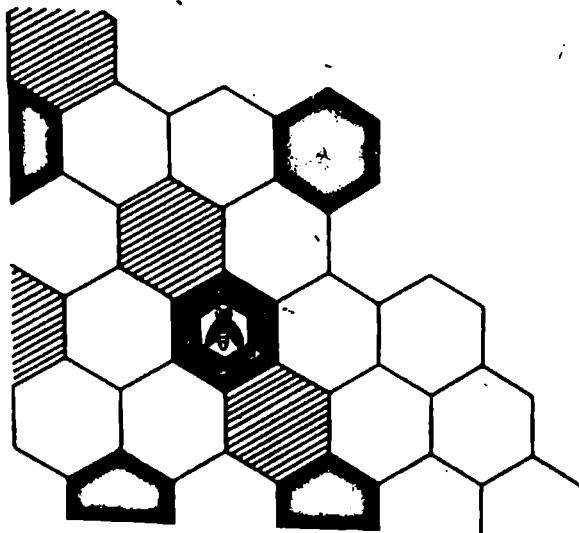
১৬ : ৬৮-৬৯ তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকুলকে পাহাড়, গাছপালা ও মানব বসতিতে তাদের মধুচক্রের কোষ নির্মাণের ও এরপর (মাটিতে) উৎপন্ন সকল কিছু হতে (আহার) এহণ করতে এবং অতঃপর (তোমার) প্রতিপালকের পথ অনুসরণ করতে প্রেরণা দিয়েছেন যে পথ তিনি নির্ণয়যোগ্য করেছেন। তাদের উদ্দর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণময় পানীয় যার মাঝে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নির্দশন চিষ্টাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

এই দুই আয়াতে অল্প কিছু শব্দের পরিসরে মধুর মতো সবচেয়ে নন্দিত ধরনের তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। প্রথমত যে প্রেরণায় উপযুক্ত পরিবেশে মধুর চাক গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। এরপর মৌমাছিদের মধুর উপাদানের উৎস ও কীভাবে মৌমাছিরা তাদের খাদ্যের জন্য মধুর উপাদানের সঙ্কান করে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, মৌমাছির উদ্দর থেকে উৎপাদিত নানা বিচ্চিত্র বর্ণের মধু উৎপাদনে প্রকৃতির কী রহস্য ও বিশ্বায় লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হচ্ছে। যা মানুষের নানা রোগের মহোষধন্বরণ।

### মধুর চাক তৈরি

মৌমাছিকুলের আবাসস্থল মধুর চাকের সামাজিক গঠন বা নির্মিতি অত্যন্ত সুগঠিত। মধুর প্রতিটি চাকে একটি করে রাণী মৌমাছি ও কিছু পুরুষ মৌমাছি থাকে। আর থাকে অসংখ্য অপরিপূর্ণ বিকশিত স্ত্রী মৌমাছি বা শ্রমিক মৌমাছি। বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী মৌমাছির চাকের মধ্যে বড়ো রকমের তারতম্য হয়ে থাকে। কোনো মৌচাক গড়া হয় প্রক্ষিণ ও ঝুলন্ত শিলা বা গাছের ডাল, গাছের শুঁড়ির ফাঁকা খোলের মধ্যে, বিভিন্ন ভবনের দুই দেয়ালের মধ্যে বা ধৰংসা বশেষে মধুর চাক গড়া হয়। পাহাড়ি মৌমাছিরা (*Apis dorsata*) বিরাট আকারের

একক মধুর চাক তৈরি করে যার আয়তন সাধারণত এক বর্গগজের মতো (০.৮ বর্গমিটার)।<sup>১</sup> অন্যান্য প্রজাতির মৌমাছি যেমন, ইউরোপীয় (*Apis mellifica*) ও এশীয় প্রজাতির মৌমাছিরা তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের চাক তৈরি করে। চাকের যে বসতি এলাকায় মৌমাছিরা বাস করে তা সাধারণত ওপর থেকে নিচের দিকে খোলানো সমান্তরালভাবে সজ্জিত কোষ দিয়ে চাকটি গঠিত হয়। মধুর চাকে থাকে উলুব ঝুঁটি বা শীর্ষ ও সমান্তরাল কোষ দিয়ে গঠিত, প্রতিটি শীর্ষ বা ঝুঁটি কোষ থেকে একটি কেন্দ্রীয় মোমের চাদর থেকে ওপরে-নিচে উভয় দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়।। এভাবে গোটা কোষের আকার হিণুণাকার হয়ে থাকে। মৌচাকের মোমের উৎপত্তি হয় মৌমাছির দেহের বাম দিকের নিলয়ের কাছে অবস্থিত গহ্নি থেকে। কর্মী মৌমাছি মৌচাক তৈরির সময় এই মোম চিবিয়ে ও তাতে তার জ্বালা মিশিয়ে পাতলা আস্তর ও ফিতার আকারে ছড়িয়ে চাকের ছয় কোণাকৃতি কোষগুলো তৈরি করে। যে কোনো জ্যামিতির হাত্তের জন্য এটি অত্যন্ত কৌতুহলোদীপক বিষয়। ছয় কোণাকৃতি মৌচাকের কোষগুলি বিস্থায়করভাবে সবচেয়ে কম জ্বালান নষ্ট করে সবচেয়ে বেশী ধারণক্ষমতার উপযোগী (চিত্র-৭) করে নির্মিত হয়। কোষগুলো আগেই বলা হয়েছে ষড়কোণবিশিষ্ট আর এগুলো দুটি আকারের হয়ে থাকে। ছোট আকারের কোষ কর্মী মৌমাছির পালন ও পরিচর্যা এবং পরাগ ও মধু সঞ্চিত করার জন্য এবং বড়ো আকারের কোষ পুরুষ মৌমাছি পালনের জন্য। একেক বিশেষ মৌসুমে যখন মৌমাছির সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন কর্মী মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির জন্য বিশেষ কোষ নির্মাণ শুরু করে যা মৌমাছির বংশবৃক্ষি তথা ডিম পাড়ার প্রস্তুতি। এই কোষগুলো খাড়া না হয়ে আনুভূমিক হয়ে থাকে। আর এগুলোর নিজের দিকে দরজা খোলা থাকে। এক পাউণ্ডের মতো (০.৫ কেজি) মোম দিয়ে মৌমাছির চাকের ৩৫ হাজার কোষ তৈরি হয়ে থাকে। আর এইসব কোষের মাঝে আনুমানিক ২২ পাউণ্ডের মতো (৯.৯ কেজি) মধু জমা করে রাখা যায়। কোষের প্রাচীরগুলো বিভিন্ন উভিদ থেকে নিঃস্তৃ ধূনার মতো পদার্থের প্রলেপ দেয়া থাকে কোষগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। এই ধূনা বা আঠার মতো পদার্থ কর্মী মৌমাছিরা সংগ্রহ করে কোষের গহ্বরগুলোর দেওয়াল মসৃণ করে তোলার ও পানি থেকে সুরক্ষিত করার জন্য।<sup>২</sup> চাকের মধ্যে সাধারণভাবে যে পরিকল্পনা বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় তা হলো তাতে একটি বড়ো এলাকা জুড়ে থাকে পরিচর্যা ইউনিট বা চাকের নিচের দিকে বাচ্চা পরিচর্যা ও পালন কেন্দ্র ও তার কাছাকাছি পরাগ সঞ্চার আগার। চাকের ওপরের দিকে থাকে খাদ্য প্রকোষ্ঠ যেখানে মধু সঞ্চয় করে রাখা হয়। এ মধু সঞ্চয় আগার বা প্রকোষ্ঠটি থাকে চাকের নিচের প্রবেশ পথ থেকে সবচেয়ে দূরে।



চিত্র : ৭ মধুর চাকের একাংশের নকশা।

এখানে বড়ভূজাকার কোষগুলো বিন্যস্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। যে কোষগুলো তির্যক রেখাস্থিত সেগুলোতে মধু ও পরাগ সংগ্রহ করে রাখা হয়। আর কালো ঝুক করা কোষগুলোতে কর্মী মৌমাছির পরিচর্যা ও পালন কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্য কোষগুলো ফাঁকা থাকে।

**মধুর উৎস সমূহ ও মৌমাছিরা যেভাবে এই সব উৎস থেকে মধু আহরণ করে থাকে**

এক পাউন্ড (০.৫ কেজি) মধু তৈরি করার জন্য ৫৫০টিরও বেশি মৌমাছিকে আনুমানিক ৮০,০০০ বার<sup>৩</sup> দলবদ্ধভাবে উড়ে গিয়ে কমপক্ষে ২৫,০০,০০০ (পাঁচশ লক্ষ) ফুল হতে পরাগ সংগ্রহ করতে হয়। মৌমাছির খাদ্য হলো পরাগ ও সুমিট রস যা নানা ধরনের ফুল থেকে সংগ্রহ করা হয়। যখন ফুল থাকে না বা পাওয়া যায় না তখন তারা ফল থেকে মিষ্ঠি রস সংগ্রহের ওপর নির্ভর করে তবে তাদের চিবুকাস্তি এমনকি নরম ফলের খোসা ভেদ করার মতো যথেষ্ট শক্ত না হওয়ায় তাতে হ্ল ফোটাতে পারে না। তাই কোনো ফল কেবল আগে কোনো ভাবে ফেটে বা কিছুটা নষ্ট হয়ে আলগা হয়ে পড়লেই কেবল তা থেকে মৌমাছি রস সংগ্রহ করতে পারে।<sup>৪</sup>

গড় ধরনের একটি মধুর চাকে ৩০,০০০ থেকে ৬০,০০০ কর্মী মৌমাছি থাকে। এই জাতের মৌমাছি তাদের জীবনের ২১তম দিবসে বাইরে গিয়ে মধু আহরণের উপযুক্ত হয়। আর যে সব মৌমাছি বাইরে গিয়ে পরাগ ও মধুর নতুন

উৎস সন্ধান করে এই মৌমাছিরা শেষ পর্যন্ত তাদের পথ প্রদর্শক বা ক্ষাউটের কাজ করে এবং তারপর তারা বাইরে কর্মরত অন্যান্য মৌমাছির কাছে এই খবর পৌছে দেয়। মৌমাছি খাদ্য ও সমৃদ্ধ সরবরাহের উৎস খোঁজার জন্য সাধারণত তাদের মধুর চাকের একশ মিটার পর্যন্ত এলাকায় অনুসন্ধান চালায়। ৫ ক্ষাউট মৌমাছি তাদের সহকর্মী মৌমাছিদের মিষ্টি রসের সন্ধানের তথ্য জ্ঞাপন করতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে কথিত মধুন্ত্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাদের সে তথ্য জ্ঞাপনের ভাষা ও নৃত্যের জ্যামিতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সূরা ৬ : ৩৮-এর আওতায় পরিপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। কুরআনের আয়াতে স্পষ্টভাবে মৌমাছিদের এই তথ্য নির্দেশের অর্থ করা হয়েছে “আপনার প্রতুর পথ সন্ধান করুন” এই মর্মে।

নানা বর্ণের মধুর উৎপাদন মানবজাতির জন্য আচর্য রোগ আরোগ্যকারক

“মধু এক মিষ্টি, আধা ঘন পদার্থ, নানা ধরনের শর্করার এক দ্রবণ বিশেষ যার বর্ণ গাঢ় বাদামি থেকে সোনালী হলুদ হয়ে থাকে। মৌমাছিরা ফুল থেকে সংগৃহীত সুমিষ্টি রস থেকে মধু তৈরি করে ও তা পরবর্তীকালে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য চাকে সঞ্চয় করে ত্বার্থে।<sup>১৬</sup>” মধু সর্বপ্রাচীন ও প্রায় একমাত্র প্রাকৃতিক মিষ্টি বলা চলে। কোন্ কোন্ ধরনের ফুল থেকে মিষ্টি রস ও পরাগ সংগ্রহ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী মধুর সুরক্ষি, রং ও গঠন নির্তর করে।

মধুর সুগন্ধ ও রং উভয়ই নির্ভর করে কোন ধরনের ফুলকে মিষ্টি রস পাওয়ার উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর। মধুতে একপ্রকার অ্যাসিড রয়েছে। এই অ্যাসিডের নাম ট্যানিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডের জন্যই মধুর গাঢ় রং ও তীব্র স্বাদ হয়ে থাকে। মধুর রং হলুদ হয়ে থাকে ক্যারোটিন বা জ্যানথোফিল নামের রাসায়নিক পদার্থের কারণে। মধুর এই হলুদ রং হয়ে থাকে সাধারণত সরিষা ফুল থেকে মৌমাছির পরাগ সংগ্রহের কারণে। সাদা ক্লোভারুল (মাষকলাই জাতের এক ধরনের ত্রিপত্রী উদ্ভিদ) থেকে সংগৃহীত মধুর রং সাধারণত গোলাপী রঙের হয়ে থাকে যার কারণ এই মধুতে অ্যানথোসিয়ানিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি। মধুর চাকে অতিরিক্ত পানির (আর্দ্ধতার) বাষ্পীভবন ঘটে। আর সুক্রোজ বিপরীতায়ন প্রক্রিয়ায় মনোস্যাকারিডস লেভুলোজ বা ডেক্সট্রোজ পরিণত হয়। মধুর মধ্যে গড়ে ৪০.৫% লেভুলোজ, ৩৪% ডেক্সট্রোজ, ১.৯% সুক্রোজ, ১৭.৭% পানি, ১.৯% ডেক্সট্রিনস ও আঠা এবং ০.১৮% ছাই থাকে। এ ছাড়াও এতে থাকে ১.৫-৬% অন্যান্য উপাদান যেমন বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন (সি ও বি ভিটামিন

গ্রুপের আনেকগুলি উপ-ভিটামিন), এনজাইম (যেমন, ডায়াস্টেজ, ইন্লেজ, ক্যাটালেজ ও ইনভার্টেজ (সুক্রোজ ইনভার্টস), তরলতার রঞ্জক পদার্থ, নিলাসিত সলিডস (পরাগ ও মৌ-মোম), খনিজ (তামা, ক্যালসিয়াম, আয়রন), অতি সামান্য পরিমাণে সিলিকা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিন, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, গুরুত্ব, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। আহরিত মিষ্ট রসে কিছু খৰীর উপাদান থাকতে পারে। আহরিত মধু উপাদান সঞ্চিত থাকাকালে তাই কিছু খৰীরায়নও ঘটতেই পারে। সকল শ্রেণীর মধু আর্দ্রতাধারণ করে বলে ঠাণ্ডায় কখনও জমে যায় না। অতিরিক্ত তাপে মধুর সুগন্ধ ও খাদ্যগুণ নষ্ট হয়।<sup>৬</sup>

ইউনানী ও আযুর্বেদীয় চিকিৎসকেরা মধুকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করেন। কুরআন এ বিষয়ে বলছে যে মানবজাতির জন্য মধু ওষুধের গুণ ধারণ করে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অবশ্য মধুর ওষুধগুণ নিয়ে বিশদ ও বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করেনি। তবে মধুর নিম্নবর্ণিত ব্যবহার সবিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ

১. কোনো কোনো চিকিৎসক মধু শিশুদের দেহে ক্যালসিয়াম বা চূন জাতীয় পদার্থ বজায় রাখার জন্য উপযোগী ও উপকারী প্রভাবসম্পন্ন খাদ্য বলে সুপরিশ করেছেন। মধু পরিপাকে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, মধুর বেশিরভাগে রয়েছে মনোস্যাকারিডস বা সাধারণ চিনি।<sup>৭</sup>

২. মধুতে যে সব এনজাইম, পাচকরস, খনিজ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে সবগুলোই মানুষের জন্য উপকারী। আর মানব পুষ্টির এসব অত্যাবশ্যক উপাদানের সরবরাহ লাভের জন্য মধুকে উত্তম উৎস বলে গণ্য করা যেতে পারে।

৩. এই মর্মে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, মহানবী (সা) নানা ধরনের অসুস্থতা, বিশেষ করে, মাদকাসক্তি নিরাময়ে মধুর ব্যবস্থাপন্ত দিতেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আওতায় লারসেনচ জটিল মাদকাসক্তি রোগীর চিকিৎসার জন্য বারংবার ১২৫ গ্রাম করে মধু খাওয়ানোর ব্যবস্থাপন্ত দিতেন। মধুতে থিয়ামিন ও ভিটামিন 'বি' গ্রুপের নানা উপ-ভিটামিন ও নানা ধরনের শর্করার সমৃদ্ধ সমাবেশ রয়েছে। এসব উপাদান জটিল মাদকাসক্তি রোগীর পৌঢ়িত যকৃতের চিকিৎসায় মধুর অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্ব আজ নতুন করে জ্ঞান লাভ করছে। তিনি এ বিষয়ে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানীর বহু বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল থেকে উদ্ভৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে জটিল মাদকাসক্তি রোগীর রোগ চিকিৎসায় তাদের দেহের ভিটামিন ঘাটতি এবং তাদের দেহে মাদক সেবনের কারণে যে দূষণ ঘটে থাকে তা দূর করার প্রক্রিয়াকে<sup>১০</sup> মধু সহজ করে তোলার কাজে বিরাট সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮. শরীরের কোনো অংশ পুড়ে গেলে সেই পোড়া ও কাটাছেঁড়া ঘায়ের চিকিৎসায় মধু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ, মধুতে মৃদু জীবাণুনাশক ও পচনরোধক গুণ রয়েছে।<sup>৭</sup>

মধুর ঔষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সকল গুণ উদঘাটন করার জন্য এ বিষয়ে আরও সমীক্ষা প্রয়োজন।

### তথ্যসূত্র :

1. Friedman (ed.), Collier's Encyclopaedia, Vol. 3, P.F. Collier, Inc. London, 1980, p. 762.
2. Encyclopaedia Americana, Vol.3, Ross & Hatchins, 1979, p. 438.
3. Ibid.
4. E. Crane, (ed.), Honey-a comprehensive Survey, William Heinsman Ltd. London, 1976, p.22.
5. Friedman (ed.), Collier's Encyclopaedia, Vol.3, P.F. Collier, Inc. London, 1980, P. 764.
6. C. L. Farror and H. M. Grace, Honey, Collier's Encyclopaedia, Vol. 10, 1956, pp. 139-141.
7. Encyclopaedia Britannica, 1962.
8. M. Larsen, Brit, M.J. (August) 1954 quoted Digir, M. Al-Assal, Dar al-kutub al Arabia, Damascus, 1974.
9. M. Digir, Al-Assal, Dar al-Kutub al Arabia, Damascus, 1974.
10. M. B. Badri, Islam and Alcoholism, American Trust Publications, USA, 1976, pp.27-28.

۰۰۷۱- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفِسْكِمُ اَرْذَلَمَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَرْوَاحِكُمْ اَبْيَنَ وَحَدَّدَ  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطِّبِّبَتِ اَنْهَا لِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنُعْصَمَتِ الْغُوْهُرِيْكُفْرُونَ

১৬ : ৭২ এবং আল্লাহর তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া (দম্পতি) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল ইতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কী ওরা মিথ্যায় বিশ্঵াস করবে এবং ওরা কী আল্লাহর অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে ?

নাফস -এর সরাসরি শব্দার্থ আস্তা ও আস্তার রিপু প্রধান অংশ। আল্লামা ইউসুফ আলী<sup>১</sup> নাফসকে প্রকৃতি বা স্বভাব বলে অর্থ করেছেন। আর পিকথল<sup>২</sup> কুরআনের এই আয়াতের আলোকে এর অর্থ করেছেন স্বকীয়তা। পুরুষ ও স্ত্রীদের বেলায় প্রকৃতি বা স্বভাবে বা “স্বকীয়তা” অর্থ মেনে নিয়ে ঐ বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করতে গিয়ে সাধারণভাবে জীব-প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষত মানুষের জৈবতাত্ত্বিকভাবে এক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এক প্রজাতির সকল সদস্য সুপরিজ্ঞতভাবেই অন্য সকল প্রজাতির সদস্যদের তুলনায় আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। মানুষ হোমো স্যাপিয়েনস প্রজাতিভুক্ত। মানুষসহ কোনো একটি জীবপ্রজাতির সদস্যরা এককভাবে একে অন্যের মধ্যে কিছু পরিমাণে তারতম্য প্রদর্শন করে থাকে যা সাধারণত তাদের ভৌগোলিক বন্টন বা কোথায় কোন অঞ্চলে বসবাস করে তার ওপর নির্ভর করে। তাছাড়া এই একই বিষয়ে বড় ধরনের জাতিগোষ্ঠী বা নরগোষ্ঠীতে বিভিন্নভার ভিত্তিতেও এই তারতম্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রজনন সম্ভব। তবে অন্যান্য জীবপ্রজাতির কোনো সদস্যের সাথে মানব প্রজাতির কোনো সদস্যের আন্তঃপ্রজনন বা শিশু/ শাবক উৎপাদনের সম্ভাবনা কার্যত নেই। এর অর্থ এই যে, একটা জীবতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এ ধরণের বিষম প্রজননের মধ্যে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো জিনগত ভিত্তিতে নির্যাতিত। আর এর ফলে একটি জীব-প্রজাতি<sup>৩</sup> ও অন্য আরেক জীব-প্রজাতির মধ্যে আন্তঃপ্রজননের ক্ষেত্রে ‘বিচ্ছিন্নতা ও পৃথক্যায়নের’ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বাবা-মার জিনের পার্থক্যজনিত কারণে এটি হতে পারে। কেননা এই জিনগুলো প্রাণ বিকাশের ক্ষেত্রে পরম্পর বিরোধী জৈবরাসায়নিক ‘নির্দেশ’ দিতে পারে। আর তার ফলে নিষিক্ত ডিম্বকোষ বিকশিত হতে পারে না অথবা বিকশিত হলেও যে শিশু বা

শাবকের জন্ম হয় সাধারণত সে হয় দুর্বল ও পূর্ণ বয়সে তার মাঝে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ নাও ঘটতে পারে। অনেক সময় এক জীব-প্রজাতির শুক্রাণু অন্য এক জীব-প্রজাতির স্ত্রী জননাঙ্গের যথা অবস্থানে টিকে থাকতে পারে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জীব-প্রজাতির সদস্যবর্গের মধ্যে জিনের প্রবাহ অসম্ভব।

এই প্রজনন অঙ্গরায় বা বাধার জীবতাত্ত্বিক গুরুত্ব অসাধারণ। এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জীব প্রজাতির স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। এই অঙ্গরায় না থাকলে যে কোনো একটি জীবপ্রজাতি শেষ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মধ্যবর্তী সংকর হিসেবে পর্যবসিত হতো ও এই প্রজাতির স্বকীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতো। আর সেই সাথে দুটি আদি ও মূল জীবপ্রজাতির মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা আর সম্ভব হতো না। যদি তিনি দুই জীবপ্রজাতির মধ্যে আন্তঃপ্রজননের সুবাদে একটা টেকসই সংকর তৈরি করা সম্ভব হয়ও তাহলেও ঐ সংকরদের দিয়ে আরও আন্তঃপ্রজনন আর সম্ভব হবে না কেননা এসব সংকর হবে বন্ধ্য। এ বিষয়ে একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হলো খচর যা ঘোড়া ও গাধার মধ্যে আন্তঃপ্রজননের এক শক্তিশালী, কষ্টসহিষ্ণু ও ভারবাহী প্রাণী। অথচ এই সংকর প্রাণীটি হয়ে থাকে বন্ধ্য। এই সংকর প্রাণীর বাবা-মা কিন্তু আলাদা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যময় প্রাণী প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে আর তাদেরই শাবক ঐ খচরটি একজাতের বিচ্ছিন্ন, বন্ধ্য প্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকে। এই খচরেরা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।

আল্লাহ প্রতিটি প্রজাতির প্রাণীকে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টি জীবকুল কেবল আন্তঃপ্রজননগত বিচ্ছিন্নতার সুবাদেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগত অবস্থা বজায় রাখে না, এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মেও তাদের বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা অক্ষণ্ট রাখে। জিন বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে জিন উপাদানের স্থানান্তরনের মধ্য দিয়েই উল্লিখিত ধারাবাহিকতা বর্জায় রাখা সম্ভব হয়। এই বিষয়ের প্রতিই কুরআনের আলোচ্য আয়াতে পূর্বম ও তাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে সন্তান সন্তুতি ও পুত্র-পৌত্রাদি উৎপাদনের কথার ইঙ্গিত করান হয়েছে।

### তথ্যসূত্র :

1. A. A. Yusuf, *The Holy Quran*, Islamic Foundation, Liecester, UK. 1975, p.675.
2. M. Pickthall, *The Meaning of The Glorious Quran*, Kutub Khana Ishyat-ul-Islam, Churiwala, Delhi.

“وَإِلَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ لَا كَلْنَعُ الْبَحْرِ  
أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৬ : ৭৭ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং  
কিয়ামতের ক্ষণের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তা  
অপেক্ষাও সত্ত্বর। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এক  
অত্যুক্তি ও অতি শুদ্ধ, অতি ঘন, মৌলিক প্রকৃতির অগ্নিগোলক থেকে যার ব্যাখ্যা  
দেওয়া হয়েছে ২ : ১১৭ আয়াতে এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ। মহাবিশ্বের শুরুতে  
ঘটে বিগ ব্যাং-এর মতো ঘটনা। আর তারপর ক্রমাবয়ে পরমাণু, অণু,  
নীহারিকা, ছায়াপথ, নক্ষত্র ও সৌরমণ্ডল আদি অগ্নিগোলক থেকে সৃষ্টি হয়।  
মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই বিগ ব্যাং তত্ত্ব আজ বিশ্বজীবীনভাবে স্বীকৃত হলেও বাস্তবিক  
পক্ষে এটি আজও মহাবিশ্বায়ই রয়ে গেছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে সকল পদার্থ  
একটি আবর্তক গতি লাভ করে যা আজও অস্তিত্বশীল। আর এই গতিই  
মহাকাশের জ্যোতিষ্মণ্ডলীর মধ্যে কেন্দ্রাতিগ শক্তি দ্বারা অভিকার্ষিক আকর্ষণের  
ভারসাম্য বিধান করে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে আজও মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা থেকে  
সৃষ্টি এই আবর্তক গতির আদি উৎস এখনও রহস্যায় থেকে গেছে। নিউক্লিয়াসকে  
কেন্দ্র করে ইলেক্ট্রনের আবর্তনশীল গতির আদি উৎস একইভাবে আজও রহস্যে  
ঘেরা। ঐজেব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের সৃষ্টি মহাবিশ্ব সৃষ্টির আরেক হেঁয়ালি।  
সৃষ্টির প্রতিটি স্তরের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা যে রয়েছে তা  
বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব আরও স্পষ্ট করে ভুলেছে। জ্ঞানের অগ্রগতির আলোকে মানুষ  
আকাশ ও পৃথিবীর অনেক রহস্য এখন উপলব্ধি করতে সক্ষম। তবে আরও  
অন্যান্য অনেক রহস্যায় রয়েছে যেগুলো এখনও মানুষের বোধগম্য নয়।

শেষ বিচারের দিনের ক্ষণ সম্পর্কে যে উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে ৭ :  
১৮-৭ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

“وَاللَّهُ أَخْرِجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهِتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۝ ۝ ۝  
وَجَعَلَ لَكُمُ النَّسْمَةَ ۝ ۝ ۝  
وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ۝ ۝ ۝

১৬ : ৭৮ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের  
করেছেন, এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি

তোমাদেরকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা করার জন্য মন  
দিয়েছেন এজন্য যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

একথা খুবই সত্য যে মানব শিশু যখন জন্ম লাভ করে তখন সে কিছুই  
জানে না এবং সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল থাকে। তখন এই শিশুর লালন পালন করে  
তার পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আশীর্যস্বজন ও সেবক বা সেবিকারা। তারাই  
শিশুর খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সরবরাহ করে। এখানে আল্লাহ আরও বলেছেন  
যে তিনি শিশুকে শ্রবণ, দৃষ্টি ও মনন শক্তি দান করেন।

কান শ্রবণ কার্য সম্পাদন করে। জন্মের সময় যদিও বাহ্যিক দুটি কান থাকে  
যার প্রত্যেকটির তিনটি অংশ রয়েছে :- বাইরের অংশ, মধ্যম ও অভ্যন্তরীণ  
অংশ। বাইরের অংশ বা কান মাতৃগতেই তৈরি হয় যা গর্ভের ষষ্ঠি সপ্তাহে শুরু  
হয় এবং ৩২তম সপ্তাহে তার নির্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত হয়। মধ্যম অংশ  
গর্ভধারণে ২৪-২৮ দিনের মধ্যে শুরু হয় এবং গর্ভের শেষ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত  
হয়। অভ্যন্তরীণ কানের সৃষ্টি গর্ভের ৪৬ সপ্তাহে শুরু হয় এবং ২০তম সপ্তাহে  
শেষ হয়। কিন্তু এ সময় শিশু সব শব্দ খুব স্পষ্ট শুনতে পায় না। কানের পেছনের  
উঁচু অংশকে mastoid বলে। তাতে বাতাস ধরে রাখার মত অনেকগুলো  
গর্ভের সৃষ্টি হয় যা আওয়াজকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। এগুলো গর্ভাবস্থায়  
শুরু হলেও জন্মের পর এর বেশীর ভাগের তৈরি শেষ হয়। জন্মের সময়  
mastoid সমান থাকে উঁচু হয় না- এক বছর বয়সে এটা বেশ উঁচু হয় এবং  
তখনই শিশু ভাল শুনতে পায়। তবে এর গঠন ঘোনকাল পর্যন্ত চলতে পারে।<sup>১</sup>

একটি শিশু ভাল শুনতে পেলেই কথা বলতে শিখে তাই এক বৎসর হলে  
বাক্সা কথা বলতে শুরু করে।

চক্ষু ও গর্ভের ৪৬ সপ্তাহে (২২তম দিবসে) শুরু হয় এবং ৩২ দিনের সময়  
optic cup চোখের ভিতরের অংশ যা দৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রয়োজন, সৃষ্টি হয়  
এবং চক্ষুর নার্ভ optic nerve ৬ষ্ঠ থেকে ৮ষ্ম সপ্তাহে তৈরি হয়। জন্মের সময়  
চোখের নার্ভের বাহ্যিক আবরণ (myelination) থাকে যা মস্তিষ্কের সঙ্গে  
সম্পর্কিত। জন্মের পর চোখে আলো পড়ার পর প্রায় দশ সপ্তাহ পরে এই আবরণ  
তৈরি সম্পূর্ণ হয়।<sup>২</sup> চোখের দুই পাপড়ি দুদিক থেকে এসে মিলিত হয় গর্ভের  
দশম সপ্তাহে এবং ২৬তম সপ্তাহে পাপড়ি দুটি আলাদা হয়।<sup>৩</sup> এর আগ পর্যন্ত  
পাপড়ি দুটি যুক্তই থাকে। নবজাত শিশুর চক্ষু, পূর্ণ বয়ককালের চক্ষুর তুলনায়  
দুই-তৃতীয়াংশ ছোট থাকে। প্রথম বছরে চক্ষুর আকার বৃদ্ধি পায় দ্রুতগতিতে,

ତାରପର ଯୌବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ତାରପର ଚକ୍ଷୁର ଆକାର ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଓ ନଗପଣ୍ୟ ।

ନବଜାତ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ କରେକ ସନ୍ତାହ ଭାଲ କରେ (ସ୍ପଷ୍ଟ) ଦେଖତେ ପାଯ ନା । ଚକ୍ଷୁର ଭିତରେ ବିଶେଷ ଅଂଶ (macula lutea ଏବଂ fovea centralis) ଗୁଲୋ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଗଡ଼େ ଓଠେ ନା ବଲେ ତାଦେର ଦୃଷ୍ଟି ହିଁର କରାର ଶକ୍ତି ହୁଯ ନା । ତଥନ ତାରା ଚେଯେ ଥାକଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖେ ନା- ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ତାକିଯେ ଥାକେ । ଚକ୍ଷୁର ଭିତରେ ପେଛନ ଦିକେ ରେଟିନାର କେନ୍ଦ୍ରେ ହଲଦେ ଦାଗକେ macula lutea ବଲେ ଆର ଏର ମଧ୍ୟକାର ସାମାନ୍ୟ ଗର୍ତ୍ତଟିକେ fovea centralis ବଲେ । ଏଖାନକାର ରେଟିନାର ଆନ୍ତରଣ ଥୁବ ପାତଳା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ cones ଦ୍ୱାରା ତୈରି । ବାକୀ ରେଟିନାତେ cones ଏବଂ rods ପାଶାପାଶି ଥାକେ । ତବେ ଯେଥାନେ optic nerve ପ୍ରବେଶ କରେ ଯେଥାନେ rod ବା cone କିଛୁଇ ଥାକେ ନା । ଏଥାନେ କୋନ ଆଲୋର ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଯ ନା ବଲେ ଏଟାକେ ଅନ୍ଧ ଏଲାକା ବା blind spot ବଲା ହୁଯ । କୋନ ବସ୍ତୁର ଆଲୋ ରେଟିନାତେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ fovea ତେ refracted ଓ ପୁଣ୍ଡିତ୍ତ ହଲେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ଯାଯ । ଜନ୍ମେର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପର macula ଓ fovea ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ।<sup>2</sup> ତାଇ ମାସଥାନେକ ପର ଶିଶୁ ଚକ୍ଷୁ ହିଁର କରେ ଦେଖତେ ପାଯ, ଏର ପୂର୍ବେ ଚକ୍ଷୁ ହିଁର ହୁଯ ନା ।

ହୃଦ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ରଙ୍ଗ ଚଲାଚଲ ମାତୃଗର୍ଭର ଶୋଧିତ ରଙ୍ଗ (80%) ମାୟେର placenta ଥେକେ umbilical vein (ନାଡ଼ୀ) ଦିଯେ ଫିରେ ଆସେ । ଏର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧକେ ରଙ୍ଗ ଯକୃତେର ଭିତର ଦିଯେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଯ । ଆର ବାକୀ ଅର୍ଦ୍ଧକେ ବାଦ ଦିଯେ ductus venosus ଦିଯେ inferior vena cava (IVC) (ନିମ୍ନେ ବୃହତ୍ ଶିରା)ତେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏଇ ରଙ୍କେର ଚଲାଚଲ ductus venosus sphincter ଦିଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଯ ।<sup>4</sup> ଯେହେତୁ ମାତୃଗର୍ଭ ଶିଶୁ ନେଯ ନା ଏବଂ ଲିଭାର ବା ଯକୃତେର କାଜାଓ କରେ ତାଇ ସବ ଶୋଧିତ ରଙ୍ଗ ଯକୃତେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯାଓଯାର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ । ଦୁଇ ପଥେଇ ଶୋଧିତ ରଙ୍ଗ ନିମ୍ନେର ବୃହତ୍ ଶିରାଯ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏଥାନେ ନିମ୍ନାଙ୍ଗେର ପେଟ ଓ ତଳପେଟ ଥେକେ ଆଗତ ରଙ୍କେର ସଙ୍ଗେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଯ । ଏଇ ରଙ୍ଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦ୍ପିଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ଅଲିନ୍ଦେ (atrium) ପ୍ରବେଶ କରେ । ଯଦିଓ ଏତେ ଅଶୋଧିତ ରଙ୍ଗ ଥାକେ ତବୁଓ ଏଇ ରଙ୍ଗ ମୋଟାମୁଟିଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚିଜେନ ବହନ କରେ । ଶରୀରେର ଉର୍ଧ୍ଵାଙ୍ଗ ଥେକେ ଅଶୋଧିତ ରଙ୍ଗ ଉର୍ଧ୍ଵତନ ବୃହତ୍ ଶିରା ବା superior venacava (SVC) ମାରଫତ ଡାନ ଅଲିନ୍ଦେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଡାନ ଓ ବାମ ଅଲିନ୍ଦେର ମଧ୍ୟକାର ଦେଯାଲେ ଏ ସମୟ ଏକଟି ଛିନ୍ଦି ଥାକେ ଯାର ନାମ foramen ovale IVC ଥେକେ ଆସା ବେଶୀର ଭାଗ ରଙ୍ଗ foramen ovale ଦ୍ୱାରା ବାମ ଅଲିନ୍ଦେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯେଥାନେ ଫୁସଫୁସ ଥେକେ କିଛୁ ରଙ୍ଗ (ଶୁନନେର ନୟ ବଲେ ଅଶୋଧିତଇ ଥେକେ ଯାଯ) ଏସେ ଜମା

হয়। ফুসফুস তার প্রয়োজনীয় অঙ্গিজেন রক্ত থেকেই গ্রহণ করে। তারপর বাম অলিন্দের রক্ত বাম প্রকোষ্ঠে (left ventricle) প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ধমনির সাহায্যে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়।

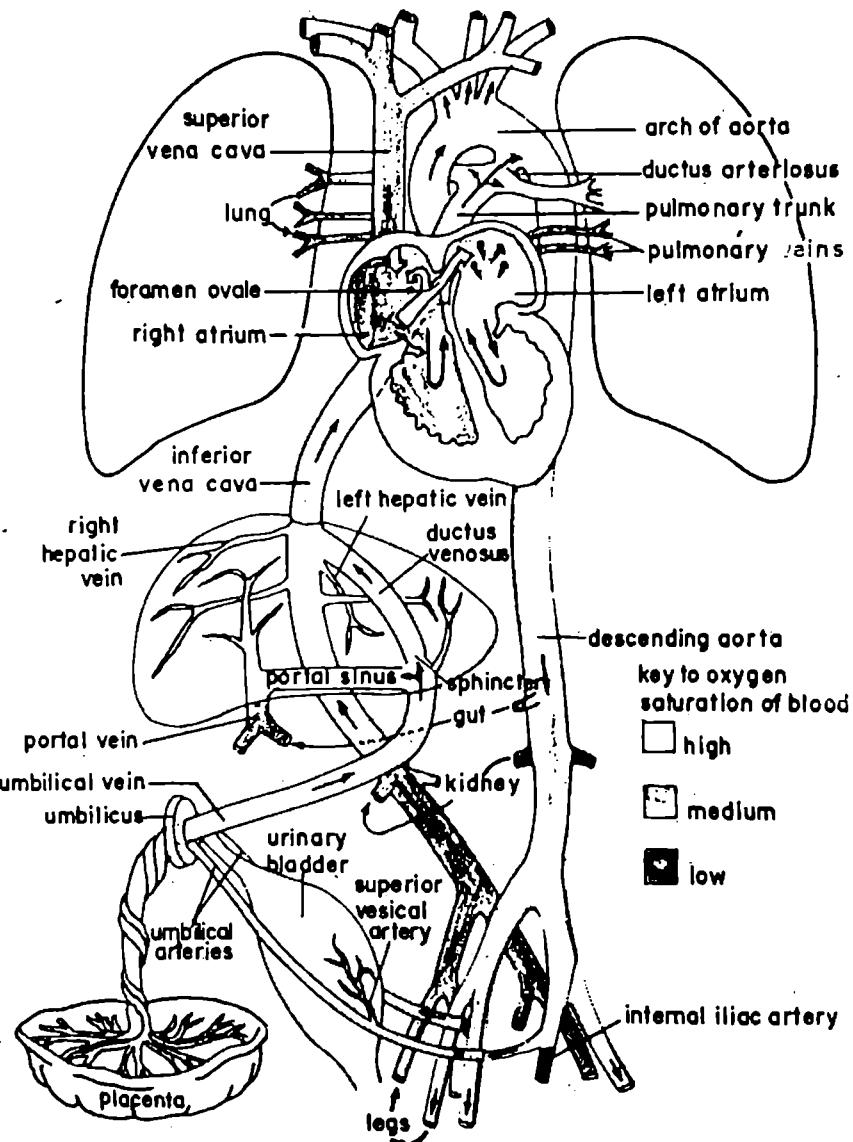
IVC-র কিছু রক্ত যা বাম অলিন্দে যায়নি তার সঙ্গে SVC দ্বারা প্রবাহিত রক্ত একত্র হয়ে দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যায় এবং সেখান থেকে pulmonary trunk দ্বারা ফুসফুসে যায়। তবে এর বেশীর ভাগ রক্ত ductus arteriosus দ্বারা ফুসফুসে যায়। তবে এর বেশীর ভাগ ধমনিতে প্রবেশ করে। সুতরাং মাত্রগৰ্ভে খুব সামান্য রক্ত (৫-১০%) ফুসফুসে যায়। কারণ স্থান নেয় না বলে ফুসফুসের কাজ খুব কম হয়। যে রক্ত ধমনির নীচের অংশে প্রবেশ করে তাতে মাত্র ৫৮% অঙ্গিজেন থাকে। এই রক্তের অর্ধেক শরীরের নিম্নাংশকে সরবরাহ করে, আর বাকি অর্ধেক নাড়ির ধমনি (umbilical arteries) দিয়ে plncenta-তে যায় এবং মায়ের মাধ্যমে অঙ্গিজেন লাভ করে umblical vein দিয়ে আবার শিশুর শরীরে প্রবেশ করে।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকের রক্ত চলাচলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। Placenta মারফত মায়ের রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যায় আর শিশুর শ্বাসক্রিয়া শুরু হয়। গর্ভাবস্থার তিনিটি বিকল্প পথ foramen ovale, ductus venosus এবং ductus arteriosus গুলোর আর প্রয়োজন থাকে না। কারণ, তখন যকৃত ও ফুসফুস পূর্ণ কার্যক্ষম হয়।

মাত্রগৰ্ভে শিশুর হৃৎপিন্ডের ডান প্রকোষ্ঠের দেয়াল অতিরিক্ত কাজের ফলে বাম প্রকোষ্ঠের তুলনায় মোটা। জন্মের মাত্র এক মাস পর বাম প্রকোষ্ঠের দেয়াল ডান প্রকোষ্ঠের তুলনায় বেশী মোটা হয় যা বাকি জীবনভর থাকবে। আর ডান প্রকোষ্ঠের দেয়াল কম কাজ করার ফলে পাতলা হয়ে যায়।

নবজাতকের কয়েকবার শ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় এবং বাম অলিন্দে রক্ত চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে ডান অলিন্দ থেকে রক্ত আসতে পারে না বলে foramen ovale থীরে অকেজো হয়ে যায়। Ductus arteriosus ১০-১৫ ঘন্টায় আর কার্যক্ষম থাকে না সম্ভবত ফুসফুস কর্তৃক তৈরি braykinin নামক রাসায়নিক বস্তুর মধ্যস্থায়।<sup>৫</sup>

যেহেতু pulmonary trunk যথারীতি রক্ত ফুসফুসে প্রেরণ করে তাই এই পথের আর কোন প্রয়োজন থাকে না এবং কাজ না থাকায় শেষ পর্যন্ত ductus venosus কাজের অভাবে ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় এবং portal vein যথারীতি কাজ করে যায়। মাত্রগৰ্ভের রক্ত চলাচলের পরিবর্তন হতে বহু দিন থেকে বহু সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগে। (ছবি দ্রষ্টব্য)



সুতরাং জন্মের সময় শিশুর চক্ষু, কর্ণ এবং হৃৎপিণ্ড পূর্ণ কার্যক্রমে থাকে না। শিশু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করে। আর এই জ্ঞান লাভের জন্য চক্ষু, কর্ণ ও হৃৎপিণ্ডের প্রয়োজন। শুনতে বা দেখতে না পেলে মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই উপরের আয়ত অনুযায়ী এ কথা অত্যন্ত সঠিক যে শিশু যখন জন্মলাভ করে তখন সে অজ্ঞ এবং আল্লাহর দেওয়া চক্ষু, কর্ণ ও হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে শীঘ্ৰই দৃষ্টি, শ্রবণ ও চিন্তা শক্তির সাহায্যেই সে জ্ঞান লাভ করে।

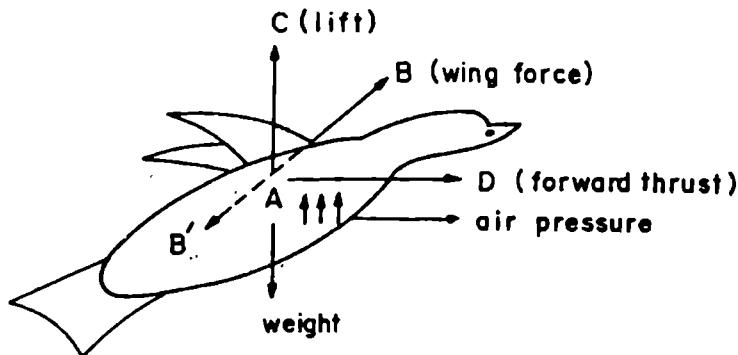
### তথ্যসূত্র :

1. K. L. Moore A. M. A. Zzzindani (eds.)*The Developing Human*, 3rd edn. W. B. Saunders Co. Philadelphia, 1983, p. 424, 420.
2. M. L. Kwitko, (ed) *Surgery of the Infant Eye*, Appleton-Century-Crofts, New York, 1979.
3. K. K. Jain, G. J. Bhandari, and S.P. Koronne, *Histogenesis of the Human Eyelid*, East Arch. Opt. 3 : 8, 1973.
4. A. D., Dickson, *The development of the ductus venosus in man and the goat*, J. Anat. 91 : 358, 1957.
5. K.L. Melmon, M.J. Cline, J. Hughes; and A. S. Nies Kinins : *Possible mediators of neonatal circulatory changes in man*, J. Clin. Invest 47; 1295, 1968.

٩- أَلَّا يَرَوُ إِلَيْهِ مُسْحَرٌ فِي جَوَافِعِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ<sup>١</sup>  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُغْرِيُهُنَّ ۝

୧୬ : ୭୯ ତାରା କୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ନା ଆକାଶେର ମାଝେ ଉଡ଼ିନ ଆନୁଗତ୍ୟଶୀଳ ବିହତକୁଳକେ? ଆନ୍ଦ୍ରାହିଁ ତାଦେରକେ ସେଥାନେ ଉଡ଼ିନ ଓ ଅନ୍ତିତ୍ତଶୀଳ ରାଖେନ । ଅବଶ୍ୟଇ ଏତେ ନିର୍ଦର୍ଶନ ରହେଛେ ମୁ'ମିନ ସମ୍ପଦାୟେର ଜନ୍ୟ ।

বাতাসে পাখা বিস্তার করে পাখির আকাশচারণ মানুষের জন্য সর্বকালের বিশ্বয়। আমরা পাখির এই বায়ুমণ্ডলে আকাশে উড়ওয়নের ব্যাখ্যা করতে পারি শক্তির বিশ্লেষণ বা পৃথকীকরণ সূত্র এবং নিউটনের গতি সম্পর্কিত ততীয় সূত্রের ভিত্তিতে। পাখা সঞ্চালনের মাধ্যমে উড়ওয়নের বেলায় উপরে ওঠা ও অভিকর্ষক টানে ধাক্কার শক্তি আসে একজোড়া পাখার সঞ্চালন বা আলোড়নের কারণে। পাখার নিম্নাভিমুখী সঞ্চালন অভিঘাতের সময় নিম্নে প্রদন্ত ছবি অনুযায়ী বাতাস কখ অভিমুখে ধাবিত হয়। আর নিউটনের গতিসংক্রান্ত তয় সূত্র অনুযায়ী, প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি ডানায় কখ দিকাভিমুখে কাজ করে (চিত্র ৯)। কখ দিকাভিমুখে ক্রিয়াশীল পাখার শক্তিকে কগ ও কঘ দিকাভিমুখী শক্তি হিসেবে আলাদা বা বিশ্লিষ্ট করা যায়। আর এই শক্তির উপাদানগুলো যথাক্রমে অভিকর্ষ টানের বিরুদ্ধে ওপরে ওঠায় এবং প্রয়োজনীয় ধাক্কার শক্তি জুগিয়ে পাখিকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমর্থ করে। একটি সম শর উড়ওয়নের সাথে সামনের দিকে উড়ে এগিয়ে যাওয়ার বেলায় পাখির পাখা নিচের ও সামনের দিকে তার দেহের সাথে আপেক্ষিকতা বজায় রেখে আন্দোলিত হয়। এর ফলে পাখার নিম্নাভিমুখী অভিঘাতের সময় সামনের দিকে একটা ধাক্কার সৃষ্টি হয়। আর পাখির পাখার অভিঘাত যখন ওপরের দিকে ঘটে তখন পাখা দুটি উল্টো ওপরের দিকে অভিঘাত করে ফলে পাখা দুটি এমনভাবে বাতাসে আঘাত হানে যাতে ওপরে ওঠার একটা শক্তি তৈরি হয়। এ সময় পাখা দুটি দ্রুত পেছনের দিকে সঞ্চালিত হয় যার ফলে সামনের দিকে যাওয়ার গতির সৃষ্টি করে। এমনিভাবে উপরে ওঠা ও সামনের দিকের ধাক্কাজনিত শক্তি পাখা নিম্ন ও উর্ধ্বাভিমুখী উভয় অভিঘাতেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাখির উড়ওয়নের ক্ষেত্রে ডানা ঝাপটে পাখির উড়ওয়ন সবচেয়ে কার্যকর।



চিত্র ১৯

পাখির ওড়ার আরও দু একারের পদ্ধতি রয়েছে : ১. অবতরণমূলক উড়য়ন; ও ২. আরোহণমূলক উড়য়ন। অতরণমূলক উড়য়নে পাখি উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে। তখন অভিকর্ষের টান পাখিকে নিচে নামার শক্তি বা ঠেলা দিয়ে সহায়তা করে। উর্ধ্বারোহণমূলক উড়য়নে পাখি উর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহের সুবিধে নেয় আর সে ক্ষেত্রে তার পাখা চালনা বা ঝাপটানোর দরকার হয় না। বহু পাখি সময়ের পরিবর্তন বা আনুভূমিক বাতাসের গতিকে কাজে লাগায় এবং ঐ বাতাসের মাঝে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনুভূমিক সঞ্চারের মহুর্তগুলোকে কাজে লাগিয়ে উর্ধ্বারোহণ করে। আলব্যাট্রিস পাখি এ ধরনের উর্ধ্বমুখী ভাবে ওড়ে এবং বাতাস থেকে বিপুল গতি ও শক্তি সঞ্চয় করে। এরপরে এই পাখি অবতরণমুখী উড়য়ন কৌশল কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের উপরিভাগে খাদ্যের সঙ্গে বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে। যখন তার উড়য়নের গতি অনেকটাই হ্রাস পায় তখন অ্যালব্যাট্রিস আবার ওপরের দিকে উড়তে শুরু করে এবং আবার নিম্নাভিমুখী অবতরণের জন্য একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে নিম্নাভিমুখী অবতরণমূলকভাবে ওড়ে। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে অ্যালব্যাট্রিস সাগরের ওপর হাজার হাজার মাইল ধরে ওপরের দিকে ওড়ে। এজন্য তার পাখা ঝাপটানোর প্রয়োজন হয় না। হামিং বার্ডের মতো কোনো কোনো পাখি আকাশে খাড়াখাড়ি উর্ধ্বে এমনকি খাড়াখাড়ি নিচেও উড়ে নামতে পারে। পাখির সবচেয়ে বিশ্বয়কর বিষয় হলো তারা বাতাসে হেলিকটারের মতো হির হয়ে থাকার ক্ষমতা ও তারই মধ্যে ফল থেকে মধু আহরণ করতে পারে। তাদের এই সামর্থ্যের গোপন রহস্য হলো তাদের পাখা তাদের কাঁধের সাথে একটি বিশেষ ধরনের সুইলেন (ঘূর্ণায়মান) সঞ্চি সন্নিবেশিত থাকে।

ପାଖିର କଙ୍କାଳ ପ୍ରକୃତିର ହାଲକା ପ୍ରକୌଶଳ ଓ ନିର୍ମିତିର ଅପୂର୍ବ ନିର୍ଦଶନ । ପାଖିର କଙ୍କାଳେ ରଯେଛେ ହାଲକା ଦେହକାଠାମୋର ସାଥେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟେର ସମସ୍ୟା । ସେ ସବ ପାଖି ଆକାଶେ ଓଡ଼ି ତାଦେର ବକ୍ଷଦେଶେର ଅନ୍ତିମ ଖୁବହି ହାଲକା- ପାତଳା ହଲେଓ ତାତେ ସନ୍ନିବେଶିତ ରଯେଛେ ଗଭୀରେ ହୃଦୀପିତ ଏକଟି ତଳଦେଶେର ମତୋ ବିନ୍ଦୁତତର ପାତ ବିଶେଷ ଯାର ସାଥେ ଆଟକାନୋ ରଯେଛେ ଓଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପେଣୀ । ଓଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ହାଲକା, ପାତଳା ଶାରୀରିକ ଗଡ଼ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବଲେ ପାଖିର ଶରୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶୟକରଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଯେଛେ ବାୟୁଥିଲିଙ୍ଗଲୋ ବିନ୍ୟାସେର ଆକାରେ । ଏହି ବାୟୁଥିଲିଙ୍ଗଲୋ ପାଖିର ଶରୀରେର ଏମନକି ଫାଂପା ହାଡ଼େର ମଧ୍ୟେ ସହ ପ୍ରାୟ ସକଳ ଅଙ୍ଗେ ବିନ୍ୟାସ ରଯେଛେ । ଏହି ଜଟିଲ ଧରନେର ବାୟୁଥିଲିଙ୍ଗଲୋର ସାଥେ ବୁନ୍ଦୁଦେର ବୁନ୍ଦ ପାଖିକେ ଅଧିକତର ବଡ଼ୋ ଫୁସଫୁସ ବିଶିଷ୍ଟ ତନ୍ୟପାଯୀ ପ୍ରାଣୀଦେର ଚେଯେଓ ତାର ପ୍ରଶ୍ଵାସେର ବାୟୁରେ ତାର ଛୋଟ୍ ଫୁସଫୁସେ ଅନେକ ବେଶି ଦକ୍ଷତାର ମଙ୍ଗେ ଛେଡ଼େ ଦିତେ ସମର୍ଥ କରେ । ଏହି ବାୟୁଥିଲିଙ୍ଗଲୋ ପାଖିର ଜନ୍ୟ ତାପନିୟମକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାଜିଟିଓ କରେ । ବଲା ଦରକାର ପାଖିର ଦେହେର ବିପାକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତତର । ପାଖିର ଶରୀରେର ତାପର ଥାକେ ଅନେକ ବେଣୀ । ଆର ସେଇ ସାଥେ ଘାମ ଶୀତଳ କରାର ଜନ୍ୟ କୋନୋ ଏହିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ।

ପାଖିର ପାଖନା ଏକ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ । ଏହି ପାଖନା ପାଖିକେ ସନ୍ଦେହାତୀତ ଭାବେ ସକଳ ଆକାଶଚାରୀର ମାଝେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଯେଛେ । ପାଖନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଓ ଗଠନେର ଦିକ୍ ଥିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀଓ । ପାଖିର ପାଖନାର ଶକ୍ତି ଦାଢ଼ି ଏକଟା ଝଜୁତା ଦେଓଯାର ସାଥେ ସାଥେ ପାଖନାର ଅନ୍ତଭାଗକେ ବାତାସେ ଓଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା କରାର ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଦେଯ । ପାଖନାର ନକଶାର ସୂଚିତମ୍ବୂଚିତ ପାଖନାକେ ଅଗୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରେ ନିଚେ ଧରଲେ ବୋରା ଯାଯ । ଏତେ ଦେଖା ଯାବେ ପ୍ରତିଟି ଆନୁଭୂମିକ ଫଳାର ମତୋ ବସ୍ତୁ ପାଖନାର ମୂଳ ଦସ୍ତ ଥିକେ ତୀର୍ଯ୍ୟକଭାବେ ଆଡ଼ାଆଡ଼ି ବିନ୍ୟାସ ଆର ଏଣ୍ଟଲୋର ସାଥେ ସଂଲଗ୍ନ ରଯେଛେ ଅସଂଖ୍ୟ କୁଦ୍ରାକାର ଶାଖା (barbules) ଯା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଙ୍ଗଲୋତେ ହେରିଏ ମାଛେର କାଟାର ମତୋ ବିନ୍ୟାସେ ଅଧିବ୍ୟାପିତ ହୁଏ ଆଛେ । ଆର ଏଣ୍ଟଲୋ ଥିକେ ଅତି କୁଦ୍ରାକୃତି କିଛି ବସ୍ତୁ ବେରିଯେ ଆଛେ ଯେଣ୍ଟଲୋକେ ଫଳାର ଶାଖାଗୁ ବା ବାରବିସେଲେ ବଲା ହୁଏ । ଏରକମ ବାରବିସେଲେର ସାଥେ ଅତି କୁଦ୍ର ବଁଢ଼ିଶିର ମତୋ ଆଂଟା ସଂଲଗ୍ନ ଥାକେ ଆର ଏଣ୍ଟଲୋ ପରିପାଟିଭାବେ ସବକିଛୁ ତାର ଯଥାନ୍ତାନେ ହିଂର ଥାକତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏତାବେ ସ୍ପଷ୍ଟତ ଦେଖା ଯାଯ, ପାଖିର ଏହି ପାଖନା ଆକାଶେ ଓଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ଆଗ୍ରାହ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପହାର ବିଶେଷ ।

ପାଖିର ଆକାର ଯତୋ ବଡ଼ୋ ହବେ, ପାଖିର ଓଡ଼ାର ସମସ୍ୟାଓ ତତୋଥାନି ବାଡ଼ବେ । ପାଖିର ଓଜନ ରୈଥିକଭାବେ ଘନ ମାତ୍ରାର ହାରେ ବାଡ଼େ ଆର ସେଇ ସାଥେ ପାଖିର ବର୍ଗେର ଆକାରେ ଉପରିତଳେର ଆୟତନଓ ବାଡ଼େ । ପାଖିର ଉନ୍ନତତର ଉଡ଼େଯନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର

করে উচ্চতর উপরিতল এলাকার ওপর। কেবল, বাতাসে অঙ্গীজেনের সীমাবদ্ধতার কারণে নিম্ন তাপমাত্রা ও বাতাস পাতলা হয়ে আসার জন্য পাখিরা সাধারণত আকাশে ১০ থেকে ১৫ হাজার ফুট ওপরে ওঠে। পাখিদের ২৪ ঘণ্টায় গড় উড়ওয়নের হার ৩০০-৪০০ মাইল। কোনো কোনো পাখি অবশ্য ২৪ ঘণ্টায় ৭০০ মাইল পর্যন্ত ওড়ে বলে রেকর্ড করা হয়েছে। কোনো কোনো পাখি খাদ্যের এক বিরাট এলাকা অত্যন্ত উঁচু দিয়ে ওড়ে। মৌসুমি পাখি যেমন সাইবেরিয়ার পাখিরা আকাশের অত্যন্ত উঁচু দিয়ে অত্যন্ত নিয়মিত ও নিখুঁতভাবে অবিশ্বাস্য দূরত্বের গন্তব্যে চলাচল করে।

মানুষের আকাশে ওড়ার আকাশে উনিশ শতকের শেষাবধি পূরণ হয়নি। ঐ সময়ে আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় গ্লাইডারের উড়ওয়নের নিয়ম সূত্রকে ভিত্তি করে তাঁদের ঐতিহাসিক আকাশ ভ্রমণে সক্ষম হন। মানুষ পাখির ওড়ার জটিল কার্যপ্রণালী সমীক্ষা করে ক্রমান্বয়ে আধুনিক বিমান তৈরি করে। বিমানের মাটি থেকে উর্ধ্বারোহণ ও সামনের দিকে ঠেলে দেওয়ার শক্তি আসে তার প্রপালশান ইঞ্জিন ব্যবস্থা থেকে। এই ইঞ্জিন বা টার্বাইনচালিত প্রপেলার বা টার্বাইন সৃষ্টি জেট প্রবল বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করে বিমানের পাখায় শক্তি যুগিয়ে উর্ধ্বারোহণের ব্যবস্থা করে।<sup>১২</sup>

প্রকৃতির এইসব নিয়ম সূত্র সম্পর্কিত জ্ঞান বা স্রষ্টা নির্ধারিত ‘নির্দর্শনগুলো’ সত্ত্বিকার অর্থেই উপলব্ধির বিষয়।

### তথ্যসূত্র :

1. Encyclopaedia Americana.
2. Encyclopaedia of Science and Technology, McGraw Hill, Vol. 5, 1977.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ  
بِيُونَاتٍ تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَغْيَانٍ وَيَوْمَ إِقْلَامٍ كُلُّهُ دِرْمَادٌ أَصْوَافُهَا وَأَذْوَافُهَا  
وَأَشْعَارُهَا أَطْرَافٌ مَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝

১৬ : ৮০ এবং আল্লাহ্ তোমাদের আবাসস্থলকে করেন তোমাদের আবাসস্থল  
যেখানে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার ও নীরবে থাকতে পার এবং  
এজন্য তিনি তোমাদের জন্য পশ্চর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন,  
তোমরা ভ্রমণকালে এটা সহজে বহন করতে পার এবং  
(কোথাও) অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পার এবং তিনি  
তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পশুর পশম, লোম ও কেশ হতে  
কিছুকালের জন্য স্থায়ী গৃহসামগ্রী ও ব্যবহার উপরকণ।

আল্লাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহে মানুষকে উন্নত বৃদ্ধিমত্তা এবং নতুনতর জ্ঞান  
অর্জনের এবং অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হবার সামর্থ্য দিয়েছেন। আর এই সুবাদে  
মানুষ ক্রমে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ও তার সুবিধা মতো পরিবেশ বদলে  
নিয়েছে। এক সময়ে মানুষ উত্তমভাবে ছাউনিযুক্ত ও সুরক্ষিত আবাস নির্মাণে  
সমর্থ হয়েছে যেখানে সে তার পরিবার নিয়ে বাস করতে, বিশ্রাম নিতে ও  
নিরাপত্তা, শান্তি ও আয়েশের সঙ্গে নিদ্রা যেতে পারে। মানুষের এই অগ্রযাত্রায়  
সে নানা জীবজগতের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার ও সে ভাবে চামড়া সংরক্ষণের  
নানা পদ্ধতি বের করেছে। নানাভাবে এ চামড়ার ব্যবহার করতে শিখেছে।  
মরুচারী ও মরুবাসী যায়াবর বেদুঈন গোত্রগুলো যারা সাধারণত তাঁবুতে বাস  
করে তাদের জন্য এই জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার বেলায় চামড়ার  
এই হালকা তাঁবু বেশ কাজে লাগে। তাছাড়া এ ধরনের তাঁবু সহজে খুলে ফেলে  
গুটিয়ে নেওয়া যায়। আর সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে  
সেখানে খুব একটা অসুবিধে ছাড়াই তাঁবু স্থাপন করা যায়।

এছাড়াও মানুষ ভেড়ার চমৎকার পশম, ছাগলের মোটা পশম ও উটের নরম  
পশম থেকে চমৎকার সুতো তৈরি করে তা দিয়ে মানুষের আরাম-আয়েশ ও  
সুবিধের জন্য কম্বল ও গরম কাপড় তৈরি করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এসব  
জিনিসপত্র মানুষকে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে ও এগুলো তৈরির কাঁচামাল  
বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ্ তরফ থেকে মহৎ উপহার। এসব উপহার অবশ্য যে  
ইহজাগতিক উপহার তা মনে রাখা দরকার। এগুলো কেবল কিছু সীমিত সময়ের  
জন্য স্থায়ী।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجَيْلَانِ أَلْنَانًا وَجَعَلَ  
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِينُكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِينُكُمْ بَا سَكُونٍ كُلُّكُمْ يُتَخَّلِّصٌ نَعْمَلَهُ  
عَلَيْكُمْ لَكُمْ شُلُونَ ۝

১৬ : ৮১ এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আস্তসমর্পণ কর।

এই সূরায় আল্লাহ চার ধরনের নিরাপত্তামূলক অনুগ্রহের কথা বলেছেন। এগুলো হলো- (১) যেসব বস্তু আমাদের ছায়াদান করে; (২) পাহাড়-পর্বত যেগুলো আমাদেরকে আশ্রয় দেয়; (৩) বস্ত্রাদি যা আমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে; ও (৪) পশ্চর্ম নির্মিত বর্মবিশেষ যা শক্রের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ছায়ার কাঠামো সম্পর্কে সূরা ২৫ : ৪৫ এ আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে গাছের ছায়ায়, কোনো উঁচু বস্তুর পাশে মাটিতে, পাহাড়ের পাশে এবং ছাদওয়ালা বাড়ীতে কড়া রোদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় নেওয়া। এমনকি মেঘের কারণে যে ছায়ার সৃষ্টি হয় তাও মরু অঞ্চলে আরামদায়ক। সূরা ৭ : ১৬০-এর আওতায় মেঘের ছায়ার বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। মানুষ ছায়াকে আরও এক কাজে ব্যবহার করেছে। আগেকার দিনে মানুষ সূর্যঘড়ির ছক এঁকে দিনের সময় নির্ণয়ের উপায় বের করেছে। দিনের বিভিন্ন সময়ে মাটিতে স্থাপন করা একটি নির্মিত কাঠামোতে সূর্যের আলো পড়ার পর যে ছায়া তৈরি হয় তার দৈর্ঘ্য মেপে ও দেখে সময় নির্ণয় করা হতো।

পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে বলা যায়, স্বরণাতীতকাল থেকেই মানুষ জানে বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত পাহাড়ের গুহাগুলো বন্যপ্রাণের আক্রমণ, উত্তাপ ও ঠাণ্ডা থেকে সুরক্ষিত ও উত্তম আশ্রয়স্থল। পাহাড়ের গুহাগুলোর অধিকাংশই সৃষ্টি হয়ে থাকে ভূমি ধসের কারণে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। তাতে মাটি

ଗଲେ ଯାଯ, ପାଥରୀ କ୍ଷୟେ ଯାଯ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୟ । ଏଭାବେ ଖୋଦିତ ହରେ ତୈରି ହୋଇଥା ଗୁହାଙ୍ଗଲୋତେ ସାଧାରଣତ ଭାଲୋଭାବେଇ ବାୟ ଚଳାଚଲ କରେ ଓ ଆଲୋକପାତ ସଟେ । ଆର ଗୁହାର ଭେତରକାର ତାମମାତ୍ରା ଓ ମୋଟାମୁଟି ଶ୍ଵିର ଥାକେ । ଏହି ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳେରୀ ଗଡ଼ ବାର୍ଯ୍ୟିକ ତାପମାତ୍ରାର ଚେଯେ କିଛୁଟା କମ । ସବଚେଯେ ଆଦି ଗୁହାବସୀ ମାନୁଷେର ବାସ ଛିଲ ଚୀନେ ଆନୁମାନିକ ୩,୬୦,୦୦୦ ବହୁ ଆଗେ । ଇଉରୋପେ ମାନୁଷ ସଞ୍ଚବତ ଆନୁମାନିକ ୭୦,୦୦୦ ଥିକେ ୧,୦୦,୦୦୦ ବହୁ ଆଗେ ବାସ କରତୋ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଭେଦା ସମ୍ପଦାଯେର ମତୋ କିଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କିଛୁକାଳ ଆଗେ ଅବଧିଓ ଗୁହାୟ ବାସ କରତ । ଫ୍ରାଙ୍ ଓ ସ୍ପେନେର କିଛୁ ଗୁହାୟ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ମାନୁଷ ଗୁହାର ପ୍ରସ୍ତର ପାତ୍ରେ ଛାପ ଦିଯେ ଓ ଖୋଦାଇ କରେ ନାନା ଚିତ୍ରମୟ ଅଲଙ୍କରଣ କରେ ରାଖତୋ । ଜର୍ଦାନ, ଇରାକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶେର କୋନୋ କୋନୋ ଅଂଶେ ଗରୀବ ଲୋକେରା ଆଜଓ ଗୁହାୟ ବାସ କରେ । ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକାଳେ ପାହାଡ଼-ପର୍ବତେର କୋନ କୋନ ଗୁହା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଥିକେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ହୁଲ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଦାମ ହିସେବେ ବ୍ୟବହତ ହେଁଥେ । ଏହାଡ଼ାଓ ଉଁଚୁ ପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ ବା ପର୍ବତମାଳା ବହିରାଗତ ଆକମଣକାରୀଦେର ହାମଲାର ବିରଳଦେହ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ହିସେବେ କାଜ କରେ ।

ପରିଧେଯ ବନ୍ଦେର ବିଷୟେ ବଲା ଯାଯ, କାଲପରିକ୍ରମାର ଏକଟି ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ମାନୁଷ ତାର ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରଦତ୍ତ ମେଧା ଓ ଉତ୍ୱାବନୀ କ୍ଷମତାବଲେ ନାନା ଧରନେର ତ୍ତ୍ଵ ଓ ସୁତୋ ତୈରି କରତେ ସମର୍ଥ ହୟ ଏବଂ କେବଳ ଶୀତ ଥିକେ ନୟ ଗରମ ଥିକେ ଶରୀରକେ ରକ୍ଷା କରତେ ସୁତୋ ବା ତ୍ତ୍ଵ ବୁନତେ ଶେଷେ । ବନ୍ଦୁ ଉତ୍ୱମ ତାପ କୁପରିବାହୀ, ଆର ଏର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ବାତାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୁକ୍ତ । ଆମରା ବନ୍ଦୁ ବୟନ ଶିଳ୍ପଜାତ କାପଡ଼େର ଯେସବ ଜାମାକାପଡ଼ ପରି ତା ବାଇରେ ଥିକେ ଅତିରିକ୍ତ ତାପ ଆମାଦେର ଦେହକେ ପୌଛୁତେ ଦେଯ ନା ଓ ତାତେ କରେ ଆମରା ଅସ୍ତରିତ ହାତ ଥିକେ ବେଁଚେ ଯାଇ । ଆର ତାପଜନିତ କାରଣେ କୋନୋ ଫୋଟକ୍ ହୟ ନା ।

ସବଶେଷେ ବର୍ମ ତଥା ଚାମଡ଼ାର ଢାଲେର ଆଲୋଚନାୟ ବଲତେ ହୟ, ମାନୁଷେର ଜ୍ଞାନେର ପରିଧି ବିସ୍ତୃତତର ହୋଇଥାର ସାଥେ ସାଥେ ମାନୁଷ ଲୌହ ଆକର ଆବିଷ୍କାର କରେଛେ ଏବଂ ତା ଥିକେ ଆକର ତୁଲେ ତା ଦିଯେ ବହୁ ଦରକାରି ହାତିଯାର ବିଶେଷ କରେ ଢାଲ ତୈରି କରେଛେ । ଏହି ଢାଲ ବା ବର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଫଲ୍ୟେର ସମେ ବ୍ୟବହତ ହେଁଥେ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର ୧

1. The World Book of Encyclopaedia, Field Enterprises Educational Corporation, Vol. III, London, 1966.
2. Collier's Encyclopaedia, Colliers and Sons Limited, Vol. V, USA, 1980.

۱۴- فَكُلُّا مِنْ أَرْزَقْنَا لَهُ حَلَالًا طَيْبًا وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ ○

১৬ : ১১৪ অতএব, আল্লাহ্ যা কিছু হালাল ও পাক রিয়ক্ তোমাদেরকে দান করেছেন তা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের (নেয়ামতের) শোকর আদায় কর যদি সত্য তোমরা তাঁরই এবাদত কর।

খাদ্যের হালাল হারাম বিষয়ে ২ : ১৬৮ ও ২ : ১৭২ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

۱۵- إِنَّا حَزَمَ عَلَيْكُمُ الْمِيَتَةَ وَ الدَّمَرَ وَ كُحْمَ الْخَنِيرِ وَ مَا أَهْلَ لِغَيْرِ النُّوْبَةِ  
فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِ وَ لَا عَادَ فَلَئِنَّ اللَّهَ عَفُوزٌ رَّحِيمٌ ○

১৬ : ১১৫ নিচয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য মরা জীব, রক্ত শূকরের মাংস আর সেই সব জন্ম যাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে জবাই করা হয়েছে হারাম করেছেন। অবশ্য ক্ষুধার ফলে বাধ্য হয়ে আল্লাহর আইনের বিরোধী বা সীমালংঘনকারী না হয়ে খায় তবে নিচয়ই আল্লাহ্ দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

এ বিষয়ে ২ : ১৭৩ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

۱۶- وَجَعَلْنَا لِلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِيَتَيْمٍ تَسْهِلَنَا إِلَيْهِ الْأَيْلَلِ وَجَعَلْنَا إِلَيْهِ النَّهَارَ مُبَصِّرَةً  
لِتَبَتَّعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَذَابَ التَّنِينِ وَ الْجَنَابَ  
وَ كُلَّ شَيْءٍ وَ نَصَّلَهُ تَنْصِيلًا ○

১৭ : ১২ আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দুটি নিদর্শন; রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি ও দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্কান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব নির্ণয় করতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

উল্লিখিত আয়াতের এই অংশে রাত ও দিনকে আল্লাহর দুটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাত ও দিনের বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে সূরা ২ : ১৬৪ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায়।

۱۴- وَكُمْ أَفْلَكْنَا مِنَ الْقَرْوَنْ مِنْ بَعْدِ لَوْجٍ وَكُلِّ بَرْكَتٍ بَذَلَّابٌ عَيَادٌ  
خَيْرًا بَعْصَرًا ○

১৭ : ১৭ নৃহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার  
প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও  
পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

এই আয়াতে নৃহ (আ)-এর পর কয়েক প্রজন্মের মানব ধ্বংসের বিষয়ে  
উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোন কোন প্রজন্ম তা উল্লেখ করা হয়নি কিংবা কোন  
অপরাধে তাদের ধ্বংস করা হলো তারও উল্লেখ নেই। সূরা ৭ : ৪ সম্পর্কিত  
আলোচনার আওতায় বিভিন্ন মানব প্রজন্মের ধ্বংসের উল্লেখ নয়, বিভিন্ন শহর  
ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে।

٢٣- تَسْبِحُهُ لَهُ التَّمَوُتُ السَّبْعُ الدَّرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ  
وَلَنْ مَنْ شَاءَ إِلَّا يُسْتَخْرُجُ مَحْمِدًا وَلِكِنْ لَا تَنْفَعُهُنَّ تَسْبِيحُهُمْ  
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُوزًا ○

১৭ : ৪৪ সম্পর্কিত আকাশ পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্ভুক্তি সম্পত্তি কিছুই তাঁরই  
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর  
সপ্রসংশ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের  
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না;  
তিনি সহনশীল, ক্ষমাপ্রাপ্য।

সূরা ২ : ২৯ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায় সম্পূর্ণ আকাশ ও পৃথিবী  
সম্পর্কিত বিষয়ের বিবরণ আছে। সম্পূর্ণ আকাশ ও পৃথিবীতে সৃষ্টি সকল জড় বস্তু ও  
প্রাণী যে আল্লাহ'র প্রশংসা করে তার অর্থ তারা তাদের জন্য আল্লাহ'র নির্ধারিত  
বিধি-বিধান কঠোর নিষ্ঠার সাথে পালন করে তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে।  
বিষয়টি সূরা ১৩ : ১৫ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٤٤- رَبُّكُمُ الَّذِي يُنْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ نَفْلِهِ  
إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○

১৭ : ৬৬ তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান  
পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সঞ্চান করতে  
পার। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

সূরা ২ : ১৬৪ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায় জাহাজ নির্মাণ ও তাদের নৌযাত্রা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ রয়েছে।

۱۶۴-۷۰  
أَفَمِنْتَهُ أَنْ يَخْسِفَ بِكُفَّرٍ جَانِبَ الْبَرِّ أَذْبَرُ سَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا  
ثُرَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ دِيْكِيلًا

১৭ : ৬৮ তোমরা কী তা হলে নিরাপদ বোধ কর যে যখন তোমরা যমীনে অবস্থান কর তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকার নিচে গ্রাস করবার কারণ ঘটাবেন না কিংবা তোমাদের উপর শিলাবর্বণসহ প্রচণ্ড ঝড় পাঠাবেন না? তখন তোমরা কাকেও পাবে না তোমাদের বিষয়াদি পরিচালনা করতে।

এই আয়াতে মানুবকে ইঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে তারা যেন ধরাপৃষ্ঠে থাকতে পারছে বলেই নিজেদেরকে নিরাপদ বোধ না করে। উল্লেখ করা হয়েছে, স্থলভাগও ভূমিকম্প ও ঝড়ের ধাক্কা সাপেক্ষ। এই দুই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকই বিরাট বিপর্যয় ঘটাতে পারে ও তাতে বহসংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটতে পারে।

১. সূরা ৭ : ৯১-এর আলোচনায় ভূমিকম্পের বিষয় আলোচিত হয়েছে।
২. কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ঘূর্ণিবাত্যা হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আবহাওয়ার নানা উপাদানের মধ্যে বাতাস সম্বৃত সবচেয়ে হেঁয়ালিময়। মূলত বাতাস হলো বায়ু যা গতিতে বিদ্যমান রয়েছে। তবে এমনকি একটি মাত্র মৌসুমেও বাতাসের শক্তি ও প্রবাহের দিকের মধ্যে যে বিরাট বৈচিত্র্য রয়েছে সে সবের কারণ বহু ও জটিল। স্থলভাগ থেকে বাতাসের প্রবাহ যখন সমুদ্রে এসে পড়ে কিংবা সমুদ্র থেকে বাতাস স্থলভাগে প্রবাহিত হয় তখন বাতাস যে আকার নেয় ও যে শক্তি বা প্রচণ্ডতায় প্রবাহিত হয় তা সর্বদাই ক্রমাগতভাবে পরিবর্তনশীল তাপমাত্রার বিন্যাস, পাহাড়-পর্বত ও অন্যান্য ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগত কারণ ও সেই সাথে পৃথিবীর আপন কক্ষে<sup>১</sup> আবর্তনের কারণে প্রভাবিত হয়।

বাতাসের গতি বর্তমানে বিউফোর্ট স্কেল দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। বাতাসের গতির ভিত্তিতে এই বিউফোর্ট স্কেলে জল বা স্থলভাগের পরিস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

বিউফোর্ট নং	শিরোনাম	গতিসীমা (৩০ ফুট) খোলা জায়গায় (ঘন্টায়প্রতিমাইল)	স্লভাগের সাধারণ চিত্র	জলভাগের সাধারণ চিত্র
০	শান্ত	১-এর কম	শান্ত	আলোড়ন নেই
১	হালকা বাতাস	১-৩	বাতাসের গতি ধোয়ার প্রবাহ দ্বারা প্রদর্শিত	ছোট দৈর্ঘ্যের চেট
২	হালকা মৃদু বাতাস	৪-৭	গাছের পাতার খসখস আওয়াজ	ছোট ছোট তরঙ্গ
৩	মৃদুমূল্য বাতাস	৮-১২	পাতা ও ছোট ফড়কির অন্বরত আলোন	অপেক্ষাকৃত বড়ো তরঙ্গ
৪	মাঝারি	১৩-১৮	ধূলো ওড়ে, ঝরা পাতা ও শাখা দূরে সরে যায়	আরও বড়ো তরঙ্গ
৫	তাজা বাতাস	১৯-২৪	ছোট আকারের গাছ ও পাতা দুলতে শুরু করে	মাঝারি ধরনের চেট ও আরও লক্ষ্যণীয় দৈর্ঘ্যের চেট
৬	জোর বাতাস	২৫-৩১	বড়ো ডালপালার ব্যাপক আলোন	বড়ো আকারের তরঙ্গ ও ফেনায়িত উমিশীর্ব
৭	মাঝারি ঝড়	৩২-৩৮	গোটা গাছ দুলতে থাকতে	সাগর উচ্চাসিত হয়ে ওঠে
৮	নতুন স্ট্র ঝড়	৩৯-৪৬	গাছের ফড়কি ডেঙ্গে উড়িয়ে নেয়	মাঝারি ও এচর ফেনায়িত তরঙ্গ
৯	প্রবল ঝড়	৪৭-৫৪	নির্মাণ কাঠামোসমূহের সামান্য ক্ষয়ক্ষতি	উচু তরঙ্গ ও ঘন ফেনা
১০	পূর্ণ ঝড়	৫৫-৬৩	উৎপাটিত বৃক্ষ, বাঢ়িঘরের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি	অত্যন্ত উচু তরঙ্গ
১১	প্রবল ঝড়	৬৪-৭৫	ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি	এতো উচু চেট যে সঙ্কীর্ণ চ্যানেলে থাকা জাহাজ ও দেখা যায় না
১২	হারিকেন	৭৫-এর উর্ধ্বে	"	বাতাসে ফেনা ও অন্যান্য দ্রব্য

## তথ্যসূত্র :

1. B. David Bowen, Britain's Weather, pp. 29-32.

٤٠- وَلَقَدْ كُرِّمَ مَنْ أَبْيَقَ أَدْمَرَ وَحَسَّلَهُ مِنِ الْبَرِّ وَرَزَقَهُ مِنِ الْقَطْنَبِ  
وَفَضَّلَهُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ حَلَقَنَا تَغْضِيلًا

১৭ : ৭০ আমি তো আদম সন্তানদেরকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে  
তাদের চলাচলের জন্য যানবাহন দিয়েছি; তাদেরকে উভয়  
রিয়িক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের  
অনেকের উপরেই তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

এই আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ্ মানুষকে কী বৈশিষ্ট্য ও গুণ দিয়েছেন সে  
সবের বিষয় স্বরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে সৃষ্টিধর্মী বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন  
যা আল্লাহহ তাঁর অন্যান্য সৃষ্টিকে দেননি। মানুষ তার এই সৃষ্টিধর্মী মেধা দিয়ে  
নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। যন্ত্র দ্বারা মানুষ জলে, স্থলে,  
অন্তরীক্ষে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। আল্লাহহ মানুষকে বিভিন্ন  
বস্তু দান করেছেন সেগুলি থেকে তাদের বেঁচে থাকার অবশ্যিনী খুঁজতে হয়। বস্তুত  
মানুষ যে দিন থেকে এই ধরায় অস্তিত্বশীল ঠিক সেই দিনটি থেকে এই কাজটিই  
করে আসছে। মানুষের এই সৃষ্টিধর্মী মেধা মানুষের জন্যই বিশেষ অনুগ্রহ। তারা  
এজন্য কৃতজ্ঞতার সাথে সে কথা স্বরণ করবে সেটিই প্রত্যাশিত।

٤١- وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُؤْسِى تَشْعَأْيِتْ بِكَتْبَتْ فَنَّلَ بَيْنَ إِنْسَاءِنَيْنَ إِذْ جَاءَهُمْ  
فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظْلِكَ يُمُوسِى مَسْمُورًا

১৭ : ১০১ তুমি বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ আমি মূসাকে নয়টি  
স্পষ্ট নির্দশন দিয়েছিলাম; যখন তিনি বনি ইসরাইলদের  
সমীপে আসলেন ফিরআউন তাঁকে বলেছিল “হে মূসা, আমি  
তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।

মূসাকে (আ) প্রদত্ত নয়টি স্পষ্ট নির্দশনের মধ্যে তিনটি হলো (আছা/  
ছড়ি) (সূরা ৭ : ১০৭) এবং খরা (السَّنِينَ وَنَقْصَ منِ الشَّمَراتِ) ও স্বল্প  
ফসলের বছর (সূরা ৭ : ১৩০)। ছড়ি/ আছার অলৌকিক গুণগুলো বক্ষমান  
রচনায় আলোচনার অবকাশ নেই। খরার বছরগুলো বৃষ্টিহীনতা ও একনাগাড়ে  
শুকনো আবহাওয়ার পরিণতিতে হতে পারে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে  
ফসলের ক্ষেত্রে। আল্লাহর ইচ্ছায় নীল নদের উপত্যকার মতো উর্বর ও রেকর্ড

বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধি অঞ্চলেও হতে পারে দীর্ঘকাল বৃষ্টিপাতের অভাব যার ফলে নদীতে পানি জোগানের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ উৎসও শুকিয়ে যায়। আর অল্প ফসল হতে পারে নানা কারণে। এসব কারণের অন্যতম হলো খরা। কারণগুলো হলো (১) গোলায় বীজ মওজুদ থাকাকালে পোকা বালাইয়ের আক্রমণে রঁপু বীজ জমিতে বপনের কারণে; (২) আবাদকালে পানির বিস্কাশন ব্যবস্থার অভাবে; (৩) ফসলের সুস্থ বিকাশ ও বীজ উৎপাদনের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাবে; ও (৪) ছ্রাক ও পোকামাকড়ের বালাই ইত্যাদির জন্য। মানুষের সর্বোত্তম প্রয়াস ও যত্ন সত্ত্বেও উল্লিখিত সমস্যাগুলোর কোনো কোনোটি থাকতেই পারে।

ফিরআউনের প্রজাদের জন্য অবশিষ্ট ছয়টি নির্দর্শনের পাঁচটি হলো :  
মহাপ্লাবন, الطوفان, قمل, পঙ্গপাল, الجراد, ফসলের ক্ষতিকর কীট, মুষিকাদি,  
ব্যাং ও رَجْدِ الْصَّفَارَع (الصَّفَارَع)। যা আল্লাহ ফিরআউনের রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন তাদের উক্তত্ত্বের জবাবে শুক্রিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যদিও এ বিষয়ে তাদেরকে মূসা (আ) বারবার হঁশিয়ার করেছিলেন। এই হঁশিয়ারির বিষয় ইতিমধ্যে সূরা ৭ : ১৩৩-এর আওতায় আলোচিত হয়েছে।

অবশিষ্ট একটি অর্থাৎ নবম যে নির্দর্শনটি মূসাকে (আ)-কে দেওয়া হয় সেটি ছিল সুখ্যাত অলৌকিক বস্তু যার নাম বিপ্লব (البِيْضَاءُ) উজ্জ্বল হস্ত (উজ্জ্বল হস্ত) যে বিষয়টি এই বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার আওতা বহির্ভূত।

\* খরার নিয়ন্ত্রণ খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ, এ সমস্যার সমাধান করতে হলে বিপুলসংখ্যক শর্ত পরিমিতিসহ বহু ব্যবস্থার সমাবেশ বা আয়োজন থাকা আবশ্যিক। তাই খরার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে আর এটাকে তাঁর নির্দর্শন হিসেবে ধরা যায়।

۱۸. وَتَرَى الْأَنْوَسَ إِذَا طَلَعَتْ خَرَّورٌ عَنْ كَهْفِهِمْ دَاتَ الْيَنْبِينِ إِذَا غَرَبَتْ  
تَقْرِصُهُمْ دَاتَ الشَّمَائِلِ وَهُمْ فِي لَجْوَةٍ مُّنْهَةٍ ۝ ذَلِكَ مِنْ أَيْمَنِ اللَّهِ

১৮ : ১৭ সূর্য উদ্দত হলে তুমি দেখতে পেতে- ওরা যখন গুহার প্রশস্ত  
চতুরের মাঝে পড়েছিল তখন সূর্য গুহার দক্ষিণ দিকে হেলে যায়  
আর যখন সূর্য তাদের খেকে বামে সরে গিয়ে অন্ত যায়। এই  
সময়ই আল্লাহর নির্দর্শন।

এই আয়াতে আসহাবুল কাহফের (গুহাবাসী সঙ্গী) সাত সঙ্গী যে গুহায়

৩০৯ বছর ঘুমিয়েছিলেন সেই গুহার অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সাত মুমিন যুবক আল্লাহতে তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের ওপর অত্যাচার করা হতে পারে এই ভয়ে পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নেয় ও ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে থাকার পর তারা জেগে উঠে। তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণত মনে করা হয় এটি হলো এফিসিউসের সাত খ্রিস্টান যুবকের কাহিনী যারা রোমক সম্রাটের অত্যাচারের ভয়ে তাদের ঐ শহর ছেড়ে যায়। গিবনের 'Decline and Fall of Roman Empire'- এষ্টে এভাবেই বর্ণনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, সূর্য এমন অবস্থানে ছিল যে গোটা বছর ধরে তার ক্রিয় সরাসরি গুহায় প্রবেশ করতো না। সূর্য উঠতো গুহার ডান দিকে আর অন্ত যেতো বাম দিকে। সূর্যের প্রাত্যহিক চক্রপথ ছিল দক্ষিণে কর্কট ক্রান্তি থেকে একটি ক্রান্তিতে। যেহেতু আলোচ্য গুহার বেলায় সূর্য ডান দিকে উঠে বাম দিকে অন্ত যেতো সেহেতু স্পষ্টতই গুহার প্রবেশ পথ ছিল উত্তর দিকে। আর কোনো মানুষ ঐ গুহামুখে দাঁড়ালে সে তার ডান দিক থেকে সূর্যোদয় দেখবে ও বামদিকে সূর্য অন্ত যাবে। কাজেই ঐ গুহার অবস্থান অবশ্যই কর্কট ক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত ছিল।

কুরআনে গুহার সত্যিকারের অবস্থানের উল্লেখ নেই। খ্রিস্টান কাহিনী অনুযায়ী, এফিসিউসের গুহার অবস্থান ছিল উত্তরে  $38^{\circ}$  ডিগ্রি দ্রাঘিমায়। এরকম অবস্থানে কোনো গুহার প্রবেশপথ উত্তর দিকাভিমুখী হলে সে গুহার ভেতরে কখনও সূর্যকিরণ প্রবেশ করার কথা নয়। তাই এফিসিউসের গুহার অবস্থানটি কুরআনে গুহার বর্ণনার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ।

٢- قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ مُحَاوِرٌ كَفَرَتْ بِالذِّي خَلَقَ مِنْ شَرَابٍ ثُمَّ مِنْ  
نَطْفَةٍ ثُمَّ سَوْلَكَ رَجْلًا

১৮ : ৩৭ তার প্রতিবেশী (কথা প্রসঙ্গে) তাকে বলল, তুমি কী কুফরী কর তাঁর (সেই মহান আল্লাহর) সাথে যিনি তোমাকে প্রথমে মাটি থেকে, পরে নৃৎকা থেকে এবং পরে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করলেন?

অবিশ্বাসীরা সব সময়ই আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ

ও অবিশ্বাস করে আসছে। কিন্তু যদি কেউ নিরপেক্ষ ভাবে আল্লাহর সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে তবে তাকে অবশ্যই বিজ্ঞানী হতে হবে।

এখানে আল্লাহ মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরগুলোর উল্লেখ করেছেন। মানুষ যে মাটি থেকে সৃষ্টি এ সম্পর্কে ২ : ২৮ আয়াতে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতের تراب বলতে ধূলাবালি বুঝায়। ঔর্ধ্ব মানুষ মাটিতে মওজুদ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ থেকে সৃষ্টি। কারণ মানুষের শরীরের সকল মৌলিক পদার্থ তার খাদ্য থেকে আহরিত। আর খাদ্য (শাক-সবজি মাছ মাংসসহ) সবই শেষ পর্যন্ত মাটি থেকে উদ্ভৃত। সুতরাং মানুষ মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি। পশুপক্ষী সবই সবজি বা গাছপালা থেয়ে বাঁচে যা মাটিতে জন্মে। এই বিষয়টি ২৩ : ১২ আয়াতে বলা হয়েছে যা উক্ত আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانَ مِنْ طِينٍ  
বিষয়ে ১৬ : ৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ মায়ের পেটে মায়ের নৃৎফার ডিস্ব আর বাপের নৃৎফার শুক্রকীটি এর মিলনে সৃষ্টি zygote থেকে উদ্ভৃত তা আজ বৈজ্ঞানিক সত্য। এই সৃষ্টিতে মানুষের সরাসরি কোন কর্তৃত্ব বা ক্রিতিত্ব নেই। শিশুর লিঙ্গ আল্লাহই ঠিক করেন এবং এর উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

بِهِ نَعَى رَبِّنَ اُنْ يُؤْتَيْنَ شَيْئًا مِّنْ جَنْتِكَ وَيُزِيلَ عَلَيْكَ مُحْسِنًا  
مِنَ التَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْقاً

১৮ : ৪০ তবে হয়ত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ থেকে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, যার ফলে তা উত্তিদ শূন্য মাটিতে পরিণত হবে।

হস্বানান শব্দটির আক্ষরিক অর্থ (মর্মে উপলক্ষ করানোর উপায় হিসেবে) আর আলোচ্য আয়াতে এর প্রচল্ল অর্থ হতে পারে আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো দুর্বিপাক। আলোচ্য প্রসঙ্গের আলোকে এই দুর্বিপাক বলতে বজ্রপাত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

বজ্রপাত সবসময় বিজলী চমকানোর সাথে সম্পর্কিত; মেঘ থেকে পৃথিবীর

মাটিতে বজ্রপাতের ফলে প্রাণহানি ছাড়াও বিষয় সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। বজ্রপাতে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয় তাতে যে পথ দিয়ে বজ্রপাত ঘটে সেই পথ বরাবর ও কাছাকাছি সবকিছুই পুড়ে যেতে পারে যদি না মাটির সাথে সংযোগসহ বজ্রপাতের বিরুদ্ধে রক্ষামূলক ব্যবস্থা না থাকে। প্রতি বছর বজ্রপাতে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই আনুমানিক ১৫০ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে, ২ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতি হয়, ১০,০০০-এর মতো ঘটনা ঘটে ও ৩ কোটি ডলার মূল্যের দামী ও বিক্রির উপযোগী কাঠ<sup>১</sup> ধ্রংস হয়ে থাকে। বজ্রপাত ঘটলে এমনকি একটি চমৎকার তরঙ্গতার সুন্দর বাগানও অল্লিদিনের মধ্যেই পতিত ভূমিতে পরিণত হয়, অত্যন্ত উর্বর জমি একেবারেই উষর, অনুর্বর হয়ে ওঠে এবং ক্রমে বালুময় হয়ে পরিশেষে কার্যত এক নিদারুণ মরুভূমি হয়ে ওঠে।

বিজলী চমক ও বজ্রপাতের বিধ্বংসী প্রভাব প্রতিক্রিয়ার বিষয় কিছুটা বিশদ কলেবরে সূরা ১৩ : ১২-তে এ সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

শিলাখাড়, হারিকেন কিংবা বেশ বড়ো আকারের জুলন্ত উক্কাপিও পৃথিবীতে আঘাত হানে। এ ধরনের উক্কাপিও পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানার পর ঐ প্রচণ্ড আঘাতে যে গর্তের সৃষ্টি হয় তাতে আটকে থাকে। এ ধরণের উক্কাপাতে সুন্দর বাগানও ধ্রংস হয়।

### তথ্যসূত্র :

1. Encyclopaedia Britannica, Vol. 10, 15th edition, p. 966, 1980.

○ أَوْ نُصِّبُهُ مَأْوَىً هَا غُرْزًا فَلَمْ يَنْتَطِعْ لَهُ طَلْبًا ۚ

୧୮ : ୪୧ ଅଥବା ଏ ବାଗାନେର ପାନି ମାଟିର ତଳାର ଅସ୍ତର୍ମିହିତ ହବେ ଆର ତୋମରା କରନ୍ତି ତାର ସଙ୍କାନ ଲାଭେ ସଙ୍କର ହବେ ନା ।

ବାଗାନେ ଭୂଗର୍ତ୍ତ ଥେକେ ଯେ ପାନି ପାଓୟେ ଦାର୍ଯ୍ୟ ମେଟ୍ ଭୂଗର୍ତ୍ତ ପାନିର ପ୍ରଶ୍ନତ୍ବ ଲୋପ ପାଓୟାର ଫଳେ ବାଗାନଟି ମରନ୍ଦମ୍ ହୁଯେ ଉଠି ବ୍ୟାହ ହୁଅ ପାରେ । ବାଗାନେର ଜଳ ପାନିର ଏରାପ ଅନୁପଶ୍ରିତ ନାନାଭାବେ ଘଟାଇ ପାରେ, ଯେମନି ୯

(୧) ପାନିର ମୂଳ ଉଣ୍ଡଟି ଶ୍ରକିଯେ ଯା ଓୟାର ପାନିର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୁଅ ପାରେ; (୨) ଭୂଗର୍ତ୍ତ ପାନିର ଶ୍ର ଆର ଓ ନିଚେ ଚାଲେ ଯେତେ ପାରେ ଯାର ନାଗାସ ପାଓୟେ ଦୃଢ଼ନ୍ଦ୍ରିୟ ହୁଯେ ଉଠାଇ ପାରେ; (୩) ଭୂମିକଷ୍ପେର କାରଣେ ଗ୍ରାହିକା ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ସାନ-ପତନେର କାରାଣେ ଏ ବାଗାନ ଥେକେ ପାନିର ପ୍ରବାହେର ଧାରାଟି ଆର ଓ ଦୂରେ ଅନ୍ୟଦିକ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ପାରେ ।

○ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الْلُّنْيَا كَمَّا أَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ فَانْخَلَطَ بِهِ بَأْثَ  
الْأَرْضِ فَاصْبِرْ مَثِيمًا تَذَرُّدُهُ التَّرْبُجُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُفْتَهِرًا ۖ

୧୮ : ୪୫ ତାଦେର ନିକଟ ପେଶ କର ଉପମା ପାର୍ବିବ ଜୀବନେର : ଏଟା ପାନିର ନ୍ୟାୟ ଯା ଆମି ବର୍ଷଣ କରି ଆକାଶ ହତେ, ଯଦ୍ବାରା ଭୂମିଜ ଉତ୍ସିଦ୍ଧ ସନ ସନ୍ନିବିଷଟ ଯା ଉତ୍ସାନ ହୁଯ, ଅତଃପର ଯା ବିଶ୍ଵକ ହୁଯେ ଏମନ ଚର୍ଚ-ବିଚର୍ଚ ହୁଯ ଯେ, ବାତାମ ତାକେ ଉଡ଼ିଯେ ନିଯ୍ୟେ ଯାଯ । ଆଶ୍ରାହ ସବ ବିଷୟେ ଆଧିପତ୍ୟଶୀଳ ।

ଆକାଶ ଥେକେ ବାରିପାତ ଓ ତାର ସାଥେ ଉତ୍ସିଦ୍ଧେର ବିକାଶେର ବିମୟାଟି ନିଯ୍ୟେ ଆଲୋଚନା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରଯେଛେ ମୂରା ୨ : ୨୨ ଓ ମୂରା ୨ : ୧୬୪-ର ଆଓତାଯ ।

ଉତ୍ସିଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧତର ଓ ସୁନ୍ଦର ହୁଯେ ଉଠି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ସନଶ୍ୟାମ ଚେହାରା ଧାରଣ କରେ । କିନ୍ତୁ ତାର ଏହି ଘନ ସବୁଜ ତାରଣ୍ୟ ଓ ମୌବନ ଚିରଦ୍ଵାରୀ ନୟ ବରଂ ନଷ୍ଟର ଓ ନାମ୍ୟିକ । ମାତ୍ର ସୀମିତ ସମୟେର ଜନ୍ୟ ଏ ଅବଶ୍ଵା ଦ୍ଵାରୀ ହୁଯ । ତାରପର ଜରା, କ୍ଷୟଗ୍ରହ ହିଁୟେ ପଡ଼େ ଆର ବାତାମେ ଉଡ଼ିଯେ ନେଇୟାର ଜଳ ଅଚିରେଇ ଶକନୋ ଆବର୍ଜନାୟ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଯ । ଏହି ତାର ଅନିବାର୍ୟ ନିୟମିତ । ତାରପର ତାର ଆର କୋମେ ଅବଶେଷେର ଚିହ୍ନାମ ଥାକେ ନା । ଏହି ଉପମାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମାଦେରକେ ପୃଥିବୀରେ ଆମାଦେର ସାମ୍ୟିକ ଅନ୍ତିତ୍ରେ ପ୍ରକୃତିଟି ବୁଝେ ଉଠାଇ ନାହାୟ କରେ ।

٤٠- وَيَوْمَ نُسْتِرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِشًا  
وَحَسْرَتْهُمْ كَمْ نُغَاوِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا

১৮ : ৪৭ এবং একদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে  
দেখবে উন্মুক্ত সমতল প্রান্তর হিসেবে ।

আনুমানিক পাঁচশ কোটি বছরের পরিক্রমায় সূর্য এক বিরাট রক্তিম গোলকে  
রূপান্তরিত হবে বলে মনে করা হয় । তখন এই সূর্যের ব্যাস তার বর্তমান আকার  
থেকে শতগুণ বাঢ়বে । আর তেমন অবস্থায় ১১: বুধ ও শুক্র গ্রহকে প্রাস করে  
পৃথিবীর কক্ষপথ প্রায় স্পর্শ করবে । পৃথিবীর সকল সমুদ্রের পানি বাল্প হয়ে উভে  
যাবে । অতি প্রথম সূর্যকিরণে ধাতব সব বস্তু গলে যাবে । পৃথিবী হয়ে উঠবে এক  
প্রচও উত্তপ্ত কড়াইয়ের মতো । এখানে কোনো প্রাণী প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না ।  
পাহাড়-পর্বত উৎপাটিত হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে । আর তা পৃথিবীর বুকে  
ছড়িয়ে পড়বে । আর এমনিভাবে পৃথিবীর স্থলভাগ এক বিশাল সমভূমির মতো  
হয়ে উঠবে ।

٥٩- وَتَلَكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَنَا فَلَمْنَا وَجَعَلْنَا لِهُمْ كِبِيرًا مَّؤْعِلًا

১৮ : ৫৯ ঐ সব জনপদ- তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম,  
যখন তারা সীমা লজ্জন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য  
আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ ।

এই আয়াতে অন্যায়কারী জনগোষ্ঠীর বিষয়ে বলা হয়েছে যারা একটি  
নির্ধারিত সময়ে ধ্বংস হয়ে যায় । এসব ঘটনার দ্রষ্টান্ত নৃহ (আ) সূরা ১১ : ৪০,  
লৃত (আ) সূরা ৭ : ৮৪ এবং আদ ও ছামুদ জাতির ধ্বংসের মাঝে পাওয়া যাবে  
যাদের বিষয় সূরা ৭ : ৭৮ ও ৯১-এ আলোচিত হয়েছে ।

٩٣- حَتَّىٰ إِذَا أَبْلَغْنَا اللَّهَ بِنَيْنَ السَّلَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا  
لَا يَكَادُونَ يَفْهَمُنَ قَزْلًا

১৮ : ৯৩ চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছল  
তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা  
একেবারেই বুঝতে পারছিল না ।

قَالُوا يَا أَيُّهُكُمْ أَنْ يَأْجُوَهُ مَأْجُوجٌ وَمُفِسِّدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهُنَّ مُنْهَلُ لَكُمْ  
خَرْجًا عَلَى أَنْ يَتَعَالَى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا

১৮ : ৯৪ তারা বলল, ‘হে যুলকারনাইন! যাজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কী তোমাকে কর দেব এই শর্তে যে তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবে?’

ইবন খালদুন তাঁর সুবিখ্যাত রচনা মুকাদ্দিমা হল্লে যাজুজ ও মাজুজের দেশের একটি ধারণা দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, “পৃথিবীর আবাদী অঞ্চল উত্তরাভিমুখেই অধিকতর সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত। আর এই অঞ্চল একটি গোলাকার তল হিসেবে বিশুব রেখার অভিমুখে দক্ষিণে ও গোলাকার রেখাবৎ উত্তরে সম্প্রসারিত। এরপর আছে পর্বতমালা যে পর্বতমালা পৃথিবীর আবাদী অংশকে তার সামুদ্রিক বা মূল জলভাগ থেকে আলাদা করে রেখেছে। এই পর্বতমালার মধ্যে বেষ্টিত রয়েছে যাজুজ ও মাজুজের বাঁধ। এই পর্বতমালা পূর্বাভিমুখে বিস্তৃত”।<sup>১</sup> এই পর্বতমালা কুফায়স পর্বতমালা নামে পরিচিত যাজুজ-মাজুজকে পরিবেষ্টন করে আছে। সংশ্লিষ্ট এই জাতিগুলো তুর্কি বংশোদ্ধৃত। এই দুই পর্বতের মধ্যকার বাঁধটি আলেকজাণ্ড্র কর্তৃক নির্মিত।<sup>২</sup> । ১৭ শতকের ভৌগোলিক সাদিক ইসফাহানির মতে যাজুজ ও মাজুজ দেশটির অবস্থান  $139^{\circ} 30$  ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ ও  $88^{\circ}$  অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত। আর এই অবস্থানের হিসেব করা হয়েছে ফরচুনেট দ্বীপ থেকে দ্রাঘিমার ডিগ্রি ও বিষুবের অক্ষরেখাত থেকে অক্ষাংশে গণনা করে (সাদিক ইসফাহানির ভৌগোলিক রচনাবলি, অনু. J.C. John Murray, London. 1832, p. 146 & p. 60).

এক আধুনিক ভাষ্যকারের মতে কুরআনের বিবরণের সাথে হ্রবহ মিলে যায় এমন এক লোহার দ্বারের সঞ্চান পাওয়া গেছে মধ্য এশিয়ার দারবাদ অঞ্চলে। জায়গাটি বুখারার অনুমানিক ১৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হিসার জেলায়। এখানে একটি খুবই সক্ষীর্ণ এক গিরিসঞ্চক্ট রয়েছে। এর ওপর দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে বিশাল এক শিলা। গিরিসঞ্চক্টটি সংযুক্ত করেছে ভারত ও তুর্কিস্থানকে। এর ভৌগোলিক অবস্থান অক্ষাংশ  $38^{\circ}$  ডিগ্রি উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ  $67^{\circ}$  পূর্ব। এই এলাকাটিকে বর্তমানে তুর্কি বাজগোল খানা (ছাগল গৃহ) বলা হয়। আগে নাম ছিল লৌহদ্বার (বাবুল-হাদিদ); Per (দার-ই আহানি)। এখানে এখন আর

কোনো লোহার প্রবেশ দ্বার নেই। তবে ৭ম খ্রিস্টাব্দে এখানে তার অস্তিত্ব ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতে যাওয়ার পথে ঐ লোহার প্রবেশদ্বার দেখতে পান। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী লোহার তৈরি দরজা তাঁজ করে গুটিয়ে নেওয়া যায়। আর এই দ্বারের সাথে ঘন্টাও ঝোলানো ছিল। আরব ভৌগোলিক ও পরিব্রাজক মুকাদাসি তাঁর আনুমানিক ৩৭৫/৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে এক লেখায় বলেছেন আবৰাসীয় খলিফা ওয়াসিক (৮৪২-৮৪৬ খ্রি.) এই লোহার গেটের বিবরণ দেওয়ার জন্য মধ্য এশিয়ায় একটি মিশন পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে এসে এই ১৫০ গজ প্রশস্ত গিরিসক্ষটি দেখতে পান। লোহার ইটের তৈরি ও গলানো সীসা দ্বারা গাঁথুনিসহ দুটি স্তম্ভের সাথে দুটি বিশাল আকারের গেট লাগানো। এ গেট বন্ধ রাখা হতো। এই ভাষ্যকারের মতে কৃত্রিমভাবে নির্মিত এই প্রতিবন্ধকতাটি কিছুকাল তার উদ্দেশ্য পূরণ করে ও পরে ভেঙ্গে পড়ে ধূলোয় মিশে যায়।

#### তথ্যসূত্র :

1. Khaldun. Ibn. Muqa. Vol. 1, p. 96
2. Ibid, pp. 162-166.
3. Ali, A. Yusuf, The Holy Quran. p. 762, 1975.

٩٦- أَتُونِي زُبَرَ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ إِذَا سَأَوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْتَخُرْأً  
حَتَّىٰ إِذَا جَعَلْتَهُ نَارًا قَالَ أَتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا

১৮ : ৯৬ তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন কর, অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা হান পূর্ণ হয়ে লৌহস্তুপ যখন দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, ‘তোমরা হাপরে বাতাস দিতে থাকো’ যখন তা অশ্বিবৎ উত্তপ্ত হল তখন সে বলল, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি তা ঢেলে দিই এর উপর।

এই আয়াতে যাজুজ ও মাজুজকে প্রতিহত করার ব্যাপারে যুলকারনাইনের প্রয়াসের উল্লেখ করা হয়েছে। যাজুজ ও মাজুজ নামে দুই হানাদার গোত্র। তাদের আক্রমণ ঠেকাতে লোহার প্রাচীর\* গড়ার চেষ্টা করা হয়। এটি করা হয় উত্পন্ন, রক্ষিত লোহা ও গলিত সীসা মিশিয়ে। এভাবে দুটি ধাতব পদার্থের বা অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে যে মিশ্রিত ধাতব পাওয়া যায় তাকে সংকর ধাতু বা ইংরেজিতে অ্যালয় বলে। মূল উপাদান গলানোর সময় যে অ্যালয় তৈরি হয় সেটিও এক ধাতব পদার্থই বটে। এই অ্যালয় মৌলিক ধাতুর চেয়ে সাধারণত যান্ত্রিক গুণাবলির দিক থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধাতুর সংকরায়নে অনেক সময় মিশ্রিত ধাতুর মরিচাজনিত ক্ষয়রোধ বৈশিষ্ট্যের ক্ষতিও হতে পারে, উন্নতিও হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় সংকর ধাতুটির ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, নমনীয়তা ও বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত পিও লোহা বা ঢালাই লোহাতে আনুমানিক ২-৪.৫% ওজনের কার্বন, ০.৫% ম্যাঙ্গানিজ, ১-২.৫% সিলিকন, ০.১-০.৩% গঙ্ক ও ০.০১% ফসফরাস থাকে। বাতাস ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে আসলে লোহায় জং বা মরিচা ধরতে শুরু করে। সংকরায়ন করে, রং লাগিয়ে বা দস্তার প্রলেপ দিয়ে লোহার মরিচা রোধ করা যায়। বস্তুত ইংরেজিতে গ্যালভানাইজিং বলে যে প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে তার আওতায় লোহাকে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে তা গলানো দস্তা বা তামার মধ্যে ডুবিয়ে নেওয়াকে বুঝিয়ে থাকে।

বিশুদ্ধ লোহা ১৫৩০° সেন্টিগ্রেড তাপে গলে যায়। তবে যে লোহায় আনুমানিক ৪.৬% হারে ওজনের কার্বন থাকে তার গলনাক্ষ অপেক্ষাকৃত নিম্ন মাত্রার অর্থাৎ ১১৪৭° সেন্টিগ্রেড, তামা ১০৮৩° সেন্টিগ্রেড তাপে গলে যায়।

লোহা উত্পন্ন হলে আগুনের মতো লাল দেখায় যার অর্থ তাপমাত্রা তখনও নিচে রয়েছে। আর তাপের মাত্রা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছালে ঐ লোহা গলে যাওয়ার আগে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। লোহার পিণ্ড লোহার গলনাঙ্ক মাত্রার অনেক কম তাপমাত্রায় উত্পন্ন করা হলে তা ঐ লোহার পিণ্ডের পরবর্তী পিণ্ডের সাথে জুড়ে যায় ও এই লৌহখণ্ডলোর ওপর গলিত তামা ঢেলে এই প্রক্রিয়াকে আরও ঘজবৃত্ত করা হয়। গলিত তামা এক ধরনের সংকর ধাতু তৈরি করে ঢালাই লোহার সাথে মিলে যায়। এটা সম্ভব হয় গলিত তামা একটা নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত ঐ জুড়ে দেওয়া খণ্ডলোর মাঝখানে ওপর থেকে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে। এভাবে গ্যালভানাইজ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর তাতে ধাতব ব্লকগুলোর উপরিভাগ অতিরিক্ত জোরাদার ও স্থায়ী হয়ে ওঠে। ইস্পাত লৌহ সংকরেরই অন্যতম আকার বা গঠন। কিন্তু এ ধরনের সংকরায়নের ইস্পাত ব্যবহারের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কেননা, ইস্পাত নিজেই এক ধরনের সংকর ধাতু। এতে থাকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ ধরনের লোহা মূল ধাতব হিসেবে আর সেই সাথে থাকে সামান্য পরিমাণ ও হারে ক্রোমিয়াম বা টাইটানিয়াম যা মেশানো হয় উৎপন্নাধীন দ্রব্যকে শক্ত করার জন্য। ইস্পাতের গলনাঙ্ক অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার। আর সে কারণে ইস্পাতের ব্লক বা খণ্ডলো একসাথে জোড়ার কাজটি খুবই কঠিন। অন্যদিকে ঢালাই লোহার সংকর ধাতুগুলোর শক্তি সম্পর্কিত গুণ অপেক্ষাকৃত বেশি, ক্ষয় প্রতিরোধক, সহজে যন্ত্রে ব্যবহার করা যায়, উত্তাপ দিয়ে এর গুণমান প্রয়োগ উন্নত করা যায় ও মরিচা প্রতিরোধক করেও তোলা যায়।

\* কোনো কোনো ভাষ্যকার কিত্রা শব্দটির অনুবাদ করেছেন পিতল হিসেবে যা আসলে তামা ও দস্তার সংকর মাত্র। এ. ওয়াই. এ. (পৃঃ ৭৫৬)-এর অনুবাদ করেছেন সীসা হিসেবে। কিন্তু আমরা এ সম্ভাবনাকে নাকচ করছি এ কারণে যে লোহার সাথে সীসার কোনো সংকর হতে পারে না। আর পিকথলের মতে কিতরা শব্দের অর্থ তামা।

### তথ্যসূত্র :

1. Encyclopaedia Americana, Vol. 1. p.606, 1979.
2. P. Max Hasan, Constitution of Biranay Alloys, 2nd. Ed. McGraw Hill Co., London. pp. 353, 580, 1950.

هُوَ إِنِّي خَفْتُ الْمُوَالِيَ مِنْ وَرَاهِينَ وَكَانَتْ أَمْرَاتِنِي عَاقِرًا لَهُبَّلْيُّ مِنْ لَدُنْكَ وَلَيْلَا

১৯ : ৫ আমি এখন আশঙ্কা করি আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী  
বন্ধ্যা; সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর  
[আমার] উত্তরাধিকারী।

۰- يَذْكُرْ يَا إِنَّا بَشِّرُكَ بِعُلُمٍ أَسْعَلَةٍ يَخْلِيْنَ لَهُ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلٍ سَيِّئَاتٍ

১৯ : ৭ তাঁকে বলা হল, ‘হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের  
সুসংবাদ দিচ্ছি তার নাম হবে যাহয়া; এই নামে পূর্বে আমি  
আর কারও নামকরণ করি নি।

قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمَانٌ وَكَانَتْ أَمْرَاتِنِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبِيرِ عِتِّيًّا

১৯ : ৮ সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক, ক্ষেমন করে আমার পুত্র হবে  
যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।

۹- قَالَ كَذِيلَكَ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْلَىٰ وَقَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلٍ وَلَهُ تَكُّفُ سَيِّئَاتٍ

১৯ : ৯ তিনি বললেন, ‘একপথই হবে।’ তোমার প্রতিপালক বললেন, এটা  
আম্মার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি  
যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

নবী জাকারিয়া (আ) তাঁর বৃক্ষ বয়সে তাঁর বংশ রক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন  
যা সূরা ১৯ : ৫-এ উল্লিখিত হয়েছে। তাই তিনি আল্লাহর কাছে মোনাজাত  
করলেন তাঁর একজন বংশধর দেওয়ার জন্য। এই মোনাজাতে সাড়া দিয়ে আল্লাহ  
তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন তাঁকে এই শুভ সংবাদ দিতে যে তিনি  
এক পুত্র সঙ্গান্বিত করবেন। জাকারিয়া (আ) শুভ সংবাদ পেয়ে খুবই বিশ্বিত  
হলেন এ কারণে যে, তাঁর বৃক্ষা স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। তাঁর এ প্রতিক্রিয়ার বিষয়  
বুঝতে পেরে ফেরেশতা বললেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তা সম্ভব হবে।

বৃক্ষ বয়সে পুরুষ ও বন্ধু স্ত্রীর সত্তান হওয়ার বিষয়টি ইতিমধ্যেই সূরা ৩ : ৩৯, ৪০-এ আলোচিত হয়েছে।

১৯ : ৯ আয়তে আল্লাহ্ নবী জাকারিয়াকে (আ) শ্রবণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বৃক্ষ বয়সে ও তাঁর স্ত্রী বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সত্তান হওয়ার বিষয়টি তাঁর (আল্লাহর) জন্য খুবই সহজ। একজন মানব সত্তানের জন্মের আগে তার কোনো পরিচয় নেই ও একজন নতুন শিশুর সৃষ্টি সর্বদাই বিশ্যকর বিষয়।

۱۹-۹. قَالَ أَنِّي يَكُونُ لِيْ غَلْمَانٌ وَلَخْرَيْتَنَسْنِي بِكُرْوَلْخَ أَكْبَعْيَنَا

১৯ : ২০ মারয়্যাম বলল, ‘কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি এবং আমি ব্যাভিচারিণীও নই?’

۱۹-۲۰. قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئَتٍ وَلَنْجَعَلَهُ أَيْمَانَ النَّاسِ وَرَحْمَةً مِنْ نَارٍ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا

১৯ : ২১ তিনি বললেন, ‘এরপই হবে।’ আপনার প্রতিপালক বলেছেন, “এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নির্দর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটাতো এক স্থিরীকৃত বিষয়।

কুমারী মাতার গর্ভে ঈসার (আ) জন্ম তথা অযোনি সংসর্গজাত জন্মের বিষয়টি সূরা ৩ : ৪৭-এর আওতায় ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ আরও বলেছেন, ঈসার (আ)-এর জন্ম মানবজাতির জন্য এক নির্দর্শন হবে। তিনি (ঈসা) মানবজাতির জন্য করুণা, কেননা তিনি শাস্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন। ঈসার (আ) জন্ম মানবেতিহাসে একমাত্র অনন্য দৃষ্টান্ত আর তাই আল্লার তরফ থেকে এক বিরাট নির্দর্শন।

۱۹-۲۵. وَهُنَّاَيِ إِنِّيْكَ بِمُدْعِنِ الْخَلْقِ تُسْقَطَ عَنِّيْكَ رُطْبَاجِنِيَّا

১৯ : ২৫ তুমি তোমার দিকের খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা তোমাকে সুপক্ষ তাজা খর্জুর দান করবে।

কুরআনের এই আয়াতটি আরও তিন আয়াতের অনুবর্তী। এতে কুমারী মরিয়মের (আ) গর্ভধারণ ও তার জেরজালেমের অনতিদূরে বেথলেহেমের এক নিভৃত খেজুর বীথিতে তাঁর যাওয়ার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রসব বেদনার সূচনায় তিনি ব্যাখ্যায যখন ক্রন্দনরত তখন এক ফেরেশতার কঠস্বর তাঁকে দুঃখ না করার জন্য সাত্ত্বনা দেয়। তাঁকে জানানো হয় যে অদূরেই রয়েছে এক স্রোতস্বিনী যেখান থেকে তিনি পানি পান করতে ও ওজু করতে পারেন। তাঁকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়াবারও পরামর্শ দেওয়া হয় কিছু তাজা সুপক্ষ খেজুর পাওয়ার জন্য। এই ঐশ্বী বাণীর দুটি অত্যন্ত তৎপর্যবহু দিক রয়েছে যা মরিয়মের (আ) জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বিরাট সাহায্য হিসেবে প্রমাণিত হয়। কেননা তিনি তখন তীব্র প্রসব যাতনায় ছটফট করছিলেন।

১. প্রসব বেদনা চলাকালে আকশ্মিকভাবে জরায় ও তলপেটের পেশীর সঙ্কোচন দেখা দেয়। আর এটি চলতে থাকে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে। তবে ক্রমেই এটি দ্রুততর হতে থাকে। বেদনাও বাড়তে থাকে। আর তাতে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ করে কোনো সঙ্গী তাকে পাশে বসে সাত্ত্বনা দেবার না থাকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে যারা ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ তারা আসন্নপ্রসবা রোগীকে বেদনার সময় কোনো স্থির বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন যাতে করে কিছুটা স্বন্তি পাওয়া যায়। আর যাতে সেই সাথে জাতক তার জন্মনালী হয়ে বেরিয়ে আসার কাজটিও সহজ হয়। খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে থাকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে এই উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করতে পারে। আর সেই সাথে ঐ কাণ্ড নাড়া দেওয়ায় খাদ্য হিসেবে পাকা খেজুর পাওয়া যেতে পারে।

২. প্রসব বেদনার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরই মাঝের জরায়ুতে তীব্র সঙ্কোচনের আলোকে যে শক্তিক্ষয় ঘটে তা পূরণের জন্য তৎক্ষণিক পুষ্টির প্রয়োজন হয়। মধ্যপ্রাচ্যে খেজুর মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। আর এতে প্রধান পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে বিপুল মাত্রায় চিনি যা খেজুরের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। এই সাথে খেজুরে এ, বি, বি২, নিকোটিন অ্যাসিডের মতো উৎকৃষ্ট ভিটামিনও রয়েছে। তৎক্ষণিক পুষ্টির সরবরাহ হিসেবে মরিয়মের (আ) জন্য আল-কুরআনে ইরফ থেকে পুষ্টিকর পাকা খেজুরের ব্যবহাৰ কৱা হয়।

٤٥- رَبُّ الْمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ  
هُلْ تَعْلَمُ لِهِ سَيِّنًا

১৯ : ৬৫ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু আছে তার  
প্রতিপালক। সূতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে  
ধৈর্যশীল থাক। তুমি তাঁর সমগ্রসম্পর্ক কাকেও জানো ?

বিষয়টি সূরা ৫ : ১৯-এ আলোচিত হয়েছে।

٤٦- وَكَمْ أَفْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنَيْنِ فُرْخَانَى وَرِيزْ

১৯ : ৭৪ তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি যারা তাদের  
অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে উন্নততর ছিল।

এই আয়াতে বহুকাল আগে বহু মানব প্রজন্মকে ধ্রংস করার কথা বলা  
হয়েছে। এই ধ্রংসথাণ্ড জাতির লোকেরা তাদের জড় বিষয়-বৈভবের আয়োজন  
বাহ্যাভ্যরে ব্যাপক জৌলুস ও শান-শাওকতের অধিকারী ছিল। এই বিষয়টি সূরা  
৭ : ৪, ৬৪-তে আলোচিত হয়েছে।

কুরআনে যেসব জাতির ধ্রংসের কথা বলা হয়েছে তাদের ব্যাপারে আধুনিক  
প্রত্ত্বাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে আদ ও ছামূদ জাতির লোকেরা এই আয়াতে  
উল্লিখিত জাতিসমূহের চেয়েও বেশি সমৃদ্ধ ছিল।

٤٧- وَكَمْ أَفْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنَيْنِ مَلْجَعُ مِنْهُمْ مِنْ أَعْيُوبِ  
أَوْسَنْمَعُ لَهُمْ رِيزْ

১৯ : ৯৮ তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি? তুমি কি  
তাদের কাউকে দেখেতে পাও অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও  
শনতে পাও?

এই আয়াতে আগেকার কোনো কোনো মানব প্রজন্মের সামগ্রিক ধ্রংসের  
কথা বলা হয়েছে। নানা প্রজন্মের লোকজনের ধ্রংসের বৃত্তান্ত সূরা ৭ :  
৪, ৬৪-তে আলোচিত হয়েছে।

এভাবে যেসব প্রজন্মের মানুষ ধৰ্স হয়েছে তাদের কোনো চিহ্ন নেই, কেউ আর তাদের কথা বলে না। তারা এখন ইতিহাস মাত্র।

সূরা ১৯ : ৭৪, ১৯ : ৯৮ এবং আরও অন্যান্য আয়াতে যে সব মানব প্রজন্মের ধৰ্সের কথা বলা হয়েছে তাদের অস্তিত্ব যে এককালে ছিল এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে তা প্রমাণিত হয়েছে।

## ٨- تَنْزِيلًا مِنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالْمَوْتُ الْعَلِيُّ

২০ : ৪ যিনি সমৃক্ষ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট হতে এটি অবরীণ।

বিষয়টি সূরা ২ : ১১৭ ও পরিশিষ্ট-২-এ আলোচিত হয়েছে।

## ٥- لَهُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا تَحْتَ التَّرَازِ

২০ : ৬ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, এই দুইয়ের মধ্যস্থলে যা কিছুই রয়েছে তার সবকিছুই আল্লাহর।

এই আয়াতের শেষাংশ ছাড়া অন্যান্য অংশ সম্পর্কে সূরা ৫ : ১৯-এ আলোচনা হয়েছে। শেষাংশ “মৃত্তিকার নিচে যা কিছু আছে” অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের নিচে যা কিছু আছে সে সব বিষয় এখানে আলোচিত হবে।

- পৃথিবী হচ্ছে একটা শিলাময় বলয়বিশেষ। এর গড় ব্যাসার্ধ ৬৩৭১ কিমি, দুই মেরুর দিকে ঈষৎ চাপা। পৃথিবী তিনি প্রধান স্তর সমন্বয়ে গঠিত। এই তিনি স্তর আবার কয়েকটি উপ-স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর বা তৃতীয় স্তরকে তৃতীয় বলা হয়। পরের স্তর অংশত গলিত ও অংশত আধা তরল, পরিজের মতো এক উপাদান যার নাম আচ্ছাদন স্তর। পৃথিবীর সবচেয়ে অভ্যন্তরভাগের অঞ্চলটি মূল গর্ত নামে পরিচিত।

ভৃত্যক পৃথিবীর মোট পরিমাণের মাত্র ০.৬%। এর পুরুত্ব বেশ সমাকার; সাগরতলে ৫ কিলোমিটার থেকে মহাদেশীয় সমতল উপরিভাগে ৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং বিশাল পর্বতমালার নিচে যেমন হিমালয়ের নিচে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর। ভৃত্যকে বহু সম্পদ যেমন, নানা ধরনের খনিজ,

কয়লার মতো জীবাশ্মজাত জ্বালানি, ভূগর্ভস্থ বিশুদ্ধ পানি এবং নাইট্রোজেন চক্র রক্ষাকারী বহু তরঙ্গতার ভূনিম্বে প্রবিষ্ট অংশ ও জীবাণু। মহাদেশীয় ভৃত্যক প্রধানত সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে গঠিত। আর তার সাথে অস্বিজেন মিশ্রিত থাকে। মহাদেশীয় ভৃত্যকের উপাদানগুলোর নামকরণ করা হয়েছে সিয়াল (sial) যা ইংরেজি silicon ও aluminum-শব্দ দুটির যথাক্রমে দুটি করে আদ্যাক্ষর মিলিয়ে গঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সমুদ্র তলীয় ভৃত্যকের উপাদানের নামকরণ করা হয়েছে সিমা (sima) যা silicon ও magnesium -এর সমাহার দিয়ে।

ভৃত্যকের নিচে রয়েছে এক আধা-শক্ত উপাদানের এক স্তর। এই স্তর ৭০ কিলোমিটার পুরু। এই স্তরের নাম অশ্বমগুল lithosphere। আমাদের এই পৃথিবী গ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই বাস্তবতায় নিহিত যে অশ্বমগুলসহ এর উপরিভাগ বা পৃষ্ঠদেশ কয়েকটি শীতল ও ঝজু অশ্বমগুলীয় প্লেটে বিভক্ত।

অশ্বমগুলের নিচে ভূগর্থনে খুবই লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর তা চিহ্নিত সীমা চৌহদিমূলক রেকার মাধ্যমে। আর একে বলা হয় মোহো বিচ্ছিন্নতা (Moho discontinuity)। এই রেখার নিচে রয়েছে আচ্ছাদন স্তর যা ২৯০০ কিলোমিটার পুরু কিংবা গভীর। এই স্তর ভূগর্থনের মোট পরিমাণের ৮২%। ৭৫ কিলোমিটার থেকে ২৫০ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে আচ্ছাদন স্তরে এমন এক অঞ্চল রয়েছে যা উষ্ণ, অপেক্ষাকৃত নমনীয়, আংশিকভাবে গলিত ঘন পরিজের মতো। এই স্তরকে অ্যাসথিনোফিয়ার বলা হয়। এই অনেকটা গড়ের উপাদানের স্তর কঠিন অশ্বমগুলীয় প্লেটগুলিকে নড়াচড়া তথা সঞ্চরণের সুযোগ করে দেয়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরতে পারে আর তার ফলে মহাদেশগুলো ভূমগুল জুড়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। এইসব প্লেট বার্ষিক ৫ সেন্টিমিটার থেকে ১০ সেন্টিমিটার সরে যায়। এই গতির সূচী হয় আচ্ছাদন স্তরের শিলার উষ্ণতার অবতলীয় গতি এবং পৃথিবীর অভিকর্ষ ও আবর্তনের কারণে। অ্যাসথিনোফিয়ারও ম্যাগমার আকারে নতুন ভৃত্যকীয় উপাদানের উৎস হিসেবে কাজ করে। এই ম্যাগমা ভূগর্ভের অভ্যন্তর থেকে ভূপৃষ্ঠ অবধি উঠে আসে।

আচ্ছাদনের অবশিষ্ট অংশ আধা তরল এবং তা মধ্যগোলকমগুল (mesosphere) নামে পরিচিত। এর আরও গভীরে অবস্থিত কেন্দ্র বা মূলগর্ভ রয়েছে। এই কেন্দ্র বা মূলগর্ভের রয়েছে দুটি স্তর : বহিঃকেন্দ্র ও অন্তর্কেন্দ্র। বহিঃকেন্দ্র ২১০০ কিলোমিটার পুরু, আর অন্তর্কেন্দ্রের ব্যাসার্ধ হলো পৃথিবীর

କେନ୍ଦ୍ରୀ ୧୩୭୦ କିଲୋମିଟାର । ବହିଙ୍କେନ୍ଦ୍ର ତରଳ ଲୋହା ଦିଯେ ଗଠିତ ଆର ସେଇ ସାଥେ କିଛୁ ପରିମାଣ ଗନ୍ଧକ ମିଶ୍ରିତ ଆଛେ । ଅନ୍ତର୍କର୍ଣ୍ଣଟି ସନ୍ତବତ ଶକ୍ତି, ଆର ତାତେ ଆଛେ ଲୋହା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ପଦାର୍ଥ । ଏ ଧରନେର ଆବର୍ତନଶୀଳ ଗଲିତ ଲୋହାର ଅନ୍ତର୍କର୍ଣ୍ଣ ଥାକାର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ହିସେବେ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟତରଭାଗେ ଚୌଷକ କ୍ଷେତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଁ ଥାକେ ଯାର ନାମ ଚୌଷକମଣ୍ଡଳ ।

ଆଜକେର ମାନୁଷେର ଜ୍ଞାନ ଯତୋଟୁକୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବଲା ଯାଯ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠେର ନିଚେ ରଯେଛେ ଏହି ସର୍ବ ଉପାଦାନ ଆର ଏସବେର ମାଲିକ ହଚ୍ଛେନ ଆହ୍ଲାହ । ଏତାବେ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟତରଭାଗେର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଗବେଷଣା ଥେକେ ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଯାଯ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠେର ନିଚେ ବେଶ କିଛୁ ଉପାଦାନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରଯେଛେ । ଏସବେର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନେର ମାଲିକଓ ଆହ୍ଲାହ ଆର ବାତ୍ତବିକିପକ୍ଷେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠେର ଓପରେ ଓ ନିଚେ ଯା-ଇ ଥାକୁକ ସବକିଛୁରଇ ମାଲିକ ଆହ୍ଲାହ ।

#### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. J. C. Brandt, and Maran S.P, New Horizon in Asrtronomy, W. H. Freedmand Company, San Fransisco, USA.
2. J. Gribbin, Genesis, Oxford University Press, Oxford, UK.
3. B. M. Cordell, Venus Astronomy, September, 1982.

أَنْ أَقْبِلَ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْبَلَ فِيهِ فِي الْبَرْ قَلِيلُهُ الْبَعْدُ يَا سَاحِلٍ  
يَا خُدْهُ عَدُوِّي وَ عَدُوُّهُ وَالْقَيْنُ عَنِكَ عَمَّا مَرَّ وَ لَنْ تُحْسِنَ عَلَى عَيْنِي ۝

২০ : ৩৮-৩৯ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আমরা তোমার (হ্যারত মূসা আ) মাকে ইঙ্গিত করলাম এখন থেকে যা অঙ্গীর সাহায্যেই করা হয় যে, এই শিশুটিকে (শিশু মূসা) ঝুড়ির মধ্যে রেখে দাও এবং পরে ঝুড়িটিকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে কিনারায় ঠেলে দেবে এবং তাকে আমার শক্ত ও এই শিশুটির শক্ত গ্রহণ করবে। কিন্তু আমার দিক হতে তোমার উপর ভালবাসার সৃষ্টি করে দিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করলাম যে তুমি আমার চাকুৰ রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিপালিত হবে।

হ্যারত মূসা (আ)-র জন্ম এমন এক সময় হয়েছিল যখন ঈসরাইলীদের প্রতি দুশ্মনির ফলে মিশর রাজ ফেরাউন তাদের সকল পুরুষ শিশুকে জন্মের পরই হত্যার হকুম দিয়েছিল। মূসা (আ)'র মা তাকে নিয়ে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু আর লুকিয়ে থাকা যখন সম্ভব ছিল না তখন মহান আহ্মাদ তাকে যে উপদেশ দেন তাই এই আয়তে বর্ণিত হয়েছে। তখন যা তার শিশু পুত্রকে একটি ঝুড়িতে রেখে সেই ঝুড়ি নীল নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেন। ঝুড়ি ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের রাজবাটোর নিকট নদী পাড়ের ঘোপে আটকে রইল। তখন রানীর চোখে পড়ায় সেই শিশুকে রাজবাটীতে নেওয়া হয়। ফেরাউন নিঃসন্তান থাকায় ও রানীর কথায় শিশু মূসা ফেরাউনের ঘরে লালিত পালিত হয়। এই ঘটনা বাইবেল ও কুরআনে রয়েছে।

এখানে আলোচনার বিষয় কী ধরনের ঝুড়ি বা বাক্স যাতে রেখে শিশুকে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নীল নদীর তীরে Cyperus papyrus নামক এক প্রকার নল খাগড়া গাছ প্রচুর জন্মে যার প্রমাণ রয়েছে বহু পিরামিডে থাণ্ড সে সময়কার অঙ্গিত ছবিতে। এই নল খাগড়ার কান্ড সে সময় সমুদ্রগামী নৌকা বানাতে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া এ সব দিয়ে ঝুড়ি, বাক্স সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্ৰী তৈরি করা হতো। এইগুলোর ভেসে থাকার ক্ষমতার ফলেই প্রাচীন মিশরীয়রা সামুদ্রিক জাহাজ তৈরি করতে এবং এর সাহায্যে আটলান্টিক পাড়ি দিতে সমর্থ হয়েছিল বলে এখন ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন। সুতরাং এ ধরনের গাছের তৈরি বাক্স বা ঝুড়িতে শিশুটির ভেসে যাওয়া ও বেঁচে থাকা খুবই সম্ভব ছিল।

## ۰- قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَغْلَى كُلَّ شَنْقٍ وَخَلَقَهُ تَحْفَدْيٌ

২০ : ৫০ ফেরাউনের কথার জবাবে হ্যরত মুসা (আ) বল্লেন, “আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেকটি জিনিষের আকৃতি দিয়েছেন এবং পরে তাতে পথ দেখিয়েছেন।”

এই আয়াতের বিষয় বস্তু দৃশ্যমান ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিদৃষ্ট গঠন প্রণালী ও কার্য পদ্ধতি সকল জৈব ও অজৈব সৃষ্টির বেলায়ই প্রযোজ্য। সব সৃষ্টির মূল তার মৌলিক পদার্থ যা বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর (atom) সমষ্টি এবং যা কোন মানুষের সৃষ্ট নয়। পরে মানুষ এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং এই শক্তি নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারও করেছে; যেমন বিদ্যুৎ, এক্স-রে, আণবিক শক্তি, আণবিক চুম্বী ইত্যাদি। আণবিক এবং নিউক্লিয়ার গঠন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার শক্তির উপর নির্ভরশীল যেমন অণুর ভিতরের নিউক্লিয়াস (প্রোটন ও নিউট্রনসমূহ), এর গতি, শক্তিশালী নিউক্লিয়ার শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর এটমের ভিতরে ইলেক্ট্রন এর গতি electromagnetic শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এ ছাড়াও নিউক্লিয়াসে এক বিশেষ অর্থ দুর্বল কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়ার শক্তি ও রয়েছে। এই দুই শক্তির সমন্বয়ে (nuclear force and electromagnetic force) বিভিন্ন প্রকারের শক্তির বিকাশ ঘটে। এক বা একাধিক ইলেক্ট্রনের সংযোগ ঘটলে অর্থাৎ এক বা একাধিক প্রোটন এটমের ভিতরের electricity কে neutral করে দিলে কোন বস্তুর প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। লিথিয়াম<sup>6</sup> সবচেয়ে হালকা ধাতু, এর এটমে ৩টি electron ও ৩টি proton রয়েছে। যদি আরও ১টি proton এতে যোগ করা যায় তবে Berrylium তৈরি হয় যা খুব ক্ষণস্থায়ী এবং শীত্র দৃটি Helium nuclei এ বিভক্ত হয়ে যায়। Berrylium কেন স্থায়ী হয় না তা ৩ : ১ : ১ অয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে Berrylium স্থায়ী হলে এই মহাবিশ্ব ধৰ্স হয়ে যেতো। সুতরাং এই বস্তুর অস্থায়ী প্রকৃতি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং মহান আল্লাহর বিরাট পরিকল্পনার অংশ মাত্র।

## ۰- الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا فَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ كُلِّ أُنْبَاتٍ شَفِيفٍ

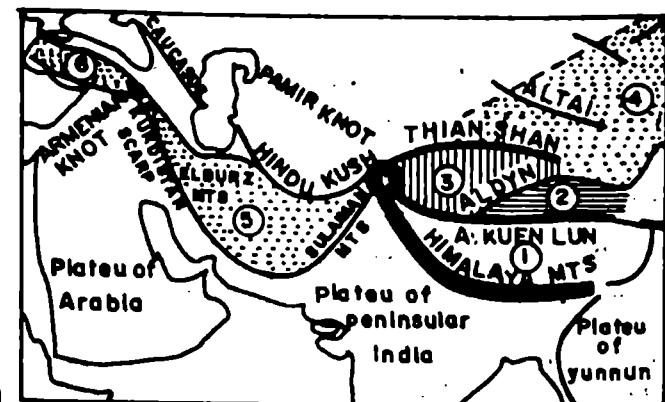
২০ : ৫৩ যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলবার পথ, তিনি আকাশ হতে বাসিবর্ষণ

করেন এবং আমরা তা দ্বারা একে অপর হতে ভির নানা প্রকারের উদ্ধিদ উৎপন্ন করে থাকি।

### গালিচার মতো পাতা পৃথিবী এবং চলার পথের ব্যবস্থা

এই আয়াতের অংশবিশেষ পৃথিবী গালিচার মতো পাতা, এ রকম বিষয়ের ব্যাখ্যা রয়েছে সূরা ২ : ২২-এ। আয়াতের এই অংশটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা রয়েছে, আর তার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ :

যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা মানব কার্যাবলিকে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সড়ক নির্মিত হয়। প্রাচীন বাণিজ্য পথগুলো এসব সড়কেরই দৃষ্টান্ত। এ ক্ষেত্রে আমরা সুবিখ্যাত রেশম পথের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই সড়ক চীনের সাথে ভারতকে সংযুক্ত করে। এছাড়া প্র্যান্ড ট্রাক রোডের কথাও বলা যায়। বিভিন্ন সমতল ভূমি ও মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে পর্বতমালাসমূহ প্রবল বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। পানির ঘন্টি থেকে সৃষ্টি বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী এশিয়ায় তিক্কত, পারস্য, চীনের ইউনান এবং সিঙ্গু ও গামেয় সমভূমি একে অন্যকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে (চিত্র-১০)। দক্ষিণ ইউরোপে নবীন ভাঁজ বিশিষ্ট পর্বতমালা আল্পস বহু পার্বত্য ফাঁসের সৃষ্টি করেছে এবং বহু সমভূমি ও মালভূমিকে আলাদা করে পরিবেষ্টিত রেখেছে। উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ভঙ্গিল অ্যাভিজ পর্বতমালা দুই আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় সমভূমি ও মালভূমিগুলোকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। পার্বত্য গিরিপথগুলো সাধারণত ঐসব ভঙ্গিল পর্বতমালা দ্বারা বিছিন্ন সমভূমি ও মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ দ্বার হিসেবে কাজ করে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে ইরানের সাথে পাকিস্তানের কোয়েটাকে যুক্তকারী খাইবার গিরিপথ, আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের পেশোয়ারকে যুক্তকারী খাইবার গিরিপথ এবং আফগানিস্তানের গয়নীর সাথে পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খানের সাথে যুক্তকারী গোমাল গিরিপথের নাম উল্লেখ করা যায়। কাশ্মীরের শ্রীনগর শহর থেকে দুটি দুর্গম পথ রয়েছে যোজিলা গিরিপথ ও কারাকোরাম গিরিপথের মধ্য দিয়ে। ভারতের পাঞ্জাব থেকে তিক্কত পর্যন্ত রয়েছে শিপকি গিরিপথ। ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে চারটি গিরিপথ রয়েছে। এগুলো অবশ্য কৃচিং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো : (১) তুজুর সংকট; (২) মণিপুর রুট; (৩) আন, ও (৪) তাউনগুপ গিরিপথ। কানাডায় রকি পর্বতমালা যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায়। এই বাধা কাটানো হয়েছে কিকিং হর্স ও ইয়োলো হেড গিরিপথে রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে।



চিত্র-১০

চিত্র পরিচিতি : এশিয়ার পর্বতমালা ও মালভূমিসমূহের এক সরল মানচিত্র। এখানে (১) তিব্বতের মালভূমি; (২) একটি জলাভূমি; (৩) তারিম উপত্যকা; (৪) গোবি মরুভূমি; (৫) ইরানের মালভূমিসমূহ, এবং (৬) এশিয়া মাইনের মালভূমি দেখান হয়েছে।

বিভিন্ন দেশ ও ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বের কারণে মানুষ উন্নততর যানবাহনের উপায় খুঁজতে প্রবৃত্ত হয়েছে। রেল যোগাযোগ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বিপ্লব সাধিত হয়। বিশ শতকের মধ্যভাগে মোটরযানের দ্রুত বিকাশের কারণে বহু উন্নত দেশে পাকা রাজপথ ও সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোও উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে জলপথ গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। কানাড়ায় প্রেট লেক ও লরেন্স রিভার, যুক্তরাষ্ট্র মিসিসিপি ও ওয়ারিয়র, মধ্য ইউরোপে রাইন নদী, আফ্রিকায় নীল, নাইজার ও কঙ্গো নদী, চীনে ইয়াংসি নদী, ইন্দোচীনে মেকং নদী, বর্মায় ইরাবতী নদী এবং ভারতে গঙ্গা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰের ভাটি অঞ্চলের প্রবাহ সড়কের মতো তুলনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধে প্রদান করে।

মনে রাখা আবশ্যিক যে বিশ্ববাণিজ্যের সিংহভাগ সমুদ্রপথে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সামুদ্রিক পথগুলো কেবল উন্নত ও সুসজ্জিত সামুদ্রিক বন্দর থেকেই

পরিচালিত হয় না, এই বন্দর থেকে বিভিন্ন নৌপথের মধ্যবর্তী নানা বিরতি স্থলে জ্বালানি ও জাহাজ মেরামতের সুযোগ-সুবিধেও থাকে। এই নৌপথসমূহ জরিপকৃত। এগুলোর উপর্যুক্ত মানচিত্রও আছে। আর এই সমুদ্র পথের যে যে স্থান জাহাজ চলাচলের জন্য বিপজ্জনক সেই সব স্থান বাতিঘর ও বাতিজাহাজ দ্বারা সুচিহিত করা রয়েছে। সুয়েজ খাল হলো বিভিন্ন সমুদ্রপথের মিলনস্থল। অনুরূপভাবে পানামা খাল পঞ্চম ভারতীয় দ্বীপপুঁজি রুটে জাহাজ চলাচলের সুবিধে প্রদান করে। পানামা খাল এলাকা ভৌগোলিকভাবে একটি যোজক অর্থাৎ দুটি বিপুল ভূভাগ- উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে এক চিলতে ভূখণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত রেখেছিল। তার মধ্য দিয়ে খাল কেটে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব হয়েছে এখানকার এই বিশেষ ভৌগোলিক সুবিধের কারণে।

এই আলোচনায় কুরআনের এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে পৃথিবীকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়ে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন যোগাযোগ পথে ভ্রমণ করে তার নিজের কল্যাণে বিপুল উপকার নিয়ে আসার সুবিধে করে দিয়েছেন।

### আকাশ থেকে বারিপাত

আয়াতের এই অংশে আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়েছে। সূরা ২ : ২২-এর আলোচনার আওতায় এ বিষয়টির ব্যাখ্যা রয়েছে।

### নানা প্রজাতির উদ্ভিদের জোড়

আজওয়াজা শব্দের অর্থ জোড় বা জুটি। এখানে স্পষ্টত উদ্ভিদের পরাগায়ন, যৌন বা বংশবৃক্ষির উল্লেখ করা হয়েছে। দুই জনক-জননী উদ্ভিদের মাধ্যমে যৌনমিলনে বংশবিস্তার (একটি জোড় বা দম্পতি) ঘটে তখনই যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রী বংশবিস্তারক ইউনিট মিলিত হবার ফলে সৃষ্টি নবীন উদ্ভিদের জন্ম হয় ক্রোমোজমের নতুন সমন্বয় সহকারে। এভাবে যে যৌনমিলনভিত্তিক যে বংশবিস্তার ঘটে তার ফলে অশেষ উদ্ভিদ প্রজাতি সৃষ্টি সম্ভব হয়। আর সেগুলোর মাঝে নানা বৈশিষ্ট্যের অশেষ সমন্বয় ঘটে। আর এভাবে সৃষ্টি উদ্ভিদের পক্ষে পরিবর্তনশীল পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য বেড়ে যায় খাপ খাইয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা যা অত্যন্ত সুবিধেজনক।

এই আয়াতে পরে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সম্পর্কিত। হিসেব করা হয়েছে, মেরু থেকে ক্রান্তীয়, স্তলভাগ থেকে জলভাগ, বায়ুজীবী থেকে অবায়ুজীবী ৩,৫০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদকে বিভিন্ন

ପରିବେଶ ଏବଂ ଆବହାସ୍ୟାର ସାଥେ ଖାପ ଖାସ୍ୟାନୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହେଁଛେ । ଆର ତାତେ ଏଇସବ ଉଡ଼ିଦେର ମାଝେ ତାଦେର ଆକୃତି ଓ ଗଠନେ ବ୍ୟାପକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏସବେର ମାଝେ ପୁଷ୍ପକ ଉଡ଼ିଦଗଳେ ଆକାରେ କରେକ ଟନ ଓଜନେର ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ଧାନେର ଫ୍ଲେର ମତୋ ଛୋଟ ଉଡ଼ିଦେର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଉନ୍ନିତ ହେଁଛେ । ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵେ ଉଡ଼ିଦକୁଳ ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ସଂଗଠନ କାଠାମୋ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଗାଲୀ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଅସାଧାରଣ ବିନ୍ୟାସଗତ ଏକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେଛେ । ବିନ୍ୟାସଗତ ଏକ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ନଜିର ହଲୋ ପ୍ରଜନନେର ବିଷୟଟି । ଜୀବାଣୁ ବା ନୀଳାଭ-ସବୁଜ ଅୟାଲଗିର (ଶେଲା) ମତୋ ଉଡ଼ିଦେର ଏକଟି ଆଦିବର୍ଗ ଛାଡ଼ା ଏହି ଯୌନଭିତ୍ତିକ ବଂଶ ବିତ୍ତାର ବିଶ୍ଵଜନୀନଭାବେଇ ଥାଏ ସକଳ ଉଡ଼ିଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ । ଯୌନଭିତ୍ତିକ ବଂଶବିତ୍ତାର ଜନ୍ମସୂତ୍ରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରେର ବିଷୟ, ବିବର୍ତ୍ତନେର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଗାଲୀ ଓ ଜୀବେର ବେଶର ଭାଗ ଆଚରଣକେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଆର ଏଇ ଫଳେ ଆବାର ଉଡ଼ିଦକୁଳେ ବିପୁଲ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଆମରା ମେ ସବଇ ଏଥିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଇ ।

ଏ ଛାଡ଼ାଓ ସୂରା ୧୩ : ୩-ଏ ଯୌନ ବିଷୟେର ଉଲ୍ଲେଖ ଆଛେ ଈଷଂ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହକାରେ । ଏହି ଆଯାତେ ଜାଓଜାଇନ ଶର୍ଦ୍ଦନିଚୟ ବ୍ୟବହତ ହେଁଛେ । ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଯାତେଇ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଏକଟା ସନ୍ତାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହିସେବେ ବିଷୟଟି ନିୟେ ବିତ୍ତାରିତ ଆଲୋଚନା ଓ ରଯେଛେ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର ୫

1. L. Duddley, Stamp, A Regional Geography pts. I.V., Longmans, Green and Co. Ltd., N.Y. 1939.
2. W. G. Moore, New Visual Geography Mountains and Plateaus Hutchinson Educational Ltd. London, 1970.

٤٥- كُنُوا وَارْجِعُوا أَنْعَامَكُمْ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتٍ لِأَدْلِي النُّهْيٌ ۝

২০ : ৫৪ তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশুর চারণ করাও;  
অবশ্যই এতে নির্দশন আছে বিবেকসম্প্রদের জন্য।

এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের মূলভাবেরই নিরবচ্ছিন্ন আলোচনা বিশেষ। এতে বৃষ্টিপাতের পর যেসব ঘটনা পর পর ঘটে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যেমন অনেক উড়িদের জন্ম হয় যেগুলো তাদের ভিন্ন ভিন্ন যৌন পরিচয় ও জীবতান্ত্রিক বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। আলোচ্য আয়াতে খাদ্যের আকারে আল্লাহর রহমতের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে আমরা সবুজ উড়িদ থেকে কেবল আমাদের জন্যই খাদ্য সংগ্রহ করি না, আমাদের গবাদি পশুর জন্যও খাদ্য সংগ্রহ করি। আমাদের প্রধান খাদ্যের উৎস হচ্ছে দানাশস্য, ডাল ও কন্দজাতীয় ফসল। এসব ছাড়াও নানা মাত্রা, ধরণ ও স্বাদের খাদ্য হিসেবে এহণযোগ্য ফলও আমরা পেয়ে থাকি সবুজ উড়িদ থেকেই। এ ধরনের কতকগুলি ফলের গাছ মানুষ নিজেরা আবাদণ করতে পারে। উড়িদের অবশিষ্টাংশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রধানত ঘাস ও অন্যান্য আগাছা যাঁর রাসায়নিক উপাদান মানুষের পাকস্থলীর উপযোগী নয় যদিও পশুখাদ্য হিসেবে গবাদি ও অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর পরিপাক যন্ত্রের জন্য উপযোগী ও সেই সুবাদে তাদের জন্য চমৎকার রুক্মের উপযোগী খাদ্য।

বোধসম্পন্ন মানুষ তার নিজ প্রজাতি ও গবাদি পশুর প্রাণ রক্ষার জন্য উদ্বিদীরাজ্য থেকে আল্লাহ যে পুষ্টি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন তার নেপথ্যে তাঁর বিপুল বিচক্ষণতা ও উপকার অন্যায়াসেই উপলক্ষি করতে পারবেন। এই উদ্বিদেজগত ঘটনাক্রমে খাদ্য চক্রের এক যোগসূত্র। তৎভোজী প্রাণী সবুজ উদ্বিদ খেয়ে প্রাণ ধারণ করে। আর প্রায় সর্বভূক মানুষ সবজি ও পশুর গোশত উভয় প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। কাজেই এই আমিষ তথা গোশতেরও পরোক্ষ উৎস হলো উদ্বিদ, আর তাতেই ‘সুকল মাংসই ঘাস’ এই বজ্রব্যের সারবস্তু প্রমাণিত। মানুষ ও গবাদি পশুর গলিত লাশ মাটিতে আবশ্যিকীয় পুষ্টি উপাদান জোগায়। এই উপাদান উদ্বিদের চমৎকার ও সমৃদ্ধতর বিকাশের জন্য জরুরী। বস্তুত এসবের মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীল ও বোধসম্পন্ন মানবের চিন্তার খোরাক।

## ۵۵- مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُ كُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

২০ : ৫৫ মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা হতেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব ।

মানুষ পৃথিবীর উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছে- এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই সূরা ১৮ : ৩৭-এ আলোচিত হয়েছে ।

মানুষ আবার মৃত্তিকায় ফিরে যাবে- এ বিষয়টির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন । বাইবেলেও একই ধারণা অভিব্যক্ত রয়েছে । সেখানেও বলা হয়েছে, “তোমরা ধূলো থেকে এসেছো, সেখানেই তোমরা ফিরে যাবে ।” বিভিন্ন জাতির লোক নানাভাবে মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করে থাকে । ইহুদী, মুসলমান ও খ্রিস্টানরা তাদের প্রথা মাফিক লাশ কবরে দাফন করে । কবরেই ঐ লাশ পচে মাটির সাথে মিশে যায় । মুসলমানদের বেলায় কাফনের কাপড় এই পচনক্রিয়ায় খুব একটা বাধার সৃষ্টি করে না । খ্রিস্টান ও ইহুদীরা কাঠের বাল্ব বা কফিন ব্যবহার করে । তাতে লাশের পচনক্রিয়া ও মাটিতে মেশা অনেকটা বিলম্বিত করে । আর যদি লাশ কোনো পাথর বা কনক্রিটের ভল্টে সমাধিস্থ করা হয় তাহলে তাতে ঐ লাশটিতে পচনক্রিয়া ঘটবে লাশের দেহে অবস্থিত সপন সহায়কী জীবাণুর ক্ষরণে । তবে তাতে লাশের মাটিতে মিশে যেতে দীর্ঘতম সময় লেগে যাবে । প্রাচীন মিসরীয়রা তাদের লাশের গায়ে এক ধরনের ভেষজ মলম লাগিয়ে কাপড় দিয়ে লাশ জড়িয়ে নেওয়ার পর পাকা কবর বা পিরামিডে রেখে দিত । আজও এ ধরনের লাশ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে । এইসব লাশ মাটির সাথে মিশতে অনেক বেশি সময় নেয় ।

লাশ সৎকারের আরেক উপায় হলো দাহ করা । হিন্দুরা তাদের শবদেহ সাধারণত কোনো নদীর ধারে কিংবা সাগরকূলে কাঠের চিতায় দাহ করে । তারপর লাশের যেসব অংশ থেকে যায়, পোড়ে না সেগুলো সহ লাশের ছাই সাধারণত ঐ নদী বা সাগরে নিক্ষেপ করে । লাশের যা ছাই হয়ে যায় তা গ্যাসের আকারে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ও বৃষ্টির আকারে আবার তা মাটিতে ফিরে আসে । ফলে যেতাবেই লাশের নিষ্পত্তি করা হোক না কেন শবদেহের উপাদানসমূহ এভাবে আবার মাটিতে ফিরে আসে ।

অগ্নিগৃজক পারসিকরা তাদের লাশ একটি উঁচু টাওয়ারের ওপর রাখে । আর সেখানে শকুনেরা লাশের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে । আর তারপর হাড়গুলো

ଟାଓୟାରେ ବିଶେଷଭାବେ ତୈରି ଛିନ୍ଦିପଥେ ନିଚେ ଏସେ ପଡ଼େ ଏବଂ ତା ଏକ ସମୟ ମାଟିର ସାଥେ ମିଶେ ଯାଯାଇଲା । ଶକୁନେରୋ ଲାଶ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଯେ ବିଷ୍ଟା ତ୍ୟାଗ କରେ ତା ମାଟିତେ ପଡ଼େ, ଆର ତାରା ନିଜେରାଓ ଏକସମୟ ମାରା ଯାଯାଇଲା ଓ ମାଟିତେ ମିଶେ ଯାଯାଇଲା ।

অনুরূপভাবে যদি কেউ নদী বা সাগরে ডুবে মারা যায় এবং তার লাশ যদি দাফন বা সমাধিস্থ করার জন্য না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও লাশটি মাছ বা হাঙরে খেয়ে ফেলবে অথবা সম্মুখ বা নদীতলে পচে মাটির সাথে মিশে যাবে।

ତାଇ ବସ୍ତୁତ ମୃତ୍ୟୁର ପର ସକଳ ମାନୁଷଙ୍କେ ମାଟିତେଇ ଫିରତେ ହବେ

এই আয়াতের তৃতীয় অংশটি রোজ হাশরের দিনে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা আমাদের বর্তমান আলোচনার একটিভাবের বাইরে।

، قال أمنتم له قبل أن أذن لكم رأته تكبيركم الذي علمنكم التسخر، فلما فطعنة  
أين يكفر وأزجلكم من خلافه لا وصلبته كفر في جذوع العذيل  
ولتعلمن أئننا أشد عناداً وأبغلى ○

২০ : ৭১ ফিরআউন বলল, ‘কী আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার  
পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখেছি, সে  
তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতৰাং  
আমি তো তোমাদের হস্তপদ একাদিক্রমে কর্তন করবই এবং  
আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিন্দ করবই এবং  
তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের দুইয়ের ঘട্টে কার  
শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।

এখানে যে দণ্ডের কথা বলা হয়েছে সেরকম শাস্তির বিধান তৎকালীন প্রচলিত ছিল। যদি একদিকের হাত ও পা কেটে ফেলা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট লোকটি আর দাঁড়াতে বা চলতে পারবে না। কিন্তু একটি হাত রেখে আরেক দিকের হাত বা একটি পা রেখে বিপরীত দিকের পা কাটা হয় সেফলে লোকটির পক্ষে কোনো রকমে চলাফেরা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে তাকে হয়তো অন্যকিছু কৃত্রিম বস্তুর সাহায্য নিতে হবে। কেননা, মানুষ তার দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে তার বিপরীত প্রত্যঙ্গ

দিয়ে। এমন দণ্ডানের নেপথ্য চিন্তা ছিল বিষয়টির ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করা। তাই ফিরআউন একটি হাত বা একটি পা রেখে অন্যটি কাটার নির্দেশ দেন। তিনি ক্রুশবিন্দ করার হুমকি দেন যা ছিল কঠিনতম শক্তি। ক্রুশবিন্দ করে মারার পদ্ধতিটির আওতায় শাস্তিভোগীকে মৃত্যুর আগে অবধি তিনে তিলে দীর্ঘকাল নিদারণ কষ্ট পেতে হতো। ক্রুশে চড়িয়ে সাধারণত ক্রুশকাঠের সাথে পেরেক ঠুকে দণ্ডাণ ব্যক্তির প্রত্যঙ্গ সেঁটে দেওয়া হতো বা তার দেহ বেঁধে রাখা হতো। এই ক্রুশ বলতে খেজুর গাছের একটা গুঁড়ি বোঝাতো। অভিযুক্তকে ক্রুশে আটকে রাখা হতো রক্তপাত, ভয় বা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা যাওয়া পর্যন্ত।

٨-**بَسْنَى إِنَّا بِكُلِّ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَذَابِ كَحْ وَوَعْنَ نَكْفُ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ  
وَزَانَّا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوْيِّ**

২০ : ৮০ হে বনী ইসরাইল! আমি তো তোমাদেরকে শক্র হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদেরকে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম।

এই আয়াতের তৃতীয় অংশটিতে মান্না ও সালওয়ার উল্লেখ রয়েছে। আর এটি আমাদের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। বিষয়টি সূরা ২ : ৫৭-র আওতায় আলোচিত হয়েছে।

٩-**كُلُّ مَنْ طَهِبَتِ مَارِزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْفَافِينِهِ لَيَعْلَمَ عَلَيْكُمْ غَصِّيْنِ  
وَمَنْ يَعْلَمْ عَلَيْهِ غَصِّيْنِ فَقَدْ هُوَيِّ**

২০ : ৮১ তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে উত্তম বস্তু আহার কর এবং এই বিষয়ে সীমা লংঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ আপত্তি হবে আর যার উপর আমার ক্রোধ আপত্তি হয় সে বাস্তবিক পক্ষেই ধৰ্ষণ হবে।

আল্লাহ এখানে বনী ইসরাইলের ওপর তাঁর করুণা ও রহমতের বিষয় উল্লেখ করেছেন যখন মূসা (আ) তাদেরকে মিসরের কারাগার থেকে মুক্ত করে এ

সময় আল্লাহ তাদেরকে খাদ্য হিসেবে মান্না নামে একধরনের খাদ্য ও সালওয়া নামের একধরনের খাদ্যোপযোগী কোয়েল পাথি প্রেরণ করেন। মান্নায় ছিল শ্বেতসার ও কোয়েল পাথিতে ছিল প্রোটিন, মেহজাতীয় পদার্থ এবং খাদ্যের তিনটি আবশ্যিকীয় উপকরণ। যেহেতু মান্না ও সালওয়া পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য তাই আল্লাহ এগুলোকে মানুষের জন্য উত্তম খাদ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সূরা ২ : ৫৭, ৭ : ১৬০ ও ২২ : ৮০তে আলোচনা রয়েছে।

○ ﴿۱۰۸﴾  
عَنِ الْجَهَالِ فَلْمَ يُؤْسِفَهَا رَبِّي نَسْفًا

২০ : ১০৫ ওরা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, ‘আমার প্রতিপালক ওদেরকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিণ্ণ করে দেবেন’।

পর্বতমালার মূলোচ্ছেদ এবং তাদের ধূলিসম ছিটিয়ে পড়ার বিষয়টি ১৮ : ৪৭ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

○ ﴿۱۰۹﴾  
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُفَّارُكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقَرْوَنَ يَسْتُرُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ

২০ : ১২৮ এই লোকগুলো কি (ইতিহাসের শিক্ষা থেকে) কোন হিদায়াত পেল না? তাদের পূর্বে কত জাতিকেই না আমরা ধ্রংস করেছি যাদের (ধ্রংসপ্রাণ) জনপদে আজ এই লোকেরা চলাক্রেরা করছে। বস্তুত এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নির্দর্শন রয়েছে।

এই আয়াত বিভিন্ন জাতিকে যে আল্লাহ ধ্রংস করে দিয়েছেন সে বিবরণ নবী (সা) মারফত মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়টি ৭ : ৪ এবং ৭ : ৬৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

বলতে গেলে কুরআনের এসব আয়াতে archeology (প্রত্নতত্ত্ব) বিজ্ঞানের দিক নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন নায়িলের পূর্বে এই বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান ছিল বলে জানা যায় না।

۱۸-فَإِذْ أَقْبَلَ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُونَ وَسَيَّئَتْهُ بَحْرَنَ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الْأَنْفُسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا  
وَمِنْ أَنَّهُ إِلَيْنَا يُنَزَّلُ مَا نَسِيَّ وَأَطْرَافُ النَّهارَ لَعَلَّكَ تَرْضَى٠

২০ : ১৩০ সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ কর এবং  
সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে তোমার প্রতিপালকের  
সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে  
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রাত্মসমূহেও  
যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দিনের শুধু দুটি প্রাত্মসীমাই দেখতে পাই  
ঃ একটি সূর্যোদয়কালে যাকে বলা হয় উষা, আর অপরটি সূর্যাস্তের সময় যাকে  
বলা হয় গোধূলি। কুরআনের ১১ : ১১৪ আয়াতে দিবসের দু'প্রাত্মের উল্লেখ  
রয়েছে।

কিন্তু অত্র আয়াতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো : এত্রাফ  
ফ্লাই (তরফ - এর বহুবচন) যাতে স্পষ্টতই দু'য়ের অধিক প্রাত্মের কথা  
বুঝানো হয়েছে। তাহলে দিনের দু'য়ের অধিক প্রাত্মের ব্যাপারটা আমরা কীভাবে  
অনুধাবন করতে পারি?

দিবসের স্বাভাবিক দু'প্রাত্মের বিষয়টি কোন বিশেষ অঞ্চলের স্থানীয় যে কোন  
পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতায়ই ধরা পড়ে। কিন্তু দর্শক বা পর্যবেক্ষক যদি পূর্ব কিংবা  
পশ্চিম অভিমুখে বেশ ভাল গতিতে সরে যান, তাহলেই ঘটে পরিস্থিতির  
পরিবর্তন। ধরা যাক, এক ব্যক্তি উচ্চ গতিসম্পন্ন কোন বিমানে ভ্রমণ করছেন,  
ঘন্টায় ২ হাজার মাইলযোগে পশ্চিমদিকে উড়ছে বিমানখানি, সূর্যাস্তের ঠিক  
পরপরই তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। ২ হাজার মাইল  
দূরে কোন স্থানে অবতরণ করলে তিনি বিস্থায়ের সাথে লক্ষ্য করবেন যে, সূর্য  
পশ্চিম দিগন্তের খেলার বেশ উপরেই আছে এবং ১৫-২০ মিনিট পরেই তিনি  
আরেকটি সূর্যাস্তের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। আর তিনি যদি তার যাত্রা অব্যাহত  
রাখেন এবং আরো এক ঘন্টার ভ্রমণ শেষে থামেন, তাহলে তার অভিজ্ঞতায়  
সংযুক্ত হবে আরো একটি সূর্যাস্ত। কাজেই, আমরা দেখতে পাই যে, একজন  
চলমান পর্যবেক্ষকের পক্ষে দিনের দু'য়ের অধিক প্রাত্মের সাক্ষাত লাভ সম্ভব।  
চূড়ান্ত বিশেষণে দেখা যায় যে, পৃথিবীর গোলাকৃতি এবং আপন অক্ষের চারদিকে  
আঙ্কিকগতির কারণেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। অনুরূপভাবে কেউ যদি  
সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করার ঠিক পর পরই কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে অনুরূপ গতিতে

পঞ্চম দিকে ভ্রমণ করতে থাকেন, তাহলে তিনি বেশ কয়েকটি সূর্যোদয় দেখতে পাবেন। এভাবে বিশ্বয়কর হলেও তিনি দিবসের দু'য়ের অধিক গুরু বা সূচনা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন। আর এতে স্বাভাবিক বা ব্রহ্মস্ফূর্তভাবেই মানুষের মুখে উচ্চারিত হবে আল্লাহর প্রশংসাবাণী।

## ○ ﴿۱۰﴾ مَا أَمْنَثَ قَبْلَهُمْ مِّنْ فَرِيَادٍ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

২১ : ৬ এদের পূর্বে কোন জনবসতিই যাকে আমরা ধ্রংস করেছি ঈমান আনেনি আর এখন এরা কি ঈমান আনবে?

মোজেজা দেখানো সত্ত্বেও অনেক জাতি তাদের নবীর উপর ঈমান আনেনি। জনপদ ধ্রংসের ব্যাপারে ৭ : ৪ এবং ৭ : ৬৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

## ○ وَكُلُّ قَصْنَنَا مِنْ فَرِيَادٍ كَانَتْ ظَلَلَةً وَأَنْشَآنا بَعْدَ هَا قَوْمًا أَخْرَى نَ-

২১ : ১১ কত অত্যাচারী জনবসতিই এমন আছে যেগুলোকে আমরা পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি এবং তাদের পরে যেখানে আমরা অন্য কোন জ্যাতিকে উদ্ধিত করেছি।

এ বিষয়টি ৭ : ৪ ও ৭ : ৬৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

## ○ وَمَا حَلَقْنَا النَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِيُعِينَ

২১ : ১৬ আমরা এই আসমান ও যথিন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে, খেলার ছলে সৃষ্টি করি নি।

এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ বিষয়টি ৩ : ১৯১ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## ○ أَوْلَمْ يَرَ الْذِينَ كَفَرُوا أَنَّ التَّمَوُتَ وَالْأَنْهَى كَانَتْ أَرْتَقَافَتْقَنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ النَّارِ كُلَّ شَيْءٍ حَرْقَى أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

২১ : ৩০ যারা কুফরী করে তারা কী ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওত্থোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম। এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না?

## আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া

বিজ্ঞানীদের দ্বারা এ সত্য গৃহীত হয়েছে যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীস্থ সবকিছু তথা সকল বস্তুই একত্রে যুক্ত ছিল এবং একটি মাত্র একক বিন্দুতে একটি অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন এবং অতি উজ্জ্বল বৃদ্ধুদের মধ্যে অস্তিত্বমান ছিল। সময়ের ঘড়ির কাঁটা তখনও যাত্রা শুরু করেনি। এমনি শূন্য সময়ে সৃষ্টির সূচনা হয় ‘বিগব্যাং’ তথা মহা বিক্ষেপণের মাধ্যমে এই বৃদ্ধুদের বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে। শূন্য সময়ে এবং অসীম ঘনত্ববিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র গোলকটির অবস্থা কেমন ছিল পদার্থ বিজ্ঞান তার বিবরণ দিতে পারেনি। প্রচন্ড ঐ বিক্ষেপণের ১০<sup>-৩</sup> সেকেন্ড পর ঐ সময়ে অনুমিত অস্তিত্বমান মহাকর্ষ বল একক সংযুক্ত বল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। এ মুহূর্তে মহাবিশ্বের ব্যাস ছিল ১০<sup>-৮</sup> সেঁ: মিঃ এবং তাপমাত্রা ছিল ১০<sup>-১২</sup> কেলভিন। প্রচন্ড বিক্ষেপণের পর ১০<sup>-৩২</sup>তম সেকেন্ডে শক্তি বিভিন্ন বস্তুকণা তথা কোয়ার্ক, ইলেক্ট্রন এবং এন্টিম্যাট্রার নামক তাদের আয়না প্রতিবিষ্ঠে জমাট বাঁধতে শুরু করে। মহাবিশ্ব স্ফীত হয়ে একটা নরম বলের আকার ধারণ করে। মহাবিক্ষেপণের অব্যবহিত পরের ১০<sup>-৬</sup> সেকেন্ডে মহাবিশ্ব বেড়ে গিয়ে ১০<sup>-১০</sup> কেলভিন তাপমাত্রা বিশিষ্ট আয়াদের এই সৌর জগতের আকার নেয়। এত নিম্ন তাপমাত্রায় কোয়ার্কগুলো বাঁধনযুক্ত হয়ে প্রোটন ও নিউট্রনে পরিণত হয়। মহা বিক্ষেপণের তিন মিনিট পর প্রোটন ও নিউট্রন একীভূত হয়ে আনবিক নিউক্লিয়াস তথা সুরুম্বা কেন্দ্র গঠন করে। এ পর্যায়ে ইলেক্ট্রনগুলো এত শক্তিমান থাকে যে বঙ্গনযুক্ত হয়ে পরমাণু গঠন করতে পারে না। এ পর্যায়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা থাকে ১০<sup>৯</sup> ডিগ্রী। বিগ ব্যাং-এর এক লাখ বছর পর ইলেক্ট্রনসমূহ সুষুম্বাকেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়ে পরমাণু গঠন করে, বিকিরণ বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং আরো মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করতে থাকে। এ পর্যায়ে তাপমাত্রা ছিল ৩০০০ কেলভিন। মহা বিক্ষেপণের ১০০ কোটি বছর পর তাপমাত্রা কমে গিয়ে ১৫ কেলভিনে এসে দাঁড়ায়। কোয়াসার সমূহ গঠিত হয় এবং মহাবিশ্ব তার পরিচিত আকৃতি ধারণ করে যেখানে ছয়াপথসমূহ তীব্র গতিতে পরম্পর থেকে দূরে সরে যায়। কাজেই, যদিও আমরা দেখতে পাই যে, বস্তু বিভিন্ন স্তরে সংগঠিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সকল আকারের বস্তু একত্রে সংযুক্ত ছিল এবং অতঃপর তারা বিভক্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে।

## পানি থেকে সকল জীবের সৃষ্টি

জীবনের প্রক্রিয়া হচ্ছে কার্বন-ভিত্তিক অণুর ব্যবহার দ্বারা সংগঠিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার এক ধারা বিশেষ। এ প্রক্রিয়ায় বস্তুকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে

নেয়া হয় এবং এই ব্যবস্থাও প্রজননকর্মে ব্যবহার করা হয় যাতে পরিভ্রমিত দ্রব্যাদিকে নির্গত বা বহিষ্ঠার করা হয়। জৈব ও অজৈব অণুর অসংখ্য বিন্যাস দ্বারা গঠিত এক বা একাধিক কোষ নিয়ে জীবদেহ গঠিত। প্রজনন ও বৎশ বৃদ্ধির সংকেত থাকে কেন্দ্রীয় কোষ ডিএনএ-তে (ডিঅ্যুরাইবোনিউক্লিয়িক এসিড)। পৃথিবীর ইতিহাসের আদি যুগীয় সময়কালে এখানে বিরাজমান আদিম পরিবেশে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া জীবনের প্রথম স্পন্দনের সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হয়। ১৯৫০ সালে, রাসায়নবিদ এস. এল. মিলার হাইড্রোজেন, এমোনিয়া, মিথেন এবং জলীয় বাষ্পের এক গ্যাসীয় মিশ্রণকে একটা পানির পাত্রের ভিতর রাখেন এবং এর উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করেন। কয়েকদিন পর পানির পাত্রটিতে ধারণ করে এমাইনো এসিডের দ্রবণ যার বিভিন্ন যৌগ আমিষ তৈরি করে। বিজ্ঞানীগণ ধারণা করেন, ‘প্রাথমিক চোলাই’-এ এ ধরনের রাসায়নিক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রথম জীবকোষ সৃষ্টি হয়।<sup>১</sup>

অতি শীর্ষই এই ‘প্রাথমিক চোলাই’ প্রকল্প সম্পর্কে আপত্তি উথাপিত হয়। এরই মধ্যে জীবনের সংকেত বা প্রধান পরিকল্পক ডিএনএ সম্পর্কে জানা যায়। দেখা গেল বিষয়টা এত জটিল যে, অনেকে অবিষ্বাস করলেন যে, ডিএনএ পানিতে উৎপন্ন হয় যেখানে এর বিভিন্ন গঠন উপাদানের একত্রে সংযুক্তি ছিল অসম্ভব। ডিএনএ দেখতে একটা পেঁচানো মই-এর মত, যাকে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যুগল পেঁচ। মইয়ের ধাপগুলো তৈরি হয় এডেনাইন (এ), থাইমিন (টি), গুয়ানিন (জি) এবং সাইটোসিন (সি) নামক চারটি অণুর বিভিন্ন যুগলের একত্রে সংযুক্তির মাধ্যমে। মইয়ের প্রতিটি ধাপ সর্বদাই তৈরি হয় AT অথবা TA, GC কিংবা CG অণুর যুগল তৈরির মাধ্যমে। AT, CG, GC এবং TA-র বিন্যাস এক জিন (তথা গতির নিয়ন্ত্রক উপাদান) থেকে অন্য জিনে পার্থক্য হয়ে থাকে, যাতে অধ্যঙ্কন বৎশধরের মধ্যে বৎশগতির বৈশিষ্ট্যাদির সঞ্চারণ নিশ্চিত হয়। ডিএনএ অণুর ধাপসমূহ সকল জীবদেহেই একই রকম। সকল জীবের মধ্যে পার্থক্য ঘটে থাকে এই সকল ধাপ যেভাবে সাজানো থাকে তার উপর এবং AT (কিংবা TA)-এর সাথে GC (কিংবা CG)-র সংখ্যানুপাতের উপর। এই বিন্যাস এবং অনুপাতের কারণেই পার্থক্য সৃষ্টি হয় একটি নীল মাছি আর একটা কুকুরের মধ্যে। এমনিভাবেই একটা গোলাপ আর একটা ক্যাকটাস ফুল কিংবা একজন মানুষ আর একটা বানরের মধ্যেও পার্থক্য ঘটে থাকে।<sup>২</sup>

জে. ডি. বার্নাল ডিএনএ-র গঠন উপাদানসমূহকে একত্রে সংযুক্ত করণে সম্মত সৈকতে সূর্যতাপে শুকানো মাটির ভূমিকার কথা বলে গেছেন।<sup>৩</sup> এ বিষয়টি ৬ : ২ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। রাসায়নিকভাবে

সিলিকেট পাতের স্তুপ দিয়ে মাটি গঠিত যাতে দু'টি পাতের মধ্যে বাতাস ও পানি চলাচলের মত যথেষ্ট ফাঁক বিদ্যমান। সূর্যতাপে শুষ্ক হওয়া আর সাগরের পানিতে ভিজে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি অনুসমূহকে সংযুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে থাকে। কাদামাটির বৈদ্যুতিক ফেরেসমূহ তাদের ভিতর দিয়ে চলাচলকারী ঘোগসমূহের উপর কোন নির্দিষ্ট উজ্জ্বল্য আরোপ করে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীগণ আজ বিশ্বাস করেন যে, আদিম সেই চোলাইয়ে যখন জটিল অণুসমূহ কাদামাটির স্তরবিন্যস্ত কাঠামোর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে, ঠিক তখনই জীবনের প্রথম স্পন্দনের সূচনা হয়। সর্বাধিক নাটকীয় ঘটনাটি ছিল জড় থেকে জীবন স্তরে উন্নীত হওয়ার সেই আদিম অগ্রগতিটি, যা দৃশ্যত সংঘটিত হয়েছিল সম্মুদ্র সৈকতে সূর্যতাপে বিশুষ্ক কাদামাটির মধ্যে। আদিমযুগীয় চোলাই থেকে জীবনের উন্নোয়ে সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত সবগুলো বৈজ্ঞানিক মতামতই অবশ্য বাস্তবতার অতি সরলীকরণ মাত্র। জীবন গঠনকারী সবগুলো অণুকে একটা পরীক্ষা পাত্রে একত্রে রাখলেই তা জীবন সৃষ্টি করতে পারবে না। জীবনের প্রারম্ভটা অবশ্যই ডিএনএ থেকে হতে হবে। ডিএনএ-র জটিল আণবিক গঠন কাঠামো দৈবক্রমে জীবন সৃষ্টির পক্ষে একটা সমাধান অযোগ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটা ভাইরাসের ডিএনএ-তে রয়েছে ২ লাখ (মইয়ের) ধাপ। আর মানব ক্রোমোজমের অভ্যন্তরস্থ একটা ডিএনএ অনু কমপক্ষে ৬শ' কোটি ধাপ নিয়ে গঠিত। কোন ধাপ ভুলভাবে স্থাপিত হলে একটা পরিব্যক্তি তথা বংশগত পরিবর্তন ঘটে। এভাবে ধাপগুলোর বিভিন্ন সংযুক্তির মধ্যে শুধুমাত্র একটি সংযুক্তিই মানব জীবনের জন্যে উপযুক্ত হয়েছে। আদিমযুগীয় সেই চোলাইয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞায়তার প্রতিটি যদি শুধুমাত্র কয়েকদিন সময় নিত, তাহলে দৈবক্রমে সরলতম ডিএনএ-র সৃষ্টি হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আর, ধাপগুলো সাজানোর ৬০০ কোটি জোড়ার সংজ্ঞায়তা আছে এটা বিবেচনা করলে মানব ডিএনএ-র দৈবক্রমে উদ্ভব হওয়াটা প্রায় অসম্ভব।

### তথ্য সূত্র :

1. J. D. Bernal, *Science in History*, Vol. 3, Penguin Books, 1965. p. 986.
2. J. G. Navarra, J., Zaffaroni and J.E. Gatone, California State Deptt. of Education, 1967, P. 170.
3. J. D. Bernal, *The Physical Basis of Life*, London, Routledge and Kegan Ltd., 1952.

## ۱۱- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تُبَيَّنَ بِهِمْ ۚ وَجَعَلْنَا فِيهِمَا فِجَاجًا سُبْلًا ۰ لَمْ يَمْهُدْنَا مِنْ دُرْنَ

২১ : ৩১ এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গতব্যস্থলে পৌছতে পারে।

কুরআনের ২০ : ১০৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে মহাদেশীয় ভূখণ্ডের পারম্পরিক সংঘর্ষকালে প্লেট টেক্টোনিক্স দ্বারা কীভাবে পর্বতমালার সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষের আঘাত বা চাপ সমান না হওয়ায় বিভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট আলাদা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয় এবং সেই সাথে থাকে উপত্যকা ও গিরিপথ। পর্বতসমূহ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কেননা, ভূত্তুক পর্বতের ৮০ কিঃ মিৎ নিচে থাকে, যেখানে মহাদেশীয় অঞ্চলগুলোতে থাকে ৩৫ কিঃ মিৎ, আর মহাসাগরের থাকে প্রায় ৫ কিঃ মিৎ নিচে। যখন দু'টি ভূখণ্ডের পরম্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে, তখন একটা প্রচন্ড স্থিতিস্থাপক ক্ষেত্র তৈরি হয় যার ফলে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়। এথেকে পর্বতমালা গঠনের প্রাথমিক স্তরে সাংঘাতিক ভূমিকম্প তৎপরতা চলতে থাকে। পর্বত গঠিত হলে স্থিতিস্থাপক ক্ষেত্রটি মুক্ত হয় এবং এভাবে ভূকম্পনের মাত্রা কমে আসে। গিরিপথগুলো সাধারণত পর্বতসমূহের মধ্যকার সরু পথ বিশেষ, যা এক ঢালু স্থান থেকে অন্য ঢালু জায়গা এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাধার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। গিরিপথের থাকতে পারে বিরাট কৌশলগত গুরুত্ব। নিজ নিজ গিরিপথসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার উপরই কখনও কখনও বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা নির্ধারিত হয়েছে। ভূমি বাণিজ্য পথকে অবশ্যই গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে। বিশেষ কিছু কিছু গিরিপথের মধ্যে রয়েছে হিমালয়ের খাইবার ও অন্যান্য গিরিপথ, গ্রীসের থার্মোপাইলা, আল্পস পর্বতমালার সেন্ট বার্গার্ড, ককেশাসের দারিয়াল ইত্যাদি। এভাবে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণ ত্বরিত করতে পর্বতমালার মাঝে গিরিপথ সৃষ্টি করেছেন।

## ۱۲- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْأَمْسَ وَالْغَرْبَ ۚ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَعُونَ ۰

২১ : ৩৩ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রজ্যোকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

রাত ও দিন এবং চাঁদ ও সূর্যের সৃষ্টি বিষয়ে ২ : ১৬৪ এবং ৭ : ৫৪ আয়াতদ্বয়ে এবং পরিশিষ্ট-১ ও ২-এ আলোচনা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ধারণা করা হত যে, সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়া অন্য সব মহাজাগতিক বস্তু মহাশূন্যে স্থিরভাবে আটকানো আছে। তাদের নিজেদের কোন গতি আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু মহাজাগতিক ক্ষেত্রের ঘূর্ণনের কারণেই এরা ঘূরছে বলে মনে হয়। বর্তমানে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিটি মহাজাগতিক বস্তুরই নিজ নিজ নির্দিষ্ট গতি আছে। এভাবে, পৃথিবীরও রয়েছে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনের গতি, যাতে ৩৬৫.২৪ দিনে সে সূর্যকে পুরোপুরি প্রদক্ষিণ করে থাকে। অনুরূপভাবে, চাঁদের ঘূর্ণনগতিকাল ২৭.৩ দিন, বুধের ৮৮ দিন, শুক্রের ২২৫ দিন, মঙ্গলের ১.৮৮ বছর, বৃহস্পতির ১১.৯ বছর, শনির ২৯.৫ বছর, ইউরেনাসের ৮৪ বছর, নেপচূনের ১৬৫ বছর এবং প্লুটোর ২৪৮ বছর। সূর্য মিহিওয়ে ছায়াপথের অন্যান্য গ্রহসহ ২৫০ কিঃ মি/সেকেন্ড গতিতে ঘূরছে। অন্যান্য ছায়াপথগুলোও ২,০০০ কিঃ মি/সেকেন্ড থেকে ৫০,০০০ কিঃ মি/সেকেন্ড-এর মত প্রচন্ড গতিতে ঘূর্ণয়মান রয়েছে। দূরবর্তীতম মহাজাগতিক বস্তুসমূহ তথা কোয়াসারগুলো আরো অধিক বেগে ধারণান; এদের কতকগুলোর গতি আলোর গতির চেয়ে ৯০% ভাগ পর্যন্ত বেশী। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, অত্র আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য জ্যৈতি-পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের সাহায্যেই অনুধাবন করা সম্ভব।

○ ২২-وَمَا جَعَلْنَا لِيَثْرَقْ مِنْ قَبْلِكَ الْحَدْلُونْ أَفَأُنْ مَتَ فَهُمُ الْخَلْدُونْ

○ ২৩-كُلُّ نَفِيسٍ ذَارِقَةُ الْوَوْبُ وَبَلْكُوْنُ بِالشَّرِّ وَالْحَسِيرِ نِشَانَهُ وَالَّذِينَ أَنْزَلْجَعُونَ

২১ : ৩৪-৩৫ আর হে নবী আমরা তো তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্য চিরঝীব (অমর) হওয়ার ব্যবস্থা করি নি ? তুমি যদি মরে যাও তবে এই লোকেরা কি চিরদিন বেঁচে থাকবে?

প্রত্যেক জীবস্তুকেই মৃত্যুর স্বাদ এহণ করতে হবে। আর আমরা ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলের পরিক্ষা করছি। তোমাদের সবাইকে আমাদের কাছেই ফিরে আসতে হবে।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে দুনিয়াতে কোন জীবই অমর নয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে জীবিত লোকের বিভিন্নতা পাওয়া যায়। কিন্তু ১০০ বছরের উর্ধে জীবিত লোকের সংখ্যা নগণ্য। উত্তম খাদ্য, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা, ইত্যাদির ফলে গড় আয়ুর সীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও শতবর্ষ আয়ু পায় এমন লোকের সংখ্যা খুর কম। শিশু মৃত্যুর হার কম

বলে উন্নত দেশে বৃক্ষ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহে উন্নত জীবনযাত্রার ব্যবহা শিশু মৃত্যুর হার কমিয়েছে এবং বৃক্ষলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

পৃথিবীর সব জীবকেই মরতে হবে। এটা এক চিরস্তন সত্য। মৃত্যুর একমাত্র নির্দিষ্ট প্রমাণ হচ্ছে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, যা স্টেথোস্কোপ দিয়ে নিশ্চিত করা যায়—অর্থাৎ যখন হৃদপিণ্ডের কোন শব্দ শোনা যায় না। মৃত্যুর অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হচ্ছে মুখের সামনে আয়না ধরলে তাতে বাস্প জমবে না, বা একটি পালক উপরের ঠোটে রাখলে তা স্পন্দিত হবে না, অথবা মৃত ব্যক্তির বুকের উপর পানি ভর্তি একটি কাপ রাখলে পানির কোন নড়াচড়া বুবু যায় না। মৃত্যুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হলো চামড়া বা রক্তনালী কাটলে রক্ত বের না হওয়া। অন্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান প্রমাণ হলো মুখের কোষগুলো ঢিলা হয়ে যাওয়া, ফলে চোখ স্থির হয়ে যায় এবং মুখ হা হয়ে থাকে, পিঠের বক্রতা হারিয়ে যায়, চামড়ার রং ফ্যাকাসে হয়, চামড়া পুড়ালে ফোসকা পড়ে না এবং লাল হয় না।

কোন কোন ক্ষেত্রে এক দেহ থেকে অন্য দেহে অঙ্গ সংযোজন এবং যান্ত্রিক উপায়ে পুণ্যজীবিতকরণ যেমন বায়ুশোধক মুখোশের সাহায্যে একজনের হৃদপিণ্ড অনিদিষ্টকালের জন্য সচল রাখা অনেক সময় মৃত্যুকে বুবা কঠিন করে তুলেছে। এই সমস্যা পরিহার করার জন্য ‘ব্রেইন ডেথ’-এর উদ্ভাবন হয়েছে। ইলেক্ট্রোইনসেফালোগ্রামের মাধ্যমে ব্রেইন কার্যকর নয় ধরা পড়লে কৃতিম উপায়ে শ্বসন ও হৃদপিণ্ড চালু থাকলেও একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে ধরা হয়।

এ পর্যন্ত আমাদের জীবন জীবন্ত কোষের সঙ্গে জড়িত যা বার্ধক্যজনিত কারণে লয় হয়। এই লয় কৃতিমভাবে বিলক্ষিত করা যায় কিন্তু অনিদিষ্টকালের জন্য ঠেকানো যায় না।

٩-فَاسْجِبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَتْمِي وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِكُونَ  
○ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَلْعَنُنَا رَغْبَةً وَرَغْبَةً وَكَانُوا لَا يُخْسِنُونَ

২১ : ৯০ আমরা (যাকারিয়ার) দোয়া করলাম আর তাকে দান করলাম ইয়াহইয়াকে। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযুক্ত করে দিলাম।

এই লোকেরা (যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও যাকারিয়ার স্ত্রী) নেক ও পুণ্য কাজে অঘসর, আমাকে আগ্রহ ও ডয় সহকারে থাকত এবং আমাদের নিকট ছিল ভীত, অবনত।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে বৃক্ষ বয়সে এবং সন্তানহীনা স্তৰীর গর্ভে হ্যরত যাকারিয়া (আ)-এর পুত্র সন্তান ইয়াহইয়া (আ)-র জন্মের কথা বলা হয়েছে। হ্যরত জাকারিয়ার পুত্র সন্তান লাভের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। এ বিষয়টি ১৯ : ৮ ও ৯ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

## ۹۱-وَالَّتِي أَخْصَصْتُ فِرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا أَبْنَاهَا لِلْعَلَمِينَ

২১ : ৯১ আর সেই মহিলা (বিবি মরিয়াম) যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, আমরা তার গর্ভে স্থীয় 'রাহ' ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে (হ্যরত ঈসা আ) দুনিয়াবাসীর জন্য উজ্জ্বল নির্দশন বানিয়ে ছিলাম।

এখানে কুমারীমাতা হ্যরত মরিয়াম (আ)-এর গর্ভে হ্যরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণের প্রসঙ্গটি আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়টি ১৯ : ২০ ও ২১ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

## ۱۰۲-يَوْمَ نَطْبُو النَّمَاءَ كَطْنَى التَّهْلِيلُ لِلْكَبْرِيَّةِ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَى خَلْقِنَا تَعْيِنَاهُ وَغَدَّا عَلَيْنَا إِذَا كُنَّا فَعَلَمِينَ

২১ : ১০৪ সেদিন আকাশমণ্ডলীকে উঠিয়ে ফেলব, যেভাবে উটান হয় শিখিত দফতর; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রূতি পালন আমার কর্তব্য; আমি তা পালন করবই।

এখানে আল্লাহ মহাবিশ্বের চূড়ান্ত অবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এটা সেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে যা একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ তথা বিগ ব্যাং দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিগ ব্যাং তথা মহা বিস্ফোরণের প্রবর্তী সম্প্রসারণের বেগ এখনও কার্যকর রয়েছে। ছায়াপথ ও ছায়াপথ উচ্চসমূহ তীব্রবেগে পরম্পর থেকে দ্রবর্তী স্থানে চলে যাচ্ছে; দূরত্ব যত বাঢ়ছে, দূরে সরে যাওয়ার বেগও ততই বৃক্ষি পাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, মহাবিশ্ব কি অনন্তকাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে? এ সম্প্রসারণ বলকে প্রতিরোধ করার জন্যে রয়েছে আকর্ষণ বল যা মহাকর্ষ থেকে সৃষ্টি। এ মহাকর্ষ বলের কারণে, ছায়াপথটচ্ছ এবং আলাদা আলাদা

ছায়াপথসমূহ পরম্পরকে আকর্ষণ করে থাকে। এভাবে, মাধ্যাকর্ষণ বল সম্প্রসারণের হার কমিয়ে থাকে। মহাবিশ্বে মাধ্যাকর্ষণ এবং সম্প্রসারণ—এ দু'টি বল ক্রিয়াশীল রয়েছে। আজ পর্যন্ত সম্প্রসারণ বলটি মাধ্যাকর্ষণ বলকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। যে কারণে ছায়াপথগুলো এখনো পরম্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সম্প্রসারণ বলের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণও অব্যাহত থাকবে। এক সময় সম্প্রসারণের হার হ্রাস পেতে পারে, এমনকি তা শূন্যের কাছাকাছি যেতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতেই থাকবে এবং তা খোলা থাকবে। অপরপক্ষে, মাধ্যাকর্ষণ বল যদি প্রভাবশালী হয়, তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন সম্প্রসারণের হার হ্রাস পেতে শুরু করবে এবং শেষ পর্যন্ত তা শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও মাধ্যাকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল থাকবে। ফলে, মহাবিশ্ব সংকুচিত হওয়া শুরু করবে এবং শেষ পর্যন্ত বিরাট এক চূর্ণনৰ্ধনির মাধ্যমে ভেঙ্গে পড়বে এবং অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন এক বৃদ্ধুরদে পরিণত হবে।

সম্প্রসারণ বল এবং মহাকর্ষজনিত সংকোচণ বলের মধ্যে প্রচণ্ড রশি টানটানির ফলাফল নির্ভর করে মহাবিশ্বে বর্তমান বস্তুর গড় ঘনত্বের উপর। গড় পড়তা ঘনত্ব যদি সংকট সৃষ্টিকারী নিম্নতম মানেরও কম হয় তাহলে সম্প্রসারণ বল হয়ে পড়ে প্রভাবশালী ও নিয়ন্ত্রণকারী; আর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে এবং চিরকালের জন্য খোলা থাকে। অপরপক্ষে, বিশ্বের গড় ঘনত্ব যদি সংকট মান অতিক্রম করে, তাহলে সংকোচণ বল শক্তিশালী হয়, মহাবিশ্ব নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসে এবং সংকুচিত হওয়া শুরু করে; অবশ্যে বিশাল এক চূর্ণনৰ্ধনির মধ্য দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

মহাবিশ্বের বস্তুর গড় ঘনত্বের এই সংকট মান প্রতি ঘন আলোকবর্ষ ভরের সমান। মহাবিশ্বের সকল জ্ঞাত বস্তুর তর বিবেচনা করলে, গড়পড়তা ঘনত্ব দাঁড়ায় সংকট মানের মাত্র ৩০% ভাগ। এমতাবস্থায় মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতেই থাকবে এবং খোলা থাকবে। কিন্তু ছায়াপথগুলোর ভিতর বিপুল পরিমাণে ঘন, অদৃশ্য বস্তু আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ঘন বস্তুর মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ গহর, অনুজ্জল ও ভগ্নীভূত তারকাপুঁজ, বিপুল সংখ্যক বৃহস্পতি আকৃতির বস্তু যেগুলো এতটা ভারী ছিল না যে প্রজ্ঞলিত হয়ে তারকায় পরিণত হয়। সবচেয়ে অবাক করার মত ঘটনা হচ্ছে এই সব অতি ক্ষুদ্র ভরবিহীন কণা-নিউট্রন যেগুলো প্রচণ্ড বিক্ষেপণকালের প্রথমদিকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এখনও তারকার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে। এ সকল নিউট্রনের বিদ্যুৎবিহীন, ভরবিহীন শক্তি প্রচণ্ড হবার কথা ছিল। ১৯৮০ সালে সোভিয়েত এবং আমেরিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইঙ্গিত দেয় যে,

নিউট্রনগুলোর খুব সামান্য ভর থাকতে পারে।<sup>1</sup> বিগব্যাং সৃষ্টি নিউট্রনসমূহের সংখ্যা আলোক কণা ফোটনের বিপুল সংখ্যার কাছাকাছি। এদের সংখ্যা এত বিপুল যে, সাধারণ বস্তুকে নিউট্রন পর্বতমালার শীর্ষে বরফের আচ্ছাদনের মত লাগতে পারে। যদি তাই হয়, নিউট্রনসমূহের ভর যত সামান্যই হোক না কেন, সম্ভাব্য সকল অদৃশ্য বস্তুর কথা বিবেচনায় আনলে বিশ্বস্থিত বস্তুর গড়পড়তা ঘনত্ব সংকট মানের চেয়ে বেশী হবে। কাজেই, এমন একটা সময় আসবে, যখন মহাবিশ্ব সংকুচিত হওয়া শুরু করবে এবং বিশাল চূর্ণনধনির মধ্য দিয়ে ভেঙ্গে পড়বে।

মহাবিশ্বকে যে গোটান কাগজের মত গুটিয়ে নেয়া হবে, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত অবস্থার কর্মসূচির মধ্যেই সেটার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যা আমেরিকার বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের বিবরণীতে পাওয়া যায়।<sup>2</sup> তিনি স্বীকার করেন যে, মহাচূর্ণনধনির প্রায় একশ' কোটি বছর আগে আলাদা আলাদা ছায়াপথগুলোর ভিতরকার শূন্যস্থানগুলো ছোট হয়ে আসবে। মহাবিশ্ব তখন তারকামণ্ডলীতে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তারকামণ্ডলো পরম্পরের আরো কাছাকাছি চলে আসবে। মহাচূর্ণনধনির এক লাখ বছরের মত আগে ছায়াপথসমূহ একাঙ্গীভূত হয়ে যাবে এবং তারকাসমূহ পরম্পরের এত কাছাকাছি চলে আসবে যে, মনে হবে একটা বিশাল সূর্য জুলছে। মহাচূর্ণনধনির এক হাজার বছর আগে তারকাসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধবে এবং বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণ গহ্বর সৃষ্টি হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ সকল গহ্বর পরম্পরাকে আকর্ষণ করতে করতে এক সময় একাঙ্গীভূত হয়ে একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র, অতি উন্নত, অতি ঘন বস্তুর বুদ্বুদে পরিণত হবে। এটাই সেই মহাচূর্ণনধনি।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, মহাচূর্ণনধনির পর আরেকটি মহাবিক্ষেপণ ঘটবে এবং বর্তমান মহাবিশ্বের মত নতুন একটা মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে। এই অভিযন্তাটি আলোচ্য আয়তের মর্মের সথে সামঝস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

#### তথ্যসূত্র :

1. G. Philips, Restless Universe, Nigel Henbest and Heather Couper, 1980.
2. Ibid.

هَيْلَاهُ النَّاسُ إِنْ كَنْتُمْ فِي رَبِّكُمْ لَكُمْ وَإِنْ تَرَبَّوْنَ لَكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ  
 هَمْ مِنْ عَلَقَةٍ لَثُرَّ مِنْ مُضْعَفَةٍ مُعَلَّقَةٌ وَغَيْرُ مُعَلَّقَةٍ لِبَيْنَ لَكُفَّٰ  
 وَلَكُفَّٰ فِي الْأَرْضِ أَمْ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجْلِ سَمَاءٍ لَثُرَّ مُخْرِجٌ مُكَبْرَ لَثُرَّ اتَّبَاعُوا أَهْدَافَكُفَّٰ  
 وَمِنْكُفَّٰ مَنْ يُسْوِي وَمِنْكُفَّٰ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكِبَلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ  
 عَلِيهِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا السَّاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ  
 وَأَبْدَأَتْ مِنْ كُلِّ رُوْجٍ بِهِيجٍ ○

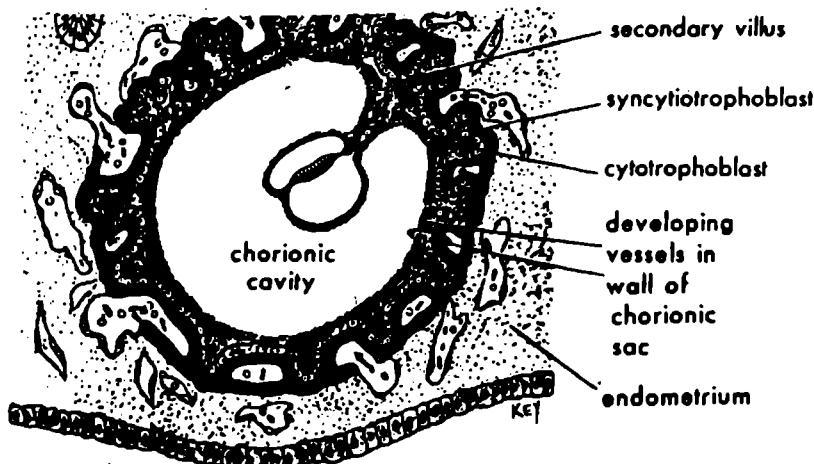
২২ : ৫ হে মানব সমাজ” মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে  
 কোন সন্দেহ থাকে তবে তোমাদের জানা উচিত যে আমরা  
 তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, পরে শুকানীটি হতে, তার  
 পর রঙপিণ্ড হতে, পরে মাংসপিণ্ড হতে যা আংশিক গঠিত এবং  
 আংশিক অগঠিত। (এ সব বলার) উদ্দেশ্য যেন তোমাদের  
 নিকট সব কথা স্পষ্টভাবে পেশ করা হয়। আমরা যাকে ইচ্ছা  
 করি একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে  
 রাখি, পরে তোমাদেরকে একটি শিশুরাপে ভূমিষ্ঠ করি, পরে  
 তোমাদেরকে বর্ধিত করি যেন তোমরা পূর্ণ শক্তি সক্ষম হয়ে  
 উঠতে (যৌবন পর্যন্ত পৌছাতে) পার। আর তোমাদের মধ্যে  
 কাকেও পূর্বাহেই মৃত্যুদান করি আবার কাউকে দুর্বলতম বৃদ্ধ  
 অবস্থায় পৌছাই এমনকি তারা সব কিছু জানার পরও তখন  
 কিছুই জানে না। তোমরা দেখতে পাও, জমিন প্রাণহীন অনুরূপ  
 অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কিন্তু পরে যখনই এর উপর পানি বর্ষণ  
 করি, তা পুনঃ সতেজ হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে এবং তা সকল  
 প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিজ্জ উৎপাদন করতে শুরু করে দেয়।

### মাতৃগর্ভে মানব শিশুর সৃষ্টি

এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব শিশুর সৃষ্টির কয়েকটি স্তর সম্পর্কে উল্লেখ করা  
 হয়েছে। মানুষ যে মাটি থেকেই সৃষ্টি এ বিষয়ে ২ : ২৮ ও ১৮ : ৩৭ আয়াতের  
 সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মাটি থেকে অর্জিত মৌলিক পদার্থ মা ও বাবার

ଖାଦ୍ୟର ମାଧ୍ୟମେ ବାବାର ଶୁଦ୍ଧକାଟ ଓ ମାଯେର ଡିମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହ୍ୟ ଯାକେ ନୁଂଫାହ ବା ଫୋଟା ବଳା ହେବେ । ନୁଂଫାହ ଥିବା ମାନବ ଶିତ୍ରର ଜନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟରେ ୧୬ : ୪ ଆଯାତେ ଆଶୋଚନା କରା ହେବେ ଯା ପରିଶିଷ୍ଟ ୭-୬ ବିଷ୍ଟାରିତ ଦେଓଯା ଥାଏ ।

ଡିମ୍ ଓ ଶୁଦ୍ଧକାଟ ମିଳିଲେ ପର ଯେ ସଙ୍ଗୀବିତ ଡିମ୍ (fertilized ovum) ହ୍ୟ ଯାର zygote ଫେଲୋପିଯାନ ଟିଉବ ଦିଯେ ଜରାଯୁତେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାର ଦେଯାଲେ ଗୈଥେ ବସେ । ମେଥାନେ ଏର ବୃଦ୍ଧି ହତେ ଥାକେ । zygote-ଏର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରରେ ନାମ ଆଲାକାହ ଅଛି ଯାର ଅର୍ଥ ଜୋକେର ମତ କୋଣ ବସ୍ତୁ ଅଥବା ଝୁଲାତ୍ କୋଣ ବସ୍ତୁ ବା ରଙ୍ଗପିଣ୍ଡ ଯା ଗାଯେର ସଙ୍ଗେ ଲେଗେ ଥାକେ । ୧ ସୂତରାଂ ଜରାଯୁତେ ଗୈଥେ ବସାକେଇ ଆଲାକାହ ବା (ଅଛି) ଝୁଲାତ୍ ଶ୍ରରେ ଶୁରୁ । ଜ୍ଞଣେର ୩-୪ ସଂତାହ (୨୪-୨୫ତମ ଦିନ) ସମୟେ ଜୋକେର ମତ ଏକଟି ବସ୍ତୁ ଜରାଯୁର ଗାୟେ ଲେଗେ ଝୁଲେ ଥାକେ (ଛବି-୧୧) । ଏ ସମୟ ଜ୍ଞଣ ଏକଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭରା ଥିଲିତେ ଝୁଲାତ୍ ଥାକେ । ଏ ସମୟ ଜ୍ଞଣେର ହରିପିଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଶୁରୁ ହ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞଣ ମାୟେର ରଙ୍ଗେର ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ବଲେ ଜୋକେର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଯା ଦେଖିତେଓ ଜୋକେର ମତ । ୨ ଏଇ ଆଲାକାହ ଶ୍ରର ୧୫-୨୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେ ।



ଚିତ୍ର- ୧୧

ଏ ସମୟ ଯଦି ଗର୍ଭପାତ ହ୍ୟ ତବେ ଏହି ଶ୍ରରେ ଜ୍ଞଣ (ଅଥବା ଯଦି ଶଳ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଜରାଯୁର ଦେଯାଲ ଚେହେ ବେର କରେ) ଦେଖିତେଓ ଜୋକେର ମତ (ଛବି-୧୨) ବା ଏକଟି

রজপিত মাত্র ।<sup>৩,৪</sup> এ ছাড়া ক্রমের ১৫-১৬ দিন সময়ে একে জরায়ুর দেয়াল থেকে ঝুলতে দেখা যায়।<sup>৫</sup> সুতরাং আলাকাহ শব্দের সরণলো অর্থই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত।

এর পরের শ্রকে বলা হয়েছে مُضْفَل (মুদগাহ) অথবা চিবানো বস্তু যা মাংসপিণ্ডের মত। এই শ্র ষ৩ থেকে শুরু করে ৪২ দিন পর্যন্ত চলে। এ সময়কার জ্ঞ দেখতে সত্যিই চিবানো বস্তুর মত, যার তেরটি প্রকৃত অংশ (somites) দেখতে চিবানো মাংসে দাঁতের দাগের মত মনে হয় (ছবি-১২)।<sup>৬</sup> এ সময় যদিও শরীরের বিভিন্ন অংশ তৈরি শুরু হয় তবে তাদের কাজ শুরু হয় না অর্থাৎ অন্ত ও যন্ত্রণলো তখনও পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যায়নি। তাই কুরআনের বর্ণনা আংশিক তৈরি ও আংশিক তৈরি নয় অবস্থা বৈজ্ঞানিকভাবেও সত্য। এ বিষয়ে বাকি শ্রণলো সম্পর্কে ২৩ : ১২-১৫ আয়াতগুলোতে প্রবর্তীতে বিস্তারিত বলা হবে।



চি- ১২

গর্ভকাল সাধারণত ডিম্বের গর্ভাধানের (fertilization) ২৬৬ দিন বা ৩৮ সপ্তাহ পর্যন্ত অথবা শেষ ঋতুস্নাবের (last menstrual period or LMP) -এর ২৮০ দিন বা ৪০ সপ্তাহ বলে ধরা হয়। তবে প্রকৃত পক্ষে এই গর্ভকাল কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ কম বা বেশীও হতে পারে। এই সময়কাল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যাকে এখানে আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় বলা হয়েছে।

সন্তାନେର ଜନ୍ମଅହଣ ଏକ ଅଲୋକିକ ଘଟନା । ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମେର ପର ସେ ଶିଶୁ, କିଶୋର, ଯୌବନ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଅବହ୍ଳାସ ପ୍ରାଣ ହୁଏ । ଏଥାନେ ଆଲ୍‌ଗ୍ଲାହ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧାବହ୍ଳାସ କଥା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ । ଯୌବନେ ଓ ପ୍ରୌଢ଼କାଳେ ମାନୁଷ ବେଶ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧକାଳେ ଆବାର ଦୂର୍ବଲ ହୁଏ ଯାଏ । ତବେ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ଯାଏ ଯେ ତାରା ଶିଶୁର ମତ ହୁଏ ଯାଏ ଏବଂ ତାରା ସବ ଜାନା ବିଷୟ ଭୁଲେ ଯାଏ । ଏହି ଅବହ୍ଳାସକେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନେ Alzheimer's dementia ବିଳା ହୁଏ ଯା ମନ୍ତ୍ରିକର ବିଶେଷ ଧରଣେ ଶୁଭତା (sclerotic)-ର ଜନ୍ୟ ହୁଏ ଥାକେ । ଏଟା ସତି ଭାବବାର ବିଷୟ ଯେ ଆଲ୍‌ଗ୍ଲାହ ଆମାଦେରକେ ଏକଟି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଥେକେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣେ ମାଧ୍ୟମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଶିଶୁ ରୂପେ ପୃଥିବୀତେ ଡ୍ରମିଟ କରାନ ଯା ଏଥିନ ଆମରା ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ଵର ମାଧ୍ୟମେ ଜାନତେ ପାରଛି । ଅର୍ଥାତ ସଥିନ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ଵର ଜନ୍ୟରେ ହେଲା ତଥା ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏଛେ । ଏତେ ନିଃସମ୍ବେଦେହେ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ଆଲ-କୁରଆନ ଆଲ୍‌ଗ୍ଲାହର ପ୍ରେରିତ କିତାବ, କୋନ ମାନବ ରଚିତ ପୁଣ୍ଡର ନନ୍ଦି ନାହିଁ ।

### ବୃଷ୍ଟିର ପାନି ମାଟିକେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳିତ କରେ

ଏହି ପୃଥିବୀତେ ଅନେକଦିନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନା ହଲେ ଗାଛପାଲା ଓ ଲତାପାତାର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ମୃତ ମନେ ହୁଏ ଯଦିଓ ଏର ମଧ୍ୟେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉତ୍ତିଦେର ବୀଜ ଲୁକ୍ଷାୟିତ ଥାକେ । କୋନ ଗାଛଇ ପାନି ଛାଡ଼ା ବାଁଚେ ନା । ଆର ସ୍ତଳଭାଗେର ବୃକ୍ଷରାଜି ସାଧାରଣତ ବୃଷ୍ଟିର ପାନିତେଇ ବେଁଚେ ଥାକେ । ଆମରା ସବୁଜ ବନାନୀ ଓ ଘାସେ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେଇ ପାନିର ସଙ୍ଗେ ବୃକ୍ଷର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିତେ ପାଇ । ଶକ୍ତ ମାଟିତେ ଗାଛେର ବୀଜ ପାନିର ଅଭାବେ ମୃତପ୍ରାୟ ପଡ଼େ ଥାକେ ଏବଂ ତାପେର ତାରତମ୍ୟ ସହ୍ୟ କରାର ଶକ୍ତି ରାଖେ । ଏକମ ଆପାତ ମୃତ ପୃଥିବୀତେ ବୃଷ୍ଟିର ପର ସୁଣ୍ଡ ବୀଜଗୁଲୋ ଅନୁରିତ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟେ ୬ : ୯୫ ଆଯାତେ ଆଲୋଚନା କରା ହୁଏଛେ ।

କୁରଆନେର ଶଦ୍ଦୟାଜ-ରିବ୍ ବିଶେଷଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଏର ଅର୍ଥ ବଲତେ ବୁଝାଯ ଆନ୍ଦୋଳିତ ବା ଆଲୋଡ଼ିତ ହେଁଯା ବା ଉତ୍କୁଳ୍ଳ ହେଁଯା ଯାର ତରଜମା ଆନନ୍ଦେ ଉଦ୍ଦେଲିତ ହେଁଯାକେ ବୁଝାଯ । ତକମୋ ମାଟିତେ ବୃଷ୍ଟିର ପାନି ପଡ଼ିଲେ ଘାସ ଲତା ଗୁଲ୍ବ ଯେ ଭାବେ ଦ୍ରୁତ ଜନ୍ୟେ ତାତେ ଏହି ଆନନ୍ଦେ ଉତ୍କୁଳ୍ଳ ଭାବଇ ଯେନ ଫୁଟେ ଉଠେ । ବୃଷ୍ଟିର ପାନିତେଇ ମାଟିତେ ଗାଛପାଲା ଜନ୍ୟେ ଜନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ରାସାୟନିକ ଓ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁରୁ ହୁଏ । ବହୁ ଉପର ଥେକେ ପଡ଼ା ବୃଷ୍ଟିର ଫୋଟା ମାଟିର ଛେଳାକେ ନରମ କରେ ତେଙ୍ଗେ ଶୁଡିଯେ ଦିତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆର ମାଟିର କୋନ କୋନ ଶୁଦ୍ଧାଂଶ୍

পানির সাহায্যে ফুলে ফেঁপে উঠে বীজ অংকুরিত করতে সহায়তা করে। আরবী  
রب شدের অর্থ খাওয়ানো, পুষ্টি সাধন বা লালন-পালন করা। প্রকৃতপক্ষে  
ভিজা মাটিই গাছ-পালার বীজকে পুষ্টি প্রদান করে। মাটি আর পানির মিলনে  
মৃত পৃথিবী আবার সবুজ বৃক্ষলতায় সুশোভিত হয়ে উঠে।

### তথ্যসূত্র :

1. K. L., Moore and A.M.A., Azzindani, *The Developing Human with Islamic Additions*, 3rd edn. Dur al-Qiblah for Islamic Literature, Jeddah, p. 73, 1982.
2. Ibid, pp. 56-82.
3. M.G. Muazzam, *History of the Discovery of the Mechanism of Reproduction and the Revelation in the Holy Quran*, Pak. J. Science. Vol. 14, No. 6, pp. 281-298, 1982.
4. K. L., Moore and A.M.A., Azzindani, *The developing Human with Islamic Additions*, 3rd edn. Dur al-Qiblah for Islamic Literature, Jeddah, 1982, p. 56a.
5. Ibid, p. 67.
6. Ibid, p. 80.
7. Steingass, *Arabic-English Dictionary*. Cosmo Publications, New Delhi, India, 1982.
8. M. Pickthall, *The Meaning of the Glorious Qur'an*. Kutub Khana Ishayat-Ul-Islam (Regd), Delhi. 1979.

১- ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِبُّ التَّوْثِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ هُوَ قَدِيرٌ ۝

২২ : ৬ সুতরাং নিকটই আল্লাহই একমাত্র সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবনদান করেন এবং একমাত্র তিনিই সব কিছুর উপর প্রভাব রক্ষাকারী।

মৃতকে জীবিত করার বিষয়টি ২ : ২৮ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১- إِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ يَسْبُحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْجِنُّ وَالْفَلَقُ  
وَالْجِبَرُ وَالْجَنَّوُرُ وَالْجَنَّوَرُ وَالْجَنَّوَرُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ  
وَمَنْ تُهِنَّ إِنَّ اللَّهَ فَعَلٌ مِّنْ كُرْمَةِ نَفْلٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

২২ : ১৮ তোমরা কী সক্ষ্য কর না যে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু বা জিনিষটি আল্লাহর নিয়মের নিকট অবনত শির যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা এবং প্রাণীজগত, আর মানব জাতিরও বিরাট অংশ। এমন অনেক রয়েছে যাদের উপর আল্লাহর আধাৰ অবধারিত হয়ে রয়েছে। আল্লাহ থাকে ঘৃণা করেন তাকে আর কেউ স্বান্দন দিতে পারে না। বস্তুত আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করতে সক্ষম।

মহাকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জীব ও বস্তু যে একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এ বিষয় ৫ : ১৯ ও ৭ : ১৮৫ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে এবং পরিশিষ্ট-৩-এ এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

২- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۝ وَإِنَّ يَوْمًا عَنْدَ رَبِّكَ  
كَلْفَ سَنَةً مِّنَ الْمَوْلَدِ ۝

২২ : ৪৭ আর এরা আপনার নিকট আধাবের জন্য তাগাদা করছে (কারণ তাদের ধারণা আধাৰ আসবে না), অথচ আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ কৰবেন না। আর আপনার রবের নিকট একটি দিন এক হাজার বছরের সমতুল্য।

আমরা পৃথিবীর নিজের মেরুদণ্ডের (axis) চার পাশে দৈনিক আবর্তনকে একদিন গণনা করি। আর সূর্যের চারদিকে ঘূরবার সময়কে এক সৌর বছর ধরা হয়। তবে এই ঘূর্ণনের বেলায় যদি সূর্যকে স্থির ধরা হয় তবে বছরের দৈর্ঘ্য হয় ৩৬৫.২৪২ দিন আর যদি কোন তারকাকে স্থির ধরা হয় তবে এক বছরের দৈর্ঘ্য হয় ৩৬৫.২৫৬ দিন।

এমনিভাবে যে কোন গ্রহ, উপগ্রহ যদি তার মেরুদণ্ডের চার পাশে একবার ঘূরে তবে তাকে সেই গ্রহের একদিন ধরা হবে। পৃথিবী থেকে এই সব বিভিন্ন গ্রহের প্রতিদিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হবে। আমাদের চাঁদও তার মেরুদণ্ডের চার পাশে একবার ঘূরলে আমাদের হিসাবে চাঁদের একদিন হবে। তবে পৃথিবীর হিসাবে হবে ২৯ দিন। আর সূর্যের নিজস্ব একদিন আমাদের হিসাবে হবে ২৭ দিন। আমাদের মিল্কি ওয়েয় (Milkyway) একদিন আমাদের পৃথিবীর হিসাবে হবে ২২ কোটি বছর। সূতৰাং মহাবিশ্বের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির দিনগুলো আমাদের হিসাবের বিভিন্ন সময়ের হবে।

আর পাক কুরআনে **يُوْم** বলতে একদিন নয় এক সময়কাল (period) বুঝায়। যদিও আমরা আকাশের বিভিন্ন বস্তুর দিনের বিভিন্ন হিসাব দিবার চেষ্টা করেছি তবে এখানে আল্লাহর বলছেন যে আখেরাতের একদিন হবে আমাদের এক হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট একদিন আমাদের দিন বা বছরের তুলনায় অনেক বেশী। তাই ৭ : ৫৪ আয়াতে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার অর্থ ছয় সময় কাল যা বহু হাজার লক্ষ বছরও হতে পারে।

-৫৮-

**لَيُجَعَّلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَنُ فَتَنَّهُ لِلْبَرِّينَ فِي كُلِّ بَهْرَمٍ مَرْضٌ وَالْقَاسِيَةُ  
كُلُّ بَهْرَمٍ وَإِنَّ الْلَّاهِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيشُونَ**

২২ : ৫৩ যেন তিনি (আল্লাহ) শয়তানের উজ্জ্বালিত সন্দেহকে এমন লোকদের পরীক্ষার উপকরণ করে দেন যাদের অন্তরে ব্যধি রয়েছে এবং যাদের হৃদয় কঠিন। আর বাস্তবিক এই যাতিমরা চরম বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে।

মনের রোগ বা মানসিক রোগের কথা ৯ : ১২৫ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। ২ : ১০ আয়াতেও মনের রোগের উল্লেখ রয়েছে।

হৃদয় কঠিন বলতে হৎপিণ্ডের মাংস শক্ত হয়ে যাওয়াকে বুঝায় না বরং এতে আল্লাহকে বিশ্বাস না করার ধৃষ্টতা বুঝায়।

٦١- ذَلِكَ يَأْنَتُ اللَّهُ بِمَا يُبَرِّئُ الْأَنْيَلَ فِي النَّهَارِ وَذَلِكَ لِجُنُوبِ النَّهَارِ فِي الْأَنْيَلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَيِّدُ  
بَعْضِ الْأَنْيَلِ

২২ : ৬১ সেটা এ জন্য যে, আল্লাহু রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসের মধ্যে  
আর দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহু  
সর্বশ্রেণীতা, সম্যক দ্রষ্টা।

৩ : ২৭ আয়াতে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٦٢- أَلَمْ تَرَأَنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُؤْمِنُ بِهِ الظَّالِمُونَ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً  
إِنَّ اللَّهَ لِطِيفٌ خَلَقَ

২২ : ৬৩ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহু বারি বর্ষণ করেন আকাশ হতে  
যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে ধরিবী : আল্লাহু সম্যক সৃষ্টিদর্শী,  
পরিজ্ঞাত।

২ : ১৯ এবং ২ : ২২ আয়াতদ্বয়ে আকাশে মেঘের গঠন এবং বৃষ্টির ফোটার  
নিচে পতন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর সবুজে আচ্ছাদিত হওয়ার অর্থ প্রাচুর্যের সাথে গাছপালা ও শস্য  
ফলাদির জন্য ও বৃক্ষিপ্রাণ হওয়া। বৃষ্টির ফোটা শুক মৃত্তিকার উপর পড়ে, বিশুক,  
অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করে এবং তারপর প্রচুর পরিমাণে সবুজ গাছপালার জন্ম  
দেয়। সবুজ গাছপালা ও শস্যফলাদির বৃক্ষির বিষয়টি ২ : ১৬৪, ৬ : ৯৯ এবং  
২০ : ৫৩ আয়াতদ্বয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٦٣- لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَحْكَمُونَ

২২ : ৬৪ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহু,  
তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

'বিলিংগিং' (belonging) তথা অধিকারভূক্তি কথাটার প্রচলিত অর্থ  
মালিকানা বা দখল এর পরিবর্তে ভিন্ন এক অর্থে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।  
কেননা আল্লাহুর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। অবশ্য, আল্লাহু যেহেতু (জীব ও  
জড়) সব কিছু সৃষ্টি করেন, লালন-পালন করেন এবং নিজ বিধান মোতাবেক  
পরিচালনাও করেন, সেহেতু সবকিছুই তাঁর মালিকানাভূক্ত হিসেবে গণ্য করা  
যেতে পারে।

আল্লাহু তা'আলাই যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তা ২ : ১৬৪ আয়াতে এবং  
পরিশিষ্ট-১ ও ২-এ আলোচিত হয়েছে। ১ : ২ আয়াতে দেখানো হয়েছে যে,  
আল্লাহই সবকিছু লালন-পালন করেন। আল্লাহ একজন আইনদাতা হিসেবে  
সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন-এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ৭ : ৫৪ আয়াতে। ৫ : ১৯  
আয়াত প্রসঙ্গে যে আলোচনা রাখা হয়েছে তা-ও এখানে প্রাসঙ্গিক।

هُوَ الَّذِي رَأَى اللَّهُ سَخْرَيْنَ لَكُمْ فَإِنَّ الْأَرْضَ وَالْفَلَكَ تَحْتَنِي فِي الْبَعْرَى يَا أَنْزَلْتَهُنَّا وَيُنَسِّلُ  
الْكَلَمَ أَنْ تَقُصَّ عَلَى الْأَرْضِ لَا يَأْذِنُهُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالثَّارِسِ لَرَوْفَ وَجِيلَمُ<sup>٥٦</sup>

২২ : ৬৫ তুমি কি লক্ষ্য করা না যে, আল্লাহু তোমাদের কল্পণে নিয়োজিত  
করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুকে এবং তার  
নির্দেশে সমুদ্র বিচরণশীল জলবানসমূহকে এবং তিনিই  
আকাশকে হির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর  
তাঁর অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহু মানুষের প্রতি দয়ার্দ, পরম  
দয়ালু।

পৃথিবীস্থ সবকিছুকেই যে আল্লাহু মানুষের অধীন করে দিয়েছেন, তার প্রাচুর  
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রকৃতিকে বশে আনতে ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে মানুষের  
অব্যাহত সফলতার মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে তা সম্ভব  
হয়েছে। পৃথিবীস্থ সবকিছুর উপর মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সত্ত্ব  
সত্ত্ব সে তাকে আল্লাহুর প্রতিনিধি হিসেবে প্রমাণ করেছে। এ বিষয়ে ২ : ২৯  
আয়াতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাগর ও নদীবক্ষে আল্লাহুর  
হৃকুমে জাহাজ চলাচলের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২ : ১৬৪ আয়াতে।

অত আয়াতে উল্লিখিত আকাশের পৃথিবী পৃষ্ঠে পতন ঠেকিয়ে রাখার বিষয়টি  
বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার দাবী রাখে। ১৩ : ২ আয়াতে ঘোষিত বিষয় তখন  
'তিনিই আল্লাহু যিনি তোমরা যে আকাশমণ্ডলী দেখতে পাও তাকে কোন স্তুত  
ছাড়াই উচ্চে স্থাপন করেছেন' বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই একই  
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখানেও থাটে। কেননা অত আয়াতে আল্লাহু স্পষ্টভাবেই এমন  
অনেক বলের কথা বলেছেন যা আসমান ও আকাশমণ্ডলীস্থ সবকিছুকে যথা স্থানে  
রাখে এবং এই বলই মহাকর্ষ বল হিসেবে পরিচিত।

وَهُوَ الَّذِي أَخْيَأَكُمْ ثُمَّ يُنِيبُكُمْ ثُمَّ يُعِذِّبُكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ<sup>৫৭</sup>

২২ : ৬৬ আর তিনিই সেই বরং যিনি তোমাদেরকে জীবনদান করেছেন,  
আবার তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করবেন, পুনরায় তোমাদেরকে  
জীবিত করবেন। নিচরাই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহু যে জীবন ও মৃত্যু দেন এ বিষয় ২ : ২৮ এবং ৯ : ১১৬ আয়াতে  
আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পুনরায় জীবিত করা বলতে কিয়ামতের পর  
বিচারের সময় আবার জীবিত করা বুঝান হয়েছে।

VII UNIVERSE	PHL 957 + INDUS w A865 - HERCULES m COMA - A2232 +	20,000,000,000 LIGHT YEARS
VI LOCAL SUPER-CLUSTER OF GALAXIES	SCULPTOR + NGC 5128 + M96 + VIRGO + URSA MAJOR + NGC 3245 +	75,000,000 LIGHT YEARS
V LOCAL GROUP OF GALAXIES	ARGO + URSA MINOR + ANDROMEDA NGC 205 / LEO I + LEO II + SMALL MAGELLANIC CLOUD LARGE MAGELLANIC CLOUD MILKYWAY @	2,000,000 LIGHT YEARS
IV MILKY WAY	MILKY WAY	50,000 LIGHT YEARS
III LOCAL GROUP OF STARS	o o o o o o o PROCYON o o SICYONI o o o o o SIRIUS o o o o o ALPHA CENTAURI o o o o o SUN o o o o o TAU CETI o o o o o	20 LIGHT YEARS
II SOLAR SYSTEM	NEPTUNE URANUS SATURN JUPITER MARS PLUTO	5 LIGHT HOURS
MINOR PLANETS	... ... ... ...	
I INTERIOR PLANETS	SUN MERCURY VENUS EARTH	13 LIGHT MINUTES

PLATE : SEVEN FIRMAMENTS

۱۷۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَنٍ قِنْ طِينٍ ۝

۱۸۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي كَرَارِ مَكِينِينَ ۝

۱۹۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ

عَظِيمًا لِكَسْوَتِ الْعِظَمِ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخْرَى

لَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِيقَيْنَ ۝

۲۰۔ ثُمَّ إِذْ كُوُبَ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْتَمُونَ ۝

২৩ : ১২-১৫ আর আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে আমি বীর্ব ঝাপে সৃষ্টি করে এক সুরক্ষিত স্থানে সংযুক্ত করে রাখলাম। অতঃপর আমি উক্ত শুক্র বিন্দুকে জোকের মত লেগে থাকা বস্তুকে পরিণত করলাম, অনন্তর সেই বস্তুকে চিবানো মাংসপিন্ডের মত বস্তুতে পরিণত করলাম, পরে সেই মাংসপিন্ডকে হাড়ে পরিবর্তন করলাম, পরে উক্ত হাড়গুলোকে গোশত দিয়ে জড়িয়ে দিলাম। তারপর আমি তাকে একটি নতুন সৃষ্টির পথে গড়ে তুললাম। সুতরাং মহান সেই আল্লাহ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা। অতঃপর তোমরা অবশ্য মৃত্যুবরণ করবে এবং তারপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে।

এই আয়াতসমূহে মায়ের গর্ভে জন্ম তৈরি এবং তা থেকে ত্রুমে বিভিন্ন শরের মাধ্যমে পূর্ণ মানব শিশু সৃষ্টির বিষয়ে বিজ্ঞারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ তত্ত্ব (embryology) বলা যায়। পরিশিষ্ট-৬ এ বিজ্ঞারিত দেখুন।

মাটির নির্যাস বা উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টির বিষয় ১৮ : ৩৭ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নুৎফা থেকে জন্ম সৃষ্টির কথা ২২ : ৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পুরুষের নিক্ষিপ্ত কোটি কোটি শুক্রকৌটের মধ্যে একটি মাত্র শুক্রকৌট মায়ের ডিষ্ট্রিন্যুলেশনে প্রবেশ করলে জন্মের সূচনা হয় যাকে zygote নামা হয়। এই zygote গর্ভাশয়ের নালী ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যদিয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে এবং তার জন্ম তৈরি করা দেয়ালে সংযুক্ত হয় যেখানে এটা নিরাপদে

অবস্থান করে। তাই কুরআনে একে قرار ৰা বা শান্তিস্থল বলা হয়েছে। সূতরাং মুক্তি বলতে zygote গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে তার দেয়ালে প্রথিত (embedding) হওয়াকে বুঝায়। এর অন্য অর্থও করা যায়। আমরা জানি যে ডিষ্ট্রি প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত শুক্রকীট অস্ত্রিক বা চক্ষুল থাকে। ডিষ্ট্রি প্রবেশ করে তা স্থির হয়। আবার zygote-ও পেটের পানিতে ভাসতে থাকে এবং গর্ভাধানের দেয়ালে সংযুক্ত হবার পর স্থির হয়।<sup>১</sup> শুক্রকীট ডিষ্ট্রি প্রবেশ করে এবং zygote গর্ভাধানের দেয়ালে সংযুক্ত হওয়ার পর স্থির এবং নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে থাকে।

**عَلَقَ** এবং **مُضْفَتَة** - স্তর সম্পর্কে ২২ : ৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। 'মুদগাহ' স্তর প্রায় গর্ভের ৪০তম দিবস পর্যন্ত চলতে থাকে।<sup>২</sup>

এর পরের স্তর হল হাড়ের সৃষ্টি। প্রথমে দুই হাতের হাড় সৃষ্টি শুরু হয়। ষষ্ঠ সপ্তাহের শুরুতে হাড় হবার উপযুক্ত কোষগুলো 'কার্টিলেজ' বা নরম হাড়ে পরিবর্তিত হয়। ষষ্ঠ সপ্তাহের শেষে দুই হাতের এবং বার সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র শরীরের হাড়ের একটি কাঠামো তৈরি হয়ে যায়।

আয়াতে 'নৃৎফা' থেকে 'আলাকা' স্তর পর্যন্ত প্রতি স্তরের শুরুতে **بِ** বা অতঃপর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে এই সংযোগকারী অব্যয় প্রতি স্তরের মধ্যে কিছুটা সময় লেগেছে বুঝায়। মুদগাহ'র পদ **ف** অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এতেও অতঃপর বুঝায়। তবে এতে কম সময়ের ব্যবধান বুঝায়। তাছাড়া এই সব স্তরই একটার পর একটা শুরু হলেও বিভিন্ন স্তর তার নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও সময় পর্যন্ত চালু থাকে।

হাড়ের পরের স্তর হচ্ছে মাংসপেশির সৃষ্টি। গর্ভের ৭ম সপ্তাহ থেকে হাড় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করে এবং ক্রমে শরীরের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন আকারের হাড় সৃষ্টি হতে থাকে। অতঃপর জ্বণ একটি মানব শিশুর আকার লাভ করে। ৭ম ও ৮ম সপ্তাহে মাংসপেশি হাড়গুলোকে ঢেকে দেয় বা হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। যদিও হাড় ও মাংসপেশী প্রায় একই সময়ে তৈরি হতে থাকে। তবে মাংসপেশী ও হাড় তৈরি হওয়ার পরই সংযুক্ত হয় তাই হাড়ের পর মাংসপেশির সংযোগ বলা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক। আর হাড়কে মাংসপেশি আবৃত করছে বলাও খুব যুক্তিপূর্ণ উক্তি।

৮ম সপ্তাহের পর শরীর ও হাত পায়ের ও মাথার মাংসপেশিগুলো সঠিক অবস্থান গ্রহণ করে এবং তখন নবসৃষ্ট শিশু সামান্য নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়।<sup>৩</sup>

এরপর শিশুটি ক্রমেই বড় হতে থাকে যেমন ২২ : ৫ আয়াতের আলোচনায়

বিবৃত হয়েছে। একেই এখানে খালাকান আখার বা নবীন সৃষ্টি বলা হয়েছে। অতঃপর পূর্ণতা প্রাপ্ত শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং একজন নতুন মানুষের পৃথিবীতে আগমন ঘটে।

আল্লাহ নিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা বলেছেন যা খুবই সঠিক বিবরণ। মানুষ অনেক কিছুই সৃষ্টি করতে পারে। তবে সে যাই সৃষ্টি করুক্ত কেন তা সে করে আল্লাহর সৃষ্টি বল্ল দিয়েই। তাই আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা। আর আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত বা সেরা সৃষ্টি।

মানব সৃষ্টি রহস্যের ঐতিহাসিক বিবরণ পরিশিষ্ট-৬ এ দেওয়া হয়েছে।

### তথ্যসূত্র :

1. M.G. Muazzam, History of the Discovery of the Mechanism of Reproduction and the Revelation in the Holy Quran, Pak. J. Science. Vol. 14, No. 6, pp. 281-298, 1962.
2. K. L., Moore and A.M.A., Azzindani, The developing Human with Islamic Additions, 3rd edn. Dur al-Qiblah for Islamic Literatures, Jeddah, p. 73, 1982.
3. Ibid, p. 364.

۰۱۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا نُورًا كُمْ سَبْعَ طَرَاقِينَ وَمَا كُلُّ أَعْنَٰنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ

২৩ : ১৭ আমি তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সঙ্গ তুর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই ।

আমাদের মাথার উপরে আছে মহাজাগতিক ক্ষেত্র । আর এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি জগত । আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টিকর্ম এই পৃথিবীও এই মহাজাগতিক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত ।

আল-কুরআনের ২ : ২৯ আয়াতে দেখা যায়, সাতটি আলাদা রকমের মহাজাগতিক বস্তু রয়েছে, যাদের প্রত্যেকের রয়েছে নব নব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গতি ও চলার পথ । সাত প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসমূহ নিম্নরূপ ।

১. তারকা : একক, দৈত ও বহুবুর্তী তারকা, তারকাগুচ্ছ, বাদামী বামন, প্রধান অনুবর্তী তারকা, রক্তিম দৈত্য, স্পন্দনশীল, শ্঵েত বামন, ক্ষণ উজ্জ্বল নক্ষত্র, অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র, নিউট্রন তারকার ক্ষেপনকারী তারকা এবং কৃষ্ণ গহ্বর । প্রত্যেকের নিজ নিজ ঘূর্ণন গতি, রশ্মি এবং যথাযথ গতি রয়েছে । এরা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে ।
২. গহ-নক্ষত্র : সৌরজগৎ কিংবা অন্যান্য তারকামণ্ডলীয় গহও হতে পারে । প্রতিটির নিজস্ব দু'টি গতি আছে : সূর্যের কিংবা সংশ্লিষ্ট তারকার চারদিকে প্রদক্ষিণের গতি এবং নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের গতি । প্রতিটি গহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্য কিংবা সংশ্লিষ্ট তারকাকে অন্যতম ক্রিয়া-কেন্দ্রে রেখে ঘূর্ণায়মান থাকে ।
৩. উপগ্রহ : গ্রহের উপগ্রহ, সংশ্লিষ্ট গ্রহের চারদিকে ঘোরে এবং নিজ অক্ষের চারদিকেও ঘোরে ।
৪. ধূমকেতু : এরা সৌরজগৎ কিংবা অন্য কোন তারকা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার অধীন, এটা সূর্য কিংবা সংশ্লিষ্ট তারকার চারদিকে পরিভ্রমণ করে এমন কক্ষপথে যা গ্রহের কক্ষপথের চেয়ে অনেক বেশি কেন্দ্রোপসারী ।
৫. নীহারিকা : নীহারিকা হচ্ছে আন্তঃতারকা গ্যাসীয় মেঘবিশেষ, যা হয় উজ্জ্বল নীহারিকা হিসেবে পরিচিত একটা দীপ্তিমান আলোকবিধু আকারে নতুবা অনুজ্জ্বল নীহারিকা হিসেবে পরিচিত একটা অক্ষকারীময় ফিতা বা বৃক্ষনীর গহ্বর আকারে পরিদৃষ্ট হয় । নীহারিকা যে ছায়াপথে অবস্থিত তার গতি এবং সেই সাথে এর নিজস্ব গতির কারণে নীহারিকা ঘূর্ণায়মান থাকে ।
৬. ছায়াপথ : এগুলো তারকা ও তাদের জগৎ, গ্যাস এবং ধূলির এক বিশাল

সমাবেশ যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত রয়েছে মহাবিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুসমগ্রী। ছায়াপথ উপবৃত্তাকার, পেঁচানো, বাহ্যত-পেঁচানো কিংবা অসমাঙ্গ হতে পারে। ছায়াপথ প্রচণ্ড বেগে ঘোরে। ছায়াপথের দূরত্ব যত বাড়ে, ততই এর অপসরণমানতার বেগও বাড়ে। প্রতিটি ছায়াপথই আলাদা আলাদা কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান।

৭. কোয়াসার : কোয়াসার হচ্ছে ছায়াপথ-বহির্ভূত ঘন সন্নিবিষ্ট বস্তুবিশেষ, যা দেখতে আলোকপ্রাপ্তের মত হলেও একশটি অতি দৈত্যাকার ছায়াপথের চেয়েও বেশী শক্তি নির্গত করে। এরা অচিন্তনীয় গতিতে ঘূর্ণায়মান থাকে। কিছু কিছু কোয়াসারের গতি আলোর গতির চেয়ে প্রায় ৯০% তাগ বেশি।

এভাবে এ সত্যটি এখন প্রতিষ্ঠিত হল যে, সকল মহাজাগতিক বস্তুই গতিশীল এবং এদের প্রতিটি স্পষ্টতই আলাদা আলাদা কক্ষপথে ঘোরে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির প্রতি এতটা সজাগ দৃষ্টি রাখেন যে, মহাজাগতিক বস্তুর সংখ্যা অগণিত হলেও তারা এলোপাতাড়ি চলাচল করে না, পরম্পরের সাথে সংঘর্ষ বাধায় না বা একে অপরকে ধ্বংস করে না। বরং তারা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কক্ষপথে এমনভাবে চলতে আদিষ্ট যেন তারা পরম্পরের সংশ্পর্শে না আসে।

## ١٨-وَإِنَّا مِنَ الْكَمَاءِ مَاءٌ بِنَقْدِ رَفَسَكَةٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِهِ لَقِيرُونَ

২৩ : ১৮ এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় শোরণের ব্যবস্থা করি; এবং আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম।

আকাশে বৃষ্টির ফেঁটা কীভাবে সৃষ্টি বা গঠিত হয় তা কুরআনের ২ : ১৯ ও ২ : ২২ আয়াতদ্বয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৃষ্টির ফেঁটা মাটিতে এসে পড়ে বর্ষণ আকারে। অধিকাংশ পানিই শোষণ করে নেয় শুক্র মাটি, আর তা থেকেই জন্মে সবুজ গাছপালা।

একমাত্র জলদ-পুঁজি মেঘই পানিপূর্ণ থাকে যা বর্ষণ ঘটায় এবং তাও সীমিত পরিমাণে। বর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে জলদ মেঘের আকার, মাটি থেকে এর উচ্চতা, ঐ স্থানের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা এবং ঐ সময়ের বর্তমান বায়ু প্রবাহের তীব্রতার উপর। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, যখন সমস্ত বিবেচ্য বিষয়সমূহ অনুকূল অনুপাত ধারণ করে, তখন বৃষ্টির পানি মাটিতে পড়বে। অন্যথায় বাতাস ভাসমান মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং ঐ অঞ্চল শুক্রই থেকে যাবে।

ବୃଷିର ଫୋଟା ଭୂ-ପୃଷ୍ଠର ଗର୍ତ୍ତ ଓ ଖାନାଖନ୍ଦେ ଜମା ହୁଏ । ଅଧିକତ୍ତୁ, ଏ ପାନି ଭୃଗର୍ଭେ ଓ ଭୂ-ଅଭ୍ୟନ୍ତରଙ୍କ ପାନିର ଆଧାର ହିସେବେ ଜମା ହୁଏ ଥାକେ । ଏଟାକେ ଭୃଗର୍ଭରୁ ନିରାପଦ ପାନିର ଆଧାର ହିସେବେ ବିବେଚନା କରା ହୁଏ ଥାକେ । ଆଲ୍ଲାହୁ ଇଚ୍ଛା କରଲେ ଏ ସକଳ ସ୍ଥାନେ ସଂଖିତ ପାନି ଉଧାଉ ବା ଶେଷ ହୁଏ ଯେତେ ପାରେ । ଏଭାବେ ପାନି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବେଶ କରେକଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେତେ ପାରେ । ପାନି ଚାହିୟେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋନ ମୃତ୍ୟୁକା-ଗହର ବା ଖାଦ ଏବଂ ଅନେକ ନିଚୁ ପାନିର ଶ୍ରବନିଶିଷ୍ଟ ଖାଲ, ନଦୀ କିଂବା ହୃଦ, କିଂବା ତା ମାଟିର ଗହିନ ଗର୍ଭେ ନାଗାଲେର ବାଇରେ ଓ ଚଲେ ଯେତେ ପାରେ । ଦ୍ରୁତ ଭୂ-ଉପରିଷ୍ଠ ବାଞ୍ଚୀତବନେର ମାଧ୍ୟମେ ଅଥବା ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଗମନ ହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତିଦେର ପାତାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଦ୍ରୁତ ପାନି ନିର୍ଗମନେର ମାଧ୍ୟମେ ଓ ପାନି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ହାରିଯେ ଯେତେ ପାରେ । ବର୍ତମାନେ ଏଟା ଏକଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟ ଯେ, ଇଥିଓପିଯାର ଭୟାବହ ପାନି ସଂକଟେର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହଲୋ ଯେ, ଏ ଅନ୍ଧଲେ ବ୍ୟାପକଭାବେ ଇଉକେଲିପଟାସ ଗାଛର ଆବାଦ ।

ଏଭାବେ ଦେଖା ଯାଛେ, ଆକାଶ ଥିକେ ଯଥାର୍ଥ ପରିମାପେ ବୃଷିର ପାନିର ଭୂପୃଷ୍ଠେ ପତନ ଏବଂ ମାଟି ଥିକେ ପାନି ପ୍ରତ୍ୟାହାତ ହୁଏଯାର ଜନ୍ୟ ଦାୟୀ ସମ୍ମତ କାରଣଇ ବସ୍ତୁତ ଆଲ୍ଲାହୁଇ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଥାକେନ ।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبَرَةٌ \* تُشَقِّي كُلُّ مَنْ فِيهَا فِي بُطُونِهَا  
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ \* وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

୨୩ : ୨୧ ଏବଂ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଆଛେ ଆନ୍ଦୋଳନ; ତୋମାଦେରକେ ପାନ କରାଇ ଓ ଦେଇ ଉଦରେ ଯା ଆଛେ ତା ହତେ ଏବଂ ତାତେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ରମ୍ଯେହେ ପ୍ରଚୁର ଉପକାରିତା; ତୋମରା ଓଟା ଥିକେ ଭକ୍ଷଣ କର ।

ଆଯାତଟିତେ ଅନ୍ୟତମ ଶୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଗରୁର ଦୁଧ ଏବଂ ମାଂସ ସହ ଗରୁର ଅନେକ ଉପକାରିତାର ବିଷୟ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ହେଯେଛେ । ଏ ସକଳ ବିଷୟ ୧୬ : ୫ ଏବଂ ୧୬ : ୬୬ ଆଯାତଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚିତ ହେଯେଛେ ।

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفَلَكَ يَأْغِيَنَا وَوَجِينَا فَلَذَا جَمَاءٌ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ  
فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ النَّسَنَيْنِ وَأَهْلَكَ لِلْأَمْنِ سَبَقَ عَلَيْنَا القَوْلُ مِنْهُمْ  
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ○

୨୩ : ୨୭ ଅତଃପର ଆମି ତାର ନିକଟ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ କରିଲାମ, 'ତୁମି ଆମାର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନେ ଓ ଆମାର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲୌଧ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କର,

অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনান উথলে উঠবে তখন উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক জোড়া হারে তোমার পরিবার পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা তো নিমজ্জিত হবে।

অত্র আয়াতে হয়েরত নূহ নবীর (আ) আমলের সংঘটিত মহাপ্লাবনের উল্লেখ করা হয়েছে যখন তিনি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন একটা নৌকা তৈরি করতে এবং প্লাবন এসে পড়লে ঐ নৌকায় পরিবারবর্গ ও প্রতিটি জাতের একজোড়া প্রাণী সহ জলযাত্রা করতে।

এ বিষয়টি কুরআনের ১১ : ৪০-৪২ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٥-وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ الْحَسَنَاتِ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ فَلِيَلَا مَا تَشْكُرُونَ

২৩ : ৭৮ তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন; তোমরা অল্লাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

এ বিষয়টি কুরআনের ১০ : ৬ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٦-وَهُوَ الَّذِي شَفَعَ وَعَمِّيَّتَ وَلَهُ احْتِلَافُ الْيَمَلِ وَالْيَمَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

২৩ : ৮০ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই অধিকারে রাজি ও দিবসের পরিবর্তন। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

দিন ও রাতের পরিবর্তন সম্পর্কে ১০ : ৬ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٧-فَلِمَنْ زَبُّ التَّمَوُتِ السَّبْعَ وَزَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

২৩ : ৮৬ জিজ্ঞাসা কর, 'কে সঞ্চাকাশ এবং মহাআৱশ্যের অধিপতি?'

সপ্ত (স্তুর বিশিষ্ট) আকাশমণ্ডলী সম্পর্কে ২ : ২৯ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٨-فَلِمَنْ بَيْدِيْ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِجُنُوبِ وَلِبِجَارِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

২৩ : ৮৮ জিজ্ঞাসা কর, 'সমস্ত কিছুর কর্তৃত কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর আশ্রয় দাতা নাই, যদি তোমরা জান?'

সকল কিছুর পরিচালনা বিষয়ে ৭ : ৫৪ ও ৭ : ১৮৫ আয়াতের এবং পরিশিষ্ট-৩ এ আলোচনা করা হয়েছে।

۲۹۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كُسْرًا بِقِيمَتِهِ يَحْسَبُهُ الظَّنَانُ مَا هُوَ  
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَنْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَمَوْجَدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابٌ  
وَاللَّهُ سَرِينُ الْحِسَابُ

২৪ : ৩৯ যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত  
যাকে পানি মনে করে থাকে কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে  
দেখবে তা কিছু নয় এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর  
তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেবেন। আল্লাহ হিসাব প্রহণে  
তৎপর।

মরীচিকা এক প্রকার দৃষ্টি বিভ্রম যাতে বায়ুঘনত্বের উল্লম্ব বট্টনকালে  
বায়ুমণ্ডলে আলোকরশ্মির বেঁকে যাওয়ার ফলে দূরবর্তী বস্তুর প্রতিবিষ্঵ কখনও  
কখনও উল্টানো অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়।

দিবাভাগে, মরুভূমির বালি অত্যন্ত উপরের বায়ুস্তরের তুলনায়  
ভৃ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুস্তর অনেক বেশী উপরে উপরের বায়ুস্তরের তুলনায়  
এবং/অথবা বৃক্ষের উপরিভাগ থেকে এ সকল বায়ুস্তর ভেদ করে নিচের দিকে  
আসতে থাকে, তখন আলোকরশ্মি প্রতিসারিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত উপরের  
দিকে বেঁকে গিয়ে দর্শকের দৃষ্টিরেখার নিচ দিয়ে তার চোখে প্রবেশ করে। দর্শক  
তখন আকাশ ও গাছের প্রতিবিষ্঵ উল্টো অবস্থায় দেখতে পায় ঠিক যেমন তারা  
দেখে জলাশয় থেকে প্রতিফলিত প্রতিবিষ্঵। এভাবেই তৈরি হয় দূরবর্তী কোন  
হৃদের ধারণা যা নিকট থেকে দেখলে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছু কিছু মরীচিকা  
অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও লক্ষণীয় যা দৃশ্যত এমনকি ঢেউ প্রদর্শন করে থাকে। উপরে  
বায়ু স্তরের অবস্থানের পার্থক্য হওয়ায় এ রকম ঘটে।

মরীচিকার ব্যাপারটা যদিও প্রাচীন কালের মানুষের নিকটে জ্ঞাত ছিল, তবুও  
সর্বপ্রথম এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন টোবিয়াস গ্রুবার-১৭৮০'র দশকে।

۳۰۔ أَوْ كَظُلْمَتِ فِي بَحْرٍ لَّجْأَ يَغْشِيهِ مَوْجٌ مَّنْ فَوْقَهُ مَوْجٌ مَّنْ فَوْقَهُ سَحَابٌ  
ظُلْمَتِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَخَرَكَنْدَرَهَا وَمَنْ لَخَرَكَنْدَرَهَا  
اللَّهُ لَهُ تُوْرَافِلَهُ مَنْ تُوْرَهُ

২৪ : ৪০, অথবা গভীর সমুদ্র তলের অক্কার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে  
তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্ধ্বে মেঘপুঁজ, অক্কারপুঁজ স্তরের  
উপর স্তর এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে

না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই।

এখানে ব্যবহৃত উপমেয়তার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে “আলোর উপর আলো” বিষয়ের আলোচনায়।<sup>১</sup>

অত্র আয়াতে স্বাভাবিক এবং ব্যাহত আবহাওয়াগত পরিস্থিতিতে বিশাল মহাসাগরতলে অঙ্ককারের গভীরতা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যখন সাগর শান্ত ও আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকে, এমনকি তখনও সাগরতলে বেশ অঙ্ককার থাকে। কারণ, সাগরের পানি দৃশ্যমান আলোকসহ বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ তীব্রভাবে শোষণ করে থাকে। যতই সাগরের গভীরে যাওয়া যায়, ততই আলোর তীব্রতা দ্রুত কমে আসে এবং বস্তুত সাগরের তলায় এই তীব্রতা একেবারেই কম। এটাই হচ্ছে প্রথম প্রকারের অঙ্ককার।

সাগরের উপরিতল শান্ত থাকার পরিবর্তে যদি তরঙ্গের উপর তরঙ্গের অভিঘাতে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়, তাহলে সূর্যালোকের বেশীর ভাগই ঢেউয়ের তির্যক পাশে প্রতিফলিত হয়ে বাইরে চলে যায় এবং প্রতিসরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত যতটুকু আলো সাগরতলে গিয়ে পৌছে তা নিতান্তই সামান্য। এভাবে সাগরতলের অঙ্ককার বেড়ে বেশ গভীর হয়, আর এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকারের অঙ্ককার।

আমরা জানি, মেঘ হচ্ছে বিন্দু বিন্দু ফোটা আর অতি ক্ষুদ্র বরফ কণা আকারে বাতাসে ভাসমান ঘনীভূত জলীয় বাল্পপুঁজি যা জলদপুঁজি মেঘ নামে পরিচিত। বর্ষণ-মেঘ হচ্ছে বিশাল-বিস্তৃত এবং বিরাট উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতসূম মেঘপুঁজি যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অঙ্ককার। এর উচ্চতা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। উপর থেকে সূর্যালোক এর ভিতর দিয়ে চলার সময় মেঘ গঠনকারী বরফ কণা এবং পানির কণিকায় প্রতিফলিত হয়ে বাইরে চলে যায়। কাজেই, উত্তাল-তরঙ্গমালার উপরস্থিত আসমান যখন ঘন মেঘে আচ্ছাদিত থাকে তখন বেশীর ভাগ সূর্যালোকই মেঘ দ্বারা বাধাপ্রাণ হয় এবং যেটুকু নিষেজ আলো ঢেউয়ের উপর পড়ে তা গভীর পানির ভিতর দিয়ে তেমন একটা প্রবেশ করতে পারে না। ফলে, সাগরের তলদেশ সবটুকু আলো থেকেই বঞ্চিত থাকে যা সাগরতলকে করে তোলে ঘন অঙ্ককারময়। এই তৃতীয় প্রকার অঙ্ককারে কেউ নিজের হাতটি পর্যন্ত চোখের সামনে আনা হলেও দেখতে পায় না। এতই গাঢ় এ অঙ্ককার!

### তথ্যসূত্র :

1. M.F. Khan: Light upon Light, Dhaka Ahsania Mission, Dhaka, Bangladesh, pp. 33-35. 1986.

۸۱- أَلَمْ يَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْتَأْنِفَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّيْرُ صَفَرٌ  
كُلُّ قَنْ عَلَيْهِ صَلَانِدُوكَشِينِيَّةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِسَايَقَعُونَ ○

২৪ : ৪১ তুমি কী দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উজ্জীয়মান বিহঙ্কুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং ওরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত ।

স্কুলতম জীবদেহ থেকে শুরু করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীস্থ বিশালকায় প্রাণী পর্যন্ত সকলেই আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের অধীন । এ সকল বিধান ৭ : ৫৪ এবং ৭ : ১৮৫ আয়াতদ্বয় ও পরিশিষ্ট-১, ২ এবং ৩ এ আলোচিত হয়েছে ।

পাখিদের উড়ন্ত ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ১৬ : ৭৯ আয়াতের আলোচনায় দেয়া হয়েছে । বস্তুত এমনকি পাখিদের আকাশে উড়ার ব্যাপারটাও স্মৃষ্টা প্রদত্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । এভাবে, সকল কিছুই আল্লাহর জরীকৃত বিধান পুরুষানুপুরুষভাবে অনুসরণ করছে এবং এভাবে তারা আল্লাহর ইচ্ছার নিকট মাথা নত করছে । এ সত্যটিকেও তাদের ইবাদত হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেজন্য তাদের থাকতে পারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রকাশ পদ্ধতি । এ ধরনের ইবাদতের জন্যে তারা যে প্রচুর ফায়দা লাভ করে থাকে তার জন্যেও তারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পন্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করে থাকে ।

○ يَقْرَبُ اللَّهُ الْيَلَى وَالنَّهَارُ بِئْ فِي ذَلِكَ لَعْزَةٌ لِلَّذِينَ اصْلَمُوا - ৮৮

২৪ : ৪৪ আল্লাহ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান । এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পর্কের জন্য ।

রাত ও দিনের আবর্তন হয় পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তনের কারণে (দ্রঃ আয়াত ১০ : ৬) । এই অঙ্গীয় আবর্তন বা ঘূর্ণন, যা অধিকাংশ গ্রহেই দেখা যায়, আসে কেথেকে ? বহু পারমাণবিক কণার ঘূর্ণন গতি এক অত্যন্ত মজার ব্যাপার । সকল মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য হালকা মৌল নিউক্লিয়াসের একীভবনের মাধ্যমে তারকামণ্ডলীর উৎপত্তি প্রক্রিয়া চলে । আদিম যুগীয় সেই অগ্নিগোলক (দ্র. পরিশিষ্ট-২) যতই শীতল হতে থাকে এই সকল আটককৃত ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ গঠন করে । বিজ্ঞানীগণের ধারণা পরমাণু অভ্যন্তরস্থিত আগুরীক্ষণিক জগতের কণার ঘূর্ণনের সাথে যার ঘূর্ণন গতি বাইরের কোন সহায়ক শক্তির সাহায্য লাভ করেনি । এর কারণ, পরমাণু অভ্যন্তরস্থিত কণা থেকে উদ্ভূত কৌণিক গতির পরিধি এত বড়

হয় না যে, বস্তুটি ঘোরাতে পারে। অবশ্য, এই ধারণা এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না যে, কেন শুক্র বাদে আর সব গ্রহ একইভাবে আবর্তন করে। কিন্তু শুক্র গ্রহ অন্যান্য গ্রহের বিপরীত দিকে ঘোরে। অন্য আরেক ধারণানুযায়ী বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে, গ্রহসমূহ নিজেদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে এবং নিজ নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তন করে নীহারিকা হিসেবে আখ্যায়িত এক ধরনের ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় মেঘ থেকে সূর্য এবং গ্রহসমূহের গঠিত হওয়ার কারণে। এ প্রকল্পটি ল্যাপল্যাস কর্তৃক ১৭৯৬ সালে উপার্থিত হয়েছিল। এ প্রকল্পের বক্তব্য অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান গ্যাস বলয় ছুঁড়ে মারে বলে ধরে নেয়া হয় যা শেষ পর্যন্ত ঘনীভূত হয়ে গ্রহের আকার ধারণ করে। ল্যাপলাসের প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত ও প্রত্যাখাত হয় এবং অতঃপর সাম্প্রতিককালে খানিকটা গৃহীত হয়েছে বটে। এখন ধরে নেয়া হয় যে, আদিমযুগীয় সেই সৌর নীহারিকার সম্ভবত প্রথম থেকেই একটা ছোট জালের আকারের ঘূর্ণন ছিল। আদিমযুগীয় স্তরে ঘূর্ণায়মান কৌণিক গতি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বর্তৈ এটা সংকুচিত হতে থাকে ততই এটা কৌণিক গতির সংরক্ষণে দ্রুততর গতিতে ঘূরতে থাকে যে নীতিটি ঘূর্ণায়মান একজন বরফ ক্ষেইটারের মাধ্যমে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ক্ষেইটার যখন দ্রুততর গতিতে ক্ষেইটিং করতে চান, তখন তিনি তার হস্তদ্বয়কে নিজেরদিকে গুটিয়ে আনেন যা তার দেহের ভরের বট্টনকে কার্যকরভাবে ঘূর্ণন অক্ষের অধিকতর নিকটে নিয়ে আসে। আর এটি দ্রুততর ঘূর্ণন দ্বারা পুরিয়ে যায় যাতে কৌণিক গতি (অক্ষ তরবেগে থেকে দূরত্ব) একই থাকে। অবশ্য, এই মতবাদ বহু বিস্তারিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় যেমনটি লক্ষ্য করা যায় সৌর জগতে। যেমন : উচ্চতর মহাকর্ষ বল থাকা সত্ত্বেও কেন বহিঃস্থ গ্রহসমূহ হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পূর্ব বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে ব্যর্থ হল, যেখানে এই মতবাদ অনুমান করছে যে, বৃহৎ এবং হালকা উপাদানে গঠিত বহিঃস্থ গ্রহসমূহের তুলনায় অন্তঃস্থ গ্রহসমূহ অধিকতর ঘন উপাদানে গঠিত হওয়া উচিৎ ? এ ধারণা আরো ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ যে, সৌরজগতের এত বেশী কৌণিক গতি কেন গ্রহগুলোর কক্ষপথের গতিতে থাকে, আর খোদ সূর্যের আবর্তনের মধ্যে এত কম কেন ? সম্ভবত শক্তিশালী সৌরদহন আন্তঃগ্রহসমূহের হালকা গ্যাস দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং মূল সৌর কৌণিক গতির অধিকাংশটাই নিয়ে গেছে। ১ দিন ও রাতের আবর্তনের বিভিন্ন উপকারী দিক সম্পর্কে ২৮ : ৭১, ৭২ এবং ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

#### তথ্যসূত্র :

1 Jay M.Pasachoff, Contemporary Astronomy, W.B. Saunders co., London. p 284, 1976.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابٍ مِّنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَشْئُ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ  
 يَشْئُ عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৪ : ৪৫ আল্লাহু সকল প্রাণীকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে  
 কেউ বুকের উপর ঘসে চলে, কেউ দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে  
 আবার কেউ চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহু যাই চান তাই  
 সৃষ্টি করেন কারণ তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান।

এই বিষয়টি ২১ : ৩০ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

هـ-أَفَ قُلُّهُمْ تَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَحْسِفُونَ أَنْ تَجْعِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِرْزٌ وَرَسُولٌ  
 بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

২৪ : ৫০ ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না, ওরা সংশয় পোষণ করে? না  
 ওরা তয় করে যে, আল্লাহু ও তাঁর রাসূল ওদের প্রতি জুনুম  
 করবেন? বরং ওরাই তো সীমা লংঘনকারী।

অন্তরে রোগের বিষয়টি ইতিপূর্বে ২ : ১০ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَغْنِي وَلَدًا وَلَهُ يَكْنِي  
 لَهُ شَرِيكٌ فِي السُّلْطَانِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تَقْدِيرٌ ۝

২৫ : ২ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি  
 কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি; সার্বভৌমত্বের তাঁর কোন অঙ্গী  
 নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত  
 করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

আসমান ও জমিনের সবকিছুই যে আল্লাহরই কর্তৃত্বাধীন এ বিষয়টি ৭ :  
 ৫৪ আয়াত এবং পরিশিষ্ট-১ ও ২এ আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতটির  
 শেষাংশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহু তাঁর সকল সৃষ্টির জন্যে একটা  
 পরিমাপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ বক্তব্যটির ভিতরে বিজ্ঞানের যে বিষয় রয়েছে  
 তা অনুধাবন করতে প্রথমে মানুষের আকার বিবেচনা করা যাক। মানুষের  
 সাভাবিক আকার ১ থেকে ২ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট হওয়া পৃথিবী নামক এই  
 গ্রহের তার আবির্ভাবের পর থেকেই যে মাধ্যাকর্ষণ বলের অভিজ্ঞতা তার হচ্ছে

সেটার সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, মানুষ বর্তমানের তুলনায় দু'তিনগুণ বড় হলে কী ঘটত? সেক্ষেত্রে দেখান যায় যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের মধ্যে হাঁটাচলা করা অত্যন্ত বিপদসংকুল হয়ে পড়ত। মানুষ তিনগুণ লম্বা হলে এবং একই অনুপাতে তার দেহের আকার বর্ধিত হলে বর্তমানের তুলনায় তার ওজন হত সাতাশ গুণ। হেঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ২৭ গুণ ওজনের ধাক্কা সামলাতে এবং শুধু পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনগুণ দূরে পড়ে যাওয়ার ধাক্কা সামলাতে হত। আর পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সামগ্রিক চাপের পরিমাণ দাঢ়াত ৮১ গুণ। তার হাড়গুলোর ওজন বাঢ়ত ৯ গুণ। কেননা, এদের শক্তি নির্ভর করে আড়াআড়ি অবস্থানের উপর। কাজেই, পতন হয়ে পড়ত ৯ গুণ ক্ষতিকর। উল্টোদিকেও প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, মানুষ বর্তমানের তুলনায় বেশ ছোট আকারের হলে কী ঘটত? আবারো এটা প্রমাণ করা যায় যে, পরের ক্ষেত্রেও মানুষকে প্রচন্ড অসুবিধার মুখোযুক্তি হতে হত। আমরা জানি, শরীর থেকে অপশক্তি হারানোর পরিমাণ দেহের তলীয় ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে।\* মানুষ যদি হত অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তার তলীয় ক্ষেত্র আয়তনের তুলনায় হয়ে যেত অনেক বড়। সুতরাং তার দেহ তখন অনেক বেশী তাপশক্তি হারাত এবং সে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ত। উষ্ণ থাকার জন্য তাকে তখন থেতে হত বিপুল পরিমাণ খাদ্য। বস্তুত ইন্দুর জাতীয় ছোট ছোট প্রাণী, যারা ক্ষুদ্রতম উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট, উষ্ণ থাকার জন্য বিপুল খাদ্য খেয়ে থাকে যার পরিমাণ তার দেহের ওজনের কয়েকগুণ হয়ে থাকে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, মানুষ যদি তার বর্তমান আকার অপেক্ষা কয়েকগুণ ছোট হত, তাহলে শুধু যে চরম খাদ্য সংকটই দেখা দিত তা নয়, বরং তার মস্তিষ্কের আকার একেবারেই ক্ষুদ্র হয়ে যেত এবং সে আল্লাহর সর্বাধিক বুদ্ধিমান সৃষ্টি হিসেবে গর্ব করতে পারত না। এ সবকিছুই আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, আল্লাহ মানুষকে যে ‘পরিমাপ’ দান করেছেন তা বস্তুতই বিজ্ঞতম।

ঘটনাক্রমে, দেখা গেল যে, যে কোন জীবদেহের দৈহিক মাপ আল্লাহ তাকে যে পরিবেশে বাস করার অনুমতি দিয়েছেন তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উপরে আলোচিত জীবদেহ এবং তাদের পরিবেশের মধ্যে তাপ বিনিয়য়ের তাপীয়গতির বিবেচনা এও ব্যাখ্যা করে যে, কোন মেরুভলুক থাকে দেহের তাপ আটকে রাখতে হয়, আকারে বড় যার রয়েছে সৌর ভলুকের তুলনায় কম তলীয় ক্ষেত্র;

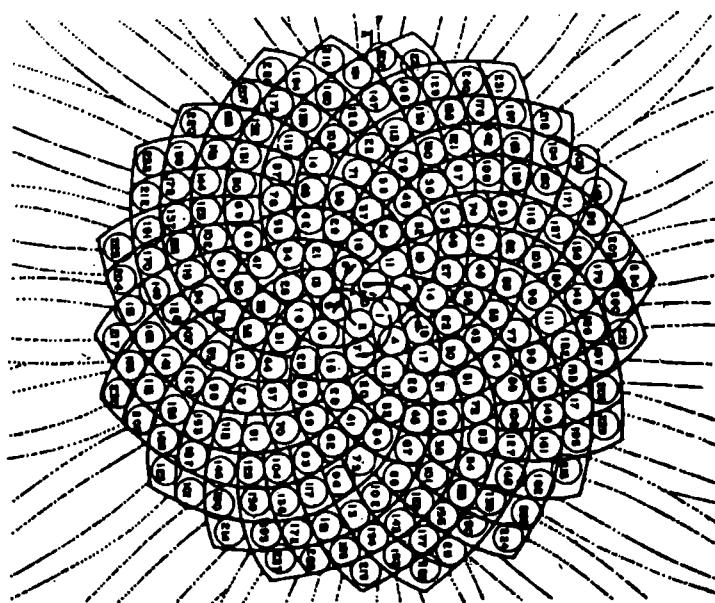
\* কোন বস্তুর আয়তনের সাথে তলের অনুপাত কোন গোলাকার বস্তুর সাথে মিলিয়ে রাখিতে প্রকাশ করা যায়। যার অনুপাতের রাশি হচ্ছে  $4\pi r^2 / 4\pi r^3 = 1/r$  যেখানে  $r$  হচ্ছে বস্তুর ব্যাসার্ধ।  $r$  যতই কমতে থাকে, অর্থাৎ বস্তুটি যত ছোট হতে থাকে, তলের সাথে আয়তনের অনুপাত ততই বাড়তে থাকে।

କେନନା ସୌର ଭଣ୍ଡକକେ ଠାଗା ଥାକତେ ହଲେ ତାପଶକ୍ତି ହାରାତେ ହୟ ଏବଂ ସେ କାରଣେ ସେ ଆକାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଆନୁପାତିକଭାବେ ବୃଦ୍ଧ ତଳୀୟ କ୍ଷେତ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ।

ଏଥିନ କୋନ ଏକଟା ଜିନିସେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନ୍ମ ଏକଟା ଦିକ ତଥା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ୟେର ବିଷୟଟି ବିବେଚନା କରା ଯାକ । ଆମରା ସବାଇ ଆପ୍ନାହର ସୃଷ୍ଟି ଜଗତେର ସରତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଉପଭୋଗ କରେ ଥାକି । ଆମରା ଜାନି ଯେ, କୋନ ବ୍ୟକ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସାମଙ୍ଗସ୍ୟ (ସେଟା ପ୍ରତିଫଳନ କିଂବା ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଧରଣେରଇ ହୋକ ନା କେନ) ହୟେ ପଡ଼ିବେ ଅର୍ଥହିନ ଯଦି କୋନ ବ୍ୟକ୍ତର ଗଠନ ଉପାଦାନ ବା ଅଂଶସମୂହ ପରମ୍ପରେର ତୁଳନାୟ କୋନ ଏକଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପେର ନା ହୟ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵର୍ଗପ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଲଷାଲାହିଭାବେ ଦ୍ୱିବିଭାଜିତ ମାନବ ମୁଖମନ୍ଡଲେର ପ୍ରତିଫଳନ-ସାମଙ୍ଗସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହତ ଯଦି ମୁଖେର ଗଠନେ ଡାନପାର୍ଶ୍ଵେର ତୁଳନାୟ ବାମ ପାହଟୀ ବଡ଼ ହତ ।

ପରିମାପେର ଅନ୍ତିମ ଆନନ୍ଦେର ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରେ ଗେଛେନ ଅଂକଶାସ୍ତ୍ରବିଦଗଣ । ତାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରରେହେନ ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଫୁଲେର ସୁନ୍ଦର ପାପଡ଼ିଗୁଲୋ କେନ୍ଦ୍ର ଥିକେ ବର୍ଧିତ ଦୂରତ୍ବେ ଏବଂ ୧,୧,୨,୩,୫,୮,୧୩,୨୧ ଅନୁପାତେ ସାଜାନୋ ଏବଂ ଏ ସଂଖ୍ୟାଗୁଲୋ ହଛେ ଫିବୋନାଚି ସଂଖ୍ୟା ତଥା ପ୍ରତିଟି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳେର ସମାନ ।

(ଚିତ୍ର : ୧୩ ଦ୍ରୋ)



ଚିତ୍ର ୧୩ : ଏକଟି ସୂର୍ଯ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଫୁଲେର ପୁନର୍ଗଠିତ ମାଥା

এভাবে, আনন্দের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, গাণিতিকভাবে সূর্যমুখী ফুলের নকশা করার সময় আল্লাহ এর গঠনে একটা পরিমাপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। প্রকৃতি যে আল্লাহর নির্ধারিত গাণিতিক পরিকল্পনা দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত এতে বিশ্বয়ের কিছু নেই।

উপরে যা উল্লেখ করা হলো তা শুধু অল্প কয়েকটা দৃষ্টান্ত মাত্র, যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ কর্তৃক সব জিনিসই একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ী অত্যন্ত যথাযথভাবে রূপদান করা হয়েছে। কোন কিছুর পরিমাপ সম্পর্কিত বিষয়টির অনুধাবন থেকে দল মতবাদ, স্ফটিক বিদ্যা, ভূ-সংস্থানবিদ্যাসহ পদার্থবিদ্যা ও গণিতের নতুন নতুন কিছু শাখার উদ্ভব হয়েছে যা মহাকাশে বস্তুসমূহের বিন্যাস এবং তাদের সামঞ্জস্য বিষয়ে কাজ করে।

উপসংহারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২৫ : ২ আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য পরিমাপ নির্দিষ্ট করেছেন তা চমৎকারভাবে এ সকল জিনিসের জন্য যে বাস্তবিক বা দৈহিক কার্যাবলি নির্ধারণ করেছেন এবং মহাবিশ্বের সার্বিক বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থার যে ভূমিকা পালনের জন্যে তাদের নিযুক্ত করেছেন, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

○-بِلْ كَلَّ بُوْلًا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لَهُنَّ كَذَبٌ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا○

২৫ : ১১ এরা সেই নির্দিষ্ট সময়কে মিথ্যা মনে করেছে (শেষ বিচার দিবস) আর যারাই সেই নির্দিষ্ট সময়কে মিথ্যা মনে করবে তাদের জন্য আমরা জলস্ত আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

এই বিষয়টি ৭ : ১৮৭ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

○-وَيَوْمَ لَشَفَقُ النَّهَارُ بِالْغَامِرِ وَنُزِلَ الْكِتَابُ هُنَّ لِغَافِرِ

২৫ : ২৫ যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ঘ হবে এবং ফিরিশ্তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে-

এটা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত যে, এমন একটা সময় আসবে যখন সূর্যসহ গোটা সৌরজগৎ দীর্ঘবিদীর্ঘ হয়ে যাবে এবং গ্যাসীয় মেঘ বের হয়ে চলে যাবে। সূর্যের ভিতর দু'টি বিপরীতমুখী বল কাজ করছে : একটি হচ্ছে দহনক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে ঝুপাত্তরে একীভবন শক্তির নির্গমণজনিত কারণে সৃষ্টি সম্প্রসারণ বল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মহাকর্ষজ্ঞনিত সংকোচণ বল।

ସତକଣ ଏ ଦୁ'ଟି ବଳ ପରମ୍ପରର ମଧ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟ ବଜାଯ ରାଖେ, ତତକଣ ସୂର୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଧାନ ପରିଣାମ ଫଳ ହିସେବେ ଶ୍ରିତଶୀଳ ଅବସ୍ଥାଯ ବିରାଜ କରେ । ସମୟ ସତଇ ଗଡ଼ାଯ ତତଇ ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିଆମେ ରୂପାତ୍ମରିତ ହୟ ଯା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭାରୀ ହେଁଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳେ ପଡ଼େ ଯାଯ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରଭାଗ ଦୁ'ଟି ଅଞ୍ଚଳେ ବିଭିନ୍ନ ହୟ ପଡ଼େ । ଏକଟି ହଞ୍ଚେ ଜୁଲାତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଖୋଲସେର ପରିବେଟନେର ସାଥେ ମୃଷ୍ଟ ହିଲିଆମେର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅପରଟି ହଞ୍ଚେ ଏକଟି ବହିରାଙ୍ଗଳ, ଯା ମୂଳତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଓ ନିର୍ବିତାପମାତ୍ରାର କାରଣେ ଏକୀଭୂତ ହତେ ଏବଂ ପାରମାଣବିକ ଡିକ୍ରିଆ-ବିଡିକ୍ରିଆ ଘଟାତେ ପାରେ ନା । ଏତେ ସୂର୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭ୍ଵ ହୟ ପଡ଼େ କାରଣ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ରଯେଛେ ବହିରାଙ୍ଗଳେର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରର ତୁଳନାର ଚାରଗୁଣ ବେଶୀ ଭର । ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସତଇ ବଡ଼ ହୟ, ସୂର୍ୟର ଶ୍ରିତଶୀଳତାର ଜନ୍ୟ ଏଇ ଅସମ୍ଭ୍ଵ ତତଇ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟ ପଡ଼େ । ସଥିନ ସୂର୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭରେର ୧୦% ଭାଗେ ଦହନ ସମ୍ପନ୍ନ ହବେ, ତଥିନ ଆର ସୂର୍ୟ ଶ୍ରିତଶୀଳ ଥାକବେ ନା । ହିସେବ କରେ ଦେଖା ଗେଛେ ଯେ ସୂର୍ୟ ସଥିନ ଏ ତ୍ରୈ ପୌଛେ, ବହିର୍ମୁଖୀ ଚାପେର କାରଣେ ବହିଙ୍କୁଣର ଦ୍ରତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୟ ଯାତେ ସୂର୍ୟର ଆଲୋକକ୍ଷେତ୍ର (ଦୃଶ୍ୟମାନ ତଳ)-ଏର ମୂଳ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ପେଯେ ଦଶ ଶ୍ରଣେ ପୌଛେ ଏବଂ ଏଭାବେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରହସମୂହ ତଥା ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ମଞ୍ଜଲେରୀ କକ୍ଷପଥସମୂହ ଗିଲେ ଫେଲେ । ଏ ଅବସ୍ଥା, କଥନ ଓ କଥନ ଓ ସଂକୋଚଣ ବଳ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ହୟ ଯାଯ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବଳ ପ୍ରଭାବଶାଲୀ ହୟ । ଆର ଏଭାବେଇ ସୂର୍ୟ ହାଜାର ହାଜାର ବହର ଧରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟାର ରଯେଛେ । ଶେଷତକ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ହିଲିଆମ କେନ୍ଦ୍ର ଭେଦେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଏକୀତବନେର ମାଧ୍ୟମେ କାର୍ବନେ ପରିଣତ ହେବେ, ଯା ଏକଟା ଶ୍ରିତଶୀଳ ଅବସ୍ଥା । ବହିଙ୍କୁ ତଥ ତଥିନ ଦୀର୍ଘବିଦୀର୍ଘ ହେବେ ଏବଂ ମେଘ ଆକାରେ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିବେ । ଏ ଘଟନା ସଥିନ ଘଟିବେ, ସମ୍ଭବତ ସେଟାଇ ସେଇ ଦିନ ଯେଦିନେର କଥା ଅତି ଆଯାତେ ଉତ୍ସମ୍ଭବ ହୟ ଯେ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର ୫

1. Brand and W.H. Maran, New Horizon of Astronomy, Freeman, San Francisco p. 299, 1922.
2. National Geographic, June 1983.

٥-٤٥. الْمَرْءُ إِلَى رِبِّكَ كَيْفَ مَلَكَ الْجَنَّةَ وَلَوْ شَاءْ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا  
 ٥-٤٦. ثُمَّ جَعَلْنَا الْجَنَّةَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا  
 ○ ٥-٤٧. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْصَائِيرًا

২৫ : ৪৫-৪৬ ভূমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না কীভাবে  
 তিনি ছায়া সম্প্রসারণ করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে তো  
 স্থির রাখতে পারতেন; অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর  
 নির্দেশক।

অতঃপর আমি একে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

একটি অস্বচ্ছ বস্তু দ্বারা আলোক বাধাপ্রাণ হলে প্রতিবিশ্বের সৃষ্টি হয় এবং  
 এটি আলোর উৎসের বিপরীত দিকে দেখা যায়। সূর্যের মত আলোর উৎসটি যদি  
 স্থির না হয়, তাহলে প্রতিবিশ্বের দৈর্ঘ্য এবং অবস্থানও স্থিতিশীল হয় না। আলোর  
 উৎস তথ্য সূর্যের অবস্থান দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। প্রতিবিশ্বের দৈর্ঘ্য আপতন  
 কোগের স্পর্শকের ব্যস্ত আনুপাতিক হয়ে থাকে। সুতরাং আপতন কোণ যত ছোট  
 হবে, প্রতিবিশ্বের দৈর্ঘ্য তত বড় হবে। কাজেই, সকালে যখন সূর্যের উচ্চতা  
 থাকে কম, তখন প্রতিবিশ্বের দৈর্ঘ্য থাকে বেশী। সূর্যের উচ্চতা যতই বাড়তে  
 থাকে, প্রতিবিশ্বও পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। পুনরায় প্রতিবিশ্বটি পর্যায়ক্রমে  
 দীর্ঘতর হতে থাকে যতই সূর্যের উচ্চতা হ্রাস পেতে থাকে। সূর্য কর্তৃক সৃষ্টি  
 প্রতিবিশ্বের এ সকল পরিবর্তন আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ীই হয়ে থাকে।  
 আয়াতের শেষাংশ তথ্য : 'তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে স্থির করে দিতে পারতেন'  
 অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটা ঘটতে পারত শুধুমাত্র তখন, যখন পৃথিবীর নিজ  
 অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের গতি এত ধীর থাকত যে, পৃথিবী যে সময়ে সূর্যের  
 চারদিক প্রদক্ষিণ করে আসে ততক্ষণে নিজ অক্ষের চারদিকে মাত্র একবার ঘূর্ণন  
 সমাপ্ত করত। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর এক পাশ স্থায়ীভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে  
 থাকত যেখানে প্রতিবিষ্ট হত স্থির, আর অপর পাশ থাকত স্থায়ীভাবে  
 অঙ্ককারাচ্ছন্ন। এ ধরনের পরিস্থিতি হত ভয়ানক বিপর্যয়কর। কেননা, পৃথিবীর  
 যে পাশটি স্থায়ীভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকত সে পাশটি হয়ে পড়ত জলত  
 ঘরঢূমি আর অঙ্ককারাচ্ছন্ন পাশটি অত্যন্ত জমাট বরফ হয়ে পড়ত, যাতে এ  
 রকম চৱম পরিবেশগত অবস্থায় জীবনের পক্ষে এই পৃথিবীতে টিকে থাকা  
 অসম্ভব হয়ে পড়ত। আল্লাহ তার সীমাহীন দয়ায় পৃথিবীকে তার অক্ষের চারদিকে

ঘূর্ণনগতি দান করেছেন যে কারণে প্রতিবিষ্ট বড় হয় আবার আকারে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এভাবে, পৃথিবীর কোন পাশই দীর্ঘকাল ধরে সূর্যের দিকে মুখ করে কিংবা সূর্য থেকে দূরে বা বিপরীত দিকে থাকে না। ফলে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হয়েছে অত্যন্ত শান্ত-কোমল এবং জীবনের ঢিকে থাকা ও সমৃদ্ধি লাভের উপযোগী।

○-رَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَى بِإِيمَانٍ وَالنَّوْمَ سُبَّاً وَجَعَلَ الْهَارَ نُشُورًا ۝

২৫ : ৪৭ এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ ব্রহ্মপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং সমুখানের জন্য দিয়েছেন দিবস।

রাত্রির আগমনে দিনের উপর একটা পর্দা টেনে দেয়া হয় (দ্রঃ ১৩ : ৩ আয়াত), অঙ্ককার নেমে আসে এবং ক্রমাগতে সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমরা অঙ্ককারে আচ্ছাদিত হয়ে যাই এবং ঘুমে ঢলে পড়ি।

বিশ্রাম ও প্রশান্তি হিসেবে ঘুম- এ বিষয়টি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কুরআনের ১০ : ৬৭ আয়াত এবং পরিশিষ্ট-৭ এ আলোচিত হয়েছে।

রাত্রিবেলা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ ঘুমের মধ্যে সুষ্ঠু থাকে যাকে ঘুমের মধ্যে সাময়িক মৃত্যুর সাথে তুলনা করা যায়। সকালবেলা আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি অর্থাৎ বলতে গেলে পুনরায় জীবন ফিরে পাই।

○-وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ مُتَرْأِبِينَ يَدِي رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا  
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كَثِيرًا ۝

২৫ : ৪৮ তিনিই শীয় অনুগ্রহের ধারালে সুসংবাদবাহীরপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।

‘বায়ু প্রবাহের তত সংবাদ বয়ে নিয়ে যাওয়া’ আয়াতের এ অংশটি ৭ : ৫৭ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর আসমান থেকে বৃষ্টি ফোঁটার পতন বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ২ : ২২ আয়াতের আলোচনায়।

বাইরে থেকে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ না করলে প্রাকৃতিক পরিবেশে স্ট্র বৃষ্টির পানি এই অর্থে বিশুদ্ধ যে এ পানি কোন ক্ষতিকর পদার্থ (কিংবা রোগজীবাণু) দ্বারা দূষিত হয় না; বজ্র মেঘমালা থেকে তৈরি বৃষ্টি কখনও কখনও দ্রবীভূত নাইট্রাস অক্সাইড বহন করে আনে যা উদ্ভিদ জগতের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু কোনভাবেই প্রাণীদের জন্য ক্ষতিকর নয়।

## ۱۰- لَنْعَنَّهُمْ مَنْ أَنْعَمْنَا وَلْنُقِيمَةَ مَنْا خَلَقْنَا أَنْعَامًا كَثِيرًا

২৫ : ৪৯ তিনি আসমান থেকে পবিত্র পানি নাখিল করেন এবং একটি মৃত অঞ্চলকে তার সাহায্যে জীবন দান করেন এবং আমাদের সৃষ্টি বহু জন্ম জানোয়ার ও মানুষের পিপাশা নিবৃত্ত করেন।

মৃত পৃথিবীকে বৃষ্টির পানিতে পুনর্জীবিত করার কথা ২ : ১৬৪ আয়াতের আলোচনায় বিবৃত করা হয়েছে।

সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকুল ও বৃক্ষ সবাই তাদের পিপাসা নিবৃত্তি বা পানির প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ'র দেওয়া পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হয় যা তাদের জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য, আর বৃষ্টিই পানির প্রধান উৎস।

## ۵- وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لَيْلٌ كَرْبَلَةَ فَلَيْلٌ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

২৫ : ৫০ এবং আমি এটা (পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্বরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃত্তাই প্রকাশ করে।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত বন্টন বলতে পানির বন্টন বুঝানো যেতে পারে। পানিচক্র তথা বরফ, পানি, জলীয় বাষ্প এবং জলীয় বাষ্প, পানি, বরফ থেকে পানি প্রাপ্তি সাধারণত নিশ্চিত ধরে নেয়া হয় এবং জীবনের অস্তিত্বের জন্য এই চক্রের যে কী তাৎপর্য তা আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করি না। আমাদের মধ্যে কতজন সত্যি সত্যি উপলব্ধি করি যে, টন খানেক পানি কোন উৎস তথা নদী কিংবা সাগর কিংবা পুকুর থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া কত দুরহ হত এবং তারপরেও এটার প্রয়োজন হত! কিন্তু উপরে উল্লিখিত পানি পরিবহন ব্যবস্থা থাকায় হাজার বা লক্ষ কোটি পানির অনু মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে পানির উৎস থেকে বাষ্প হয়ে উবে যাচ্ছে এবং উপরের বায়ুমণ্ডলে মেঘ তৈরি করছে। এ সকল মেঘ তখন বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বাহিত হয় এবং তা থেকে কোন কোন স্থানে বৃষ্টির ফোটা পড়তে পারে। এভাবে প্রকৃতি পানি স্থানান্তর এবং সেই সাথে মেঘমালার গঠন ও বায়ুপ্রবাহের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে পানির বিভিন্ন উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানসমূহে পানির বন্টনকর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আবার, পানি বহনকারী মেঘমালা পাহাড়চূড়াস্থ পুরু বরফস্তরে যুক্ত হয়ে পানির স্থায়ী আবারে পরিণত হয়। এসব বরফ তর গুলিত হয়ে নদী, ঝুঁদি ও সাগরে পানির সরবরাহ বজায় রাখে। মেঘমালা থেকে পতিত পানি এ সকল

ପାନିର ଉଂସେ ଆରୋ ପାନି ଯୋଗାନ ଦେଯା ଛାଡ଼ା ମାଟିର ଗଭୀରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏହି ପାନି ନଦୀଭୀର ଧରେ ଚୋଯାନୋ ପାନିର ସାଥେ ମିଳେ ଭୃ-ଅଭ୍ୟାସରେ ପାନିର ଉଂସେ ପରିଣତ ହେଁ ଯା ଯେ କୋନ ସମୟ ଦରକାର ହଲେ ସୁବିଧାଜନକଭାବେ ସଂଘର୍ଷ କରା ଯେତେ ପାରେ ।

ପ୍ରକୃତିତେ ବିରାଜମାନ ଏ ସକଳ ପାନି ବନ୍ଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ପ୍ରକୃତିର ଯେ କୋନ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ।

٥٢-وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْجَهَرَيْنِ هَذَا عَنِّي فُرَاثٌ وَهَذَا إِمْلَحٌ أَبْجَاجٌ  
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجَعَرًا مَنْجُورًا

୨୫ : ୫୩ ତିନିଇ ଦୁଇ ଦରିଆକେ ମିଲିତଭାବେ ପ୍ରବାହିତ କରେଛେ, ଏକଟି ମିଟ୍,  
ସୁପେଯ ଏବଂ ଅପରଟି ଲୋନା, ବର; ଉତ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ମେଖେ ଦିଯେଛେ  
ଏକ ଅନୁରାୟ, ଏକ ଅନତିକ୍ରମ ବ୍ୟବଧାନ ।

ପାନି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଲେର କାରଣେ ଅଧିକତର ଉଚ୍ଚତା ଥେକେ ନିମ୍ନ  
ଉଚ୍ଚତାର ଦିକେ ପ୍ରବାହିତ ହେଁ ଥାକେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ପ୍ରବେହମାନ ପାନିର ଦୁଃଧରନେର  
ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି କରା ହେଁବେ । ଏକଟି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଭୃ-ଭାଗେ ଏବଂ ଅପରଟି  
ସାଗର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପୃଥିବୀର ନିଶାଂଶେ । ଆଭାବିକ ଅବସ୍ଥାଯ ପାନି ଭୃ-ଭାଗ ଥେକେ  
ସାଗରେର ଦିକେ ପ୍ରବାହିତ ହେଁ । ଜୋଯାର ଏବଂ ଘର୍ଣ୍ଣବାଡ଼ ଓ ଜଳୋଞ୍ଚାସେର ମତ  
ଆଭାବିକ ଆବହାୟାଗତ ଅବସ୍ଥାଯ ସାଗରେର ପାନି ଭୃ-ଭାଗେର ଦିକେ ଛୁଟେ ଯାଇ ଏବଂ  
ଆଭାବିକ ଆବହାୟାଗତ ଅବସ୍ଥାଯ ଏଲେ ପୁନରାୟ ସାଗରେ ଫିରେ ଯାଇ ।

ପାନି ଭୃ-ପ୍ରତ୍ଠେର ପ୍ରାୟ ୭୦% ଭାଗ ଜୁଡ଼େ ରଯେଛେ ଏବଂ ସାଗରଙ୍ଗଲୋଇ ଧାରଣ କରେ  
ଆଛେ ପ୍ରାୟ ସବ ପାନି । ସାଗରେର ପାନି ଲବଣାକ୍ତ, ଯାର ଓଜନେର ମଧ୍ୟେ ୩.୫% ଭାଗ  
ଦ୍ରୋହିତ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ରଯେଛେ । ଆର ଏହି ଦ୍ରୋହିତ ପଦାର୍ଥରେ ପାନିର ପ୍ରକୃତିକ ରାସାୟନିକ  
ଉପାଦାନ । କାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସଫରାସସହ ସକଳ ଜୈବିକଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ  
ମୋଲିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ସାହୀ ଆଯନ, ସୋଡ଼ିଆମ, କ୍ୟାଲ୍‌ସିଆମ ଏବଂ  
ପଟାଶିଆମ ସାଗରେର ପାନିତେ ବର୍ତ୍ତମାନ । ଅନ୍ତର୍ଧାନ ମୋଲିକ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ  
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଉପାଦାନ ଏବଂ ସିଲିକନ, ବେରିଆମ, ଟ୍ରୋନଶିଆମ ଏବଂ  
ଫ୍ଲୋରାଇଡସମୂହ ଯା ଜଲଜ ଜୀବଦେହେର କଠିନ ଅଂଶସମୂହେର ଗଠନେ ବ୍ୟବହର ହେଁ  
ଥାକେ ।

ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେନ ଯେ, ସାଗରେର ପାନିର ସାରିକ ଗଠନ ଭୃତ୍ୟାନ୍ତିକ  
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ସମୁଦ୍ରେର ପାନିତେ କୋନ ବିଶେଷ ମୋଲିକ ପଦାର୍ଥରେ  
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେଁବା ନିର୍ଭର କରେ ଭୃ-ଭକେ ଏର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ କତଟା ସହଜେଇ ତଳାନୀ ବନ୍ଧୁ

হিসেবে এটি দ্রবীভূত হতে পারে কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা বাহিত হতে পারে তার উপর। বাষ্পীভবণ প্রক্রিয়া সাগরের পানি থেকে নিয়ে আসে মিঠা পানি আর সেখানে রয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের লবণ, জৈব ও অজৈব পদার্থ। বায়ুমণ্ডলে মেঘ গঠিত হয় এবং মেঘমালা নিচে নেমে আসে বৃষ্টির পানির আকারে এবং সেই সাথে পানি ও বরফ ভৃতাগে পানির উৎসে পরিণত হয়। পাহাড়ী জলস্তোত, ঝর্ণা ও ছেট নদীসমূহ হ্রদ ও গলায়মান বরফ স্তর থেকে উৎপন্ন হয়ে নিম্নমুখে প্রবাহিত হয় এবং মিলিত হয়ে গঠন করে নদী। এ সকল নদী বিপুল পরিমাণ পানি সাগরে বয়ে নিয়ে আসে এবং এ সকল স্রোতধারা পাহাড়-পর্বত এবং সমতলভূমি পার হয়ে অগ্রসর হবার সময় বিভিন্ন প্রকার লবণ ও খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত করে। আর বিপুল পরিমাণ তলানী পদার্থও বয়ে আনে।

জীবনের উন্নেব সাগরেই হয় বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। আর সাগরের পানি আজও ফাইটোপ্লাংকটন নামে এক ধরণের আণুবীক্ষণিক সজি জাতীয় উদ্দিদের বিস্তারের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদানের যোগান দিয়ে থাকে, যা জলজ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ভিত্তি তৈরি করে এবং জলজ জীবনধারার ক্রমবিকাশে এমন সব মৌল উপাদান সরবরাহ করে যা প্রচুর পরিমাণে পানিতে বিদ্যমান। এভাবে, ঘটনাক্রমেই অনুসন্ধিৎসু মনের নিকট সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা এবং এর গঠনও কোন দুর্ঘটনা বলে মনে হতে পারে না: সমগ্র জিনিসটারই আবির্ভাব ঘটছে স্মৃষ্টার এক মহাপরিকল্পনা হিসেবে।<sup>1</sup>

লবণাক্ত পানি মিঠা পানি অপেক্ষা অধিক ঘন এবং একই স্তরে রাখা হলে এতদুভয় পরম্পরের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। আয়াতে উল্লিখিত এতদুভয়ের মধ্যেকার প্রতিবন্ধকটি তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত এ দু'টি জলভাগের উপর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবের দর্শন। লবণাক্ত ও মিঠা পানির মধ্যকার প্রান্তসীমায় মধ্যম ঘনত্বের একটা স্তর সৃষ্টি হয়। পরিব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে পরম্পরের সাথে মিশ্রিত হওয়ার প্রাকৃতিক প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও নোনা ও মিঠা পানিকে মাধ্যাকর্ষণ বল মধ্যবর্তী স্তরে আলাদা করে রাখে। এই প্রতিবন্ধকটির অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে, তবে এর অন্তিম বিরাজমান থাকেই।

#### তথ্যসূত্র :

1. Michael, Whitefield. The salt sea-accident or design ? New scientist 1, p.14. April 1982.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ النَّارِ شَرْمًا فَجَعَلَهُ نَسِبًا  
وَصَرْمًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝

২৫ : ৫৪ এবং তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার  
শরীর থেকে রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দুটি  
আঙ্গীয়তার ধারা শুরু করেছেন। তোমাদের অভুত অতীব  
শক্তিশালী।

মানুষের শরীরের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পানি, সুতরাং পানিই মানুষ সৃষ্টির  
প্রধান উপাদান।

আমরা যদি মানুষের জন্ম পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করি, তবে আমরা দেখতে  
পাই যে, বীর্যের শুক্রকীট এবং ডিষ্টকোষ ফেটে বের হওয়া জলীয় পদার্থে  
অবস্থিত ডিওগু এ দুইই জলীয় পদার্থের অংশ যাদের মিলনে ভূগ সৃষ্টি হয়।

তাই আল-কুরআনে পুরুষের শুরু বা বীর্যে, আর নারীর ফুটস্ট ডিষ্টবাহী  
পদার্থ দুটিকেই জলীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রঃ আয়াত ৮৬ : ৬)। আর এ  
দু'টোই বেগের সাথে বের হয়। তাই এ ব্যাপারে আগ্রাহ বলেন মানুষ যেন চিন্তা  
করে সে কিসের সৃষ্টি, সে প্রক্ষিণ তরল পদার্থের সৃষ্টি।

আরবী শব্দ মাঝুন দ্বারা পানি বা তরল পদার্থকে বুঝায়। সুতরাং মানুষ যে  
পানি থেকে সৃষ্টি তা বুবই সত্য।

যৌন মিলনের মাধ্যমে বংশবৃক্ষি হয় বলে বৈবাহিক সূত্রে রক্ত সম্পর্ক স্থাপিত  
হয় যার ফলে পিতামাতা, সন্তানাদি, দাদা-দাদি ও নানা-নানির সঙ্গে এবং  
পৌত্রাদি ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে  
বিতর্কিত উন্নরাধিকারের সমস্যার সমাধান হতে পারে, রক্ত পরীক্ষা ও জিন  
পরীক্ষার মাধ্যমে যা অতীতে সম্ভব ছিল না।

স্বাভাবিক সমাজ স্বীকৃত বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা সকল  
ধর্মেই রয়েছে। আজকাল তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতেই ব্যক্তি স্বাধীনতার  
আড়ালে প্রাক বিবাহ এবং বিবাহ বহির্ভূত যৌম মিলনের ফলে সেই প্রাচীন মহান  
বিবাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর ফল মোটেই কল্যাণকর  
হয়নি।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও পাশ্চাত্যের সেই দুটি ব্যাধি ক্রমেই  
বিস্তার লাভ করছে। ইসলামী দেশগুলোতেও বর্তমান ইসলাম বিমুখ শাসকবৃন্দ  
বেপরদার মাধ্যমে যৌন ব্যাডিচার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যাচ্ছে।

পবিত্র বিবাহ বঙ্গন শিথিলের ফলে সমাজে বিশেষ করে তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতে জারজ সত্তান, যৌন ব্যাধিসমূহ এবং পারিবারিক অশান্তির চাপ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। যৌনব্যাধি AIDS এর নতুন কুফল মাত্র। পবিত্র কুরআনের মতে বিবাহ বঙ্গন ছাড়া কোন রূপ যৌন মিলন সিদ্ধ নয়।

### ٥٩-الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَمَاءٍ أَكَمَ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ○الرَّحْمَنُ قَنَّلَ بِهِ خَمْدَانًا

২৫ : ৫৯ তিনিই যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়োর মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং নিজেই সেইসব নিয়ন্ত্রণের একচ্ছক্ত কর্তৃত্বের আসন আরশে অবস্থান প্রহণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু। সুতরাং তাঁর সুষঙ্গে জানতে হলে এ বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।

এ বিষয়টি ৭ : ৫৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

### ٦٠-تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بِرْجًا رَّجَعَلَ فِيهَا بَرْجًا وَ كَمْرًا مُنْبِرًا

২৫ : ৬১ কত মহান তিনি যিনি নতোপন্থলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্ৰ।

এ বিষয়টি ১০ : ৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

### ٦١-وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَهُ لِئَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَزَادَ شَكْوَانًا

২৫ : ৬২ এবং যারা উপদেশ প্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতি এবং দিনকে পরম্পরারের অনুগামীরূপে।

কুরআনের ১০ : ৬ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে কীভাবে রাত ও দিন পরম্পরাকে অনুসরণ করে এবং কীভাবে এই পরিবর্তন আমাদের কর্মতৎপরতার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা 'ছন্দ' এনে দেয়।

স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ লোকই এই প্রাকৃতিক ব্যাপারটিকে একটা বাস্তবিক বা সত্যি ঘটনা বলে বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু রাত ও দিনের

পরম্পরের মধ্যে মিশে যাওয়ার এই প্রাক্তিক ঘটনাটি নিয়ে যারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন, তারা এ ঘটনাটির তাৎপর্য উপলব্ধি না করে পারেন না এবং তাদের অন্তর আনন্দ ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হবে। আর তারা বিমুক্ষ চিত্তে সিজদাবন্ত হবেন এবং বলে উঠবেন : ‘সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই।’

## ٥٨-٥٩. مَنْ نَذَرَ تَعْقِلَتْ

২৬ : ২৮ মূসা বলল, ‘তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বুঝতে পার।

অত্র আয়াতটি বলছে যে, যা কিছু পূর্বে আছে এবং যা কিছু পশ্চিমে আছে আর আছে এ দু'য়ের মাঝখানে এসব কিছুই মহাপ্রভু আল্লাহর।

পূর্ব হচ্ছে সেই দিক যেখানে সূর্য দিগন্তের উপরে উঠে। আর পশ্চিম হচ্ছে সেই দিক যেখানে সূর্য দিগন্তেরখার নিচে চলে যায় বলে মনে হয়। আমরা জানি, সূর্যের দু'টি সাময়িক গতি আছে; এর একটি হচ্ছে একদিন সময়কালের মধ্যে নিজ অক্ষের চারদিকে একবারসহ সকল মহাজাগতিক বস্তুসমূহ বিশুব রেখার সমান্তরালে বৃত্তাকারে ঘোরে বলে মনে হয়। এ রকম প্রতিটি বৃত্তই দিগন্তেরখাকে দু'টি বিন্দুতে ছেদ করে : একটি পূর্বদিকে আর অপরটি পশ্চিম দিকে। সূর্যের চারদিকে সাময়িক প্রদক্ষিণের জন্য পৃথিবীর আরেকটি গতি আছে। এ গতির সময়কাল এক বছর। এ গতির কারণে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে বলে মনে হয়। প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের কারণে পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তাকার পথে ঘোরে বলে মনে হয় যাতে সে দিগন্ত রেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে ছেদ করে। এভাবেই, সূর্য বিভিন্নস্থানে উদয় হয় ও অন্ত যায় বলে মনে হয়; অর্থাৎ, প্রতিটি দিনেরই আলাদা আলাদা পূর্ব বিন্দু ও পশ্চিম বিন্দু রয়েছে।

সূর্যের দৃশ্যমান বার্ষিক প্রদক্ষিণ পথ তথা কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি ২৩° ডিগ্রী ২৮ মিনিট কোণে দু'টি বিন্দুতে ছেদ করে। যেদিন সূর্য এ রকম কোন একটা বিন্দুতে চলে আসে বলে মনে হয় সেদিন সূর্যের দৈনিক বৃত্তাকার পথ বিশুব রেখার সাথে মিলে যায়। ঘটনাক্রমে, বিশুবীয় রেখার সাথে দিগন্ত রেখার ছেদবিন্দুকেই পূর্ব বিন্দু ও পশ্চিম বিন্দু বলা হয়ে থাকে।

কাজেই, পৃথিবীগত দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিকভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানের কথা বলা যেতে পারে। মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানের সরকিছুরই মালিক এতে বিশ্বায়ের কিছু নেই।

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُؤْمِنًا أَنْ أَصْرِبْ بِعَصَالَ الْبَحْرِ فَانْفَقَ لِكَانَ كُلُّ فِرْتِي  
كَالْكُلُودُ الْعَظِيمُ

২৬ : ৬৪ অতঃপর মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম; 'তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে  
আঘাত কর।' ফলে, তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল  
পর্বতসমূহ হয়ে গেল।

অত্র আয়াতে মূসা নবীর (আ) মিশর থেকে বহিগত হওয়ার ঘটনার দিকে  
ইঙ্গিত করে। তিনি সাগরে উপনীত হয়ে যখন তাঁর লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত  
করলেন, সাগর তখন দু'ভাগ হয়ে গেল।

এই অলৌকিক ঘটনার পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।  
অবশ্য, কোরিয়ায় পর্যবেক্ষণকৃত একটা সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক ব্যাপার এটাই  
ইঙ্গিত করে যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

মূসার অলৌকিক ঘটনার মত একটা প্রাকৃতিক বিশ্যয় বছরে দু'বার ঘটে  
দক্ষিণ কোরিয়ার এক দ্বীপে। চিন্দে দ্বীপের এক গ্রাম হোয়েদংনি এবং পার্শ্ববর্তী  
সুন্দুর দ্বীপ মেদার মধ্যে রয়েছে একটা সাগর প্রণালী। সেখানে বছরে দু'বার  
প্রাকৃতিকভাবে জেগে উঠে ২ .৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৪০ মিটার প্রস্থ এক  
গুরুত্ব বালুর ঢড়। স্থানটি সিউল থেকে ১০ কিঃ মিঃ দূরে। ঘটনাটি প্রথম  
আন্তর্জাতিকভাবে নজরে আসে মধ্য ৭০-এ দশকে। কোরিয়ায় নিযুক্ত ফরাসী  
রাষ্ট্রদূত পিয়েরে ল্যাভি ১৯৭৩ সালে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করেন। ফ্রাসে ফিরে গিয়ে  
ল্যাভি ফরাসী সংবাদপত্রে একটা নিবন্ধ লেখেন। এতে তিনি মূসার অলৌকিক  
ঘটনার কোরীয় সংক্রান্তির বিবরণ দেন।

কোরীয় সাগরের বিভক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে বিশেষ জোয়ার পরিস্থিতিতে।  
১৯৭৩ সালে ঘটনাটি ঘটে ১৪ এপ্রিল বিকেল পাঁচটায় যখন জোয়ারের পর  
ভাটার টান আরম্ভ হয়। পাঁচ মিনিট পরেই সাগর শুকিয়ে এক স্থানে সম্পূর্ণ বিভক্ত  
হয়ে পড়ে যা মাত্র ঘন্টাখানেক আগেও ছিল মাঝ দরিয়া। পানি ধীরে ধীরে  
পুনরায় সাগরতল ঢেকে ফেলা শুরু করে। ৬টা ১০ মিনিটের মধ্যে পানি জেগে  
ওঠা পথটাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে। এটা একটা অত্যন্ত বিরল প্রাকৃতিক  
ঘটনা যাকে বলা যায় বিশ্বের নিকট দীর্ঘকাল যাবৎ অজ্ঞাত এক অলৌকিক  
ঘটনা। কবে থেকে এ ঘটনা ঘটে আসছে কিংবা আরো কতদিন এ রকম ঘটতে  
থাকবে তা অবশ্য কারো জানা নেই।

হতে পারে, এ ধরণেরই একটা পরিস্থিতি সেই দূর অভীতে মিশর ও  
ফিলিস্তিনের মধ্যকার সাগরে ঘটে থাকবে যা কেউ লক্ষ্য করেনি। মূসা (আ)

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তার যাত্রাপথে ঐ বিশেষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তিনি যে মুহূর্তে সাগরে তার লাঠি দ্বারা আঘাত করেন ঠিক সেই মুহূর্তে এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি ঘটে ।

○-١٣٥- أَتَأْتُونَ الْذِكْرَ مِنَ الْعِلْمِينَ

○-١٣٦- وَئِذْرُفْنَ مَا حَلَقَ لِكُفْرِ رَبِّكُمْ بِرْبِنْ أَنْوَلْحَكْمُ بِلْ أَنْهُكْ تَوْرَهْ عَدْفَنْ

২৬ : ১৬৫-৬৬ সৃষ্টির মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সাথেই উপগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে ঝালোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক । তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ।

উপরোক্ত আয়াতটি হ্যরত লৃত (আ)-এর অনুসারীদের যৌন বিকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে । তারা স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের পরিবর্তে পুরুষদের সাথে সমকামিতায় লিঙ্গ হয়েছিল । এই অভ্যাসটিকে স্পষ্ট বিপথগামিতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা ইতিমধ্যে ৭ : ৮০-৮১ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে ।

○-١٤٠- وَأَمْطَنْنَا عَلَيْهِمْ مَعْرِضاً فَسَاءَ مَطْرَالِيْنِ

২৬ : ১৭৩ তাদের উপর শান্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! আয়াতটি হ্যরত লৃত (আ)-এর সময়ে সংঘটিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে যা ৭ : ৮৪ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

○-١٤١- وَأَذْخِلْنِيْكَ فِي كَبِيْرِكَ تَحْزِيرْهِ بِيَضْكَارِمِنْ غَيْرِ سَوْمَهْ فِي تَشْعَابِيْتِ إِلَى  
فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ إِلَهُمْ كَلَوْا تَوْمَا فِسْقِيْنَ

২৭ : ১২ এবং তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বন্দের মধ্যে প্রবেশ করাও । এটা বের হয়ে আসবে উভ নির্দোষ হয়ে । এটা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নির্দশনের অনুর্গত । তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ।

মূসার (আ) দীপ্তিমান হাত একটি সুপরিচিত অলৌকিক ঘটনা বা মোজেজা যা ছিল মুসাকে (আ) ফেরাউনের মিশরে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্যে আগ্নাহ প্রদত্ত নয়টি মোজেজার অন্যতম। মূসা (আ) কর্তৃক বার বার সর্তর্ক করে দেয়ার পরেও মিশরবাসীদের উদ্বিত্তের শাস্তিপ্রদর্শ পাঠানো পাঁচটি স্পষ্ট নির্দশন তথা মহাপ্লাবন, পঙ্গপাল, কৌট-পতঙ্গ, ব্যাঙ এবং রক্তের বিষয় ইতিমধ্যে ৭ : ১৩৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে। অত্র উল্লিখিত নয়টির বাকি তিনটি নির্দশন হচ্ছে : লাঠি (দ্রঃ ৭ : ১০৭ আয়াত), খরা-অনাবৃষ্টির বছরসমূহ (দ্রঃ ৭ : ১৩০ আয়াত), এবং শস্য ঘাটতি (দ্রঃ ৭ : ১৩০ আয়াত)।

লাঠি এবং এর অলৌকিক গুণাবলী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আওতা বহির্ভূত।

বৃষ্টিপাতের অভাবের ফলেই বছরের পর বছর খরা বা অনাবৃষ্টি দেখা দিয়ে থাকতে পারে যা ফসলের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলেছিল। উর্বর নীল নদ উপত্যকার মত প্রচুর বার্ষিক বৃষ্টিপাতের রেকর্ড বিশিষ্ট অঞ্চলেও দীর্ঘদিন ধরে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করলে এবং এর ফলে নদীতে প্রধান পানির প্রবাহ শুকিয়ে গেলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। শস্য-শীৰ ছোট হওয়াও সাধারণত খরারই ফল। তবে নিম্নোক্ত কারণগুলোও এ ঘটনার জন্যে দায়ী হতে পারে :

১. গুদামে অপুষ্ট বীজে পোকার আক্রমণ;
২. চাষাবাদের সময় পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব; ফলে জলাবদ্ধতা কিংবা অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ;
৩. শস্যগাছের সুস্থিতাবে বেড়ে উঠা এবং বীজ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মাটিতে না থাকা;
৪. মাটির অনুপযোগী ভৌতিক গুণগুণ; এবং
৫. ছাঁচাক ও পোকামাকড়ের কারণে শস্য মহামারী।

٥-أَيْنَكُمْ لَتَأْتُنَ الرِّجَالُ شَهْرَةً مِّنْ دُوْنِ النَّسَاءِ بِلْ أَنْتُمْ تَوْمِيْنَ بِهِنَّ

২৭ : ৫৫ তোমরা কি যৌন পিপাসা মিটানোর জন্য নারীদের পরিবর্তে পুরুষকে গ্রহণ করবে? নিঃসন্দেহে তোমরা অতি অজ্ঞ জাতি।

এ বিষয়ে ৭ : ৮০ ও ৭ : ৮১ আয়াত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٦-وَامْطِرُنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذَرِينَ

২৭ : ৫৮ তাদের উপর ডয়কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।

অত্ব আয়াতে নৃত নবীর (আ) সময়ে সংঘটিত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।  
বিষয়টি ৭ : ৮৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

٤٠- أَعْنَ حَلَقَ التَّمُورِ وَالْأَرْضَ دَانِزَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا شَاءُ فَأَتَيْتُكُمْ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُشْبِهُوا شَجَرَهَا مَالَهُمْ مَعَ الْهُنْوَ بَلْ هُنْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

২৭ : ৬০ বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং  
আকাশ হতে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি  
তা ধারা ঘনের উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্গত  
করাবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আগ্নাহুর সাথে অন্য ইলাহ  
আছে কি? তবু ও তারা এমন এক সম্পূর্ণায় যারা সত্য বিচ্ছৃত  
হয়।

আসমান ও যমিনের সৃষ্টি বিষয়ে ২ : ১১৭ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

ଆକାଶ ଥେକେ ବୃଷ୍ଟିର ଫେଁଟାର ପତନ ସମ୍ପର୍କେ ୨ : ୨୨ ଏବଂ ୨ : ୧୬୪ ଆୟାତଦ୍ୱୟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହେଁଛେ । ଗାଛପାଳା- ଶସ୍ୟ ଫଳାଦିର ଜନ୍ମ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ୨ : ୧୬୪ ଆୟାତେ ଆଲୋଚିତ ହେଁଛେ ।

٤١- أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قِرَارًا وَجَعَلَ خَلْلَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَادِيًّا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۝ إِذَا هُمْ مُّهَاجِرُونَ بَلْ أَكْرَمُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

২৭ : ৬১ বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং তার  
মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন  
সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তর্যাম;  
আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তবুও তাদের  
অনেকেই জানে না।

২৫ : ৫৩ আয়াতে এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

٤٠- أَمَّنْ يَهْدِي نَكْفُرٍ فِي ظُلْمَتِ الْبَزَّارِ الْبَغْرِيْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ إِلَيْهِمْ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ  
عَلَّالَةُ تَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْنَا يَا شَرِيكُنَّ

২৭ : ৬৩ বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অক্ষকারে পথ  
প্রদর্শন করেন এবং যিনি শীঘ্ৰ অনুগ্রহের প্রাক্তালে সুসংবাদবাহী  
বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য ইলাহ আছে কি? তারা  
যাকে শপীক করে আল্লাহত তা হতে বড় উর্ধ্বে।

তৃ-তাগ এবং সাগরের আঁধার সংকোচ বিষয়টি ৬ : ৬৩ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ‘সীয় অনুগ্রহের প্রাকালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন’ এই বক্তব্যটি ৭ : ৫৭ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

**أَكْنِيَّبُنُوا الْخَلْقَ تَقْرِبُونِدَهُ وَمَنْ يَرْزُقُ لِكُمْ مِنَ النَّعْمَةِ وَالْأَمْرُ فِي  
هَذِهِ الْأَرْضِ مَمَّا أَنْتُمْ صَدَقُونَ ۝**

২৭ : ৬৪ কে সৃষ্টি শুরু করেছেন এবং বার বার সৃষ্টির ধারা জারি রেখেছেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন? তিনি ছাড়া কি আর কোন সৃষ্টিকর্তা আছে? (যারা আরো সৃষ্টিকর্তা আছে বলে) তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর : যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এ কথার প্রমাণ পেশ করো।

সৃষ্টির শুরু এবং সৃষ্টির ধারা সম্পর্কে ২ : ১১৭ এবং ২১ : ১০৪ আয়াতসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**وَمَا أَنْتَ بِهِدِيِ الْغَنِيِّ عَنْ صَلَتِيْمُ إِنْ شَوَّهَ لَهُ  
مَنْ يُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِمْ مُسْلِمُونَ ۝**

২৭ : ৮১ তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথ ভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না। তুমি শুনাতে পারবে কেবল তাদেরকে, যারা আমার নির্দর্শনাবলিতে বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পণকারী।

আল্লাহর নির্দর্শনাবলি :

বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহর নির্দর্শনাবলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এর আগেই প্রদান করা হয়েছে। এসব আয়াতের মধ্যে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ উল্লেখযোগ্য :

আয়াত ২ : ১৬৪, ৩ : ১৯০, ৬ : ৯৭, ৬ : ৯৮, ৬ : ৯৯, ৭ : ৫৮, ১০ : ৫, ১০ : ৬, ১০ : ৬৭, ১৩ : ২, ১৩ : ৩, ১৩ : ৪, ১৬ : ১২, ১৬ : ১৩, ১৬ : ৬৫, ১৬ : ৬৬, ১৬ : ৬৭, ১৬ : ৬৯, ১৬ : ৭৯, ২১ : ৯১।

**أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْيَلَى لِيُنْكَثِرُوا فِيهِ وَالنَّارَ مُبْصِرًا  
لَفِيفَ ذِلْكَ لَآيَتٍ لِتُوَمِّرُ لِيُؤْمِنُونَ ۝**

১৭ : ৮৬ ওরা কী অনুধাবন করে না যে, আমি রাত সৃষ্টি করেছি ওদের বিশ্বামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকপ্রদ। এতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে।

বিশ্রামের জন্য রাত আর আলোর জন্য দিন-এ বিষয়টি ১০ : ৬৭ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٨٨-وَتَرَى الْجِبَالَ تَسْهِلًا جَاءَكُمْ وَأُولَئِنَّ كَثُرَ مَا تَحْكَمُ  
صَلَمَ اللَّهُ الَّذِي أَلْقَنَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ خَمِيرٌ بَشَرَعَنَ

২৭ : ৮৮ আর তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ, কিন্তু সেদিন তাতে হবে যেগপুঁজের ন্যায় সঞ্চরমান। এটি আল্লাহরই সৃষ্টি নেপুণ্য। যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুৰম। তোমরা যা কর সে সবকে তিনি সম্যক অবহিত।

আল্লাহ সব কিছুই সম্পূর্ণ নির্বুতভাবে সৃষ্টি করেন

আল্লাহ সবকিছু নির্দিষ্ট অনুপাতে, নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুযায়ী এবং সামঞ্জস্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন- বিষয়টি ইতিপূর্বে কয়েকস্থানে আলোচিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১ : ১, ৭ : ৫৪, ১৩ : ১৬, ২৫ : ২ আয়াতের আলোচনাসমূহ দেখা যেতে পারে।

٦-وَأَوْحَيْنَا لَهُ أَوْرُؤُسَنِي أَنْ أَرْضُعُهُ فَإِذَا خَفِتَ عَلَيْهِ قَالَ قُمْهُ فِي الْيَمِينِ وَلَا  
تَخَافِي وَلَا تَخْرُنِي إِنَّمَا أَرْبَدْتُكَ وَجَاعَلْتُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

২৮ : ৭ আমরা (আল্লাহ তা'আলা) মূসার মা'কে প্রেরণা দিলাম : তোমার সন্তানকে প্রতিপালন কর, যদি তার নিরাপত্তা সম্পর্কে তয় পাও তবে তাকে (আমার নির্দেশ মত) পানিতে ফেলে দাও এবং কোন তয় করোনা বা হা-হতাশ করোনা (হতাশ হয়ো না)। কারণ আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং তাকে আমার একজন নবী (বা রাসূল) বানাবো।

মূসা (আ)-কে শিশু অবস্থায় পানিতে ফেলার কাহিনী ২০ : ৩৯ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١-فَلَمَّا دَرَيْتَ كُمَانَ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَى سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
مَنِ الْغَيْرُ لِلَّهِ بِإِلَيْكُمْ بِهِضِيَاهُ لَكُلُّا تَكْسَعَنَ

২৮ : ৭১ বল, তোমরা ডেবে দেখেছ কী, আল্লাহ যদি রাতকে কিম্বামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন- আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ

আছে, যে তোমাদেরকে আলোক এনে দিতে পারে? তবুও কি  
তোমরা কর্ণপাত করবে না?

۲۷- قُلْ إِنَّ رَبِّيُّكُمْ لَنِّيْلَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْهُدَىٰ مَرْغِمًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
مَنْ إِلَّا اللَّهُ عَلِيْدُ اللَّهِ يَا تَبَّاعِيْكُمْ لَيْلَنْ فِيهِمُ أَنْلَائُ بُعْرُونَ

২৮ : ৭২ বল, তোমরা ভেবে দেখেছো কী— আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের  
দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ  
আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে যাতে  
তোমরা বিশ্রাম করতে পার। তবুও কী তোমরা ভেবে দেখবে  
না?

۲۸- وَمَنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَيْلَنَ وَالْهَنَارَ لِسْكَنَوْا فِيهِ وَلِتَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّ كَمْ تَشْكِرُونَ

২৮ : ৭৩ তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছিলেন রাত ও দিন, যেন  
তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান  
করতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

উপরে উল্লিখিত আয়াত তিনটিতে আল্লাহ্ যে বাণী পৌছে দিয়েছেন তা  
উপলব্ধি করতে হলে আয়াতগ্রাম্যকে একসাথে আলোচনায় আনতে হবে। পরম  
করণ্যাময় ও দয়ালু আল্লাহ্ পৃথিবীকে তার নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের অস্তিক  
গতি দান করেছেন যাতে দিন ও রাত আসে। রাত ও দিনের উপকারী ফলসমূহ  
১০ : ৬৭ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পৃথিবীর অক্ষীয় গতির সময়কাল যদি সূর্যের চারদিকে একবার পূর্ণ  
প্রদক্ষিণের সময়কালের সমান হত, তাহলে পৃথিবীর এক গোলার্ধে হত চিরস্থায়ী  
দিন আর অপর গোলার্ধে চিরস্থায়ী রাত। সূর্যের দিকে চিরস্থায়ীভাবে মুখ করে  
থাকা পৃথিবীর গোলার্ধের তাপমাত্রা থাকত অত্যন্ত উচ্চ। প্রধানত যে কারণে  
পানি এবং সবুজ গাছপালার অভাবে এখানে জীবন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব  
হয়ে পড়ত। অনুরূপভাবে, চিরস্থায়ী রাতে আচ্ছাদিত গোলার্ধে আলোক  
সংশ্লেষণের অর্তমানে জীবনের বিকাশ সম্ভব হত না।

আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে পৃথিবীকে তার অক্ষের চারদিকে বর্তমানের ঘূর্ণনগতি  
থেকে ভিন্ন কোন ধরনের ঘূর্ণনগতি দান করতে পারতেন। আমাদের সৌর  
জগতেও পৃথিবী থেকে ভিন্ন ধরনের বেশ কিছু অক্ষীয় গতির দৃষ্টান্ত রয়েছে। চাঁদ

তার অক্ষের চারদিকে এমনভাবে ঘূর্ণনরত যে, যে সময়ে এটি নিজ অক্ষের চারদিকে একবার ঘূর্ণন পূর্ণ করে, সেই সময়ের মধ্যে চাঁদ পৃথিবীকেও একবার প্রদক্ষিণ করে আসে এমনভাবে যাতে চাঁদের যে কোন স্থানে পৃথিবীর ১৫ দিনের সমান একদিন এবং ১৫ রাতের সমান এক রাত হয়; আর চাঁদের একপাশ স্থায়ীভাবে পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে। ইউরোনাসের অক্ষীয় গতি আরো অধিক আকর্ষণীয়। এর ঘূর্ণন অক্ষ এর প্রদক্ষিণ ক্ষেত্রের প্রায় উপরে অবস্থিত; ফলে, সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণকালের অর্ধেক সময় ধরে এর এক মেরু সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং বাকি অর্ধেক সময় (পৃথিবীর প্রায় ৪২ বছর) ধরে অন্য মেরু সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে।

দিনের মধ্যভাগে চাঁদের তাপমাত্রা  $120^{\circ}$  ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত উপরে উঠে যায় আর রাতের তাপমাত্রা  $100^{\circ}$  ডিগ্রি সেঃ-এ নেমে আসে।

শুক্রবাহ ঘূর্ণনীত আছে অন্য সব ধরের বিপরীত দিকে এবং এর অক্ষীয় গতির সময়কাল প্রদক্ষিণ সময়কালের চেয়ে বেশী। এর অক্ষীয় ঘূর্ণনে সময় লাগে ২৪৩ পার্থিব দিন এবং প্রদক্ষিণ সময়কাল ২২৫ পার্থিব দিন। দিন কিংবা রাত চিরস্থায়ী হলে জীবনের বিকাশকে অত্যধিক দুর্ভ এবং সম্ভবত অসম্ভব করে তুলত। এ সকল আয়তে আগ্নাহ তাঁর সীমাহীন করণার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পৃথিবী নামক ইই শ্রহে দিন ও রাতকে নির্দিষ্ট পরিমাপযুক্ত করার মাধ্যমে আমাদেরকে ‘তাঁর মেহেরবানী তালাশ’ করতে আহবান জানান।

٨- لَخَفَنَاهُ وَبَدَأْرُ الْكَرْبَلَى فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِهِ  
الْمُنْعَى وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْصُورِينَ ○

২৮ : ৮১ অতঃপর আমি কার্লসকে ও তাহার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তাহার ব্যপকে এমন কোন দল ছিল না যে আল্পাহুর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আস্তরঙ্গায় সক্ষম ছিল না।

অত্র আয়াতে হ্যরত মুসার (আ) সাথে মিশর থেকে বহির্গত দলের অন্তর্ভুক্ত কানুন নামীয় অন্যতম ইসরাইলীর উপর যে শান্তি নেমে এসেছিল সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বেশ সম্পদশালী ছিলেন যা তাকে মুসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রতি উদ্বৃত্ত আচরণ করার সাহস যগিয়েছিল।

বাইবেল মতে, আড়াইশ' সঙ্গীসহ তিনি মুসার (আ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন যে কারণে দু'জন সঙ্গীসহ তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। তাদের পায়ের নিচের মাটি ফেটে দু'ভাগ হয়ে যায় এবং মাটি তাদেরকে গিলে ফেলে।

ধরণী কর্তৃক গলাধঃকরণের একটা সহজ দৃষ্টান্ত হচ্ছে চোরাবালি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে চোরাবালিকে আশপাশের বালি থেকে ভিন্ন রকম কিছু মনে হয় না, যে কারণে এটি মুসলিমদের জন্যে ভয়ানক। এটি হচ্ছে আলগা, পরিবর্তনশীল বালুকারাশি যা পানিতে এতটা সুসিক্ত থাকে যে, সহজেই চাপের নিকট নতি স্থীকার করে এবং কোন লোক কিংবা জীবজীবন ভার বহন করতে পারে না। ফলে, এটি নিচের দিকে দেবে যায় এবং মানুষ বা প্রাণীর দেহ ধীরে বালির নিচে হারিয়ে যায়। মাটি মানুষ বা প্রাণীদেহকে গলাধঃকরণ করে। ছোট ছেট চোরাবালি মাঝে মধ্যেই দেখা যায় বিশেষত আইল্যাঙ্কে, নদীর মোহনায় আর সুবিস্তৃত সাগর সৈকতে যেখানে বালির নীচে লুকিয়ে থাকে পরিবর্তনশীল কাদামাটি এবং অন্যান্য অভেদ্য বস্তু।

প্রচল ভূমিকম্পও এ ধরনের গলাধঃকরণ তথা জীবন্ত ক্ষয়ক্ষতির মত ঘটনার কারণ হতে পারে এবং সেই সাথে আরো অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি তো থাকেই। মহাবিপর্যয়কর ভূমিকম্পে ভবনসমূহ দীর্ঘ হয় বা ডেঙে যায়, ভূপৃষ্ঠে বড় বড় ফাটল দেখা দেয়, কখনও কখনও সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউ এবং তার সাথে বিপুল পরিমাণ পানি ও কাদা তীরে চলে আসে এবং মানুষ ও সম্পদের উপর বিরাট ধ্বনি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অতীতে যে সকল ভূমিকম্প বিপর্যয় ডেকে এনেছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ : ১৭৫৫ সালে লিসবনের ভূমিকম্পে তিরিশ থেকে চালিশ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল; শহরের বৃহত্তর অংশ ডেঙে-ধন্তে যায়; আগনের বিস্ফোরণ ঘটে এবং জলোচ্ছাস জাহাজস্থাটগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ১৭৮৩ সালে ইতালীর ক্যালাত্রিয়ায় সংঘটিত ভূমিকম্পে ষাট হাজার লোক মারা পড়ে। ১৯২৩ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর জাপানে সর্বাপেক্ষা ধ্বনিকম্প হয় যাতে টেকিও ও ইয়াকোহামা শহর সম্পূর্ণ ধ্বনি হয়। ১৯৩৫ সালে কোয়েটা শহর এক ভূমিকম্পে বহু লোকের প্রাণহানি হয়। ইরানের উত্তরাঞ্চলে ও আজারবাইজানের ভূমিকম্পেও বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়।

۱۹-أَوْلَئِنِإِلَيْهِمْ أَكْفَافُ الْأَخْنَانِ تُقْعِدُهُمْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

২৯ : ১৯ এরা কী কখনো লক্ষ্য করে না কীভাবে আল্লাহ সৃষ্টি শুরু করেন, পরে তারই পুনরাবৃত্তি করেন? নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

কীভাবে সৃষ্টির শুরু হয়েছে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানিক আলোচনা পরিশিষ্ট-২ এ দেওয়া হয়েছে।

এ কথাও আলোচনা করা হয়েছে যে মহাবিশ্বে দুটি পরম্পর বিরোধী শক্তি কাজ করছে একটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণ আর দ্বিতীয়টি হলো মহাবিস্ফোরণ

(Big Bang) জনিত সম্প্রসারণ (expansion) শক্তি। একটি মতবাদ এই যে মাধ্যকর্ষণ শক্তিই শেষ পর্যন্ত কামিয়াব হবে এবং মহাবিশ্ব মহাখংসের (big crunch) মাধ্যমে ধূলিসাং হয়ে যাবে এবং অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন এবং অতি উত্তপ্ত কণায় পরিণত হবে। আবার এগুলো থেকে আর এক মহাবিক্ষেপণের মাধ্যমে নতুন মহাবিশ্বের সৃষ্টি হবে এ বিষয়ে ২ : ১১৭ এবং ২১ : ১০৪ আয়াতহয়ের আলোচনাও দেখা যেতে পারে।

٢-٢. ْقُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ شُكْرًا لِّهُ يُنْسِيَ النَّاسُ أَذْجَرَةً  
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّكِبِّرٌ ۝

২৯ : ২০ (লোকদেরকে) বল (হে নবী!) তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য করে দেখো যে কীভাবে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং তিনিই দ্বিতীয়বার জীবনদান করবেন। নিচয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশালী।

এই আয়াতে মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। সৃষ্টি জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ভ্রমণই যে বিশেষ পদ্ধতি এর প্রকৃত উদাহরণ বিখ্যাত বৃটিশ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। বাইশ বছর বয়সে তিনি বৃটিশ রয়েল নেডিলির “বিগ্ল্” নামক জাহাজে প্রকৃতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে চাকুরী পান। জাহাজটি ১৮৩১ সালে সমুদ্র যাত্রা শুরু করে। এর ফলে তিনি বিভিন্ন প্রকারের জীব, বিভিন্ন দেশের জীবন পদ্ধতি ও প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পান। ডারউইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান Theory of Evolution যা আগ উন্মোরের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রশান্ত মহাসাগরের গালাপাগোস দ্বীপপুঁজি দেখবার পরই তার এইসব চিন্তার সূত্রপাত হয়। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ এবং পাক কুরআনের বিজ্ঞানময় বিষয়সমূহ সঙ্কে ডারউইনের কোন ধারণা ছিল না; বরং মানব রচিত বাইবেলের বিজ্ঞান বিরোধী ভাবধারা তার জানা ছিল তাই তিনি তার মতবাদে সৃষ্টিকর্তার কোন উল্লেখ করেন নি।

ব্যাপক ভ্রমণের মাধ্যমে প্রকৃতি জগতের উপর গভীর গবেষণা চালালে যে কোন বিজ্ঞানী সব সৃষ্টির মধ্যে এক মহান সৃষ্টিকর্তার ব্যাপক পরিকল্পনা বুঝতে পারবেন এবং সবকিছু যে একজন মহান সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে এবং আবারও হতে পারে এই সত্য তথা মহান আল্লাহর অঙ্গিত্বে বিশ্বাসী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

#### তথ্যসূত্র :

1. The Wonders of Life on Earth. Editors of Life and Lincoln Barnett. Prentice-Hall International, London, p. 9, 1963.

٢٨- وَأُنْطَارِدَأَلْقَوْمَةَ إِنْكُفَّلَتُونَ الْفَالِحَةُ  
مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

২৯ : ২৮ আর (স্মরণ কর) যখন লৃত তার দেশবাসীকে বলল : “তোমরা তো এমন নিলজ দুর্কর্ম কর যে তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কোন জাতিই এরূপ করেনি।”

এ বিষয়ে ৭ : ৮০-৮১ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٢٩- أَوْلَكُفَّلَتُونَ الرِّجَالَ دَتَّغَعُونَ الشَّيْبِيلَ ۝ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُفُّمُ اللَّكَمَ  
فَنَّاكَانَ جَوَابَ قَوْمَكَمَ الْأَنَّ قَالُوا لِلَّهِنَا يُعَذَّابَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْحَسَدِ قَيْنَ ۝

২৯ : ২৯ “তোমরা (এমন নিকৃষ্ট যে) তোমরা পুরুষদের নিকট (যৌন পিপাসা মিটাতে) যাও, রাহাজানি কর এবং নিজেদের অজলিশে দুর্কর্ম কর।” কিন্তু তার জাতির নিকট এই কথার কোন জবাব ছিল না বরং বলল, নিয়ে এসো তোমার আল্লাহর আয়াব যদি তোমার দাবী সত্য হয়ে থাকে।”

এতে বুঝা গেল যে লৃত (আ)-র জাতি শুধু গোপনে সমকামী ছিল না, বরং তারা প্রকাশ্যে দল বেধে এই দুর্কর্ম করতো এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও চালাতো। অর্থাৎ এ ধরনের বিকৃত যৌন জীবনযাপনে তাদের কোন লজ্জা বা পাপবোধ ছিল না। তাই আল্লাহ এই জাতিকে আয়াব দিয়ে ধ্রংস করে দেন।

এই ধরনের সামাজিক ও প্রকাশ্য যৌন ব্যভিচার সম্পর্কে মহানবী (সা) তাঁর উত্তরদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে আল্লাহ সেই নিলজ জাতির মধ্যে বিভিন্ন মহামারি ছাড়াও এমন নতুন রোগ ছড়িয়ে দেবেন যা তাদের পূর্বপুরুষগণ কখনও দেখেনি (ইব্ন মাজা)। বর্তমান কালের AIDS সত্ত্বত যৌন ব্যভিচারীদের প্রতি শাস্তিস্঵রূপ দুরারোগ্য রোগ।

٢٨- وَعَادًا وَتُرْدُزًا وَقَنْتَبِينَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ ۝ وَنَرْبَئِنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْنَالَهُمْ  
وَصَلَّهُمْ عَنِ الشَّيْبِيلِ ۝ وَكَانُوا مُشْتَبِّهِرِينَ ۝

২৯ : ৩৮ “এবং আমি আদ ও ছামুদ গোত্রকে ধ্রংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।”

‘এই আয়াতে নবী সালিহ (আ) ও নবী হুদ (আ)-এর লোকদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ এ সকল লোকের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। এ বিষয়টি যথাক্রমে আয়াত ১১ : ৫৮ ও ১১ : ৬৭-এর প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

۲-۲. ﴿نَحْلًا أَخْذَ تَابِدَيْهِ فَيُنْهِمُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾  
 وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسْفَنَا بِهِ الْأَرْضَ  
 وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا أَنفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

২৯ : ৪০ তাদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম।

তাদের কারণ প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচও বাড়, তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাকেও আমি মাটির নিচে গেঁড়ে দিয়েছিলাম এবং কাকেও ডুবিয়েছিলাম। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

পূর্বেকার আয়াতসমূহ যথা ২৯ : ৩১-৩৯-এ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের উপর যে নানা প্রকার শাস্তি আরোপ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের প্রসঙ্গে এই শাস্তির কথা বলা হয়েছে তারা হ'ল নবী লৃত (আ)-এর লোক, কার্নল, নবী মূসা (আ)-এর একজন সঙ্গী এবং ফিরাউন (ফারাও)। এদের বিষয়ে ৭ : ৮৪ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

### টর্নেডোর (প্রচও ঘূর্ণিঝড়) সৃষ্টি

কোন কোন বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়-বৃষ্টি বিশেষ করে প্রবল ঝড়ে বাতাস মাঝে মাঝে প্রচও ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে যা মেঘের তলদেশে উত্তব হয়ে নিচে নেমে আসে এবং ভূমি শ্পর্শ করে। এটা আবার উপরে গিয়ে মেঘের সাথে মিশে যায় এবং নিকটবর্তী কোন স্থানে গিয়ে আঘাত হানে অথবা আর কখনও এর পুনরভূত্যন হয় না। প্রচও গতিবেগের কারণে টর্নেডোর অভ্যন্তরে অত্যন্ত নিম্নচাপ বিরাজ করে। একটি ভবনের উপর দিয়ে টর্নেডো অতিক্রম করলে ভবনের চারদিকে বাতাসের এই অতি নিম্নচাপের কারণে ভবনটি প্রায় শুড়িয়ে যায় বা বিহ্বস্ত হয়। দক্ষিণ ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে প্রায়ই টর্নেডো আঘাত হানে (Van Nostrand's Scientific Encyclopaedia, ২য় সং, ১৯৪৭, পৃঃ ১৪৩২)। লৃত (আ)-এর লোকদের উপর প্রচও বিক্ষেপণ হওয়ার বিষয়টি আয়াত ১৫ : ৭৩-এ আলোচনা করা হয়েছে। কারনের ঘটনাটির বিবরণ রয়েছে ২৮ : ৮১ নং আয়াতে।

۱۰۔ لَكُنْ سَالِتُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَلَّمَ النَّسَنَ وَالْفَرَّارَ  
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنْ يُؤْنَكُونَ

২৯ : ৬১ যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ! ’ তাহলে, তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আয়াত ২ : ১১৭, ২ : ১৬৪ ও পরিশিষ্ট ১ ও ২ এ বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধানের বিষয়টি ৭ : ৫৪ সংখ্যক আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

۱۱۔ لَكُنْ سَالِتُمْ مَنْ تَرَوْ مِنَ السَّمَاءِ مَا تَرَوْ كَاهِيًّا بِالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِنَا  
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَلِلْحَمْدُ لَا يَعْقُلُونَ

২৯ : ৬৩ যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত ইওয়ার পর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে কে তাকে সংজীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ! ’ বল, ‘প্রশংসা আল্লাহরই।’ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা অনুধাবন করে না।

আকাশ থেকে বৃষ্টির বর্ষণ এবং বৃষ্টির পানি পেয়ে শুক মৃত ভূমির সজীব হয়ে ওঠার প্রসঙ্গটি ২ : ১৬৪ নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

۱۲۔ أَوْ لَمْ يَبِرُّ رَفِيقَ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ فَإِنَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوهَةً وَأَتَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُ ذَمَّاً أَكْثَرَ وَمَا عَزَّزُهُمَا  
وَجَاءَهُ ثَمَّ رُسْلَمٌ بِالْبَيْنَتِ فَنَى كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ  
وَلَكُنْ كَالَّذِينَ أَنْفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ

৩০ : ৯ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতে পেত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিগাম কেমন হয়েছে। শক্তিতে তারা ওদের অপেক্ষা প্রবল ছিল, তারা জমি চাষ করত, তারা তা আবাদ করত ওদের চেয়ে বেশী। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশন সহ, বস্তুত ওদের প্রতি জুনুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না, ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুনুম করেছিল।

এ বিষয়টি আয়াত ৩ : ১৩৭ ও ৬ : ১১তে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۰- اَللّٰهُ يَنْدِمُ عَلٰى الْخَلٰقِ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

৩০ : ১১ আশ্বাহই সৃষ্টির সূচনা করেন, পরে তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন  
এবং অবশ্যে তোমাদের সবাইকে তাঁর নিকট নিয়ে যাওয়া  
হবে।

এই বিষয়টি ২ : ১১৭, ২১ : ১০৮ এবং ২৯ : ১৯ আয়াতসমূহের সঙ্গে  
আলোচনা করা হয়েছে।

١٩- يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْهَيَّةِ وَيُخْرِجُ الْمُبَيَّنَ مِنَ الْأَقْوَى وَيُخْنِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ ۝

৩০ ৪ ১৯ তিনিই জীবিতকে মৃত হতে বের করেন, এবং মৃতকে জীবন্ত হতে বের করে আনেন এবং যমিনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা হতে) বের করে আনা হবে।

ମୁତକେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତକେ ମୃତ ଥିଲେ ବେଳ କରାର ବିଷୟଟି ୩ : ୨୭  
ଓ ୬ : ୯୫ ଆୟାତର ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ ।

মৃত প্রথিবীকে জীবন দান সম্পর্কে ২ঃ ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে বিশ্লারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٤٠- وَمِنْ أَنْتَهُ أَنْ حَلَقْكُمْ مِنْ شَرِابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ يُنْجِزُونَ

৩০ : ২০ তাঁর (আল্লাহর) নির্দশন সমূহের মধ্যে একটি এই যে তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন এবং অতঃপর তোমরা মানুষ হিসেবে গোটা বিশ্বে ভড়িয়ে পড়েছ।

ମାନୁଷକେ ମାଟି ଥେକେ ସୃଷ୍ଟି କରାର ବିଷୟଟି ୨୦୨୪ ଏବଂ ୧୯୮୩ ଆମ୍ବାତ ଦୟେର ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେଛେ ।

সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে বহু কারণ ও প্রণালী এর জন্য দায়ী। সবচেয়ে বড় কারণ মানুষের স্থান পরিবর্তন (migration)। মানব জাতির শুরু থেকেই এই স্থান পরিবর্তন চলে আসছে। প্রাণীতিহাসিক বা প্রাথমিক মুগে গোষ্ঠী বা দলগতভাবে মানুষ ধান্য, পানি এবং পদচারণ ক্ষেত্রের তালাশে স্থান পরিবর্তন করতো। প্রাকতিক দুর্ঘোগে ক্ষত্রিতির পরিবর্তন যেমন

বরফমালার ধস, মহাদেশ সমূহের ক্রমাগত সরে যাওয়া এবং ভূমিকম্প ইত্যাদি মানুষকে স্থান পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। সম্প্রতিকালে বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপপুঁজের আবিষ্কার মানুষের দলে দলে স্থান পরিবর্তনে সাহায্য করেছে যেমন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও অসংখ্য দ্বীপপুঁজ।

কিন্তু এইসব দেশসমূহ প্রথম আবিস্কৃত হবার সময় যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও বিভিন্ন দ্বীপপুঁজে সভ্য জাতি সেইসব দেশের আদিম অধিবাসীদেরকে দেখতে পেয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহই মানুষকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافُ الْبَنِيكُمْ وَآلْرَبِّكُمْ  
رَأَى فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِلْعَلِيمِينَ ○

৩০ : ২২ এবং তাঁর (আল্লাহর) নির্দশন সমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও যমিনের সৃষ্টি, তোমাদের ভাষাসমূহ ও বর্ণের পার্থক্য। বস্তুত এই সবে জ্ঞানী লোকদের জন্য অসংখ্য নির্দশন রয়েছে।

আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি ২ : ১১৭ এবং ২ : ১৬৪ আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও সব মানুষ একই মূল থেকে সৃষ্টি তবুও মানুষের ভিন্ন ভিন্ন গায়ের রঙ ও ভাষাসমূহ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

মানুষের গায়ের রং শুধু তাঁর চামড়ায় সীমাবদ্ধ। চামড়ার বহিরাবরণের বিশেষ স্তরে ‘মেলানিন’ রংয়ের পরিমাণের ভিত্তিতেই গায়ের রং বিভিন্ন হয়। চামড়ার বহিরাবরণে পাঁচটি স্তর রয়েছে যাঁর নিম্নস্তরে অবস্থিত melanocyte কোষ। এ কোষ থেকে মেলানিন রং সৃষ্টি হয় এবং ক্ষুদ্র কণিকার মত হয়ে জমা হয়। এই রং বিশিষ্ট চামড়া সূর্যতাপের আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে (যা সকল গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহে বিদ্যমান) সেই রংয়ের কণিকাগুলো মুক্ত হয়ে চামড়ার বহিরাবরণের উপরিভাগের তৃতীয় স্তর (statum grannlosun) এ পুঁজীভূত হয়, যাঁর ফলে এই রংয়ের চামড়া দেখা যায়। অতিরিক্ত সূর্যতাপে এই আলোর প্রভাবে বেশী রং তৈরি হয় যা সূর্যতাপজনিত (suntan) বলে পরিচিত। তাই শীতপ্রধান দেশের লোকের চামড়ায় খুব কম মেলানিন রং থাকে বলে তাঁরা শ্বেতকায় বা বেশ গোরা। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের তুক বিভিন্ন রংয়ের কালো, শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট ইত্যাদি।

এই মেলানিন তথা তুকের কাল রংয়ের বিস্তৃতির উপর বংশ তথা ‘জিন্সের’ প্রভাব রয়েছে। তাই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে বহু শংকর রংয়ের শিশু জন্মলাভ করতে পারে। শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় রংয়ের লোকদের তুকের বিভিন্ন

ରଂଧର କାରଣ ଏହି ରଂଧର ପରିମାଣ ଓ ଉପସ୍ଥିତିର ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବର୍ତ୍ତମାନେ ବିଷେ ନାନା ରଂଧର ଲୋକ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଏ ।

٢٢-وَمِنْ أُلْيَّهُ مَنَامَكُمْ بِالْأَيْلَلِ وَالنَّهَارِ دَابِرْغَا وَكُمْ مِنْ نَضْلِلَهُ  
لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَمَعَّنُونَ ۝

୩୦ : ୨୩ ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାବଲୀର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ରାତେ ଓ ଦିନେ ତୋମାଦେର ସୁମ ଏବଂ ତାର ଅନୁଗ୍ରହ ଅବୈଷଣ । ଏତେ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରବଣକାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ରଯେଛେ ।

ଶରୀରେର ବିଶ୍ଵାମିକାଲୀନ ଅବଶ୍ଵାର ନାମ ହଚ୍ଛେ ଘୁମ ଏବଂ ତା ଶରୀରେର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରେ ଶକ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରେ । ଏହାଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରିକ, ମ୍ଲାଯୁତତ୍ତ୍ଵ, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ସମୟ ଶାରୀରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକେ ସଜ୍ଜିବିତ କରେ ତୋଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନିତ ଜାନାର ଜନ୍ୟ ପରିଶିଷ୍ଟ-୮ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

٢٣-وَمِنْ أُلْيَّهُ يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَزْفًا وَطَبَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَيْمَحِي بِهِ  
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

୩୦ : ୨୪ ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାବଲୀର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ-ତିନି ତୋମାଦେରକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ ବିଦ୍ୟୁତ, ଡଯ ଓ ତମସଧାରକାରୀ କ୍ଲାପେ ଏବଂ ତିନି ଆକାଶ ଥେକେ ବାରି ବର୍ଷଣ କରେନ ଓ ତାଦାରା ଭୂମିକେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରେନ; ଏତେ ଅବଶ୍ୟଇ ବୋଧଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ରଯେଛେ ।

ଭୀତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ର ବିଦ୍ୟୁତକେ ଏହି ଆଯାତ ୧୩ : ୧୨ ତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହେଁଥେ । ଆକାଶ ଥେକେ ବୃଷ୍ଟି ପାତେର ଫଳେ କୀତାବେ ମୃତ ପୃଥିବୀ ସଜୀବ ହେଁ ଓଠେ ତା ୨ : ୨୨, ୧୬୪ ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହେଁଥେ ।

٢٤-وَمِنْ أُلْيَّهُ أَن تَقُومَ الْكَمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَكُمْ دَعْوَةٌ مِنَ الْأَرْضِ  
إِذَا أَنْتُمْ تُخْرُجُونَ ۝

୩୦ : ୨୫ ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାବଲୀର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ତାରଇ ଆଦେଶେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ହିତି; ଅତଃପର ଆଶ୍ରାହ ଯଥନ ତୋମାଦେରକେ ଯାତି ଥେକେ ଉଠିବାର ଜନ୍ୟ ଏକବାର ଆହ୍ଵାନ କରିବେନ ତଥନ ତୋମରା ଉଠେ ଆସିବେ ।

আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত সবকিছুই যেমন নক্ষত্রাঙ্গি, প্রহ-উপগ্রহাদি, কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ, ছায়াপথ ও ছায়াপথে অবস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী ইত্যাদি এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল জীবন ও জড়বস্তু প্রকৃতির বিধান মেনে চলে। এই বিধানগুলো আল্লাহ নির্দেশিত এবং সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও আদেশাধীন। এভাবে আকাশ ও পৃথিবী তাঁর আদেশে পরিচালিত হয়। এই বিষয়টি আয়াত ৭ : ৫৪, ১৮৫ ও পরিশিষ্ট ১, ২ ও ৪ এ বর্ণিত হয়েছে।

○ ۱۶-وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ قَنْتُونَ ○

৩০ : ২৬ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।

এই বিষয়টি আয়াত ৫ : ১৯ এ বিবৃত করা হয়েছে।

۳۸-وَمَنْ أَلْتَهُ أَنْ يُرِسِّلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ ۝ ۴۹  
وَلِتَجْرِيَ الْفَلَكُ بِأَمْرِهِ ۝ وَلِتَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَلَمَلْكُمْ شَكْرُونَ ○

৩০ : ৪৬ তাঁর নির্দশনাবলির একটি যে তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আশ্বাদন করানোর জন্য; এবং যাতে তাঁর বিধানে জলবানগুলো বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সংস্কার করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের সুসংবাদকারী হিসেবে বাতাসের ভূমিকা সম্পর্কে এই আয়াত ৭ : ৫৭-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের বিষয়টি আয়াত ২ : ১৬৪ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

۴۸-اللَّهُ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيَاحَ تُبَشِّرُ سَهَابًا فِي السَّمَاءِ كَمَّا كَيْفَ يَسْأَءُ  
وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَرَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ ۝ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادِهِ ۝ إِذَا هُمْ يَسْتَبِّشُونَ ○

৩০ : ৪৮ আল্লাহ, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, কলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং ভূমি দেখতে পাও তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে

যাদের নিকট ইচ্ছা এটা পৌছিয়ে দেন, তখন তারা হর্ষোৎসুন্নত  
হয় ।

সুসংবাদদানকারী হিসেবে বাতাস সম্পর্কে ৭ : ৫৭ আয়াতে ব্যাখ্যা করা  
হয়েছে । কীভাবে একটি মেঘে জল হয়, বাতাসের সাহায্যে তা কীভাবে আকাশে  
উঠে যায়, আকাশের অধিকতর উচ্চতায় কীভাবে মেঘদল একটি বিস্তীর্ণ এলাকায়  
ছড়িয়ে পড়ে এবং কীভাবে মেঘের মধ্যস্থিত জলকণাসমূহ পরপর একীভূত হয়ে  
পানির ফেঁটায় পরিণত হয় যা আকারে ক্রমাগতে বড় হতে থাকে এবং এক  
পর্যায়ে তারী জলকণার ফেঁটাকে বাতাস আর ধরে রাখতে পারে না; তখন তা  
বৃষ্টির ফেঁটার আকারে মাটিতে পড়ে—এসব কিছুই আয়াত ২ : ১৬৪-এ ব্যাখ্যা  
করা হয়েছে ।

বাতাসে ভাসমান থাকা বিরাট মেঘদলের, সর্বত্র একই মাত্রায় তাপ,  
বায়ুচাপ ও বায়ুর গতি বিদ্যমান থাকে না । মেঘপুঁজিস্থিত এই তাপ, বায়ুচাপ ও  
গতির পরিবর্তনশীলতা যখন কোন নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখন মেঘের  
বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক গতির সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মেঘের প্রধান  
অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন খণ্ডাংশে ভেঙে পড়ে ।

আগেই এটা বলা সম্ভব নয় যে, ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক কোন স্থানে মেঘের এসব  
খণ্ডাংশ বৃষ্টিপাত ঘটাবে । কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বৃষ্টিপাত হওয়া বেশ কয়েকটি  
বিষয়ের একটি সম্ভিলনের উপর নির্ভর করে; যেমন— (১) মেঘের আকার ও  
প্রকৃতি এবং উচ্চতা, (২) বাতাসের গতি, (৩) বাতাসের তাপ ও আর্দ্ধতা, (৪)  
ভূপৃষ্ঠে অরণ্যের অবস্থিতি, এবং (৫) বাতাস প্রবাহিত হওয়ার বড় বড়  
প্রতিবন্ধকতা (উচ্চ পর্বত শ্রেণী) । মানুষের পক্ষে এ সকল বাধ্যবাধকতার উপর  
পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা সম্ভবপর নয় । একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তাঁর বায়ুমণ্ডলে  
কর্মসূত অগণ্য সংখ্যক শক্তির মাধ্যমে এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করেন ।

۵۸-۰َلَّهُ الَّذِي خَلَقَ مِنْ صُعْفَافٍ شَرْجَلَ مِنْ بَعْدِ صُعْفَافٍ قُوَّةً  
شَرْجَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةً صُعْفَافًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

৩০ : ৫৪ আল্লাহ, তিনি তোমদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে, দুর্বলতার পর  
তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য ।  
তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ।

মানব শিশু পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায় প্রাণী এবং নিজে থায়ে দাঢ়ান্তে  
পূর্বে শিশুটির পিতামাতা, আত্মায়-স্বজন ও পরিচর্যাকারীদের মেক বছর পর্যন্ত

সার্বক্ষণিক যত্নের প্রয়োজন। শৈশবকালের এই অসহায়ত্ব থেকে শিশু ক্রমাগতে বড় হয়ে হামাগুড়ি দিতে, হাটতে, কথা বলতে এবং সবশেষে ঘোবনে পদার্পন করে। এ সময় সে নিজেই নিজের দেখাশুনা করতে পারে। একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া তাকে দুনিয়া ও তার পরিবেশ সম্পর্কে জানার একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় যেটা তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন।

এই প্রাপ্তবয়স্কতা ৫০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত শক্তি সামর্থ ও কর্ম দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তারপর ক্রমাগতে এই শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। সবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তাকে শিশুর ন্যায় দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়তে হয়। জানা কোন অসুস্থতা ব্যতিরেকে এটা একটি সাধারণ পরিণতি এবং একে বার্ধক্যজনিত ক্ষয় বা দুর্বলতা নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে বার্ধক্যের স্থাভাবিক বয়স ৭০ বছর বা তার উর্ধ্বে। বয়সের দরুণ পলিত কেশের অর্থ হচ্ছে শ্বেত শুভ মাথা বা বৃদ্ধ বয়সের পাকা চুল।

চুলের ১০-এর পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে মেলানিন নামে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ নানা পরিমাণে চুলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চুলে মেলানিন না থাকলে এবং মেলানিন গঠনকারী পদার্থের কোষসমূহে অসংখ্য শূন্য স্থান থাকার ফলে চুল সাদা হয়ে যায়। যদিও পাকা চুল বৃদ্ধ বয়সের নির্দশন তবুও চুল পাকা হওয়ার বয়স নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। সাধারণত ৩০ বছরের পর থেকে চুল পাকা হতে শুরু করে। তবে সম্পূর্ণ পাকা হওয়ার কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই।

-خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ رَّوْدَهَا وَالْأَنْفُقَ فِي الْأَرْضِ رَوَابِيَ أَنْ تَبْيَدَ يَكُونُ  
وَبَئْرٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاهِيَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَبْيَانًا  
فِيهَا مِنْ كُلِّ شَارِدٍ كَرْبُوْرٍ

৩১ : ১০ তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তু ব্যতীত-তোমরা এটা দেখছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে চলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু। এবং আমিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্ধাত করি সব ধরনের কল্যাণকর উত্তিদ।

**স্তু ব্যতীত আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি**

১৩ : ২ নং আয়াতের প্রথমাংশে এটি আলোচিত হয়েছে।

পৃথিবীতে পর্বতমালার দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন

এটা ১৩ : ৩ সংখ্যক আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রত্যেক প্রকার উন্নত ধাগীর জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

আয়াতের এই অংশে উন্তিদের বেলায় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির প্রতি দিক নির্দেশ করে এবং তা আল্লাহ কর্তৃক আকাশে ছড়িয়ে থাকা মেঘের বারি বর্ষণের সহায়তায় সম্পন্ন হয়। ১৩ : ৩ নং আয়াতে এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

**هَذَا أَخْلَقُ اللَّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ مَا ذَأْخَلَنَّ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ  
بَلِ الظَّلَمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّسِيْنِيْنَ ۝**

৩১ : ১১ এই-ই হলো আল্লাহর সৃষ্টি। এখন দেখাও দেখি আল্লাহ ছাড়া অন্যেরা কী জিনিস সৃষ্টি করেছে। আসল কথা হল, এই যাতেম লোকেরা সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

মানুষের যে কোন সৃষ্টি যে মহান আল্লাহর সৃষ্টির তুলনায় নগণ্য সে বিষয়ে ১৩ : ১৬ আয়াতে বিজ্ঞানভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**أَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ بَأْنَى فِي التَّمَرُّوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ زِعْمَةً  
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُى  
وَلَا كِتَابٌ مُّنِيرٌ ۝**

৩১ : ২০ তোমরা কী দেখ না আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন ? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সবকে বিতো করে, তাদের না আছে পথ নির্দেশক আর না আছে কোন দীক্ষিমান কিতাব।

এ বিষয়টি আয়াত নং ১৬ : ১২ তে আলোচনা করা হয়েছে।

**أَلَمْ تَرَأَنَ اللَّهَ يُولِي لِلْأَيَّلَ فِي الْهَمَّارِ وَيُوْلِي لِلْهَارِ فِي الْيَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
كُلُّ شَيْءٍ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّىٰ وَأَنَّ اللَّهَ بِسَائِعَيْلَوْنَ خَمِيرٌ ۝**

৩১ : ২৯ তুমি কী দেখ না আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিগত করেন ? তিনি চন্দ্র সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবস্থিত ।

দিনের অভ্যন্তরে রাতের ও রাতের অভ্যন্তরে দিনের নিমজ্জন ।

আয়াত ৩ : ২৭ এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

### সূর্য, চন্দ্রকে নিয়মাধীন করণ

সূর্য, চন্দ্র ও আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, জ্যোতিকমণ্ডলী সবই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মের অধীন এবং এ বিষয়টি ৭ : ৫৪ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে । আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত প্রত্যেকটি বস্তুর দু'টি গতি রয়েছে, একটা স্থীর অক্ষের উপর ঘূর্ণন ও অপরটি কক্ষপথে পরিক্রমণ বা আবর্তন । আবর্তনের গতির কারণে আকাশমণ্ডলীর প্রতিটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট পথ বা কক্ষপথে পরিক্রমণ করে । কারণ, একটি একক বস্তু যখন মহাকর্ষীয় এলাকার মধ্যে স্থাধীনভাবে বিচরণ করে তখন কক্ষপথ একটি মোচাকৃতির অংশের হয় যেমন গোলাকার, উপবৃত্তাকার, অধিবৃত্তাকার, অথবা পরাবৃত্তাকার হতে পারে । অধিকাংশ কক্ষপথ উপবৃত্তাকার এবং অধিকাংশ গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ প্রায় গোলাকার । অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার কক্ষপথের ফল এমন দাঢ়ায় যে, কক্ষপথে পরিক্রমকারী বস্তুটি একটি অতি বৃহদাকার বস্তুর নৈকট্য থেকে এমন এক গতিতে দূরে সরে যায় যা এর সরে যাওয়ার গতির সমান অথবা এর চেয়ে বেশী হয়ে থাকে । আকাশমণ্ডলীর প্রতিটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে নিজস্ব পথে চলতে থাকে অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত যখন প্রত্যেকটি বস্তু গ্রহ-নক্ষত্রের আর একটির আকার ধারণ করে (যেমন সূর্যের একটি রঙবর্ণ দানবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে) । এ সকল গ্রহ-নক্ষত্র ধরে নেয়া হয় যে তিনি তিনি মেয়াদে অথবা তাদের সমাপ্তি পর্যন্ত পরিক্রমণরত থাকবে ।

-الْمَرْأَةُ الْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِرِزْكِهِ مِنْ أَنْتِهِ  
○لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ○

৩১ : ৩১ তুমি কী লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জলধানগুলো সমৃদ্ধে বিচরণ করে, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তার নির্দর্শনাবলির কিছু প্রদর্শন করেন? এতে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ।

জলপথে জাহাজের পরিক্রমণ ২ : ১৬৪ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এখানে উল্লেখিত কিছুসংখ্যক নির্দশন কিছু পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এ প্রসংগে আয়াত ২৭ : ৮১ দেখা যেতে পারে।

২২-إِنَّمَا يُغْشِيْهِمْ مَوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَّا بِجَهَنَّمْ  
إِلَى الْبَرِّ فِيهِمْ مُفْتَحُوا لَأَكْلِنَا كُلُّ خَلْقٍ كَثُرٌ  
○

৩১ : ৩২ যখন কেউ তাদেরকে আঙ্গুল করে মেষজ্বায়ার মত তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর অনুগত ও বিশুদ্ধ হয়ে। কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভূমিতে পৌছান তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে: কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নির্দশনাবলি অঙ্গীকার করে।

আয়াত নং ২৭ : ৮১ এর নিচের টীকা দেখুন।

২২-إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَعْلَمُ الْغَيْبَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ  
○

৩১ : ৩৪ ক্রিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত।

### জরায়ুতে যা আছে তা জানা

জরায়ুর অভ্যন্তরস্থিত গর্ভাধানের বিষয়টি বিবেচনা করলে দু'জন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্টি বস্তু (zygote) সম্পর্কে মানুষের খুব কমই জ্ঞান রয়েছে। মানুষের অবয়ব লাভ না করা পর্যন্ত ‘জাইগোট’ জরায়ুর মধ্যেই অবস্থান করে। ডিশাণু জরায়ুতে সমৃদ্ধ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর এই জাইগোট জরায়ুতেই থাকে এবং পরবর্তী রজ়স্ত্রাব বন্ধ থাকে। একটি মাসিক রজ়স্ত্রাব না হলে সাধারণত গর্ভাধারণের পরীক্ষা করা হয় এবং এভাবে ডিশাণু নিষিক্ষ হওয়ার পর প্রায় দু'সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়। মানুষের জানার বহু পূর্বেই কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন কখন গর্ভাধানের ঘটনাটি ঘটবে।

আধুনিককালে মানুষ জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভাধানের বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। এই পরীক্ষা pregnandiol -এর বাড়তি উৎপাদন ও নিঃসরণের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়। এই pregnandiol হচ্ছে জরায়ুর অভ্যন্তরে corpus luteum কর্তৃক জন্মান progesterone-এর নিঃসরণকৃত ফল।

যদিও গর্ভাবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু আগেই নিশ্চিত হওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞের লিঙ্গ সম্পর্কে দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোন কিছু জানা যায় না। গর্ভাবস্থার একেবারে শেষ পর্যায়ে জন্ম সম্বন্ধীয় কিছু গবেষণা ও জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা জ্ঞের লিঙ্গ নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু তাতে নিশ্চিত হওয়া কঠিন যদি না আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষায় জ্ঞের অবস্থান ঠিকভাবে থাকে।

যাহোক এই আয়াতে এমন দাবী করা হয়নি যে জরায়ুতে কী আছে তা মানুষ জানতে পারবে না। বরং এটাই বলা হয়েছে যে জরায়ু মধ্যস্থিত বস্তুর সঠিক জ্ঞান কেবল মাত্র এক আল্লাহর রয়েছে। এছাড়া গর্ভাধানের কিছু জটিলতা যেমন কোন আঁচিলের সৃষ্টি বা chorion epithelioma-এর উত্তর হওয়া এসব কিছুতে গর্ভাবস্থার পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক হয়ে থাকে এবং এরপ পরীক্ষা রোগীকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভুল পথে চালিত করতে পারে।

۴-اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ التَّمَوُّتَ وَالْأَرْضَ دَمَائِنَهُمَا فِي سَبَّةٍ أَيَّامٍ ثُرَّاسَتِي  
عَلَى الْعَرْشِ مَالِكُهُ قُرْنَ دُونِهِ مِنْ ذَلِّي وَلَا شَفِيقٌ أَنَّ لَأَتَعْدَنَ كُرْدَنَ  
○

৩২ : ৪ আল্লাহ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অঙ্গরূপ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি ‘আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই; তবু কী তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি ৭ : ৫৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

هـ يَدْ بِرُّ لِأَمْرِ مَنِ التَّمَاءُ إِلَى الْأَرْضِ ثُرَّ بِعْرَهُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ  
كَانَ مِقْدَارَهُ أَلْفَ سَنَةٍ تِمْنَاعَدُونَ  
○

৩২ : ৫ তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সবকিছুই তাঁর নিকট উত্থিত হবে- যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান।

ଆଲ୍-ହାତ୍ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳୀ ଥିକେ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବ କିଛୁଇ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କରେନ ତା ଆଯାତ ନଂ ୭ : ୫୪ ଓ ୭ : ୧୫୮-ତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହେଁଛେ । ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତେର ସମାନିର ପ୍ରସଂଗଟି ପରିଶିଷ୍ଟ ୧ ଓ ୨-ଏ ଆଲୋଚିତ ହେଁଛେ । ଆଲ୍-ହାତ୍ ଏକଟି ଦିନ ଯେ ଆମାଦେର ହିସାବ ମତେ ଏକ ହାଜାର ବର୍ଷରେ ସମାନ ହବେ ତା ୨୨ : ୪୭ ସଂଖ୍ୟକ ଆଯାତେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ ।

### ଏକଟି ଦିନେର ଗଣନା

ଆମାଦେର ହିସାବେ ଏକଟି ଦିନ ଅର୍ଥାଏ ଏକଟି ପାର୍ଥିବ ଦିନ ହେଁଛେ ପୃଥିବୀ ତାର ସ୍ଵୀଯ ଅକ୍ଷେର ଉପର ଏକବାର ଘୋରାର ଫଳ । ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରେ-ଟୁପ୍‌ଗ୍ରେ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଦିନେର ଏହି ଏକଇ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଯୋଗ କରା ହୁଏ ତାହଲେ ଏମନ ଅନେକ ଗ୍ରେ-ଟୁପ୍‌ଗ୍ରେ ଆହେ ଯାଦେର ଦିନ ପାର୍ଥିବ ଦିନ ଥିକେ ଅଧିକତର ଅନ୍ଧକାଳବ୍ୟାପୀ ଏବଂ କୋନ କୋନ ଗ୍ରେ-ଟୁପ୍‌ଗ୍ରେରେ ଦିନ ପାର୍ଥିବ ଦିନ ଥିକେ ଦୀର୍ଘତର । ଏତାବେ ଏକଟି ବୃହିମ୍ପତି ଦିନେର ଅର୍ଥ ହେଁଛେ ବୃହିମ୍ପତି ଗ୍ରେହର ସ୍ଵୀଯ ଅକ୍ଷେର ଉପର ଏକବାର ଘୂରେ ଆସାର ସମୟକେ ବୁଝାଯ । ଆମାଦେର ହିସାବେ ଦିନଟିର ସମୟେର ପରିମାଣ ୯.୯୬ ଘଟା ଅର୍ଥାଏ ଏକଟି ପାର୍ଥିବ ଦିନେର ଅର୍ଧକେରାଓ କମ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଏହି ଏକଇ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଏକଟି ଚାନ୍ଦ ଦିବସ ପୃଥିବୀର ୨୭ ଦିନେର ସମାନ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିରକ୍ଷୀଯ ଅଞ୍ଚଳେର ଏକଟି ଦିନ ପୃଥିବୀର ୩୧ ଦିନ; ବୁଧ ଗ୍ରେହର ଏକଦିନ ପୃଥିବୀର ୫୮ ଦିନ; ଆର ଶ୍ରୀ ଗ୍ରେହର ଏକ ଦିନେର ସମାନ ପୃଥିବୀର ୨୪୩ ଦିନ । ଆମାଦେର ଛାଯାପଥାନ୍ତିତ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର କ୍ଷେତ୍ରେ ସେ Milky Way (ଛାଯାପଥ) ରଯେଛେ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁଛେ ପୃଥିବୀର ଏକ ବର୍ଷରେ ହିସାବେ ୨୫ କୋଟି ବର୍ଷ । ସୁତରାଂ ଏଟା ସଥାର୍ଥଭାବେଇ ବଲା ଯେତେ ପାରେ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳିତେ ଏମନ ଅନେକ ଗ୍ରେ-ନକ୍ଷତ୍ର ରଯେଛେ ଯାଦେର ଏକ ଦିନେର ଘୂର୍ଣ୍ଣକାଳ ଆମାଦେର ପୃଥିବୀର ବର୍ଷରେ ହିସାବେ ୧୦୦୦ ବର୍ଷ । ତାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଯାତେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ୧୦୦୦ ବର୍ଷରବ୍ୟାପୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥେ ଧାରଣା କରା ଆଦୌ କଠିନ କିଛୁ ନଥ । ଏଥାନେ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନେର କଥା ବଲା ହେଁଛେ ତା ଏକଟି ଅତି ଦୀର୍ଘ ସମୟେର ଅର୍ଥେ ଗ୍ରହଣ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିଇ ଅନେକେ ଗ୍ରହଣ କରେଛନ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର ୫ :

1. J.C. Brandt, and S.P., Maran, *New Horizon in Astronomy*, W.H. Freeman and Company, San Francisco, p. 235, 1972.

أَوْلَمْ يَرୁ وَأَنَا تَسْوِقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجَرْبِيِّ لِتُخْرِجُ بِهِ تَرْزِعًا تَائِلُ مِنْهُ  
أَنْفَامَهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ أَفَلَا يُبَحِّرُونَ ୦

۸-الَّذِي أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَهُ وَيَدْأَخْلِقُ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ۝  
 ۹-شَرَقَ جَعَلَ نَسْلَةً مِنْ سُلَّمَةٍ مِنْ قَاءَ مَهِينٌ ۝  
 ۱۰-شَرَقَ سَرِيعًا وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُورَاتْفَمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ  
 قَلِيلًا مَا تَشَكَّرُونَ ۝

৩২ : ৭-৯ তিনি (আল্লাহ) যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই খুব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন আর মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি হতে। পরে তাদের বংশধারা সৃষ্টি করেন এক নিকৃষ্ট পানি জাতীয় বস্তু থেকে। পরে তাকে সুস্থাম করে গড়েছেন এবং তাতে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং চিন্তা শক্তি (দিল) অথচ তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রথম মানুষকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করার বিষয়টি ৬ : ২ আয়াতের সঙ্গে বিজ্ঞারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর মানুষের বংশধরদের যৌন মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এটাও ১৬ : ৪ আয়াতের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। মানব শিশুর সৃষ্টির জন্য যে পানি জাতীয় বস্তুর কথা বলা হয়েছে তাহলো পুরুষের বীর্য আর নারীর ডিষ্ট্রিগু যা ডিস্কোষ ফেটে বের হয়। এই দু'রকম জলীয় বস্তুই ইসলামের দৃষ্টিতে নাপাক বা অপবিত্র। এই কথার আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে শ্঵রণ করিয়ে দেওয়া যে তার সৃষ্টি একরকম ঘূণিত বা নাপাক বস্তু থেকে তাই তাদের সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে তাদের অহঙ্কার ও বিদ্রোহ করা অনুচিত।

সুস্থাম করে গড়া বলতে যাত্ত্বরায়তে ধীরে ধীরে নিজস্ব আকৃতিতে গড়ে উঠা বুবায় এবং এ বিষয়টি ২৩ : ১২-১৪ আয়াতগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যাত্ত্বগৰ্ভে জনের শরীরে আল্লাহর রূহ ফুঁকে দেওয়ার বিষয়টি আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সীমার বাইরে। আর শ্রবণ, দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তির সৃষ্টি সম্পর্কে ১৬ : ৭৮ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

৩২ : ২৭ ওরা কী লক্ষ্য করে না, আমি উষ্ণ ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে শস্য জন্মাই, যা থেকে খাবার গ্রহণ করে তাদের ‘আন্ধাম’ এবং তারাও। ওরা কি তবুও লক্ষ্য করবে না?

আকাশে মেঘের সৃষ্টি এবং ভৃগৃষ্ঠে বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আয়াত ২ : ২২-এ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। বৃষ্টিপাতের ফলে প্রত্যেক প্রকার শস্যের জন্ম সম্পর্কিত বিষয়টি আয়াত ৬ : ৯৯ ও ১৬ : ১১তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৃষ্টির উপকারী ফলাফল হিসাবে ঘাস, লতাপাতার জন্ম, গবাদিপশু সম্পর্কে ২০ : ৫৪ আয়াতের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

**١-الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ  
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○**

৩৪ : ১ প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুইয়েই মালিক এবং আবিরাতেও তাঁরই প্রশংসা। তিনি অজ্ঞাময় এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।

এই বিষয়টি আয়াত নং ২০ : ৬-এ আলোচিত হয়েছে।

**٢-يَعْلَمُ مَا يَلْجُرُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَأْتِي نُزُلُّ مِنَ الْكَمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ بِنُورِهِ  
وَهُوَ الرَّحِيمُ الرَّغِيبُ ○**

৩৪ : ২ তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত ও যা কিছু আকাশে উদ্ধিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

এই আয়াতে বেশ কিছুসংখ্যক বিষয় পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা ভৃগৃষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তা হচ্ছে (১) পানি মাটির ভিতর দিয়ে চুইয়ে গিয়ে নিচে ভূগর্ভে পানির আধার সৃষ্টি করে, (২) উদ্ভিদাদির শিকড় মাটির ভিতরে গিয়ে পুষ্টি সংগ্রহ করে গাছপালাকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রাখতে সাহায্য করে, (৩) উদ্ভিদাদি ও প্রাণীদেহ পচে গিয়ে শেষে মাটিতে মিশে যায়, (৪) মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশকারী প্রাণী তাদের বাসস্থান তৈরি করে নেয়।

মাটি থেকে যা বের হয়ে আসে তা হচ্ছে (১) মাটির মধ্যে বীজের অংকুরোদ্ধাম হয়ে তা মাটির উপরে পদ্ধতিত হয়ে উঠে; (২) পানির প্রস্তুত যা মাটির নিচ থেকে প্রবল বেগে বাইরে বেরিয়ে আসে; (৩) গ্যাস ও অনিজ তেল

যা মাটির নিচে থেকে তোলা হয়, এবং (৪) আগ্নেয়গিরি অগুৎপাতের ফলে মাটির অভ্যন্তর থেকে ধোঁয়া, গরম কাদা, পাথর ও গলিত লাড়া সবেগে বেরিয়ে আসে।

আকাশ থেকে নেমে আসা বস্তুর মধ্যে (১) বৃষ্টি, ঝড়-ঝঁঝঁা ও বজ্র-বিদ্যুৎ (২) সূর্য ও নক্ষত্রগুলীর রশ্মি বিকীরণ, (৩) উক্তা ইত্যাদি। যে সমস্ত জিনিষ মাটি থেকে আকাশে উঠে যায়, তার মধ্যে রয়েছে (১) বাল্প যা সূর্যের তাপে তৃপ্তির পানি বাল্প হয়ে উঠে যায়, (২) পৃথিবীতে সৃষ্টি ধোঁয়া ও গ্যাস, (৩) অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা যা উপরের বাতাসে মিশে গিয়ে বায়ুমণ্ডলে ভাসতে থাকে, (৪) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ধরনের যোগাযোগ বার্তাসমূহ।

উপরিলিখিত বিষয়াদির অতি সূক্ষ্মতম ক্ষুদ্র অংশের পরিচয় আল্লাহ তা'আলার জ্ঞাত। তিনি এ সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর সংঘটনের সুনির্দিষ্ট কলা-কৌশল স্থাপন করেছেন। এটা একটা কৌতুহল উদ্দীপক বিষয় যে বিজ্ঞানধর্মী এ সকল বিষয় বা বস্তু ব্যতীত কোন জীবিত প্রাণীর সৃষ্টি, গঠন বা বেঁচে থাকা সম্ভবপর ছিল না। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এ সকল বস্তুর যদি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে তা স্ফটার অশেষ অনুগ্রহের কথাই বলবে যদিও তার মধ্যে কোন কোনটি মানুষের কৃতকর্মের জন্য শাস্তির কারণ ঘটাবে। এ সকল আয়াতের বিষয়বস্তু মানুষের জীবন চক্রের চারদিকে আবেষ্টনকৃত ও স্বাভাবিকভাবে প্রাণ সুবিধাদি সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলতে উদ্বৃদ্ধ করবে।

وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّارًا لَا تَأْبِنْنَا الشَّاعِةَ فَلْ يُبْلِي وَمَرْقَنِي لَتَأْتِيَنَاكُمْ عَلَيْهِ الْعَيْنَيْنِ  
لَا يَرْجِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا  
أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

৩৪ : ৩ কাফিররা বলে, ‘আমাদের ক্রিয়ামত আসবে না।’ বল, ‘আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিচয়ই তোমাদের নিকট ক্রিয়ামত আসবে, তিনি অদ্য সবক্ষে সম্যক পরিজ্ঞাত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অনুপরিমাণ কিছু; বরং এর প্রত্যেকটিই লেখা রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

এ বিষয়টি আয়াত ১০ : ৬১তে আলোচিত হয়েছে।

وَأَقْلَمَ بِرْزَالِيٍّ مَابِينَ لَبَدِينَمْ وَمَا خَلَقْنَمْ مِنَ الْكَاءِ وَالْأَرْضِنِ إِنْ كَشَأْغَسْتُ  
بِهِمْ الْأَرْضَ تُؤْشَقْ عَلَيْهِمْ كَسْفًا مِنَ الْكَاءِ لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَعْلَمْ بِإِنْ كَبِيْنَبِ

୩୪ : ୯ ତାରା କୀ ତାଦେର ସାମନେ ଓ ପିଛନେ ଆସମାନ ଓ ସମିନେ ଯା ଆହେ  
ତାର ପ୍ରତି ଲଙ୍ଘ କରେ ନା? ଆମି ଇଚ୍ଛା କରଲେ ତାଦେରକେ ସହ ଭୂମି  
ଧସିଯେ ଦେବ ଅଥବା ତାଦେର ଉପର ଆକାଶ ଖଣ୍ଡେର ପତନ ଘଟାବ,  
ଆନ୍ତାହର ଅଭିମୁଖୀ ପ୍ରତିଟି ବାନ୍ଦାର ଜନ୍ୟ ଏତେ ଅବଶ୍ୟଇ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ  
ରହେଛେ ।

ଏଥାନେ ଆନ୍ତାହ ବଲଛେନ ଯେ, ମାନୁଷ ଗଭୀରଭାବେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ଯେ ଅତୀତେ  
ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳୀତେ କୀ ଘଟେଛେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେ କୀ ଘଟିବେ ପାରେ । ପୃଥିବୀ ଓ  
ଆକାଶମଣ୍ଡଳୀ ନିଯେ ଗଠିତ ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତେର ବୁଝାବାର ବା ଜାନାର ଅନେକ ବିଷୟ  
ଘଟନାର ଅନୁକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସାର ସଂକ୍ଷେପ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଆଦି ଯୁଗେର ପ୍ରଚାନ୍ଦ  
ଅଗ୍ନିଗୋଲକେର ବିକ୍ଷୋରଣେର ମାଧ୍ୟମେ ଏର ଶୁରୁ । ଏହି ସମ୍ପ୍ରାରଣଶୀଳ ମାଧ୍ୟମେର  
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାଯାପଥେ ଅବସ୍ଥିତ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସବଚେଯେ ପ୍ରାଚୀନ ନକ୍ଷତ୍ରସମୂହ ୧୦ ଶତ  
ଥିକେ ୧୫ ଶତ କୋଟି ବହୁ ପୂର୍ବେ ଗଠିତ ହେଯେ । ଛାଯାପଥଟି ଚ୍ୟାଙ୍ଗଟା ହେଯେ ଏକଟି  
ଚାକତି ସଦୃଶ ଆକାର ଧାରଣେର ପର ଗ୍ୟାସ ଓ ଧୂଲାବାଲିର ମେଘ ଥିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟର  
ଘନୀଭୂତକରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଯ । ପ୍ରାୟ ୪୫୦ କୋଟି ବହୁ ଆଗେ ପୃଥିବୀସହ ସୌରଜଗତେର  
ଏହ ଉପର୍ହାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଯ ।

୪୫୦ କୋଟି ବହୁ ଥିକେ ୬୦ କୋଟି ବହୁ ଆଗେର ଯୁଗକେ ପ୍ରି-କ୍ୟାମ୍ବିଆନ (Pre-cambrian) ଯୁଗ ବଲେ । ଏହି ଯୁଗେ ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରାଣେର ସଂଖ୍ୟାର ହେଯ । ସର୍ବପ୍ରଥମ  
ଏକକୋଣୀ ଜୀବେର ସୃଷ୍ଟି ହେଯ । ତାରପରେ ଜନ୍ୟ ନେଇ ଅମେରିନ୍‌ଦଣୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ  
ଜଲଜ ଉତ୍ତିଦେଇର । ୬୦ କୋଟି ବହୁ ଥିକେ ୨୦ କୋଟି ବହୁ ଆଗେର ପରିବର୍ଯ୍ୟାଣ୍ତି  
କାଳକେ Paleozoic ଯୁଗ ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ହେଯ । ଏହି ଯୁଗେ ପ୍ରଥମ  
ମେରନ୍‌ଦଣ୍ବବିଶିଷ୍ଟ ମାହେର ଜନ୍ୟ ହେଯ । ଏରପର ଉତ୍ତବ ହେଯ ଉଭଚର ଓ ସରୀସ୍ମ୍ପ ପ୍ରାଣୀର ।  
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗେର ନାମ ହଛେ Mesozoic ଯୁଗ । ଏ ଯୁଗେର ଶୁରୁ ହେଯ ୨୦ କୋଟି ବହୁ  
ଆଗେ ଏବଂ ଶେଷ ହେଯ ୬ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ବହୁ ଆଗେ । ଏହି ଯୁଗେ ଡାଇନୋସର ନାମକ  
ଦୈତ୍ୟକାର ସରୀସ୍ମ୍ପ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀତେ ଏକାଧିପତ୍ୟ ବଜାଯା ରାଖେ । ଏହି ଯୁଗେର  
ଶେଷଭାଗେ ଘୋଡ଼ାର ନ୍ୟାୟ ଶନ୍ତପାଣୀ ଜୀବେର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ ଏବଂ ଡାଇନୋସର ଜାତୀୟ  
ପ୍ରାଣୀ ବିଲୁଣ୍ଟ ହେଯ ଯାଯା । ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ହଛେ ବର୍ତମାନ Cenozoic ଯୁଗ । ୬ କୋଟି  
୫୦ ଲକ୍ଷ ବହୁ ଆଗେ ଏ ଯୁଗେର ଶୁରୁ ହେଯ । ଏ ଯୁଗେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ବହୁ ଆଗେ ମାନବ  
ଗୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ Homo sapiens -ଦେଇ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ ।

ପୃଥିବୀର ବର୍ତମାନ ଭୌଗଲିକ ଚିତ୍ର ଆଗେର ମତ ଯେମନ ଛିଲ ନା ତେମନି  
ବର୍ତମାନେର ନ୍ୟାୟ ଭବିଷ୍ୟତେତେ ଥାକବେ ନା । ପ୍ରାୟ ୫୦ କୋଟି ବହୁ ଆଗେ ପୃଥିବୀର  
କଠିନ ଭୂତ୍ବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ plate ସମୂହ ପରମ୍ପର ଦୃଢ଼ଭାବେ ସଂବନ୍ଧ ଥିକେ Pangaea  
ନାମକ ଏକଟି ମାତ୍ର ମହାଦେଶ ଗଠନ କରେ । ଏହି plate ସମୂହେର ଗଠନିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟେର  
କାରଣେ ପୃଥିବୀର ଭୂଗୋଳ କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତି ହେଯେ ଚଲେଛେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

বর্তমান গঠন কাঠামোয় পর্যবসিত হয়েছে। Plate সমূহের বিচলনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়ে চলেছে এবং এখন থেকে ৫ কোটি বছর সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বর্তমান আকৃতি ভিন্ন হয়ে যাবে। দক্ষিণ আমেরিকা উভৰ থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং আটলান্টিক মহাসাগর আরও প্রশস্ত হবে। অন্ট্রেলিয়া এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে আসবে এবং এছাড়া অন্যান্য আরও পরিবর্তন সাধিত হবে।

এটা আমদের জানা আছে যে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র স্থির নয়। পৃথিবীর আযুক্তাল অনুসারে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বিপরীতধর্মী হওয়া খুব তাড়াতাড়ি ঘটে। একবার যদি এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্র এক বা অন্যভাবে স্থির হয়ে যায় তাহলে কমপক্ষে এক লক্ষ বছর অথবা সর্বাধিক ৫ কোটি বছর ধরে এই স্থিরতা বজায় থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে। যে গতিতে দুর্বল হচ্ছে তাতে আগামী ২০০০ বছরের মধ্যে এই ক্ষেত্রটি অদ্ধ্য হয়ে যেতে পারে। চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের কার্যকলাপের একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে প্রাণের উন্নবের কাহিনীর সাথে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এরপ মত প্রকাশ করা হয়েছে যে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র যখন দুর্বল বা অনুপস্থিত থাকে তখন মহাকাশ থেকে বর্ধিত মাত্রায় বিদ্যুতায়িত বস্তুসমূহ, মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ ভূপৃষ্ঠে পড়ে জীবনের ক্ষতি করতে পারে। সাধারণত বিদ্যুতায়িত এ সকল বস্তু পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র দ্বারা প্রতিহত হওয়ার ফলে পৃথিবীতে পৌছতে পারে না। যদি নিরাপত্তামূলক এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্র না থাকত তাহলে ঐ সকল বিদ্যুতায়িত বস্তু সরাসরি পৃথিবীতে অথবা বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে নেমে এসে জীবনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াত। কিংবা তারা জলবায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত যা পৃথিবীতে জীবন ধারণকে কঠিন করে তুলত।

সূর্যের ভবিষ্যতের অবস্থার সাথে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কযুক্ত। সূর্য প্রায় ৬০০ কোটি বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার মধ্যে অবস্থান করছে এবং এই একই অবস্থায় সূর্য অনুরূপ আর একটি পর্যায়কাল অতিক্রম করবে। তারপর এটি একটি ভয়ঙ্কর অগ্নিগোলকে রূপান্তরিত হবে। এর বহির্ভূগ বুধ ও শুক্র গ্রহকে ধ্বাস করবে এবং তারপর এটি পৃথিবীর কক্ষপথে পৌছবে। প্রচণ্ড তাপে সমুদ্রের পানি টগ্বগ্র করে ফুটতে থাকবে। ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই অঙ্গারে পরিণত হবে। (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

সামগ্রিকভাবে নিখিল বিশ্বের ভবিষ্যৎ অবস্থার উপর পৃথিবীর টিকে থাকা নির্ভর করে। এই বিশ্বে দু'টি বিপরীতধর্মী শক্তি কাজ করছে, যেমন আণবিক বৌমার যে কেন্দ্রগত অংশ থাকে তা আদিযুগীয় ভয়ংকর এক বিস্ফোরণের কারণে

সম্প্রসারণশীল শক্তির উদ্ভব হয়। এই বিক্ষেপণের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তের সৃষ্টি হয় তাকে Big Bang নামে অভিহিত করা হয় এবং দ্বিতীয়ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে আকর্ষণকারী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সম্প্রসারণশীল শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে এবং এর ফলে এই বিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া থেমে যাবে এবং তখন সংকোচণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। আর যদি সম্প্রসারণ শক্তির বিজয় হয় তাহলে গ্রহ-নক্ষত্রাজি ধারণকারী ছায়াপথগুলো একে অপর থেকে আরো দূরে, বহুদূরে সরে যাবে। “যদি আমি ইচ্ছা পোষণ করতাম তাহলে তাদেরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করতাম” এ বিষয়টি ২৮ : ৮১ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

### তাদের উপর আকাশের একটি টুকরোর পতন ঘটান

তাদের উপর আকাশের একটি টুকরোর পতন এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে আকাশে অবস্থানরত একটি বস্তুর ভূপৃষ্ঠে পতন হচ্ছে। আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে একটি মহাশূন্য। পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের স্তর হচ্ছে বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলকে আবার বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে দূরবর্তী স্তর হচ্ছে exosphere যার ৫০০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৩০০ মাইল উচ্চতা থেকে শুরু। স্থানকার বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ভূপৃষ্ঠের চাপের ১০১৩ গুণ। এই উচ্চতার বাইরে আরও উঁচুতে বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানসমূহ মহাশূন্যে তাদের সংখ্যায় বিরলতা ও সরে যাওয়ার কারণে পারস্পরিক সংঘর্ষের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। অতএব এটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে যে মহাকাশ ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মাইল উচ্চতা থেকে শুরু হয়েছে। অতঃপর, ৩০০ মাইলেরও বাইরের কোন উচ্চতায় অবস্থানরত বস্তুকে মহাকাশের একটি টুকরো নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে শিলাপিণ্ডকে আকাশের টুকরো বলা যায় না।

মহাকাশের বস্তুসমূহ বলতে গ্রহ-উপগ্রহসমূহ, নক্ষত্রাজি, জ্যোতিষমণ্ডল, ছায়াপথসমূহকে বুঝায়। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মধ্যস্থিত বিস্তৃত বলয়ে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রাকৃতির বস্তু সূর্যের চারিদিকে অনন্তকালব্যাপী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। মহাকাশে অবস্থানরত এ সকল বস্তু গ্রহণু বা ক্ষুদ্রাকার গ্রহ নামে পরিচিত।

অন্তর্গত মহাশূন্যের সর্বব্যাপী অসংখ্য শিলা ও লৌহ খণ্ড বিদ্যমান এবং তাদের অধিকাংশই সূর্যের চারিদিকে ঘূরছে। আর কিছুসংখ্যক সৌর জগত বহির্ভূত মহাশূন্যের গভীরতা থেকে অতি দ্রুত বেগে সৌরজগতস্থিত গ্রহ

নক্ষত্রাবলির দিকে ধেয়ে চলেছে। প্রায় দশ কোটিরও অধিক এসব বস্তুখণ্ড প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বৃক্তে আছড়ে পড়ছে এবং নিরবচ্ছিন্ন স্থাতের ন্যায় বায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত হচ্ছে। যদি পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের এক্লপ পুরু আবরণ না থাকত তাহলে তারা অবিরত মাটিতে পতিত হত এবং ভূপৃষ্ঠ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চাঁদের পিঠের আকার ধারণ করত।

ভূপৃষ্ঠে পতিত এসব বস্তু উক্কাপিণ্ড নামে অভিহিত। বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড ঘর্ষণজনিত কারণে যে তাপের সৃষ্টি হয় তাতে এসব উক্কাপিণ্ডের অধিকাংশই বাস্পীভূত হয় অথবা পুড়ে গিয়ে সৃষ্টি ছাইকণায় পরিণত হয়। আমরা কেবল মাত্র গুটি কয়েক, সম্ভবত প্রতি ঘন্টায় অর্ধ ডজনের মত উক্কা দেখতে পাই যদি রাত্রে এককভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা যায়। অবশিষ্ট উক্কাপিণ্ড সম্পর্কে আর কথনও জানা যায় না, কারণ তারা সমৃদ্ধ, মরুভূমিতে অনাবাসিক অঞ্চলে গিয়ে পড়ে। আরও কারণ হচ্ছে এসব উক্কা দিনের বেলায় অথবা মেঘে ঢাকা অবস্থায় থাকে যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

এহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ ধরে মহাশূন্যে শত শত কোটি উক্কাপিণ্ড পরিক্রমণরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে কোন কোন ধূমকেতু থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। পৃথিবী স্থীয় কক্ষপথ পরিক্রমণকালে যখন কোন উক্কাপিণ্ডের বাঁককে বিদীর্ণ করে এবং বাস্তবে এটা অহরহ ঘটে, তখন হাজার হাজার শুন্দি বস্তু অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে প্রবল বেগে প্রবেশ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এর ফলে উক্কাপিণ্ডের বর্ণণ ঘটে। আধুনিককালে এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে ১৮৩৩ সালের নভেম্বর মাসে এক্লপ একটি বর্ষণের ঘটনা ঘটে যা আকাশে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় আড়াই লাখ পিওনসমূহ একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে। এই অবস্থানকে রশ্মি বিকীরণকারী অবস্থান নামে অভিহিত করা হয়। নক্ষত্রপুঁজের নামানুসারে উক্কাপাতের নামকরণ করা হয়ে থাকে এবং এই উক্কা পাতের মধ্যেই কোন একটি স্থানে রশ্মি বিকীরণকারীর অবস্থান রয়েছে বলে অনুমিত হয়। যেমন কোন কোন উক্কাপাতকে লিওনিদ, জেমিনিদ, ওরিওনিদ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এক্লপ নাম আরও রয়েছে।

কখনও কখনও অতি বৃহৎ উক্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে আঘাত হানে এবং তার ফলাফল হয় দর্শনীয়। এতবড় প্রকাণ্ড উক্কাপিণ্ডের পতনের উপর বায়ুমণ্ডলের গতি ত্রাসকারী ক্ষমতা কোন কাজে আসে না। অতএব এ সকল উক্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হেনে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ন্যায় বিরাটাকার গর্তের সৃষ্টি করে। উত্তর-

আমেরিকার আরিজোনার মরুভূমিতে একটি বিখ্যাত খাত রয়েছে। এই খাতের মুখ আড়াআড়িভাবে ১.২ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৭০ মিটার গভীর এবং এর আশপাশের এলাকার উপর প্রায় ৫০ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন একটি গোলাকার বেড় তৈরি রয়েছে। প্রায় ৩০টির মত প্রমাণিত উদ্ধা পাত সৃষ্টি খাতের তথ্য জানা গিয়েছে। এর মধ্যে কানাডার কুইবেকে মানকোয়াগণ (Manquagon) খাতটি এত বড় যে এর মুখ প্রায় ৬০ কিলোমিটার প্রশস্ত। এভাবে আকাশগঙ্গার বন্ধ হিসেবে পরিচিত উদ্ধাপিণ্ডসমূহ ভূপৃষ্ঠে যথানিয়মে পতিত হয়ে থাকে।

আকাশে অবস্থার বন্ধুসমূহের মধ্যে ধূমকেতুকেও অনুরূপ বন্ধু বিবেচনা করা হয়। বিশাল সৌরজগতের মধ্যে ধূমকেতু নিতান্তই তুচ্ছ এবং তা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিদৃষ্ট হয়। স্বীয় কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে এটি পরিক্রমণ করে। তবে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহগুলীর ন্যায় অনেক বেশী ভিন্নকেন্দ্রী। ধূমকেতু গ্রহগুলীর কক্ষপথের মধ্য দিয়ে অস্তর্কর্তাবে পরিক্রমণ করে এবং অবশ্যজ্ঞাবিভাবে গ্রহগুলীর সাথে সময়ে সময়ে সংঘর্ষ হয়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে একপ একটি ধূমকেতু পৃথিবীকে আঘাত করে। এই ধূমকেতুটি সাইবেরিয়ার আকাশে তীব্র আলো বিছুরণ করে জ্বলে যায়। তার বিক্ষেরণ ক্ষমতা এত বেশী ছিল যে হিরোশিমা ধ্বংসকারী আণবিক বোমার শক্তির ১০০০ গুণ বেশী ছিল। 'তুনগুসকা' নামে অভিহিত ঘটনাটি সম্ভবত মানব জাতির নিকট পরিচিত সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কোনোপ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যতিরেকেই এই বিক্ষেরণটি ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সকাল সোয়া সাতটায় এক আলোকিত সকালে ঘটে। ফ্রাস ও জার্মানীর আয়তন একত্রিত করলে যে পরিমাণ দাঁড়ায় তার থেকেও বেশী বিস্তৃত একটি অঞ্চলের উপর তুনগুসকা (Tunguska) -এর বিক্ষেরণ দেখা ও শোনা গিয়েছিল। এই বিক্ষেরণের পর বেশ কয়েক রাত ধরে ইউরোপের আকাশ উজ্জ্বল আলোয় এত দীপ্তিময় হয়ে উঠেছিল যে মধ্যরাতের পর দীর্ঘক্ষণ ধরে বইপত্র পড়তে পারা যেত। এটা এখন সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে ভূপৃষ্ঠে একটি শুদ্ধাকার ধূমকেতুর পতনের ফলে এ ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছিল।<sup>১</sup>

এভাবে আকাশের একটি বন্ধু হিসেবে ধূমকেতু ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। উপগ্রহ, গ্রহণ এসবই আকাশে বিচরণশীল বন্ধু। এটা এখন স্বীকৃত যে কমপক্ষে একটি গ্রহণ অভীতে ভূপৃষ্ঠে আঘাত হেনেছিল। আনুমানিক ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে অন্যান্য mesozoic প্রাণীর সাথে ডাইনোসর (dinosaurs) পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এ সকল দৈত্যাকার প্রাণীর পরিবর্তে স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবিভাব ঘটে। ১৯৮০ সালে একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এক বিজ্ঞানী

একদল বিজ্ঞানীসহ বার্কলেষ্ট্রিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ব্যাপকাকারে বিলুপ্তির ঘটনাটি ১০ কিলোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি গ্রহণগুরু ভৃপৃষ্ঠে সংঘাতের ফলে ঘটে।<sup>12</sup> এই সংঘর্ষের ফলে এত বিপুল পরিমাণ ধূলিকণার সৃষ্টি হয় যে বাযুস্তরে এই ধূলিকণা অতি কার্যকরভাবে কয়েক বছর ধরে সূর্যরশ্মিকে আটকে রাখে। এই সময়ে সালোক সংশ্লেষের প্রচণ্ড অবদমনের কারণে সমগ্র জীবজগতে এক মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে। জীবমগ্নের খাদ্য জোগান রাখায় হেদ পড়ার ফলে বিভিন্ন জীবের ব্যাপকাকারে অবলুপ্তি ঘটে।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুসারে আকাশ থেকে বিভিন্ন বস্তুর অংশবিশেষ নানা আকারে ভৃপৃষ্ঠে পড়ে। এটা অভীতে ঘটেছে এবং তাঁর মহান ইচ্ছানুসারে ভবিষ্যতেও অনুরূপ ঘটনার অবতারণা হতে পারে।

### তথ্যসূত্র :

1. New Scientist, Halley's Comet issue.
2. Ibid : Death of Dinosaurs.

۱۰۔ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاءَدِ مِنَّا فَضْلًاٌ بِعِجَالٍ أَقْبَنْ مَعَهُ وَالظَّلِيرُ وَالْكَلَالُهُ الْحَبِيدُ

۱۱۔ أَنْ أَعْمَلُ سِعْيَتٍ وَقَدْرُ فِي التَّرَدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا لِنِسْبَةِ مَا نَعْمَلُونَ بِعِصْدُ

৩৪ : ১০-১১ আমি নিক্ষয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, ‘হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাথী সকলকেও, তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লোহা যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে এবং বুনার পরিমাণ রক্ষা করতে পার এবং তোমরা সৎকাজ কর, তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।

আল্লাহ্ তা’আলার রহমত ও অনুগ্রহে দাউদ (আ) লোহা দ্বারা বর্ম তৈরির কৌশল শিখেছিলেন।

ইংরেজি বিশ্বকোষ এনসাইক্লোপিডিয়া ট্রিটানিকা অনুসারে লৌহ যুগের শুরু হয় ১২০০ প্রিস্টপূর্বাব্দে। লোহার প্রধান প্রধান আকরিক হচ্ছে এর অক্সাইড হেমাটাইট (oxides hematite) এফই২ ( $Fe_2$ ), ও৩ ( $O_3$ ), এবং ম্যাগনেটাইট (magnetite), এফই৩ ( $Fe_3$ ), ও৪( $O_4$ ), কার্বোনেট (carbonate), সিডেরাইট (siderite), এফইসিও৩ ( $Fe Co_3$ ) এবং পানিয়োজিত ফেরিক অক্সাইড (ferric oxides)। লোহার এ সকল আকরিক থেকে পানি দূর করার জন্য সাধারণত এগুলোকে তাপদণ্ড করা হয়, আর কার্বোনেট সমূহকে মূল উপাদান থেকে আলাদা করার জন্যও এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। ধাতব পদার্থ গলানর জন্য ব্যবহৃত চুলা blast furnace নামে অভিহিত বিশেষ চুলীতে এই তাপদণ্ড আকরিকসমূহকে কোক কয়লায় রূপান্তরিত করা হয়। যিশ্রিত লৌহ আকরিক, ধাতব যিশ্রিত হিসাবে ব্যবহৃত চুনাপাথর ও কোককে ব্রাঞ্ট ফার্নেসের একেবারে উপরে রেখে মুখ নলের মাধ্যমে ব্রাঞ্ট ফার্নেসের তলায় আগে থেকে উত্তপ্ত করে রাখা বাতাস দ্রুত প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে কঠিন পদার্থসমূহ ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসার সাথে সাথে সেগুলো গ্যাস ও তরল লোহা ও ধাতুমলে রূপান্তরিত হয়। এই বের হয়ে আসা উত্পন্ন গ্যাস ব্রাঞ্ট ফার্নেসের বাতাস গরম করার কাজে ব্যবহৃত হয়। গলে যাওয়া লোহা ও ধাতুমল ফার্নেসের তলদেশ থেকে বের করে নেয়া হয়।

গলে যাওয়া তরল লোহার মধ্যে সাধারণত ৩% থেকে ৪% দ্রবীভূত কার্বন থাকে, আর থাকে সিলিকন, ম্যাঙ্কানিজ, ফসফরাস ও সামান্য পরিমাণে সালফার। এরপ অপরিস্কৃত গলিত লোহা যদি হঠাতে করে শীতলীকরণ করা হয়

তাহলে খেতবর্গের ঢালাই লোহা পাওয়া যায় এবং এই শীতলীকরণ যদি ধীরে ধীরে করা হয় তাহলে ধূসর বর্ণের ঢালাই লোহা তৈরি হবে। এই উভয় প্রকার ঢালাই লোহা বেশ ভঙ্গুর প্রকৃতির। উপর্যুক্ত যৌগিকের ধূসর বর্ণের ঢালাই লোহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ দেওয়া হলে পিটিয়ে পাতলা করা যায় এমন পাতবিশিষ্ট ঢালাই লোহা পাওয়া যায় এবং এরপ লোহা বেশ শক্ত এবং সাদা বা ধূসর রং-এর ঢালাই লোহা থেকে কম ভঙ্গুর। এই আয়াতে এরপ পেটান পাতলা লোহার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে এবং যুদ্ধে এ ধরনের লোহা দ্বারা নানা প্রকার আঘৰক্ষাকারী বর্ম তৈরি করা যায়। এই বিষয়টি আয়াত নং ১৬ : ৮১ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

#### তথ্যসূত্র :

1. Linus Pauling, College Chemistry, Vakil, Feffer and Simons Pvt. Ltd. Bombay, 4th ed. p. 647-650, 1969.
2. Encyclopaedia Britanica, p. 894, 1978.

۱۰۔ وَلِسْكِنَ الْوَيْرَ خَدُلُهَا شَهْرٌ وَرَاهِهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَ الْعَيْنَ الْقَطْرُ  
وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُلْذِنَ رَبِّهِ وَمَنْ يُزِغُّ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا  
كُلُّ نَفْهٌ مِنْ عَدَابِ التَّعْبُرِ ۝

۱۱۔ يَعْتَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَحَارِبٍ وَكَالَّا يُلْبِلَ وَجْهَنَّمَ كَالْجَوَابِ وَقُلْدُورِ  
رُسْبَتِ لِعْنَمَوْأَلَ دَاؤَدَ شَكْرٌ وَكَلِيلٌ قِنْ عَبَادَى الشَّكُورُ ۝

৩৪ : ১২-১৩ আমি বায়ুকে সুলায়মানের অধীন করেছিলাম যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায়ও এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্তরণ প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহর অনুমতিক্রমে জিনদের মধ্যে কিছুসংখ্যক তার সামনে কাজ করত। ওদের মধ্যে যে আমার আদেশ অমান্য করে তাকে আমি জুলন্ত আগন্তের শাস্তি আবাদন করাব।

তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, হাওয়া সদৃশ বড় আকারের পাত্র এবং দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বড় আকারের ডেগ তৈরি করত। আমি বলেছিলাম, “হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বাস্তবের মধ্যে অল্লাই কৃতজ্ঞ।”

নবী সুলায়মান (আ)-এর আমলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে এই দু'টি আয়াত থেকে ধারণা পাওয়া যায়। আরাতের প্রথম অংশটিতে নবী'র (আ) বাতাসের উপর কর্তৃত করার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত এটি আয়াত নং ২১ : ৮১-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র। বাইদাভী ইবনুল কাহির-এর ন্যায় অতি উচ্চ মানের তাফসীরকারীর মতানুসারে নবী সুলায়মান (আ) এক বিরাটাকার সিংহাসনে আরোহণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশে বাতাস তা বহন করত। ১ আধুনিক ভাষ্যকারদের মতে এটা ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের আকাশ উপসাগর দিয়ে চলাচলকারী নবী'র (আ) নৌ-শক্তির প্রসংগে উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রতীকী অর্থে তিনি বাতাসকে নির্দেশ প্রদান করতেন। এই বিষয় নবী (আ) সম্পর্কে বাইবেলে উল্লেখিত বর্ণনার মিল রয়েছে (প্রথম বাদশাহগণ ৯ : ২৬,

৩৪ : ১৩ সংখ্যক আয়াতে দেখা যায় যে নবী সুলায়মান (আ) এর আমলে মৃতি, বড় বড় গামলা, বয়লার প্রভৃতি গলান লোহা দিয়ে তৈরি হত। এতে স্পষ্ট হয় যে ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কাজ সে আমলে সম্পাদিত হত। প্রত্তত্ত্ববিদগণের মতে লোহিত সাগরের মুখে প্রাচীন ইজিয়ান জেবার (Ezion Geber) নামে পরিচিত আকাবা অঞ্চলে লোহা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের খনি ছিল এবং সে আমলে এসব ধাতুর কাজ সম্পন্ন হত। এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে তামা ও লোহার খনি দেখতে পাওয়া যায় এবং একটি ধাতু গলান কারখানা খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে উক্তর দিক থেকে প্রবাহিত প্রচও বাতাসের একটি পরিপূর্ণ ঝাপটাকে যাতে ধরা যায় এবং হাপরের সাহায্যে বায়ুকে টেনে আনার অনুরূপ কোন পদ্ধতির প্রয়োজন ব্যতিরেকে জোরপূর্বক সৃষ্টি একটি প্রবল দমকা বাতাস গ্রহণের কৌশল সে আমলে বর্তমান ছিল। এই সমগ্র বিষয়টিই আধুনিক শিল্প কারখানার পদ্ধতি অনুযায়ী নির্মিত একটি সঠিক ব্লাস্ট ফার্নেস। আধুনিক শিল্প কারখানায় পূর্বের Bessemer system হিসাবে এর পূর্ণজন্ম হয়। এই Fertile Crescent -এর কোথাও এমনকি ব্যাবিলন বা মিসরেও এতবড় ফার্নেস দেখা যায় না।

আমেরিকান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল রিসার্চ-এর অধ্যাপক নেলসন গ্লুয়েক (Nelson Glueck) মধ্যাচ্ছের এই অংশে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলেন। তার মতে সুলায়মান (আ) ছিলেন একজন বিখ্যাত তামা বিশেষজ্ঞ বাদশাহ এবং খুব সম্ভবত প্রাচীন পৃথিবীতে সে আমলে বড় বড় তামা রপ্তানীকারকদের মধ্যে তার পরিচিতি ছিল। একটি বিষয় স্পষ্ট যে সুলায়মান (আ)-এর অধীনে খনি থেকে লোহা ও তামা বিপুল পরিমাণে আহরিত এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গলান হত। যাহোক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে লোহা ও তামা গলান রে জন্য সে সময়ে কোন যন্ত্রকৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং এজন্য সৃষ্টি খুবই উত্তপ্ত বাতাস নিয়ন্ত্রণ করা হত। এই গরম বাতাস কোন কৌশল উদ্ভাবন করে বেলুন তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারত।

ইতিহাসে দেখা যায় যে ১৭৮৩ সালে Montgolfier ভাত্বর্গ গরম বাতাসের সাহায্যে বেলুন ওড়ানোর কৌশল প্রথম উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে গ্যাসের সাহায্যে উপরে উঠার কাজটি প্রধানত হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা সম্পাদিত হয়। বর্তমানে দু'ধরনের বেলুন রয়েছে মুক্ত ও আবক্ষ। আবক্ষ বেলুনকে সামরিক প্রয়োজনে অথবা আঙুনকে নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে ব্যবহৃত হয়। ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে দশ থেকে ষাট কিলোমিটার উর্ধ্বের আকাশ অর্থাৎ আন্তর আকাশ

(stratosphere)-এর মহাজাগতিক রশ্মি ও বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এই আন্তর আকাশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মুক্ত বেলুন ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের বেলুন প্রায় ৭০,০০০ ফুটের ওপর উঠতে পারে। বেলুন বাতাসের সাহায্যে ভেসে বেড়ায় এবং এর মধ্যে স্থাপিত ব্যালান্স মুক্ত করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে উপরে উঠে যেতে পারে, আবার ভাস্তু খুলে দিয়ে গ্যাস ছেড়ে দিলে নিচে নেমে আসে। দক্ষতা ও আবহাওয়ার চমৎকার সংযোজন ঘটলে এরপ বেলুনে চড়ে ১০০০ মাইলেরও বেশী পথ সহজে পরিক্রমণ করা যায়। এটা অসম্ভব কোন ব্যাপার নয় যে নবী সুলায়মান (আ)-এর আমলে এরূপ কোন বেলুন উত্তীর্ণিত হয়ে থাকতে পারে যা আকাশে দীর্ঘ দূরত্বের পথ পাঢ়ি দিতে পারত।

### তথ্যসূত্র :

1. Muhammad, Shafi, Mariful Quran, Vol, p 254, 1983.
2. A Yusuf Ali, The Holy Quran-Text, Translation and commentary, Sheik Mohammad Ashraf, Lahore, 2nd Ed. p. 1137, 1977.

۱۹- فَأَعْرَضُوا فَإِنَّا عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَبَلَّ اللَّهُمْ بِمَحْسِنَاتِهِمْ جَلَّتِينَ  
ذَوَانٌ أَكْلَ حُمْطٍ وَأَقْلَ ذَهْنٍ وَمَنْ سَدَرْ قَلْبِيْلَوْ

৩৪ : ১৬ পরে তারা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করলাম এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে এমন দু'টি উদ্যানে পরিবর্তন করে দিলাম যাতে উৎপন্ন হয় বিশ্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ ও কিছু কুল গাছ।

এই আয়াতের ঠিক পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়েমেন-এর সাবা নগরীর প্রসংগে আলোচিত হয়েছে। সেখানে মা'আরিব নামক বিখ্যাত বাঁধ দিয়ে সেচের ফলে প্রাচুর পরিমাণে ফসল, বাগানে নানাবিধ ফলমূল, মশলা, গুগল, ধূনা প্রভৃতি জন্মে এবং ইয়েমেন সম্পদশালী হয়ে ওঠে। হ্যরত সুলায়মান (আ) ও রানী বিলকিস-এর আমলে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ১ শ্রীবৃন্দিশালীর এই আমল সুলায়মান (আ)-এর ইন্দ্রকালের পরেও বর্তমান থাকে। কিন্তু সাবা নগরীর জনগণ এই প্রাচুর্মের জন্য আল্লাহ'র তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার পরিবর্তে তাঁর নির্দেশিত পথ থেকে সরে এসে বেইমানী করে। ফলে মা'আরিব বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার আকারে তাদের উপর আল্লাহ'র ত্রৈধ নেমে আসে। বাঁধটি ধ্রংস হওয়ার কারণে নিয়মিত সেচের কাজ ব্যাহত হয় এবং ঐ এলাকায় খরা পরিস্থিতির উত্তর হয়। রসাল ফলমূলে পূর্ণ একদা সম্মুক্ষালী বাগানগুলো ক্রমাবর্যে শুকিয়ে পিয়ে মরুময় হয়ে ওঠে এবং মরুভূমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বোপ-ঝাড় ও কাটা গাছের সৃষ্টি হয়। এক্ষেপ মরুময় অবস্থায় জন্মানো দু'টি গাছের উদাহরণ এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে; গাছ দু'টি হচ্ছে- চিরহরিৎ ঝাউগাছ ও কাটাযুক্ত কুল গাছ। ঝাউ গাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক অভক্ষণযোগ্য ফল জন্মে। আর Zizyphus গোত্রের কুল গাছ তার কাটাযুক্ত ঝোপের জন্য কৃত্যাত, এই গাছ কোন ছায়া দেয় না এবং মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী তিক্ত কষাযুক্ত ফল উৎপাদিত হয়।

#### তথ্যসূত্র :

1. A. Y. Ali, The Holy Quran-Text, Translation and Commentary, Sheikh Mohammad Ashraf, Lahore, p. 1138 (1938).

۱۔ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلْكَ لِرَسُولِنَا أُبُونَا أَجْمَعِينَ  
مَشْفَعًا وَثَلَاثَةَ وَرْبَعَ مَرْبُودًا فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৩৫ : ১ প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই যিনি ফেরেশতাদের বাণীবাহক করেন যারা দুই দুই, তিনি তিনি অধিবা চার চার পক্ষ বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃক্ষি করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে সবিস্তারে পরিশিষ্ট-২ এ আলোচনা করা হয়েছে।

۲۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَلَتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْبُّ كُلَّ مُرْسَلٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَإِنَّ تُؤْفَكُونَ ۝

৩৫ : ৩ হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যক্তিত কি কোন স্মষ্টি আছে যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করে? তিনি ব্যক্তিত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছে?

আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করা হয় তা আয়াত ১৫ : ২১-এ আলোচিত হয়েছে।

۴۔ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّبِيعَ فَتْشِيدُ سَحَابًا فَسَعَنَهُ إِلَى بَلْكَ مَيْتَ فَأَحْيَنَاهُ بِالْأَرْضِ  
بَعْدَ مَوْتِهِ لَكَلَّا إِلَّا كُلُّ الْكُلُوبُ ۝

৩৫ : ৯ আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি তা দ্বারা ধরিদ্রীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুদ্ধান এভাবেই হবে।

আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের বিষয়টি আয়াত ২ : ২২-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

۵۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْسِنُ مِنْ  
أُنْثَى وَلَا تَضُمُ الْأَبْرَاجَ وَمَا يُعْتَرَفُ مِنْ مُعَتَرَّ وَلَا يُفْصَلُ مِنْ عُشْرَةِ أَلْفِيْ كَتَبَ  
لَكَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

৩৫ : ১১ আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, পরে জলীয় পদার্থ (নুঁকা) হতে, পরে তোমাদেরকে জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন।

কোন নারী আল্লাহর জ্ঞাতসারে ছাড়া গর্ভধারণ করে না বা সন্তান প্রসব করে না। বয়স্ক ব্যক্তি যখন বৃদ্ধ হয় অথবা কোন ব্যক্তির বয়স হ্রাস লাভ করে এ সবই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এবং আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।

মাটি থেকে এবং তেক্র বা নৃৎফা থেকে মানব সৃষ্টির বিষয়টি ১৬ : ৪ এবং ১৮ : ৩৭ আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। নারী পুরুষ এর জোড়া সৃষ্টি মানুষের ক্ষমতার বাইরে। বর্তমানকালে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে গর্ভস্থ সন্তান একটু বড় হলে ছেলে না মেয়ে তা জানতে সক্ষম। কিন্তু সন্তান ছেলে বা মেয়ে হোক এ বিষয়ে কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। জোড়া সম্পর্কে বলা যায় যে আল্লাহ পুরুষের নৃৎফা বা বীর্যে যে শুক্রকীট সৃষ্টি করেন তা জোড়ায় জোড়ায় থাকে অর্থাৎ শুক্রকীট সমূহের অর্দেক পুরুষ (২৩Y ক্রোমোজম) এবং অর্দেক নারী (23X)। যদি 23Y শুক্রকীট ডিস্কে সম্মিক্ষ (fertilise) করে তবে সন্তান মেয়ে আর যদি শুক্রকীট ২৩Y হয় তবে সন্তান ছেলে হবে। এতে বাবা-মা বা অন্য কারোর কোন হাত নেই।

এ ছাড়া মায়ের গর্ভের সন্তান সৃষ্টি ও স্বাভাবিক অথবা ক্রটিযুক্ত হতে পারে। আর কোন মা জীবিত সন্তান প্রসব করে, আবার কেউ মৃত সন্তান বা ক্রটিযুক্ত সন্তান প্রসব করে অথবা কারো সন্তান গর্ভপাতের মাধ্যমে নষ্ট হয়। এসবই আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে মানুষ অনেক পরে তা জানতে পারে। এই বিষয়ে পরিশিষ্ট-৫ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের বয়স কত হবে এ বিষয়েও একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

اَوْمَا يَسْتَوِي الْبَحْرُونَ ۝ هَذَا عَذْنُبٌ فَرَاتٌ سَالِيْعٌ شَرَابٌ وَهَذَا اَمْلَاحٌ اَجَاجٌ ۝  
وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَهُمَا طَرِيْعًا وَشَنَخْرِجُونَ حَلِيْةً تَلْبِسُهُنَّا ۝ وَتَرَى الْفَلَكَ  
فِيهِ مَوَاحِدٌ لِتَبْغَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّ كُمْ تَشَكَّرُونَ ۝

৩৫ : ১২ সমুদ্র দু'টি এককুপ নয়- একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি শোনা, খর। প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং অলংকার যা তোমরা পর এবং রঞ্জসমূহ আহারণ কর এবং তোমরা দেখ তার বুক চিরে জাহাজ চলাচল করে যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

প্রবাহিত পানির দু'টি ধরন রয়েছে। এটা ২৫ : ৫৩ সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াত নং ১৬ : ১৪তে গোশত, টাটকা ও নরম এবং সমৃদ্ধে জাহাজ চলাচলের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

۱۴-يُولَجُ الْيَلَ فِي التَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارَ فِي الظَّلَلِ وَسَحْرَ النَّسَنَ وَالقَمَرِ  
كُلُّ يَوْمٍ يَجْرِي إِلَيْهِ سَعْيٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لِهُ السَّلَكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ  
دُوْنِهِ مَا يَنْلَكُونَ مِنْ قَطْمَنِيْرُ

৩৫ : ১৩ তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; অত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।

দিনের মধ্যে রাত ও রাতের মধ্যে দিনকে অন্তর্ভুক্ত করানোর বিষয়টি আয়াত ৩ : ২৭-এ আলোচিত হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত করার বিষয়টি আয়াত ৭ : ৫৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব ৫ : ১৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

۱۵-إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مَّا لَخَرَجَنَّا بِهِ شَرَابٌ فَخَلَقْنَا أَوْلَاهَا  
وَمِنَ الْجَهَنَّمِ جُدَدٌ بِيَنْعُشُ وَحُمْرَهُ خَلَقْنَا أَوْلَاهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

৩৫ : ২৭ তুমি কী দেখনা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন এবং আমি তা ধারা বিচ্ছিন্ন বর্ণের ফলমূল উভূত করি। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচ্ছিন্ন বর্ণের পথ- সাদা, লাল ও নিকৃষ কাল।

এই আয়াতে প্রকৃতির তৃতীয় নির্দশনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যথা (১) আকাশ থেকে নিচে বৃষ্টি প্রেরণ, (২) বিভিন্ন রং ও বর্ণের ফলের উৎপাদন, এবং (৩) পাহাড়ে রং-এর নানা বৈচিত্র্য।

### (১) আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত

আকাশ থেকে ভারি বর্ষণ এবং গাছপালার উপর এর মঙ্গলজনক প্রভাব সম্পর্কে ২ : ২২ সংখ্যক আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

## (২) নানা বর্ণের ফলের উৎপাদন

জীবতাত্ত্বিক ঘটনাবলির ধারাবাহিকতার সূচনা হয় বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে, আর সমাপ্তি ঘটে ফলের উৎপাদনের সাথে। অপকৃ ফল-ফলাদির রং প্রায়ই সবুজ হয় এবং না পাকা পর্যন্ত পাখ-পাখালি, শন্যপায়ী প্রাণী ও পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছের সবুজ পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। ফল পাকতে থাকলে রং-এর পরিবর্তন ঘটে এবং নানা ধরনের প্রাণী ও পাখাদের আকর্মণের এটা একটা কৌশলও বটে। তারা পেকে যাওয়া ফলের বীজকে নানাদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পাকা ফলের হলুদ বর্ণ থেকে লাল রং-এর উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করার জন্য এক ধরনের পিঙল বর্ণের পদার্থ দায়ী। একে ক্যারোটিন বলে। আবার এ্যানথোসায়ানিন (anthocyanin)-এর প্রভাবে ধূসর বর্ণ থেকে বেগুনি, লাল অথবা নীল রং-এ পরিবর্তন ঘটে। যদিও আরবী “সামারাত” শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ফল-ফলাদি, তবুও এর অর্থ সকল খাদ্যশস্য বিশেষ করে সকালের খাবারের বেলাতেও প্রযোজ্য হয়। প্রাতঃরাশে যে খাবার যাওয়া হয় তা গর্ভাধানের ফলে সৃষ্টি ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। ডালকেও বীজ বলা যেতে পারে অথবা অন্যভাবে ফলের অংশ বিশেষ হিসেবে গণ্য করা যায় এবং বৃহত্তর ভাবধারায় আরবী “সামারাত”কে যদি ফল হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে ডালও ফলের অংশ বিশেষের পর্যায়ে পড়ে।

সংজ্ঞা যাই হোক না কেন ফলের রং-এর নানা রূপ বৈচিত্র্য এতই স্পষ্ট যে আমরা তা অবহেলা করতে পারি না এবং এসব কিছু মানুষ ও জীবজগতের জন্য আনন্দহর তরফ থেকে উদার দানশীলতা ভিন্ন আর কিছু নয়।

## (৩) পাহাড়-পর্বতাদিতে নানান রং-এর বৈচিত্র্য

নানান ধরনের পাথর দিয়ে গঠিত পাহাড়সমূহে রং-এর বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং এটা নির্ভর করে তাদের উৎপত্তির ধরনের উপর। অনেক প্রকৃতিবিদের চোখে এটা বেশ মনোরঞ্জনকর। অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ দ্বারা আংশিকভাবে গঠিত পর্বতমালার ডলোমাইট (dolomites— এক ধরনের খনিজ পদার্থ), চুনা পাথর, ও খড়িয়াটি প্রভৃতির রং সাদা ও ধূসর। মার্বেল পাথর সাধারণত সাদা থেকে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। এরপ পাথরের মধ্যে শিরা-উপশিরার ন্যায় কাল রং-এর দাগ দিয়ে যে অপূর্ব নকশার সৃষ্টি হয় তা দেখতে খুবই মনোমুগ্ধকর হয়। এক প্রকার কর্বুরৰ্বণ প্রস্তর বা মনি লাল ও সবুজ রং-এর স্ফটিকের ন্যায় শোভা পায়। ল্যাট্যারাইট (laterite) পাথর লাল বর্ণের এবং আগ্নেয়শিলা হচ্ছে কাল ধূসর থেকে কাল বর্ণের। পক্ষান্তরে চকমকি পাথরের রং হচ্ছে যোর কৃষ্ণ বর্ণের। গ্যালেনা (galena) পাথরে রয়েছে সীসার

ଗନ୍ଧକ ମିଶ୍ରଣ ଯା ଥେକେ ନୀଳାଭ ଧୂସର ରଂ ବେର ହେୟ ଆସେ । Fluorspar - ଏର ସବୁଜାତ ରଂ କ୍ୟାଲସିଯାମ ଫ୍ଲୁୱୋରାଇଡ - ଏର ଉପକ୍ରିୟର କାରଣେ ହେୟ ଥାକେ । ବଙ୍ଗାଇଟେର (bauxite) ମଧ୍ୟେ ଏୟାଲୁମିନିୟାମ ରଯେଛେ । ଏହି ଏୟାଲୁମିନିୟାମେ ନାନା ମାତ୍ରାଯି ଲୋହା, ସିଲିକନ ଅଥବା ଟାଇଟାନିୟାମେର ଅକସାଇଡ ମିଶ୍ରଣ ରଯେଛେ ଏବଂ ଏସବ ପାଥରେର ରଂ ସାଦା ଥେକେ ଲାଲ ରଂ-ଏର ମଧ୍ୟେ ଗାଡ଼ ବାଦାମୀ ହେୟ ଥାକେ ।

ପାହାଡ଼-ପର୍ବତାଦିର ପାଥରେର ମଧ୍ୟେ ରଂ-ଏର ଏହି ବିପୁଲ ବୈଚିତ୍ର୍ୟେର ମଧ୍ୟେ କ୍ୟାରେକଟି ଉଦାହରଣେର ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଗେଲ ମାତ୍ର । ପାଥରେର ଏକପ ନାନା ରଂ-ଏର ପଦାର୍ଥଗତ ଓ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର କାରଣେ ହେୟ ଥାକେ । ଏବଂ ଏସବଇ ଆଲ୍ଲାହର ସୃଷ୍ଟିତେ ଆଡ଼ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରଂ-ଏର ଅଂଶ ହିସେବେ ଅବଦାନ ରେଖେ ଚଲେଛେ ।

وَمِنَ النَّارِ وَالْوَآتِ وَاللَّاعِمِ مُخْتَلِفٌ أَوْاَنٌ كَذِلِكَ إِنَّمَا يَعْنَشُنَى لِلَّهِ مَنْ  
عَبَادَ وَالظَّلَمُوا لَئِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ

୩୫ : ୨୮ ଏତାବେ ରଂ ବେର-ଏର ମାନୁଷ, ଜନ୍ମ ଓ ଆନ୍ତାମ ରଯେଛେ । ଆଲ୍ଲାହର ବାଦାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ଜାନୀ ତାରାଇ ଆଲ୍ଲାହକେ ଡଯ କରେ; ଆଲ୍ଲାହ ପରାକ୍ରମଶାଲୀ, କ୍ଷମାଶୀଳ ।

ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆୟାତେ ନାନା ରଂ-ଏର ବୈଚିତ୍ର୍ୟେର ମୂଳ ଭାବଟି ଏହି ଆୟାତେଓ ବର୍ଣିତ ହେୟଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆୟାତେର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଚ୍ଛେ ମାନୁଷ, ସରୀସୃପ ଓ ଗବାଦିପତ୍ର । ମାନବ ଶରୀରେର ବହିରାବରଣେ ରଂ-ଏର ସେ ବିଭିନ୍ନତା ରଯେଛେ ତା ଆୟାତ ୨ : ୨୧୩ ତେ ଆଲୋଚନା କରା ହେୟଛେ ।

ଆରବୀ ଶବ୍ଦ 'ଦାଓୟାକ' ମୂଳ ଧାତୁ 'ଦାବ' ଥେକେ ଏସେଛେ । ଏର ଅର୍ଥ ହାମାଣ୍ଡି ଦେଓୟା ବା ବୁକେ ହାଁଟାଇ, ବୁକେ ହାଁଟେ ସେ ସବ ପ୍ରାଣୀ ଏକେ ସେ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର କରା ହେୟ ଯାର ଅର୍ଥ ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ସରୀସୃପ । ଏ ସକଳ ସରୀସୃପ ନାନାନ ବର୍ଣେର ହେୟ ଏବଂ ଗିରଗିଟିର ନ୍ୟାୟ ତାଦେର କୋନ କୋନଟି ଚାମଡ଼ାର ରଂ ବାଦାମୀ ଥେକେ ସବୁଜ ବା ଲାଲ ବର୍ଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରତେ ପାରେ । ଚାମଡ଼ାର ରଂ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ବିଷୟଟି ତାରା ଚାରପାଶେର ପରିବେଶେର ସାଥେ ମାନିଯେ ନେଇ । ସରୀସୃପେର ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ବର୍ଣ୍ଣବହୁ ଶ୍ରେଣୀଟି ହଚ୍ଛେ ସାପ । ଏଦେର ରଂ ସନ କାଳ ଥେକେ ସବଚେଯେ ଦଶନୀୟ ସବୁଜ, ହଲୁଦ ବା ବାଦାମୀ ହେୟ ଥାକେ । ତାହାଡ଼ା ଏଦେର ଚାମଡ଼ା ବହବର୍ଣେ ଚିତ୍ର-ବିଚିତ୍ର କିଂବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚଜ୍ଵଳ ରଂ-ଏର ସାଥେ ଫୁଟକିଓ ଦେଓୟା ହେୟ । ସରୀସୃପେର ଏ ସକଳ ବିଚିତ୍ର ରଂ ତାଦେରକେ ଶିକାରୀଦେର ହାତ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ନିଜେରା ଶିକାର ଧାରାର ସମୟ ଲୁକିଯେ ଥାକତେ ପାରେ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଶ୍ରୀଅମ୍ବଲୀଯ ଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରଚାର ବୃଷ୍ଟିପାତେର ଫଳେ ସୃଷ୍ଟ ଗହିନ ଅରଣ୍ୟେ ତାଇପାର ବା ବିଷଧର ସାପେର ରଂ ସବୁଜ, ମରଜ୍ବିମିର ମହାବିଷଧର ସାପ ଦେଖତେ ହଲୁଦାତ

বাদামী এবং ছোপ জঙ্গলের কেউটে সাপ কাল-বাদামী থেকে কাল। এ সকল সাপ যেখানে বাস করে তার চারপাশের রং-এর সাথে এরা মানিয়ে চলে ফলে সহজে চেনা যায় না।

‘আন’আম’ শব্দটির অর্থ গবাদি পশু যার মধ্যে গাড়ী, ঘাঁড়, মহিষ রয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে গৃহপালিত পশুকে বুঝায় যাদের কাছ থেকে দুধ, গোশত, চামড়া ও পশম আহরণ করা যায়। মহিষের রং সাধারণত কাল হয়। কিন্তু গরু, ঘাড়ের চামড়ার রং নানা রকমের হয় যেমন সম্পূর্ণ সাদা থেকে সম্পূর্ণ বাদামী এবং কাল ও ঘন বাদামী রং-এর ছোপ ছোপ পড়তেও দেখা যায়। ঘোড়া, উট, ছাগল ও ভেড়ার রং-এও বৈচিত্র্য রয়েছে এবং এটা নির্ভর করে তাদের জাতির উপর। গবাদি পশুর জাতিগত বৈশিষ্ট্যসহ এ সকল নানা ধরনের বর্ণ তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিনতে সাহায্য করে এবং তারা মানব সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সেবা প্রদান করে।

বস্তু জগত ও জীব জগতে রং-এর বৈচিত্র্য আমাদের সকলের নিকট প্রকাশ্য ও স্পষ্ট, কিন্তু একমাত্র জ্ঞানী লোকেরাই তা উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ্ তা’আলার মহাবিচ্ছৃণতাকে অনুধাবন করতে পারে।

### তথ্যসূত্র :

1. F. Steingass, Arabic-English Dictionary, Cosmo Publications, New Delhi, India, p. 351, 1884, reprint 1982.

۱۰- إِنَّ اللَّهَ يُسِّلِكُ النَّمُوتَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرْوَلَاهُ وَلَكُنَّ زَالَتْ  
إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ قُرْبًا لِلَّهِ كَانَ حَلِيمًا عَنْ فُرُورًا ۝

۳۵ : ۸۱ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ছাড়া কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ন।

আল্লাহ তা'আলা যে আসমান যমিনে সকল প্রাণী ও জড় বস্তুর সংরক্ষক তা আয়াত ۱ : ۲ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

۱۱- أَوْ لَغْرِيْبٍ رَّوْفِيْنِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ كُبُرِ الْمُمْلِكَاتِ  
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوْجًا وَمَا كَانَ اللَّهُ بِيُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَلَا  
فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا كَفِيرًا ۝

۳۵ : ۸۸ এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্ববর্তীদের পরিগাম কী হয়েছিল তা দেখতে পেত। ওরা তো এদের চেয়ে অধিকতর বলশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

এটি একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ যে জনগণকে জিজ্ঞাসা করা কে নবীর বাণী শ্রবণ করবে না এবং কুরআনকে মেনে চলবে না? তাদেরকে পরিভ্রমণ করতে হবে এবং দেখতে হবে যে আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী শক্তিশালী 'আদ ও ছামুদ গোত্রের দশা কী হয়েছিল। এ বিষয়টি আয়াত ۳ : ۱۳۷-এ আলোচিত হয়েছে।

۱۲- إِنَّمَا تَسْمَعُ شَيْءًا مِنْ السُّورَى وَرَكِنْتُمْ كَائِنَ مُؤْمِنًا إِنَّمَا فَمْ ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ وَاحْصَيْنَاهُ  
فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

۳۶ : ۱۲ আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা আগে প্রেরণ করে ও যা তারা পিছনে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

সব জিনিসের লিপিবদ্ধকরণের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হলে যদি সকল জিনিস বলতে সকল ঘটনাকেই বুঝান হয় তাহলে এই আয়াতটি বিজ্ঞানের

দৃষ্টিকোণ থেকে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করে। একটি ঘটনা কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের নির্দিষ্ট অবস্থার সদৃশ বা যুক্ত হয়। এরূপ অবস্থা সেই বিষয়ের সমৰ্থ ও প্রেরণার নির্দিষ্ট মূল্যবোধ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। এই মূল্যবোধ যেহেতু পরিবর্তিত হয় তাই সেই বিষয়ের অবস্থারও পরিবর্তন সাধিত হয়। একটি বলের মাটিতে পড়া একটি ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনাটি অর্থাৎ বলের মাটিতে পতনের পূর্বে বলের একাধিক ক্রমাবয় পরিবর্তন ও গতিবেগ দ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করে। একটি ইলেক্ট্রনের একটি পরিক্রমণ পথ থেকে আরেকটি পরিক্রমণ পথে লাফিয়ে যাওয়া একটি ঘটনা। আগুনীক্ষণিক জগতে ঘটা এই ঘটনাটি ইলেক্ট্রনের অবস্থান ও গতিবেগের ধারাবাহিকতাহীন (অর্থাৎ হঠাতে অথবা ঝাকুনিযুক্ত) পরিবর্তন দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। যখন একটি উক্তাণু একটি শ্রী ডিপ্পকোষের সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট (zygote— দুই জনন কোষের মিলনের ফলে উৎপন্নকৃত) গঠন করে তখন এই জাইগোট একটি ক্রমাবয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শিশু জন্মাহণ না করা পর্যন্ত এই পরিবর্তনের ধারা বজায় থাকে। ক্রমাবয়ে পরিবর্তনের এসব কিছুকেই একটি পর্যায়ক্রমিক অবস্থা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে একটি ক্রমাবয়িক ঘটনাবলি মাত্জনন কোষে জাইগোটের বিভিন্ন অংশের অবস্থান ও গতিবেগের ধারাবাহিক পরিবর্তন দ্বারা বিশিষ্টতা দান করা হচ্ছে। এরূপ পরিবর্তনের সংখ্যা সংখ্যাতীত ভাবে বিশাল। অতঃপর প্রশ্ন উঠতে পারে যে গণনার অতীত এ সব ঘটনাবলি কিভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব? এমনকি যদি আগুনীক্ষণিক পর্যায়ে এ সকল পরিবর্তনের একটি হিসাব রাখতে সক্ষম হইও তবুও সকল ঘটনার খুঁটিনাটি হিসাবের জন্য বিশালায়তনের জায়গার প্রয়োজন হবে। এ প্রসংগে কম্পিউটার যন্ত্রের ক্রমোন্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে যা আমরা চার দশক ধরে দেখে আসছি। গোড়ার দিকের বৈদ্যুতিক কম্পিউটারসমূহে ভাল ব্যবহার করা হত, কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয় ট্রানজিটর। ট্রানজিটর আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে অণুপরিমাণ বিদ্যুৎ পরমাণুর (microelectrons) উন্নয়ন কল্পনাতীতভাবে দ্রুত হয়েছে। ভালু, ট্রানজিটর, সমন্বিত সার্কিট (Integrated Circuits-IC), ব্যাপকাকার সমৰ্থ (Large Scale Integration-LSI) এবং খুবই ব্যাপক সমৰ্থন (Very Large Scale Integration-VLSI) ইত্যাদি হচ্ছে মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়। বর্তমানে অতি স্ফুরাকার প্রতিক্রিপ্তের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে,  $1 \times 1$  আয়তন বিশিষ্ট জায়গায় ১০ লক্ষেরও অধিক বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ সংযোজন করা যায়। একটি মাইক্রো প্রসেসর-এর আকার একটি ডাক টিকেটের আয়তনের সমপর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে। মাটের দশকের গোড়ার দিকের বড় আকারের একটি কম্পিউটার যে

କାଜ କରତେ ପାରତ ତା ଏଥିନ ଏକଟି ପକେଟ ଆକାରେର କ୍ୟାଲକୁଲେଟର କରତେ ପାରେ । ଏତାବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟାରେର ଆକାର କ୍ରମାବୟେ ଛୋଟ ହୁୟେ ଆସଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଦେର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଓ ଗତି ବେଡ଼େ ଚଲେଛେ । ଖୋଦାଇ କରା ବିଦ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ରେ କାରିଗରି ଦକ୍ଷତା ଏତିଇ ବୃଦ୍ଧି ପେଯେଛେ ଯେ, ଏକଶତ ବହୁ ଆୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନଶାୟ ସତ କଥା ବଲବେ ହାତେର ତାଲୁ ଥେକେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଏକଟି ଚାକତିର ମଧ୍ୟେ ତା ସଂରକ୍ଷଣ କରା ଯାବେ । ଶ୍ରେ ବିଜ୍ଞାନେର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥେକେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶରସମ୍ମହକେ ଘଟନାବଳି ବଲା ଯାଯ ଏବଂ ତା ଯେମନ ସଂରକ୍ଷଣ କରା ଯାଯ ତେମନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ପୁନର୍ଗଠନଓ କରା ଯାଯ ।

ଏହି ପ୍ରସଂଗେ ଯେ ବିଷୟେର ଉପର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଓଯା ଯାଯ ତା ହଛେ ଯଦି ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ଆଲାର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବେ ମାନୁଷ ଏତବେଶ କାରିଗରୀ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରେ ଯା ଏକଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘଟନାବଳି ସଂରକ୍ଷଣ କରା ଯାଯ ତାହଲେ ମାନୁଷେର ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଵୟଂ ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ର ଅପରିସୀମ ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ଷମତାବଳେ ସବ ଜିନିସେର ରେକର୍ଡ କେନ ରାଖିତେ ପାରବେନ ନା? ତବେ ଏଟା ଠିକ ଯେ ସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣେ ଆଲ୍ଲାହର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କେ ଆମରା କିଛୁଇ ଜାନି ନା । କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣେ କ୍ରମାବୟ ଅଗ୍ରଗତିର ଦିକେ ତାକାଲେ ଆମରା ମାଇକ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରାନ୍‌ରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକ ବୈପ୍ରବିକ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଯା ଚଙ୍ଗିଶେର ଦଶକେର ଗୋଡ଼ର ଦିକେ କଳନାତୀତ ଛିଲ ଏବଂ ସେ ସମୟ ଟ୍ରାନ୍‌ଜିଟ୍‌ଟର ଆବଶ୍ୱତ ହୟନି । ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍‌ର ଭବିଷ୍ୟାଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକତର ଅଗ୍ରଗତି ମାନୁଷକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟାତେର ଏକଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କେ ଅବହିତ କରତେ ପାରବେ ।

٣١-۰۱. أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَمْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ الْقُرْبَانِ لَأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

୩୬ : ୩୧ ତାରା କୀ ଦେଖେ ନାହିଁ ତାଦେର ପୂର୍ବେ ଆମରା କତ ଜାତିକେ ଧର୍ମ କରେଛି  
ତାରପର ତାରା ଆର ତାଦେର ନିକଟ ଫିରେ ଆସେ ନି ।

ଏ ବିଷୟାଟି ୭ :୪ ଆୟାତେର ସମେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଥେ ।

୦-୩୩. وَإِذْ لَهُمُ الْأَرْضُ الْيَتَةُ ۝ لَهُبِّنَاهَا وَأَخْرَجْنَاهَا مِنْهَا حَبَّاً فَيَنْهُ يَا أَكْلُونَ ୦

୦-୩୪. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَبَتٍ مِّنْ تُخْبِيلٍ ۝ دَاعِنَابٍ ۝ وَفَجَعْنَا فِيهَا مِنَ الْعُجُّونِ ୦

୩୫ : ୩୩-୩୪ ଏହି ଶୋକଦେଇ ଜଳ୍ୟ ନିଷ୍ପାଗ ସମିନ ଏକଟି ନିଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ।  
ଆମରା ଏକେ ଜୀବନ୍ତ କରି, ତା ହତେ ଫୁଲ ଉପର କରି ଯା  
ଏବା ଥେଯେ ଥାକେ । ଆମରା ତାତେ ଥେଜୁର ଓ ଆକୁରେର ବାଗାନ  
ତୈରି କରି ଏବଂ ତା ହତେ ବାର୍ଣ୍ଣଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରି ।

মৃত যমিনকে জীবন্ত করার বিষয়টি ২ : ১৬৪ আয়াতে, খাদ্য উৎপাদন, খেজুর ও আঙুর বাগান সৃষ্টির বিষয়টি ৬ : ৯৯ আয়াতে এবং বর্ণাধারা সৃষ্টির কথা ২ : ৬০ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٠- سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ كَلَّهَا مَنَّا شَبَّثَتِ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِنَ الْأَنْعَمِ

৩৬ : ৩৬ পবিত্র মহান সেই সত্ত্বা, যিনি সব রকমের জোড়া পঞ্চদা করেছেন, তা যখিনের উজ্জিদেই হোক অথবা মানব জাতির মধ্যেই হোক অথবা সেইসব সম্পর্কে যা তারা এখনও জানে না।

প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে জোড়া সৃষ্টির বিষয়টি ১৩ : ৩ আয়াতে বলা হয়েছে। এখানে মানুষের মধ্যে নর-নারী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। মানুষের পুরুষ বা নারী সন্তান সৃষ্টির ব্যাপারে কোন হাত নাই এবং সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণকারী একমাত্র আল্লাহ। এ বিষয়ে ৪ : ১ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এই সঙ্গে ৫৩ : ৪৫-৪৬ আয়াতদ্বয়ের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক।

٢١- وَإِنَّهُ لَهُمْ إِلَيْنَا تَسْلُكُونَ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ

৩৬ : ৩৭ ওদের জন্য এক নির্দশন রাত, তা থেকে আমি দিনের সৃষ্টি করি। এবং দেখ তাদেরকে অঙ্ককারে নিমজ্জিত করি।

একটি নির্দিষ্ট স্থানে দিগন্তের উপরে সূর্য যে সময়ে অবস্থান করে তা হচ্ছে সেখানকার দিনের সময়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে দিন অপসারিত হয়, তখন সূর্য দিগন্তের নিচে নেমে যায় এবং দৃষ্টির আড়াল হয়ে পড়ে। তখন সেখানে রাতের সূচনা হয়, আর সে স্থানটি অঙ্ককারে নিমজ্জিত হয়। দিন ও রাতের এই বিষয়টি ৩ : ২৭ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

٢٢- وَالشَّمْسُ تَنْهَىٰ لِسْتَسْعَىٰ لَهَا ذَلِكَ تَقْرِيرٌ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

৩৬ : ৩৮ এবং সূর্য ভৱণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, তা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণে।

এই বিষয়টি আয়াত ৭ : ৫৪-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

## ٥٩- وَالْفَسَرَ قَدْنَةً مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْمُرْجُونِ الْقَدِيرِ

৩৬ : ৩৯ এবং চন্দ্রের অন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনজিল; অবশেষে  
তা তকনো বাঁকা, পুরনো খেজুর ডালের আকার ধারণ করে।

সময় পরিমাপের মাধ্যম হিসেবে চাঁদের আলোচনা আয়াত নং ১০ : ৫-এ  
করা হয়েছে।

**كَلِّيْنِ فَلَكِ يَكْبَثُونَ**  
**وَكُلِّيْنِ يَشْبَغُنِيْنِ تَذْرِكَ الْقَسْرَ وَلَا يَلِلْ سَابِقُ النَّهَارِ**

৩৬ : ৪০ সূর্যের পক্ষে সম্বৰ নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে  
সম্বৰ নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং অভ্যোকে নিজ নিজ  
কক্ষপথে সাংতার কাটে।

**সূর্য কর্তৃক চাঁদকে আঁকড়িয়ে ধরা**

দু'টি বস্তু যখন একত্রে থাকে অর্থাৎ একই অবস্থানে বিদ্যমান হয় তখন একে  
অপরকে আঁকড়িয়ে ধরা বলে। সমশ্রেণীভুক্ত বস্তু যখন একই অবস্থানে থাকে  
তখন গণিত শাস্ত্রানুযায়ী দু'টি বস্তুর একই অবস্থান বুঝায়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিন  
প্রকার সম-শ্রেণীভুক্ত বস্তুর প্রচলন রয়েছে : উচ্চতা-দিশ্বলয়, আকাশের  
মহাবিস্তার-দৈর্ঘ্য এবং সঠিক আরোহণ ও ক্রম নিম্নগমন। উচ্চতা দিশ্বলয় হচ্ছে  
স্থানীয় স্থানাংক অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে যেমন দেখা যায়। এক  
স্থান থেকে দেখা হলে দু'টি বস্তুর একই উচ্চতা-দিশ্বলয় থাকতে পারে। কিন্তু  
অন্যান্য স্থান থেকে দেখলে সমশ্রেণীভুক্ত এ সকল বস্তুকে সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন  
হিসাবে দেখা যায়। যদিও আকাশের মহাবিস্তার ও দৈর্ঘ্য বিশ্বজৰীন, হিন্দু  
জ্যোতির্বিদ্যা ব্যতীত অন্য কোথাও এর কোন চৰ্চা নেই। সমশ্রেণীভুক্ত বস্তু,  
সঠিক আরোহণ ও ক্রম নিম্নগমন সর্বজনীন এবং এর ব্যবহার সাধারণে  
প্রচলিত। এই সম্বলনের বেলায় সূর্যের ও চন্দ্রের সঠিক প্রভাব (অথবা গ্রীনিচ-এর  
সময় কোণ) একই থাকে, কিন্তু ক্রম নিম্নগমনের বেলায় তা হয় ভিন্ন। সূর্য  
গ্রহণের সময় সূর্য ও চন্দ্রের এই সমশ্রেণীভুক্ত দু'টি বস্তু একই থাকে। অতএব  
একটি এস্ত মনে হয় সূর্য চন্দ্রকে ধরে ফেলেছে। তবে এই দু'টি বস্তু  
বিমাতান্বিত যেমন আকাশমণ্ডলীতে অবস্থানরত সকল গ্রহ-উপগ্রহকে পৃথিবী  
থেকে একই দূরত্বে রয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু পৃথিবী থেকে দূরত্বের ব্যাপারে  
তৃতীয় একটি মাত্রা রয়েছে। মহাকাশে এই দু'টি বস্তুর মধ্যকার দূরত্ব বিশাল।

তাই সূর্য গ্রহণের সময় সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যকার দ্রুত্ত্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার। অতএব সূর্য কখনও চন্দ্রকে ধরে ফেলার যোগ্যতা রাখে না বা তাকে এরপ অনুমতি দেওয়া হয় নি।

### রাত দ্বারা দিনকে পিছনে ফেলে যাওয়া

'রাত দিনকে কখনও পিছনে ফেলে যেতে পারে না'-এই কথার অর্থ হচ্ছে, রাত দিনের কোন অংশের নাগাল ধরতে পারে না। দিগবলয়ের নিচের অবস্থানে সূর্য থাকলে সেটা রাত, আর দিঘলয়ের উপরে থাকলে দিন হবে। সূর্য কখনও একই সময়ে দিঘলয়ের উপরে বা নিচে একই অবস্থানে থাকতে পারে না। সুতরাং একই স্থানে একই সময়ে রাত ও দিন হতে পারে না। তাই, এভাবে বলা যায়, রাত কখনও দিনকে পিছনে ফেলে যেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আয়াত ৭ : ৫৪ এর আলোচনা দেখা যেতে পারে।

### প্রত্যেকে তার স্বীয় কক্ষপথে পরিক্রমণ করে

সূর্য ও চন্দ্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করার বিধান সম্পর্কে আয়াত ৭ : ৫৪ তে আলোচনা করা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে চন্দ্র ও সূর্য স্ব স্ব কক্ষপথে সবচেয়ে সঠিক ও অর্তীব সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া স্বচ্ছন্দে ভেসে চলেছে। তারা তাদের স্বষ্টা নির্দেশিত বিধান অনুসরণ করে অতি সতর্কতার সাথে স্বীয় পথ পরিক্রমায় রত আছে এবং তাদের কখনও প্রারম্পরিক সংবর্ধ হয় না।

وَإِنَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرَيْتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ

وَلَقَبَ الْمُهُومُ مِنْ قَبْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

৩৬ : ৪১-৪২ তাদের এক নির্দশন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই জলাধানে আরোহন করিয়েছিলাম; এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহন করতে পারে।

একটান্নিশতম আয়াতটিতে নৃহ নবীর (আ) কিশৃতির কথা বলা হয়েছে, যাদের করে মহাপ্লাবনের সময় তাঁর অনুসারীদের বহন করা হয়েছিল। যিয়াম্বিশতম আয়াতে মহাপ্লাবন পরবর্তীকালে নির্মিত জাহাজের কথা বলা হয়েছে।

নোকা, জাহাজ বিষয়ক ব্যাপারটি ২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

وَمَنْ نُعِزِّهُ كُنَّكُنَّهُ فِي الْخَلْقِ أَنَّلَا يُعْقِلُونَ ٠٧٨

৩৬ : ৬৮ যে ব্যক্তিকে আমরা দীর্ঘ জীবন দেই তাঁর দেহের গঠনকেই আমরা উচ্চিয়ে দেই। এটা দেখেও কী তাদের কোন জ্ঞান হয় না?

বৃদ্ধ নর-নারী অনেক সময় শিশুদের মত দুর্বল এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি ৩০ : ৫৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে শিশুদের মত দুর্বল হয়ে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَذَلِكَنَّهَا لَهُمْ قَبْنَهَا رَبُّهُمْ وَمِنْهَا يَا كُلُونَ ٠٧٩

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبٌ أَنَّلَا يَشْكُرُونَ ٠٨٠

৩৬ : ৭২-৭৩ আমরা এগুলোকে এমনভাবে তাদের আয়ত্তাখীন করে দিয়েছি যে, এগুলোর (গৃহপালিত পত) কারো উপর তারা সওয়ার হয় আবার কোনটার গোশ্ত তারা খায়। আর এদের মধ্যে তাদের জন্য আরো অনেক কল্যাণ রয়েছে এবং এদের থেকে পানীয় (দুধ) পেয়ে থাকে। এদের কি শোকন করা উচিত নয়?

প্রথম আয়াতে (আয়াত ৩৬ : ৭১) গৃহপালিত গবাদি পশু সম্পর্কে বলা হয়েছে যাদের কিছু আমাদের বোৰা বহন করে, মানুষ পিঠে সওয়ার হয় এবং কোন কোনটির গোশ্ত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে ১৬ : ৫, ৭ ও ৮ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আর প্রাণী থেকে উৎপাদিত দুধ সম্পর্কে ১৬ : ৬৬ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

أَوْ لَهُرَى إِلَّا نَسَانٌ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ ٠

৩৬ : ৭৭ মানুষ কী দেখে না যে, তাদেরকে আমরা উকুর্কীট থেকে সৃষ্টি করেছি? অথব এখন সে প্রকাশ্য বিরোধী হয়ে উঠেছে।

নৃত্বা থেকে মানব সৃষ্টির বিষয়টি ১৬ : ৪, ১৮ : ৩৭ ও ৩৫ : ১১ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

أَلَيْهِنِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الرَّخْضَرِ نَلَمْ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِلُونَ ٠

৩৬ : ৮০ তিনি তোমাদের সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন তৈরি করেন এবং তোমরা তা দ্বারা আগুন জ্বালাও ।

পবিত্র কুরআনের একেবারে গোড়ার দিকের তাফসীরকারক সাহাবী হযরত ইবন আবুস (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি এই আয়াতের সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন তৈরির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরব মরুভূমিতে জন্মান পত্রবিহীন ঝোপ মারখ-এর প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।<sup>১</sup> Forskal<sup>২</sup> মূলত এই তৃণের বর্ণনা দেন, যিনি এর নামকরণ করেন *Cynanchum pyrotechnica* Forsk। পরবর্তীকালে এই তৃণটি *Pyrotechnica* (Forsk) Decne নামে পরিচিতি লাভ করে। তৃণটির সবুজ ডালপালার মধ্যে বাতাসের সাথে ঘর্ষণজনিত কারণে আগুন ধরে যায় এবং এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এর লেখক *pyrotechnica* নাম দেন। ডালপালায় ঘর্ষণ লাগলে আগুন ধরে যায়, এই বিশেষত্ব প্রাচীন আরবদের জানা ছিল। আগুন জ্বালাবার জন্য তারা যিনাদ (zinad) নামে একটি কাঠের যন্ত্র ব্যবহার করত। এই তৃণের দু'টি শাখা এই যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করা হত-এর উপরের অংশের নাম ছিল 'আফার বা যানদ এবং নিচের অংশকে মারখ বলা হত। এই ডাল দু'টির পরম্পর ঘর্ষণের ফলে আগুনের সৃষ্টি হত।<sup>৩</sup> ইস্পাত ও চকমকি পাথরে ঘর্ষণের ফলে আগুন তৈরির পদ্ধতি প্রবর্তনের পূর্বে আরববাসীরা আগুন জ্বালাবার এই কৌশল ব্যবহার করত।

মিগাহিদ<sup>৪</sup> (Migahid) তাঁর *Flora of Saudi Arabia* থেকে এই গাছটির আরবী নাম মারখ বা সাদাদাহ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একে পত্রবিহীন গুল্ম বা ৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট অসংখ্য দীর্ঘ সরু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত গাছ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আরবী শব্দ 'শাজারাল আখদারি'-এর অর্থ সবুজ বৃক্ষ এবং এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এর একটি বিশেষ তৎপর্য রয়েছে। সবুজ ক্লোরোফিল-এর কারণে সবুজ গাছপালা বায়ুমণ্ডলের শোভা লাভ করে এবং এর পাতা দ্বারা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সৌর শক্তি গ্রহণ করে। তারপর কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে যা কার্যকর অবস্থায় শক্তি সঞ্চয় করে রাখে। রাসায়নিক আকারে এই বোতলজাত সৌর শক্তি তৃণটির শাখা-প্রশাখায় ঘর্ষণের ফলে এক শক্তিশালী আলো ও তাপের আকারে বেরিয়ে আসে।

#### তথ্যসূত্র :

1. M. Hamidullah, Early Muslim Contribution to Botany, Science in Islamic Polity, pp 216-222, 1983.
2. P. Forskal, flora of Aegyptiaco-Arabica, Beirut, p. 53, 1775.
3. A. Y. Ali, The Holy Quran-text, translation and commentary, Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore, p. 1188, 1938.
4. A. M. Migahid, Flora of Saudi Arabia Vol. 1, 2nd edn. Riyadh University Publications, 1978.

## ○ ۱۷-۲۰ میرزا جیلانی گفتگوں

৩৬ : ৮২ তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন, ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়।

এই আয়তে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তা’আলা যে কোন ঘটনা ঘটাতে পারেন। আমরা যখন কোন ঘটনার কথা বলি তখন এও বলি যে, ঘটনাটি অধিক অথবা কম বিশ্বাসযোগ্য। আমরা কখনও কখনও বলতে উদ্ধৃত হই যে, এটা একটা অসম্ভব ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি একটি বল উচু পাহাড়ের দিকে কার্যকর শক্তির চাইতে কম গতিশক্তি ব্যবহার করে গড়িয়ে দেয় তাহলে যে কেউ বলবে যে, বলটির পাহাড় অতিক্রম করে যাওয়া একটি অসম্ভব ঘটনা। কিন্তু সংখ্যা তাত্ত্বিক বলবিদ্যার (quantum mechanics) ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ক্ষুদ্রের বলবিদ্যা যা বৃহৎ পদার্থের বলবিদ্যা থেকে নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং নিউটনীয় বলবিদ্যা নামে খ্যাত) কেউ একথা বলতে পারে না যে, এই ঘটনা ঘটা অসম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিক বলবিদ্যা যে কোন ঘটনার সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এভাবে একটি ঘটনা খুব উচু মাঝায় সম্ভাব্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, কিন্তু তাকে অসম্ভব বলা যাবে না। একটু আগে উল্লেখিত সম্ভাব্যতার বিস্তৃতিকে ‘তরঙ্গ কার্যক্রম’ (wave function) নামে অভিহিত করা হয়। সংখ্যা তাত্ত্বিক বলবিদ্যা বলে যে এমন কী যদি বলের গতিবেগ এমন হয় যে, এর গতি শক্তি পাহাড়ের উচ্চতায় এর কার্যকর শক্তির চেয়ে অধিকতর কম তাহলে বলটির পাহাড় পার হয়ে যাওয়ার একটি সীমিত সম্ভাবনা থাকে। পরিভাষাগতভাবে একে ‘সংখ্যাতাত্ত্বিক সূড়ঙ্গপথ’ (quantum tunneling) নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ কার্যকর প্রতিবন্ধকতার সমস্যার ক্ষেত্রে এ ধরনের সূড়ঙ্গপথে অসমর হওয়া পরীক্ষামূলকভাবে এর সত্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, যদি একটি ক্ষুদ্র পদার্থ  $1/2$  এমভি $^2$  ( $1/2mv^2$ ) গতিবেগ শক্তির সাথে উচ্চতা  $V$  (height V) এর একটি কার্যকর প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে নিষ্কেপ করা হয় এবং  $1/2$  এমভি $^2$  ( $1/2mv^2$ ) যদি  $V$  ( $V$ ) থেকে কিছুটা ক্ষুদ্র হয় তাহলে এই ক্ষুদ্র পদার্থটি অধিকাংশ সময় প্রতিবর্ষিত হবে এবং কখনও কখনও প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারবে। প্রতিবন্ধকতার ঘട্য দিয়ে প্রেরণের সম্ভাব্যতা প্রতিবন্ধকার সম্ভাব্যতা থেকে অবশ্য অনেক কম হবে। একটি সজ্ঞানকারী যত্ন পাহাড়ের একদিকে এবং আর একটিকে পাহাড়ের অপরদিকে স্থাপন করা রেতে পারে। প্রথম সজ্ঞানকারী যত্নের কল যেখান থেকে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র পদার্থটি নিষ্কেপ করা হয়েছে, যদি তিপে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং উদাহরণ

স্বরূপ একটি আলোর ঝলকানি দেখা যায় তাহলে আমরা জানতে পারব যে, বলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যদি পাহাড়ের অপর দিকে স্থাপিত যন্ত্রটির কল টিপে দেওয়া হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে, নিষ্কিণ্ঠ পদার্থটি প্রেরিত হয়েছে। নিজে সৃষ্টি সমস্যাটি এরূপ যে, একই প্রাথমিক গতিশক্তির জন্য একই গুণসম্পন্ন পদার্থ কখনও কখনও প্রতিবিহিত হয় আবার কখনও কখনও উপর দিয়ে চলে যেতে পারে। পদার্থটি প্রতিবিহিত হবে, না অতিক্রম করে যেতে পারবে তা কে নির্ধারণ করবে? Squires<sup>১</sup> তার 'Mystery of the Quantum World' নামক সাম্প্রতিক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি দু'টি ভূমিকা আরোপ করেছেন। বর্তমান আয়াতটির প্রসঙ্গে প্রথম ভূমিকাটি যথাযথ এবং নিচে তা উদ্বৃত্ত করা হল :

"প্রথম ভূমিকাটি হল পচন্দ তৈরির যা একটি পরিমাপ তৈরি হলে প্রয়োজন হয়। সংঘাত্য পরিগতির একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি থেকে এই পরিমাপ নির্বাচন করে। এরূপ একজন ঈশ্বর পৃথিবী থেকে সকল দিখা বা স্থির লক্ষ্যের অভাব দ্রৰীভূত করেন। আর তিনি নিজেই সে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম তাড়িত নয়। যদিও ঐতিহ্যগত পরিভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত নয় তবুও একজন ঈশ্বরের গৃহীত ভূমিকার সাথে যুক্তিসঙ্গতভাবে সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি পৃথিবীর সকল বিষয়ে খুবই সক্রিয় হবেন এবং তার নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে তিনি হবেন সর্বশক্তিমান। পদার্থবিদ্যার বিধানানুযায়ী তার আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী হবে একবারেই অসম্ভব (লক্ষ্য করুন যে, এই অধ্যায়ে আমরা কোন গুপ্ত বৈষম্যকে আমলে আনছি না) যদিও ধর্মতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বিশ্বাস করতে চাইব যে, নির্বাচিত পচন্দসমূহের কমপক্ষে কয়েকটি সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। অন্যথায় আমরা এলোমেলো অবস্থার মধ্যে ফিরে যাব এবং ঈশ্বরের পক্ষে তার ভূমিকা পালন করা সম্ভবপর হবে না। এখানে উল্লেখ করা বেশ চমকথন্দ হবে যে, ঈশ্বরের এই ভূমিকা অলৌকিক ঘটনাবলিকে এমন কি স্থীকার করে নিতে পারে যদি আমরা এরূপ অলৌকিক ঘটনাকে অতি অসম্ভাব্য বলে ধরে নিই। কারণ, এ সকল ঘটনা একেবারে সুনির্দিষ্ট ও অস্বাভাবিক। ত্রৈশী পচন্দ ব্যতিরেকে কার্যকরভাবে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। উদাহরণস্বরূপ, সংখ্যাতাত্ত্বিক তত্ত্বানুসারে একটি অবশ্যই ক্ষুদ্র কিন্তু শূন্যবিহীন সংঘাতার অনুপাত থাকবে যে, আমি যদি দৌড়ে দেয়ালের মধ্যে গিয়ে পড়ি তাহলে আমি এর মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাব। কার্যকর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম পরীক্ষার এটা একটা বিশেষ ঘটনা এবং বামদিকের wave function ও তারপর প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে প্রেরণ কখনও সম্পূর্ণ শূন্য হবে না। তাহলে

প্রেরণের জন্য সম্ভাব্যতা অনুপাত যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন একজন ঈশ্বর যদি পছন্দ করেন, তিনি পরিণতি হিসাবে একে নির্বাচন করতে পারেন।

ইসলাম ধর্মে আমরা কেবল একমাত্র একক এক আল্লাহকে বুঝি এবং তাঁরই কেবল সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে কোন অসম্ভব ঘটনার পরিণতি বাহাই করার। তিনি চান যে তা ঘটুক এবং অতঃপর তিনি বলেন “হও”, আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়।

মহানাদ (Big Bang)-এর মাধ্যমে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি বিশ্বায়কর ঘটনা এবং বাস্তবিকপক্ষে তা গ্রীষ্ম আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি শুরু হয় একটি নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে যেখানে বিশ্বের সকল পদাৰ্থ কেন্দ্রীভূত ছিল। কেউ হয়ত যথার্থভাবে প্রশ্ন করতে পারেন যে, একটি একক বস্তু কীভাবে সীমাহীন শক্তি ধারণ করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে এক্সপ্রেস উন্নত দেওয়া কঠিন। কাউকে এটা ধরে নিতে হবে যে, সমগ্র বিশ্বটি ছিল অনন্যসাধারণ একক এবং মহানাদ (Big Bang) থেকে সময়ের শুরু। ধরে নেওয়ার বিষয়টি হচ্ছে বিশ্বাসের একটি শর্ত এবং পরবর্তীকালের ঘটনাবলি যথার্থে পরিমাপের সাথে ব্যাখ্যাযোগ্য যদি কেবলমাত্র প্রাথমিক হঠাত বিস্ফোরণকে সীকার করে নেওয়া হয়। তবে একজনের পক্ষে এই উন্নত দেওয়া সম্ভব হবে না যে, এই আকস্মিক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করেছিল। কেউ হয়ত সংখ্যাতাত্ত্বিক অস্থিরতার (quantum fluctuations) পরিভাষা অনুসারে এর একটা ব্যাখ্যা দাঢ় করানোর চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু ঘটনাটি সম্পর্কে কোন সম্ভোজনক উন্নত পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইসলাম ধর্মানুসারে এক এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। একমাত্র আল্লাহই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মহানাদ ঘটাবার এবং তা যত সম্ভাব্যহীন হোক না কেন, এটা তাঁর সীয় ইচ্ছার এখতিয়ারাধীন। আল্লাহ তা'আলার আদেশ “হও” নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির অকুস্তুল তৈরি করতে পারে এবং একইভাবে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় পর্যায়ে পদাৰ্থের গঠন ও বিস্তার সম্ভবপর হয়।

### তথ্যসূত্র :

1. Evan Squires, *The Mystery of the Quantum World*, Adam Hilger Ltd. Bristol and Boston, pp 66-67, 1986.

## ٥- مَرْبُتُ الْمَهَارَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغارِيقِ

৩৭ : ৫ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সব কিছুর প্রভু  
এবং সকল উদয়স্থলের।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভু আল্লাহ। এ বিষয়টি আয়াত ৫ : ১৯ এ  
আলোচিত হয়েছে।

### সকল উদয়স্থলের প্রভু

এই আয়াতটির বর্ণনানুসারে অনেকগুলো পূর্বদিক রয়েছে অর্থাৎ অনেকগুলো  
অবস্থান রয়েছে যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং আল্লাহ এ সকল অবস্থানের  
প্রভু।

আমরা জানি যে, পৃথিবীর দু'ধরনের গতি রয়েছে। একটি হচ্ছে স্থীয় অক্ষের  
উপর একবার ঘূর্ণনের আক্ষিকগতি, আর অপরটি সূর্যের চারদিকে স্থীয় কক্ষপথে  
একবার সুরে আসা, যাকে বার্ষিক গতি বলে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের বার্ষিক গতির  
কক্ষপথ একটি বিবাটাকার বৃত্ত, একে সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমণ পথ বলে। এই  
বার্ষিকগতির কারণে বছরের বিভিন্ন দিনে আকাশে সূর্যকে সৌর অয়নবৃত্তে বিভিন্ন  
অবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। আর পৃথিবীর আক্ষিক গতির ফলে সূর্যকে বিভিন্ন  
বৃত্তাকারে আকাশে আড়াআড়িভাবে অবস্থান করতে দেখা যায়। তাই বিভিন্ন  
অবস্থানে সূর্যকে উঠতে ও অন্ত যেতে দেখা যায়। কার্যত বছরের প্রতিটি দিনে  
সূর্যকে বিভিন্ন অবস্থান থেকে উঠতে দেখা যায় এবং একইভাবে বিভিন্ন অবস্থানে  
অন্ত যায়। তাই সূর্যোদয় (পূর্ব প্রান্ত) ও সূর্যাস্তের (পশ্চিম প্রান্ত) অনেকগুলো  
অবস্থান রয়েছে। যদি ভিন্ন ভিন্ন দিনে বিভিন্ন অবস্থান থেকে সূর্যোদয় না হত  
তাহলে ঝুতু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হত না। এই ঝুতু বৈচিত্র্য এবং গাছপালা ও  
জীবজগতের উপর তার প্রভাব পৃথিবীতে জীবনচক্রের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যময়।  
সুতরাং বিভিন্ন অবস্থানে সূর্যোদয় অর্থাৎ বিভিন্ন পূর্বদিকের সৃষ্টি মহাপ্রভু আল্লাহ  
তা'আলার নির্দেশন। অতএব আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই আল্লাহ হচ্ছেন সূর্যোদয় ও  
সূর্যাস্তের সকল অবস্থানের প্রভু।

### পূর্ব ও পশ্চিম দিক

যদিও পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যে, অনেকগুলো পূর্ব ও পশ্চিম  
দিক রয়েছে তবুও কেবলমাত্র একটি উত্তর ও একটি দক্ষিণ দিক বর্তমান।  
গোলাকার আকাশে পৃথিবীর ঘূর্ণনের অক্ষরেখাকে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু  
একটি পয়েন্টে আড়াআড়িভাবে ছেদ করেছে। মেরুদ্যন্ত ও সুবিন্দু তেদে করে যে

মহাবৃত্ত চলে গিয়েছে তাকে পৃথিবীর বৃত্তের মধ্যরেখা (meridian) বলে এবং ভূপৃষ্ঠের সমতলে মহাবৃত্ত যে স্থান ছেদ করেছে তাকে দিগন্তরেখা (horizon) বলে। এই মধ্যরেখা ও দিগন্তরেখা যে পয়েন্টে পরস্পর ছেদ করেছে তাকে উভর পয়েন্ট ও দক্ষিণ পয়েন্ট বলে। যেহেতু একটি স্থানে কেবলমাত্র একটি মধ্যরেখা ও দিগন্ত রেখা রয়েছে তাই সেখানে শুধুমাত্র একটি করে উভর প্রতিচ্ছেদ পয়েন্ট ও দক্ষিণ প্রতিচ্ছেদ পয়েন্ট থাকবে। নিরক্ষরেখার (ক্রিবাক্ষের সমকোণে মহাবৃত্ত) প্রতিচ্ছেদের পয়েন্ট তৎসহ দিগন্তরেখা অর্ধাং উভর পয়েন্ট  $90^{\circ}$  ডিগ্রী দূরে হচ্ছে পূর্ব পয়েন্ট ও পশ্চিম পয়েন্ট।

### দু'টি পূর্ব পয়েন্ট ও দু'টি পশ্চিম পয়েন্ট

আমরা জানি যে, একটি মহাবৃত্তের মধ্যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে (অথবা সূর্যকে ঘূরতে দেখা যায় বলে মনে হয়)। এই মহাবৃত্তকে সৌর অয়ন বৃত্ত বা সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমণপথ বলে। এই ক্রান্তিবৃত্ত নিরক্ষরেখার উপর  $23^{\circ}$  ডিগ্রী ২৮ মিনিট নোয়ান অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং সূর্যের স্থীয় কক্ষপথ ধরে উভর দিকে পরিক্রমণের সময় তার এই  $23^{\circ}$  ডিগ্রী ২৮ মিনিটের বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাকে এখানে এসে দক্ষিণ দিকে মোড় নিতে হয়। অনুরূপভাবে সূর্য দক্ষিণ দিকে  $23^{\circ}$  ডিগ্রী ২৮ মিনিট থেকে উভর দিকে মোড় নেয়। সুতরাং এই দু'টি হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী পয়েন্ট যার বাইরে সূর্য যেতে পারে না এবং উদয় হতেও পারে না। এই দু'টি বাঁককে সূর্যের অয়ন বলে। পূর্বদিকের পয়েন্টসমূহের মধ্যে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী পয়েন্ট বলে। অনুরূপভাবে পশ্চিম দিকে দু'টি নিয়ন্ত্রণকারী পয়েন্ট রয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণকারী পয়েন্টগুলো হচ্ছে দু'টি পূর্ব দিকে ও দু'টি পশ্চিম দিকের পয়েন্ট যা আয়াত নম্বর ৭ : ১৩৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

-٧- **إِنَّا زَيَّنَاهُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنِعْمَةِ الْكَوْكَبِ**

৩৭ : ৬ আয়া নিকটবর্তী আকাশকে নক্তরাজির সুষমা আরা সুশোভিত করেছি।

আয়াত ২ : ২৯ এ লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, মহাশূন্যকে সাতটি পৃথক অঞ্চল বা আকাশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অঞ্চল বা আকাশে সূর্য ও প্রহমণ্ডলী যথা বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল তাদের উপর্যুক্ত সহ অবস্থান করছে। সৌর অগতের প্রহমণ্ডলী দু'টি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত-পার্থিব (পৃথিবীর প্রতিরূপ বৰুপ) ও বৃহস্পতি গ্রহের প্রতিরূপ (Jovial) বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহসমূহ হচ্ছে

পার্থিব এবং অপর পাঁচটি গ্রহ বৃহস্পতির প্রতিরূপ। এ সব পার্থিব গ্রহের ঘনত্ব মাত্র ০.৭ থেকে ১.৭ এর মধ্যে। একটি ৩.১ এ. ইউ (জ্যোতির্বিদ্যার ইউনিট) প্রশংস্ত উপগ্রহাদির বক্সনী দ্বারা এই দু'টি শ্রেণীকে পৃথক করেছে। সৌর জগতের পার্থিব অংশটি অর্থাৎ প্রথম আকাশ পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। অতএব এটা পৃথিবীর আকাশ নামে অভিহিত। মহাশূন্যের এই অঞ্চল সূর্য, চন্দ্র ও পূর্বেন্নাখিত গ্রহসমূহ দ্বারা শোভিত করা হয়েছে। দিনের বেলায় আকাশে সূর্য-প্রাধান্য বিস্তার করে এবং আকাশ পরিক্রমণ করে বলে দেখা যায়। এ সময় নানা বর্ণের সমাহার ঘটে। খুব সকালে এর যাত্রা শুরু হয় তখন এর উষার গোধূলি ক্ষীণ আভা থেকে ক্রমান্বয়ে এর রাজকীয় উপাসন ঘটে এবং লাল গোলকের রূপ ধারণ করে। আকাশে পরিক্রমণ কালে সূর্য সকালে নরম আলো ছড়াতে থাকে, দুপুরে তীব্র দাবদাহের সৃষ্টি করে এবং পুনঃ তার আলোর তেজ কমতে থাকে এবং শেষে পঞ্চম দিষ্ঠিলয়ের নিচে অন্ত যায়, সে সময় তার রাজকীয় লাল আভা বিরাজ করে। ক্রমান্বয়ে শক্তি হারিয়ে অঙ্ককারে নিমজ্জিত হয় এবং সাক্ষ্যকালীন গোধূলির নানা ধরনের অঙ্ককারের পর্দা পৃথিবীর বুকে অবস্থান নেয়। চন্দ্রেরও ক্রমান্বয় পরিবর্তন ঘটে, প্রথমে একটি কাণ্ডের আকার নিয়ে আকাশে উদিত হয় তারপর একটি পূর্ণ বৃক্ষের আকার ধারণ করে। বুধ ও শুক্র এহ কেবলমাত্র সূর্যাস্তের কিছু পরে এবং সূর্যোদয়ের কিছু আগে আকাশে দেখা যায়। অতএব প্রথম আকাশ হচ্ছে সূর্য ও পার্থিব গ্রহগুলী ধারণকারী অঞ্চল, এর চারদিকে উপগ্রহগুলীর একটি বক্সনী দিয়ে সীমানা দেওয়া হয়েছে। সমগ্র সৌরজগত ধারণকারী অঞ্চল দ্বিতীয় আকাশ গঠন করেছে।

নক্ষত্রের বিবর্ধন সংক্রান্ত চলচ্চিত মতবাদসমূহ থেকে জানা যায় যে, নক্ষত্রগুলীর অধিকাংশই এককভাবে না হয়ে দল বা গুচ্ছকারে গঠিত হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্বন্ধ, অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন সম্পর্কের কারণে পারাপ্পরিক নৈকট্যের সৃষ্টি হয় এবং দল গঠন করে। একইভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের তারকারাজি নিরিষ্টভাবে দলবদ্ধ থাকে। দলের মধ্যে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তারা কম-বেশী একটি ইউনিট হিসেবে একত্রে চলাফেরা করে। আমাদের ছায়াপথে প্রায় ১০,০০০ কোটি নক্ষত্র রয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে অধিকাংশ নক্ষত্র শিথিলভাবে স্থানীয় দল-উপদলে পরম্পর সংবদ্ধ থাকে। আমাদের সূর্যেরও ৩০টি নক্ষত্র সমূহে একটি স্থানীয় দল রয়েছে এবং ২০ আলোকবর্ষের সমপরিমাণ ব্যাসার্ধ নিয়ে গঠিত। এটি হলো তাদের পরিক্রমণ। সূর্যের এই স্থানীয় দলভূক্ত নক্ষত্রগুলী নিয়ে তৃতীয় আকাশ গঠিত হয়েছে।

এরূপ স্থানীয় তারকামণ্ডলীর এ সকল স্থানীয় দলের একত্র সন্নিবেশ এবং তার সাথে একক নক্ষত্র মিলিয়ে যে ছায়াপথের সৃষ্টি হয়েছে তা চতুর্থ আকাশ গঠন করেছে। এ সকল স্থানীয় তারকাপুঞ্জের পারস্পরিক দূরত্ব ১০,০০০ আলোক বর্ষ থেকেও বেশী।

এই একই প্রক্রিয়ায় ছায়াপথমণ্ডলীরও আবার স্থানীয় দল বা পুঁজ রয়েছে এবং তারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শিখিলভাবে পরস্পর সংবন্ধ আছে। স্থানীয় ছায়াপথমণ্ডলীর একটি দল থেকে আরেকটি দলের দূরত্ব পাঁচ লক্ষ আলোকবর্ষ থেকেও বেশী। ছায়াপথমণ্ডলীর একটি স্থানীয় দল পঞ্চম আকাশ গঠন করেছে। Milky Way এই ছায়াপথমণ্ডলীর একটি সদস্য।

ছায়াপথমণ্ডলীর এরূপ সকল স্থানীয় দলের সমন্বয়ে এক বিশাল ইউনিট গঠিত হয়েছে যাকে super galaxy নামে অভিহিত করা হয়। এই super galaxy -এর আওতাধীন ছায়াপথমণ্ডলীর স্থানীয় দলের মধ্যকার দূরত্ব ২ কোটি ৫০ লক্ষ আলোকবর্ষের সমান। এই super galaxy ষষ্ঠি আকাশ গঠন করেছে।

সকল super galaxy মিলিয়ে নিখিল বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ গঠিত হয়েছে যাকে সপ্তম আকাশ অভিধায় অভিহিত করা যায়।

وَنَجِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَزْبِ الْعَظِيْمِ ۝

৩৭ : ৭৬ তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহা সঙ্কট থেকে।

আয়াতের এই বিষয়টি হ্যরত নূহ (আ)-এর সময়ের মহাপ্লাবনের প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। সে সময়ে তিনি জাহাজ তৈরি করে তাঁর লোকদের উদ্ধার করেছিলেন। আয়াত ৭ : ৬৪ তে এই প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

۝-۸۱- نَحْنُ أَعْرَقْنَا الْأَخْرَيْنَ

৩৭ : ৮২ অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

এই আয়াতে নূহ (আ)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে যেখানে নৌকায় আশ্রয়প্রাণ লোক ছাড়া অন্য সকলে ডুবে মারা যায়।

আয়াত ৭ : ৬৪ তে মহাপ্লাবনের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

١٣٢- فَالْتَّقِمَةُ الْحُرُثُ وَهُوَ مُلِيمٌ○

١٣٣- قَدْ لَمْ أَكُنْ كَلَّا مِنَ الْمُسْتَعِينَ○

١٣٤- لَيْلَتَنِي بِطِينَمَ إِلَى يَوْمِ يُبَعْثَرُونَ○

١٣٥- قَبَذَنَهُ يَالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ○

١٣٦- وَأَبْتَنَاهُ عَلَيْنَا شَجَرَةً مِنْ يَنْطِلُونَ○

৩৭ : ১৪২-১৪৬ পরে এক বিরাটকায় মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে যদি আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা বোঝগা না করত, তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের উদরে থাকতে হত। অতঃপর আমি ইউনুসকে নিষ্কেপ করলাম এক তৃণহীন প্রাণীরে এবং সে কুঁঘ ছিল। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদ্গত করলাম।

উপরোক্ত পরপর পাঁচটি আয়াতে কিভাবে নিনেভে জাতির দুর্কর্মের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রেরিত ইউনুস নবী (আ) তার জাতির লোকদের উপর ক্রোধাভিত হয়ে তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। নিনেভে ছিল ইরাকের বর্তমান আধুনিক নগরী মসূল-এর বিপরীত দিকে দজলা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন আসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। চরম হতাশাব্যঙ্গক পরিস্থিতিতে আল্লাহর কুদরতী শাস্তির উপর নির্ভর না করে ইউনুস(আ) নিনেভে ত্যাগ করে চলে যান। বাইবেলের ব্যাখ্যাতাগণের মতে, তিনি নিনেভে থেকে ৬শ মাইল পশ্চিমে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর জাফা-য় একটি জাহাজ নেন। তবে তার গন্তব্য দজলা নদীর কাছাকাছি কোথাও ছিল এবং তা অধিকতর সম্ভব বলে মনে করা হয়। জাহাজটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মুখে পড়ে যায় এবং নাবিকরা ভাগ্য গণনার পর তাকে খারাপ লোক হিসেবে জাহাজের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বিশালাকার এক মৎস্য তখন তাকে গিলে ফেলে। কিন্তু, মাছের পেটের ভিতর অবস্থানকালে তিনি অনুত্তম হলে এবং আল্লাহর মহিমা কীর্তন করলে মাছটি তাকে সাগরতীরে নিষ্কেপ করে। স্পষ্টত মাছের নাড়িভুঁড়ি তথা অন্তর্দির ভিতর অবস্থানজনিত মুসিবতের কারণে অসুস্থ অবস্থায়

ଥାକାକାଳେ ଏକଟି ବୃକ୍ଷ ତାକେ ଛାଯା ଦାନ କରେ ଏବଂ ତିନି ଏହି କ୍ରାନ୍ତିକର ଅବସ୍ଥା ଯୁକ୍ତି ଲାଭ କରତେ ସମ୍ଭବ ହନ ।

ଏ ଷଟନାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦୁ'ଟି ବିଷୟକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଯା ଯଥୀ  
୧ : କ. ଇଉନ୍ସ (ଆ)-କେ ଗଲାଧଃକରଣକାରୀ ଜୀବଦେହ, ଏବଂ ବ. ତାକେ  
ସୁହୃତ୍ତାଦାନକାରୀ ସେଇ ବୃକ୍ଷଟି ଯା ସାଗର ସୈକତେ ଇଉନ୍ସ (ଆ)-ଏର ଆରାମେର ବ୍ୟବସ୍ଥା  
କରେଛି-ଏ ଦୁ'ଟିର ପରିଚୟ ଚିହ୍ନିତ କରା ।

କ : ୩୭ : ୧୪୨ ଆଯାତେ ଉତ୍ସିତ 'ଆଲହ୍ତ' (الْحُّوَّت) ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବିଶାଲ  
ମଂସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତିମି । ଏକଜନ ମାନୁଷକେ ଗଲାଧଃକରଣ କରତେ ହଲେ କୋନ ଆଣିକେ  
ଅବଶ୍ୟାଇ ୧. ସେଥିୟେ ବୃଦ୍ଧାକାର ହତେ ହବେ, ୨. ତାର ଖାଦ୍ୟର ଚୂମେ ଖାଓଯାର ଅଭ୍ୟାସ  
ଥାକତେ ହବେ, ଏବଂ ୩. ଏହି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରେ ସେଟାକେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାମୁଦ୍ରିକ  
ଅଞ୍ଚଳେ ବସବାସକାରୀ ହତେ ହବେ । ତିମି ଯଦିଓ ଏମନ ଏକ ଜାତେର ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଯା  
ଆକାରେ ବିଶେର ବୃଦ୍ଧତମ, ଏଦେର ବିଭାଗ ଆର୍କଟିକ, ଏର୍କାର୍କଟିକ, ଆଟୋଲାନ୍ଟିକ,  
ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରେ ସୀମିତ, ଯା ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ତିମିକେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ  
ହିସେବେ ମେନେ ନେଯାର ସଞ୍ଚାବନାକେ ନାକଚ କରେ ଦେଇ । ବିଶାଲ ଆକୃତିବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ  
ପ୍ରାଣୀର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ହାତର ଏବଂ ଟାରଜିଯନ । ପୂର୍ବୋର୍ଜଟିର ବାସ ମହାସାଗରେ ଏବଂ  
ଏହି ଅନ୍ୟତମ ଡ୍ୟଂକର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାରାଲୋ ଚୋଯାଲେର ଜଳ୍ୟ କୁର୍ଯ୍ୟାତ । ଏରକମ  
ଏକଟା ମାଛେର ପକ୍ଷେ ଶିକାରକେ ପ୍ରଥମେ କେଟେ ଟୁକରା ଟୁକରା କରେ ନା ମେରେ ଶୁଦ୍ଧ  
ଗିଲେ ଫେଲା ଅଭ୍ୟାସ ଅସଂଗ୍ରେ ଏକଟା ବ୍ୟାପାର । ଅପରାଦିକେ, ଟାରଜିଯନ ବର୍ତ୍ତମାନକାଳେର  
ଜାନେ ମିଠାପାନିର ମାଛେର ମଧ୍ୟେ ବୃଦ୍ଧତମ, ଶ୍ରୀରା ସାଗରେ ବାସ କରଲେଓ  
ଡିମ ଛାଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ମିଠା ପାନିତେ ଚଲେ ଆସେ । ଏଦେର ରଯେଛେ ଚୋଷକ ଏବଂ  
ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁ ମୁଖ ଯାତେ ବୋବା ଯାଯା ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଗାଛପାଲା  
ଚୋଷଣ କରେ ଖାଓଯାର ଅଭ୍ୟାସ ଏଦେର ରଯେଛେ । ଟାରଜିଯନେର ବିଶ ରକମେର ମତ  
ଜାତ ପ୍ରଜାତି ଛଢିଯେ ଆହେ ଇଉରୋପ, ଏଶ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର  
ଉପକୂଳ ବରାବର ।<sup>୧</sup> ରୁଷ ଟାରଜିଯନ (Acipenser huso) ପ୍ରଜାତି ୨୪ ଫୁଟ ଦୀର୍ଘ  
ଏବଂ ୨ ହାଜାର ପାଉଡ (୧୦୦ କି. ଗ୍ରା.) ଓଜନେର ହେଁ ଥାକେ । ୨ କାମ୍ପିଆନ ସାଗର  
ଓ କୁର୍ବାନ ସାଗରେ ଏଦେର ବାସ ଯା ବିଭିନ୍ନ ଉପନଦୀର ମାଧ୍ୟମେ ମେସୋପଟେମୀଯ  
ନଦୀବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାଥେ ସଂ୍ୟୁକ୍ତ । ଆଶା କରା ଯାଯା ଯେ, ଏଇ ଆକାରେର ଟାରଜିଯନ ଇଉନ୍ସ  
(ଆ)-ଏର ସମୟକାଳେ (ସ୍ରୀ.ପ୍ର. ୮୦୦ ମାଲେ ଛିଲ ବଲେ ଅନୁମିତ) ନିକଟ୍ୟାଇ ଦଜଲା  
ନଦୀତେ ବିଚରଣ କରେ ଥାକିବେ । ଟାରଜିଯନେର ଅନ୍ତର୍ଭେଦ ବାଦ୍ୟାଭାସ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁ  
ଥେକେଇ ତୁରଣ ଇଉନ୍ସେର (ଆ) କୋନ କ୍ଷତି ଛାଡ଼ାଇ ଏହି ମାଛେର ପେଟେ ଶୋଷିତ  
ହେଁ ଯାଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଖୁଜେ ପାଓଯା ଯାଯା । ପ୍ରମଶିକ୍ରମେ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଯେ, ଏ ଧରନେର ବିଶାଲ  
ମାଛେର ପେଟେର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁ ଥାକତେ ହବେ ଯାତେ ଏଇ ଅଭାବରାଶ୍ତ୍ରି ଶିକାର  
ତାର ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଯେ ଯେତେ ପାରେ । ଅଧିକତ୍ତୁ, ପେଟେର ଭିତରକାର ବିଷାକ୍ତ ଜଳୀଯ

দ্রব্যাদি হয়তো মারাত্মক অস্তির সৃষ্টি করে থাকতে পারে কিংবা এমনকি অমৃদহনও সৃষ্টি করতে পারে। এ অবস্থায় নবী ইউনূস (আ) যেহেতু দোষা-মোনাজাত করেছিলেন এবং আল্লাহর মহিমা কীর্তন করেছিলেন, সেহেতু ৩৭ : ১৪৫ আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহর রহমতে মাছটি তাকে উপকূলে ছুড়ে মারে।

খ. ইয়াকতিন (يَقِنٌ) অর্থ মিষ্টি কুমড়া কিংবা ক্ষোয়াশ। এটি কিউকার-বিটাকি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে রয়েছে সকল প্রকার লাউ, তরমুজ, এবং এদের নানান সহ-গোত্রীয় সদস্য যা গ্রীষ্মগুলীয় এবং নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলসমূহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উৎস হিসেবে গণ্য। মিষ্টি কুমড়া কিংবা ক্ষোয়াশ গাছ কোন বৃক্ষে জন্মে না এবং নরম কাও আঁকশি নামে এক প্রকার বিশেষ অঙ্গের সাহায্যে যে কোন কিছুর উপর ভর দিয়ে বেয়ে উঠে। এরা প্রবলভাবে বেড়ে যায় এবং দ্রুত কোন ঘাচা কিংবা তাঙ্গাচোরা নির্মাণ কাঠামো ভরে তুলতে পারে এবং পর্যাণ ছায়া দ্বারা কাউকে এর নিচে বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে পারে। লাউগোত্রের অন্তর্ভুক্ত গাছপালা বালুকাময়, সুনিষ্কাশিত মাটিতে খুব ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ভূমধ্যসাগরীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে এদের দেখা যায়। বালুকাময় নদীতীরেও প্রায়শই এদের চোখে পড়ে। মজার ব্যাপার হলো যে, ১৪৬ নং আয়াতে বলা হচ্ছে যে, ইউনূস (আ) যখন অসহায়ভাবে অসুস্থ অবস্থায় শায়িত ছিল, তখন আল্লাহ তার উপর লাউ গোত্রীয় একটি গাছ জন্মান। বস্তুত ‘আমবাত্না আলাইহে’ (ابننا علىه) বাক্যাংশ দ্বারা আক্ষরিক অর্থে ঠিক এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে।

### তথ্যসূত্র :

1. Encyclopaedia Americana, Vo. 25, Americana Corporation, Danbury, Connecticut, U.S.A., p. 810, 1979.
2. Encyclopaedia Britannica, Vol. 21, Ency. Brit. London, p. 485, 1962.

## ○ ۲- کُنْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ ثُرُبٍ فَنَادُوا إِلَّاتٍ حِينَ مَنَاصِ

৩৮ : ৩ এদের পূর্বে আমরা একপ কত জাতিকেই না খৎস করেছি- যখন তারা চিৎকার করে উঠেছে কিন্তু তখন আর রক্ষা পাওয়ার সময় ছিল না ।

এই বিষয়টি ৭ : ৪ এবং ১৭ : ১৭ আয়াত দুটির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে ।

## ○ ۳- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْتَهُمَا بِأَطْلَالٍ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُنَزِّلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

৩৮ : ২৭ আমরা আসমান ও যমিন এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু তা অনর্থক পয়দা করি নি । এটি সেই লোকদের ধারণা যারা কুফরী করেছে । এ ধরনের কাফেরদের জন্য জাহানামের আগনে খৎস হওয়া অনিবার্য ।

আল্লাহ্ যে কোন কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেন নি তা ৩ : ১৯১ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে ।

## ○ ۴- كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَّكٌ لِيَدَيْ بَرْوَا أَسْتَهِ وَلَيَتَدْكُسَ أُولُو الْأَلْبَابِ

৩৮ : ২৯ এটি (কুরআন) এক বহু বরকতপূর্ণ কিতাব, এটি আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এবং আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ ।

আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে ২৭ : ৮৬ আয়াত সহ কয়েক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে ।

আর জানী লোকদের জন্য যে এই কিতাব এ বিষয়টি ২ : ২৬৯ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে ।

## ○ ۵- لَسْخَرْنَا لَهُ الْجِنُّوْ بَعْرِيْ بِأَمْرِهِ رُخَاءُ حَيْثُ أَصَابَ

৩৮ : ৩৬ তখন আমরা বাতাসকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিলাম, তখন তার হকুমে তা যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো ।

এই বিষয়টি ৩৪ : ১২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে ।

## ٥٦-رَبُّ الْأَمْوَالِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَارُ

৩৮ : ৬৬ আসমানসমূহ ও যমিনের মালিক, সেই সব জিনিসেরও মালিক যা এই দু'য়ের মধ্যে রয়েছে, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

এ বিষয়সমূহ ৭ : ৫৪, ৭ : ১৮৫ আয়াত এবং পরিশিষ্ট ১, ২ ও ৩-এ আলোচনা করা হয়েছে।

## ٥٧-إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِلَيْنِي خَالقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ

৩৮ : ৭১ যখন তোমার (হে নবী) প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন আমি মাটি দ্বারা একজন মানুষ সৃষ্টি করব।

মাটি থেকে মানব সৃষ্টির বিষয়টি ৭ : ১২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

هـَخَلَقَ الْأَمْوَالَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوْرُ الْيَلَى عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوْرُ النَّهَارَ عَلَى الْيَلَى  
وَسَعَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَيْجِيلْ مُسْتَقِيًّا أَلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ

৩৯ : ৫ তিনি আসমানসমূহ এবং শৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের উপর রাতকে এবং রাতের উপর দিনকে পৌছিয়ে থাকেন। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন- এদের প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময়ে আবর্তন করে। তিনিই কি সর্বশক্তিমান ও ক্ষমাশীল নন?

সবকিছু সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন এ বিষয়টি ২৫ : ২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দিন ও রাতের আবর্তনের বিষয়টি ৩৬ : ৪০ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। চন্দ্র ও সূর্যের আবর্তনের বিষয়টি ৭ : ৫৪ এবং ৩৬ : ৪০ আয়াতব্যরে সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

مَنْ يَعْبَادُ إِلَّا دِينَ أَمْوَالِ الْغَوَّارِ كُمُّ اللِّدِينِ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ  
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوْلَى الصَّدِّيقُونَ أَبْحَرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

৩৯ : ১০ হে নবী বলুন- হে আমার বান্দারা যারা ঈমান অনেছো, তোমাদের প্রভুকে ডয় কর। যে সব লোক দুনিয়ায় সৎ আচরণ করেছে

তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহর যমিন বিশাল প্রশংস্ত। যারা ধৈর্য ধারণ করবে তারা বেহিসাব প্রতিফল পাবে।

কোন কোন তাফসীরকারীর মতে, এই আয়াত আবিসিনিয়ায় প্রথম হিয়রতের সময় নাযিল হয়েছিল। ইসলামের গ্রাথমিক কালে মক্কায় কাফেরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্যত্র হিয়রত করার কথা বলে এভাবে বলা হলো যে আল্লাহর দুনিয়া প্রশংস্ত। অত্যাচারের ভয়ে তীব্র হয়ে আল্লাহর দ্বীন পালনে অবহেলা করা যাবে না। পরবর্তীকালে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ বহু দ্বীপপুঁজি আবিক্ষার হওয়ায় আল্লাহর এই বাণীরই প্রতিফলন হলো যে আল্লাহর যমিন বিশাল ও প্রশংস্ত।

الْمَرْءُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا هُوَ سَكَنٌ لَّهُ يُنْسِي بِرْجِبَتَهُ  
رَبِّنَا مُخْتَلِفًا أَلَا وَاللهُ ثُمَّ يَهْبِطُ فَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حَلَامًا  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لِذِكْرٍ لِّرُؤْيَ الْأَلْيَابِ

৩৯ : ২১ তুমি কী দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন।

অতঃপর ভূমিতে নির্ভরন্তে প্রবাহিত করেন এবং তা যারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপাদন করেন, অতঃপর তা শক্তিশেষ যায় এবং তোমরা তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন ? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধগতিসম্পর্কের জন্য।

বৃষ্টির ফেঁটা কীভাবে আসমান থেকে নিচে নেমে আসে তা ২ : ২২ এবং ২ : ১৬ আয়াতদ্বয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গাছপালার বৃদ্ধিতে বৃষ্টির পানির রয়েছে বিরাট প্রভাব এবং অনেক শস্য রয়েছে যেগুলো মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। চুইয়ে চুইয়ে মাটির ভিতরে চলে আসা পানি সংগ্রহ করেও শস্যক্ষেত্রে সেচ দেয়া যায়। যেমন : আটেসিয়ান কৃষের সাহায্যে, গভীর নলকূপ এবং পাহাড়ী ঝর্ণা থেকেও পানি সংগ্রহ করা যায়। মাটিতে অর্দ্ধতার উপস্থিতিতে শস্য বড় হয়ে পরিপূর্ণ হয় এবং শস্য উৎপাদন করে যার প্রতিটিই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণ দ্বারা পরিচিত হয়। শস্য উৎপাদিত হওয়ার পর একবর্ষী/বর্ষজীবী শস্যগাছের আর কোন কাজ থাকে না; কজেই, পুরো গাছটিই ঘরে যায়। প্রক্রিয়াটি ঘটে ক্রমান্বয়ে এবং জীবন্ত কোষসমূহ এবং তাদের গঠন-উৎপাদনসমূহের মৃত্যুর ফলে তা সংঘটিত হয়। সবুজ তত্ত্বজ্ঞক তথা পত্র হরিতের ধূঃস সাধনের কারণে এক সময় যে গাছ ছিল সবুজ, তা হলুদ

হয়ে যায়। অবিরাম পানি শোষণের কারণে জীবন্ত উদ্ভিদ কোষের অভ্যন্তরে সৃষ্টি রসক্ষীতিজনিত চাপের দ্বারা উদ্ভিদ এবং এর পাতার যে আকৃতি ও দৃঢ়তা বজায় থাকে, তা কোষের মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যায়। গাছ ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যায় এবং শেষতক ভেঙ্গে গুড়িয়ে পড়ে যায় ও মৃত্বিকার অংশে পরিণত হয়।

উপরে বর্ণিত সকল প্রাকৃতিক ঘটনাই আন্নাহুর অসীম ক্ষমতা ও দয়ার  
কথাই ঘোষণা করে। প্রাঙ্গ ব্যক্তিগণ এ সকল ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা  
করে থাকেন। তারা যতই এসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করেন, ততই  
তারা বিশ্বে অভিভূত হয়ে আন্নাহুর মহিমা কীর্তন করেন এবং সুগভীর কৃতজ্ঞায়  
তার প্রতি সিজদাবন্ত হন।

٢٢- أَللهُ تَرَأَّلْ أَخْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيٌّ تَقْشِعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الظِّنِّ  
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ لَمَّا تَلَيْنَ جُنُودَهُمْ وَقَلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ  
يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَتَصَبَّلَ اللَّهُ فَعَالَهُ مِنْ هَادِيٍّ

୩୯ : ୨୩ ଆଲ୍ଲାହ ଅତି ଉତ୍ତମ ବାଣୀ ନାଥିଲ କରେଛେ ଏକଟି କିତାବେର  
ଆକାରେ ଯାର ସମ୍ପଦ ଅଂଶ ସୁଷମ ଏବଂ ଯାତେ ବାର ବାର ଏକଇ କଥାର  
ପୁନରାୟତି କରା ହେଁଛେ । ତା ଶୁଣେ ଯାରା ତାଦେର ରବକେ ଭୟ କରେ  
ତାଦେର ଚର୍ମ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୟ ଏବଂ ପରେ ତାଦେର ଦେହ ଓ ଦିଲ ନରମ  
ହୟେ ଆଲ୍ଲାହର ଶ୍ରରଗେ ଉତ୍ସୁକ ହୟେ ଓଠେ । ଏ ଆଲ୍ଲାହର ହିଦ୍ୟାଯାତ,  
ଏ ଦ୍ୱାରା ତିନି ଯାକେ ଚାନ ତାକେ ପଥ ଦେଖାନ । ଆର ଯାକେ ଆଲ୍ଲାହ  
ପଥ ଦେଖାନ ନା (ଯାର ପକ୍ଷେ ଡ୍ରାସାର ଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦ) ତାଦେର ଜନ୍ୟ  
କୋନ ହିଦ୍ୟାଯାତକାରୀ ନେଇ ।

এই আয়াতে ভয় শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কোন সম্ভাব্য বিপদ ঘটার আশঙ্কা থেকে ভয়ের সৃষ্টি হয়। কারো জীবনের প্রতি আশঙ্কাজনক অবস্থা থেকেই সাধারণত ভয়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বাস্তব কোন বিপদের কারণ প্রত্যক্ষ করলে, ভবিষ্যতে মহাবিপদ হবার আশঙ্কার কথা শুনলে এবং ভবিষ্যতে জীবন নাশের বা মহাবিপদের কারণ হতে পারে এমন মানসিক অবস্থাতেও ভয়ের সৃষ্টি হয়। যা হোক, ভীত হলে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় এন্ড্রিমাল প্রিসিসমূহের রস অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হয় (epinephrine এবং non-epinephrine)। এইসব অতিরিক্ত রাসায়নিক বস্তু

(hormone) রঙে প্রবেশ করে যার ফলে শরীরের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হার ও শ্বাস ক্রিয়া বৃদ্ধি (pulse) পায় এবং তৃকের ক্ষুদ্র ধমনী (arterioles) সমূহ কুণ্ঠিত হয়। এসব পরিবর্তনের ফলে ফুসফুস, মন্তিক এবং মাংসপেশিতে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালিত হয় যা ভীত অবস্থায় প্রয়োজন হয়।

ভীত হলে চামড়ার ক্ষুদ্র স্নায়ুতন্ত্রগুলোও উত্তেজিত হয় যার ফলে চামড়ার ক্ষুদ্র মাংসপেশিগুলো কুণ্ঠিত হয়ে শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে যায় এবং হাসের চামড়ার (goose skin) মত দেখতে হয়। চামড়ার দু'টি অংশ বহিঃত্তুক (external epidermis) যা খুবই পাতলা আর অন্তঃত্তুক (internal epidermis) যা চামড়ার প্রধান অংশ এবং এতেই লোমের গোড়া, রক্তবাহী শিরা, স্নায়ু, মাংস, ঘর্ষ প্রতি ইত্যাদি অবস্থিত। এ কথা সবাই জানে যে ভয়ে চামড়া কুণ্ঠিত হয়। যার কারণ এখানে দেওয়া হলো। এছাড়া পেশির শক্তি (energy) সৃষ্টির জন্য শরীরের শর্করা অধিক ব্যবহৃত হয়। আর রক্তপাত হ্রাস করার জন্য রঙের জমাট বাঁধার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য চোখের মণি বড় হয়।

শরীরের এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো জীবের আঘাতকার প্রচেষ্টা যা পরিনামে ভয় নামে পরিচিত অবস্থার সৃষ্টি করে। ভয় পেলে তৃকে সৃষ্ট এমন কুণ্ঠনে তৃক শক্ত হয় যাতে শারীরিক আঘাতে কম ক্ষতি করতে পারে।

যারা সত্যিকার ঈমানদার এবং পরকালে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে, আল্লাহর আয়ার সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো পাঠ করলে তাদের অন্তরে ভয়ের সংগ্রাম হয়, তাদের তৃক কুণ্ঠিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি পায়। তবে ঈমানদারগণ, পরকালের পুরকারের আয়াতসমূহ পাঠ করলে মনে শান্তি লাভ করে, মনের ভয় কেটে যায়, বেহেশতের সুখের সুসংবাদে মন খুশিতে ভরে যায় এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে আসে। যখন ভয় দূর হয় তখন অতিরিক্ত এক্সিমালিন ক্ষরণ বন্ধ হয়, তৃকের কুণ্ঠন দূর হয় এবং শরীরের ভয়জনিত সকল অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

মনের শান্তি বা হৃদয় বিগলিত হওয়ার বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার যা কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে আমরা সবাই জানি যে, ভয় কেটে গেলে মন শান্ত হয়, মনে খুশির ভাব সৃষ্টি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক হয়। ভয়ে হৃৎপিণ্ডের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না, কেবল তার স্পন্দনের গতি বৃদ্ধি পায়। আর ভয় দূর হলে সেই গতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

### তথ্যসূত্র :

1. L. C. Kolb. Noyes' Modern Clinical Psychiatry, 7th edn. Oxford & IBH Publishing Co. Calcutta, p. 62, 1968.

۲۲- أَلَّهُ يَتَوَفَّ إِلَّا نُفْسَنَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَمُتْكِفُ الْتَّقْبِي  
تَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرِسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ  
لِقَوْمٍ يَتَغَلَّبُونَ ۝

৩৯ : ৪২ তিনিই আল্লাহই যিনি মৃত্যুর সময় ক্রহসমূহকে কব্জি করেন, আর যারা এখনও মরে নি তাদেরও শুমের সময়। পরে যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত তাদের ক্রহ আটকে রাখেন আর অন্যদের ক্রহকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের শরীরে ফিরিয়ে দেন। এই বিষয়ে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নির্দশন রয়েছে।

যেহেতু ক্রহ বা আস্তা মানুষের জ্ঞানের বাইরে তাই এ বিষয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুমের সময় ক্রহ সাময়িকভাবে কব্জি করা হয়, এ বিষয়েও আমাদের কোন সঠিক জ্ঞান নাই। তবে শুম সম্পর্কে ৩০ : ২৩ আয়াতের সঙ্গে এবং পরিশিষ্ট-৮ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

۲۳- قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَعِيْنَاهُ لَهُ مُلْكُ التَّمَوِّلِ وَالْأَرْضِ  
شَرَّالَيْهِ وَتُرْجَمَعُونَ ۝

৩৯ : ৪৪ বলুন (হে নবী) সমস্ত শাফায়াত তো কেবল আল্লাহরই এখতিয়ারভূক্ত। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মালিকানা তো শুধু তাঁর। পরে তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। এ বিষয়টি ৫ : ১৯ আয়াতের সঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

۴۴- أَلَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيٌّ ۝

৩৯ : ৬২ আল্লাহই প্রত্যেকটি জিনিয়েরই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব কিছুর অভিভাবক।

এ বিষয়টি ২ : ১১৭ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

۴۵- وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ كُلِّ رِيمٍ وَالْأَرْضُ جَعِيْنَاهُ بِقَضَائِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
وَالسَّمَوَاتُ مَظْوِيَّتُ بِحَيْثِيْمَهُ سُجْنَاهُ وَعَلَى عَنَائِيْسِرِكُونَ ۝

৩৯ : ৬৭ তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না; কিয়ামতের দিন পুরো পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলীকে শুটিয়ে

এনে করা হবে তাঁর করায়ত। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে  
তাঁর শরীক করে তিনি তাঁর উর্ধ্বে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে সবশেষে এই বিশ্বজগতকে  
গুটিয়ে নিয়ে পৃথিবীকে অতি ক্ষুদ্র অবয়বে সংকুচিত করে নেয়া হবে। এটা জানা  
কথা যে বিশ্বজগতে দুটি বিপরীতধর্মী বল কাজ করছে : একটি হলো বিস্তৃতি বল  
(force of expansion) যার উদ্ভব হয়েছে মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং (big bang)  
এর কারণে, অপরটি হলো মহাকর্ষজনিত আকর্ষণী বল (force of  
attraction due to gravity)। বিস্তৃতি বল এখনো কার্যকর আছে বলেই  
ছায়াপথের নক্ষত্রপুঁজির পরম্পর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।  
তাহলে বিশ্বজগত কি চিরকাল এভাবে বিস্তৃতি ঘটিয়েই চলবে? এটি একটি  
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মহাকর্ষ বল বিশ্বজগতের বিস্তৃতিকে বাধা দিয়ে থাকে। ছায়াপথের ও  
নক্ষত্রপুঁজির মধ্যে পরম্পরের আকর্ষণ তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার গতিকে কমিয়ে  
দেয়। এটা হচ্ছে বিশ্বের বিস্তৃতি বল এবং সুদূরপ্রসারী মহাকর্ষ বল-এর মধ্যেকার  
সংঘাত। যদি বিস্তৃতি বল জয়ী হয়ে যায় তবে অনাদিকাল ধরে বিরতিহীনভাবে  
বিশ্বজগতের বিস্তৃতি চলতেই থাকবে। অপরদিকে যদি মহাকর্ষ বল জয়লাভ করে  
তবে এই আকর্ষণী বল ছায়াপথের গতিশীল নক্ষত্রপুঁজির গতিকে শুধু করে দেবে  
এবং এক পর্যায়ে স্থুবির হয়ে পড়বে। মহাকর্ষ বল পুনরায় তাদেরকে একত্রিত  
করে দেবে, বিশ্বজগত ক্ষুদ্রাকারে সংকুচিত হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানীরা আজ অবধি  
এটা নিশ্চিতরূপে জানতে সক্ষম হননি যে দুটি বলের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে কোনটি  
বিজয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, পরিশেষে বিশ্বজগতকে গুটিয়ে আনা  
হবে। তাহলে বলা যায় যে মহাকর্ষ বল জয়ী হবে। সুতরাং আমরা মেনে নিতে  
পারি যে চূড়ান্ত পর্যায়ে মহাকর্ষ বল প্রাধান্য অর্জন করবে এবং বিশ্বজগত এক  
ভয়ংকর আন্তঃসংকোচনের (tremendous implosion) মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে  
যাবে। একে বলা হয় মহাকুঞ্চন বা big crunch। এই ধারণা থেকে আমরা  
সেই সর্বনাশ মহাকুঞ্চন আগমনের সময় হিসাব করতে পারি। মার্কিন বিজ্ঞানী-  
ফ্রিম্যান ডাইসন'-এর মতে “মহাকুঞ্চনের একশত কোটি বছর আগে সুপার  
গ্যালাক্সি পুঁজি এবং কোয়াসার (quasar)গুলো একসঙ্গে ধাবিত হয়ে তাদের  
মধ্যেকার শূন্য পরিসর (space) ভরে তুলবে (অর্থাৎ বিশ্বজগত তার প্রান্তভাগ  
থেকে সংকুচিত হতে শুরু করবে)। মহাকুঞ্চনের দশ কোটি বছর আগে প্রতিটি  
গ্যালাক্সির ব্যবধান ঘুচে যাবে এবং সবগুলো গ্যালাক্সি একত্রিত হয়ে যাবে।  
আমাদের গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রগুলো বর্তমানে যে দূরত্বে অবস্থান করছে অনেকটা

সেৱপ দূৰত্বে সমগ্ৰ বিশ্ব তথন তাৱকারাজিতে ভৱে যাবে। মহাশূন্য সংকুচিত হতেই থাকবে। ছায়াপথগুলো ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে, মহাকৰ্ষ বল তাৱকামণ্ডলীকে আৱো কাছে থেকে কাছে নিয়ে আসবে। মহাকুশ্চনেৰ এক লক্ষ বছৰ পূৰ্বে কোন এক সময়ে তাৱকাগুলো এতো কাছাকাছি এসে পড়বে যে আকাশ শুধুমাত্ৰ চোখ ধাঁধানো উজ্জলতায় পৱিপূৰ্ণ থাকবে না, সে সাথে অসহনীয় গৱম হয়ে উঠবে। এ সময়ে বিশ্বেৰ কোন গ্ৰহে অবশ্যই প্রাণেৰ অস্তিত্ব থাকবে না। মহাকুশ্চনেৰ মাধ্যমে বিশ্বজগত নিজে নিজে ধৰ্ম হয়ে যাওয়াৰ এক হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে শত শত তাৱকা একে অপৱেৰ সাথে ধক্কাধাক্কি কৱবে। অতঃপৰ তাৱা প্ৰত্যেকে লঙ্ঘণ হয়ে ধৰ্মসেৱ কৃষ্ণ গহৰে পতিত হবে এবং চূড়ান্ত পৰ্যায়ে একদা বিশ্বজগত-এৰ সকল কিছু কৃষ্ণত এক অতি ক্ষুদ্ৰ এককে (a tiny infinitely compressed singularity) পৱিণত হবে।

এভাৱে শেষ দিনে বিশ্ব জগতকে গুটিয়ে এনে সীমাহীন ক্ষুদ্ৰ অবয়বে পৱিণত কৱা হবে।

### তথ্যসূত্র :

1. F. Dyson, Restless Universe, Henbest and Couper George Philip,  
1982.

٥۔ وَتَرَى السَّكِينَةَ حَافِذَةَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسْكِنُونَ بِمَحْمَدٍ رَّبِّهِمْ  
وَقُنْيَ يَنْهَمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

٣٩ : ٧٥ এবং তুমি ফিরিশতাদের দেখতে পাবে যে তারা আরশের চারপাশে  
ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা  
করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে, চারপাশ  
থেকে উচ্চারিত হবে- প্রশংসা, জগতসমূহের প্রতিপালক  
আল্লাহর প্রাপ্য।

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা গীত হবে অসংখ্য কারণে। আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব  
জগতের প্রতু হওয়ার কারণ ছাড়াও কিছু কিছু কারণ ১ : ২ আয়াতের  
ব্যাখ্যাকালে উপস্থাপন করা হয়েছে।

٦- مَوْلَانِيْ يُرِيكُنْ أَيْتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا  
وَمَا يَنْدَلِيْ كَرِيزَالَ مَنْ يُنِيبُ

৪০ : ১৩ তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নির্দর্শনাবলি দেখান এবং আকাশ হতে  
প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ; আল্লাহর অভিমুখী  
ব্যক্তিই উপদেশ প্রদেশ প্রদেশ করে।

আকাশ থেকে জীবনোপকরণ প্রেরণের বিষয়ে ১৫ : ২১ আয়াত প্রসঙ্গে  
আলোচন করা হয়েছে।

٨- وَأَنْذِهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ كَلْمِينَ هَمَالَ الطَّلَمِينَ مِنْ حَمِيمٍ  
وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ

৪০ : ১৮ তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ কঠে  
তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। সীমালংঘনকারীদের জন্য কোন  
অন্তরঙ্গ বস্তু নেই, যার সুপারিশ প্রাপ্ত হবে এমন কোন  
সুপারিশকারীও নেই।

আকস্মিক বিপদের কারণে ভীত মানুষের হৎকেশ্ব বেড়ে যেতে পারে এবং  
শ্঵াসরুক্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। এই  
আয়াতে কিয়ামতের দিনের ভীতিকর অবস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

۱۱- لَوْلَمْ يَعْلَمُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ كَانَ عَالِيَّهُ الَّذِينَ كَلُّا مِنْ بَلْهَمَ  
كَلْهَمَ لَهُمْ لِشَدَّ مِنْهُمُ الْقُوَّةُ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخْلَقَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ  
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَاقٍ ۝

৪০ : ২১ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা ছিল শক্তিতে ও কীর্তিতে ধ্বনিতর। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য এবং শাস্তি হতে তাদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে ছিল না।

এ বিষয়ে ২২ : ৪৫ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۲- لَحَلَّتِ الْمَوْتُ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৪০ : ৫৭ মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের সাম্প্রতিক জ্ঞান বিষয়ে ২ : ১১৭, ২ : ১৬৪, ৭ : ৫৪ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাকালে এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ আলোচনা করা হয়েছে। কাদা মাটির নির্যাস ও একটি শুক্রবিন্দু থেকে মানুষের সৃষ্টি এবং মাত্রজ্ঠরে জগনের বিকাশ লাভ সম্পর্কিত বিষয়ে ২৩ : ১২-১৪ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

সুপ্রতিষ্ঠিত মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang Theory) বহু প্রত্যয়গত (conceptual) সমস্যার কথা বলা যেতে পারে। এই তত্ত্ব অনুসারে আদিতে স্থান ও কালের (space, time) অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে এ কথায় আসতে হয় যে শূন্য থেকে এই বিশ্ব জগতের উদ্ভব হয়েছে, এর ভাবপর্য কী? এই সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সম্প্রতি তত্ত্ব তত্ত্ব (string theory)-এর কথা বলা হচ্ছে। যা হলো মাত্রাযুক্ত বাঁক বা dimensional carver-এর অনুরূপ। এই তত্ত্বগুলো অতি মাত্রায় ক্ষুদ্র। তাই এগুলোকে কখনো সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যাবে বলে আশা করা যায় না। তাহলে এটা মূলত singularity সমস্যাকে এড়ানোর জন্য একটি বিস্তাসের বিষয় মাত্র। দ্বিতীয় যে গুরুতর সমস্যার জবাব জানা আবশ্যিক তাহলো পচার্ব বিকিরণ (background radiation)  $3^{\circ}$  ডিগ্রী কেলভিন হয়ে থাকে কেন, এটা কি মহাবিস্ফোরণজনিত (big bang) isotropic-এর

অবশিষ্টাংশ? একটি ত্রিমাত্রিক পরিসর সম্পন্ন সমতলের space-time (স্থান-কাল)-এ দীর্ঘকালব্যাপী isotropizing-এর অসাধারণ গুণ থাকে। এটি সমতলীয় সমস্যা (flatness problem) নামে অভিহিত। যদি কোন ব্যক্তি মহাজাগতিক সময়ের অর্থাৎ প্র্যাংক টাইম Planck time ( $t=10^{43}$  সে $\text{c}$ )-এর প্রথম অবস্থায় বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করতো তাহলে সে দেখতো যে আজকের বিশ্বকে এই অবস্থায় পেতে হলে বিস্তৃতির হার  $10^{57}$ -এর চাইতে কমে সঠিক মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যশীলতা রক্ষা করতে হচ্ছে। বিশ্ব জগতের এই অতিমাত্রার ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ কোন জুয়াড়ীর অঙ্ক চাল-এর ন্যায় নিছক কোন দুর্ঘটনা হতে পারে না। কোন জুয়াড়ী ক্যাসিনোতে প্রবেশ করেই দেখতে পেল যে একই সাথে দুটি গুটিতে ছক্কা উঠেছে। এতে সে সম্পূর্ণ ভাস্তিবশত ধরে নিতে পারে যে, এটি ঘটেছে তার শুভ প্রবেশের কারণে। অথচ এটা ঘটেছে সম্ভাবনা সূত্রের মহা বৈশিষ্ট্যের কারণে, অর্থাৎ এই সূত্র অনুসারে বহুবার চেষ্টা করলে স্বল্প সম্ভাবনার কাম্য ফলাফল যে কোন সময় ঘটতে পারে। তবে সাফল্যের সংখ্যা সম্ভাব্য অবস্থার চাইতে বেশী হবে না।

পরিশেষে বিজ্ঞানী ডিরাক-এর বিপুল সংখ্যক প্রাক-কল্পনার (hypothesis) কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক। এ সকল প্রাক-কল্পনায় দেখানো হয়েছে যে, মহাজাগতিক সময়ের শুধুমাত্র একটি সীমিত সূচনাকালে, যখন নভোমগুলীয় অবস্থা অনুকূল থাকে তখন জীবন, মন ও চেতনার বিকাশ ঘটতে পারে। তাহলে জুয়াড়ীর অঙ্ক চালের মতো বলতে হবে যে প্রায় শূন্য সম্ভাবনা থেকে ঘটনাটি ঘটেছে- কারণ আমরা আছি অথচ ঘটনাটি ঘটেছে আমরা থাকার জন্য।

এই বিশাল বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে এবং কিছু কিছু অতীব জটিল সমস্যার যে এখনো সমাধান পাওয়া যায়নি, সে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অংক শাস্ত্রীয় জটিলতা যাই ধারুক না কেন শেষ পর্যায়ে মানুষকে একক বা singularity, তত্ত্ব তত্ত্ব ইত্যাদি কোন একটি বিশ্বাসের কাছে এসে থামতে হয়। অপরদিকে প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি এখন সুবিদিত ডি. এন. এ (deoxyribonucleic acid) সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করেছে। তবুও এখনো বহু কিছু সম্পর্কে জ্ঞানার বাকি আছে। তবে আকাশগঙ্গা ও পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে সবচাইতে জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি।

## ٥٩-لَيْلَةً لَّا تَرِبُّ فِيهَا وَلَكِنَ الْأَكْثَرُ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ

৪০ : ৫৯ কিয়ামত অবশ্যাভাবী, এতে কোন সদেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না।

সাধারণভাবে মানুষ মনে করে যে, দুনিয়ার জীবন চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু এই ধারণা ভুল, অব্যাহত জীবনধারা প্রধানত নির্ভর করে সূর্য হতে সরবরাহকৃত শক্তির উপর। যাহোক এভাবে শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে সূর্য বিশ্বয়কর হারে তার ভর হারাচ্ছে এবং ফলে একদিন তা ধ্রংস হতে বাধ্য। বিষয়টি ৭ : ৫৪ আয়ত প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١٠-اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَيَّلَ لِتَنْكِنُوا فِيهِ وَالثَّهَارَ مُبْهِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَنِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

୪୦ : ୬୧ ଆଜ୍ଞାହେ ତୋମାଦେର ବିଶ୍ରାମେର ଜନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ରାତ ଏବଂ  
ଆଲୋକୋଜ୍ଜ୍ଵଳ ଦିନ । ଆଜ୍ଞାହ ତୋ ମାନୁଷେର ଥିତ ଅନୁଗ୍ରହଶୀଳ ।  
କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମାନୁଷ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରେ ନା ।

٥٢- ذلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ تُؤْفَكُمْ فَكُونُوا مُؤْفَكُونَ ۝

৪০ : ৬২ এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্মষ্টা, তিনি  
ব্যক্তিত কোন ইন্দুর নাই, সুতরাং তোমরা কীভাবে বিপথগামী  
হচ্ছে?

ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ଯେ ସବକିଛୁର ମୃଷ୍ଟା ସେ ବିଷୟେ ୨ : ୧୧୭, ୨ : ୧୬୪, ୭ : ୭୪ ଏବଂ ପରିଶିଷ୍ଟ ୧, ୨ ଏବଂ ୪-୬ ବିଜ୍ଞାରିତଭାବେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଯେଛେ ।

٤٣-الله الذي جعل لكم الأرض فزاراً والسماء بناءً وصوركم فاخسن صوركم  
وزرقكم من الخير ذلكم الله ربكم فتح لك الله رب العرش

৪০ : ৬৪ আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং  
আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন  
করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের দান করেছেন উৎকৃষ্ট  
জীবনোপকরণ; এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক! কত  
মহান জগতসম্মতের প্রতিপালক আল্লাহ!

## ବିଶ୍ଵାମେର ସ୍ଥାନ ହିସେବେ ପୃଥିବୀ

ଏ ବିଷୟେ ୨ : ୨୨ ଆୟାତ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ ।

## ଶାମିଯାନା ହିସେବେ ଆକାଶ

ଆକାଶ ଯେ ରକ୍ଷକାରୀ ଏବଂ ମାନୁଷେର ମାଥାର ଉପର ଶାମିଯାନାର ମତୋ ଉପକାରୀ ଆଚାଦନ ହିସେବେ କାଜ କରେ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ୨ : ୨୨ ଆୟାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଳେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ ।

## ମାନୁଷକେ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ଦାନ

ଏ ବିଷୟେ ୧୩ : ୮ ଆୟାତ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଏବଂ ପରିଶିଷ୍ଟ ୬-୬ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ ।

## ଜୀବିକାର ସଂସ୍ଥାନ

ଆକାଶ ଥିକେ ଜୀବନୋପକରଣ ପ୍ରେରଣ ସମ୍ପର୍କେ ୧୫ : ୨୧ ଆୟାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଳେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ ।

٤٤- قُلْ إِنَّ رَبِّيُّهُمْ أَنَّ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَأْتُونَ بِالْبُيُّنَةِ  
مِنْ نَحْنُنَّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

٤٥- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا  
ثُمَّ يَتَبَلَّغُوا أَشُدَّ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَا شَيْئًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّيْ مِنْ قَبْلٍ  
وَلَا يَتَبَلَّغُونَا أَجَلًا مُسْتَقِيًّا وَلَعَلَّ كُمْ تَعْقِلُونَ ۝

୪୦ : ୬୬-୬୭ ବଲ, ଆମାର ପ୍ରତିପାଳକେର ନିକଟ ହତେ ଆମାର ନିକଟ ସୁମ୍ପଟ  
ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଆସାର ପର ତୋମରା ଆଶ୍ରାହ ବ୍ୟାତୀତ ଯାଦେରକେ  
ଆହବାନ କର, ତାଦେରକେ ଇବାଦତ କରତେ ଆମାକେ ନିଷେଧ କରା  
ହେଁଛେ ଏବଂ ଆମି ଆଦିଷ୍ଟ ହେଁଛି ଜଗତସମ୍ବ୍ରହ୍ମର  
ପ୍ରତିପାଳକେର ନିକଟ ଆଜ୍ଞାସମର୍ପଣ କରତେ ।

ତିନିଇ ତୋମାଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି କରେହେଲ ମୃତ୍ୟୁକା ହତେ, ପରେ ଉତ୍କ  
ବିନ୍ଦୁ ହତେ, ତାରପର ଆଲାକା ହତେ, ତାରପର ତୋମାଦେରକେ ବେର  
କରେଲ ଶିତ୍ତରପେ, ଅତଃପର ତୋମରା ଯେନ ଉପନୀତ ହୁଏ  
ଯୌବନେ, ତାରପର ହୁଏ ବୃଦ୍ଧ । ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କାରାଓ ଏମି

পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এজন্য যে, তোমরা নির্ধারিতকাল প্রাণ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

### আল্লাহর নির্দশন ও জগতসমূহের প্রভু

আল্লাহ তা'আলা ৪০ : ৬৬ আয়াতে জগতসমূহের প্রভু হিসেবে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহের কথা বলা হয়েছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দশনসমূহ বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। এর মধ্যে কিছু কিছু নির্দশন সম্পর্কে অন্যান্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে জগতসমূহের প্রভু সে সম্পর্কে ১ : ২ আয়াত প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

### মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি

৪০ : ৬৭ আয়াতে উল্লেখিত মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার কথাটি বুরো যায় যখন দেখা যায় যে মানব দেহ যে সকল প্রধান প্রধান গঠনকারী উপাদান নিয়ে গঠিত সে সকল উপাদান মাটিতেও আছে। মাটির ন্যূন বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে গঠনকারী উপাদানগুলো পাওয়া গেছে তা নিম্নের সারণি-১ এ দেখানো হলো।

### সারণি-১, ভূ-ভূকের রাসায়নিক গঠনের গড় হিসাব।

উপাদান	মাটিতে বিদ্যমান উপাদানের হার (শতকরা হিসেবে)	অক্সাইডসমূহ	মাটিতে বিদ্যমান অক্সাইডের শতকরা হার
O	৪৬.৪৬		
Si	২৭.৬১	SiO <sub>2</sub>	৫৯.০৮
Al	৮.০৭	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	১৫.২৩
Fe	৫.০৬	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	৩.১০
Ca	৩.৬৪	FeO	৩.৭২
Mg	২.০৭	CaO	৫.১০
Na	২.৭৫	MgO	৩.৪৫
K	২.৫৮	Na <sub>2</sub> O	৩.৭১
Ti	০.৬২	K <sub>2</sub> O	৩.১১
P	০.১২	TiO <sub>2</sub>	১.০৩
Mn	০.০৯	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	০.২৯
S	০.০৬	MnO	০.১২
Cl	০.০৫	H <sub>2</sub> O	১.৩০

মজাৰ ব্যাপার হলো, এই একই উপাদানগুলো মানব দেহেও বিদ্যমান। যা হোক এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এ সকল উপাদান একত্রিত কৱলেই মানুষ বা জীবন সৃষ্টি হবে না। এ সকল উপাদান দ্বাৰা জীবন সৃষ্টি কৰা ঐশী কাজ। আধুনিক বিজ্ঞান এই কাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্ৰ উন্মোচন কৱেছে।

### শুল্ক বিন্দু এবং ‘আলাক’ থেকে সৃষ্টি

৪০ : ৬৭ আয়াতে উল্লেখিত এ বিষয়টি সম্পর্কে ১৮ : ৩৭, ২২ : ৫ এবং ২৩ : ১৩-১৪ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা কৱা হয়েছে।

### তথ্যসূত্র :

1. F. W. Charke, and S. H. S. Washington, The Composition of the Earth's Crust, U. S. Geological Survey Profess. Paper 127, 1924.

٦٠- هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ وَيُبَيِّنُ ۚ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَلَا تَسْأَئِلُنَّ لَهُ كُنْ فَتَكُونُ ۝

৪০ : ৬৮ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, যখন তিনি কিছু হিঁর করেন তখন তিনি বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

ইলাহী আদেশ 'হও' সম্পর্কে ৩৬ : ৮২ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٦١- كَلَّهُ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ الْأَعْمَارِ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

০- وَلَكُفْرُ فِيهَا مَنْ تَأْفِفُ ۖ وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُخْمَلُونَ ۝

৪০ : ৭৯-৮০ আল্লাহই তোমাদের জন্য আনআম সৃষ্টি করেছেন। কিছুতে আরোহণ করার জন্য এবং কিছু তোমরা আহার করে থাক। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রতি উপকার, তোমরা যা প্রয়োজনবোধ কর, এস্বারা পূর্ণ করে থাক এবং এর উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

এখানে পরম করণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য যে সকল আনআম বা পশ্চ নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন তা থেকে আমরা যানবাহন, মাংস ও দুধ আকারে যে সকল সুবিধা পেয়ে থাকি সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য সুবিধা যেমন পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে ১৬ : ৫, ১৬ : ৭, ১৬ : ৮ এবং ১৬ : ৬৬ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাকালে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সমুদ্রের বুকে মানমের উপকারার্থে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে ২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে।

٦٢- أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ۖ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كُنُوا أَكْثَرُهُمْ مَوْأِدَةً فُؤُودًا ۖ وَأَثْلَامًا فِي الْأَرْضِ

لَا أَعْلَمُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৪০ : ৮২ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি ও দেখে নি তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল তাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তি ও কীর্তিতে প্রবল। তারা যা করতো তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

এ প্রসঙ্গে ৭ : ৮ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

- ٩- قُلْ أَئِنَّكُمْ لَكُفَّارٌ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا  
ذَلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۝
- ١٠- وَجَعَلَ فِيهَا زَوَافِي مِنْ فَوْقِهَا وَنِزْكٍ فِيهَا وَقَدْرَ فِيهَا أَقْوَاهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ  
سَوَاءٌ إِلَى سَائِلِينَ ۝
- ١١- ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْنَيْنِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا  
قَالَتَا أَتَيْنَاكَ أَيْمَانِنَ ۝
- ١٢- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْنَى فِي كُلِّ سَنَاءٍ أَمْرَهَا وَرَتَنَّا السَّمَاءَ  
الَّذِي نَّا بِصَابِرٍ وَحْفَظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الرَّحِيمِ الْعَلِيمِ ۝

৪১ : ৯-১২ তোমরা কি তাঁকে অঙ্গীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন  
দু'দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি  
তো জগতসমূহের প্রতিপালক।

তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং এতে  
রেখেছেন কল্পণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবহা করেছেন  
পরিমিত খাদ্যের, যাগাকারীদের জন্য।

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল  
ধূস্রপুঁজি বিশেষ। অতঃপর তিনি তাঁকে এবং পৃথিবীকে  
বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, তারা  
বললো আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।

অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দু'দিনে সঞ্চাকাশে পরিষ্কত  
করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে এর বিধান ব্যক্ত করলেন।  
এবং নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন ধনীগমালা  
দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত। এটা প্রাক্রমশালী সর্বজ্ঞ  
আল্লাহর ব্যবহারণ।

### পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি

এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ২  
দিনে, জীবিকার জন্য খাদ্য ৪ দিনে এবং সঞ্চাকাশ ২ দিনে। এতে প্রতীয়মান হয়  
যে সৃষ্টির এই ঘটনাগুলো মোট ৮ দিনে সম্পন্ন হয়েছে। ৭ : ৫৪ আয়াতের  
বক্তব্যের সাথে উপরের বর্ণনায় পরম্পর বিরোধিতা আছে বলে মনে হতে পারে।

যেখানে বলা হয়েছে যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৬ দিনে। সুতরাং এখানে ২ দিনের গরমিল দেখা যায়। ৭ : ৫৪ আয়াতের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে ‘দিন’ বলতে শুধুমাত্র পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তনের সময়কে বুঝানো হয় না। আল্লাহ তা'আলার নিকট ‘দিন’ বলতে কোন একটি ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে বুঝানো হতে পারে। কোন একটি ঘটনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দীর্ঘ হতে পারে, আবার অন্য ক্ষেত্রে ছুঁত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ‘দিন’ আমাদের সময়ের হিসাবে ১০০০ বছর অথবা ৫০০০০ বছর হতে পারে। অধিকতু দুটি ঘটনা একই সাথে ঘটতে পারে। ৭ : ৫৪ আয়াতের আলোচনায় বলা হয়েছে যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে একই সাথে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নয়। সুতরাং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির দুটি ঘটনা সম্পন্ন হয়েছে একই পর্যায়ে। ৭ : ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর উদ্বিদ ও পশ্চাপাথি বর্তমান অবস্থায় এসেছে ৪টি পর্যায়ে অর্থাৎ ৪টি ভূতাত্ত্বিক পর্যায়ের মাধ্যমে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৪১ : ৯ আয়াতে এবং আকাশমণ্ডল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে অন্য আয়াতে অর্থাৎ ৪১ : ১২ আয়াতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একই সময়ের দুটি পর্যায় সম্পর্কে দুটি ভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এই পর্যায়গুলোকে গণনা করতে হবে ২ হিসেবে, ৪ নয়। সুতরাং এই আয়াতগুলোতে কোন পরম্পর বিরোধিতা নেই।

### জগতসমূহের প্রভু

১ : ২ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

### পর্বতসমূহের দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি

এ বিষয়ে ১৩ : ৩ এবং ২১ : ৩১ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

### পরিমিত খাদ্যের ব্যবস্থা

পরিমিত খাদ্যের ব্যবস্থা করার অর্থ হলো বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের যোগান দেয়া যাতে মানুষ সুস্থ খাবার প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যথার্থ পরিমাণে পায়, যা তার সুস্থান্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয়। একটি পূর্ণাঙ্গ খাবারে থাকে

୧୫% ପ୍ରୋଟିନ, ୬୦% କାରୋହାଇଡ୍ରୋଟ, ୧୫% ଚରି ଏବଂ ୧୦% ପାନି, ଖନିଜ ଏବଂ ଭିଟାଯିନ । ଅନୁକୂଳତାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଖାବାରେଓ ପ୍ରୋଜନୀୟ ଉପାଦାନ ସଥାଯଥ ପରିମାଣେ ଥାକତେ ହେଁ । ଖାଦ୍ୟେର ଉଂସ ହଞ୍ଚେ ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗେ ପାଓୟା ଉତ୍ସିଦ ଓ ପଣ ପାରି । ଖାଦ୍ୟେର ଏହି ଉଂସଙ୍ଗଲୋ ୪ଟି ଭୂତାତ୍ତ୍ଵିକ ଯୁଗେର ୪ଟି କ୍ଷରେ ବିବରିତି ହେଁଛେ । ୭ : ୫୪ ଆଯାତେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ ।

### ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଉଭୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଁଯା

ଏଥାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କେ ଉତ୍ସେଖ କରା ହେଁଛେ । ୭ : ୫୪ ଆଯାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଳେ ଏ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରା ହେଁଛେ ଯେ ମହାବିକ୍ଷୋରଣେର (big bang) ପର ଆଦି ଅଗ୍ନିଗୋଲକ ବିକ୍ଷେରିତ ହେଁ ପ୍ରୋଟିନ, ନିଉଟ୍ରନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସମ୍ମନ୍ଦ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ରୁତ ସମ୍ପ୍ରାରଣ ଓ ଶୀତଳୀକରଣେର ମାଧ୍ୟମେ ଏକ ଗଭୀର ବିକିରଣ ସମୁଦ୍ରଙ୍କପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଁ । ପ୍ରଥମେ ବିକିରଣେର ଚାପ ସୁଚାରୁଙ୍କପେ ବିବୃତି ରକ୍ଷା କରେ ଚଲେ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁରୁତେ ମହାକର୍ଷ ବଲେର ଆବିର୍ଭାବ ହେଁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍ଗଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ କରତେ ଆରଣ୍ୟ କରେ । ପ୍ରୋଟିନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏକତ୍ରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନିଉଟ୍ରିନ୍ୟ ଗଠନ କରେ । ବୈଶୀର ଭାଗ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏୟାଟମଜାତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ହିଲିଆମ ଏକତ୍ରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଁ ପୁଣ୍ଡିତ୍ ଆକାର ଧାରଣ କରେ । ଗ୍ୟାସେର ଏହି ପୁଞ୍ଜଙ୍ଗଲୋ ଏକେ ଅପର ଥେକେ ଆଲାଦା ହେଁ ଡେସେ ବେଡ଼ାତେ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ମହାକାଶେ ଭାସମାନ ଏ ସକଳ ବନ୍ଧୁ ମହାକର୍ଷ ବଲେର କାରଣେ ଆଶପାଶେର ଆରୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କେ ଘନ ସନ୍ନିବିଟି କରେ ଦେୟ ଏବଂ ଆଲଗା ଧରନେର ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେମନ ତାରକା ପୁଞ୍ଜ ଓ ଗ୍ୟାଲାକ୍ରୀସମୂହେର ହାନୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାଲାକ୍ରୀସମୂହେର ହାନୀୟ ପୁଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରା ଡିନ୍ ଡିନ୍ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଁଛେ । ଆମାଦେର ସୌର ଜଗତେ ଯେକୁପ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଏହଙ୍ଗଲୋ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଯ ସେଇପଭାବେ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର ଗଠିତ ହେଁ ଥାକେ । ଏଭାବେ ମହାକର୍ଷ ବଲେର କାରଣେ ତଥା ଆଶ୍ଵାହର ଆଦେଶେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦିକେ ଆକର୍ଷିତ ହତେ ଥାକେ ଏବଂ କାହେ ଚଲେ ଆସେ । ଅତଏବ ଏଭାବେ ଦୁ'ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨ ଦିନେ ସଞ୍ଗାକାଶେର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଁଛେ ।

### ସଞ୍ଗାକାଶ ସୃଷ୍ଟି

ସଞ୍ଗାକାଶ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ୨ : ୨୯ ଆଯାତେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ । ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ତାର ସକଳ ଅଂଶ ତଥା ସାତ ଆସମାନ ନିଯେ ସୁଶୃଂଖଳ ଓ ସୁସମ୍ବିତ ରଙ୍ଗେ ଆହେ । ଏହି ଶୃଂଖଳା ଓ ନିର୍ବ୍ଲତ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଜଗତେର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶେର ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଆହେ । ବିଶ୍ୱ ଜଗତେର ସେ କୋଣ ଅଂଶେ ବିଶୃଂଖଳା ବା ଭାରଦେଶେର ପ୍ରତି ଅବାଧତା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଜଗତେ ବିପର୍ଯ୍ୟାୟକୁଟିକାରୀ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରତେ ପାରେ ।

বিগ-ব্যাং-এর এক সেকেন্ড পরের অবস্থা সম্পর্কে লোডেল<sup>১</sup> মন্তব্য করেছেন যে, যদি ঐ মুহূর্তে বিশ্বজগতের কোন একটি অংশের বিস্তৃতি এক লক্ষ কোটি ভাগেরও কম হারে হতো তাহলে কয়েক মিলিয়ন বছরের মধ্যে বিশ্বজগত ধ্রংস হয়ে যেত। তিনি আরো লিখেছেন যে “অনুরূপভাবে যদি বিস্তৃতি সামান্যতম হারেও বৃদ্ধি পেত তাহলে তার বিশালত্ব এতো বেশী হতো যে মহাকর্ষ নিয়ন্ত্রিত (অর্থাৎ তারকাপুঁজ ও গ্যালাক্সিসমূহ) কোন ব্যবস্থা গড়ে উঠতো না।”

সৌরজগত, আমাদের গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত তারকাপুঁজ তথা ছায়াপথ নিয়ে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশ গঠিত হয়েছে। এখানে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের তারকা সন্নিবেশিত রয়েছে, এগুলো আকাশকে আলোকমালায় সুশোভিত করেছে। আকাশমণ্ডলীয় এ সকল বস্তু অত্যন্ত নিখুতভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার বিধান মেনে চলছে। এ বিষয়ে ৭ : ৫৪ আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

#### তথ্যসূত্র :

1. Lovell, Bernard, *In the Centre of Immensities*, Hutchinson and Co. Ltd. London. pp. 122-23, 1979.

۱۰- قَاتُلَ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْدُرْهَا تَكُمْ صِيقَةً

مِثْلَ صِيقَةٍ عَادَ وَسُودَ

৪১ : ১৩ তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, ‘আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধৰ্সকর শান্তির, আদ ও ছামূদের শান্তির অনুরূপ।’

এই আয়াতে অবিশ্বাসের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীদেরকে আদ ও ছামূদ জাতির অনুরূপ শান্তি দেয়া হতে পারে, যে সম্পর্কে ১১ : ৬০ ও ২২ : ৬৫ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۱- قَارَسْلَنَا عَلَيْهِمْ رِبْحًا صَرَّافٍ إِنَّا مِنْ حَسَابٍ لِلْغُرْبِيِّ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنَصَّرُونَ

৪১ : ১৬ অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শান্তি আবাদন করাবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম বাঞ্ছা বায়ু অগ্রভ দিনে। পরলোকের শান্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

এই আয়াতে আদ জাতির অবাধ্যতার জন্য প্রদত্ত শান্তির কথা বলা হয়েছে। তাদের উপর একটি শান্তি এসেছিল বাঞ্ছা বায়ুর আকারে। বিভিন্ন প্রকার বায়ু সম্পর্কে ১৭ : ৬৯ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۲- وَأَتَائِسْوَدَ فَهَدَى يُنْهَمُ فَاسْتَحْبِبُوا الْعَسْيَ عَلَى الْهَدْيِ  
فَأَخْذُهُمْ صِيقَةً الْعَذَابُ الْهُوَنُ يُمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

৪১ : ১৭ আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভাঙ্গপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শান্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণামবৰুৱা।

সাম্যিকাত তথা বজ্জ ও বিদ্যুতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ২ : ১৯ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যুতালোকের দ্বারা যে ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে ১৩ : ১২ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَمَنْ أَيْتَهُ الْأَيْلُ وَالْهَادِرُ وَالْقَسْرُ وَلَا تَبْعِدُنَا إِلَيْنَا وَلَا لِغَرَبٍ

وَاسْبُعْدُوا إِلَهَ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِلَيْاهُ تَعْبُدُونَ ۝

৪১ : ৩৭ তাঁর নির্দর্শনাবণীর মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চাঁদকেও নয়, সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

রাত এবং দিন যে আল্লাহ তা'আলার নির্দর্শন সে সম্পর্কে ২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে। চাঁদ এবং সূর্য আল্লাহ তা'আলার নির্দর্শন হওয়া সম্পর্কে ১০ : ৫ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে। চন্দ্র ও সূর্যের সৃষ্টি সম্পর্কে পরিশিষ্ট-১-এ আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক অজ্ঞ লোক চন্দ্র এবং সূর্যকে সিজদা করে অথচ আল্লাহ তা'আলা যিনি সৃষ্টি এবং জগতসমূহের প্রতিপালক, তিনিই একমাত্র সিজদা পাওয়ার যোগ্য।

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْكَثَ رَبِّ الْأَرْضَ حَائِشَةً فَإِذَا آتَنَاكَ عَلَيْهَا الْأَمَةَ أَهْزَنْتُ وَرَبَّتُ ۝

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَتُخْتِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪১ : ৩৯ এবং তার একটি নির্দর্শন এই যে তৃমি ভূমিকে দেখতে পাও শুক, উমর। অতঃপর আমি এতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও ক্ষীত হয়। যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃত্তের জীবন দানকারী। তিনি তো সব বিষয়ে জীবনদানকারী।

শুক ভূমিকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বারিপাতের মাধ্যমে পুনর্জীবিত করা সম্পর্কে ২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ الْعَاقِعَةِ وَمَا تَحْرِيرُهُ مِنْ سُرَرَتْ مِنْ أَكْمَانِهَا  
وَمَا تَعْمَلُ مِنْ أَنْشَىٰ وَلَا تَفْعِلُهُ وَيَوْمَ يُنَادِي بِهِمْ أَيْنَ شُرَكَاهُ  
إِلَوْا أَذْلَكَ مَا مَنَّا مِنْ شَهْمَدْ ۝

৪১ : ৪৭ ক্রিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহতেই ন্যস্ত, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না, যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, ‘আমার শরীকেরা কোথায়?’ তখন তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

গর্ভাশয়ে গর্ভধারণের অর্থ হলো পূর্ণাঙ্গ ডিসাগুর সাথে শক্রাগুর সংমিশ্রণের মাধ্যমে জন্মের জন্মলাভ এবং তা জরায়ুতে সংস্থাপিত হওয়া। এই প্রক্রিয়া এমনিভাবে ঘটে যার সঠিক সময় সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নেই, কেবল আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। এ সম্পর্কে ৩১ : ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি সফলভাবে সন্তান প্রসব করাও আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের অধীন। এ বিষয়ে পরিশিষ্ট-৬-এ আলোচনা করা হয়েছে।

وَسُرْئِنْهُمْ أَلْيَتَنَافِي الْأَنْفَاقِ وَنِيَّةً أَنْفِسِهِمْ حَتَّىٰ

بَيْتَيْنِ لَهُمَا أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৪১ : ৫৩ আমি তাদের জন্য আমার নির্দর্শনাবলী ব্যক্ত করব দিগন্তে এবং  
তাদের নিজেদের মধ্যে ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে  
যে, এটাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপাদক  
সর্ব বিষয়ে অভিহিত?

এবাবে প্রথমে দিগন্তের নির্দর্শনাবলী সম্পর্কে এবং জ্ঞানের পরিধি বৃক্ষি  
পাওয়ার সাথে সাথে কিভাবে দিগন্তের পরিধি বিস্তৃত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা  
করব। সভ্যতার প্রথম থেকেই মানবজাতির নিকট আল্লাহ তা'আলার  
নির্দর্শনাবলি পর্যায়ক্রমে প্রদর্শিত হয়েছে এবং আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত  
থাকবে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মনে করা হতো যে আকাশে তারকারাজি এবং  
সাতটি গ্রহ আছে। চন্দ্র এবং সূর্যকে দুটি গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, মনে  
করা হতো যে পৃথিবী গ্রহ নয় বরং তা কেন্দ্রস্থলে অনড়ভাবে স্থাপিত। তারপর  
জানা গেল যে সূর্য এবং চন্দ্র দুটি গ্রহ, তবে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘূরে। আরো  
জানা গেল যে বিভিন্ন ধরনের জ্যোতিষ্ক্রমণ্ডলী আছে যেমন তারকাপুঞ্জ, গ্রহসমূহ,  
উপগ্রহসমূহ, নেবুলা, গ্যালাক্সি ও কোয়াসারসমূহ। মানব জাতিকে আরো  
জানানো হলো যে বিভিন্ন ধরনের তারকা বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে।  
পরিশিষ্ট-১-এ দেখানো হয়েছে যে কোন তারকার ভর যদি সূর্যের তুলনায় এক  
দশমাংশেরও কম হয় তাহলে নিউক্লিয়ার সংযোজন (nuclear fusion) তৈরি  
হয় না, ওধুমাত্র মহাকর্ষজনিত চাপের কারণে সৃষ্টি তাপের দ্বারা কিরণ দিয়ে  
থাকে। এই তাপমাত্রার একটি তারকার রং হয়ে থাকে বাদামী, তাই এক্সপ  
তারকাকে বাদামী বামন (brown dwarf) নামে অভিহিত করা হয়। যদি কোন

তারকার ভর বেশী হয় (তবে সূর্যের তুলনায় ১.৪৪ গুণের চাইতে বেশী না হয় ক্রান্তি ভর (critical mass; Chandrasekhars limit) চন্দ্র শেখর মাত্রা) তাহলে নিউক্লীয় সংযোজন (nuclear fusion) সম্ভব এবং সেখানকার মহাকর্ষ বল তারকার বিস্তৃতি ঘটাতে চেষ্টা করে। এভাবে দীর্ঘকাল ধরে অর্থাৎ প্রায় ১২ শত কোটি বছর ধরে ভারসাম্য রক্ষা করে। এই পর্যায়ে তারকাকে বলা হয় প্রধান অনুবর্তী তারকা (sequence star)। কিন্তু পরিশেষে বিকিরণ চাপ মহাকর্ষ বল-এর উপর জয়ী হয় এবং তারকাটি বিশাল আকার ধারণ করে; তাপমাত্রা কমে গিয়ে রক্ত বর্ণ ধারণ করে। এই পর্যায়ের তারকাকে বলা হয় লাল দৈত্য তারকা (red giant star)। এভাবে বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে এবং তারকার মধ্যে অস্ত্রিগ্রহ অবস্থা চলতে থাকে। তারকাটি পর্যায়ক্রমে স্পন্দিত, বিস্তৃত এবং সংকুচিত হয়। এই পর্যায়ের তারকাকে বলা হয় স্পন্দিত তারকা (pulsating star)। অবেশেষে তারকার বহিরাবরণ পৃথক হয়ে দূরে সরে যায় এবং কেন্দ্রীয় অংশ দারুণভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। এ সময়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তারকাটি সাদা দেখায়। এই পর্যায়ের তারকাকে শ্বেত বামন (white dwarf) তারকা নামে অভিহিত করা হয়।

যদি তারকার ভর বেশী হয় তবে ক্রান্তি ভরের (critical mass) চাইতে বেশী না হয়, ধরা যাক তারকার ভর যদি দশগুণ বেশী হয় তাহলে মহাকাশের চাপ এতো বেশী হয় যে তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। এ সময় শ্বেত বামন ধ্রংস প্রাণ হয়। এই ধ্রংসাত্মক ঘটনার ফলে নোভা (nova) এবং সুপার নোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে বল অবযুক্ত হয়। এই পর্যায়ে নিউট্রনের সমরয়ে তারকা তার মধ্যে কোর (core) বা কেন্দ্র গড়ে তুলে। এই পর্যায়ের তারকা নিউট্রন তারকা হিসেবে পরিচিত। এর থাকে ১০১৪ গ্রাম/ সি সি-এর মতো বিশাল ঘনত্ব। নিউট্রন তারকাকে পালসার বা স্পন্দনকারী তারকাও বলা হয়ে থাকে (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

এরপরও যদি কোন তারকার ভর বেশী থাকে, ধরা যাক সূর্যের চাইতে ১০০ বা ১০০০ গুণ বেশী হয় তাহলে শ্বেত বামন পর্যায়ের তারকা নিউট্রন পর্যায়ের তারকার আগেই ধ্রংস হয়ে যায় এবং বিপুল পরিমাণ নক্ষত্র কণিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। এগুলো সুপার নোভা নিষ্কারণ ঘটিয়ে শত শত কোটি সংখ্যক সূর্যের চাইতেও বেশী ঔজ্জ্বল্যে জুলে উঠে। আর অবশিষ্টাংশের ঘনত্ব এতো বেশী থাকে যে মহাকর্ষ বল-এর কবজ্ঞ থেকে আলো বেরিয়ে আসতে পারে না। তারকাটি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে, যাকে বলা হয় কৃষ্ণ গহ্বর (black hole)।

নক্ষত্রাজি ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে আরো অন্যান্য জ্যোতিষ্করাজি উন্মুক্ত রেখেছেন যেগুলো এই বিশ্ব জগতের অংশ বিশেষ। এগুলো হচ্ছে এহ, উপগ্রহ, নেবুলা, গ্যালাক্সি ও কোয়াসারসমূহ।

যদিও সূর্য ছাড়াও অন্যান্য তারকার প্রহসমূহ এখানে খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা যায়নি, তবুও কিছু কিছু তারকার চারপাশে ঘূর্ণ্যমান গ্রহের উপস্থিতি সম্পর্কে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে। নেবুলা বলতে গ্যাস ও ধূলিকণার সমন্বয়ে গঠিত মেঘমালা যা নিজেদের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। নেবুলা নাক্ষত্রিক স্পেসে (space) গ্যাস ও ধূলিকণার সমন্বয়ে মেঘমালার আকারে বিদ্যমান থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'লাল দৈত্য নক্ষত্র' থেকে গ্যাসীয় ভর দূরে সরে যায় এবং আন্তঃবিক্ষেপারণের কারণে নাক্ষত্রিক ধূলিকণা নিষ্কিণ্ড হয়ে নোভা ও সুপারনোভা বিক্ষেপণ ঘটায়। এ সকল বস্তু আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিকণার সৃষ্টি করে এবং তা থেকে গড়ে উঠে নেবুলা। নেবুলা হচ্ছে তারকা ও নাক্ষত্রিক ব্যবস্থার জন্মস্থান। গ্যালাক্সি হচ্ছে তারকারাজির পরম্পরারের মধ্যে হালকা ধরনের মহাকর্ষিক বস্তু ব্যবস্থা। গ্যালাক্সিগুলো বিপুল গতিতে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোয়াসার হচ্ছে বিশ্বজগতের সব চাইতে কৌতুহলোদ্দীপক ও শক্তিশালী বস্তু। দশ হাজার কোটি তারকা নিয়ে গঠিত ছায়াপথের মতো (milky way) একটি গ্যালাক্সি অপেক্ষা একটি কোয়াসার ১০০ বা ১০০০ গুণ বেশী শক্তি নির্গমন করে। এগুলো খুবই শক্তিশালী ব্যাসের (diameter) রেডিও উৎস (radio source) এবং কখনো কখনো তা এক সেকেণ্ড আর্ক (a second of arc)-এর ও কম হয়ে থাকে। এগুলো শুধু গ্যালাক্সি বহির্ভূত বস্তু হিসেবেই নয় বহু দূরের গ্যালাক্সির সাথেও তুলনীয়। কোয়াসারগুলোর অবস্থান দু'হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে। তারা আলোর চেয়েও ৯০% দ্রুত গতিতে পিছু সরে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে, কোয়াসার হচ্ছে কেন্দ্রে প্রচুর সংখ্যক কৃষ্ণ গহন্ত সম্বলিত অদৃশ্য গ্যালাক্সি।

নিখিলবীক্ষণ (macroscopic) জগতের এই বিকাশের ফলে পৃথিবী থেকে বিশ্বজগতের দূরতম সীমা পর্যন্ত এ যাবত যা জানা গেছে (অর্থাৎ ১০২৮ সে. মি. দ্বারা) তা আমাদেরকে জ্ঞান জগতের চিরবর্ধিমূল দিগন্তের কথা বলে প্রতি মুহূর্তে জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে চলেছে, আর আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নতুন নতুন নির্দর্শন দেখতে পাচ্ছি। বস্তুত যাইজাগতিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার বহু নির্দর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর প্রতিটি বস্তুরাজির গঠনের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞান ভাগারের অংশ বিশেষ মাত্র ফুঠে উঠেছে। আগুন্যবীক্ষণিক (microscopic) জগতেও আমরা গঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন তর দেখতে পাই। প্রথম দিকে আগুন, পানি, বাতাস ও মাটিকে বস্তুর প্রাথমিক

উপাদান হিসেবে মনে করা হতো। পরবর্তীতে মানুষের পর্যায়ক্রমিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে যৌগ, উপাদান, মলিকিউল, এটম, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেক্ট্রন, শক্তিশালী পারম্পরিক প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন অন্যান্য বস্তু কণা এবং লেপটন-এর building block বা গঠনকারী পিণি পর্যন্ত এসে পৌছেছে। লেপটন গঠিত হয় ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি দ্বারা। কোয়ার্ককে মনে করা হয় প্রকৃতির building block বা গঠনকারী পিণি। কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি এ প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব ভবিষ্যত অনুসন্ধান থেকে পাওয়া যেতে পারে। বস্তুর গঠনকারী উপাদান সম্পর্কে জানতে গিয়ে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠন কাঠামো সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ফলে এই প্রতিক্রিয়ায় মানুষ আল্লাহ তা'আলার নতুন নতুন নির্দর্শন আবিষ্কার করতে পেরেছে। যেমন পরমাণু (atom) গঠনের ক্ষেত্রে 'তড়িৎ চৰ্বীয় বল' (electromagnetic force) ক্রিয়াশীল থাকা, দুর্বল নিউক্লীয় বল তেজক্রিয়তা (radioactivity) তৈরির জন্য দায়ী হওয়া এবং অপরদিকে সবল নিউক্লীয় বল (strong nuclear force)-এর কারণে নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়নকে ধরে রাখা ইত্যাদি। তবে এ সকল বল কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা আজও রহস্যাবৃত। এ সকল বল কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে পদাৰ্থ বিজ্ঞানীদের কিছুটা গ্ৰহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারলেও এগুলো কেন কাজ করে সে ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। অন্যদিকে অবাক হওয়ার বিষয় হলো, এ সকল বল না থাকলে কোন বস্তু (জড় ও জীব) বর্তমান অবস্থায় অস্তিত্ব পেত না। মজার ব্যাপার হলো সালাম, ওয়েনবার্গ, প্লাশো এবং অতি সম্প্রতিকালে অন্য আরো অনেকে সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রকৃতির এ যাবত জানা চারটি বল (মহাকর্ষ বল ও অন্য তিনটি বল সম্পর্কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে) কে সমবিতভাবে দেখতে চেয়েছেন। তাঁরা অতি বৃহৎ (মহাকাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব) এবং অতি ক্ষুদ্র (পদাৰ্থ বিজ্ঞানের অতি ক্ষুদ্র কণা)-এর মধ্যে বিশ্বয়কর মিল খুঁজে পেয়েছেন। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের এই সম্বয় (synthesis) থেকে এমন এক বিশ্বয়কর ও সূক্ষ্ম কৌশল প্রকাশ পায় যে, মহান প্রভু তাঁর এক মহাপরিকল্পনার আওতায় ধারাবাহিকভাবে গাণিতিক নিয়ম অনুসারে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন এবং তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থাও নিয়েছেন।

আমাদের নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ মানবদেহের মধ্যে প্রকাশিত আল্লাহ তা'আলার নির্দর্শন সম্পর্কে কয়েকটি কথা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

গত একশত বছরে মানব দেহ সম্পর্কে যে গবেষণা সমূহ হয়েছে তাতে অতীয়মান হয় যে, মানব দেহও একটি ক্ষুদ্রাকারের বিশ্ব। মানবদেহের কোষগুলোকে (cells) অতিমাত্রায় উচুমান সম্পন্ন উৎপাদন কারখানা বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এখানে তৈরি করা হয়।

কোষের অভ্যন্তরে সূতোর মতো ক্রমোজমের (chromosome) মধ্যে থাকে ডি.এন.এ (Deoxyribonucleic Acid) অণু। এই মলিকিউল (molecule) বা অণুকে বলা হয় জীবনের মুখ্য অণু বা master molecule। এগুলো দ্বারা গঠিত হয় জীবনে বৎসরগতির নীল নকশা। আমাদের বৈশিষ্ট্য (যেমন রং, উচ্চতা, বৃদ্ধিমত্তা) এবং জৈবিক কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য এখানে কোড বা সংকেত (এগুলো হচ্ছে মূলত কিছু রাসায়নিক ঘোঁট যেমন এডেনিন, থাইমিন, গুয়ানিন ও সাইটোসিন-এর যথাযথ সন্নিবেশ) আকারে সংরক্ষিত থাকে। সম্পূর্ণ ডি.এন.এ (D.N.A) অণুর কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কেবল এ সকল সংকেত বুঝা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আমাদের দেহ ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কিত জ্ঞানের ধারাবাহিক বিকাশের মাধ্যমে নতুন এক দিগন্তের আবির্ভাব হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার সংগঠন ও পরিকল্পনার আরেকটি অকল্পনীয় নির্দশন প্রকাশিত হয়েছে, যা দেখে যে কোন মানুষ ভয়ে ও বিস্ময়ে স্মৃষ্টির কাছে অবনত হয়ে পড়বে।

### ٤-٢. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ الْعَظِيمِ

৪২ : ৪ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, তিনি সমুল্লত মহান।

এ বিষয়ে ৫ : ১৯, ৭ : ৫৪ এবং ৭ : ১৮৫ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

### ٤-٣. أَمَّا الْخَلْقُوا مِنْ دُنْيَةٍ أُولَئِكَاهُنَّ مُّؤْلِيُونَ وَمُؤْبِيُونَ وَمَوْعِلٌ كُلُّ شَيْءٍ وَكَبِيرٌ

৪২ : ৯ কী? এই লোকেরা তাঁকে (আল্লাহ) বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে? প্রকৃত অভিভাবক (বা ওল্লী) তো একমাত্র আল্লাহ, তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনিই সবকিছুর উপর শক্তিশালী।

মহাবিশ্বে আল্লাহই যে একমাত্র অভিভাবক এবং তিনি যে মৃত পৃথিবীকে বৃষ্টির মাধ্যমে জীবন দান করেন, এই বিষয়সমূহ ২ : ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহর অভিভাবকত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে ১ : ১ আয়াতের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে।

“فَإِطْرُ الْمَوْتَ وَالْأَرْضُ، جَعَلَ لَهُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْجَامًا  
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَرْجَامًا، يَدْرُكُمْ فِيهِ لِئَنَّ كَيْثِيلَهُ شَنِيٌّ  
وَهُوَ التَّسْيِيمُ الْمُؤْزِرُ”

৪২ : ১১ (তিনিই) আকাশমণ্ডলী ও যমিন সৃষ্টিকারী। তিনিই তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে তিনি তোমাদের বৎশ বৃক্ষ ও বিস্তার করেন। বিশ্বলোকের কোন জিনিষই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনিই (একমাত্র সন্তা) সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

আল্লাহ যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ বিষয়টি ২ : ১১৭, ২ : ১৬৪, এবং ৭ : ৫৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়টি পরিষিষ্ট ১ ও ২ তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ ও পশু এবং সকল জীবজগতের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির প্রসঙ্গ জীব জগতের সৃষ্টি ও বৎশবৃক্ষের বিষয়টি চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে মহান আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

জীবজগতের প্রধান দুটি অংশ হলো পুষ্টি ও বৎশবিস্তার। মহান আল্লাহ প্রাকৃতিক জগৎ থেকে সকলের পুষ্টি সরবরাহ করেন। আর পুরুষ ও নারীর মিলনের মাধ্যমে বৎশ বিস্তার করেন। এ ধরনের ব্যবস্থা মানুষ ও জীবজগতে বর্তমান রয়েছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অযৌন বৎশবৃক্ষ হয়ে থকে যেমন ব্যাকটেরিয়া, এলগি, এমিবা ও হাইড্রো ইত্যাদি।

শুধু নারী-পুরুষের অবস্থানই বৎশ বৃক্ষের জন্য যথেষ্ট নয় বরং যেন মিলনের মাধ্যমে নারী ডিষ্ট ও পুঁঁ শুক্রকীটের মিলনে (zygote) জাইগোট সৃষ্টি হলেই নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি সত্ত্ব। এই বৎশবৃক্ষের পদ্ধতির দুটি উদ্দেশ্য- (১) এর মাধ্যমে প্রতিটি প্রজাতির স্থিতি নিশ্চিত করা, এবং (২) জিন্সের রান্দবদলের মাধ্যমে উন্নত প্রজন্ম সৃষ্টি করা যেন তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় ঢিকে থাকার যোগ্য হতে পারে। সুতরাং পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন ধরনের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

“لَهُ مَقَالِيْنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَبْسُطُ الْمُرْقَى لِئَنْ يَكُونَ دَيْقَرُ  
إِلَهٌ بَلِلَّ شَنِيٌّ عَلَيْمٌ”

୪୨ : ୧୨ ଆକାଶମତ୍ତଳ ଓ ପୃଥିବୀର ଚାବି ତାରଇ ନିକଟ । ତିନି ଯାର ପ୍ରତି ଇହା  
କରେନ ତାର ଜୀବନୋପକରଣ ବର୍ଧିତ କରେନ ଅର୍ଥବା ସଂକୁଚିତ କରେନ ।  
ତିନି ସବବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଅବହିତ ।

ଏହି ଆଯାତେ ଇହିତ କରା ହେବେ ଯେ ଆକାଶମତ୍ତଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟଟି  
ରହସ୍ୟାବୃତ । ଏ ସକଳ ରହସ୍ୟର ଆବରଣ ଚଢ଼ାନ୍ତିଭାବେ ଉନ୍ନୋଚନ କରା ଏକମାତ୍ର ଆହୁତି  
ତାଯାଲାର ପକ୍ଷେଇ ସନ୍ତ୍ଵନ, ଯିନି ଏକଟି ମହାପରିକଳ୍ପନାର ଆଓତାଯ ସକଳ କିଛୁ ସୃଷ୍ଟି  
କରେହେନ । ମାନୁଷ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସଙ୍ଗାନସମୂହ କରତେ ଗିଯେ ଏ ସକଳ  
ରହସ୍ୟମଯତା ଦେଖେ ସନ୍ତ୍ରତ ହେବେ ପଡ଼େ । ମାନୁଷର ବିଗତ ଦୁ'ଶ ବହୁରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ  
ସାଫଲ୍ୟର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଲେ ଦେଖି ଯାବେ ଯେ ମାନୁଷ ଅନେକ କିଛୁ ଶିଖେହେ । ତବେ ମେ  
ଏଟାଓ ଅନୁଧାବନ କରେହେ ଯେ ଏଥିନେ ଯା ଜାନାର ବାକି ଆହେ ତାର ତୁଳନାଯ ମେ  
ଅତି କୁନ୍ତ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଜେନେହେ । ମାନବ ଭବ୍ୟତାର ଇତିହାସେ ଏମନ ଅନେକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ଏମେହେ  
ଯଥିନ ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଡେବେହିଲେନ ଯେ; ଯା ଯା ଜାନାର ଛିଲ ତାର ସବଇ ତାରା ଜେନେ  
ଫେଲେହେନ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ପ୍ରକୃତି ତାର କିଛୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାନ୍ତବତା ନାଟକୀୟ  
ଉପଥ୍ରାପନେର ମାଧ୍ୟମେ ଦାବୀ କରେହେ ଯେ ଏ ଯାବତକାଳେର ସକଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାପାର  
ପୁନର୍ମୂଳ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଡ଼ର ଦିକେ ଏକପ ଘଟନା ଘଟିଲେ ଦେଖି  
ଯାଇ, ଯଥିନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନେର ଜଗତେ ଦୁ'ଟି ବଡ଼ ଧରନେର ବିପ୍ଳବ ସଂଘଟିତ ହେଲା ।  
ମେତାଲୋ ହେଲେ, କୋଯାଟୋମ ମେକାନିଜମେର ଆବିର୍ଭାବ (ଅର୍ଥାଏ କୁନ୍ତ ବନ୍ତୁ କଣାର  
ମେକାନିଜମ) ଏବଂ ଅପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ଵ (theory of relativity) । ଏ ଦୁ'ଟି ବଡ଼  
ଧରନେର ଉତ୍ତରଣେର ଫଳେ ମାନୁଷ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଆରୋ ଗତିରେ ଡୁବ ଦିଲେ ମକ୍ଷମ  
ହେବେ । କିନ୍ତୁ ସବ ସମୟେଇ ଦେଖି ଯାଇ ଯେ କୋନ ଏକଟି ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ସନ୍ତ୍ଵନ  
ହଲେ ଆରୋ ଗତିରତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରେକଟି ରହସ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ । ବନ୍ତୁ ମୌଲିକ  
ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଅନୁସଙ୍ଗାନ କରତେ ଗିଯେ ତାଇ ଘଟେହେ । ଯଥିନଇ କୋନ କିଛୁକେ  
ବନ୍ତୁର ମୌଲିକ ଉପାଦାନ ଭାବା ହେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖି ଯେ ତାର ମଧ୍ୟେଇ  
ଆରୋ (କୁନ୍ତ) ମୌଲିକ ଉପାଦାନ ନିହିତ ରାଯେହେ । ଏହାବେ ଆମରା ଉପାଦାନ, ଅଣ୍ଟ,  
ପରମାଣୁ, ପ୍ରୋଟିନ, ନିଉ୍ଟ୍ରନ, କୋଯାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରେଛି । ଯେନ ଆମରା  
ମହାଜାଗତିକ (cosmic) ଏକଟି ପିଣ୍ଡାଜେର ଖୋସା ଛାଡ଼ାତେ ଯାଛି, ତାର ଆଗେଇ  
ଆରେକଟି ଖୋସା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଖୋସାଟି କୋଥାଯ ମେ-ପ୍ରଶ୍ନଟିଇ ସନ୍ଧାନୀ  
ମନକେ ଦାରୁଣଭାବେ ନାଡ଼ା ଦେଇ ।

ସବଚେଯେ ମଜାର ବ୍ୟାପାର ହଲୋ ସମ୍ପ୍ରତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥେକେ ସୃଷ୍ଟିର  
ଇତିହାସ ଖୁଜିଲେ ଗିଯେ ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅଣ୍ଟକଣା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଦାର୍ଥ  
ବିଜ୍ଞାନେର ମଧ୍ୟେ ଅସାଧାରଣ ସମୟର ସାଧନେର ଉଦ୍ଦୋଗ ନିଯୋହେନ । ବୃତ୍ତରେ ବିଜ୍ଞାନ  
ତଥା ନିଖିଲେର ବିଜ୍ଞାନ ଓ କୁନ୍ତ ବନ୍ତୁର ବିଜ୍ଞାନେର ଏହି ମହା ଏକଜୀକରଣେର ପ୍ରଚ୍ଟେଯ  
ବାହ୍ୟତ ଚାରଟି ଡିମ୍ ଡିମ୍ ବଲ (force) ବିବେଚନାଯ ଆନା ହେବେ । ମେତାଲୋ ହଲୋ

সবল নিউক্লিয় বল (strong nuclear force), দূর্বল নিউক্লিয় বল (weak nuclear force), তড়িৎ চুম্বকীয় বল (electromagnetic force), এবং মহাকর্ষ বল (gravitational force)। এই প্রচেষ্টাকালে দেখা গেছে যে সময়ের শুরু সম্পর্কে অনেক অনেক বিবেচ্য বিষয়ের উত্তর ঘটছে। এবং এ সকল রহস্যের সমাধানের ফলে নতুন নতুন জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটছে। তবে নিশ্চয়তার সাথে এ বিষয়ে শেষ কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টিভাবে ছাড়া আর কিছুই নয়। চূড়ান্ত সত্য নিজে থেকে কখনো প্রকাশিত হবে কিনা সে প্রশ্ন একটি দার্শনিক সমস্যা হয়েই থেকে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সত্য ধরা হোমার বাইরে- একমাত্র জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত সত্য জ্ঞাত আছেন।

٢٨-وَهُوَ الَّذِي يُكَلِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَطَرَ وَيَنْتَرُ رَحْمَتَهُ

وَهُوَ الرَّبُّ الْحَمِيدُ

৪২ : ২৮ শোকদের নিরাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং দীর্ঘ রহমত চারদিক বিস্তৃত করে দেন। আর তিনিই একমাত্র প্রশংসাযোগ্য অভিভাবক।

বৃষ্টির বর্ষণ সম্পর্কে ২ : ১৬৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ নিরাশ হওয়ার পর ও বৃষ্টি বর্ষণের অর্থ হলো যে বৃষ্টি বর্ষণ কখন হবে এ বিষয়ে মানুষ সব সহ্য সঠিক ভবিষ্যৎ বাণী করতে সক্ষম নয়। আর বৃষ্টিপাত ঘটানো শুধু আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়- এ কথাও বুঝিয়ে দেওয়া এই আয়াতের উদ্দেশ্য।

একই বিষয়ে ৩০ : ৪৮ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।

বৃষ্টি যে মানুষের প্রতি আল্লাহর মহা দান ও রহমত এ বিষয়ে ৭ : ৫৭ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।

٢٩-وَمِنْ أَيْتَهُ خَلْقُ التَّمَوُتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَكُنْ فِيهِمَا مِنْ دَآئِبٍ

وَهُوَ عَلَى جَنْعِلِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَوِيرٌ

৪২ : ২৯ তাঁর (আল্লাহর) নির্দশনসমূহের মধ্যে রয়েছে যমিন ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি, এবং জীবন্ত সৃষ্টিকূল যা তিনি এই উভয় স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তিনি যখনই চাইবেন তখনই তাদেরকে একত্রিত করতে পারেন।

যমিন ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টি সম্পর্কে ২ : ১৬৪ আয়াত এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২ তে আলোচনা করা হয়েছে। জীবজগতের বিজ্ঞারের কথা ৩ : ১৬৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

'আকাশমণ্ডলী ও জীবকূল ছড়ানো রয়েছে' থেকে মনে হয় পৃথিবীর বাইরের জগতের সম্ভাব্য জীবজগত ((extra-terrestrial life) সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মহাশূন্যে জৈব অণু ((organic molecule) রয়েছে বলে ধারণা করতে শুরু করেছেন। বিজ্ঞানী D. Wickramasinghe হালিলির ধূমকেতু (Halley's Comet)-তে জীবাণু রয়েছে বলে মনে করেন।<sup>১</sup> অসংখ্য সৌরজগত রয়েছে বলে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ড্রেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, অন্যান্য সৌর জগতেও তাদের থাহে কোন না কোনরূপ জীব থাকা সম্ভব।<sup>২</sup>

### তথ্যসূত্র :

1. New Scientist, 17 April, 1986.
2. Jay M. Pasachoff, Contemporary Astrophysics, W. B. Saunders, London. 1976.

## ٢٢- دَمْنُ أَيْتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

৪২ : ৩২ তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে এই জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করার সময় পাহাড়ের মত মনে হয়।

জাহাজ ও তার সমুদ্রে চলাচলের বিষয়টি আয়াত ২ : ১৬৪ তে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٣- لَنْ يَنْكِنَ الرِّزْقَ فَيَظْلَمُ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهِيرَةِ  
لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَأْيَتٍ لِكُلِّ صَبَابِ شَكُورٍ ۝

৪২ : ৩৩ আল্লাহু যখন চাইবেন বাতাসকে ধারিয়ে দেবেন এবং এর ফলে ওরা (জাহাজ) সমুদ্রের বুকে ছির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যারা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বড় নিদর্শন।

আধুনিক কালে জাহাজ চালাবার জন্য বড় আবিষ্কার হচ্ছে কোন জাহাজের পালে বাতাস লাগার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।<sup>1</sup> এটা সম্ভব হয় আল্লাহর সৃষ্টি প্রাকৃতিক আইন Law of Parallelogram of Forces এর মাধ্যমে যা এমন মানুষ বুঝতে ও জানতে পেরেছে।

### তথ্যসূত্র :

1 The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 2, p. 1978, p 1167.

٤٩- لِمَلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَلْقِ مَا يَعْلَمُونَ  
وَيَهْبِطُ لِمَنِ يَشَاءُ اللَّهُ كُوْزْ

৪২ : ৪৯ আল্লাহ যমিন ও আকাশমণ্ডলের একমাত্র মালিক। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনিই তাঁর ইচ্ছামত কাউকে কন্যা সন্তান এবং কাউকে পুত্র সন্তান দান করেন।

যমিন ও আসমানের মালিক যে কেবল মহান আল্লাহ এ বিষয়ে ৫ : ১৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

সন্তান পুত্র না কন্যা হবে এ বিষয়টি মানুষ গর্ভধান হওয়ার বেশ কিছুদিন পরই জানতে পারে। গর্ভের ১২ সন্তানের পূর্বে বাহ্যিক জননেন্দ্রিয় দৃষ্টিগোচর হয় না। ১ সন্তান আরো বড় হলে এবং বাচ্চা মায়ের পেটে সুবিধাজনকভাবে অবস্থান করলে X-ray বা ultrasonography-র মারফত বাচ্চার লিঙ্গ সম্পর্কে জানা যেতে পারে। তবে সন্তান পুত্র না কন্যা, সে ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই।

বাবার x বা y ক্রমোজোম ও মায়ের x ক্রমোজোমের মিলন হলেই নব-শিশুর সৃষ্টি শুরু হয়। আর এ মিলন মানুষের হাতে নয়। তবে বাবার y-chromosome পৃথক করে মায়ের x-chromosome এর সঙ্গে মানবদেহের বাইরে মিলন ঘটিয়ে ইচ্ছামত লিঙ্গের সন্তান জাত সঞ্চব হতে পারে তবে এদের মিলন ঘটানো আল্লাহর হাতে।

এ প্রসঙ্গে ৫৩ : ৪৬ আয়াতে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে।

#### ‘তথ্যসূত্র :

1. K. L. Moore, and A. M. Azzopardi, *Developing Human with Islamic Additions*, 3rd edn. Dar-al-Qibla, Jeddah, p. 281, 1983.

۷۰۔ أَوْ يُرَوُّ جُمِعْتُ ذَكْرًا وَرَبْأً وَجَعَلَ مَنْ يَقَاوِ عَقِيْمًا

### إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

৪২ : ৫০ আর যাকে চান পুত্র ও কন্যা উভয় রকম সন্তানই দান করেন।

আর যাকে চান তাকে বক্ষ্যা করে রাখেন। তিনিই সব কিছু  
জানেন এবং সব বিষয়ে শক্তিমান।

সন্তানের লিঙ্গের বিষয়টি ৪২ : ৪৯ আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।  
বাকি শুরুত্বপূর্ণ অংশ ৫৩ : ৪৫-৪৬ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

সন্তান পুত্র না কন্যা হবে তা পিতা-মাতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়।  
অনেকে পুত্র সন্তান চায় অথচ শুধু কন্যা সন্তান লাভ করে। আবার কারো বেলায়  
কন্যা চাইলেও শুধু পুত্র সন্তান হয়। আবার অনেকে বহু চাওয়া সত্ত্বেও কোন  
সন্তানই লাভ করে না। সুতরাং এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে।

সমাজে নর-নারীর সংখ্যা-সাম্য খুব জরুরী যা একমাত্র মহাজানী আল্লাহই  
তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম। মানুষ এ বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব পেলে মানব জাতির বংশ  
পরম্পরার বাধাঘাস্ত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের বহু স্থানে কন্যা সন্তান  
হলে তাকে আতুড় ঘরেই হত্যা করা হয় যেমন জাহেলী যুগে আরবে করা হতো।  
আজকাল ভারতে ultrasonography করে সন্তানের লিঙ্গ জানার পর কন্যা  
সন্তানকে গর্ভপাত করে নষ্ট করা হচ্ছে বলে ভারতীয় TV-তে যথেষ্ট আলোচনা  
হচ্ছে।

সুতরাং জন্মের পূর্বে সন্তানের লিঙ্গ জানা কখনো কল্যাণকর নয়। এই বিংশ  
শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতীয় হিন্দু সমাজের একেব কন্যা-বিরোধী মনোভাব  
খুবই নিন্দনীয় ও মানবতা-বিরোধী। ইসলাম এ ধরনের মনোবৃত্তির কঠোর  
বিরোধী।

۷۱۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْنَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلًا

### لَعْلَمُ تَهْتَدُونَ

৪৩ : ১০ তিনিই তো তোমাদের জন্য এই যমিনকে বিছানার মত বানিয়ে  
দিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছেন  
যেন তোমরা নিজেদের গম্ভোজলে যাওয়ার পথ পেতে পার।

পৃথিবীকে বিছিয়ে দেওয়ার কথা ২ : ২২ এবং ১৩ : ৩ আয়াতদ্বয়ে  
আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি যে নানাকৃত চলাচলের পথ তৈরি করেছেন এ বিষয়টিও ২০ : ৫৩  
আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا لَا يُقْدَرُ فَأَنْشَرَنَا بِهِ بَلْدَةً مَبْتَأْسًا ۝  
كَذِيلَكَ مُخْرَجُونَ ۝

৪৩ : ১১ তিনিই এক বিশেষ পরিমাণে আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং  
তার সাহায্যে মৃত যমিনকে জীবন্ত করে তোলেন। এমনিভাবে  
তোমাদেরকেও একদিন যমিন থেকে বের করা হবে।

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ও মৃত যমিনকে তাদারা সজীব করার বিষয়টি ২ :  
১৬৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আর বৃষ্টির পরিমাণ কত হবে তা  
সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারে। এ ব্যাপারেও মানুষের কোন হাত নেই।

এই আয়াতে মৃত যমিনকে জীবিত করার মাধ্যমে ক্রিয়ামতের পর বিচার  
দিবসে হাশরের ময়দানে মানুষের পুনরুত্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা  
ইসলামের একটি মৌলিক আক্ষিদা।

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ مِنْ كَلَأٍ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفَلَقِ كُلَّفَاجْعَلَ ۝  
وَالَّذِي أَنْعَمَ مَا تَرَكُبُونَ ۝

৪৩ : ১২ তিনিই সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই তোমাদের  
আরোহনের অন্য নৌকা ও জলু জানোয়ারকে বাহন  
বানিয়েছেন।

এই আয়াতটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখানে  
সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি বলা হয়েছে। মানুষ, জলু জানোয়ার ও গাছপালা  
ইত্যাদির ব্যাপারে জোড়া সৃষ্টির বিষয়টি ১৩ : ৩, ৩১ : ১০ এবং ৪৩ : ১২  
আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো অজেব বা জড় পদার্থে কি  
জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি? হ্যাঁ, আজ বিজ্ঞানীরা একে সত্য বলে স্বীকার করে কিন্তু  
১৯৩০ সালের প্রথম দিকে এটা জানা যায় যে, প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু তা  
স্থিতিশীল বা অস্থিতিশীল আকারে থাকুক না কেন তার একটা antiparticle  
রয়েছে। উদাহরণ বৰুপ electron, proton এবং neutron রয়েছে, যখন  
একটি অণু ও তার প্রতি-অণু একত্রিত হয় এবং একে অপরকে ধ্রংস করে তখন  
বিক্ষেপণসহ প্রবল শক্তিসম্পন্ন তেজ বা এনার্জির সৃষ্টি হয়। এই প্রতি-অণু

সম্পর্কে প্রথম ঘোষণাকারী হলেন বিজ্ঞানী P.A.M. Dirac যখন তিনি free electron সমীকরণ (equation) সমাধান করতে চেষ্টিত ছিলেন। এই সমীকরণ যা Dirac equation নামে খ্যাত, তার উদ্দেশ্য হলো- অত্যন্ত উচ্চ তেজোময় অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র অণুর পরিণতি জানা আর্থাৎ-এর কাজ হলো quantum mechanics এবং আপেক্ষিক গতি (theory of relativity motion) র সূত্রের মিলন। ঘটনাক্রমে, বিশেষ আপেক্ষিককতাবাদ প্রযোজ্য হয় সেইসব বস্তুর উপর যেগুলো এমন গতিবেগে চলে যা আলোর গতির তুলনায় অনুপেক্ষণীয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। পারমাণবিক জগতের অন্যতম সূক্ষ্ম কণা হিসেবে ইলেক্ট্রন আলোক গতিবিদ্যাকে মেনে চলে এবং যেহেতু এটি সাংঘাতিক গতিবেগের সাথে চলে, সেহেতু এবং গতির বেলায়ও বিশেষ আপেক্ষিককতাবাদ প্রযোজ্য হওয়া উচিত। মুক্ত ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রে ডাইরাক সমীকরণের সমাধান ও শ্রেণীকরণ সমস্যার সৃষ্টি করে। ইলেক্ট্রনের শক্তির জন্য ডাইরাক একটা রাশির বর্গমূলসমূহ নিতে বাধ্য হন-যাদের একটা ধনাত্মক এবং অপরটা ঋণাত্মক। যে কোন সংখ্যার ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মূল সকলেই বুঝেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২৫ সংখ্যাটির বর্গমূল +৫ কিংবা -৫ যে কোনটি হতে পারে। অবশ্য সমস্যাটা ছিল যে, মুক্ত ইলেক্ট্রনের জন্যে ধনাত্মক বর্গমূল সমাধানটি সঠিক ছিল বটে, কিন্তু মুক্ত ইলেক্ট্রনের শক্তির ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনের ঋণাত্মক মান একটা সমস্যার সৃষ্টি করে। মুক্ত ইলেক্ট্রনের শক্তি সর্বদাই ধনাত্মক, তাহলে ঋণাত্মক শক্তি সমাধানটির কী অর্থ হতে পারে? এই সমস্যাটা উত্তরাতে হলে ডাইরাক অস্বাভাবিক ধরনের এক কল্পনা করে নেন যে, ইলেক্ট্রনের যে সকল অবস্থায় তাদের শক্তি ঋণাত্মক হতে পারে তা সবই সুবিন্যস্ত-ঋণাত্মক শক্তি সম্বলিত ইলেক্ট্রন যা মোটেই দৃষ্টিগোচর হতে পারে না-তারা সব এক সাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। যে মুহূর্তে শক্তি বিনিয়োগ করে তাদেরকে ঐ সাগর থেকে টেনে আনা হয়, শুধু তখনই তারা ধনাত্মক শক্তি অবস্থায় চলে আসে। তখন আমরা তাদেরকে ইলেক্ট্রন হিসেবে দেখতে পাই। আর তারা যে ঋণাত্মক শক্তি সাগরের যে স্থানগুলো খালি করে চলে এসেছে সেগুলো পজিট্রন হিসেবে আবির্ভূত হয়। পজিট্রনের চার্জ সর্বদাই ধনাত্মক, যদিও ঐ চার্জের মাত্রা ইলেক্ট্রনের মতই। ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটলে তারা পরম্পর পরম্পরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্রংস করে এবং বিকিরণ শক্তি আকারে আবির্ভূত হয়। একটা ইলেক্ট্রনকে  $mC^2$ -এর ঋণাত্মক শক্তি অবস্থা (যেখানে  $m$  হচ্ছে ইলেক্ট্রনের ভর এবং  $C$  হচ্ছে আলোর গতি) থেকে  $mC^2$ -এর ধনাত্মক অবস্থায় আনতে হলে  $2mC^2 = 1.1 \text{ Mw}$  শক্তি ব্যয় করতে হবে। বস্তুত  $1.1 \text{ Mw}$  শক্তিবিশিষ্ট (বিকিরণ কণা) ফোটনকে যুগল উৎপাদন সম্পন্ন করতে দেখা গেছে-যার একটি হচ্ছে ইলেক্ট্রন এবং অপরটি পজিট্রন।

বিপরীতধর্মী চার্জ থাকার কারণে ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রস্থ বিদ্যুৎ আলোকচূর্ণ বিপরীত বক্রতায় শনাক্ত করা যায়।

এভাবেই, ইলেক্ট্রনের ডাইরাক মতবাদ বস্তু ও প্রতিবস্তু ধারণার জন্ম দেয়। প্রতিটি বস্তুরই একটি প্রতিবস্তু থাকতে হবে। বস্তুত পরবর্তী বছরগুলোতে, ডাইরাকের মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা-বহু স্বল্প ও দীর্ঘস্থায়ী প্রাথমিক কণার বিপরীতে প্রতিকণার উপস্থিতির প্রমাণ পরীক্ষাগারে পাওয়া গেছে। এ সকল প্রতিকণা অন্য কণার সাথে মুখোমুখি হলেই তারা পরম্পরাকে ধ্বংস করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অজেব জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির ব্যাপারটির তাৎপর্য আছে বৈকি। বস্তু নির্মাণ ফলক অর্থাৎ তথাকথিক মৌলিক কণাসমষ্টি দ্বারা গঠিত এবং এ সকল কণার রয়েছে প্রতিকণা। বস্তু যে যুগলন্তরে বা জোড়ায় জোড়ায় থাকতে পারে, এখন তা সহজেই বুঝা যায়।

জাহাজে চড়ে বেড়ানোর বিষয়টি ২ : ১৬৪ আয়াতের আলোচনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবাদি পশুর পিঠে চড়ার বিষয়টি ১৬ : ৫ এবং ১৬ : ৮ আয়াতস্থায়ের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

إِنَّمَا تَعْلَمُ طَهُورًا لِمَنْ تَدْلُكُوا نِسْنَةً رَبَّكُمْ إِذَا اسْتَوْبَنُتُمْ عَلَيْهِمْ وَتَغْلُبُوا  
سَبِّحْنَ اللَّهَيْ سَمْرَلَنَا مَذَا دَمَلْنَا لَهُ مُقْرِبُنِينَ

৪৩ : ১৩ যাতে তোমরা তাদের পিঠে হিল হয়ে বসতে পার এবং তোমরা হিল হয়ে বসার পর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরণ কর এবং বল, ‘পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অদিও আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না।

পশ্চ বন্য থাকা অবস্থায় তাদের উপর আরোহণ করা সম্পর্কে ১৬ : ৮ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে একই বিষয়বস্তু পুনরায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহু তা'আলা পশ্চ সৃষ্টি করেছেন মানুষের ব্যবহারের জন্য এবং তিনি মেহেরবানী করে এগুলোকে পোষ মানানোর জ্ঞান ও কৌশল শিখিয়েছেন। এদের মধ্যে কিছু আছে তাদের পিঠে আরোহণ করার জন্য যেমন ঘোড়া ও গাঢ়ার পিঠে আরোহণ করা বেশ আরামদায়ক। কারণ তাদের পিঠ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন ভ্রমণের সময় আমরা আরামে বসতে পারি। এই আয়াত দ্বারা আমাদেরকে একথাই স্বরণ

করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে আমাদের জীবন যাপনকে আরামদায়ক করে দেয়ায় আগ্রহ তা'আলার এই মহা অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য। কারণ আমরা তাঁকে ছাড়া এই আরাম ও উপকার নিজেরা অর্জন করতে পারতাম না।

## ٤٣-سَعَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَقُولَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمُشَرِّقِينَ لِمَنِ الْقَرِينُ

৪৩ : ৩৮. অবশেষে সে যখন আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, ‘হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি দুই পূর্বদিকের ব্যবধান থাকতো’ কত নিকৃষ্ট সহচর সে !

৩৭ : ৫ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে বলা হয়েছে যে, দুই পূর্ব বলতে সূর্যোদয়ের স্থানসমূহের দুটি দূরতম প্রান্ত আছে- একটি উত্তরে এবং অপরটি দক্ষিণে। এই দুটি প্রান্তকে বলা হয় অয়নান্ত (solsticial)। যথাক্রমে ২২শে জুন ও ২২শে ডিসেম্বরে মনে হয় যেন সূর্য এগুলোকে স্পর্শ করেছে। এ হিসাবে দুটি পূর্ব-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৬ মাস। দুই অয়নান্ত বা দুই পূর্ব-এর কৌণিক দূরত্ব  $46^{\circ} 56'$  বা প্রায়  $47^{\circ}$ । বৃত্তের চাপের উপর এ দুটি বিন্দুর চাপীয় দূরত্ব ১০, যখন ব্যাসার্ধ r এবং কৌণিক দূরত্ব O রেডিয়াস তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায়  $93000000$  মাইল ( $1 : 5 \times 10^8$  কি. মি.) এবং দুই পূর্ব-এর কৌণিক দূরত্ব তথা দুই অয়নান্তের কৌণিক দূরত্ব  $47^{\circ}$  যা চাপের বিপরীতে কেন্দ্রীয় কোণের (radius)  $22 \times 8717 \times 180$ । সুতরাং দুই পূর্ব-বা-দুই অয়নান্তের চাপীয় দূরত্ব (arcial distance) দাঁড়ায় প্রায়  $78320000$  মাইল ( $123093000$  কি. মি.) এবং পৃথিবীর উপর এই চাপীয় দূরত্ব দাঁড়াবে  $300$  মাইল ( $5000$  কি. মি.)। পৃথিবীর পরিমাপে এই দূরত্বও বেশ বড়।

৪৩ : ৩৮ আয়াতে দুটি পূর্বের দূরত্ব কথাটি একটি বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর অর্থ পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্ভব দূরত্ব।

এই কথার অকৃত তাৎপর্য হবে একজন পাপী শয়তান থেকে বিশাল দূরত্ব কামনা করেছিল। এটা সত্যই বিশ্বয়কর যে দুই অয়নান্তের চাপীয় দূরত্ব তথা দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিম-এর ভিত্তিতে পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্ভব দূরত্ব সম্পর্কে এই আয়াত নায়িল হওয়ার পূর্বে আরবদের নিকট অজানা ছিল।

٤٠- وَتَبَرَّأَ الَّذِينَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَمَانِيْهِمَا ۚ

وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْعَاجِزَةِ ۖ وَالَّذِينَ شَرَجُوْنَ ۝

٨٣ : ٨٥ کত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমষ্ট কিছুর সার্বভৌম অধিপতি। ক্লিয়ামতের জ্ঞান ক্ষেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌম অধিপতি এ বিষয়ে ৫: ১৯ আয়াতে বিজ্ঞানিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

،رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَمَانِيْهِمَا ۖ لَمْ يَنْشُرْ مُؤْقِنِينَ ۝

٨٤ : ٧ যিনি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমষ্ট কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

বিষয়টি ৫ : ১৯ আয়াত এসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٥- فَإِنْ تَرْقِبْ يَوْمَئِنَ السَّمَاءِ بِمُحَاجَّةٍ

٨٤ : ١٠ অতঃপর তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূমাঙ্গন হবে আকাশ।

আমরা দেখতে পাই যে আকাশ সূর্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ‘ধূমাঙ্গন হবে আকাশ’ এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে সূর্য ধোঁয়ার মেঘ দেখা দেবে। আমরা জানি দুটি বিপরীতমূর্খী বল সূর্যের উপর কাজ করছে (১) মহাকর্ষ বল-এর কারণে আকর্ষণ বল, এবং (২) সূর্যের কেন্দ্র হাইড্রোজেন সংযোজনের (fusion) কারণে সৃষ্টি বিকিরণজনিত চাপের বিস্তৃতি বল। বর্তমানে এই দুটি বিপরীতমূর্খী বল ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আছে। সূর্য অথবা অন্য কোন তারকার এক্সপ অবস্থাকে বলা হয় মুখ্য দ্যোতনাকারী (main sequence)। যখন কেন্দ্র হাইড্রোজেন (যা সূর্যের মোট ভরের শতকরা ১০ ভাগ) হিলিয়ামে ক্রপান্তরিত হয়ে যাব, এখন সূর্যের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বিস্তৃত হয়। বিকিরণ চাপের ফলে সূর্যের উপরিভাগের বায়বীয় অংশ বিশাল আয়তনে বিস্তৃত হয় এবং আকাশের একটি বিরাট অংশ ধোঁয়ায় আঙ্গন হয়ে যাব, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ আরো সংকুচিত হয়ে

পড়ে। সূর্যের সামগ্রিক আকার বেড়ে যাওয়ায় উপরিভাগের তাপমাত্রা কমে যায় এবং সূর্য অধিকতর শীতল হয়ে যায়, ও 'লাল দৈত্যের' রূপ ধারণ করে। বিকিরণ চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভারসাম্য ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এক সময় আচ্ছাদনকারী গ্যাসের মেঘ তখা ধোঁয়া বিস্তৃত হয় এবং আবার সংকুচিত হয়। এই বিস্তৃতি এবং সংকোচণ চলে কয়েক হাজার বছর ধরে এবং সূর্য একটি স্পন্দিত তারকায় পরিণত হবে। পরিশেষে বিকিরণ চাপ জয়ী হয়। গ্যাসীয় মেঘ দূরে সরে যায় এবং সূর্যকে রেখে যায় ষেত বামন অবস্থায়।

○ ۲۴-وَأَنْرِكِ الْبَحْرَ رَهُوا۝ إِنَّهُ فَجْنٌ مُغْرِفٌ

৪৪ : ২৪ সাগরকে ছিঁড়ি (বিভক্ত অবস্থায়) থাকতে দাও, এরা এমন এক বাহিনী যারা ডুবে যাবে।

এই আয়াতে নবী মূসা (আ) কর্তৃক সাগর অতিক্রম করা এবং ফিরআউন ও তার অনুসারীদের ডুবে যাওয়ার ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ২৬ : ৬৪ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

○ ۲۵-أَفَمُ خَيْرٌ أَمْ تَوْمُ تَبْعِيْعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ  
إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِيْنَ

৪৪ : ৩৭ শ্রেষ্ঠ কী ওরা, না তুর্কা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই তারা ছিল অপরাধী।

তুর্কা ছিল ইয়েমেনের রাজাদের উপাধি, তবে যে সকল রাজা সাবা, হাদ্রামাউত এবং হিমায়র<sup>১</sup> এলাকা শাসন করেছিল তাদেরকেই তুর্কা নামকরণ করা হয়েছে। মনে করা হয় যে, এক সময় তাদের কর্তৃত সমগ্র আরব এবং সম্বত পূর্ব আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু যখন তারা ক্ষমতার নেশায় উন্নত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হলো, তখন ধীরে ধীরে তারা বিলীন হয়ে গেল। কেউ কেউ মনে করেন যে, তুর্কা একজন নবী ছিলেন এবং তার জনগণ ছিল অবিশ্বাসী।

তাদেরকে কিরণ শান্তি দেয়া হয়েছিল, কিংবা তারা কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে কুরআনে কোন উল্লেখ নেই।

তথ্যসূত্র :

1. A. Yusuf, Ali, The Holy Quran, Translation and Commentary, The American Trust Foundation, p. 1350. 1977.

## ٠-٣- دَمَا حَكَمْنَا الْعُمُرَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا لَعِيَّنَ

٤٤ : ٣٨ আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে কোন কিছু ক্রীড়াজলে সৃষ্টি করিনি।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা কোন কিছুই ক্রীড়াজলে সৃষ্টি করেননি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে একটা গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সে সম্পর্কে আমাদের জানা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এ বিষয়ে ৩ : ১৯১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা জোর দিয়ে বলেছেন যে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

## ٠-٤- إِنَّ فِي الْعُمُرَتِ وَالْأَرْضِ لَذِيْبَ لِلْمُؤْمِنِينَ

৪৫ : ৩ নিচয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে নির্দশন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সকল বস্তুর (জড় ও জীব) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে হলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এরপ বিশ্লেষণ সৃষ্টিকর্তার এক মহাপরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে এবং তাঁর ক্ষমতার কথা ঘোষণা করে তারা কত সৌভাগ্যবান যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর সৃষ্টির ভাষা অনুধাবন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালার বহু নির্দশন বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, মেখানে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে) এবং এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু নির্দশন সম্পর্কে ২৭ : ৮১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

## ٠-٥- وَفِي خَلْقِكُفْ وَمَا يَبْثُ مِنْ دَآبَّةٍ لَيْلَقُمْ بُوْقُمُونَ

৪৫ : ৪ তোমাদের সূজনে ও জীবজন্মের বিস্তারে নির্দশন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।

মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে আগেই ১৬ : ৪, ১৮ : ৩৮, ২৩ : ১৩ এবং ২৩ : ১৪ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জীব জন্মের বিস্তার সম্পর্কে ২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

وَالْخِلَافُ الْيَنِيُّ وَالْهَمَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ نَعْذُبٍ

فَلَحِمًا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفُ الْمُجْمِرِ إِذْ لَقَوْرَئِعَلَنَّ ۝

৪৫ : ৫ নিদর্শন রয়েছে চিঞ্চলীল সম্পদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহু আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ ধারা ধরিবাকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

### রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন

এ বিষয়ে ২ : ১৬৪ এবং ১০ : ৬ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

### আকাশ হতে জীবনোপকরণ প্রেরণ

এ বিষয়ে ১৫ : ২১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

### মৃত মাটিকে পুনর্জীবিত করণ

এ বিষয়ে ২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

### বায়ুর পরিবর্তন

এ বিষয়ে ২ : ১৬৪ এবং ৭ : ৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۷-۱۸. أَنَّهُ الَّذِي سَعَى لَكُمُ الْبَخْرَ لِتَعْبُرَ الْفَلَكَ فِيهِ بَاءَرْ !

وَلَيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৪৫ : ১২ আল্লাহই সাগরকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে এতে জলধানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসরণ করতে পারে ও তাঁর অতি কৃতজ্ঞ হও।

এই আয়াতে যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ২ : ১৬৪ এবং ১৬ : ১৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۹-۲۰. وَسَعَى لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَيْعَانِهِ

لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَذِيَّ لِقَوْمٍ كَيْفَلَوْنَ ۝

୪୫ : ୧୩ ତିନି ତୋମାଦେର କଳ୍ୟାଣେ ନିଯୋଜିତ କରେ ଦିଯେହେଲ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ କିଛୁ ନିଜ ଅନୁଥହେ, ଚିତ୍ତାଲୀଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ଅନ୍ୟ ଏତେ ତୋ ରହେଛେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ଏହି ଆୟାତେ ଉପ୍ରେସିତ ବିଷୟେ ୩ : ୧୯୦-୧୯୧ ଏବଂ ୧୬ : ୧୨ ଆୟାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଳେ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ ।

• ۱۴- ﷺ لَفَنْ أَكِنَّا بَنَى إِسْرَائِيلَ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالْبُيُوْنَ

وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ وَنَصَّنَاهُمْ عَلَى الْغَلَبَيْنِ ۝

୪୫ : ୧୬ ଆମି ତୋ ବନୀ ଇସରାଇଲୀଦେରକେ କିତାବ, କର୍ତ୍ତୃ ଓ ନ୍ରୂତ ଦାନ କରେଛିଲାମ ଏବଂ ତାଦେରକେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନୋପକରଣ ଦିଯେଛିଲାମ ଏବଂ ଦିଯେଛିଲାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱ ଜଗତେର ଉପର ।

ବନୀ ଇସରାଇଲୀଦେର ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନୋପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରା ସମ୍ପର୍କେ ୨ : ୫୭ ଏବଂ ୨ : ୬୧ ଆୟାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଳେ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ ।

• ୧୫- ۰۷- وَحَلَّنَ اللَّهُ الْكَمْرُ وَالْأَرْضُ يَلْعَبُ وَلِنْجُزِيٌّ كُلُّ نَفْرٍ

بِمَا كَبَدَتْ وَهُنْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

୪୫ : ୨୨ ଆଲ୍ଲାହ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେହେ ସଥ୍ୟଧର୍ତ୍ତାବେ ଏବଂ ଯାତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କର୍ମନୁୟାୟୀ ଫଳ ପେତେ ପାରେ, ଆର ତାଦେର ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ କରା ହବେ ନା ।

ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କେ ୨ : ୧୬୪ ଆୟାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଳେ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ । ସୃଷ୍ଟିମୂଳ୍କ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା କୀ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କରେହେଲ ତା ୧ : ୧ ଆୟାତେର ସାଥେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବେ । ସେ ଆଲୋଚନାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବେ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲାର ଯେ କୋନ ସୃଷ୍ଟିର ପିଛନେ ରହେଛେ କରନ୍ତାର ଉପାଦାନ ଏବଂ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟେ ଯତ କିଛୁ ଛଡିଯେ ଛିଟିଯେ ଆଛେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୃଷ୍ଟିର ପିଛନେ ରହେଛେ ଯୁକ୍ତିସ୍ଵରୂପ କାରଣ ।

• ୧୬- ۰۸- قَلِّ اللَّهُ يُحِبُّكُمْ تُلَكَ بُيُونِكُمْ ثُمَّ يُحِبُّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

لَا زَنِيَّا فِيهِ وَلِكُنْ أَكْلُ النَّارِ لَا يَغْلُمُونَ ۝

୪୫ : ୨୬ ବଳ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କେ ତୋମାଦେରକେ ଜୀବନ ଦାନ କରେନ ଓ ତୋମାଦେର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ । ଅତଃପର ତୋମାଦେରକେ କ୍ଷମାମତ ଦିବସେ ଏକତ୍ରିତ କରାବେଳ, ଯାତେ କୋନ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମାନ୍ୟ ତା ଜାନେ ନା ।

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক জীবন দানের বিষয়ে ২ : ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের জানা আছে যে সকল জীবিত বস্তুই মরে যাবে এবং সকল মানুষ মরণশীল।

۲- مَا خَلَقْنَا التَّمَوُتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بِنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجِلٌ مُّهَمَّٰٓ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذَرُوا مُغْرِضُونَ ۝

৪৬ : ৩. আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি। কিছু কাফিররা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক সৃষ্টি করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ৪৫ : ২২ আয়াতের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ১ : ১ এবং ২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে। ৩ : ১৯০-১৯১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালেও এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি সম্পর্কে যে কেউ অনুসন্ধান করবে সেই ঘোষণা করবে যে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

۱۵- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ إِحْسَانًاٰ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلَهُ وَفِصْلَهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَزْبَعِينَ سَنَةً لَّا قَالَ رَبِّيْ أَوْ تَعْزِيزِيْ أَنْ أَشْكَرْ نِعْمَتَكَ الرَّحِيمَ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْدَّائِيْ دَأْنُ أَخْمَلَ صَاحِبَاتِرَضْسَهُ وَأَصْلِحْتِيْ فِيْ ذَرِيْقِيْ إِلَيْ تَبَتْ رَأْيِكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

৪৬ : ১৫ অঘরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ আচরণ করে। তার মাতা কত কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্জে ধারণ করে রেখেছে এবং কষ্ট শীকার করেই প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুঃঘান ত্যাগ করা পর্যন্ত সময় লেগেছে ত্রিশ

ମାସ । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଥନ କୀମ୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଲ ଏବଂ ତାର ଚନ୍ଦ୍ରଶ ବହର ବୟସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲୋ ତଥନ ସେ ବଳଳ ୫ 'ହେ ଆମାର ବସ୍ତୁ, ତୁ ଯି ଆମାକେ ତେବେକି ଦାଓ, ଆସି ଯେନ ତୋମାର ସେଇ ସବ ନିମ୍ନାମତେର ଶୋକର ଆଦାୟ କରି ଯା ତୁ ଯି ଆମାକେ ଓ ଆମାର ପିତା-ମାତାକେ ଦାନ କରେଛ ଏବଂ ଯେନ ଏମନ ନେକ୍ ଆମଳ କରି ଯାତେ ତୁ ଯି ସମ୍ମୂଳ ହବେ । ଆର ଆମାର ସନ୍ତାନକେଓ ନେକ୍ ବାନିଯେ ଆମାକେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଦାଓ । ଆସି ତୋମାର ନିକଟ ତେବା କରାଇ ଏବଂ ଆସି ଅବଶ୍ୟାଇ ତୋମାର ଅନୁଗତ ବାନ୍ଦାହ (ମୁସଲିମ)ଦେର ମଧ୍ୟେ ଶାଖିଲ ଆଛି ।

ଇସଲାମ ପିତା-ମାତାର ପ୍ରତି ସମ୍ବ୍ୟବହାର କରା ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୋଷଣ କରେଛେ । ୧୭ ୫ ୨୩-୨୪ ଆୟାତ ଦୂଟିତେ ଏ ବିଷୟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ବଳା ହେଯେଛେ । ଏଥାନେ ଏର ଜନ୍ୟ ଏକଟି କାରଣ ଦେଖାନୋ ହେଯେଛେ ଯେ ମା ବହ କଟ୍ ସହ୍ୟ କରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ ଏବଂ ବହ କଟ୍ କରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରେ । ସଦିଓ ପ୍ରସବ ବ୍ୟଥା ଖୁବ କଟିଲା ତବୁଓ ଏହି ବ୍ୟଥା ଖୁବଇ ଜର୍ମନୀ କାରଣ ଏହି ବ୍ୟଥାର ଫଳେ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତାତେ ପ୍ରସବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଗର୍ଭଧାରଣ ଓ ଶିଶୁକେ ମାତୃଦୂଷ ପାନ କରାନୋର ଜନ୍ୟ ମୋଟ ତ୍ରିଶ ମାସ ସମୟେର ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଯେଛେ । ସୂରା ବାକାରାର ୨୩୩ ଆୟାତେ ଆଲ୍ଲାହ ବଲେନ, 'ମାୟେରା ତାଦେର ସନ୍ତାନଦେରକେ ପୁରୋ ଦୁ'ବହର ବୁକେର ଦୁଧ ପାନ କରାବେ ।' ସୁତରାଂ ତ୍ରିଶ ମାସ ଥେକେ ଦୁଇ ବହର ବାଦ ଦିଲେ ଗର୍ଭଧାରଣେର ଜନ୍ୟ ଯାତ୍ର ୬ ମାସ ବା ୨୪ ସନ୍ତାହ ବାକି ଥାକେ । Moore ଏବଂ Azzindani<sup>୧</sup>ର ମତେ ବେଁଚେ ଥାକତେ ସକ୍ଷମ ଏମନ ଜନେର ସର୍ବନିନ୍ଦ୍ର ବୟସ ହଞ୍ଚେ ୨୨ ସନ୍ତାହ ଏବଂ ଓଜନ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ । କିନ୍ତୁ ଏକପ ଅପୁଷ୍ଟ ଜନେର ବେଁଚେ ଥାକା କଟିଲା । ସୁତରାଂ ୨୪ ସନ୍ତାହ ବା ଛୟ ମାସକାଳ ବୟସ ହଲେ ଶିଶୁର ବେଁଚେ ଥାକାର ସଞ୍ଚାବନା ବୈଚୀ ତାତେ ସନ୍ଦେହ ନେଇ । ସାଧାରଣତ ଗର୍ଭକାଳ ୩୮ ସନ୍ତାହ ବା ୨୬୬ ଦିନ (୯.୫ ଚାଲ୍ମ ମାସ = ୮.୭୫ ସୌର ମାସ) । ସୁତରାଂ ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁର ଜନ୍ୟ ସମୟକାଳ ୨୨ ଥେକେ ୩୮ ସନ୍ତାହ ୨୨ ଏହି ଆୟାତେର ଭିନ୍ନିତେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ ଇବ୍ନ ଆବି ତାଲିବ (ରା) ବିଯେର ଛ୍ୟ ମାସ ପର ଜନ୍ମାତ୍ମ କରା ସନ୍ତାନକେ ବୈଧ ବଲେ ଫତ୍ଵୋଯା ଦିଯେଛେ । ଏତେ ମନେ ହ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାଣୀ ଶିଶୁର ଜନ୍ୟ ଛ୍ୟମାସ ଗର୍ଭ ହଲେ ଓ ଚଲତେ ପାରେ ।

ଆର ଏକଟି ବିଷୟରେ ଏହି ବିଷୟେର ଉପର ଆଲୋକପାତ କରତେ ପାରେ । ଆରବୀ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହଲୋ ବୋକା ବହନ କରା, ଆର ହରା ଶବ୍ଦ ଘାରା ଦୁଃଖ ଓ କଟ୍ଟେଇ କଥା ବୁଝାନୋ ହ୍ୟ । ଗର୍ଭବତୀ ମା ପ୍ରାୟ ୧୨ ସନ୍ତାହ ବା ଡିନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର କୋନ

ওজন বা ভার বহনের কষ্ট অনুভব করে না। কারণ সেই সময় জগ্নের আকার মাত্র ৮.৭ মি.মি (8.7 cm=3.5 inches) এবং ওজন মাত্র ৪৫ গ্রাম (0.032 পাউন্ড)।<sup>৩</sup> সুতরাং এই তিন মাস বা ১২ সপ্তাহ বাদ দিলে মায়ের গর্ভের বোঝা বহনের সময় তিন মাস কমে যায় যদিও পূর্ণ গর্ভকাল ৯ মাস (৬+৩) এবং শুধু বোঝা বহনের কষ্ট ৬ মাস কাল। সুতরাং দুধ পানের ২৪ মাস বাদ দিলে যে ৬ মাস থাকে তাহলো গর্ভকালের শেষ কষ্টদায়ক ৬ মাস। এই হিসাবে উপরের আয়তের ৩০ মাসের হিসাব সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

#### তথ্যসূত্র :

1. K. L. Moore, and A. M. Azzindani. *The Developing Human with Islamic Additions*, 3rd edn. Saunders and Dar al-Qibla, Jeddah, Saudi Arabia, p. 95. 1983.
2. Ibid, p. 94.
3. Ibid, p. 95.

۲۳- فَلَمَّا أَرَوُهُ عَلَيْهَا سَتَقَبِلَ أَوْدِيَتُهُمْ ۝ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُسْطَرُنَا ۝  
بَلْ هُوَ مَا تَسْعِجُ لَتُمْ بِهِ ۝ رَبِيعٌ فِيهَا عَلَابٌ أَلِيمٌ ۝

৪৬ : ২৪ পরে তারা যখন সেই আয়াবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, তখন বলতে শাগল : এটা মেঘপুঁজি, এটা আমাদেরকে বারিবর্ষণ করে দেবে- ‘না বরং এটা সেই জিনিস যার জন্য তোমরা খুব তাড়াহড়া করছিলে। এটা বাতাসের ঝঙ্গা তুফান যার মধ্যে রয়েছে কঠিন আয়াব।

এই আয়াতে ‘আদ’ জাতির প্রতি আল্লাহর গবেষণার উল্লেখ করা হয়েছে এবং মেঘের বিষয়টি ২ : ১৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

۱۰- أَفَلَمْ يَرَوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ كَبِيلَمْ  
ذَكْرُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ۝ وَلِلْكُفَّارِ أَمْثَالُهَا ۝

৪৭ : ১০ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে বেড়ায় নি? তা হলে তারা সেই সব সোকদের অবস্থা দেখতে পেত যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাদের সবকিছুকেই সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন আর কাফিরদের জন্য এমনি পরিণতিই সুনির্দিষ্ট রয়েছে।

এইসব প্রাচীন ঘটনাবলি ৩ : ১৩৭, ৬ : ১১ এবং ২২ : ৪৬ আয়াত সমূহে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۱- ذَكَرِيْنَ مِنْ قَرْبَىٰ هُنَّ أَشَدُّ دُوَّبٍ جُنُونٌ قَرَبَتِكَ الْحَقُّ أَخْرِجْنَاهُ  
أَفْلَكْنَاهُمْ نَلَّا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

৪৭ : ১৩ ওরা তোমার যে জনপদ থেকে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা হতে অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করবার কেউ ছিল না।’

আয়াত নং ৭; ৪, ৭ : ৬৪, ১৭ : ১৭ ও ২০ : ১২৮ এ উপরোক্ত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

۲- مَوْلَانِي أَنَّكَ لِتُكَرِّيْنَّهُ فِي قُلُوبِ النَّوْمِيْنَ لِيَرْزَدَ إِلَيْنَا مَعَ اِيمَانِهِ  
وَهُوَ هُنْدُ الْكُسْرَى دَالْأَرْضِ وَكَانَ لِهُ عَلَيْنَا حَكِيْمًا

৪৮ : ৪ তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস দৃঢ় করে নেয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়-

এখানে প্রকৃতির শক্তির প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে তা হচ্ছে বিজ্ঞানীগণ প্রকৃতির চারটি মৌলিক শক্তি আবিকার করেছেন, যথা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, দুর্বল আণবিক শক্তি, তাড়িত চুম্বকীয় শক্তি এবং শক্তিশালী আণবিক শক্তি। এ সকল শক্তির ব্যাপৃতি ও মান-মাত্রা ভিন্ন যা আয়াত ১ : ২, এ উল্লেখ করা হয়েছে। মহাকর্ষীয় শক্তি এই নিখিল বিশ্বে এক অতি বিস্তৃত পরিমাণ দূরত্বের উপর ক্রিয়াশীল এবং গ্রহ-উপগ্রহ পুঁজকে গতিশীল রেখেছে। এটা দু'টি বস্তুর ভর-এর উপর নির্ভর করে তা এ সকল বস্তুর জ্যামিতি যাই হোক না কেন। মহাকর্ষ শক্তি না থাকলে আমরা পৃথিবী ঘৰের সাথে লেগে থাকতে পারতাম না। দুর্বল আণবিক শক্তি এর কেন্দ্রীয় অংশে সক্রিয় এবং বিটা (beta) রশ্মিসমূহের ক্ষয় প্রাণ্তির জন্য দায়ী। বিটা রশ্মির এই ক্ষয়প্রাণ্তি ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহকে প্রোটোন দেয় যার ফলে সৌর শক্তির বিকীরণ ঘটে। তাড়িত চুম্বকীয় শক্তি পরমাণু তৈরীর ক্ষেত্রে মূল কারণ বলে বিবেচিত হয় এবং তা সকল বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় বস্তুকে শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশগুলোকে একত্রে ধরে রাখে। যদিও মাত্রা ও শক্তির ক্ষেত্রে অতি বিশাল মাত্রায় পার্থক্য বিদ্যমান (যে বিশাল দূরত্বের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকর তা শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তির চেয়ে প্রায় ১০<sup>৪০</sup> মাত্রায় দুর্বল। আর এই শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তি ১০<sup>১৩</sup> সি.এম.এস মাত্রার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র পদার্থসমূহকে পরম্পরের সাথে আটকে রাখে) তবুও এ সকল শক্তির স্ব স্ব আজাধীন এলাকা বিদ্যমান। দুর্বল পারমাণবিক শক্তি ও তাড়িত চুম্বকীয় শক্তিকে সমন্বিত করার জন্য বিজ্ঞানী সালাম, ওয়েইনবার্গ (Weinberg) ও গ্লাশো (Glashow)-এর সাম্প্রতিক গবেষণা একটি ও একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে প্রকৃতির এ সকল শক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করতে আরও বেশী করে অনুপ্রেরণা দান করেছে। এগুলো হচ্ছে দূর কল্পনা যে সৃষ্টির শুরুতেই এ সকল শক্তি অতি উচ্চমাত্রার ভারসাম্যমূলক শক্তির মধ্যে সংবন্ধ ছিল এবং শীঘ্রই এই ভারসাম্যের স্বতঃকৃত ভাঙ্গনের সাথে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে দৃষ্টিগোচর হয়। শক্তির এই সম্মিলন সম্পর্কে সৃষ্টি ভাবধারাসমূহকে পরীক্ষার

ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଅତି ଉଚ୍ଚମାତ୍ରାୟ ଶକ୍ତିର ବେଗବର୍ଧକ ସ୍ତର ତୈରିର ଜଳ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଯେ ଯାଚେନ୍ । ଆଶା କରା ଯାଏ ଯେ, ଏ ସକଳ ବେଗବର୍ଧକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟିର ଶୁରୁତେଇ ଅତି ଉଁଚୁ ମାତ୍ରାର ଶକ୍ତିସମୂହର ପ୍ରାରତ୍ତିକ ଅବଶ୍ଵାକେ ଉଦ୍‌ଦୀପିତ କରତେ ପାରବେ । କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ (TeV) ଅନ୍ଧଳେ ( ୧ ଟେକ୍=୧୦୩ ବେତ ) (Bev), ଏକଟି ବେତ ୧୦୯ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରମାଣୁ ଭୋଲ୍ଟ [electron volt-ev]-ଏର ସମାନ ) । ଅତି ଉଚ୍ଚମାତ୍ରାୟ ଶକ୍ତିର ବେଗବର୍ଧକ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଉଂପାଦିତ ଶକ୍ତିସମୂହ ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱର ଗୋଡ଼ାର ଦିକେର ବିଦ୍ୟମାନ ଶକ୍ତିର ସାଥେ ସମକଷତା ଅର୍ଜନ କରେ ଉଠିତେ ପାରେନି । ତୃତୀୟେ ଅତି କୁନ୍ଦ୍ର କଣିକାର ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାର କ୍ରମାବୟ ଅର୍ଥଗତି ଏବଂ କୁନ୍ଦ୍ରକଣାର ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଔକ୍ୟସାଧନେର ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ଵରେ ସାଥେ ସାଥେ ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଏହି ସକଳ ମିଥକ୍ରିୟାର ବହୁ ଚମକପ୍ରଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ । ତାରା କିଛୁ ପରିମାଣେ ହଲେଓ ବୁଝାତେ ପେରେଛେ କୀଭାବେ ଏହି ମିଥକ୍ରିୟା କାଜ କରେ । କିନ୍ତୁ କେନ ଏହି ମିଥକ୍ରିୟା ସମୂହକେ ଚାଲୁ କରା ହାଲ ତା ଚିରକାଳ ଏକଟା ରହସ୍ୟ ହିସେବେଇ ଥେକେ ଯାବେ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ, କେଉ ହ୍ୟତ ତେବେ ଅବାକ ହନ ଯେ କୀଭାବେ ପ୍ରକୃତିର ଏତ ସବ ଶକ୍ତିର ସ୍ତରପାତ ବ୍ୟତିରେକେ ପଦାର୍ଥ କେ ବିନ୍ୟଷ୍ଟ କରା ସମ୍ଭବପର ହେୟେ । ତାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରାଇ ଅତି କୃତଜ୍ଞତାର ସାଥେ ସ୍ଵିକାର ନା କରେ ପାରେ ନା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଏ ସମନ୍ତ କର୍ମକାଳେ ମିଥକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିକଳ୍ପନାକାରୀ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୟ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ତାରଇ ଏସବ କିଛିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନ ଓ ଅବହିତି ରହେଛେ । ଏ ସକଳ ଶକ୍ତି ତାର ସକଳ ପ୍ରକାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଭାରସହ ଯେ କାଜ କରେ ତା ହଞ୍ଚେ ଆଲ୍ଲାହର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ । ଆର ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱଯକର ଜାଟିଲତା ଯା ଏସକଳ ଶକ୍ତିର କାଜେର ମଧ୍ୟେ ଅତିନିହିତ, ମୁମ୍ମିନଦେର ବିଶ୍ୱାସେର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହୟ ।

○۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ الْمَوْتَىٰ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۖ

୪୮ : ୭ ଆଲ୍ଲାହରଇ ଆକାଶମନ୍ତଳୀ ଓ ପୃଥିବୀର ବାହିନୀସମୂହ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ପରକ୍ରମଶାଳୀ, ଅଞ୍ଜାମୟ ।

ଏଥାନେ ଯେ ବିଷୟଟି ଉପ୍ରେର୍ଣ୍ଣ କରା ହେୟେ ତା ଆଯାତ ୪୮ : ୪ ଏ ଆଲୋଚନା କରା ହେୟେ ।

۱۱- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَعْلَمُ لِمَنِ يَكُوْنُ وَيَعْلَمُ مَنْ يَكُوْنُ ۖ

○۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۖ

୪୮ : ୧୪ ଆକାଶମନ୍ତଳ ଓ ପୃଥିବୀର ବାଦଶାହୀ, ପ୍ରଭୃତି ଓ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷମତାର ଏକଛତ୍ର ମାଲିକ ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ ତିନି ଯାକେ ଇଚ୍ଛା କରି ଦେନ ଆର ଯାକେ ଇଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି ଦାନ କରେନ ।

আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি—এ বিষয়টি ৫ : ১৯ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

## —كَزُرْعٌ أَخْرَجَ شَطْعَةً فَأَنْزَرَهُ فَإِنْتَلَقَتْ فَأَسْتَوِي عَلَى سُوقِهِ .....يُعْجِبُ الرُّزَاعَ

৪৮ : ২৯ ..... (আর ইঞ্জিলে তাদের চিহ্ন একুপ) যেন একটা বীজ, তা প্রথমে অঙ্কুর বের করেছে, পরে তা শক্তিশালী করেছে। পরে তা মোটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এর পর এটা সীয় কান্দের উপর দাঁড়িয়ে যায় যাতে চারাকারীকে অবাক ও সন্তুষ্ট করা হয়....

উদ্ভিদ জগতে যে সমস্ত জৈব কর্মকাণ্ড দেখা যায় তার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে অতি ক্ষুদ্র অঙ্কুর বের হওয়া, পরে সেই ক্ষুদ্র ও দুর্বল চারাগাছ ক্রমে বড় হয়ে এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হওয়া যখন গাছটি নিজের কান্দের উপর সংগোরবে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনাটি আমাদের অবাক করে এবং এতে কৃষকদেরও অপার আনন্দ লাভ হয়। একটি পরিপুষ্ট বীজ উপযুক্ত পরিবেশে যেখানে থাকবে প্রয়োজনীয় তাপ, প্রচুর জলীয় পদার্থ এবং অঙ্গীজেন, অঙ্কুরিত হয়। বীজের ভিতরকার ঘূমস্ত জ্বল বৃক্ষটি সেই পরিবেশে জেগে উঠে এবং প্রথম একটি মূল মাটিতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। পরে একটি অঙ্কুর সোজা উপরের দিকে বের হয় এবং একটি ছোট চারাগাছে পরিণত হয়। এই সময় চারাগাছটি বীজের সংরক্ষিত খাদ্যবস্তুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে। ধীরে ধীরে সবুজ পাতা বের হয় এবং চারাগাছটি খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়ে যায়। কারণ এই পাতার সাহায্যে চারাটি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। যে প্রাথমিক অঙ্কুর থেকে পাতা বের হয় সেই নবাঙ্কুর প্রথমে খুব নরম থাকে যাকে প্রাথমিক অঙ্কুর বলা হয়। পরে ধীরে সেই অঙ্কুরটি শাখা বিশিষ্ট ডালে পরিণত হয় যাতে আরো নতুন পাতা বের হয়। ফলে চারাটির আরো দৃঢ়তার প্রয়োজন হয় যেন সে ডাল ও পাতার ওজন নিতে পারে এবং মূল থেকে পাতা পর্যন্ত পানি সিঞ্চন করতে পারে ও গাছের এক অংশ থেকে অন্য অংশে খাদ্য পরিবেশন করতে সক্ষম হয়। চারাগাছটির কান্দের দৃঢ়তা লাভ করা যে পদ্ধতিতে হয় তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃদ্ধি বলা হয় — যার ফলে এমন কতগুলো সহকারী বস্তুর সৃষ্টি হয় যা প্রধানত মৃত অথচ শক্ত আবরণযুক্ত জীবকোষ সমষ্টি। এই পদ্ধতি গাছটির বেলায় আজীবন চালু থাকে যার ফলে গাছের কান্দটি তার সমস্ত ডাল পালা ও পত্রাবলির ওজন বহন করার শক্তি লাভ করে। এই আয়াতে একটি ক্ষুদ্র চারা কিভাবে বিরাট মহীরূহ হয় সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন ইসলামও প্রথমে নানা বাধা বিপন্নি সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত বিরাট সভ্যতায় পরিণত হয়।

يَا أَيُّهُ الْكَافِرُونَ إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ ذِكْرٍ وَأَنْذِيلٍ وَمَعَالِمَ لِكُلِّ شَعْبٍ  
وَقِبَالِ لِتَعَارِفِهَا إِنَّ الْمَرْسَلَرِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَفَكُورُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حِلْمٌ حَمِيدٌ

৪৯ : ১৩ হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে জাতি ও গোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরম্পরাকে চিনতে পার। বস্তুত আশ্লাহুর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়বান। নিঃসন্দেহে আশ্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত।

এক জোড়া নর-নারী থেকে মানব জাতির সৃষ্টির বিষয়টি ৪ : ১ এবং ৩৯ : ৬ আয়াতের সঙ্গে মানব জাতির বিভিন্ন রং আকৃতি ও জাতিতে বিভক্তির বিষয়টিও ২ : ২১৩ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও বর্ণের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ভৌগলিক জাতীয়তা একে অন্যের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে কালে কালে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি সংষ্করণ হয়েছে। বিভিন্ন জাতির চাল-চলন, রীতি-নীতি ও দৈনন্দিন জীবন পদ্ধতির পার্থক্য, এক জাতি অন্য জাতি সম্পর্কে জানবার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া এক জাতি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও আবাস স্থলের প্রয়োজনে নিজের এলাকার প্রসারের উদ্দেশেও অনুপ্রাণিত হয়। এমনিভাবে আপোষে বা বিরোধের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান ঘূর্ণ হয়। এই ভাবের আদান-প্রদানের কথাই আয়াতের লিতা'আরাফু (যেন তোমরা পরম্পরাকে জানতে পার) শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

أَنَّكُنْ نَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ فَوْهَمُوكُنْ بَنْيَنَاهَا وَرَبَنَاهَا

وَمَا لَهَا مِنْ قُرْدُجٍ

৫০ : ৬ ওরা কী ওদের উর্ধ্বাহিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই?

আয়াত নং ২ : ১১৭, ২ : ১৬৪ এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২তে আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, প্রভৃতি দ্বারা

আকাশমণ্ডলীকে সজ্জিত করণের বিষয়টি রাতের আকাশের সৌন্দর্যের প্রসঙ্গে আয়াত ৩৭ : ৬-এ আলোচনা করা হয়েছে। আকাশে লক্ষ কোটি নক্ষত্র দৃশ্যমান যা মিটিয়েট করে জুলে, এই-উপর্যুক্ত থেকে নিয়মিত আলো প্রতিঃসরিত হয় এবং আলোকিত চল্ল একটি চালু মাসে তার অবস্থান পরিবর্তন করে। আকাশমণ্ডলীর আর একটি অঙ্গসজ্জা হচ্ছে সূর্য। দিনের বেলায় সূর্যের প্রতাপ অপরিসীম এবং আকাশমণ্ডলীর অন্য সব গ্রহ, উপর্যুক্তকে আলো বিতরণ করে তাদেরকে উদ্ধাসিত করে। আকাশমণ্ডলীর এই সৃষ্টিতে এমন কি একজন সতর্ক পর্যবেক্ষণকারীও কোন প্রকার ঝটি খুঁজে পাবে না। নিখিল বিশ্বের সর্বত্র সূক্ষ্ম ভারসাম্য ও সমৃদ্ধ বিদ্যমান এবং এ বিষয়টি আয়াত ৬ : ৭৩ ও ২৫ : ২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

وَالْأَرْضُ مَدَّنَهَا وَالْعِينَافِيهَا رَوَابِيٌّ وَأَبْنَى

فِنَّا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهْجِيٍّ

৫০ : ৭ : আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্ভাত করেছি সর্পপ্রকার নয়ন শ্রীতিকর উদ্ধিদি।

পৃথিবীর বিস্তার সাধনের বিষয়টি আয়াত ২ : ২২ ও ১৩ : ৩ এ আলোচিত হয়েছে। পৃথিবীর ভূত্বকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতমালার বিন্যাস সম্পর্কে ১৩ : ৩ সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আর চমৎকার সব উদ্ভিদাদির উৎপাদন পৃথিবীকে করেছে সুশোভিত এবং ৬ : ৯৯ সংখ্যক আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

وَتَرَكْنَا مِنَ النَّمَاءِ مَاءً مُبَرِّئًا فَأَبْنَيْنَا بِهِ جَنَبٍ وَحَبَّ الْحَمِينِي ৫

وَالتَّخْلُلَ لِسَقْطٍ لَهَا طَلْمٌ نَفِيَّ ৬

وَنَرْقَالِ الْعَبَادِ وَأَخْيَنَّا بِهِ بَلْدَةً مَكِنَّا كَذِلِكَ الْخُرُوجُ ৭

৫০ : ৯-১১ আকাশ থেকে আমি বর্ণণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ষ শব্দগ্রাজি ও সমুদ্রত খেজুর গাছ যাতে আছে তচ তচ খেজুর আমার বান্দাদের জীবিকাৰকৰ্ত্তৃপ ও বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবে পুনৰুদ্ধান ঘটিবে।

ଆକାଶ ଥେକେ ବୃକ୍ଷିର ବର୍ଷଣ ଏବଂ ଫଳ-ଫସଲେର ଉତ୍ପାଦନେର ଉପର ଏଇ ଉପକାରୀ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କେ ଆଯାତ ୨ : ୨୨ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହେଁଛେ । ପ୍ରଲ୍ପିତ ଖେଜୁରେର ଛଡ଼ାମହ ଲମ୍ବା ଖେଜୁର ଗାଛ ଓ ଖେଜୁରେର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବୃକ୍ଷିପାତରେ ଫଳେ ମୃତ ଭୂମିକେ ସଜୀବ କରେ ତୋଳାର ବିଷୟଟି ୨ : ୧୬୪ ସଂଖ୍ୟକ ଆଯାତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଛେ ।

**وَكُمْ أَفْلَكْنَا أَقْبَلْهُمْ قِنْ قَنْ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوْا فِي الْبَلَادِ ۚ**

### ○ مَلُّ مِنْ تَجْيِعٍ ○

୫୦ : ୩୬ ଆମି ତାଦେର ପୂର୍ବେ ଆରା କତ ମାନବଗୋଟୀକେ ଧ୍ୱାନ କରେଇ ଯାରା  
ହିଲ ତାଦେର ଅପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିତେ ପ୍ରବଳ, ତାରା ଦେଶେ-ବିଦେଶେ ଭରଣ  
କରେ କିନ୍ତୁ; ପରେ ତାଦେର ଅନ୍ୟ କୋନ ଆଶ୍ରଯଙ୍କୁ ରାଇଲ ନା ।  
ଏହି ବିଷୟଟି ଆଯାତ ୩ : ୧୩୭, ୬ : ୧୧ ଓ ୭ : ୪-ଏ ଆଲୋଚିତ ହେଁଛେ ।

**وَلَقَدْ خَلَقْنَا النَّمَاءَتِ دَلَارِحَ وَمَا يَنْهَا مِنْ بِشَوَّ اٰتَاهُ ۚ**

### ○ وَمَا مَنَّنَا مِنْ لَغْوٍ ۚ ○

୫୦ : ୩୮ ଆମି ଆକାଶମନ୍ତଳୀ ଓ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏଦେର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ସବ କିନ୍ତୁ ହୟ  
ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି କରେଇ, ଆମାକେ କୋନ କ୍ଲାଷ୍ଟି ସ୍ପର୍ଶ କରେନି ।

ଆକାଶମନ୍ତଳୀ ଓ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏଦେର ମଧ୍ୟେର ସବ କିନ୍ତୁଇ ହୟ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟିର  
ବିଷୟଟି ୧ : ୫୪ ନଂ ଆଯାତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଛେ ।

**۱-وَاللَّهُ يَعْلَمُ ذَرْوَا ۚ ۲-فَالْحِسْلِيٌّ وَقَرْأٌ ۚ**

**۱-فَالْجُرْيِيٌّ يُنْرَأٌ ۚ ۲-فَالْمُقْتَسِيٌّ أَمْرًا ۚ**

୫୧ : ୧-୪ ଶପଥ ଧୂଲିବାଡ଼େର, ଶପଥ ବୋରୀ ବହନକାରୀ ମେବ ପୁର୍ଜେର, ଶପଥ  
ହଜନ୍ଦଗତିର ଜଳଯାନେର, ଶପଥ କର୍ମବନ୍ଦନକାରୀ ଫିରିଶତାଗଣେର-

ଅଧିକାଂଶ ତାଫ୍ସୀରକାରଙ୍କଣ ଐକମ୍ୟ ପୋଷଣ କରେନ ଯେ ଏଇ ଆଯାତେ  
ବ୍ୟବହତ ସର୍ବନାମ ‘ଐଶ୍ଵରୀ’ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ବାତାସେର ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଉତ୍ସ୍ମେରିତ ହେଁଛେ ।  
ବିଭିନ୍ନ ଗତିର ଉପର ଭିତ୍ତି କରେ ବାୟୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କେ ୨ : ୧୬୪ ଆଯାତେ  
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହେଁଛେ । ଏହି ଆଯାତେ ବାୟୁର ଚାରାଟି ସାଭାବିକ ଧର୍ମର କଥା ସଂକ୍ଷେପେ  
ଉତ୍ସ୍ମେର କରା ହେଁଛେ ।

প্রথমত, শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ ও প্রবল বাত্যা প্রচন্ড গতিতে প্রবাহিত হয় এবং শুকনো ধূলিকণা, ধূলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরকুচি প্রভৃতি বয়ে নিয়ে গিয়ে এক বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে দেয়। এভাবে বায়ুর সাহায্যে একটি পরিচ্ছন্নতার অবস্থার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, উর্ধমুখী ধাক্কার প্রভাবে প্রবলভাবে প্রবাহিত বায়ু বিশাল বিশাল মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। এইরূপ মেঘে হাজার হাজার টন পানি থাকে। এত বিপুল পরিমাণ জলকণা যা মেঘদল গঠন করে তা কীভাবে শূন্যে বাতাসের মধ্যে ভাসমান থাকে, সে বিষয়ে আয়াত ২ : ১৬৪ ও ৭ : ৫৭তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রবল বাতাস বিভিন্ন দিকে মেঘপুঁজকে ভেসে বেড়াতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন গঠন বিন্যাস ও প্রকারে আল্লাহর রহমত বিতরিত হয়, যেমন, ফলবতী বা উর্বর করে এমন বাতাস (আয়াত ১৫ : ২২), মৃত ভূমিকে সজীব করার জন্য বারিপাত (আয়াত ২ : ১৬৪), পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত প্রাণীর পিপাসা নিবৃত্তিকরে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা (আয়াত ২৫ : ৪৮) উল্লেখ্য।

### وَالْمَاءُ ذَابُ الْحَلَبِ ۝

৫১ : ৭ শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের।

এই বিষয়টি আয়াত ২১ : ৩৩-এ আলোচনা করা হয়েছে।

### وَفِي السَّمَاءِ رِزْقٌ لِّكُمْ وَمَا تُؤْمِنُونَ ۝

৫১ : ২২ তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রূত সরকিছু আকাশে রয়েছে।

আকাশ মন্ত্রলীতে সমন্বিত থাকার বিষয়টি ১৫ : ২১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۝ قَالُوا لَا تَخَفْ ۝ وَبَشِّرُوهُ بِغُلْمَانِ عَلِيهِمْ ۝

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ فِي صَرْكَةٍ نَصَّكَتْ وَجْهَهَا ۝ قَالَتْ هُوَ زَوْجُكُمْ عَلَيْهِمْ ۝

قَالُوا كَذَلِكَ ۝ قَالَ رَبِّي ۝ إِنَّهُ مِنْ أَعْلَمِ الْعَالَمِينَ ۝

৫১ : ২৮-৩০ এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে জীতির সংগ্রাম হ'ল। তারা বলল, ‘জীত হয়ো না।’ তারপর তারা তাকে এক জনী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে

করতে সামনে আসল এবং গাল চাপড়িয়ে বলল, ‘এই  
বৃদ্ধা-বক্ষ্যার সন্তান হবে?’ তারা বলল, ‘তোমার  
প্রতিপালক একেপই বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।’

বৃদ্ধ ইবরাহীম (আ) ও তার বক্ষ্য স্ত্রীর সন্তান জন্মানের বিষয়টি ইতোমধ্যে  
আয়াত ১১ : ৭১-৭২ এ আলোচনা করা হয়েছে।

٠-لَرْبِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِّنْ طِينٍ ۝

৫১ : ৩৩ তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত চিল,

লৃত (আ)-এর লোকদের উপর শান্তিনানের বিষয় নিয়ে আয়াতটি নাখিল হয়  
এবং এ বিষয়ে আয়াত নং ৭ : ৮৪, ১১ : ৮২ ও ১৫ : ৭৪ এ আলোচনা করা  
হয়েছে।

٠-وَفِي عَالَمٍ إِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ الْعَقِيمَ ۝

٠-مَا تَدْرِي مِنْ شَيْءٍ أَنَّتِ عَلَيْهِ لِأَجْعَلْنَاهُ كَالْزَمِينِ ۝

৫১ : ৪১-৪২ এবং নিদর্শন রয়েছে ‘আদের ঘটনায়, যখন আমি তাদের  
বিকলকে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু; এটা যা  
কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে  
দিয়েছিল,

বায়ু সম্পর্কিত বিষয়টি আয়াত নং ১৭ : ৬৯ এ আলোচিত হয়েছে।

٠-وَفِي شَوَّدٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَسْكُنُوا حَتَّىٰ جِبِينٍ ۝

٠-فَعَطَوْا عَنْ أَصْرَارِهِمْ فَلَخَلَّتِهِمُ الضُّوئَةُ وَهُمْ يَنْظَرُونَ ۝

٠-فَنَّا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِبَامِ رَمَادٍ أَنُوا مُنْتَهِيَنَ ۝

৫১ : ৪৩-৪৫ আরও নিদর্শন রয়েছে ছামুদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা  
হয়েছিল, ‘তোগ করে নাও বল্লকাল।’ কিন্তু তারা তাদের  
. প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল; ফলে তাদের প্রতি  
ব্রহ্মাণ্ডাত হ’ল এবং তারা তা দেখেছিল। তারা উঠে দাঁড়াতে  
পারল না, এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারল না।

এই আয়াত সমূহে ছামুদ জাতির উপর যে শান্তি নেমে এসেছিল তার উদ্দেশ্য  
করা হয়েছে। আয়াত ১১ : ৬৭তেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

## ○-۳۶- وَالْمَاءُ بَنِينَاهَا بِأَيْمَنِكُمْ وَإِلَيْهَا لَمْوِسْعُونَ

৫১ : ৪৭ আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী ।

সৃষ্টি কৌশলের জন্য শক্তিশালী কল্পনা শক্তি ও কুশলী দক্ষতার প্রয়োজন হয় । এক লক্ষ কোটির মধ্যে যদি কোন একটি তাৎপর্যহীন বিচ্যুতি বা ত্রুটি ঘটে, তাহলে সমগ্র সৃষ্টিই নষ্ট হয়ে যায় । আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা ও দক্ষতা ব্যক্তিত আকাশমন্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহহরাজি এবং বিভিন্ন আঙিকে ও বিন্যাসে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য ও প্রাণীজগত কোন কিছুরই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিলনা (দ্র. পরিশিষ্ট ১ ও ২) । এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশ এই অর্থ সৃষ্টিত করে যে এই নিখিল বিশ্ব সম্প্রসারণশীল এবং তা পরিশিষ্ট-২ এ সরিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

## ○-۳۷- وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا قَنْعَمَ الْمِهْدُونَ

৫১ : ৪৮ এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি তা কত সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিয়েছি ।

আয়াত নং ২ : ২২ ও ১৩ : ৩ এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

## ○-۳۸- وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُجَّلِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

৫১ : ৪৯ আমি অত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।

৪৩ : ১২ নং আয়াতে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

## ○-۳۹- وَالْتَّقْفِ الرَّفُوعِ

৫২ : ৫ শপথ সম্মুখত আকাশের ।

জানা আছে যে দু'টি ভিন্ন ধরনের শক্তি এই নিখিল বিশ্বে কর্মরত আছে, (১) মহানিনাদ (Big Bang)-এর কারণে সম্প্রসারণ শক্তি, ও (২) মহাকর্ষ শক্তি । সম্প্রসারণ শক্তি সব কিছুকেই কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, পক্ষান্তরে মহাকর্ষ শক্তি সবকিছুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে । এই বিশ্ব জগতে যে কোন দু'টি পদার্থ তা সে সম্প্রসারণশীল বিশ্বে হোক না কেন, পরম্পরাকে আকর্ষণ করে । এই দু'টি পদার্থ যত বেশী কাছাকাছি আসবে ততবেশী তাদের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি বৃক্ষি পাবে এবং বলতে গেলে সম্প্রসারণশীল বিশ্বের পৃথকীকরণ

প্রভাবের বিপক্ষে এই দু'টি পদার্থের পরম্পর দৃঢ়ভাবে লেগে থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

উদাহরণ স্বরূপ এই সম্প্রসারণশীল বিশ্ব সৌরজগতের গঠনিক উপাদান সমূহকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে না অথবা একটি ছায়াপথের অন্তঃস্থ নক্ষত্রসমূহকে তাদের একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করে না। মহানিনাদ (Big Bang)-এর কারণে এবং মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে আকাশমন্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ সমূহের প্রত্যেকটির উপর সম্প্রসারণশীল শক্তি কাজ করে। মহাকর্ষের কারণে যদি আকর্ষণকারী শক্তি সম্প্রসারণ শক্তির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয় তাহলে আকাশমন্ডলীতে অবস্থিত ঐ সকল বস্তু পরম্পর সংযুক্ত হয়ে ওছে গঠন করে। এভাবে মহা বিশ্বের নক্ষত্রের ও ছায়াপথের পুঁজি গঠিত হয়। এবং যে সব পুঁজের উপর সম্প্রসারণ শক্তি মহাকর্ষ শক্তি থেকে বেশী শক্তিশালী হয় সেসব পুঁজি অপসৃত হয়। এভাবে অপসৃয়মান অনেক ছায়াপথ রয়েছে। এরূপে আকাশমন্ডলীর আমরা সাতটি স্তর পাই যারা পরম্পরের সাথে সংযুক্ত আছে এবং অপসৃত হচ্ছে। এই সাতটি স্তর হচ্ছে : (১) অন্তঃস্থ গ্রহসমূহ যাদের কক্ষপথ উপগ্রহ বলয় ও সূর্যের মধ্যর তর্তী অবস্থানে রয়েছে; (২) সৌরজগত; (৩) সূর্যের স্থানীয় তারকা দল; (৪) ছায়াপথস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্র মন্ডলী; (৫) ছায়াপথ সমূহের পুঁজি; (৬) মহা ছায়াপথ; এবং (৭) মহা বিশ্বের প্রান্তঃস্থ অঞ্চল। এরূপে আমরা দেখতে পাই যে একটি ঢাকনা (চাঁদোয়া) পৃথিবী থেকে উত্থিত হয়ে মহা ছায়াপথ ও মহাবিশ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এ বিষয় শুলোই ২ : ২৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

## وَالْبَحْرُ الْمُجْرِيُّ

### ৫২ : ৬ এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রে-

মহাসমুদ্র/ সমুদ্র হচ্ছে বিপুল জলরাশির সমাহার। এই জলরাশি ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১% স্থান জুড়ে রয়েছে। এ বিশাল জলরাশি জলস্রোতের একটি সুবিন্যস্ত প্রণালী দ্বারা পরম্পর সংযুক্ত। মহাসাগরীয় স্রোতসমূহ তাদের স্ব স্ব অবস্থানে কমবেশী স্থায়ী। সমুদ্র তলের বায়ু ঘর্ষণ এবং মহাসাগর/ সাগরের পানির ঘনত্বের মধ্যে আনুভূমিক ও উল্লম্বের পার্থক্যের কারণে মহাসাগর/ সাগরের জলস্রোতের মধ্যে প্রবহমানতার শক্তির উত্তোলন হয়। পার্থক্যমূলক উত্তোলন ও শীতলীকরণ, অতি প্রচলিতবেগে নিচের দিকে ধাবন এবং বাষ্পীভবন সমুদ্রতলে পানির ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। কারণ, সামুদ্রিক জল স্রোতের পরিবেষ্টন বায়ুমণ্ডল ও তার আচরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। মহা মহাসাগরীয় জলস্রোতের পদ্ধতিসমূহ যেমন ধারণা করা হয় তেমন স্থির নয়। অভিকর্ষের বহিঃশক্তি ব্যতিরেকে সামুদ্রিক জলস্রোতের সংষ্টক ও প্রভাবক হিসেবে সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে

আনুভূমিক চাপ বিশিষ্ট নতিমাত্রার শক্তি, Coriolis শক্তি ও ঘর্ষণজনিত শক্তি। সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে সামুদ্রিক স্নোত প্রধানত দায়ী। আর, এর ফলে বায়ুমণ্ডলের উপরিস্থিত আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে।<sup>1</sup>

সমুদ্রের গড় গভীরতা প্রায় ৩৭৯০ মিটার ( $12,480$  ফুট) বলে হিসাব করা হয়েছে। সমুদ্রের সর্বোচ্চ পরিমাণ গভীরতা হচ্ছে  $10,850$  মিটার ( $35,595$  ফুট)। এই গভীরতা হিমালয় পর্বতের  $8,848$  মিটার ( $29,028$  ফুট) উচ্চতাকে অতিক্রম করেছে।

পৃথিবীতে বিদ্যমান বিভিন্ন সমুদ্রের অভ্যন্তরে যেখানে ব্যাপক মাত্রায় পানির চলনের ফলে স্নোতের সৃষ্টি সেখানে সমুদ্রের উপর দিয়ে দেয় যাওয়া প্রবল বাতাস পানিকে দারণভাবে আন্দোলিত করে। আর এর ফলে সমুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বহুধরন ও প্রকারের সমুদ্র তরঙ্গ রয়েছে, এদের মধ্যে একটি হচ্ছে অভিকর্ষ তরঙ্গ। সমুদ্রের উপরিভাগে ধাবনশীল তরঙ্গের মধ্যে যেগুলো প্রবাহিন তাদের মধ্যে তিন ধরনের তরঙ্গকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন বাতাস দ্বারা সৃষ্টি তরঙ্গ, ফুলে-ফেঁপে ওঠা উত্তাল তরঙ্গ এবং ভূকম্পনয়টিত সমুদ্র তরঙ্গ। বায়ুতাঙ্গিত তরঙ্গ প্রবল বায়ু প্রভাবের ফলে সৃষ্টি হয়। বায়ুর গতি অনুসারে সমুদ্রের অবস্থা বর্ণনা করে বিউফোর্ট (Beaufort) একটি সারণি তৈরি করেছেন। বায়ুপ্রবাহে সৃষ্টি সমুদ্র তরঙ্গের উচ্চতা ক্রমবর্ধমান বায়ুর গতি ও মেয়াদের কারণে বৃদ্ধি পায় এবং বায়ু যে উচ্চতায় প্রবাহিত হবে তদনুসারে সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যেও বৃদ্ধি ঘটবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে প্রতি সেকেন্ডে  $5$  মিটার ( $16$  ফুট),  $15$  মিটার ( $50$  ফুট) ও  $25$  মিটার ( $80$  ফুট) গতির বায়ুপ্রবাহ একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উচ্চতায় তরঙ্গকে উঠিয়ে নিতে পারে। এই উচ্চতা হবে যথাক্রমে  $0.5$  মিটার ( $1.6$  ফুট),  $8.5$  মিটার ( $15$  ফুট) ও  $12.5$  মিটার ( $41$  ফুট)। আর এর অনুরূপ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে যথাক্রমে  $16$  মিটার ( $53$  ফুট),  $180$  মিটার ( $460$  ফুট) এবং  $800$  মিটার ( $1300$  ফুট)।

বাতাসের গতি হ্রাস প্রাপ্ত হলে তরঙ্গ সৃষ্টির এলাকা থেকে তরঙ্গসমূহ-এর বিচরণ শেষ হয়। তারপর ক্রমাবয়ে এগুলো স্ফীত হয়ে ওঠে এবং এরপ অবস্থাকে সমুদ্র উপরিভাগের তরঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। এসব তরঙ্গের রয়েছে একইরকম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অধিকতর দীর্ঘ ও দীর্ঘতর সময় ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তরঙ্গ স্ফীতি হাজার হাজার মাইলব্যাপী স্থান পরিভ্রমণ করতে পারে। এটা তরঙ্গ ও তরঙ্গ ফেনা দ্বারা গঠিত হয়। এই তরঙ্গ পরে উর্মিভঙ্গে পরিণত হয়, আর তরঙ্গ ফেনা সমুদ্র তীরে গিয়ে সঞ্চিত হয়।

#### তথ্যসূত্র :

1. Encyclopaedia Britannica, vol. 13, pp. 437-443; 1978.

٩- مَوْرًا سَيِّدُ النَّمَاءِ نَمَاءً تَمَّرًا ۝

١٠- سَيِّدُ الْجَبَالُ جَبَالٌ سَيِّدًا ۝

৫২ : ৯-১০ যেদিন আকাশ প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে এবং পর্বত দ্রুত চলবে।

এই বিশ্বজগত চৃড়ান্তভাবে ধ্রংস হওয়ার অর্থাৎ মহা-নিমাদ-এর পূর্বে প্রায় এক লক্ষ বছরের একটা সময়ে নক্ষত্রাজি এত নিকটবর্তী হবে যে রাতের আকাশ কেবল চোখ ধীধান উজ্জ্বল আলোয় ভরে যাবে না তা তাপদণ্ড গরমে পর্যবসিত হবে। এই নিখিল বিশ্বের যে কোন গ্রহের সকল জীবন্ত প্রাণীর সমাপ্তি ঘটবে। শ্঵েত তাপে ভাস্বর আকাশের নিচে সমুদ্রের পানি টগবগ করে ফুটবে, তারকা রাজি এত নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে যে তাদের উত্তাপে কঠিন পাথর গলে যাবে এবং গলিত পাথর উত্তাপে ফুটতে ফুটতে প্রবাহিত হবে। গলিত পাথরের পিণ্ডের মধ্যে প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি হবে, আর পর্বতসমূহ উড়ে চলে যাবে। তারকারাজির একে অপরের সাথে সংঘর্ষ হবে। এভাবে সমগ্র বিশ্বজগত এক সময়ে এক ভীতিকর আলোড়নের মধ্যে পড়বে।

١- إِذَا هَوَى جِمْعُ الْأَنْجَوْمِ ۝

৫৩ : ১ শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তিত্ব হয়।

পৃথিবীর স্বীয় অক্ষরেখার উপর ঘূর্ণনের ফলে নক্ষত্রাজিসহ আকাশমন্ডলীর সকল গ্রহ-উপগ্রহ প্রত্যু পূর্ব দিকে ওঠে ও পশ্চিমে অস্ত যায় বলে প্রতীয়মান হয়। এই আয়াতে নক্ষত্র শব্দ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রকে বুঝান হয়েছে। অনুমিত হয় যে, এখানে লুক্স (Sirius) নক্ষত্রের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। আকাশের লুক্স নক্ষত্রকে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতির্বিদ্যায় একে Alpha Canis Majoris নামে অভিহিত করা হয়। সংগী Sirius B সহ এটি সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকা। পৃথিবী থেকে 8.7 আলোক বর্ষের দূরত্বে রয়েছে এবং লুক্সের বলয় থেকে একটি অবরোহণ রেখার মধ্যে অবস্থিত।

٢- إِذَا عَلِمُوا بِإِيمانِ الْأَرْضِ فَلَمْ يَجْزِئُ الَّذِينَ أَسْأَلُوا ۝

٣- الَّذِينَ أَخْسَرُوا بِالْحُسْنَى ۝

৫৩ : ৩১ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি মন্দ ফল দেন এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। এ বিষয়টি আয়াত ৫ : ১৯, ৭ : ৫৪ ও ৭ : ১৮৫তে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٢-الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرًا إِلَّا مَرِدُ الْفَوَاحِشِ إِنَّ رَبَّكَ وَإِسْمُ الْعَفْرَةِ  
مُوَاعِدُهُ يَكُمْرُ إِذَا أَنْتَ كُحْرُ قَنَ الْأَزْرِقُ وَإِذَا أَنْتَ مَأْجَنَّ فِي بَطْوَنِ أَمْهِنَكُمْ  
فَلَا تُرِكُوكُمْ أَنْفَسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الْفَغِيْ

৫৩ : ৩২ যারা বড় বড় শুগাহ এবং প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে— তবে কিছু অপরাধ তাদের দ্বারা ঘটে যায়, মনে রেখো তোমাদের রবের ক্ষমাশীলতা অনেক ব্যাপক তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি তোমাদেরকে সেই সময় থেকেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর যখন তোমরা তোমাদের মাত্গর্ডে জ্ঞ অবস্থায় ছিলে। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতার দাবী করো না, প্রকৃত মুক্তাকী কে, তা তিনি ভালই জানেন।

মানুষ যে মাটি থেকে সৃষ্টি সেই বিষয়টি ২ : ২৮, ৬ : ২ এবং ১৮ : ৩৭ আয়াত সমূহের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের প্রাক জ্ঞ ও জ্ঞ কালের যাবতীয় খবর আল্লাহ জানেন যার উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব নেই। মায়ের পেটে মানব শিশুর সৃষ্টির বিবরণ ১৩ : ৮ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٢٣-وَأَنَّهُ هُوَ أَضَكُّ وَأَبْكَىٰ

٢٤-وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَاهٌ

৫৩ : ৪৩-৪৬ আর তিনিই হাসিয়েছেন এবং তিনিই কাঁদিয়েছেন, আর নিচয়ই তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন। আর নিচয়ই তিনিই পুরুষ ও নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন সেই ফেঁটাতে যা নিষ্কিণ্ড হয়।

হাসি এবং কান্না মনের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ যাতে মানসিক দুঃখ ও কষ্টের অবস্থা বুঝা যায়। হাসি ও কান্নার অভিযোগ্য কীভাবে হয় তা বুঝা খুবই জটিল। এ জন্য মানসিক অবস্থা ও শারীরিক কিছু কর্মকান্ডের সম্বয়, মুখের কতক

ମାଂସେର କୁର୍ଦ୍ଦନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଯାର ଫଳେ ହାସିର ଉଡ଼ିବ ହ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭାବେର ଫଳେ ଚୋବେର Lachrymal ଗ୍ରିଙ୍ଗଲୋ ଉତ୍ୱେଜିତ ହ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହ୍ୟ । ଏ ସବାଇ ଆଲ୍ଲାହୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାୟ ଓ ମାଂସେର ସମବିତ କର୍ମକାନ୍ଦେର (neuromuscular functions) ସମାପ୍ତି ।

ଆଲ୍ଲାହୁ ଯେ ଜନ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ମାଲିକ ତା ୬ : ୯୫ ଆୟାତେର ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରା ହେୟେଛେ । ନର ଓ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟଟି ୧୬ : ୪ ଓ ୩୦ : ୨୧ ଆୟାତେ ଆଲୋଚିତ ହେୟେଛେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆୟାତେ ଆର ଏକଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ରଖେହେ ଯା ମାତ୍ର କରେକ ଦଶକ ପୂର୍ବେ ମାନ୍ୟ ଜାନତେ ପେରେଛେ । ଏହି ଆୟାତ ଦୁଟିର (ଆୟାତ ୫୩ : ୪୫-୪୬) ପ୍ରଚଲିତ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ନୂଝଫା (seminal fluid) ତୋମାର ଛୁଡ଼େ ଫେଲ ତା ଥେକେ ଜୋଡ଼ାଯ ଜୋଡ଼ାଯ ନର-ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରା ହେୟେଛେ । କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀତେ ସବ ନର-ନାରୀ ଜୋଡ଼ାଯ ଜୋଡ଼ାଯ ଜନ୍ୟହଣ କରେ ନା । ସେହେତୁ ଛୁଡ଼େ ଫେଲାର କଥା ବଲା ହେୟେଛେ ତାତେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷେର ବୀର୍ଯ୍ୟକେ ବୁଝାଯ । ଆର ଶୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷେର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହ୍ୟ ନା- ତାର ଜନ୍ୟ ନାରୀର ନୂଝଫା ବା ଡିବି ପ୍ରୟୋଜନ । ସୁତରାଂ ପୁରୁଷେର ବୀର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟେଇ ଜୋଡ଼ାଯ ଜୋଡ଼ାଯ ନର ଓ ନାରୀ ରଖେହେ ଧରାଲେ ଅର୍ଥଟା ପରିକାର ହ୍ୟ ।

### ٥-وَأَنَّهُ مُرَبِّٰٰ لِلشِّعْرِيِّ

୫୩ : ୪୯ ଆର ତିନିଇ ‘ଶେଯରା’ ତାରକାର ରବ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ।

ଏହି ବିଷୟେ ୫୩ : ୧ ଆୟାତେ ଆଲୋଚନା କରା ହେୟେଛେ ।

٠-وَأَنَّهُ أَهْلُكَ عَادٌ الْأُولَى ٥- وَكَوْدَا فَمَا أَبْقَى ٠-

٥-وَتَوَمَ لُوْجَرْ قِنْ قَبْلَ ٦- كَلْمَ كَلْمَ هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْفَلُ ٥-

٥-وَالْمُؤْنِفَكَةُ لَهُوَ ٦- فَقَسْمَهَا مَا غَنِيَ ٥-

୫୩ : ୫୦-୫୪- ଆର ତିନିଇ (ସେଇ ଆଲ୍ଲାହୁ) ଯିନି ପ୍ରାଚୀନ ‘ଆଦ’ ଜାତିକେ ଧର୍ମ କରେଛେ, ଏବଂ ହାମ୍ଦ ଜାତିକେ ଏମନଭାବେ ଧର୍ମ କରେନ ଯେ ତାଦେର ଏକଜନକେଓ ବାଚିଯେ ରାଖେନନି । ଆର ତାଦେର ପୂର୍ବେ ନୁହେର ଜାତିକେ ଧର୍ମ କରେଛେ । କାରଣ ତାରା କଠିନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଓ ସୀମାଲିଖନକାରୀ ଦୂର୍ବିନୀତ ଲୋକ ଛିଲ । ଆର ତିନି ଉପରୁ ହ୍ୟ ପଡ଼େ ଥାକା ଜନବସତିସୟକେ (ସୋଡୋମ ଓ ଗୋମରାହ) ଉଠିଯେ ନିକ୍ଷେପ କରେଛିଲେନ ଯାଦେର ଉପର ବିହିଯେ ଦିଲେନ ସେଇ ଜିନିସ ଯା ତୋମରା ଜାନ ।

ଏହି ବିଷୟଗୁଲୋ ୧୧ : ୬୭, ୬୮ ଓ ୮୨ ଆୟାତେର ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚିତ ହେୟେଛେ ।

## ○اقرئیت الشاعر ؛ انشق القمر۔

৫৪ : ১ ক্রিয়ামতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বর্তিত হয়েছে।

পৃথিবী ও চাঁদ পরস্পরের সঙ্গে তাদের একে অন্যের চারিদিকে ও নিজস্ব ঘূর্ণনের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর এই সম্পর্ক স্থির নয়— বরং সব সময় পরিবর্তিত হচ্ছে। সমুদ্রের জোয়ার ভাট্টা এর সঙ্গে সম্পর্কিত। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সমুদ্রের পানিকে পৃথিবী থেকে সামান্য সরিয়ে চাঁদের দিকে আকর্ষণ করে আর পৃথিবীকে চাঁদের বিপরীত দিকে পানি থেকে দূরে সরাতে চেষ্টা করে।

যদি পৃথিবী আপন অক্ষরেখা বা মেরুদণ্ডের চারিদিকে না ঘূরতো তবে শুধু এই পানির উচ্চতা একদিকে স্থির না থেকে বিভিন্ন এলাকায় পরিব্যাপ্ত হত। আর পানি ফুলে উঠতে এবং আবার নেমে যেতে সময় লাগে তখন পৃথিবী ও চাঁদের কল্পিত রেখা থেকে পানির উচ্চতা দূরে সরে যায়। এই পানির প্রতি চাঁদের আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণনের গতি এক শতাংশীতে  $0.002$  সেকেন্ড হ্রাস পায়। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির এইভাবে শুধু হয়ে আসায় একটা মজার ব্যাপার ঘটে। এটা জানা যে, যে কোন বিছিন্ন ব্যবস্থায়/জগতে কৌণিক গতি সংরক্ষিত/অক্ষুণ্ণ থাকে। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি যদি জোয়ার দ্বারা বাধাগ্রস্ত করা হয়, তাহলে এর কৌণিক গতি কমে আসে। এ ক্ষতিটা পুরিয়ে নিতে হলে একে অন্য কোথাও পুনরাবৃত্ত হতে হবে। বর্তমানে এটি পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের আবর্তনপথে দেখা যায়। চাঁদের আবর্তনপথে কৌণিক গতি ক্রমাগায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চাঁদ ধীরে ধীরে পৃথিবীর বহিদিকে পেঁচালো গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে যাচ্ছে ততই এর আবর্তনকাল বৃদ্ধি পাচ্ছে কেপলারের সূত্রানুযায়ী। এভাবে দিন ও মাস উভয়ই দীর্ঘতর হচ্ছে, তবে দিন বাঢ়ছে দ্রুততর হারে। আজ থেকে পাঁচশ থেকে এক হাজার কোটি বছর পর যখন বর্তমানের ২৪ ঘণ্টার দিনের স্থলে ৪৩ ঘণ্টার মত দিন হবে, তখন দিন ও রাত সমান হবে। এ বিষয়টি ছাড়াও পৃথিবী-চাঁদ জগতের আরও বিবর্তন আরো বেশি গভীর চিন্তাভাবনার বিষয়। বিজ্ঞানিত হিসাবাদি এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে, চাঁদ পেঁচানো বা সর্পিল গতিতে পৃথিবীর দিকেই চলে আসবে এবং পৃথিবীর নিকটতর হতে থাকবে। পরিণতিতে চাঁদ পৃথিবীর এত কাছাকাছি চলে আসবে যে, চাঁদের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অর্ধাংশের উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানের পার্থক্য আক্ষরিক অর্থেই চাঁদকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবে।

### তথ্যসূত্র :

1. J. C. Brandt, and J. P. Maron, New Horizons in Astronomy, W. H. Freeman and Company, San Francisco, p. 427. 1972.

৫৪ : ১১-১৫ ফলে আমি প্রবল বারি বর্ষণে আকাশের ঘার উন্মুক্ত করে দিলাম, এবং মাটি থেকে প্রস্তুত উৎসাহিত করলাম;  
অতঃপর এক পরিকল্পনা অনুসারে সকল পানি যিনিত  
হ'ল। তখন নৃহকে কাঠ ও কীলক নির্মিত এক জলযানে  
আরোহণ করলাম যা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলত;  
যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তার জন্য এটা পুরকার। আমি  
একে এক নির্দর্শনক্রপে রেখে দিয়েছি; অতএব উপদেশ  
গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

আকাশের যে বস্তু থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এই বিষয়টি ১১ : ৫৭  
সংখ্যক আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন কোন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল যেখানে  
বন ও পাহাড় আছে সেখানে কখনও কখনও বিশাল জলদ মেঘপুঁজি আকাশ ঢেকে  
ফেলে এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় যেন আকাশের  
দরজাশুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এরূপ প্রবল বৃষ্টিপাত বড় ধরনের বন্যার  
সৃষ্টি করে যা ব্যাপক এলাকা প্রাবিত করে প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। এই আয়াতে  
নৃহ (আ)-এর লোকদের শান্তিস্বরূপ যে বন্যার সূচনা করা হয়েছিল তার প্রসঙ্গ  
উল্লেখিত হয়েছে। এই বিষয়টি আয়াত ৭ : ৬৪, ১০ : ৭৩ ও ১১ : ৪০-৪২ এ  
আলোচিত হয়েছে।

١٠- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرِصَرًا فِي يَوْمٍ شَحِينٍ مُّشَيْئِرٍ  
١٠- تَشْرِيعُ الْكَاسِ كَانُوكُمْ لِتَحْازِمَ تَخْلُّ مُتَقْعِدِرٍ

৫৪ : ১৯-২০ ওদের উপর আমি নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিলে ঝঁঢ়াবায় প্রেরণ  
করেছিলাম। উন্মুক্ত বেজুরের কাডের ন্যায় মানুষকে তা  
উৎখাত করেছিল।

আদ জাতির উপর যে শাস্তি নেমে এসেছিল এ দু'টি আয়াতে সে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে এবং আয়াত নং ১১ : ৬৭তে তার আলোচনা এসেছে।

○-۳-۱۰- نَكَانُوا كَهْشِنُوا مُعْتَدِلٍ صَبَّجَهُمْ دَائِعَةً أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

৫৪ : ৩১ আমি এক মহানাদ দ্বারা তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম, ফলে, তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর শুক্ষ শাখা-প্রশাখার ন্যায় বিখ্যাতি হয়ে গেল।

এ বিষয়টি পূর্বের অনেকগুলো আয়াত যেমন ৭ : ৭২, ২৬ : ১৩৯-এ আলোচিত হয়েছে।

○-۳-۱۱- حَاجِبًا كَهْشِنُوا مُعْتَدِلٍ دَائِعَةً أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لَوْطٌ

৫৪ : ৩৪ আমি ওদের উপর পাথর বহনকারী প্রচল বাড় প্রেরণ করেছিলাম, কিন্তু লৃত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি রাতের শেষাংশে উদ্ধার করেছিলাম।

লৃত (আ)-এর লোকদের যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল এখানে তারই প্রসঙ্গটি এসেছে। ৭ : ৮৪ সংখ্যক আয়াতেও এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

○-۱-بِيَانُ الْعِلْمِ

৫৫ : ৪ তিনিই তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যাকে আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহে কথা বলার সবচেয়ে উন্নত দক্ষতা প্রদান করেছেন। বাকশক্তির এই দান ব্যতীত মানব সভ্যতা সম্পর্ক ছিল না; সাহিত্য, সঙ্গীত, বৈজ্ঞানিক আবিক্ষার, নতুন জিনিসের উদ্ভাবন ও তাদের অগ্রগতি সাধিত হ'ত না; এমন কি সংগঠিত মানব সমাজের অস্তিত্ব থাকত না।

স্বরবর্ণ ও ব্যঙ্গনবর্ণের নানা ধরনের বিন্যাসের মাধ্যমে মানব কঠস্বর ভাবের প্রকাশ ঘটাতে পারে। সঙ্গীতে এ স্বর যেমন ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি বাদ্য ও গানের বাণীর সাথে বাকশক্তির সম্মিলন ঘটতে পারে। মানুষ তার কঠস্বর

ଉନ୍ନୟନେର ଦୀର୍ଘ ନାମାନ ଭାଷାର ସ୍ଥାପନକୁ ଉପରି ସାଧନ କରତେ ସନ୍ଧମ ହେଯାଇଛେ । ମେ ତାର ଚିତ୍ତା ଓ କର୍ମର ସବଚେଯେ ନିର୍ମୂଳ ବର୍ଣନା ଦିତେ ପାରେ ।

ମାନୁଷେର ଦେହ ଅଭ୍ୟାସରୁଷ୍ଟ ସ୍ଵରତତ୍ତ୍ଵସମୂହ ପ୍ରଧାନତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଫିତାର ନ୍ୟାୟ ଦୁ'ଟି କୁଦୁ ଟିସ୍ୟ ସବ୍ର ଯତ୍ରେ ଆଡ଼ାଆଡ଼ି ଚଲେ ଗିଯେଛେ । ଏକଟି ଫିତା ସ୍ଵରଯତ୍ରେ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଶେ ପ୍ରସାରିତ ଅବହ୍ଲାୟ ଥାକେ । ଗଲାର ମାଂସ ପେଣୀ ପ୍ରସାରିତ ହେୟ ସ୍ଵରଯତ୍ରକେ ଶିଥିଲ କରେ ଦେଇ ।

ଆମରା ସଖନ ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସ ପ୍ରାଣ କରି ତଥବ ସ୍ଵରଯତ୍ରକେ ଶିଥିଲ କରି ଏବଂ ଏଟା ଇଂରେଜୀ 'V' ଅକ୍ଷରେର ଆକୃତି ତୈରି କରେ । କଥା ବଲାର ସମୟ ସଂଲଗ୍ନ ମାଂସପେଣୀସମୂହ ସ୍ଵରଯତ୍ରକେ ଟେନେ ଧରେ ବାୟନଲେର ପ୍ରବେଶ ମୁଖକେ ସଂକୁଚିତ କରେ । ତଥବ ଫୁମଫୁସ ଥିକେ ବାୟୁ ସ୍ଵରଯତ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସ୍ଵରଯତ୍ରେର ପାତଳା ଅଂଶ ସ୍ଵରତତ୍ତ୍ଵସମୂହ ବାତାସେ ଫେଂପେ ଓଠେ । ସ୍ଵରଯତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ବାୟୁର ଅତିକ୍ରମକାଳେ ଯେ କମ୍ପନେର ସୃଷ୍ଟି ହେଁ ତାର ଫଳେ ଧନିର ସୃଷ୍ଟି ହେଁ । ଫୁମଫୁସ ଥିକେ ବାୟୁ ସ୍ଵରଯତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯେହେତୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାଇ ବାୟନଲେର ପ୍ରବେଶପଥ ଖୋଲା-ବନ୍ଦ ହେୟାର ସମୟ ସ୍ଵରତତ୍ତ୍ଵସମୂହ ଦ୍ରମ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଁ । ଏଭାବେ ତୈରି ଧନିର ଉକ୍ତତାର ମାତ୍ରା ସ୍ଵରତତ୍ତ୍ଵସମୂହରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଘନତ୍ବ ଓ କଠିନ ଟାନେର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ । ସ୍ଵରତତ୍ତ୍ଵର ଯେ କଠିନ ଟାନ ଧନିର ନାନାପକାର ମାତ୍ରା ତୈରି କରେ ତା ମାଂସପେଣୀର କ୍ରିୟାର ଫଳେ ପରିବର୍ତ୍ତି ହେଁ । ଏକଜନ ସ୍ଵର୍ଗତି ତାର ଠୋଟ, ଜିଭ ଓ ମୁଖର ସାହାଯ୍ୟେ ଧନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଶବ୍ଦ ତୈରି କରେ ।

ସ୍ଵରଯତ୍ରେ ଧନି ତୈରିର ଫଳେ ଯେଥାମେ ସ୍ଵରେର ସୃଷ୍ଟି, ମେଥାମେ ବାକଣକ୍ତି ହଛେ ମୁଖେର ଓ ନାକୁର ଅନୂରଣନେର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବହ୍ଲାୟ । ଏକଟି ଶିଶୁ ତାର ମାଯେର ନିକଟ ଏବଂ ପରିପାର୍ଶ୍ଵ ଅନ୍ୟାନ୍ୟେର କାହିଁ ଥିକେ ତମେ କଥା ବଲାତେ ଶେଷେ । ମାନୁଷେର ବାକଣକ୍ତି ତାଇ ଜ୍ଞାନ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥଗତିର ସାଥେ ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନେର ଧାରାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଅଗସର ହେଯାଇଛେ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. The World Book of Encyclopaedia, Field enterprises educational corporation, London, vol. 12, p. 522, 1966.
2. Encyclopaedia Britannica, vol. 17, Willium Benton, Publisher, p. 477, 1978.

## ۰۔ الْكِتْمُ وَالنَّفَرُ بِحُبْلَانٍ

৫৫ : ৫ সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে।

এ বিষয়টি ৭ : ৫৪ ও ৩৬ : ৩৮-৩৯ সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

## ۱۰۔ النَّجْمُ وَالشَّجَرُ بِسِجْنٍ

৫৫ : ৬ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই বিধান মেনে চলে।

‘নজম’ শব্দটির অর্থ আকাশমণ্ডলীর কোন গ্রহ, তারকা বা তারকা পুঁজি। অন্য অর্থ হচ্ছে তৃণলতা বা কোন ঘাস।) যেহেতু এই শব্দটি আশশাজার অর্থাৎ একটি বৃক্ষ-এর সাথে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এটা ধ্যানণা করা যুক্তিসংগত হবে যে এই নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নজম শব্দের অর্থ হবে তৃণলতা। একটি তৃণলতা ও একটি উত্তিদ উভয়ই যথাক্রমে নরম কাণ্ড ও কাঠের প্রতীক সদৃশ এবং স্পষ্ট করে বলতে গেলে সমগ্র উত্তিদ জগৎ হিসেবে একে ব্যাখ্যা করা যায়। আল্লাহ কর্তৃক স্থিরীকৃত বিধানাবলির প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ভক্তি ভরে সিজদাবনত হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উত্তিদরাজির মধ্যে এক বিশ্বাকর প্রাণের দৃশ্য দেখা যায় যা অতি সূক্ষ্মভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। সংবহন-নালিকা সংবলিত উত্তিদের ক্ষেত্রে তাদের শিকড় মাটিতে পুষ্টির উপাদান ও পানির উৎস খুঁজে পাওয়ার জন্য মাটির নিচে প্রবেশ করে। উত্তিদের অংকুর-উদগম হলে তা সব সময় উপরের দিকে বেড়ে ওঠে। অর্থাৎ মাটি থেকে উপরের দিকে আলো, অঙ্গিজেন ও কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণের জন্য বেড়ে উঠতে থাকে। পাতায় থাকে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র। এই ছিদ্র ও কচি বোঁটার সমতালে খোলা ও বন্ধ করার চালনা থেকে গ্যাসের প্রবেশ ও নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তিদ খাদ্য তৈরিতে কার্বনডাই অক্সাইড ব্যবহার করে এবং অঙ্গিজেন ছেড়ে দেয়। জীবন্ত প্রাণী বা উত্তিদের বেঁচে থাকার জন্য এই উভয় ধরনের গ্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলো, রাসায়নিক দ্রব্য ও শারীরিক আঘাতের প্রতি গাছপালা নানাভাবে ও মাত্রায় সংবেদনশীলতা প্রকাশ করে এবং দক্ষতার সাথে উত্তাবিত নানা ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে নিজেদের রক্ষা করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে উত্তিদেরও অনুভূতি আছে এবং তাদের বেড়ে ওঠা ও ফলোৎপাদনে সঙ্গীত বা বাদ্যের প্রতি তারা অনুকূল সাড়া দেয়। প্রতিটি প্রজাতির উত্তিদে একটি নির্দিষ্ট ঝাতুতে ফুল ফোটে এবং যথাসময়ে পরাগায়ন ও গর্ভাধানে কাজ করে। এর ফলে

ବୀଜେର ମଧ୍ୟେ ଜୁଗେର ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ଫୁଲେର ବୀଜ ଓ ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେକଟି ମାଧ୍ୟମ ସେମନ ବାୟୁ, ପାନି, ପାଥି ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସବଦିକେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଏଇ ଫୁଲେ ଉତ୍ତିଦ ସଠିକ ସମୟେ ସଥାୟଥିବାରେ ମାନିଯେ ନିତେ ପାରେ ଯଥନ ତାର ଫଳ ଓ ବୀଜ ପରିପକ୍ଷ ହୟେ ଓଠେ । ଅନୁକୂଳ ଅବଶ୍ୟା ବୀଜେର ଅଂକୁରୋଦ୍ଗମ ହୟ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍ତିଦେର ବୀଜେର ଡିନ୍ ଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦରାବନ୍ଧୁର ସମୟ ରଯେଛେ । ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ପାର ହେୟାର ଜନ୍ୟ ଏଇ ସୁନ୍ଦରାବନ୍ଧୁ ହଛେ ଏକଟି ନିରାପତ୍ତାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର । ଏ ସକଳ ଘଟନା ଏବଂ ଆରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସବହି ଆଶ୍ଵାହ ତା'ଆଲା ନିର୍ଧାରିତ ବିଧାନାବଲିର ପ୍ରତି ଉତ୍ତିଦ ଜଗତେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଆଉନିବେଦନ ଓ ଆଉସମର୍ପଣ । ଅନ୍ୟ କଥାଯ ଉତ୍ତିଦ ଜଗତ ଆଲଙ୍କାରିକ ଅର୍ଥେ ଭକ୍ତିଭରେ ଆଶ୍ଵାହର ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୟ ।

#### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. F. Steingass, Arabic- English Dictionary, Second Cosmo Print, p. 1104, 1982. Cosmo Publications, New Delhi.

وَالنَّمَاءُ رَفِيعٌ وَضَمَّ الْبَيْزَانَ ۝

أَلَا تَطْغَوْنَ فِي الْبَيْزَانِ ۝

৫৫ : ৭-৮ তিনি আকাশ সমৃদ্ধ করেছেন এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড।  
যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।

আকাশকে উচ্চে সমুদ্রত রাখার বিষয়টি ৫২ : ৫ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। উপরের দুটি আয়াতে উল্লেখিত ভারসাম্য শব্দটিকে আমরা যদি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি এবং যদি প্রকৃতির ভারসাম্য অর্থে ব্যবহার করি তাহলে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ বিষয় বেরিয়ে আসে। এই বিষয়টি প্রকৃতিতে বর্তমান। আসমান-জগন্নামের সকল বিষয় তৎসহ আকাশের সমুদ্রতি সব কিছুই পরম ভারসাম্যময় প্রক্রিয়ায় স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রকৃতির এই ভারসাম্যকে লংঘন না করার জন্য মানব জাতিকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এসব কিছুই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যদি আমরা বর্তমান কালের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় যথা পরিবেশ দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করি। পরিবেশের উপাদানকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে : (ক) ভৌত উপাদান, ও (খ) জীবতাত্ত্বিক উপাদান। এখন ভৌত উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ বায়ু নিয়ে আলোচনা করা যায়। আমরা জানি যে নাইট্রোজেন (৭৮%), অক্সিজেন (২১%), কার্বনডাই অক্সাইড (.০৩%) ও অন্য কয়েকটি উপাদান নিয়ে বায়ু গঠিত। বায়ুতে এ সকল উপাদানের অনুপাত রক্ষিত হওয়া থেকেই শুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বহুসংখ্যক cycle (আবর্তনশীল পরিবর্তন ধারা) যেমন কার্বন cycle ও নাইট্রোজেন cycle-এর মাধ্যমে প্রকৃতিতে এ সকল উপাদানের অনুপাত সংরক্ষণ করেছেন। এ সকল cycle ব্যক্তিত জীবনের অবস্থিতি বিপন্ন হয়ে পড়ত। যে পরিবেশে পৃথিবীতে মানুষ বাস করে তা যেন তাদের অপব্যবহারের ফলে মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত না হয় সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি নিবন্ধ করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ভিদ জগতসহ সকল জীব অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। তবে উদ্ভিদ দিনের বেলায় সামোক সংশ্লেষ পদ্ধতির মাধ্যমে অক্সিজেন মুক্ত করে। এখন যদি জুলানী চাহিদা মিটান্র জন্য আমরা বাচবিচার না করে গাছ কেটে ফেলি, এবং যদি অনিদিষ্ট সংখ্যায় মোটর যান বৃক্ষ পায় তাহলে কার্বনডাই অক্সাইডের একটি সঞ্চয় গড়ে উঠবে যা পরিবেশকে উত্তেজ করে তুলবে। অধিকতু আমাদের বর্তমান কালের যান্ত্রিক সত্ত্বার মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাই অক্সাইড, মিথেইন, নাইট্রাস অক্সাইড ও সিএফসি (ক্লোরোফুরো কার্বন) নামক বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত করে চলেছি। 'গ্রীন হাউস গ্যাস' নামে অভিহিত এ সকল গ্যাস সূর্যরশ্মি যখন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগত বস্তুসমূহের উপর পড়ে প্রতিসরিত

ହୁଏ ତଥନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ବିକିରଣେ ଦୀର୍ଘତର ତରঙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟକେ ଆଟକେ ଫେଲେ । ଏଇ ଅର୍ଥ ଦାଙ୍ଗାୟ ଏହି ଯେ, ଦୀର୍ଘତର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସାଥେ ସଂୟୁକ୍ତ ହୁଏ ବାୟୁମନ୍ଦଲେ ତାପ ସଂଧିତ ହୁଏଥା । ଏଥାନେ ଏକଟି ସତର୍କ ସଂକେତ ରଯେଛେ ଯେ ବାୟୁମନ୍ଦଲେ ଏକପ ତାପ ବୃଦ୍ଧିର ଫଳେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାବେ ଏବଂ ଅନେକ ନିମ୍ନ ଲୋକା ପ୍ଲାବିତ ହୁଏ ପଡ଼ିବେ । ସିଏଫ୍‌ସି ବାୟୁମନ୍ଦଲେର ଓଜୋନ ଶରେର କ୍ଷତି କରିବେ ଏବଂ କ୍ଷତିକର ଅତିବେଶନୀ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମନ୍ଦଲେ ପ୍ରେବେ କରତେ ପାରିବେ । ଯଦିଓ ତଥାକଥିତ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପରିମାଣ ମାପକ କୋନ ମଡେଲ ନେଇ ତବୁ ଏହି ସତର୍କବାଣୀ ସଚେତନ ମହିଳା କର୍ତ୍ତକ ଗୁରୁତ୍ବରେ ସାଥେ ଗୃହିତ ହୁଏଥା । ଅବଶ୍ୟ ଏହି କ୍ଷତିକର ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିବିଧାନେର ଉପାୟ ହୁଛେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭାରସାମ୍ୟ ବଜାଯା ରାଖି । ସକଳ ମାନବୀଯ କର୍ମକାଳ ଏମନଭାବେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହୁଏଥା ଦରକାର ଯେ ବାୟୁର ପାରିପ୍ରାଣିକ ସମ୍ପର୍କରୁକୁ ଉପାଦାନମୟହେର ଅଣ୍ମୁତ୍ର ଯେନ ପରିବର୍ତନ ନା କରା, କାରଣ ଜୀବଜଗତର ବଁଚାର ଜନ୍ୟ ବାୟୁର ଅତୀବ ପ୍ରଯୋଜନ । ପୁନଃ, ବାୟୁମନ୍ଦଲେର ଜୀବତାଦିକ ଉପାଦାନ ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରତେ ଗିଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଏ ଯେ ମାନୁଷ ଓ ଜୀବମନ୍ଦଲେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଅର୍ଥବହ ମିଥିକ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟାନ । ପରିବେଶର ମଧ୍ୟେ ସେଣ୍ଟଲୋ ହୁଛେ ଏକ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ । ଏ ସକଳ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେହୀର (micro- organisms) ମଧ୍ୟେ ମାତ୍ର ଶତକରା ପାଁଚ ଭାଗ (5%) ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅର୍ଥାଏ ରୋଗେର କାରଣ ଘଟାଯ । ଆର ଅବଶିଷ୍ଟ ସକଳ ଅଂଶ ଆମାଦେର ଖାଦ୍ୟ, ଓସ୍ତ୍ରୁଧ ପ୍ରଭୃତି ତୈରିର ମତ ନାନା ଧରାର ଉପକାରେ ଆସେ । ଏଥିର ପରିବେଶର ମଧ୍ୟେ ମାନୁଷ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକତାର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହଲେ ଏସବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣ୍ମୁଜୀବେର କିଛୁ କିଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଧର୍ମ ହୁଏ ଯାବେ । ଆର, ଏଇ ଫଳେ ଆମରା ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କ୍ଷତିର ସ୍ଵର୍ଗିନ ହବ ।\* ଉପରୋକ୍ତ ଦୂଟି ଆୟାତେର ମାଧ୍ୟମେ ଆମାଦେରକେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରେଛେ ତା ହୁଛେ ଆଲ୍ଲାହର ସୃଷ୍ଟିତେ ଯେ ସ୍ଵର୍ଗ ଭାରସାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟାନ ରଯେଛେ ତା ବୁଝିବେ ଚେଷ୍ଟା କରା ଏବଂ କୋନଭାବେଇ ଆମାଦେର ତା ଲଂଘନ କରା ଉଚିତ ନନ୍ଦ । ସୁନ୍ଦର ସମବ୍ୟ ବେବେ ଆମାଦେର ବଁଚା ପ୍ରଯୋଜନ । ତବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକାରୀ ନାମେ କୋନ କ୍ଷତିକର ପଞ୍ଚତି ଅବଲମ୍ବନ କରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନନ୍ଦ ।

### ୦-୧୦-୧୫. ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ତିନି ପୃଥିବୀକେ ହାପନ କରେଛେ;

ପୃଥିବୀର ସମ୍ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱାସିତ ଆୟାତ ୨ : ୨୨ ଓ ୧୩ : ୩ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହୁଏଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟାତେ ଏକମାତ୍ର ସଂଯୋଜନ ହୁଛେ 'ଆନାମ' ଶବ୍ଦଟି ଯାର ଅର୍ଥ 'ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ' । ପୃଥିବୀକେ ସମ୍ପ୍ରାଣିତ କରାର ମାଧ୍ୟମେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ମାନବଜାତିକେ ଯେ ଅନୁଥର ଦାନ କରେଛେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ତାର ଉପର ଅଧିକତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେଛେ ।

\* ପ୍ରକ୍ରିୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ସମବ୍ୟ ଓ ଭାରସାମ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦାରଣେର ମଧ୍ୟେ ମାତ୍ର ଦୂଟି ଉଦ୍ଦାରଣ ଉଚ୍ଚତ କରା ହୁଏଥା ।

۱۱- فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْكَسَابِ

۱۲- وَالسَّبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

৫৫ : ১১-১২ এতে রয়েছে ফলমূল এবং খেজুর গাছ যার ফল আবরণযুক্ত,  
এবং মিষ্টি দানা ও সুগন্ধি গুলু।

খেজুর ফলে পরিপূর্ণ ছড়াসহ খেজুর গাছ ও নানা প্রকার ফলের সমাহারে  
আল্লাহ আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন সে বিষয়টি আয়াত ৬ : ৯৯ এ  
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আরবী 'হাব' শব্দটির অর্থ শস্য অর্থাৎ খাদ্য শস্য যা সমগ্র পৃথিবীতে মানব  
জাতির প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই শস্য যখন মানুষকে  
খাদ্যের যোগান দেয় তখন শস্যের পাতা ও কাণ্ড গবাদিপশুর চমৎকার খাদ্য  
হিসেবে কাজে লাগে। যেমন ভুট্টা ও ধান গাছের কাণ্ড ও পাতা শুকিয়ে খড় তৈরি  
করা হয় যা গবাদিপশু আহার করে। যদিও খাদ্য শস্যের কাণ্ড ও পাতা কেবল  
মাত্র তণ্ডোজী প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবুও সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক  
গবেষণায় অপরিপাকেয়েগ্য কার্বোহাইড্রেটকে অধিকতর সহজপায়ে পরিণত  
করার সাফল্য অর্জিত হয়েছে যা মানব খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।  
এভাবে খাদ্যশস্য ও শস্যের পাতা ও কাণ্ড উভয়ই মানুষ ও গবাদিপশুকে বাঁচিয়ে  
রাখার জন্য আল্লাহর অতি বড় অনুগ্রহ।

অনেক তাফসীরকারক রাইহান (Raihan) শব্দটিকে 'সুগন্ধি- গুলু'<sup>১</sup> অথবা  
'মিষ্টি গন্ধযুক্ত লতাগুলু'<sup>২</sup> নামে অনুবাদ করেছেন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা  
যায় যে মানব জাতির জন্য আল্লাহর আরেকটি দান হচ্ছে ভেষজ লতা-গুলু; ওষুধ  
ও সুগন্ধি প্রস্তুতকারক শিল্পের উপর যার প্রচল প্রভাব রয়েছে। এক বচনে  
'রাইহান' শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'পুষ্টিসাধন'।<sup>৩</sup> মানুষ ও গবাদিপশুর  
খাদ্যের প্রেক্ষিতে এই শব্দটির যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে।

### তথ্যসূত্র :

1. M. Pickthal, The Meaning of the Glorious Quran, Kutub Khana Ishayat-ul-Islam, Delhi, p. 595.
2. A. Yusuf Ali, The Holy Quran-Translation and Commentary, American Trust Publications, USA, p. 1473, 1977.
3. F. Steingass, Arabic-English Dictionary, Kutub Khana Ishayat-ul Islam, Delhi, p. 445, 1980.

**١٠-خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَصَالٍ كَالْعَيْرَادِ**

٥٥ : ١٤ تিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির যত তকনো মাটি থেকে ।

মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি আয়াত ৬ : ২ ও ১৮ : ৩৭ এ আলোচনা করা হয়েছে ।

**١١-رَبُّ الْشَّرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ**

٥٥ : ١٧ তিনিই দুই উদয়চল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা ।

এ বিষয়টির উপর ৩৭ : ৫ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ।

**١٢-مَرَجِّعُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَوِيْلِينِ**

**١٣-بَيْتَهَا بَرْزَانٌ لَا يَبْغِيْلِينِ**

৫৫ : ১৯-২০ তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরম্পর মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অস্তরাল যা ওরা অভিজ্ঞ করতে পারে না ।

আয়াত ২৫ : ৫৩-তে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

**١٤-يَخْرُجُ مِنْهَا اللُّؤْلُؤُ وَالسِّرْجَانُ**

৫৫ : ২২ উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল ।

আরবী বাক্যাংশ ‘মিনহুমা’ যার অর্থ ‘তাদের মধ্য থেকে,’ সুস্পষ্টভাবে দু’ধরনের জলাশয়ের কথা বলা হয়েছে এবং এই সূরার ১৯ ও ২০ নম্বর আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে । পানি হচ্ছে মুক্তা ও প্রবালের উৎপত্তিস্থল এবং তথ্য ও উপাস্ত সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এই উভয় বস্তুই পানিতে জীবন ধারণকারী অতি ক্ষুদ্র অনুজীব দ্বারা উৎপন্ন হয় । মুক্তা উৎপন্নকারী ঝিলুকের ন্যায় দিপুটক বিনিষ্ঠ এক ধরনের প্রাণীর শক্ত খোলসের অভ্যন্তরস্থ অংশ ‘পার্শ’ নামক এক প্রকার পদাৰ্থ দ্বারা তৈরি হয় । এরা Mollusca গোত্রভূক্ত । এদের শক্ত খোলসের অঙ্গরাত অংশ উক্তিপূর্ণ পরাত বা স্তর নামে পরিচিত চুনের এক প্রকার স্ফটিকভূল্য

কার্বোনেট-এর অসংখ্য পরত দ্বারা গঠিত। এক দানা বালুকণার ন্যায় যদি কোন বহিরাগত বস্তু খোলসের মধ্যকার পরতে স্থান করে নিতে পারে তাহলে এটা উভেজক হিসেবে কাজ করবে এবং শক্তিপূর্ণ পদার্থ নিঃসরণের জন্য উদ্দীপিত করবে। এই অবস্থায় মুক্তা নামে অভিহিত এক ধরনের সুসমঙ্গস, গোলাকার উজ্জ্বল পিণ্ড গঠিত হয়। মুক্তা সাধারণত সাদা অথবা নীলাত ধূসর হয়ে থাকে। মিষ্টি পানির খিনুক থেকে সংগৃহীত কোন কোন মুক্তার রং কিছুটা ফ্যাকাশে লাল। রত্ন হিসেবে এগুলো খুবই মূল্যবান এবং এমন মুক্তা দিয়ে নানা প্রকার আকর্ষণীয় অলংকার তৈরি হয় যা ধনবান মহিলারা ব্যবহার করেন। *Pinctada (Maleagrina)* নামে প্রকৃত মুক্তা উৎপন্নকারী খিনুক লোহিত সাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। ১ লবণ পানিতে উৎপন্নকৃত সবচেয়ে সুন্দর মুক্তা পাওয়া যায় পারস্য উপসাগরে। বহু বছর ধরে খাচার মধ্যে কৃতিমত্তাবে মুক্তা উৎপাদিত হয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে খিনুকের শক্তিপূর্ণ পরতে ক্ষুদ্র বালুর কণা প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়।

প্রবাল Coelenterata গোত্রভূক্ত একটি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী। একটি চুনযুক্ত পেয়ালা আকৃতির বস্তুতে এটা স্থায়ীভাবে লেগে থাকে। প্রবাল কীট দলে দলে বাস করে এবং একে একে অপরের সাথে লেগে থাকে বলে পাথরের মত শক্ত আবরণ গড়ে তোলে। শতাদীর পর শতাদী ধরে বিভিন্ন প্রজাতির প্রবাল কীটের উপনিবেশসমূহ একত্রিত হয়ে সমযুক্ত ridge (দু'টি ঢলের মিলিত প্রান্তরেখা) তৈরি করে। এদের গভীরতা অনেক বেশী হয় এবং এদেরকে প্রবাল প্রাচীর বলা হয়। লাল প্রবাল নামে পরিচিত *Corallium* প্রোত্তুক প্রবাল খুবই আকর্ষণীয় এবং অলংকারাদিতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া দলে দলে বাস করা পাথরবৎ প্রবালের নানা প্রকার আকৃতি ও নকশা রয়েছে এবং এগুলো সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

### তথ্যসূত্র :

- I. T. T. Storer, R. L. Winger, R. C. Stebbins and J. w. Nybakken,  
General Zoology, 5th ed. Tata McGraw Publishing Company Ltd.  
New Delhi, P. 500, 1975 (reprint 1978).

## وَلَهُ الْجَوَارِ السُّنْمَتُ فِي الْبَحْرِ كَلْأَعْلَامٌ

٥٥ : ٢٤ سমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্নবপোতসমূহ তারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

এ সম্পর্কে ২ : ১৬৪নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অতি বৃহৎ জাহাজসমূহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সমুদ্রগামী জাহাজ গভীর সমুদ্রে উঁচু উঁচু টেও-এর মধ্য দিয়ে চলাচল করে।

يَعْثَرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ لِنِ اسْتَطْعَمْتُمْ أَنْ تَنْقُذُنَا مِنْ أَنْفُلَرِ النَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ  
نَانْقُذُنَا لَا تَنْقُذُنَا إِلَّا بِلُطْنٍ

৫৫ : ৩৩ হে জিন ও মানুষেরা! আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা শক্তি ব্যতিরেকে পারবে না।

১৯৬৯ সালে মানুষ যখন প্রথম চাঁদে অবতরণ করে তখন যাদের কোন বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা নেই তারা এই আয়াতটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে চাঁদে অবতরণ প্রচেষ্টার সাফল্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। এই প্রেক্ষাপটে এই আয়াতটির ভাষ্য বেশ চমকপ্রদ। বস্তুত এই সকল লোকের যদি গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকত তাহলে এই আয়াতে উল্লেখিত শক্তি বা ক্ষমতা বলতে তারা জ্ঞানের ক্ষমতাকে বুঝত। মহাশূন্যে উপগ্রহ প্রেরণের প্রচেষ্টা সম্ভব হত না যদি মানুষের কারিগরী প্রযুক্তি জানা না থাকত যে কীভাবে মাত্রা (প্রতি সেকেন্ডে ৭ মাইল) এডানর শক্তি অর্জন করতে এবং অভিকর্ষ শক্তি জয় করে এগিয়ে যেতে পারে। মহাশূন্য আবিষ্কারের ইতিহাস প্রমাণ করে যে আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদের উড়ন্ত যান আবিষ্কারের পূর্বে শুরুতেই এটা অকল্পনীয় ছিল যে মানুষ অভিকর্ষ শক্তিকে জয় করে মহাশূন্যে অভিযান চালাবে। কিন্তু বলবিদ্যা ও পদাৰ্থবিদ্যার জ্ঞানের প্রভৃতি উন্নতি সাধিত হয় এবং বিগত শতাব্দীর মাত্র এক চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে মানুষ কারিগরী জ্ঞানের ক্ষেত্রে এতই অগ্রসর হয় যে মনুষ্যবাহী অথবা মনুষ্যহীন যান মহাকাশে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। এই মহাকাশ যান পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর প্রভাবাধীন অঞ্চল পার হয়ে যেতে সমর্থ হয়। স্পষ্টতই আল্লাহ ঐ সকল মানুষকে এই শক্তি (অর্ধাং জ্ঞান ও দক্ষতা) দান করেছেন যারা তা অর্জন করার জন্য স্থির সংকল্প হয়। এই শক্তি ব্যতীত পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তি অতিক্রম করে মহাশূন্যে অ্যগ করা অদৌ সম্ভব হত না।

فَإِذَا أَنْسَقْتِ السَّاءَةَ فَكَانَتْ وَسَدَّةً كَالْهَاجِنِ ۝

৫৫ : ৩৭ যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্তরঙে রঞ্জিত চামড়ার  
জন্ম ধারণ করবে।

আয়াত নং ২৫ : ২৫ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

٠١٠-رِبْهَنَافِكِهَهُوَنَخْلُوَرُمَانِ ۝

৫৫ : ৬৮ সেখানে রয়েছে ফলমূল- খেজুর ও আনার,

এই আয়াতটি প্রতীকীমূলক প্রসঙ্গের অংশ হিসেবে অবর্তীর্ণ হয়েছে যেখানে  
বেহেশতের পর সুখের মধ্যে আল্লাহর বহুসংখ্যক অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত হয়েছে।  
আমাদের পুষ্টিসাধনের জন্য ফল-ফলাদির দান রয়েছে তা ২ : ২২ নং আয়তে  
ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খেজুর ও আনার আল্লাহর দান, এটা আয়াত ৬ : ৯৯ ও ১৬  
: ৬৭ তে আলোচিত হয়েছে।

٠-٨-إِذَا رُجَحَتِ الْأَرْضُ رَجَعَ ۝

٠-٩-وَبَتَّتِ الْجِبَالُ بَتَّا ۝

٠-٤-فَكَانَتْ مَبَاءُهُ مُبْشِّرًا ۝

৫৬ : ৪-৬ যখন পৃথিবী প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে এবং পর্বতমালা  
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে, ফলে তা উৎক্ষিণ ধূমিকণাঙ্গ পর্যবসিত  
হবে।

ভূপৃষ্ঠের নিচে একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় রয়েছে কঠিন ভূত্বক। ভূত্বকের নিচে  
প্রায় ১০০ কিঃ মি� পুরু একটি শীতল কঠিন পদার্থের স্তর রয়েছে, একে  
লিথোক্ষেয়ার বা কঠিন শিলাত্মক নাম অভিহিত করা হয়। আমাদের পৃথিবী নামে  
এই গ্রহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কঠিন শিলাত্মক (লিথোক্ষেয়া)সহ এর ভূপৃষ্ঠ বেশ  
কিছু সংখ্যক শক্ত শিলাত্মকের প্লেইট (Plate)-এর মধ্যে খন্ড খন্ড অবস্থায়  
রয়েছে। কঠিন শিলাত্মকের নিচে ১০০ কিঃ মি� থেকে ২৫০ কিঃ মি� পুরু  
আরেকটি অঞ্চল রয়েছে। সেখানে অবস্থিত তরল পদার্থ উষ্ণ এবং  
তুলনামূলকভাবে নমনীয়, পুরু পুড়ি (porridge)-এর ন্যায় আংশিকভাবে  
গলিত। এই স্তরকে aesthenosphere বলে। লিথোক্ষেয়ারের প্লেইটসমূহ  
তাপ সঞ্চালন গতি দ্বারা aesthenosphere-এ তাড়িত হয়।

ଏଥିନ ହତେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ କୋଟି ବହୁରେର ମଧ୍ୟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରବର ଏକଟି ରଙ୍ଗିମ ବର୍ଣ୍ଣର ଦୈତ୍ୟ ବିଶେଷ ହବେ ଏବଂ କୁନ୍ତ କୁନ୍ତ ଏହସମ୍ମହ ବୁଧ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୃତିକେ ଗ୍ରାସ କରବେ ଏବଂ ତାରପର ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥେ ପୌଛେ ଯାବେ ତଥବ ଭୂଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତାପମାତ୍ରା ଅନେକ ବେଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାବେ ଏବଂ aesthenosphere-ଏର ଗତି ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଓ ଅନିଚ୍ଛିତ ହେଁ ପଡ଼ିବେ । ଏଇ ଫଳେ lithospheric ପ୍ରେଇଟ ସମ୍ମହର ଏକେ ଅପରେର ମଧ୍ୟେ ଦ୍ରୁତ ଓ ପ୍ରଚନ୍ଡଭାବେ ସଂଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହବେ । ଫଳବ୍ରକ୍ତ ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରଚନ୍ଡଭାବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅବିରାମ କମ୍ପନେର ସୃଷ୍ଟି ହେଁ : ସୂର୍ଯ୍ୟର ଭୀରଣ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାର ତାପ ତୃପ୍ତିର ପର୍ବତାଦିମହ ସବ କିଛିକେଇ ପୁଡ଼ିଯେ ଦେବେ ୮୬୬ ଖୂଲାଯ ପରିଣତ କରବେ । ଏହି ତାପମାତ୍ରାଯ ସମୁଦ୍ରର ପାନି ଟଗବଗ କରେ ଫୁଟାତେ ଥାକବେ ।

۰-هـ. نَحْنُ حَلَّيْنَا لَكُلَّ لَأْسَلِيَّةٍ

۱-هـ. أَفَرَبِتُمْ مَا تَنْهَىَنَّ

۲-هـ. إِنَّمَا يَخْلُقُنَّ مَمْعَنِ الظَّالِقَنَّ

۳-هـ. مَنْحُنُ قَدَّرْنَا بِيَنْكُمُ الْوَتْ

۴-هـ. وَمَا مَنْحُنُ بِسُبُوقِنَّ

୫୬ : ୫୭-୬୦ ଆମରା ତୋମାଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି ତାହଲେ ତୋମରା ଏହି ସତ୍ୟଭା କେନ ସ୍ଥିକାର କରିବେ ନା ?

ତୋମରା ଯେ ଉତ୍ତର ନିକ୍ଷେପ କରୋ, ସେ ସମ୍ପର୍କେ କି ଭେବେ ଦେଖେଛୋ ? ତୋମରା କି ତା ସୃଷ୍ଟି କର, ନା ଆମରା ଉହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ? ଆମରାଇ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ମୃତ୍ୟୁକେ ବନ୍ଦନ ଓ ନିର୍ଧାରଣ କରି, ଆର ଆମରା ମୋଟେଇ ଅକ୍ଷମ ନାହିଁ ।

ଆଲାହ୍ ଯେ ମାନୁଷେର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏ କଥା ସକଳ ଧରେଇ ସ୍ଥିକୃତ । ଆଜ ଏ କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ପୁରୁଷେର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ନାରୀର ଡିଶ୍ରେର ଫିଲନେଇ ଶିଖିର ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ । ଏଥାନେ ଆଲାହ୍ ନାତିକଦେରକେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କରେ ବଲଛେନ ଯେ, ମାନୁଷେର ପ୍ରକିଞ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାର ନିଜେର କ୍ଷମତାଯ ସୃଷ୍ଟ ନନ୍ଦ ବରଂ ଏଠା ବୟାଂ ଆଲାହ୍ର ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି । କିନ୍ତୁ ମାନୁଷେର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର କୀଟ ନେଇ ଏବଂ ଏ ବ୍ୟାପାରେ କାରୋ କିଛୁ କରାର ନେଇ । ଆର ଏ କଥାଓ ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ, ମାନୁଷ ବିଜ୍ଞାନାଗାରେ କୋନ ଜୀବକୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରତେ ସକ୍ଷମ ନନ୍ଦ । ସୁତରାଂ ଉତ୍କର୍କାଟ ତୈରି କରାର ପ୍ରଶ୍ନାଇ ଉଠେ ନା ।

ଯଦିଓ ଅଗ୍ରକୋଷେ ଉତ୍କର୍କାଟ ତୈରି ହେଁ ଏବଂ ପଥେ କୋନ ବାଧାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆସିଲେ ଅକ୍ଷମ ହେଁ ତବେ କୋନ କୋନ କ୍ଷେତ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାର ସାହାଯ୍ୟ ବାଧା ଦୂର କରା ଯାଇ । କିନ୍ତୁ ଉତ୍କର୍କାଟ ତୈରି କରାର ପ୍ରଶ୍ନାଇ ଉଠେ ନା ।

এখানে আর একটি অকাট্য সত্য বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর মালিকও স্বয়ং  
আল্লাহই, অন্য কেউ নয়।

٤٠- ﴿كُوْنَتْ لِكُمْ أَنْتَمُ الْأَنْجَائُ الْمُرْبَّيُونَ﴾  
 ٤١- ﴿إِنَّمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السُّرْئِينَ أَمْ حَمْنَ الْمُنْزَلُونَ﴾  
 ٤٢- ﴿كُوْنَتْ جَعْلَةً أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾

৫৬ & ৬৮-৭০ তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা  
করেছ? তোমরাই কি তা যেহে হ'তে নামিয়ে আন, না  
আমি তা বর্ণণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা সর্বণাত্ম করে  
দিতে পারি। তবুও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

যেখ থেকে সৃষ্টি পানির মূল উৎস হিসেবে কাজ করে। যে পানি আমরা  
পান করি এবং যা মৃত ভূমিকে সজীব করে সবই বৃষ্টি থেকে আসে। আকাশে  
মেঘের সৃষ্টি এবং সেখান থেকে বৃষ্টির বর্ষণ— এ সবই আয়াত ২ : ১৬৪ ও ১৫ :  
২২-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উপরে ৭০নং আয়াতে ব্যবহৃত উযায়া শব্দের অর্থ তিঙ্গ এবং ব্যাপক অর্থে  
বিস্বাদ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। জল বিভাজিকার নিকটবর্তী পার্বত্য  
শ্রোতুস্থিনীর পানি পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ। কিন্তু ক্রমাবর্যে নিচের দিকে গেলে মানুষের  
কর্মকান্ডজনিত বর্জ্য নদীতে ফেলার জন্য এই বিশুদ্ধ পানি দূষিত হয়ে পড়ে।  
সাধারণত শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য, কৌটপতঙ্গ বিনাশকারী ক্ষতিকর রাসায়নিক  
পদার্থ অথবা নগরীর পয়ঃবর্জ্য পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে।  
দুর্ঘটনাবশত পারমাণবিক বর্জ্য, প্রাকৃতিক কারণ যেমন পলি মিশ্রিত হয়ে পানি  
পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়। যে ঝর্ণার পানি  
এক সময় পরিষ্কার ও বাকবাকে ছিল। তা খনি থেকে কয়লা আহরণের কোন  
বিশেষ পদ্ধতির কারণে নষ্ট হয়ে পড়ে। বৃষ্টির পানির দৃশ্য ঘটলে কোন নির্দিষ্ট  
অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ্যাসিড (অল্ল) বৃষ্টির কারণ হতে পারে। জীবাশ্ম জালানীর  
দহন, সালফাইড আকরিকে দ্রবণ বিপুল পরিমাণে সালফার অক্সাইড ও  
নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ করে। বায়ু মভলে বৃষ্টির পানির সাথে এই  
গ্যাস মিশে শিয়ে অতি উচু মাত্রায় অল্ল সৃষ্টি করে। অল্লের এই মাত্রার পিএইচ  
(PH) মান ৫.৬ এর কম। উত্তিদ ও মাছের উপর এ্যাসিডের এই ক্ষতিকর  
ফলাফল ছাড়াও এ্যাসিড বৃষ্টি জলজ পরিবেশে প্রবলভাবে কার্যকর বিষাক্ত ধাতুর  
দ্রবণীয়তার উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে মানব স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হয়ে

দেখা দিতে পারে। ১ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন কর্মণার মাধ্যমে আমাদের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশুদ্ধ পানি বৃষ্টির আকারে আমাদের উপর নেমে আসে। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তাহলে এই বিশুদ্ধ পানি পানের অযোগ্য হয়ে যেত। তাহলে কী আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয়?

### তথ্যসূত্র :

1. P. Raven and F. Evert, Biology of Plants, 3rd. edn. Worth Publishers Inc. New York, p. 556.

٤٠- أفراد ينتميون إلى القار التي توزعون في

٤٢- لَمْ يَأْتِنَا شَرُّ شَجَرَةٍ أَمْ نَحْنُ الْمُنْذَنُونَ

५६ : ७१-७२ तोमरा ये आउन छालाओ ता लक्ज फरै देखेह की?  
तोमराइ की तार वृक्ष सुषि करन, ना आयि सुषि करिए?

অক্সিজেন ও তৎসহ অন্যান্য পদার্থের দ্রুত সংযুক্ত হওয়ার ফলে আগন্তনের সৃষ্টি হয় যা থেকে তাপ উৎপন্ন হয়। আগন্তনের সৃষ্টি হলে শিখা নামে পরিচিত ভাবের গ্যাস দেখতে পাওয়া যায় যা দূষিত সরবরাহ করে। আগন্তন হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন ও মৌলিক অঙ্গসমূহের অন্যতম এবং সম্ভবত সভ্যতার পথে অধিযাত্মায় সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে। কৃত্রিম আলো ও তাপ ব্যবৃত মানুষ সম্ভবত পশুর জগতে প্রত্যাবর্তন করত। বন্য পশু ও মানুষের শৰ্করদের আক্রমণ থেকে আগন্তন আদিম মানুষকে রক্ষা করত। খাদ্য সামগ্ৰীকে তাপ প্ৰয়োগ কৰা হলে রাসায়নিক পরিবৰ্তন সৃষ্টি হয় এবং তা পৰিপাকে সাহায্য কৰে, কৃচিকৰণ গৰ্জ তৈৰি হয়, অতি ক্ষুদ্ৰ অণুজীবৰ ধৰ্মস কৰে এবং উদ্বায়ী বিষাক্ত উপাদানকে পরিত্যাগ কৰে।

চকমকি পাথর আবিষ্কারের পূর্বে আঢ়ান প্রক্রিয়ায় আগুন তৈরি করা হত। দু'টি কাঠের টুকরো নিয়ে পরম্পরাগত ঘর্ষণ করা হ'ত, এর মধ্যে একটি টুকরো লাঠির আকারের এবং অপরটি বড় যার মধ্যে একটি গর্ত থাকে। এই গর্তের মধ্যে লাঠির আকারের টুকরোটি চুকিয়ে ত্রুমাগত পাক খাওয়ান হ'ত। এই ঘর্ষণের ফলে সৃষ্টি আগুনের ফুলকি থেকে আগুন জ্বালানর ব্যবস্থা করা হ'ত। দু'টি কাঠের টুকরো ঘর্ষণের দ্বারা আগুন তৈরির দৃশ্য আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবীতে প্রায় সকল শক্তির শেষ উৎস হচ্ছে সূর্য। সবুজ উদ্ধিদানিতে সালোক সংগ্রহের মাধ্যমে সূর্য থেকে যে শক্তি আহরিত হয় তা রাসায়নিক শক্তির আকারে পুঁজীভূত থাকে। এই রাসায়নিক শক্তিতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অণু একত্রিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এই কার্যকর শক্তি কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও কয়লা থেকে সৃষ্টি গ্যাসে যাদেরকে একত্রে জীবাশ্ম জ্বালানী বলা হয়, তা আটক অবস্থায় থাকে। এই জীবাশ্ম জ্বালানীর উৎস হচ্ছে ডু-অ্যুন্ডেরে সবুজ বৃক্ষদির জীবাশ্মকৃত দেহাবশেষ। এই জীবাশ্ম জ্বালানীতে প্রজ্বলনের সৃষ্টি হলে বোতলাবৃত শক্তি প্রচল আকারে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই আয়তে ‘অগ্নি প্রজ্বলনে বৃক্ষের ব্যবহার’ বাক্যাংশের সংশ্লিষ্টতা সুন্পটভাবে প্রকাশ করে। এই বাক্যাংশের সাধারণ অর্থ হতে পারে আগুন জ্বালানর কাঠ যা জ্বালানী হিসেবে গাছ থেকে আহরণ করা হয়।

গাছ থেকে আসন্নের সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ের আরও বিস্তারিত বিবরণ আয়াত  
৩৬ : ৮০তে আলোচনা করা হয়েছে।

**٠٠٥-هُنَّا أَقْسَمُ بِسَوْقِ الْتَّجُورِ**

৫৬ : ৭৫ আমি নক্ষত্রাজির অস্তাচলের শপথ করছি,  
এই বিষয়টি ৫৩ : ১ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

**٠٠٦-يَلْبَلُ عِنْ رَبِّ الْعَكِيرَةِ**

৫৬ : ৮০ এটা রাস্কুল আশামীন কর্তৃক নাযিল করা (অবতীর্ণ)।

আল্লাহ্ যে সকল জগতের প্রভু এ বিষয়ে ১ : ২ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত  
আলোচনা করা হয়েছে।

**٠٠٧-هُنَّا مُلْكُ التَّمَوُتِ وَالْأَرْضِ، يُبَهِّ دَيْسِنَتْ**

**وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَّدِينِيٌّ**

৫৭ : ২ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর একমাত্র মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব কেবল  
তাঁরই (আল্লাহর), তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন এবং  
সব কিছুর উপরই তিনি শক্তিমান।

আল্লাহ্ যে আসমান যথিনের মালিক এ বিষয়ে এবং আল্লাহই যে জীবন ও  
মৃত্যু দানকারী, এ কথা ৫ : ১৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

**٠٠٨-فَوَاللَّهِيْنِ عَلَيَّنِ الْكَمْلَوْتِ وَالْأَرْضِ فِي سَيْئَةِ آتِيَّةِ تُحْشِنَوْنِ عَلَى الْمَرْشِ**  
**يَعْلَمُ نَائِلِيْهِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَحْرِجُهُ مِنْهَا وَمَا يَبْرُزُ مِنَ الْعَمَاءِ وَمَا يَغْرِيُهُ فِيْهَا**  
**وَهُوَ مَعْكُزُ أَيْنَ مَا كَنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ**

৫৭ : ৪ তিনিই হয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর  
‘আরশে সমাচীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ  
করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং আকাশ থেকে যা কিছু  
নামে ও আকাশে যা কিছু উঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন  
তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা  
দেখেন।

আল্লাহ তা'আলা যে ছয় দিনে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী  
সৃষ্টি করেছেন তা ৭ : ৫৪নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। যে সকল বস্তু ভূমিতে  
প্রবেশ করে এবং ভূমি থেকে যা উদগত হয়, আকাশ থেকে যা নেমে আসে এবং  
আকাশে যা উঠে যায়- এ সবই আয়াত ৩৪ : ২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

### ٥- مَلْكُ النَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُوَلَى اللَّهِ تُرْجَمُ الْأَمْوَالُ

৫৭ : ৫ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, এবং আল্লাহরই দিকে  
সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উপর একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সার্বভৌমত্ব  
বর্তমান। আয়াত ৫ : ১৯ এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

### ٤- يُولِجُ الْيَوْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الظَّلَلِ وَهُوَ عَلَيْهِ بِنَاتِ الصَّدْرِ وَبِوَرِ

৫৭ : ৬ তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনের অভ্যন্তরে এবং দিনকে প্রবেশ  
করান রাতে, এবং তিনি অন্তর্যামী।

কীভাবে রাত দিনের মধ্যে এবং দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে তা আয়াত ৩  
ঃ ২৭ এ আলোচিত হয়েছে।

### ٦- إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَزْيِّهَا قَدْ يَسْتَأْلِمُ الْكُمُ الْأَذِي

### لَعْلَمُ تَعْقِلُونَ

৫৭ : ১৭ জেনে রাত, আল্লাহই পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন।

আমি নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছি  
যাতে তোমরা বুঝতে পার।

মৃত্যুর পর পৃথিবীর পুনর্জীবন লাভ আয়াত ২ : ১৬৪তে আলোচনা করা  
হয়েছে।

### ..... كَثِيلٌ غَيْثٌ أَجْعَبَ الْكُفَّارَ نَبَائِهِ لَمْ يَهْمِيْهُ فَرَأَهُ مُضْفِرًا ..... لَمْ يَكُنْ حَطَامًا

৫৭ : ২০ ..... তার উপমা বৃষ্টি, যার ধারা উৎপন্ন শস্য সভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা পুরীয়ে ঘায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়।.....

বৃষ্টির ফলে গাছপালার সৃষ্টি সম্পর্কে ২ : ১৬৪নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। পরিপূর্ণভাবে বৃক্ষিপ্রাণ উদ্ভিদাদি তা সে খাদ্যশস্য হোক কিংবা ফলের বাগান হোক, দেখতে সবুজ রং-এর এবং পাতায় ক্লোরোফিলের উপস্থিতির কারণে সবুজ দেখা যায়। সবুজ রং মানুষের চোখের জন্য আরামদায়ক। সবুজ গাছপালাসহ যদি প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি জন্মে তাহলে কৃষকদের জন্য তা সবচেয়ে বেশী আনন্দের হয়, যে কৃষকেরা ক্ষেত্রে শস্য ফলান্ব জন্য কঠোর কার্যক পরিশৰ্ম করে, জমি চাষ করে এবং ফসলের যত্ন নেয়। ক্ষেত্র থেকে শস্য আহরণের পর সার্বিকভাবে জন্মান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে, এর গাছের কান্ড ও পাতা ক্ষেত্রে পড়ে থাকে এবং ক্রমাগতে পানি শূন্য হয়ে এর জীবন্ত কোষসমূহ ও ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায়। এরফলে এ সকল গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে পুরীয়ে যায় এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

এখানে উল্লেখ করা বেশ চমকপ্রদ হবে যে পৃথিবীতে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের অসারতার উপর জোর দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তার যথেষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক শুরুত্ব রয়েছে।

٤- لَقَنْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْبِيَانَ  
لِيَقُومَ الْمُنْكَرُ بِالْقِنْطَطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ بِفِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ  
وَمَنَّا فِي لِلثَّائِرِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ  
إِنَّ اللَّهَ تُوَيْ عَزِيزٌ ۝

৫৭ : ২৫ নিচয়ই আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও ন্যায়-নীতি দিয়েছি, যাতে শান্ত সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি শোহাও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচল শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; তা এজন্য যে আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

৩৪ : ১০ ও ৩৪ : ১১ সংখ্যক আয়াত দুটিতে ঢালাই লোহা ও ইস্পাতের শক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইস্পাত হচ্ছে লোহার একটি বিশেষাধিত সংকর ধাতু। এতে কার্বন ও অন্যান্য উপাদান রয়েছে এবং তরল অবস্থায় এটা তৈরি হয়। এটা বেশ কৌতুহলের ব্যাপার যে প্রতি নিউক্লিওন (nucleon)-এ আটকে থাকা শক্তি অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে একটি নিউক্লিওন পৃথক করে অসীমতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা সকল উপাদানের মধ্যে লোহাতে সবচেয়ে বেশী। এতে লোহার অসাধারণ স্থিতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাই এই নিখিল বিশ্বে লোহার প্রভাবশালিতা পরিলক্ষিত হয়।

শিল্প, পরিবহন, কৃষি ও যুদ্ধ বিশ্বের ক্ষেত্রে ইস্পাত ও ঢালাই লোহার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দৈনিক ১৫.২০ মি.গ্রা. লৌহের প্রয়োজন। ফল-ফলাদি ও শাকশজি গ্রহণের মাধ্যমে এই পরিমাণ লৌহ গ্রহণ করা হয়। এসবের মধ্যে লোহার যৌগিক মিশ্রণ রয়েছে। হেমোগ্লোবিনে প্রায় ৯২.৯% লোহা রয়েছে যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অঙ্গীজন বহন করে নিয়ে যায় এবং রক্তের লোহিত কণিকা তৈরিতে সাহায্য করে। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে কাজ করে।

—الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُلُدَقْرُنْ تَسْأَلُهُمْ مَا هُنَّ أَمْتَهِنُمْ إِلَّا

—الَّذِينَ شَهَدُوا مَا لَمْ يَبْغُوْلُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْعَوْلَى رَزْلُدًا وَلَئِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ

## ংশুরো

৫৮ : ২ তোমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজেদের খীদের সহিত ‘যিহার’ (যামের যত বলে পরিহার করে) করে (জেনে রাখ) তারা তাদের মা নয়। যা তো একমাত্র সেই, যে তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। এই লোকেরা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ যিথ্যা বলে। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।

এই আয়াতের ভিত্তিতে উল্লেখ করা যায় যে জন্ম দান করে কেবল সেই মা, অন্য কেউ নয়।

বর্তমানে জীব বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে টেস্ট-টিউব শিশুর জন্ম সম্ভব হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যদি কোন মহিলা সত্ত্বান উৎপাদনে সক্ষম না হয় জরায়ু বা অন্য কোন দোষের ফলে, তাহলে তার পরিপক্ষ ও পরিস্ফুট ডিস্ট আর তার স্বামীর শুক্রকীট একত্র করে বিজ্ঞানাগারে টেস্ট টিউবে মিলিত করে সেটা জরায়ুতে

প্রবেশ করিয়ে সন্তান উৎপাদন সম্ভব। এই ধরনের বিভীষিয় গর্ভধারণকারী মহিলাকে ‘বিকল্প মা’ বলা হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই বিকল্প মা প্রকৃত মা হবে কী-না?

এখানে কয়েকটি জটিল প্রশ্ন রয়েছে। এখানে এক মা কেবল তার ডিস্ট দান করেছে, আর মায়ের বিবাহিতা স্বামী তার বীর্য দান করেছে। সুতরাং বিকল্প মা শুধু গর্ভ ধারণ করার কষ্ট স্থীকার করেছে। বিকল্প মা শিশুকে দুধ পান করিয়ে আদর করে লালন-পালন করে থাকে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্য পুরুষের বীর্য গর্ভে ধারণ করা যিনার সমতুল্য। এ বিষয়ে ফকীহদের পরামর্শ প্রয়োজন। তবে এভাবে সন্তান উৎপাদনের কোন প্রয়োজন নেই। গর্ভধারণের কষ্ট না করায় প্রথম মা বা ডিস্টদানকারী মা সন্তানকে গর্জাত সন্তানের মত ভালবাসতে পারে না। তার আদর-যত্ন পালক সন্তানের মত হবে মাত্র।

٢- خَلَقَ اللَّهُمَّ أَرْضًا بِالْحَنْقَنَ فَصَرَرَ لَنْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ

وَالَّذِي بِالصَّبَرْجِ

৬৪ : ৩ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সঠিক পরিমাপে ও সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তোমাদেরকে কিরে যেতে হবে (তিনিই তোমাদের শেষ গন্তব্যস্থল)।

আল্লাহ যে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ বিষয়টি ৬ : ৭৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এখানে মানুষের আকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই আকৃতিতে একটি সৌন্দর্য ছাড়াও কার্যকরী এবং কল্যাণময়ী পরিমাপ রয়েছে। এর সঙ্গে বিবেচ শরীরের বিভিন্ন অংশের সমর্থন ও সম্বিলিত সৌন্দর্য। এ বিষয়টি ১৩ : ৮ আয়াতে বিজ্ঞানিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتِسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعِلْمِ مَقْدُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

৬৫ : ৩ আর তাকে এমন উপায়ে প্রিয়িক দেবেন যার সম্পর্কে তার কোন ধারণা হবে না। যে আল্লাহর উপর ভরসা করবে তার জন্য

তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তো নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিয়ের জন্য একটি তকদীর নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

এই আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মানুষের রিযিক এমন পদ্ধতিতে যোগাড় হতে পারে যা সে কখনও কল্পনাও করে নাই। আমরা যদি মানুষের খাদ্য বস্তুর ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাই যে, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান লক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে বহু নতুন নতুন ধরনের খাদ্য সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের তালিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু নতুন ধরনের খাদ্য ও পোশাক আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন : সামুদ্রিক শৈবাল, গাছপালা এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ। অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের কেউ এসব কল্পনাও করতে পারে নি ! এসব নতুন নতুন আবিষ্কার আল কুরআনের ৩ : ১৯১ আয়াতের বাস্তব প্রমাণ যেখানে বলা হয়েছে, “হে আমার প্রভু, এই সব কিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করনি।”

যদি আমরা আল্লাহকে একমাত্র রিযিকদাতা বলে স্বীকার করি এবং আল্লাহর সৃষ্টি বস্তুসমূহ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা চালিয়ে যাই তা হলে আশা করা যায় যে, আমরা আরো অনেক নতুন নতুন খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য বস্তু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবো।

প্রত্যেকটি বস্তুর সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট তকদীর বা সাম্য রয়েছে তা ২৫ : ২ আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

وَإِنَّ يَعْشَنَ مِنَ الْجِنِّينَ مِنْ بَأْلَمْ لِبْرَبِّهِ نَعْدَلْهُنَّ تَلَكَّهُ أَسْهُرُ  
وَإِنَّ لَهُمْ بِعِصْمَنَ دَلَوَلَتِ الْأَخْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَفْسَعُنَ حَنَلْهُنَّ  
وَمَنْ يَتَعَيَّنَ اللَّهُ بِمَحْكَمَلِ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا

৬৫ : ৪ আর তোমাদের ঝীলোকদের মধ্যে যারা তাদের হায়েজ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে (অর্থাৎ ঝুঁতুস্বাব বক্ষ হয়ে গিয়েছে), তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে তোমাদের ঘনে যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে জেনে রাখ, তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর এই হকুম তাদের জন্য ও যাদের এখনও হায়েজ শর্ক হয় নাই। গর্ভবতী ঝীলোকদের ইদ্দতের সীমা হলো তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য তিনি তার ব্যাপারে সহজ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে দেন।

୨ : ୨୨୮ ଆଯାତେ ତାଲାକପ୍ରାଣ୍ତ ଶ୍ରୀଲୋକେର ପୁନର୍ବିବାହେର ଜନ୍ୟ ଇନ୍ଦତ ପାଲନେର କଥା ବଲା ହେଁଛେ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହତେ ପାରେ ଯାଦେର ଝାତୁ ଶୁରୁ ହୁଯନି, ଅଥବା ଝାତୁକାଳ ବନ୍ଦ ହେଁଯାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଲେ ବା ଝାତୁସ୍ତାବ ବନ୍ଦ ହେଁଯେ ଗେଲେ ତାଦେର ବ୍ୟାପାରେ । ଏହି ଆଯାତେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଇନ୍ଦତ ତିନ ମାସ ସମୟ ନିର୍ଧାରିତ କରେ ଦିଯେଛେନ । ପୁନଃ ବିବାହେର ପୂର୍ବେ ଏହି ସମୟକାଳ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକତାବେ ଅପେକ୍ଷା କରାର ପ୍ରୋଜେନ ହଲେ ତାଲାକପ୍ରାଣ୍ତ ଶ୍ରୀର ସଞ୍ଚାବ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯା ତାଲାକେର ସମୟ ପ୍ରକାଶ ନାଓ ପେତେ ପାରେ । ତିନ ଝାତୁକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରାର ଯୌଡ଼ିକତା ନିଯେ ୨ : ୨୨୮ ଆଯାତେର ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ ।

ହାୟେଜ ଶୁରୁ ନା ହଲେ, ଝାତୁ ବକ୍ଷେର ପୂର୍ବେ ଅନିୟମିତ ହାୟେଜ ହଲେ ବା ହାୟେଜ ବନ୍ଦ ହେଁ ଗେଲେ ତିନ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରଲେ ଗର୍ଭଧାରଣେର ବିଷୟଟି ଧରା ଯାବେ ତାତେ କୋନ ସନ୍ଦେହ ନେଇ । ଆର ଗର୍ଭଧାରଣ କରଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ହବେ । ଗର୍ଭଧାରଣେର ପରା ଅସ୍ତାବିକ ଓ ଅନିୟମିତ ରଙ୍ଗପାତ ହଲେଓ ତିନ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରଲେ ଗର୍ଭ ହେଁଯେଛେ କିନା ତା ସହଜେ ଜାନା ଯାବେ । ସୁତରାଂ ଏହି ଆଯାତେ ତାଲାକେର ପର ସ୍ଵାମୀର ଉରସଜାତ ସନ୍ତାନ ହେଁଯାର ସଞ୍ଚାବନା ଦୂର କରାର ଜନ୍ୟ ତିନ ହାୟେଜ ଅଥବା ତିନ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରା ଖୁବଇ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ।

..... سَكْنَمُ مِنْ دُجْدَانْ وَلَا تَضَارُ ذُهْنَ  
لَعْصَمُقُّا عَيْنَيْتُ وَلَنْ كُنْ أُدَلَّبَ حَمْلَبَ نَانِقُورَا عَيْنَيْتُ حَتَّى يَصْنَعَ حَمْلَهُنَّ  
قَنْ أَرْضَمُنَ لَكُنْ فَاتَّوْهُنَّ لَجُورَهُنَّ دَائِرَوْ زَابِنَكُورَ بَسْغُرَهُنَّ وَلَنْ تَحَامِرَهُنَّ  
فَسْرُضُمُ لَهُ أَخْرَى ۝

୬୫ : ୬ (ତାଲାକ ଦିଲେ) ତାଲାକପ୍ରାଣ୍ତ ଶ୍ରୀକେ ସେଇ ହାନେ ଥାକତେ ଦାଓ ଯେବାନେ ତୋମରା ବସବାସ କରୋ, ତା ଯେ ରକମ ହାନଇ ତୋମାଦେର ଥାକନା କେନ ଏବଂ ତାଦେରକେ କଟ ଦେଓୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଝାଲା-ଯଞ୍ଚଣା ଦିଓ ନା । ଆର ତାରା ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହୁଁ ତା ହଲେ ତାଦେର ବ୍ୟାହଭାବ ବହନ କରୋ ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତକ୍ଷଣ ନା ତାଦେର ପ୍ରସବ ହୁଁ । ପରେ ସେ ଯଦି ତୋମାଦେର ସନ୍ତାନକେ ତନ୍ୟ ଦୁଧ ପାନ କରାଯ ତବେ ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ତାକେ ଦାଓ ଏବଂ ଏ ବିଷୟଟି ପାରିଶ୍ରମିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମାଧ୍ୟମେ ମୀଯାଂସା କରେ ନାଓ । କିନ୍ତୁ ତୋମରା ଯଦି ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ଅସୁବିଧା ଫେଲାତେ ଚାଓ, ତା ହଲେ ବାଢାକେ ଅପର କୋନ ଶ୍ରୀଲୋକ ତନ୍ୟ ପାନ କରାବେ ।

এখানে আল্লাহ নবজাত শিখকে মায়ের দুধ পান করানোর উপর বিশেষ তাগিদ দিচ্ছেন। যদি বেমিল হ্বার ফলে স্বামী-ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদও হয় তা হলে মা তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করিয়ে সে জন্য প্রাক্তন স্বামীর নিকট থেকে পারিশ্রমিক আদায় করতে পারবে। যদি বগড়ার ফলে মার পক্ষে দুধ পান করানো সম্ভব না হয় তাহলে দুধ মায়ের দুধ পান করাতে হবে। এতে বাচ্চাকে যেমন করেই হটক শনের দুধ খাওয়াতে হবে এটাই আল্লাহর নির্দেশ। দুধ মা হলেও দুধ শনের দুধই। বর্তমানে ডাঙ্কারী বিজ্ঞান এতদিনে আবিষ্কার করেছে যে শিখের জন্য মাতৃদূষ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই বৈজ্ঞানিক বিষয়টি পাক-কুরআনে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয় ২ : ২৩৩ আয়াতের আলোচনায় এসেছে।

..اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِنْهُنَّ يَنْزَلُ الْأَمْرَ بِتِئْهَنَ  
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدْ أَحْاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

৬৫ : ১২ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সগু আকাশ এবং পৃথিবীও, ওদের অনুরূপতাবে ওদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে, তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

সগু আকাশ সৃষ্টির বিষয়টি ২ : ২৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে। পৃথিবী প্রধানত তিনটি শনের বিভক্ত : ভৃত্যক, আবরণ ও কেন্দ্রস্থল। বায়ুমণ্ডল নামে একটি গ্যাসীয় ঢাকনা পৃথিবীর সাথে মাধ্যাকর্ষণীয়ভাবে সংযুক্ত এবং এটি পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবরণ আবার তিনটি উপস্থনের বিভক্ত : লিথোক্ষেয়ার, এন্সেনোক্ষেয়ার এবং মেসোক্ষেয়ার। কেন্দ্রস্থলও দুটি উপস্থনের বিভক্ত : (১) বায়ুমণ্ডল, (২) ভৃত্যক, (৩) লিথোক্ষেয়ার, (৪) এন্সেনোক্ষেয়ার, (৫) মেসোক্ষেয়ার, (৬) বহিঃকেন্দ্র এবং (৭) অন্তঃকেন্দ্র।

১. বায়ুমণ্ডল হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে বহিঃস্থ শন। পৃথিবী পৃষ্ঠের ৫০০ কিঃমিঃ উচ্চতা পর্যন্ত এ শনটি বিস্তৃত। এ উচ্চতারণ উপরে বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ এত কম যে তারা পরম্পরের সাথে সংশ্রে হারিয়ে ফেলে।

২. ভৃত্যক হচ্ছে পৃথিবীর বহিরাবরণী। পৃথিবীর আয়তনের মাত্র ০.৬% ভাগ নিয়ে এটি গঠিত। এর পূর্বতু স্থানবিশেষে আলাদা হয়ে থাকে; যেমন : মহাসাগরভয়ে মোটামুটি একই রকম ৫ কিঃমিঃ পর্যন্ত গভীরে, মহাদেশীয় পৃষ্ঠের ৩৫ কিঃ মিঃ গভীর পর্যন্ত এবং হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি পর্বতমালার নিচে ৮০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত গভীর।

৩. লিখোক্ষেয়ার হচ্ছে ভৃত্যকের ঠিক নিচের স্তর। প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ পুরু কঠিন পদার্থের একটা স্তর এটি। আমাদের এই প্রাচীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এ সত্যটি যে, লিখোক্ষেয়ার সহ ভৃপৃষ্ঠাটি বেশ কয়েকটি কঠিন লিখোক্ষেয়ারিক ফলকে বিভক্ত। লিখোক্ষেয়ারের নিচেই রয়েছে গঠনকাঠামোগত একটা বিঘোষিত পরিবর্তন। এতে রয়েছে একটা সীমারেখা, যার নাম ‘মোহো’ বিরামাহীনতা। এর নিচেই আবরণীর বাকি অংশ বিস্তৃত। পৃথিবীর আয়তনের ৮২% ভাগেরও অধিক স্থান জুড়ে রয়েছে এ স্তরটি।

৪. এস্থেনোক্ষেয়ার হচ্ছে চতুর্থ স্তর যা ১০০ কিঃ মিঃ থেকে ২৫০ কিঃ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে আবরণী উষ্ণ, অপেক্ষাকৃত নমনীয়, পুরু এক পুড়িং সাগরের মত গলিত। এটিই এস্থেনোক্ষেয়ার নামে পরিচিত। গুড় সদৃশ এ স্তরটি এর উত্তল গতির দ্বারা কঠিন লিখোক্ষেয়ারিক ফলকসমূহকে ভৃগোলকের চারপাশে স্থান পরিবর্তন করতে পারে।

৫. মেসোক্ষেয়ার : আবরণীর বাকী অংশ হচ্ছে প্রকৃতির মত পিচ যা মেসোক্ষেয়ার নামে পরিচিত।

৬. বহিঃকেন্দ্র : বহিঃকেন্দ্র ২ হাজার একশ কিঃ মিঃ পুরু। তরল লৌহের সাথে সামান্য পরিমাণ সালফার মোশানো পদার্থ দ্বারা এ স্তরটি গঠিত।

৭. অন্তঃকেন্দ্র : অন্তঃকেন্দ্রটির ব্যাসার্ধ ভৃ-কেন্দ্রে ১ হাজার ৩৭০ কি : মিঃ। অন্তঃকেন্দ্রটি সম্পূর্ণ কঠিন, এতে রয়েছে লোহা এবং অন্যান্য ভারী পদার্থসমূহ।

এভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চলতি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কুরআনের আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে একযোগ।

-بِكُلِّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا فِيْ أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيَّتِهَا نَارًا لَكُلُّهَا النَّاسُ دَائِيْجَارَةٌ  
كَلِّهَا مَلَوْكَةٌ غَلَاطٌ بِنَادِيْرٍ لَمَ يَعْصِمُنَ اللَّهُ مَا أَمْرَمَهُ وَيَعْلَمُنَ مَا يُؤْمِنُونَ ۝

৬৬ : ৬ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার  
পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে যার ইঙ্গন হবে মানুষ ও পাথর,  
যাতে নির্মাণের রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ,  
যারা অমান্য করে না আল্লাহ' যা তাদেরকে আদেশ করেন এবং  
তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে।

- জুলানি হিসেবে পাথর-বিষয়টি ২ : ২৪ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

**۴-الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَّاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَعْوِيتٍ**

**○فَارْجِعِ الْبَصَرَ مَنْ تَرَى مِنْ قُطُورٍ**

৬৭ : ৩ যিনি সৃষ্টি করেছেন সগু আকাশ স্তরে স্তরে। দয়াময় আল্লাহ'র  
সৃষ্টিতে তুমি কেন ঝুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ,  
কোন ঝুঁতি দেখতে পাও কি ?

সগু আসমান সৃষ্টির বিষয়টি ২ : ২৯ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।  
প্রতিটি জিনিস যথাযথ অনুপাতেই সৃষ্টি হয়েছে-এ বিষয়টি ৬ : ৭৩ এবং ২৫ :  
২ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

**۵-وَلَقَدْ زَيَّنَ اللَّهُ نَبِيًّا بِمَصَابِينَهُ وَجَعَلَنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيْطَنِ**

**○أَعْنَذَنَا اللَّهُمْ عَنَّابَ النَّعِيْرِ**

৬৭ : ৫ আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা ধারা  
এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং  
তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি ঝুলন্ত অগ্নির শাস্তি।

নিম্নতম আসমানে সাজসজ্জা বিষয়টি ৩৭ : ৬ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত  
হয়েছে।

**۶-هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُّواً فَامْسُوا فِي مَنَابِهَا**

**○وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ التَّسْوُرُ**

৬৭ : ১৫ তিনিই তো তোমাদের জন্য তৃষ্ণিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব  
তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ  
থেকে আহার্য প্রহণ কর। পুনরুদ্ধান তো তাঁরই নিকট।

পৃথিবীর বিস্তার বিষয়টি ২০ : ৫৩ আয়াতের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ ধন্দণ রিয়িক বিষয়টি ৬ : ৯৯ এবং ১৬ : ৬৭ আয়াতের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١٤- إِنَّمَا مُنْتَهُ الْمَرْءِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
كَذَّابٌ هُوَ تَسْوِيرٌ

৬৭ : ১৬ তোমরা কী নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না ? আর তা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে।

আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে ভূমিকম্প দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হতে পারে। ভূমিকম্প বিষয়টি ৭ : ৯১ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সময় পৃথিবী প্রচণ্ডভাবে আনন্দালিত হয়, কখনও কখনও পৃথিবীর উপরিভাগের স্তরসমূহ ফেটে যায়; এতে গভীর খাদ সৃষ্টি হয় এবং আক্রান্ত উপরিতলের উপর যা কিছু থাকে তার সবই গলাধংকরণ করে ফেলে।

١٥- أَمْ أَمْنَثْمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَبْرِزُ

৬৭ : ১৭ অথবা তোমরা কী নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর কংকর বর্ষণকারী ঝঙ্গা প্রেরণ করবেন না ? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল।

আল্লাহ সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তাদেরকে টর্নেডো মারফত তাদের অবাধ্যতার শাস্তি দেয়া হতে পারে। ঘূর্ণিবাত্যার বিষয়টি ১৭ : ৬৮ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ঐ প্রসঙ্গে প্রবল বাতাস এবং ঘূর্ণিবাত্যাসহ বায়ু প্রবাহের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। ঘূর্ণিবাত্যা প্রচণ্ড গতিবেগে ধেয়ে চলে। কখনও কখনও এ গতি ১৫০ কিঃ মি/ঘণ্টা অতিক্রম করে যায় যাতে গাছপালা উপর্যুক্ত গিয়ে ইমারত ধ্রংস হয়ে এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজীব মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ব্যাপক ধ্রংস নেমে আসে।

۱۰۷- أَوْلَئِرِ رَبِّ الظَّاهِرِ تُوقَهُمْ صَفَقُتْ وَيَقِضَنْ مَا يُشِكُّهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ

### إِنَّهُ يَعْلَمُ شَنِيبَرَصِيدُ

৬৭ : ১৯ তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যারা  
পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে ? দয়াময় আল্লাহই তাদের  
স্থির রাখেন। তিনি সব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

বিষয়টি ১৬ : ৭৯ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

۱۰۸- قُلْ هُوَ الَّذِي أَشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ التَّسْمُمَ وَالْأُبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  
فَإِنَّمَا تَشَكُّونَ

৬৭ : ২৩ বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমারদেরকে  
দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্লাই  
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

মানব শিশুর সৃষ্টি বিষয়টি ২৩ : ১২-১৪ আয়াতগ্রহের প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই  
আলোচনা করা হয়েছে। শ্রবণ, দর্শন এবং অনুধাবন বা উপলক্ষ করার ক্ষমতার  
বিষয়টি ১০ : ৩১ এবং ২৩ : ৭৮ আয়াতগ্রহের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

### ۱۰۹- قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَ الْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

৬৭ : ২৪ বল, তিনিই তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট  
তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

মানবজাতির বংশবিস্তার ঘটে দৈহিক প্রজননের মধ্য দিয়ে বিষয়টি ২৩ :  
১২০-১৪ আয়াতগ্রহের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

۱۱۰- قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءً كَمْ غَزَّا

فَمَنْ يَأْتِي بِكُمْ بِسَاءٌ مَعِينٌ

৬৭ : ৩০ বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কী যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের  
নাগালের বাইরে চলে যায় কে তোমাদেরকে এনে দেবে  
অবহমান পানি!

অনেক সময় ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধস, ভূপাত, আলগা মাটির হিমবাহ এবং মাটিতে চিড় ও ফাটলের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পকালে সংঘটিত অবস্থানও উচ্চতাগত বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের কারণে পানির প্রবাহ বৰ্ক হয়ে যেতে পারে যাতে ঝর্ণাধারা পরিৱৰ্তিত হয়ে পুকুর কিংবা হৃদে পরিণত হতে পারে। ঝর্ণা ও কৃগ সমূহ প্রায়শই ভূমিকম্প দ্বারা বাধাঘাস্ত বা বিনষ্ট হয়ে যায়।

### ○ وَالْقَلْمَنْ وَمَا يَسْطُرُونَ ৮

৬৮ ৪ ১ নূন, কলমের শপথ, লেখকগণ যা লিখে তার শপথ।

এই আয়াতে কলম ও কলমের সাহায্যে লিখিত জিনিসের শপথ গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো লেখার শুরুত্ব প্রকাশ করা। আন্নাহুর শপথ করার উদ্দেশ্য কোন বস্তুর শুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মানুষের ইচ্ছাকৃত, কথার আক্ষরিক সঙ্কেতের নামই লিখন যা বেশ কঠিন এবং উন্নতমানের শিল্প। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে মানুষ তার জ্ঞান, বৃদ্ধি এবং কর্ম ক্ষমতার সমর্থনে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে লিখন ক্ষমতা অর্জন করে। সর্বপ্রথম এই লিখন ইবির আকারে প্রকাশ পায়।<sup>1</sup> এই লিখা আবিষ্কার মানুষের কর্ম ক্ষমতার বিরাট বিস্তৃতি ঘটাতে সাহায্য করে। কারণ এর ফলে সে তার চিন্তা ও মনের ভাবকে স্থায়ী আকারে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। অতঃপর সময়ের আবর্তনে খুব দ্রুতগতিতে এই লিখন শিল্প উন্নত হতে হতে বর্তমানে তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়। লিখন শিল্পের উন্নত না হলে মানব সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অভিনব উন্নতি সম্ভব হতো না। লিখিত বাণী বা বাক্য কেবল মত বিনিময়ের উন্নত মাধ্যমই নয় বরং এটা মানুষের অর্জিত জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে ধরে রাখা এবং ভবিষ্যত প্রজননের জন্য চিরকালের জন্য সংরক্ষিত করার পদ্ধতি।

সুতরাং মানুষ যা লিখে তার মূল্য অনেক। তাছাড়া চিঠিপত্র লেখা, রিপোর্ট তৈরি করা এবং দলিল পত্র তৈরির মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারি। আর লিখিত জিনিসের মাধ্যমে আমরা অনেক অজ্ঞান জিনিস জানতে পারি এবং বর্তমান ও অতীত যুগের মহান ব্যক্তিদের পরিচয় লাভ করতে পারি।

#### তথ্যসূত্র :

1. Encyclopedie Britannica, Vol. 19, pp. 1033-1044, 1978.

۰۔ کل بنت شود و عاد بالقلعه ۰ ۱۔ فاما شعوذ فأملکوا بالطاغية ۰  
 ۲۔ واما عاد فأملکوا بربج صریح عاتیة ۰ ۳۔ سخرا ما عليهم  
 سبعة ليالٍ وعشرين ليلة أيام حسوماً فترى القوم فيهم صرف كان لهم أتجاه  
 تحيل خلوية ۰ ۴۔ فهل ترى لهم من باقيه ۰ ۵۔ وجاء فرعون ومن  
 قبليه والمؤتفيك بالخطيئة ۰ ۶۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم آخذة  
 رايته ۰ ۷۔ لئلا طغى الناس وحملنكم في الجاريه ۰  
 ۸۔ لنجعلها لكم وذريتهم وتعيشها أذى وداعيه ۰

৬৯ : ৪-১২ ছামুদ ও আদজাতি সেই আকশিকভাবে সংঘটিতব্য মহা  
 বিপদকে অঙ্গীকার করেছিল। অতঃপর ছামুদ জাতি এক  
 আকশিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আদ জাতিকে  
 ধ্বংস করা হয়েছে এক ভয়াবহ তীব্র ঝড়ের আঘাতে।  
 আল্লাহ তা'আলা সেই ঝড়কে ক্রমাগত সাত রাত ও আট  
 দিন পর্যন্ত তাদের উপর জারি রেখেছিলেন। (তুমি থাকলে)  
 দেখতে পেতে যে তারা সেখানে এমনভাবে বিক্ষিণ্ড অবস্থায়  
 উপুড় হয়ে পড়েছিল যেমন পুরোন খেজুর গাছের কান্দসমূহ  
 ঝড়ে ভূপাতিত থাকে।

এখন তাদের একজনও কি তোমরা আজ বেঁচে আছে দেখতে  
 পায় ?

আর ফেরাউন এবং তার পূর্ববর্তী লোকেরা এবং বিভিন্ন ধ্বংস-  
 প্রাণ জনপদসমূহ এরূপ মারাত্মক অপরাধই করেছিল।

এই লোকেরা তাদের রবের প্রেরিত রাসূলদেরকে মানে নি,  
 ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে শাস্তি দিলেন।

যখন (নৃহের সময়) পানির উচ্ছাসিত স্নোত সীমা লংঘন করে  
 গেল, তখন আমরা তোমাদেরকে (মানব বৎসকে) নৌকায়  
 আরোহী বানিয়েছিলাম যেন এই ঘটনাটি তোমাদের জন্য  
 একটি শিক্ষাপ্রদ স্মারক বানিয়ে দেই, আর এই ঘটনা  
 শ্রবণকারী কানসমূহ তার স্মৃতিকে সংরক্ষিত করে রাখে।

ଛାମୁଦ ଓ ଆଦ ଜାତିର ଧର୍ମସେର ବିବରଣ ୭ : ୪ ଏବଂ ୧୧ : ୬୭ ଆୟାତଦୟର ସଙ୍ଗେ, ନୂହ (ଆ)-ଏର ଜାତିର ଧର୍ମସେର ବିବରଣ ୭ : ୬୪ ଆୟାତେର ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ଫେରାଉନ ଓ ତାର ଜାତିର ଧର୍ମସେର କାହିଁନି ୭ : ୧୩୬ ଆୟାତେର ସଙ୍ଗେ ବିଜ୍ଞାନିତ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ ।

### ١٠- وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَنِ ذَاهِيَةٍ

୬୯ : ୧୬ ଯେ ଦିନ ଆକାଶ ଦୀର୍ଘ-ବିଦୀର୍ଘ ହବେ ଏବଂ ତାର ବାନ୍ଧନ ଶିଥିଲ ହେଁଯେ ଯାବେ ।

ଏ ବିଷୟଟି ୨୫ : ୨୫ ଆୟାତେ ଆଲୋଚିତ ହେଁଛେ ।

### ١١- لَمْ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَرْبَينَ

୬୯ : ୪୬ ଏବଂ ତାର କଟ୍ ହର୍ଦପିଲେର ଧମନି ଛିନ୍ନ କରେ ଫେଲତାମ ।

ହର୍ଦପିଲେର ଧମନି ଏରୋଟ୍ (Aorta) ଯା ହର୍ଦପିଲେର ବାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥେକେ ଶୁଳ୍କ ହୟ ଏବଂ ଶରୀରେର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେ ରକ୍ତ ସମ୍ବଲିତ କରେ । ଏହି ଧମନି ବିଚିନ୍ନ ହଲେ କେଉ ବାଚତେ ପାରେ ନା । ସାଧାରଣତ ଦୂର୍ଘଟନା, ଛୁରି ବା ବୁଲେଟେର ଆଘାତ ଅଥବା aneurysm ହୟେ ଫେଟେ ଗେଲେ ଏକପ ହତେ ପାରେ ।

### ١٢- تَعْرِجُ السَّلَيْكَهُ وَالرُّؤُسُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً

୭୦ : ୪ ଫିରିଶତା ଏବଂ ଝାହ ଆଲ୍ଲାହର ଦିକେ ଉର୍ଧ୍ଵଗାମୀ ହୟ ଏମନ ଏକଦିନେ ତା ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚଶିଖ ବହରେର ସମାନ ।

ଏ ବିଷୟଟି ଆୟାତ ୨୨ : ୪୭ ଓ ୩୨ : ୫ ଏ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ ।

### ١٣- وَكَوْنُ الْجَبَابُ كَالْعِنْبُونِ

୭୦ : ୯ ଏବଂ ପର୍ବତସମୂହ ହବେ ପଶମେର ମତ,

ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆୟାତ ୫୬ : ୪-୬ ଏ ଆଲୋଚିତ ହେଁଛେ ।

### ١٤- وَقَدْ خَلَقْنَا أَطْوَارًا

୭୧ : ୧୪ ଅଥଚ ତିନିଇ ତୋ ତୋମାଦେଇରକେ ସୃଷ୍ଟି କରେହେଲ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତରେ,

দু'জনন কোষের মিলনের ফলে উৎপন্ন জাইগোট (zygote) থেকে মানুষের সৃষ্টি এবং বিভিন্ন জগাবস্থাত থাকার বিষয়টি আয়াত ২৩ : ১২-১৫তে হয়েছে। এই তত্ত্বে কোন কোন বিজ্ঞানী দাবী করেন যে মানুষ আদিম যুগের জীবন থেকে ক্রমাগতে উচ্চতর জীবন যাপনে ক্রম বিকশিত হয়েছে।

۱۵-۱۶. ﴿اَلْفَرَّارُوَاۤكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَوْلَتٍ طَبَاقًاۤ﴾

৭১ : ১৫ তোমরা কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ কীভাবে সঙ্গ স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন,

এ বিষয়টি ২৩ : ৮৬ সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۷-۱۸. ۰ جَعَلَ الْقَرَرِ فِيهِنَّ نُورًا۝ وَجَعَلَ الشَّمْسَ بِرَاجِمًا۝

৭১ : ১৬ এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোকাপে এবং সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে;

পৃথিবীকে আলোকিত করার প্রধান আলোর উৎস হচ্ছে চাঁদ ও সূর্য। এই দু'টির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে যে চাঁদ পৃথিবীর একটি স্থানাবিক উপগ্রহ এবং সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হয়ে আলো দেয়। অন্যদিকে সূর্য হচ্ছে একটি নক্ষত্র এবং তাপ-আণবিক (thermo-nuclear) প্রক্রিয়া দ্বারা নিজেই নিজের মধ্যে শক্তি উৎপন্ন করে আলো দেয়। শক্তি উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এর কেন্দ্রে প্রটোন-প্রটোনের পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া (proton-proton chain reaction)। এই বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সূর্যের কেন্দ্রের মর্মস্থলে যার ব্যাসের দৈর্ঘ্য চার লক্ষ কিলোমিটার এবং সূর্য পিঙ্কের প্রায় ৬০% ধারণ করে। আর এই কেন্দ্রীয় অংশ সূর্যের মোট ঘনমাণের মাত্র ২%। এই কেন্দ্রীয় অংশের বাইরে অবিবর্ধিত পদার্থের একটি মোড়ক রয়েছে যার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় অংশ থেকে তাপ বিকিরণ করে। এই তাপ ভূপৃষ্ঠের প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এলাকার উপর বিকিরিত হয় এবং তাপ সঞ্চালন শক্তি পরিবহনের সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। সূর্যের মর্মস্থল থেকে উপরিভাগ পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রায়  $15,000,000^{\circ}$  ডিগ্রী কিলো-ওয়াট থেকে মাত্র  $6,000^{\circ}$  ডিগ্রী কিলো-ওয়াটে নেমে আসে। ফটোক্রিয়ার (সূর্যের আলোকময় বহিরাবরণ, যেখান থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়) নামে পরিচিত সূর্যের বহিরাবরণ সূর্যের তাপসঞ্চালন এলাকা ও সৌর বায়ু মণ্ডলের মধ্যে একটি সীমানা তৈরি করে। কয়েকশ' কিলোমিটার পুরু এটা একটি স্তর যেখান থেকে

সূর্যের নির্গত শক্তির বিকিরণ হয়। এই বিকিরণকৃত শক্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ মাত্র পৃথিবী গ্রহণ করে।

পৃথিবীর একমাত্র স্বাভাবিক উপগ্রহ চাঁদের ব্যাসের পরিমাণ ৩৪,৭৬ কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার। আর পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকারের কক্ষপথ গড় ২৭.৩০২ সৌর দিবসে প্রদক্ষিণ করে। চাঁদের ঘূর্ণন সমলয় বিশিষ্ট অর্থাৎ এর অক্ষ রেখা যার চারদিকে ঘূর্ণনের কৌণিক বেগ পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণের বেগের সমান। অতএব চাঁদের সম্মুখভাগ সব সময় পৃথিবীর দিকে থাকে। চাঁদের সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয়টি হচ্ছে চাঁদের পৃষ্ঠের আলোকিত ও দৃশ্যমান অংশের গঠন এক রাত থেকে আরেক রাতে পরিবর্তিত হয়। চন্দ্রকলার এই দৃশ্যটি দু'টি ঘটনার একটি সাধারণ ফলাফল, (১) চাঁদ নিজে দীপ্তিমান নয়, কিন্তু সূর্যের ক্রিয় প্রতিফলিত হওয়ার ফলে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে; এবং (২) চাঁদ স্থীয় কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। যেহেতু সূর্য সবসময় চাঁদের অর্ধেক পিঠকে আলোকিত করে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে এর মুখোমুখি হয় তাই চাঁদের কলাসমূহ পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান চান্দ্ৰ গোলার্দের আলোকিত অংশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এরাপে এটা পরিদৃষ্ট হয় যে সূর্য ও চন্দ্ৰ দু'টি ডিন্ব ধরনের আলোর উৎস। চাঁদ শুধুমাত্র সূর্যালোককে প্রতিফলিত করে, আর সূর্য আলোক বর্তিকার ন্যায় নিজের মধ্যেই আলো উৎপন্ন করে।

وَاللَّهُ أَبْتَكَنَّ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ إِلَيْهِ وَمَا

৭১ : ১৭ আর তিনি তোমাদেরকে উজ্জ্বল করেছেন মাটি থেকে।

একটি শব্দমূল থেকে আরবী ‘আনবাত’ শব্দটি আহরণ করা হয়েছে। এর অর্থ অংকুরিত হওয়া অথবা উৎপন্ন করা। গুরুতরশয়ের ফল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং ‘আল্লাহত্তা’আলা এখানে জরায়ু মধ্যস্থিত মানব শিশুর সৃষ্টির প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। যেমন একটি গাছ ভূপৃষ্ঠে একটি বীজ থেকে জন্ম লাভ করে। তেমনিভাবে মানববীজ যথা ডিম্বকোষ ও শুক্রের একত্রে মিলনের ফলে জাইগোট (zygote দুই জননকোষের মিলনের ফলে উৎপন্নকৃত) গঠিত হয়।

তারপর জরায়ুতে ক্রমাবয়ে জগের উন্নয়ন ঘটে। উদ্ভিদ তার শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে পুষ্টি আহরণ করে ক্রমাবয়ে বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে মানব জগ মায়ের গর্ভফুল থেকে পুষ্টি লাভ করে ধীরে ধীরে বড় হয়। আর মা ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে তার পুষ্টি লাভ করে। তাই একটি বীজের অংকুরোদগম ও তা থেকে একটি গাছের বৃদ্ধিপ্রাণ হওয়া মায়ের উদরে একটি

জনের ক্রমাবয় বৃদ্ধির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই আয়াতে পৃথিবীতে মানুষের জন্য ও তার ক্রমাবয় বৃদ্ধির বিষয়টি এসেছে এবং তা আয়াত নং ৬ : ২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١٩- جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِاطِّا

৭১ : ১৯ এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন-

আয়াত ২ : ২২ ও ১৩ : ৩ এ প্রসংগে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে।

٢٠- إِنَّمَا تَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُّلًا فِي جَنَابَاتِ

৭১ : ২০ যাতে তোমরা অশস্ত পথে চলাফেরা করতে পার।

এ প্রসংগে ২০ : ৫৩-এ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٢١- وَمَا خَطَّبْتُكُمْ أَغْرِقْتُمَا فَإِذْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَرْجِعُنَّ وَاللَّهُمَّ

٢٢- قِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا

৭১ : ২৫ তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে অগ্নিতে দার্শিল করা হয়েছিল, অতঃপর তারা আল্লাহ্-র মুকাবিলায় কাকেও সাহায্যকারী পায়নি।

এই আয়াতটিতে নবী নূহ (আ)-এর সময়কার বন্যার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আয়াত ৭ : ৫৯-৬৪তে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٣- يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجَبالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مُّهْنِيًّا

৭৩ : ১৪ সেই দিনে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকল্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।

আয়াত নং ১৮ : ৪৭ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٤- الْجِمَاءُ مُنْكَطِرٌ بِهِ " كَانَ وَعْدُهُ مَكْفُولًا

৭৩ : ১৮ যেদিন আকাশ বিদীর্ঘ হবে; তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

এ বিষয়ে আয়াত ২৫ : ২৫ এ আলোচনা করা হয়েছে।

..... ﴿۱۷﴾ لَنْ تُحْصِنْهُ عَلَمَانْ لَنْ يُقْتَدِرُ الْيَلَى وَالنَّهَارُ

৭৩ : ২০ ..... এবং আল্লাহই দিন ও রাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেন।  
তিনি জানেন যে তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না,

আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত বিধান অনুসারে পৃথিবী সীয় অক্ষের উপর ২৪ ঘন্টায় একবার ঢকাকারে আবর্তন করে এবং সীয় কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ৩৬৫.২৪ দিনে একবার ঘুরে আসে। সীয় কক্ষপথের উপর আবর্তনকালে সব সময় ২৩০.৫° ডিগ্রী কোণিক অবস্থানে থাকে। দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আয়াত ২ : ১৬৪ ও ১০ : ৬ এ আলোচনা করা হয়েছে।

বছরের বিভিন্ন সময়ে একই স্থানে দিন-রাতের স্থিতির তারতম্য হতে দেখা যায়। আবার তাদের ব্যাপ্তির প্রেক্ষিতে স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই একজন অতি সাধারণ লোকের পক্ষে দিন-রাতের এসব পার্থক্য সম্পর্কে জানা প্রায় অসম্ভব এবং তাদের পক্ষে সঠিকভাবে নির্ধারণ করাও সম্ভবপর নয় যে একটি রাতের অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ বা দুই তৃতীয়াংশ কী পরিমাণ সময় নিয়ে গঠিত হয়।

### ٩-وَجْهِهِ الْكَمْسُ وَالْقَرْ

৭৫ : ৯ যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।

পরিশিষ্ট ১ ও আয়াত ৪৪ : ১০ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রায় ৭০০ কোটি বছরের আরও একটি বর্ধিত কালব্যাপী সূর্য তার প্রধান পরিণতির উপর বর্তমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। সেই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সূর্যের বহিরাংশ প্রচলভাবে ফুলে উঠবে এবং একটি প্রকান্ত লাল দৈত্যের রূপ পরিগ্রহ করবে। এই পর্যায়ে সূর্যের এই ক্ষীতি বহিরাবরণ বৃধি ও উক্ত গ্রহকে গ্রাস করবে এবং পৃথিবীর কক্ষ পথে পৌছবে। অতঃপর ক্ষীতি সূর্য চাঁদের কাছাকাছি চলে এসে চাঁদকে গ্রাস করবে এবং এভাবে সূর্যের সাথে চাঁদ এসে মিলিত হবে।

### ١٠-الْأَنْدِلْكُ نُطْفَةٌ مِنْ مَنْيٍ يُنْتَ

### ١١-شَعْكَانَ عَلَقَةٌ حَلَقَتْ قَسْوَىٰ

৭৫ : ৩৭-৩৮ সে কি অলিত শক্রবিশ্ব ছিল না? অতঃপর সে আশাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুষ্ঠাম করেন।

নৃতফাহ থেকে মানব শিশুর জন্মের বিষয়টি ইতোপূর্বে আয়াত ২২ : ৫ ও ২৩ : ১২-১৪তে আলোচনা করা হয়েছে।

### ٢٩-بَعْلَ مِنْهُ الرَّوْجَدُونَ الْكَرَّ وَالْأَنْثَىٰ

৭৫ : ৩৯ অতঃপর তা থেকে তিনি সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।

পুঁজিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের সৃষ্টি সম্পর্কে ১৩৪৩ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

### ٣٠-أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقِدْرٍ عَلَىٰ أَنْ يُنْبَئَ الْوَعْنَىٰ

৭৫ : ৪০ তবুও কী সেই মৃষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নয়?

আল্লাহ মৃতকে জীবিত এবং জীবিতকে মৃত করেন। এ বিষয়টি আয়াত ৮ং ৩ : ২৭ এ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

### ٣١-مَلَّ أَقْعَدَ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ حِلْمٌ قَرَنَ اللَّهُ كُنْ شَيْئًا مِنْ كُوْزَا

٢-إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَأْلَهُ نَبْتَلِيهُ

٣-بِعَلْلَهُ سَيِّئًا بَصِيرًا

৭৬ : ১-২ মানুষের উপর কী কালের এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়নি যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না?

নিচয়ই আমরা মানুষকে সংমিশ্রিত নৃক্ষা (ফোটা) থেকে সৃষ্টি করেছি বেন আমরা তাকে পরীক্ষা করতে পারি। আর এ উদ্দেশ্যে আমি তাদেরকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছি।

মানুষের পরিচয় কেবল শিশু হিসাবে জন্ম লাভের পর শুরু হয়। এর পূর্বে তার কোন উল্লেখ বা পরিচয় থাকে না। কিন্তু তার সৃষ্টি শুরু হয় পিতার শক্রকীট ও মায়ের ডিব এবং এ দুয়োর মিলনের ফলে জ্ঞান সৃষ্টির সময় থেকে। অথচ এ সময় শিশুর কোন পরিচয় নেই। এমন কি প্রায় সবক্ষেত্রে তার লিঙ্গ সম্পর্কেও জানা থাকে না। সুতরাং এ কথা অতীব সত্য যে মানুষের জীবনে একটা সময় ছিল, যখন সে উল্লেখ করার মত কোন বস্তুই ছিল না। এই আয়াতের মানুষের

ଜୀବନେର ପ୍ରଥମ ସୃତିକାଳେର ଉତ୍ସେଖ ରହେଛେ ଯା ୨୩ : ୧୨ ଆୟାତେର ସଙ୍ଗେ ବିଜ୍ଞାରିତ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ ।

۱۰-كُنْ حَقِّهِمْ وَسَدَّ ذَنْبَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا

بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدِّلُلَا

୭୬ : ୨୮ ଆମରାଇ ତାଦେରକେ (ମାନୁସ) ସୃତି କରେଛି ଏବଂ ତାଦେର ଶହ୍ରି ସମ୍ମହ (ଜୋଡ଼ା) ଶକ୍ତ କରେ ଦିଲେଛି । ଆମରା ଯଥନିଈ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତଥନିଈ ତାଦେର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଫେଲବ ।

ମାନୁସେର ସୃତିର ବିବରଣ ୨୩ : ୧୨-୧୫ ଆୟାତେର ସଙ୍ଗେ ବିଜ୍ଞାରିତ ଆଲୋଚିତ ହେବେ ।

ଶରୀରେର ଶହ୍ରି ବା ଜୋଡ଼ା ବଲତେ ବିଭିନ୍ନ ହାଡ଼େର ସଂଯୋଜନ ବୁଝାଯ । ଏହି ଜୋଡ଼ା ସାଧାରଣତ ଦୂ'ପ୍ରକାର ଯଥା ଦୃଢ଼ ବା ହିଂର ଜୋଡ଼ା ଏବଂ ଚଳମାନ ଜୋଡ଼ା ବା ଶିଥିଲ ଜୋଡ଼ା । ହିଂର ଜୋଡ଼ା ସମ୍ମହ fibrous ବା cartilaginous ହୁଏ । ଆର ଚଳମାନ ଜୋଡ଼ା ସାଧାରଣତ ବିଶେଷ ପର୍ଦା ଓ ପିଛିଲ ତରଳ ପଦାର୍ଥ (synovial fluid and membrane) ସହ ହୁଏ । ହିଂର ଜୋଡ଼ା ବା ଶହ୍ରିସମ୍ମହ ଖୁବ ଶକ୍ତ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଆୟାତେ କ୍ଷତିଗ୍ରହୀତ ହୁଏ ନା । ସାଧାରଣତ କଠିନ ଆଘାତେ ସରଗ୍ରିଷ୍ଟ ହାଡ଼ ଭେଦେ ଯାଏ ।

ଶିଥିଲ ଜୋଡ଼ାଯ ଚାର ପ୍ରକାର ବକ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ- ଶହ୍ରିର ଦୁନିକେର ହାଡ଼େର ପ୍ରାନ୍ତଦୟ ଏ ସମ୍ମତ ହାଡ଼ପ୍ରାନ୍ତକେ ଢେକେ ରାଖା ନରମ ହାଡ଼ (cartilage) ଯାତେ ହାଡ଼ ପ୍ରାନ୍ତଦୟ ଯମ୍ବଣ ହୁଏ ଆର ଏକଟି ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଯାକେ କ୍ୟାପସୁଲ ବଲେ, ଯାର ସାହାଯ୍ୟେ ହାଡ଼ ଦୂଟିକେ ଆଟକିଯିବେ ରାଖା ହୁଏ । ଜୋଡ଼ାର ଭିତରେର ପର୍ଦା ଥେକେ ଏକ ପ୍ରକାର ପିଛିଲ ପଦାର୍ଥ ବେର ହୁଏ ଯାର ଫଲେ ହାଡ଼ ଦୂଟି ସହଜେ ନଡ଼ାଚଡ଼ା କରାତେ ପାରେ । ଏ ଛାଡ଼ା ଜୋଡ଼ାର ଉପର ଦିଯେ ଶହ୍ରିର ଉପରେର ହାଡ଼ ଥେକେ ନିଚେର ହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମାଂସ ପିନ୍ଡ ରହେଛେ ଯା ଶହ୍ରିକେ ଆରା ଶକ୍ତିଶାଲୀ କରେ ।

ମୋଟ କଥା କୁରାନେର ଜୋଡ଼ା ଶକ୍ତ କରାର କଥାଟି ବିଶେଷଭାବେ ପ୍ରମିଳାନ୍ୟୋଗ୍ୟ ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. W.A.R. Thomson, Black's Medical Dictionary, 33rd edn., Adar and Charles Black, London, pp. 503-504, 1981.

١-وَالرُّسْلَتُ عَزِيزًاٌ ٢-فَالْعُوْسَقُ عَصْنًاٌ

٣-الثَّيْرَتُ شَرِيرًاٌ ٤-فَالْفِرْقَتُ فَرِيقًاٌ

٥-فَالْمُلْقِيَّتُ ذَكْرًاٌ

৭৭ : ১-৫ শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর, আর প্রলয়করী বাড়ের, শপথ  
সঞ্চালনকারী বায়ুর, আর মেষপুঁজি বিজ্ঞানকারী বায়ুর, এবং তাৰ  
যা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌছিয়ে দেয়-

প্ৰবল বাতাস ও ঘূর্ণিঝড়সহ বায়ুর শ্ৰেণী বিভাগ সম্পর্কে আয়াত ২ : ১৬৪ ও  
১৭ : ৬৮ তে ব্যাখ্যা কৰা হয়েছে। ৩০ : ৪৮ সংখ্যক আয়াতে এও ব্যাখ্যা কৰা  
হয়েছে যে আকাশের মেঘদলকে বায়ু কিভাবে বিস্তৃত কৰে দেয় এবং পৰে পৃথক  
কৰে। উপৰে একটি বার্তাৰে বিস্তাৱের অৰ্থ হতে পাৱে বায়ু সংবাদেৱ বার্তা  
বাহকেৱ কাজ কৰতে পাৱে এবং আয়াত ৭ : ৫৭তে এ বিষয়ে আলোচনা  
হয়েছে।

٦-فَإِذَا التَّجْوِهُ مُطْسَئٌ

৭৭ : ৮ যখন নক্ষত্রাজিৰ আলো নিৰ্বাপিত হৰে-

পৰিশিষ্ট-১ এ লক্ষ্য কৰা গিয়েছে যে বাদামী বৰ্ণেৱ বামন নক্ষত্রগুলো যাদেৱ  
আলো এত ক্ষীণ যে প্ৰায় দেখা যায় না, তাদেৱ ব্যতীত অন্য সকল নক্ষত্র নিম্নেৱ  
পৰ্যায়গুলোৱ মাধ্যমে প্ৰকাশ পায় : প্ৰধান অনুবৰ্ত্তিকা পৰ্যায়, কৃষ্ণনগীল পৰ্যায় ও  
ৱক্তিম দৈত্যবৎ পৰ্যায়। এ সকল পৰ্যায়েৱ পৰ প্ৰকাশেৱ ধৰন নক্ষত্ৰেৱ পিণ্ডেৱ  
উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে। যদি পিণ্ডটি 'চন্দ্ৰশেখৱেৱ সীমাৱ' (Chandrasekhar's  
Limit) মধ্যে থাকে তাহলে শেষ পৰ্যন্ত নক্ষত্ৰটি একটি সাদা বামনে পৱিণত হয়  
এবং সীয় অভ্যন্তৰস্থ আলো বিকিৰণ কৰে। তাৱপৰ ক্ৰমাবলয়ে কাল বামনে  
ক্ৰমান্তৰ ঘটে। চন্দ্ৰশেখৱেৱ সীমাৱ মধ্যে থেকে অধিকতৰ বড় পিণ্ডাকৃতিৰ  
তাৱকাসমূহ শেষ পৰ্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্ৰাজি অথবা অভিমানায় উজ্জ্বল নক্ষত্ৰমালাৱ  
মধ্যে পড়ে ক্ৰিয়াশক্তি হাৱিয়ে ফেলে। এ সকল তাৱকা একটি বুল্ল সময়ে খুবই  
উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তাৱপৰ শক্তি হাৱিয়ে ফেলে ক্ৰমাবলয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতৰ  
আলোকবিশিষ্ট হতে থাকে এবং চূড়ান্ত পৰ্যায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুবৃহৎ  
পিণ্ডকাৱেৱ তাৱকাসমূহ শেষ পৰ্যন্ত কৃষ্ণ গহনৱে পতিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।  
এভাবে সকল তাৱকা চূড়ান্তভাৱে ক্ষীণালোক বিশিষ্ট হয়ে হাৱিয়ে যায়।

وَإِذَا الْكَهْلُ فُجِّئَتْ ۝

۹۷ : ۹ یখন آکاٹش بیدীର୍ଣ୍ଣ ହବେ,

ଏହି ବିଷୟଟି ଆଯାତ ୨୫ : ୨୫ ଏ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ ।

وَإِذَا إِجْبَالُ نِسْفَتْ ۝

۹۷ : ۱۰ ଏବଂ ଯଥନ ପର୍ବତମାଳା ଉନ୍ନାଶିତ ଓ ବିକିଷ୍ଣ ହବେ-

ଏ ପ୍ରସଂଗେ ଆଯାତ ୫୬ : ୪-୬ ଏ ଆଲୋଚିତ ହେବେ ।

۱۴- أَلَمْ نُهَلِّكُ الْأَوَّلِينَ ۝

۱۵- ثُمَّ تُشَيِّمُمُ الْآخِرِينَ ۝

۹۷ : ୧୬-୧୭ ଆମରା କି ଶୂର୍ବବତୀ ଜାତିସମୁହକେ ତାଦେର ଅପରାଧେର ଜନ୍ୟ ଧଂସ କରି ନି? ଏମନିଭାବେ ପରବତୀ ଶୋକଦେଇକେଣ ତାଦେର ମତ ପରିଚାଳିତ କରବ (ଧଂସ କରବ) ।

ଏଥାନେ ଅତୀତେର ଅବିଶ୍ଵାସୀ କାଫିରଦେର କଥା ବଲା ହେବେ ଯାରା ତାଦେର ନବୀଦେର କଥା ଆମାନ୍ୟ କରାଯ ଧଂସ ହେବେ । ଏଥାନେ କୋନ ବିଶେଷ ଜାତିର ଉତ୍ସେଖ କରା ହେବି । ତବେ ତାଦେର ପାପେର ଜନ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ, ଝଡ଼, ବନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଯାହାଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଧଂସେର କଥା ୧ : ୪, ୫୯-୬୪ ଏବଂ ୧୭ : ୬୮ ଆଯାତସମୁହର ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ ।

۱۶- أَلَمْ يَخْلُقُهُ مِنْ مَأْكَلَةِ مَهِيَّنَ ۝

۱۷- بَقَعْلَنْهُ فِي قَرَارِ مَكَيْكَنَ ۝

۱۸- لَلَّا يَقْدِيرُ مَغْلُوبَهُ ۝

۱۹- فَقَدَنَا نَفْسَمُ الْقَدَارُونَ ۝

۹۷ : ୨୦-୨୩ ଆମରା କି ତୋମାଦେଇରକେ ମାପାକ ଓ ନଗଣ୍ୟ ପାନି ଥେକେ ସୃଷ୍ଟି କରି ନି? ତାରପର ତାକେ ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଟି ସଂରକ୍ଷିତ ହାଲେ ଆଟକିଯେ ରାଖି ନି? (ମନେ ରେଖୋ) ଆମରା ଯା ଧ୍ୟୋଜନ ତା କରେଛିଲାମ, ଏବଂ ଆମରା ଉତ୍ସମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ।

মানব শিশুর মায়ের গর্ভে জন্মের বিভিন্ন স্তর ও তার সৃষ্টির পূর্বের শুক্রকীট  
ও ডিস্বের মিশ্রণ ইত্যাদির বিজ্ঞানিত বিবরণ ২৩ : ১২-১৪ আয়াতের সঙ্গে  
আলোচিত হয়েছে।

গর্ভকালের সময় এবং তার বিভিন্নতা নিয়ে যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে,  
তাও ২২ : ৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٦-٧. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَابِي شِمَشَتْ وَأَسْقَيْنَاهُ مَاءً فَرَأَىٰ﴾

৭৭ : ২৭ আর তাতে (পৃথিবীতে) উচ্চশির পর্বতমালা গড়ে শক্ত করে বসিয়ে  
দিয়েছি আর তোমাদের জন্য সুমিষ্ট পানি সরবরাহ করেছি।

পৃথিবীতে কীলকের মত পাহাড় গড়ে দেওয়ার বিষয়টি ১৩ : ৩ আয়াতের  
সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তার অসীম দয়ার মাধ্যমে আমাদের জন্য পানযোগ্য অফুরন্ত পানির  
উৎস সৃষ্টি করেছেন যা ২ : ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এই পানির  
দ্বিতীয় স্তরের উৎস হলো নদী, পুরু, খাল-বিল এবং ফলুধারা সমূহ।

٨. ﴿أَلَّفَ بَيْنَ أَرْضِي مَهْدًا﴾

৭৮ : ৬ আমি কী ভূমিকে শব্দ্য করিনি?

পৃথিবী একটি বিশালাকৃতির গোলাকার বস্তু, এর ব্যাসার্ধ প্রায় ৪০০০ মাইল  
ও ভূপৃষ্ঠের আয়তন ২০.১ কোটি বর্গমাইল। পৃথিবীর বিজ্ঞানের বিষয়টি আয়াত  
১৩ : ৩ ও ১৫ : ১৯ এ আলোচনা করা হয়েছে।

٩. ﴿وَالْجَبَالُ دَارٌ﴾

৭৮ : ৭ ও পর্বত সমূহকে কীলক।

এ বিষয়টি আয়াত ১৩ : ৩ এ আলোচিত।

١٠. ﴿وَخَلَقْنَا مِنْ آتِينَا﴾

৭৮ : ৮ আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।

প্রাণী জগত ও উষ্ণিদ জগতে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির বিষয়টি আয়াত ১৩ :  
৩ এ আলোচনা করা হয়েছে।

٦-وَجَعَلْنَا نَوْمَكُوكُ سَبَّاتِا

৭৮ : ১৯ তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম।

নিদ্রার বিষয়টির উপর আয়াত ৩০ : ২৩ ও পরিশিষ্ট-৮ এ আলোচনা হয়েছে।

٧-وَبَيَّنَنَا فَوْقَكُوكُ سَبَّاعًا شَدَادًا

৭৮ : ১২ আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্ব দেশে সুস্থিত সত্ত আকাশ।

এ সম্পর্কে আয়াত ২ : ২৯ এ আলোচনা হয়েছে।

٨-وَجَعَلْنَا سَرَاجًا فَهَاجَما

৭৮ : ১৩ এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজেক্স দীপ-

এটা সূর্যের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এবং ৭ : ৫৪ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

٩-وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُغْرِبِ مَاءً ثَجَاجًا

৭৮ : ১৪ এবং বর্ষণ করেছি মেঘ থেকে প্রচুর বৃষ্টি-

প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতের প্রসঙ্গটি আয়াত ১১ : ৫২তে আলোচনা করা হয়েছে।

١٠-إِنْخِرْجَ يَهْ حَبَّا وَبَبَّا

١١-وَجَعَلْنَا لِلْفَانًا

৭৮ : ১৫-১৬ তা ধারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ধিদ, ও ঘন সর্পিল  
উদ্যান-

বৃষ্টির ফলে শস্য, উদ্ধিদাদির উৎপাদন এবং সাধারণভাবে সবুজ গাছপালার  
সৃষ্টি প্রসঙ্গটি আয়াত ৬ : ১৯তে আলোচনা হয়েছে।

١٢-وَتَبَعَّثِي السَّمَاءَ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

١٣-وَصَوَرَتِ الْجَهَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

৭৮ : ১৯-২০ আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে স্বারবিপিট। এবং  
পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে  
মরীচিক।

এ বিষয়গুলোর উপর যথাক্রমে আয়াত ৫৬ : ৪-৬ এ আলোচনা হয়েছে।

### ١٩-٢٠. وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ كُتْبًا

৭৮ : ২৯ আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ই লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম।

এ বিষয়টি ৩৬ : ১২ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

### ٢١-٢٢. رَبُّ الْمَوْتَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَنْلَوْنَ مِنْهُ خَطَايَا

৭৮ : ৩৭ সেই আসমান-যমিনের ও তার মধ্যবর্তী প্রতিটি বস্তুর মালিক যে  
প্রত্যু তাঁর নিকট থেকে, যার সামনে কারো কথা বলার সাহস  
নেই।

আল্লাহ যে আসমান-যমিন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় জিনিশের মালিক  
এ কথা ৫ : ১৯ এবং ৭ : ১৮৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

### ٢٣-٢٤. مَنْ فَرَّأَ شَيْءًا خَلْقًا أَفَإِنْسَانٌ بَنَهَا

৭৯ : ২৭ তোমাদের (মানুষের) সৃষ্টি করা কী অধিক কঠিন কাজ না  
আসমান সৃষ্টি করা? আল্লাহই তো তা নির্মাণ করেছেন।

এ বিষয়টি ৪০ : ৫৭ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

### ٢٥-২٦. رَبُّمَا سَمِّكَهَا فَسُونَهَا

৭৯ : ২৮ তার ছাদ (আকাশ) যথেষ্ট উচ্চে তুলেছেন পরে তাতে সমতা দান  
করেছেন।

আকাশের ছাদ সম্পর্কে কী বুঝানো হয়েছে তা ২ : ২২ আয়াতে সঙ্গে  
আলোচনা করা হয়েছে।

প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে এই পৃথিবী একটি ঘৃণ্যমান অতি উষ্ণ গ্যাসের কুস্তলী ছিল (আয়াত ২ : ১১৭)। পরে এটা ক্রমে ক্রমে ঠাড়া হতে থাকে এবং তরল ও শক্ত বস্তুতে পরিণত হয় যা পৃথিবীর আবরণ হিসেবে তৈরি হয়। কতগুলো গ্যাস যেমন অঙ্গীজেন, কার্বনডাই অক্সাইড ইত্যাদি বর্তমান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হিসেবে তরল ও শক্ত বস্তুর পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে যায় কারণ পৃথিবীর তাপে এগুলো তরল বা কঠিন বস্তুতে পরিণত হতে পারে না। যেহেতু এই গ্যাসগুলো পাতলা তাই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া শক্তি তাদেরকে তাদের ওজন অনুযায়ী বিভিন্ন উচ্চতায় ধরে রাখে। ফলে সবচেয়ে হালকা গ্যাস সর্বোচ্চে অবস্থান করছে। এই তথ্যকথিত ছাদের বিধান ২ : ২২ আয়াতে প্রমাণ করা হয়েছে যে কেবল আল্লাহই এ সবকে নিজস্ব পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন।

○ ﴿۱۹﴾ دَآخِرَةٍ حُصْنًا

৭৯ : ২৯ তিনি রাতকে করেছেন অক্ষকারাজ্যে এবং প্রকাশ করেছেন  
সূর্যালোক।

সূর্য তথা আলোর উৎস দিকচক্রবালের নিচে নেমে গেলে স্পষ্টতই তৃপ্তে অঙ্কাকার নেমে আসবে এবং গাগনিক বস্তুসমূহ দ্বারা সজ্জিত নৈশ আকাশের ঐশ্বর্য ফুটে উঠবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কী কারণে অসংখ্য তারকা এবং গাগনিক বস্তুনিয়চ রাতের আকাশকে উজ্জ্বল করে তোলে না তা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। ১৮২৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হেইনরিচ অলবার সর্বপ্রথম এ প্রশ্ন তোলেন যে, আকাশ রাত্রিবেলা অঙ্কাকার থাকে কেন? এটি অলবারের প্যারাডক্স হিসেবে পরিচিত।? সমস্যাটা অনুধাবন করার জন্য ধরা যাক, আকাশ সমপূর্ণভাবে অসংখ্য গোলাকার খোলসে বিভক্ত এবং সমগ্র আকাশ জুড়ে তারকার ঘনত্ব (প্রতি ইউনিট আয়তনের তারকার সংখ্যা) অপরিবর্তনীয় তথা ক্রমবক্তৃ তাছাড়া সমস্ত তারকা সমান ব্রহ্মীয় উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট। ধরে নেই  $h$  এমন পুরুত্ব বিশিষ্ট, একটি খোলসের আয়তন হচ্ছে;  $4rh$  তারকার ঘনত্ব যদি হয়  $n$ , তাহলে এমন একটা খোলসের ভিতরকার তারকার সংখ্যা হবে  $4nhr$ । এখন, প্রতীয়মান উজ্জ্বলতা দূরত্বের বিপরীত বর্গের সমান। কাজেই খোলসের ক্ষেত্রে আকাশের প্রতীয়মান উজ্জ্বলতা হচ্ছে:  $4nr^2hnkr^2$  যা  $4rhnk$  এর সমান। খোলসের দূরত্ব  $r$  থেকে এই রাশিটি আলাদা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দূরের হোক আর কাছেরই হোক, প্রতিটি খোলসই আকাশে একই পরিমাণ উজ্জ্বলতা প্রদান করে থাকে। এভাবে, যদ্বারা আকাশের যদি উপরে অনুমিত এককূপ বৈশিষ্ট্য থাকত, তাহলে প্রতিটি খোলস সদৃশ অঞ্চল তা যত দূরের বাস্তাছেরই হোক না কেন- যদ্বারা

সম্পরিমাণ উজ্জ্বলতা প্রদান করত। আর অসংখ্য খোলস থেকে আকাশে আগত  
আলোকচূটাতে ধাকত চোখ ধীধানো রকমের উজ্জ্বল্য।

যহাবিষ্টের সপ্ত্রসারণ গতি দূরত্বের সাথে বেড়ে যাচ্ছে—এ সত্যটির মধ্যে  
রয়েছে অলবারের প্যারাডক্সের সমাধান।

আবার, ১০০ কি. মি./ সেকেণ্ড/ মেগাপারসেক কে হাব্ল-এর ক্রমবক্তৃত ধরে  
নিলে দেখা যায় যে, ৩০০০ মেগাপারসেক দূরত্বে অবস্থানকারী ছায়াপথের ক্ষেত্রে  
গতি সম্ভাব হবে ৩.১০ কি. মি./ সেকেণ্ড যা আলোর গতির সমান। কাজেই,  
এর চেয়ে অধিক দূরত্বে অবস্থানকারী ছায়াপথ কখনই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরা  
আকাশের উজ্জ্বলতায় কোন অবদানও রাখতে পারে না। এ কারণে, সূর্যাস্তের পর  
আকাশ অঙ্ককার হয়ে যায়।

### তথ্যসূত্র :

1. I.C. Brandt, and S.P. Maran, *New Horizon of Astronomy*, W.H. Freeman and Co. 1972.

## ٢- بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمَهَا

৭৯ : ৩০ এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।

এ বিষয়টি ২ : ২২ এবং ১৩ : ৩ আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

## ٣- مَرْغَمَهَا وَمَرْعَهَا

৭৯ : ৩১ তিনি তা থেকে বহিগত করেছেন এর পানি ও তৃণ।

মাটি থেকে পানি কিংবা আর্দ্রতা বের করে আনা এবং চারণভূমি তৈরি করা- এ দু'টো পরম্পর পরম্পরের সাথে সংযুক্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা দু'টি শ্পষ্টতই পানি চক্রের প্রতি ইঙ্গিত করে। তৃণগর্ভে পানি সঞ্চিত হওয়া, উদ্ভিদ কর্তৃক মূল দ্বারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় তা বিশেষণ এবং নির্গমন আর্দ্রতার মাধ্যমে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ছলে আসা- এ বিষয়টি ২ : ২২ এবং ২৫ : ৫০ আয়াতদ্বয়ের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উভর আমেরিকার বৃক্ষহীন তৃণভূমির কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। এটি একটি বিশাল তৃণভূমি। যেখানে হাজার হাজার জীবন্ত গবাদি পশু চরে বেড়ায়।

## ٤- أَبْجَالَ أَرْسَهَا

৭৯ : ৩২ এবং পৰ্বতকে তিনি প্রোত্তিত করেছেন দৃঢ়ভাবে।

বিষয়টি ১৩ : ৩ এবং ২১ : ৩১ আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

## ٥- مَنَاعَ الْكُفَّارَ لَعْنَاعَاصِمَةِ

৭৯ : ৩৩ এসব কিছু তোমাদের আর তোমাদের গবাদিপশুর ডোগের জন্য।

অত্র আয়াতটি ৭৯ : ৩১ আয়াতের সাথে সংযুক্ত যাতে মাটি থেকে আর্দ্রতা এবং চারণভূমি উৎপাদনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যে বিষয়টি ঐ আয়াতের প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

মাটি থেকে আর্দ্রতা উৎপাদন করার অর্থ হৃদের আকারে পানির উপস্থিতি। সবুজ গাছপালা-তরুলতা এবং চারণভূমির আকারে যে সকল সংশ্লিষ্ট উপকার পাওয়া যায় তা ২ : ১৬৪ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

۱۰- مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

۱۱- مِنْ نُطْفَةٍ

۱۲- ثُمَّ السَّبِيلَ يَتَّرَأَ

৮০ : ১৮-২০ তিনি একে কোন্ত বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন ? উক্তবিদ্যু হতে ;  
তিনি একে প্রথমে সৃষ্টি করেন এবং পরে পরিষিত বিকাশ  
সাধন করেন। অতঃপর এর জন্য সহজ করে দেন।

**উক্তাণু থেকে সৃষ্টি এবং সঠিক অনুপাতে গঠনাকৃতি প্রদান**

মাত্ত উদরে ধাপে ধাপে মানব জনের সৃষ্টির বিষয়টি ২৩ : ১৩-১৪  
আয়াতদ্বয় প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সঠিক অনুপাতে  
ক্রমবর্ধমান মানব জনের বিষয়টি ৬৪ : ৩ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

**তার জন্যে পথ সুগম করা**

সংক্ষিপ্তভাবে আটকানো জরায়ু মুখ (cervix uteri) এবং স্বাভাবিকভাবে  
সংকীর্ণ প্রসবদ্বার যার দু'টোই হাড় পূর্ণ শ্রোণীর শক্ত বলয় দ্বারা পরিবেষ্টিত- এ  
রকম একটা পথে মানব শিশুর জন্ম আগাত দৃষ্টিতে এক অসম্ভব কর্ম। নিম্নবর্ণিত  
বৈজ্ঞানিক আবিক্ষারের ভিত্তিতে আমরা অত্র আয়াতের গভীর অর্থ ঝুঁজে পেতে  
পারি।

**প্রসব তিনটি ধাপে গঠিত**

১. প্রথম ধাপ চলাকালে, ডিষ্টাশয় এবং আমরা যা গর্ভফুল থেকে রিলাঞ্জিন  
এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয় যার কারণে শ্রোণী সঙ্গে বঞ্চনীগুলো আলগা হয়ে  
যায় এবং সারভিক্স ইউটেরি তথা জরায়ু নরম হয়ে থাকে। তার পরেই ঘটে  
থাকে জরায়ুর সংকোচন। জরায়ুর উপরের অংশে এটি শুরু হয়। এ অংশে থাকে  
সক্রিয় সংকোচন পেশীকলা যা জরায়ুর সংকীর্ণ নিক্রিয় নিম্নাংশের মধ্য দিয়ে  
শিশুকে ঠেলা দিতে থাকে। একই সঙ্গে প্রতিটি জরায়ু সংকোচন ক্রিয়ার  
পাশাপাশি শিশুর চারদিক ধিরে থাকা খিল্লির ভিতর দিয়ে এক ধরনের জলীয়  
পদার্থ (এমনিওটিক ফ্লুইড) পানির ব্যাগের মত জরায়ুর মুখ পর্যন্ত চলাচল করে  
এবং শিশুর বেড়ে ওঠা তুরাবিত করে। পরিশেষে, এই ধলেটি ফেটে গেলে  
খিল্লিটি শিশুর বয়ে চলার জন্য একটা নরম ও পিছল তল বা জরায়ুপথ তৈরি  
করে।

২. প্রসবের ২য় ধাপে শিশুর মানস ও অবস্থানে কিছু ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটে যা অনিয়মিত আকারের অঙ্গসংকুচিত হিসেবে ভিতর দিয়ে শিশুর অতিক্রমণকে সহজ করে তোলে। স্বাভাবিক প্রসবে, শিশুর মাথা প্রথমে বের হয়ে আসে, তারপর আসে দেহ ও অঙ্গসংকুচিত। সাধারণত মাতা নিজেও মধ্যস্থিতি ও উদর পেশীতে বেঞ্চাকৃত চাপ প্রয়োগ করে থাকে গড়পড়তা শিশুর মাথার আকার ঠিক পেলিসিস বা যে অস্তিপথে শিশু অতিক্রমণ করে তাতে যতটুকু ফাঁক থাকে তার সমান তার বেশী নয়। কাজেই, প্রসবকালে মাথা চাপে সংকুচিত থাকে এবং এটা সম্ভব হয় এ কারণে যে, এ সময় মাথার হাড় নরম থাকে এবং হাড়ের মাঝে থাকে 'ফন্টানেলি' (fontanelles) নামক এক ধরনের আঁশজাতীয় ফাঁকা স্থান যা জন্মাকালে মাথার করোটিকে আকৃতি পরিবর্তনে সক্ষম করে তোলে। এগুলোই হচ্ছে আল্লাহু প্রদত্ত বিশেষ ব্যবস্থা যা প্রসবকালে শিশু ও তার মাতার পক্ষে ন্যূনতম ক্ষতির দ্বারা শিশুর মাথাকে অতিক্রমণে সাহায্য করে।

৩. প্রসবের ৩য় ধাপ হচ্ছে গর্ভফুলের বহিরাগমন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই গর্ভফুলের বহিরাগমন সম্পন্ন হয়ে থাকে।

#### তথ্যসূত্র :

1. K.L. Moore, and A.A. Azzopardi, *The Developing Human.*, 3rd edn., W.B. Saunders Company, Philadelphia, p. 120 a. 1983.

٥-٧٤. شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا

٥-٧٥. فَأَبْثَثْنَا فِيهَا حَبَّاً

٥-٧٦. وَعَنْبَاءً وَقَصْبَاءً

٥-٧٧. وَزَيْتُونًا وَمَخْلَدًا

٥-٧٨. وَحَدَائِقَ عُلْبَاءً

٥-٧٩. وَفَارِهَةَ وَأَنْدَانَ

٦-٨٠. مَنَاعًا لَكُفْرِ الْأَنْعَامِ كُفْرًا

৮০ : ২৬-৩২ অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি; এবং তাতে  
আমি উৎগুল করি শস্য; দ্রাক্ষা, শাকসজ্জি; যয়তুন, ধৰ্জুর।  
বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য এসব কিছু  
তোমাদের আর তোমাদের গবাদি পত্র ভোগের জন্য।

আমরা পৃথিবীকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছি

ভৃ-পঞ্চের টুকরো হয়ে যাওয়া সংঘটিত হয়ে থাকে অংশত বৃষ্টির  
ফেঁটা এবং অংশত ভৃ-ভৃকের দ্বারা কিংবা তার নিকটস্থ খনিজ দ্রব্যাদি অথবা  
শিলার তোত সংযুক্তি ও রাসায়নিক বিভক্তি এর সাথে জড়িত থাকে। পানি ও  
বায়ু প্রবাহ কখনও কখনও এ সব খণ্ডকে বেশ দূরে নিয়ে যায় এবং এগুলোকে  
এমনকি ভেঙ্গে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত করে। পানি কণাসমূহের মধ্যে ঢুকে  
পড়ে এবং দ্রবণীর খনিজ পদার্থসমূহ পানিতে দ্রবীভূত হয়। এই মৃত্তিকা পানি  
মূলত মৃত্তিকা কণার উপরিতলে একটা ঝিল্লি হিসেবে বর্তমান থাকে এবং এই  
ধাপেই পানি উঙ্গিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

আর তা থেকে উৎপাদন করেন শস্যাদি

বৃষ্টির সুফলদায়ক প্রভাবে শস্যাদির উৎপাদিত হওয়া এবং ধূলির ধরার  
পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়টি ২ : ১৬০ আয়াতের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আর আচুর ও সবুজ তৃণলতা এবং জয়তুন ও খেজুর

বৃষ্টি এবং এর আনুষঙ্গিক সুফলদায়ক প্রভাবে আচুর, সবুজ প্রকৃতি, জয়তুন,  
খেজুর ইত্যাদি উৎপাদনের বিষয়টি ২ : ২২ এবং ৬ : ৯৯ আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গে  
আলোচিত হয়েছে।

আর পুরু বৃক্ষপত্রবিশিষ্ট বেড়া দেওয়া বাগান এবং ফলাদি ও পত খাদ্য  
তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পত্র আহারাদি

ମାନୁଷ ଓ ଗବାଦି ପତ୍ରର ଆହାର୍ୟ ହିସେବେ ଫଳବାଗାନ, ସବୁଜ ପ୍ରକୃତି ଇତ୍ୟାଦିର ବେଡ଼େ ଉଠା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାର ଜନ୍ୟ ୨ : ୧୬୪ ଆୟାତ ପ୍ରସ୍ତେର ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ ।

١- إِذَا الْكَهْنُوْتُ بِعِزْمَةٍ  
٢- إِذَا الْجَزْمُ اثْكَلَ رَبَّتْ  
٣- إِذَا الْجَيْلَانُ سَيَّدَتْ بِعِزْمَةٍ



୪୧ : ୧-୩ ଶ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଦ ନିଷ୍ଠୁର ହବେ ।

যখন নক্ষত্রগাজি থসে পড়বে ।

ପରତ୍ୟାଳାକେ ସବୁ ଚଲାନ କରା ହବେ ।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো ৫৬ : ৫ এবং ৭৭ : ৮ আয়াতগুলোর প্রসঙ্গে  
আলোচিত হয়েছে।

٤٦ دُرَادِ الْمَارِسَةِ

୪୧ : ୬ ସମ୍ବନ୍ଦ ଯତ୍ନ ଶୀତ ହବେ ।

আমরা জানি, সূর্যের কেন্দ্রে আণবিক বিক্রিয়া ঘটে এবং হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। যতই বেশী বেশী হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হতে থাকবে, তত বেশী হিলিয়াম সৃষ্টি হবে। কম্পিউটার প্রদত্ত হিসেবে অনুযায়ী পরবর্তী ৫৬ কোটি বছরে তেমন বড় কোন পরিবর্তন ঘটবে না।<sup>১</sup> সূর্য তার ক্রম বিকাশের ধারায় ধীরে ধীরে অধিকতর উজ্জ্বলতা ধারণ করবে এবং বহির্ভূগ কিছুটা বেশী উত্পন্ন হবে। ৬৬ কোটি বছরে সূর্য বেড়ে বর্তমানের চেয়ে আকাশের দ্রিশ্য হবে। সূর্য কেন্দ্রস্থ হাইড্রোজেন ব্যবস্থা হয়ে যাবে এবং কেন্দ্রাঞ্চলে এক হিলিয়ামকেন্দ্র সৃষ্টি হবে। সব হাইড্রোজেন নিঃশেষ হওয়ায় সূর্য কেন্দ্র আণবিক প্রজ্বলন ঘটাতে পারবে না এবং হিলিয়ামের একীভবনের পক্ষে সেখানকার তাপমাত্রাও থাকবে অত্যন্ত কম। সময়ের সাথে সাথে সূর্য কেন্দ্রস্থ হিলিয়াম কেন্দ্র বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটি বুধ ও শুক্রের পরিক্রমণ পথ গ্রাস করবে এবং পৃথিবীর পরিক্রমণের পথের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়বে। বিশাল দৈত্যাকার সূর্য আকাশের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হবে এবং পৃথিবীকে আলো ও তাপ দিতে থাকবে কিন্তু পৃথিবী থাকবে প্রাণহীন। তখন পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলো তাপে ফুটতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত স্ফীত হবে ও বাঞ্চাকারে উঠে যাবে।

ତ୍ୟାଗ ୫

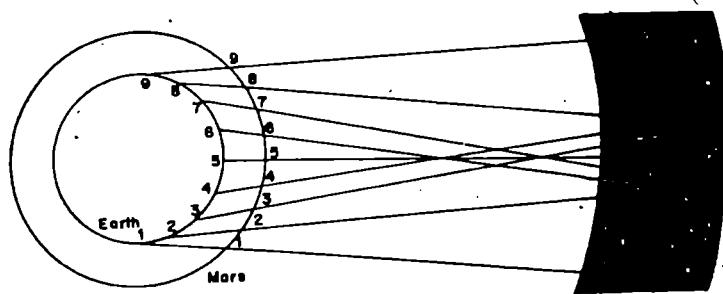
1. Rudolf Kippenhan, *100 Billion Suns*, published by Counterpoint, London, Unwin Paperbacks, 1983.

١٥-فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُلُّنِ

٤-الْجَوَارِ الْكَثِيرِ

৮১ : ১৫-১৬ আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, যা প্রত্যাগমন করে অথবা অদৃশ্য হয়।

গ্রহসমূহ আকাশে অস্থির গতিতে চলাফেরা করে বলে মনে হয়। কখনও কখনও একটি গ্রহ, বিশেষত কোন বৃহস্পতির গ্রহ (সূর্যের চারদিকে যার পরিক্রমণ পথ পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ থেকে অধিকতর দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত), পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে চলছে বলে মনে হয়। এই গতিকে প্রত্যক্ষ গতি বলা হয়। অন্য সময়ে, গ্রহটিকে পশ্চাত কিংবা বিপরীত গতিতে তথা পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলছে বলে মনে হয়।



চিৰ-১৪ : মঙ্গল গ্রহের বিপরীত গতি। গ্রহটির আকাশে দৃশ্যত প্রতীয়মান চলার পথ ভানদিকে দেখান হয়েছে এবং আধুনিক ব্যাখ্যা বাম দিকে দেয়া হল। নয় বাবের মধ্যে প্রতিবাবের জন্য পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি পথ আঁকা হয়েছে যাতে তারকারাজির বিপরীতে মঙ্গলের আপাত অবস্থান দেখানো যায় (স্ট্রাকচার এও চেঙ্গ থেকে, লেখক জি এস ক্রিস্টিয়ানসেন এবং পি, এইচ গ্যারেট, ড্রিউ এইচ সভার্স এও কোঁ, ১৯৮০)।

আবার অন্য কোন সময়ে এটি হিঁর বা গতিবেগহীন অবস্থায় থাকে। কখনও বা এটি অন্য আরেকটি এই দ্বারা ঢাকা পড়ে যায়। এটিই অকলাটেলন বা গুরুবস্থা নামে পরিচিত। পৃথিবীর তুলনায় গুরুতলের আপেক্ষিক গতির কারণে এ সকল ঘটনা প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে থাকে। গ্রহের গতি বিষয়ক কেপ্লারের ২য় সূত্রানুযায়ী সূর্যের নিকটতর কোন গ্রহের গতিবেগ সূর্য থেকে দূরবর্তী অবস্থানে অবস্থিত গ্রহের তুলনায় অধিক। যেহেতু বৃহস্পতির কোন গ্রহ পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে অধিক দূরত্বে অবস্থিত, সূর্যের চারদিকে এর গতিও কখনও পৃথিবী এগিয়ে থাকে। যখন গ্রহটি এগিয়ে থাকে, পৃথিবী তার উচ্চতর গতির দ্বারা বৃহস্পতির গ্রহটিকে ধরার চেষ্টা করে। যেটি তুলনামূলকভাবে বল্কি গতিতে সামনে চলেছে। তাদের মধ্যকার দূরত্ব কমতে থাকে। তবুও বৃহস্পতি গ্রহটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সরাসরি গতিতে পৃথিবী অপেক্ষা আগে আগে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পৃথিবী এবং গ্রহটি উভয়ই সূর্যের সাথে একই রেখা বরাবর চলে আসে। এ পর্যায়ে গ্রহটিকে গতিহীন ও হিঁর বলে মনে হয়। এ রকম ক্ষেত্রে গ্রহটি বিপরীতে আছে বলে বলা হয়। এ অবস্থানের পর পৃথিবী ঐ গ্রহটিকে ছাড়িয়ে আগে চলে যায়। তখন তাদের মধ্যকার দূরত্ব বিপরীত দিকে তখন পূর্ব থেকে পশ্চিমে বেড়ে যাওয়া শুরু করে। গ্রহটিকে তখন মনে হয় পিছন দিকে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ পিছু হটছে এবং এ অবস্থায় বলা হয়ে থাকে যে গ্রহটি বিপরীত গতিতে যাচ্ছে। কখনওবা দু'টি এই একই দৃষ্টিপথে চলে আসে এবং এভাবে একটি এই অপরাদি দ্বারা ঢাকা পড়ে যায়। এ ঘটনাটিই গুণ যা আড়াল অবস্থা হিসেবে পরিচিত।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ গ্রহসমূহের গতির কারণে সৃষ্টি এ সকল প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

### ١٤-وَيَلِ لِدَا عَسْعَسَ

### ١٥-وَالْقُبْحَاجِإِذَا نَنْصَنَ

৮১ : ১৭-১৮ শেখর নিশার যখন তার অবসান ঘটে,  
আর উবার যখন তার আবির্ভাব ঘটে।

সূর্যাস্তের মধ্য দিয়ে রাতের শুরু আর সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে রাতের সমাপ্তি। তবে, গোধূলির আবির্ভাবের সাথে সাথে রাতের অক্ষকার বিদায় নিতে থাকে। সূর্য দিগন্তের নিচে ১৮°-এর মধ্যে এসে পড়লে গোধূলি দেখা দেয়।

গোধূলি বিষয়টি ২ : ১৮৭ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

۱-إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

৮২ : ১ আকাশ যখন হবে দীর্ঘ বিদীর্ঘ

বিশয়টি ২৫ : ২৫ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

۲-إِذَا الْكَوَافِرُ اسْتَرَتْ

۳-وَإِذَا الْحَمَارُ فُجِرَتْ

৮২ : ২-৩ যখন নক্ষত্রাঙ্গি ঝরে পড়বে বিকিঞ্চিতভাবে। আর সমুদ্র যখন হবে উরেণিত।

আমরা জানি, মহাবিশ্বের দু'টি বল ক্রিয়াশীল ৪ বিকিরণ চাপ হেতু সম্প্রসারণ বল এবং অভিকর্ষ বল। প্রথম বলটির কারণে ছায়াপথপুঁজি পরম্পরের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বলটির কারণে ছায়াপথপুঁজি পরম্পরের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। এ হচ্ছে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের গতিবেগ আর দীর্ঘায়ী অভিকর্ষ বলের মধ্যকার ত্বরিত লড়াই। সম্প্রসারণ গতি যদি জয়ী হয় তাহলে মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। কিন্তু অভিকর্ষ জয়ী হলে আকর্ষণ বল দ্রুত ধাবমান ছায়াপথপুঁজের গতি ধীর করে দেবে এবং এগুলোকে একেবারে গতিহীন হিঁর অবস্থানে নিয়ে আসবে। তারপরও মহাকর্ষ তাদের সকলকে একত্রিত করতে থাকবে। মহাবিশ্ব এর সমগ্র বস্তু নিয়ে প্রচণ্ড একটা কেন্দ্রাতিগ সংকোচণ গতি না আসা পর্যন্ত সংকুচিত হতে থাকবে। সংজ্ঞা এই অগ্নি অস্তঃপোতকে 'মহাচূর্ণন' বলা হয়ে থাকে।

আজকের দিনের বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, এই মহাবিপর্যয়কর ঘটনার ক্ষণ-গণনার জন্য একটা সময়সূচি ও হিসেব করে বের করা যেতে পারে।<sup>1</sup> মহাচূর্ণনের একশ কোটি বছর পূর্বে ছায়াপথ শুষ্ঠ তাদের মধ্যকার শূন্যস্থান পূর্ণ করে ফেলেবে এবং একত্রে মিশে যাবে। সমগ্র মহাবিশ্ব আমাদের ছায়াপথে যে রূক্ষ ফোকা স্থান রেখে নক্ষত্রসমূহ ছাড়িয়ে আছে মোটামুটিভাবে সে রূক্ষভাবে ছাড়িয়ে থাকা তারকারাঙ্গিতে পূর্ণ হবে। মহাচূর্ণনের দশ কোটি বছর আগে এক সময় তারকাসমূহ এত কাছাকাছি হবে যে, আকাশ তখ্য যে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল হবে তা নয়, বরং হবে তাপ দক্ষ পীড়িত উজ্জ্বল এবং সেই সমূহ তাপে ফুটে বিশুল

তথ্যসূত্র :

1. Nigel Henbest and Heater Couper, Restless Universe, George Philip, London, 1982.

-اللَّهُمَّ خَلَقْتَ  
نَسْلَكَ نَعْدَكَ  
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبُّكَ

٨٢ : ٧-٨ বিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাকে সৃষ্টাম ও সুসমঞ্জস করেছেন।

বে আকৃতিতে তিনি চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।

মানব সৃষ্টি ও তার আকার-আকৃতি দান বিষয়টি ১৩ : ৮ এবং ২৩ : ১২-১৫ আয়াতসমূহ এবং পরিশিষ্ট- ৫এ-ও আলোচিত হয়েছে। যথাযথ মাপ ও অনুপাত সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে, বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গসমূহের পরিমাপ ও আকার সাধারণভাবে এত পূর্ণাঙ্গ যে, এর উপর কোন উন্নতি সাধন করা যেতে পারে না। মাথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ, আঙুল ইত্যাদির উচ্চতা, আকার তাদের যথাযথভাবে কার্য সম্পাদনের উপযোগী সঠিক মাপে রয়েছে। প্রতিটি জিনিস যথাযথ অনুপাতে সৃষ্টির বিষয়টি ২৫ : ২ আয়াতের প্রসঙ্গে বিজ্ঞারিত আলোচনা করা হয়েছে।

-إِذَا السَّمَاءُ اشْتَكَنَتْ

৮৪ : ১ বখন আকাশ দীর্ঘ-বিদীর্ঘ হবে।

বিষয়টি ২৫ : ২৫ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

-وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَثَّ

৮৪ : ৩ এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে।

এ দিকটি ১৩ : ৩ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

আয়াতে যে সময়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তখন সূর্য পৃথিবীর অতি নিকটে চলে আসবে এবং পৃথিবী ও এর অভ্যন্তরভাগের ভাপমাত্রা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাবে; ম্যাগমার চট্টটে আঠালো বৈশিষ্ট্য করে যাবে যে কারণে ফলকসমূহ (মহাদেশীয় প্লেইট ইত্যাদি) অধিকতর প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হবে এবং এভাবেই বিভিন্ন ফলক বহির্যুদ্ধে ছড়িয়ে ছিটকে পড়বে।

## ٥-فَلَا أُفْسِدُ هَاكَفَنَّ

৮৪ & ১৬ আমি শপথ করি অঙ্গরাগের।

সূর্য থেকে আসা দৃশ্যমান আলোতে “তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে সাতটি  
ৱং থাকে। উনিশ শতকে লড় র্যালে আবিক্ষার করেন যে বায়ুমণ্ডলস্থ ধূলিকণা  
এবং বিভিন্ন গ্যাস ভিন্নভাবে আলো ছড়ায়। ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্ধাং নীল  
ৱং ছড়ায় সর্বাধিক, আর দীর্ঘতর তরঙ্গসমূহ তথা লাল রং ছড়ায় সবচেয়ে কম।  
সূর্যান্ত ও সূর্যোদয়কালে সূর্যরশিকে দীর্ঘতম বায়ু পথ অতিক্রম করতে হয় যখন  
ক্ষুদ্রতম তরঙ্গসমূহ ছড়ায় সর্বাধিক যে কারণে আমাদের নিকট যেসকল রশ্মি  
গৌছে যায় সেগুলোতে লাল রং-এর প্রাধান্য থাকে। এ কারণেই সূর্যান্ত ও  
সূর্যোদয়কালে দিগন্ত লাল দেখায়।

## ١٠-وَالْقَمَرُ إِذَا اسْتَقَ

৮৪ & ১৮ এবং শপথ চন্দ্রের বর্ণন সে পূর্ণতা লাভ করে।

আলোচ্য আয়াতে চাঁদের পূর্ণিমা স্তরের কথা বলা হয়েছে। চাঁদ পৃথিবীর  
একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ যা সূর্যের আলো প্রতিফলনের কারণে দৃশ্যমান হয়।  
এটি পৃথিবীর চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ পূর্ণ করে ২৭.৩২২ দিনে। পৃথিবীর  
চারদিকে চাঁদের গতি সমলয়পূর্ণ। অর্ধাং চাঁদের নিজ অক্ষের চারদিকে কৌণিক  
গতি এর পৃথিবীর চারদিকের গতির সমান। ফলে, এটি সবসময় পৃথিবীর দিকে  
একই পাশ বজায় রাখে। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে নিজ কক্ষপথে চলাকালীন  
সময়ে সূর্য এর পৃষ্ঠের অর্ধাংশ বিভিন্ন অবস্থানে আলোকিত করে এবং আমরা  
চাঁদের আলোকিত বিভিন্ন অংশ দেখতে পাই। আলোকিত দৃশ্যমান অংশের  
আকারকে চাঁদের কলা বলা হয়। চাঁদ যখন পৃষ্ঠের যে অংশ আমাদের দিকে মুখ করে থাকে সে অংশ থাকে  
আলোকিত এবং তখন আমরা চাঁদকে মোটেই দেখতে পাই না। এটাই হচ্ছে  
গ্রহণ এবং এ কলাটি হচ্ছে নতুন চাঁদ। চাঁদ যতই তাম্র কক্ষপথে এগিয়ে যায়  
ততই এর একটা সরু আলোকিত অংশ দৃশ্যমান হয় এবং আমরা আকাশে বাঁকা  
চাঁদ দেখতে পাই। প্রতিটি পরবর্তী রাতে আলোকিত অংশের অধিকতর ভাগ  
আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় এবং চন্দ্রকলা অবিরাম পরিবর্তিত হতে থাকে যতক্ষণ  
না চাঁদ বিপরীতে চলে যায়। অর্ধাং এটি সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অবস্থানে  
থাকে। এটি পূর্ণিমা নামে পরিচিত। এ অবস্থানকে চাঁদের আলোকিত অর্ধাংশের  
পুরোটাই পৃথিবী থেকে দেখা যায় এবং চাঁদ থাকে তার পরিপূর্ণতায়। এই পূর্ণিমা

কলা চলাকালে চাঁদের প্রতীয়মান উজ্জ্বলতার ব্যাপকতার পরিমাণ থাকে ১২.৭ এবং পৃথিবীর চাঁদের এই পূর্ণিমা কলাই সর্বাধিক চন্দ্রালোক লাভ করে থাকে।

### ٤٠- طَبْقَةً كَبُّونِيَّةً عَنْ طَبْقَةِ

৮৪ : ১৯ তোমাদিগকে অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে অবস্থাস্তরের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

এখানে আল্লাহ মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরের কথা বলছেন যা পার হতেই হয়। জীবনের শুরু হয়েছে মাত্রগর্ডে ভূগর্বে আকারে প্রথমে 'নৃৎফা,' পরে 'আলাকা,' পরে 'মুদগাহ,' এযাম' লাহাস, স্তর হয়ে পরিপূর্ণ মানব শিশুরূপে জন্মগ্রহণ। জন্মের পর শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি স্তর পার হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তবে কেউ কেউ কিন্তু সব স্তর পার হবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে থাকে।

মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানের কোন ধারণা নেই। শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত মানুষ বিদ্যা শিক্ষা করে এবং জীবন ধারণের জন্য কোন কাজ বা পেশা সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে যেন প্রয়োজনীয় আয় উপার্জন করে জীবন যাপন করতে পারে। প্রাণ বয়স্ক হতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত মানুষ দুনিয়াবী কাজ কর্ম, সামাজিক কর্মকাল, বিবাহ, সন্তান উৎপাদন, সন্তান প্রতিপালন ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ইত্যাদিতে সময় কাটাতে হয়। তারপর মৃত্যু এসে ইহজীবনের ইতি টানে যদিও মৃত্যু যে কোন সময়ই আসতে পারে এবং তা একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণধীন।

### - وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ ٤٠-

৮৫ : ১ শপথ সুদৃঢ় দুর্গমন্ত্র আকাশের রাশিমণ্ডলীর।

এ বিষয়ে ১৫ : ১৬ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٩- الَّذِي لَهُ مُلْكُ النَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ  
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٤٠

৮৫ : ১ বিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর একমাত্র মালিক আর সেই মহান আল্লাহ সরকিছু দেখছেন।

এই বিষয়ে ৫ : ১৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

# ا-السَّمَاءُ وَالْخَلْقُ ۝

## ۳-وَمَا أَنْشَأَ مَا الظَّاهِرُ ۝

### ۴-الْجَنْحُرُ الْغَافِقُ ۝

৮৬ : ১-৩ শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আভির্ভূত হয় তাৱ।

তুমি কি জান রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কী ?

তা উজ্জ্বল নক্ত ?

সূর্য, গ্রহসমূহ, চাঁদসহ উপগ্রহসমূহ, তারকামণ্ডলী, ছায়াপথস্থ উজ্জ্বল নক্ষত্রাঙ্গি এবং নীহারিকা দ্বারা বর্ণিয় বস্তুৰ সৃষ্টি হয়। দিনেৰ আলোতে আমৱা কেবল সূর্যকে দেখতে পাৱি এবং সূর্যেৰ বলমলে আলোৱ কাৱণে অন্য কোন বস্তু দেখতে পাৱি না। রাতে সূর্যেৰ অনুপস্থিতিতে আকাশমণ্ডলীৰ অন্যান্য বস্তু দেখা যায়। এ আয়াতে উল্লিখিত রাতে আবির্ভূত হয় একটি তীব্র উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট বর্ণিয় বস্তু। রাতেৰ আকাশে চাঁদ সবচেয়ে উজ্জ্বলতম বস্তু। কিন্তু এৱ উজ্জ্বলতা কোমল ও ঠাণ্ডা এবং রাতেৰ আকাশে দৃষ্টিদানকাৰীৰ জন্য তীব্র নয়। অন্যান্য গ্রহেৰ মতো শুক্ৰ সূর্যেৰ আলো প্রতিফলিত কৱে জল জল কৱে। পৃথিবী থেকে রাতে দেখলে এটি অন্য গ্ৰহ বা তাৱ অপেক্ষা উজ্জ্বলতাৰ মনে হয়, কাৱণ এটি পৃথিবীৰ নিকটত এবং এটি পুৰুষ প্রতিফলিত মেঘ দ্বাৰা আবৃত থাকে। পূৰ্ণিমায় চাঁদেৰ উজ্জ্বলতাৰ বিত্তাৰ থাকে ১২.৭। উজ্জ্বলতাৰ দিক থেকে পৱৰ্তী গ্ৰহ হলো শুক্ৰ। এৱ সৰ্বোচ্চ উজ্জ্বলতাৰ বিত্তাৰ ৪.৪। এৱ উজ্জ্বলতা অবশ্যই তীব্র। কখনো কখনো এৱ উজ্জ্বলতা দেখে মনে হয় যেন আকাশে একটি টুচ ঝুলে আছে। কখনো কখনো শুক্ৰ গ্ৰহ এত বেশী উজ্জ্বল হয় যে তা ছায়া প্ৰদান কৱে এবং এমনকি দিনেৰ বেলায়ও দেখা যায়।

শুক্ৰ একটি নিম্নতৰ গ্ৰহ (অৰ্ধাং এৱ কক্ষপথ পৃথিবীৰ কক্ষপথেৰ মধ্যেই থাকে)। সুতৱাৎ এটা চাঁদেৰ মত বিভিন্ন পৰ্যায় প্ৰদৰ্শন কৱে এবং সব সময় সূর্যেৰ খুৰ নিকটে অবস্থান কৱে। এটা যখন সকালে দেখা যায় তখন একে সকালেৰ আৱা বলে, অথবা সন্ধ্যা হলে সন্ধ্যা তাৱা বলে। এৱ সবচেয়ে বড় কৌণিক দূৰত্ব (সূৰ্য হতে কৌণিক দূৰত্ব) হলো ৪৭° ডিগ্ৰী। নিম্নতৰ গ্ৰহসমূহলৈ (যখন গ্ৰহ পৃথিবী ও সূৰ্যেৰ মাঝে অবস্থান কৱে) ৭২ দিনে হয়, যা ৫৮৪ দিনে অন্তৱ অন্তৱ সংঘটিত হয়। যখন কৌণিক দূৰত্ব ৩৯° ডিগ্ৰী হয় তখন শুক্ৰ সবচেয়ে উজ্জ্বলতম হয়। এটা নিম্নতৰ গ্ৰহসমূহলৈৰ ৩৬ দিন পূৰ্বে বা পৱে ঘটে থাকে। সূৰ্যেৰ চাঁদদিকে এটা ২২৫ দিনে সম্পূৰ্ণ ঘূৰ্ণন সমাপ্ত কৱে থাকে। এৱ ঘূৰ্ণনেৰ দিক পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহেৰ (ইউরেনাস হাজা) উল্টো। এৱ কক্ষপথে এটা ২৪৩ দিনে ঘূৰ্ণন সম্পূৰ্ণ কৱে থাকে। সুতৱাৎ শক্রেৰ তিথিৰ দিন ডেনুশিয়ান বছৰ অপেক্ষা বড়।

তথ্যসূত্র :

1. Encyclopaedia Americana, vol. 28, p. 11, 1979.

وَكَلِّيْنَظُرِ الْإِنْسَانِ مَرْحُلٌ ۝

۝ حَلَقَتْ مِنْ كَآءٍ دَارِقَيْنِ ۝

۝ يَخْرُجُ مِنْ بَئْنِ الْعُضُلِيْنِ وَالْتَّرَابِ ۝

৮৬ : ৫-৭ মানুষ লক্ষ্য করক যে সে কী বস্তু দিয়ে সৃষ্টি। সে এক প্রকিণ্ঠ পানি থেকে সৃষ্টি যা পৃষ্ঠদেশ ও বকের অঙ্গিগজরের মধ্যবহুল থেকে নির্গত হয়।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নুৎকার বদলে প্রকিণ্ঠ পানির উন্নেব করেছেন যা সৃষ্টি হয়ে পৃষ্ঠ দেশ ও বক্ষগজরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে নির্গত হয়। আমরা জানি যে মানুষ প্রথমে শত্রুকীট ও ডিম্বের সংযোগে মাত্রগর্তে ভূগের আকারে সৃষ্টি হয়। পুরুষের বীর্যের সঙ্গে যে শত্রুকীট সঞ্জোরে প্রকিণ্ঠ হয়, সেই প্রকিণ্ঠ শত্রুকীট ডিম্ব ও রক্ত ও পেটের ভিতরকার তরল পদার্থে তাসে যেমন শত্রুকীট বীর্যে ভাসমান থাকে। সুতরাং শত্রুকীট ও ডিম্ব দুইই প্রকিণ্ঠ তরল পদার্থে থাকে যা এই আয়তে বলা হয়েছে প্রকিণ্ঠ পানি।

এই দুটি তরল পদার্থ কুরআনের ভাবায় পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষ পিঙ্গরের মধ্যবর্তী স্থল অর্থাৎ পেটের ভিতর থেকে নির্গত হয়। শারীরবিদ্যা থেকে আমরা জানি যে পুরুষের শত্রু অভক্তোষের ভিতর তৈরি হয়। পূর্ণত্ব প্রাপ্ত শত্রুকীটগুলো তখন দুটি নল দিয়ে পেটের ভিতর মৃত ধলির নিচে প্রটেট ধাত্রির পেছনে অবস্থিত দুটি ধলিতে (seminal vesicles) জমা হয়। এই শত্রু ধলির সঙ্গে নালির মাধ্যমে মূত্রনালির সরাসরি যোগ রয়েছে। আর নালীর ওভারি দুটিও তার তলপেটেই অবস্থিত। যখন শত্রু নির্গত হয়, অভক্তোষ থেকে নয় বরং তলপেটের শত্রু ধলি থেকে নির্গত হয়। ডিম্বও পরিস্কৃত হয়ে তলপেটেই পড়ে।

অভক্তোষ ও ওভারিদ্বয় পেটের ভিতরে আরো উপরে মেরুদণ্ডের ১০নং হাড়ের দু'পাশে প্রথম তৈরি হয়। এদের স্নায়ু, রক্তের ধমনি ও শিরা পেটের ভিতরকার সেই উপরের এলাকা থেকেই সংযুক্ত হয় এবং যখন এগুলো তলপেটে নেমে আসে, তার সঙ্গে স্নায়ু ও ধমনিও স্থা হয়ে ওভারির বেলায় নিচে তলপেটে নেমে আসে।

সুতরাং কুরআনে বর্ণিত শত্রুকীট ও ডিম্ব দুইই পেটের ভিতরে প্রকিণ্ঠ হয় এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্য। ১৪০০ বৎসর পূর্বে নিরক্ষর নবী (সা)-র মুখ থেকে আল্লাহর ওহীতে এ সব বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে তা নিচয়ই কুরআন যে আল্লাহর ক্ষিতাব তারই প্রমাণ দেয়।

## ○-وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْمَعِ

৮৬ : ১১ শপথ আসরানের যা ধারণ করে আবর্তন ।

. পৃথিবীর আপন কক্ষে আবর্তনের কারণে, তার ওপরের মহাকাশের সব জ্যোতিক্ষমগুলী একটি মেয়াদে আবর্তিত হয় ও ঐ নির্ধারিত সময়ের মেয়াদান্তে সকল মহিয়া ও বিশ্বয় নিয়ে তার মূল অবস্থানে ফিরে আসে বলে মনে হয় । পৃথিবীর আবর্তন মেয়াদ একটি দিবস (আক্ষিক গতি) । তাই একটি দিনের পর গোটা মহাকাশের জ্যোতিক্ষমগুলী তার সাবেক অবস্থানে ফিরে আসে । প্রায় সকল জ্যোতিক্ষ থেকে পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর মতো মহাকাশের অন্য সকল জ্যোতিক্ষই তাদের মূল অবস্থানে ফিরে আসে বলে মনে হয় ।

## ○-وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْحَلْمَلِ

৮৬ : ১২ এবং শপথ জয়নের যা বিনীর্ণ হয় ।

পৃথিবী প্রাকৃতিকভাবে তার অন্তর উন্নোচিত, প্রকাশিত রেখেছে—গিরিখাত, ক্যানিয়ন, ভূ-ফাটল ইত্যাদির মাধ্যমে নানাভাবে । সূরা রাদ-এর ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর সকল ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে টেকটোনিক প্রেইটের সক্রিয়তার কারণে । টেকটোনিক স্তরগুলোর মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে স্তরগুলো ধীরে ধীরে সরতে শুরু করে । এ ধরণের সঞ্চরণশীলভাব গতি বছরে হয়ে থাকে ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার হারে । বিশেষত অশৃঙ্খগুলীর স্তরের নিচে উষ্ণভাব অবতলীয় গতি ও অভিকর্ষের কারণে এই সঞ্চরণ ঘটে । এ সব শক্তির সংঘাতজনিত ব্যাপক ধীরগতির সঞ্চরণের ফলে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ও পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয় । যদি কোনো সামুদ্রিক ভাসী শিলাস্তর বা প্রেইট কোন অধিকতর প্লাবনশীল মহাদেশীয় শিলাস্তরের সাথে ধাক্কা খায়, তবে শেষেও শিলাস্তর ভেতরের দিকে সরে যায় । আর এভাবে ভেতরে সরে আসার পর শিলাস্তরটি নিচের দিকে নামে, উক্ত হয়ে উঠে ও পরিশেষে গলে যায় । আর এভাবে অপেক্ষাকৃত কম ঘন গলিত শিলা ভূপৃষ্ঠ অভিমুখে ওপরে উঠতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের কোন বিনীর্ণ স্থান বা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে যে স্থানটি আমাদের কাছে আগেয়গিরি হিসেবে পরিচিত । টেকটোনিক প্রেইট বা স্তরগুলোতে এই যে সংঘাত অনুষ্ঠিত হয় তাকে ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা হয় নিচের দিকে থাত বা নালিকা তৈরি । আর এ প্রক্রিয়ার সমন্বয়তলে ও তার সংলগ্ন

এলাকায় ১১ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিষ্ঠা তৈরি হচ্ছে পারে। আর এ থেকে তৈরি হতে পারে একটি বিদারণ মুখ। এভাবে সক্রিয় ৫৫ ক্ষেত্রগুলুর আগ্নেয়গিরির একটি মেখলা তৈরি হতে পারে। আর সে কারণেই দেখা যায়, আগ্নেয়গিরিগুলো রেখার আকারে সাধারণত মহাদেশীয় উপকূলের সমান্তরালে বিন্যস্ত। এভাবেই বস্তুত সৃষ্টি হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ণ আগ্নেয় মেখলা। আটলান্টিক মহাসাগরেরও এ ধরনের আগ্নেয় মেখলা বা আগ্নেয়গিরির সমাবেশ রয়েছে যেগুলোর অবস্থান আইসল্যান্ড, অ্যাঞ্জোর্স দ্বীপপুঁজি ও ক্যানারি দ্বীপপুঁজি। আগ্নেয়গিরির আরও একটি রেখাকার বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। আগ্নেয় সক্রিয়তা সাধারণত টেকটোনিক স্তর পরিসীমাগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলেও এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। বিশেষভাবে আগ্নেয় সক্রিয় স্থানগুলোর নিচেই থাকে অচল, অচেনা ভূতল থেকে উথিত গলিত ম্যাগমার পালক সদৃশ প্রবাহ।

পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে ভূপঠের ছেট আকারের বিদারণ নানাভাবে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, উদ্ধিদের বীজ মৃত্তিকা ভেদ করে বেরিয়ে আসে অঙ্কুরিত হয়ে। প্রস্তরণ বেরিয়ে আসে শিলা, মৃত্তিকা ভেদ করে ঝরণার আকারে, পৃথিবীর কন্দর থেকে প্রবল বেগে পানিরাশির আকারে। ভূপঠের নিচে কোথাও কোথাও সম্পর্ক থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস। সে সব জায়গাতে খনন করলে, এমনকি না করলেও অনেক সময় সেই গ্যাস শিলা বা মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। সে সব জায়গাতে চলে গ্যাস ও তেলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য অনুসন্ধান। ধরণী বিদীর্ঘ হওয়ার আরও একটি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় চৱক খরা, অনাবৃষ্টির সময়ে। তখন সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে মাটি ফেঁঠে চৌচির হয়ে যায়।

### ৩-الْبَنِيُّ خَلَقَ فَسُوْيٌ

৮৭ : ২ যিনি সৃষ্টি করেন ও তারপর সৃষ্টির মাঝে শৃঙ্খলা ও আনুপাতিক সুবমতা দান করেন।

আলোচ্য আয়াতটির বিষয়ে আয়াত ২৫ : ২-এর আওতায় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

### ৪-الْبَنِيُّ قَدَّرَ فَهَدَى

৮৭ : ৩ এবং যিনি নিয়মসূত্র নির্ধারণ ও পথ নির্দেশনা দান করেছেন।

আলোচ্য আয়াতটির বিষয়ে আয়াত ৫ : ১৯ ও ৭ : ৫৪, ১৮৫ এবং পরিশিষ্ট-৪ এর আওতায় আলোচিত হয়েছে।

٦- تَصْلِيْل نَارًا حَامِيَةً

٧- تُشْقِي مِنْ عَيْنٍ أَنْيَلَةً

৮৭ : ৪-৫ যিনি ত্রুটানি উৎপন্ন করেন আর তারপরে সেগোকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

আয়াত ২ : ১৬৪-র আওতায় বৃষ্টিপাতের পর উজ্জিদের বিকাশের বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে। উভয় আমেরিকার বিশাল সমতল ত্রুটমির লাখো গবাদি পশুর চারণ কাজ চলে। আর এই ত্রুটমির ত্রুটাজির ক্রমে এক সময়ে ধূসর আবর্জনায় রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি আয়াত ৬৭ : ২০-এর আওতায় আলোচিত হয়েছে।

٨- إِنَّمَا يَنْظَرُونَ إِلَى الْأَذْبَابِ كَيْفَ خُلِقُوا فِتْنَةً

৮৮ : ১৭ তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কীভাবে জীবটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

এই আয়াতের মাধ্যমে উট সম্পর্কে এক কৌতুহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা-অনুসন্ধানের অবতারণা করা হয়েছে। উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। কিন্তু উটের মাঝে কী এমন অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার প্রতি এই আয়াতে প্রশ্ন ইশারা রয়েছে? বাস্তবিকপক্ষে এ আয়াতের প্রকৃত সত্ত্বের নির্যাসটি কী হতে পারে তা জানা গেছে অতি সম্প্রতি ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শকোয়নিক ও অধ্যাপক কান্ট শিটে নিয়েলসনের উট বিষয়ক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে। তাঁদের এ গবেষণামূলক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, উটের নাসারক্সে আর্দ্রতা বিশেষণের জন্য এক বিশেষ ঝিল্লী স্তর রয়েছে যা শ্বাসত্যাগকালে তার সাথে আর্দ্রতা বেরিয়ে যেতে দেয় না। আর কোন পশুর দেহে এ ধরনের ঝিল্লীর অস্তিত্ব কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। উটের নাসারক্সে এ ধরণের ঝিল্লী থাকার কারণে, অন্যান্য পশুর শ্বাসত্যাগের সাথে সাথে অনিষ্ট্যাকৃতভাবে যে পরিমাণ আর্দ্রতা দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তার ৬৮ শতাংশ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

গবেষকরা উটের নাসিকার ব্যবহৃত করে দেখেছেন সেখানে ১০০০ বর্গ সেন্টিমিটার (৪০০ বর্গ ইঞ্চি) পরিমিত জ্বায়গা জুড়ে একাভিমুখী এক ঝিল্লীর অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষের প্রেরিত ঝিল্লীর আয়তন মাত্র ১২ বর্গ সেন্টিমিটার (৪.৮ বর্গ ইঞ্চি)।

ଉଟେର କୁଂଜେ ରମ୍ଯାହେ ଚର୍ବିର ସଙ୍ଗୟ ଯା ମରୁତେ ଖାଦ୍ୟାଭାବେର ସମୟ ତାକେ ବାଁଚିଯି ରାଖେ । କେବଳ ଚର୍ବି ହଲୋ ଖାଦ୍ୟେର ସଙ୍ଗୟ ବିଶେଷ । ମାନବଦେହର ସର୍ବତ୍ର ଚର୍ବି ବା ମେହଜାତୀୟ ଦ୍ରୁବ୍ୟ ଛଡ଼ିଯେ ଥାକେ ଅନେକଟା ଓଡ଼ାରକୋଟ ଯେମନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟା ଶରୀର ଦେକେ ରାଖେ ତେମନି । ଚର୍ବିର କାଜଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ ଓଡ଼ାରକୋଟର ମତଇ । କିନ୍ତୁ ଉଟେର ଚର୍ବି ଜମା ଥାକେ ଏକଟି ଜୀବଗାୟ । ଫଳେ ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ଏହି ଚର୍ବି ମରୁଭୂମିର ପ୍ରବଳ ତାପମାତ୍ରା ଥେକେ ତାକେ ବର୍ମେର ମତ ରକ୍ଷା କରାର ଭୂମିକା ପାଲନ କରେ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୁଳ୍ୟାଦୀପକ ବିଷୟ ଏହି ଯେ, ୧୫୦୦ ବରୁରେର ବେଶି ସମୟ ଆଗେ ଆମ୍ବାହ୍ ଉଟେର ଦେହ ଗଠନେର ବିଷୟେ ଯା ପ୍ରକାଶ କରେହେଲ ତାର ସତ୍ୟତା ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ଉଟେର ଓପର ବିଶ୍ଵଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ମାଧ୍ୟମେ ଉଦ୍‌ସାଟିତ ହେଯେ ।

#### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. The Encyclopaedia Americana, Vol. 5. Americana Corp. Connecticut, pp. 261-263, 1979.

### ١٠- مَوْلَاهُ الْمَهَاجَهُ كَيْفَ رُلَصَتْ

٨٨ : ١٨ এবং আকাশের দিকে দেখুন, কিভাবে একে উর্জে স্থাপন করা হয়েছে ?

বিষয়টি ১৩ : ২ আয়তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

### ١- دَوَالِي الْجَبَالَ كَيْفَ تُوْكَنْ

٨٨ : ١٩ এবং পর্বতমালার দিকে দেখুন, কিভাবে একে স্থাপন করা হয়েছে ?

বিষয়টি ১৩ : ৩ আয়তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

### ٤- دَوَالِي الْأَرْضِ كَيْفَ سُلَّطَتْ

٨٨ : ২০ এবং ফুতলের দিকে, কিভাবে একে সমতল করা হয়েছে ।

বিশ্ব চরাচরের এভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ার বিষয়টি ২ : ২২ ও ১৩ : ৩ আয়তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

### ٥- دَوَالِي الْفَجُورِ

৮৯ : ১ শপথ উবার

দিনের সূচনা অর্ধাং প্রত্যুষ; বিষয়টি নিয়ে ২ : ১৮৭ আয়তের আওতায় আলোচনা করা হয়েছে ।

٦- أَلْكَوْتُرَ كَيْفَ نَعَلَ رَبَكَ بِعَادَ

٧- لَرَمَ زَكَتِ الْمَسَادَ

٨- أَلْيَ لَمْ يُخْلِقْ مِثْلَهَا فِي الْمَلَادِ

৮৯ : ৬-৮ দেখেছে কि তোমার প্রতিপালক আদ জাতির লোকদেরকে কী করেছিলেন, কী ঘটেছিল ইরাম নগরীর ভাগ্যে বে নগরে নরনাত্তজাম জতপ্রেণীর সমতুল্য পৃথিবীর আর কোন দেশে নির্মিত হয়নি ?

এই আয়াতে আদ জাতির লোকদের আল্লাহ যে শান্তি প্রদান করেছিলেন তার কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়নি । এই আদ জাতির লোকদের রাজধানী ছিল ইরাম বা আরাম নগর । এই নগরে ছিল অতুল সৌধশ্রেণী । অনেকে মনে করেন ইরাম ছিল > আদ -এর পিতামহের নাম । আর আদ জাতির লোকজনের চেহারা ছিল উন্নত ।

আদ জাতির লোকের ওপর ঐশী শান্তির বিবরণ আয়াত ୪୧ : ୧୫-୧୭ তে দেওয়া হয়েছে ।

### ٦-وَكُسُورَ الْبَيْنَ بَلْبَلًا لِّكَفَرَ يَا أَوَادٌ

୪୧ : ୧ আর ছামূদ জাতির লোকেরা যারা বিশাল শিলাখণ্ড কেটে উপত্যকা প্রদেশে গৃহ নির্মাণ করে ...

এই আয়াতে ছামূদ (সেমিটিক) জাতির লোকদের কথা বলা হয়েছে । আর বিষয়টি ୧୧ : ୬୭ আয়াতে আলোচিত হয়েছে ।

### ٧-فَلَمَّا رَأَى أَذْكَرَ الْأَرْضَ دَعَاهُ دُنْدُونٌ

୪୧ : ୨୧ পৃষ্ঠবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে

বিষয়টি ୫୬ : ୪-୬ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

### ٨-أَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ

### ٩-وَلِسَانًا وَشَفَقَتِينِ

୧୦ : ୮-୯ আমি কী তাকে দু চক্ষু, একটি জিহবা এবং দুটি ঠোট দেইনি ?

এই আয়াত দুটিতে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচেছন যে তিনি মানুষকে চক্ষু, জিহবা ও ওষ্ঠ দিয়ে কৃত বড় নিয়ামত দান করেছেন । চক্ষু দিয়ে মানুষ দেখে যার পদ্ধতি হল দৃষ্টি বন্ধুর ছায়া চোখে পড়ে যা মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতায় মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় । এ বিষয়ে ২ : ୨୦ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে । মানুষের উন্নততর চিন্তা ও গবেষণা শক্তি মস্তিষ্কের মাধ্যমে রয়েছে বলে বাকি সকল সৃষ্টি জীব থেকে শ্রেষ্ঠ ।

জিহবার দুটি অংশ যথা-সামনের দিকের দুই-তৃতীয়াংশ এবং পেছনের এক-তৃতীয়াংশ । এ দু অংশের V নমুনার সংযোগ স্থলে ৭ থেকে ୧୨টি বিশেষ উচু

কোষগ্রস্তি রয়েছে যার প্রত্যেকটির চারপাশে নালার মত খাদ রয়েছে এবং দুপাশ থেকে স্বাদ প্রমিণনের মুখ এসে পিলেছে। জিহ্বার অগভীর ও দু পাশে লাল ছোট ছোট বিশেষ কোষগ্রস্তি যার চার রকম স্বাদ রয়েছে— পিটতা, সবগাজতা, তিক্ততা এবং অস্ফুটতা।

জিহ্বার ব্যবহার তিন প্রকার : (১) জিহ্বা খাদ্যব্য দাঁতের নীচে ঠেলে দেয় যাতে দাঁত চিবুতে সক্ষম হয় এবং যা পরে নরম ডেলা হয়ে গিলতে সহজ হয়। (২) জিহ্বা স্বাদ প্রাপ্ত করে খাকে এবং জিহ্বার স্পর্শ ক্ষমতাও বৃদ্ধি উন্নত। (৩) জিহ্বা কথা বলতে সর্বাধিক সাহায্য করে।

প্রথম দুটি কাজ সকল প্রাণীর বেলায় দেখা যায়। কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই রয়েছে। জিহ্বা, তালু ও ঠোটের বিভিন্ন রকম ব্যবহারে সৃষ্টি শব্দ কথায় পরিণত হয়। তাই ঠোট দুটির কথাও এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ গলার শব্দ প্রকোষ্ঠে তৈরি হয় যা মুখের ডিতর দিয়ে যাওয়ার সময় জিহ্বা, ঠোট, তালুর সমবর্যে নানা রূপ শব্দ বা সূর তৈরি করে যার ফলে কথা ও গানের সৃষ্টি হয়।

### তথ্যসূত্র :

1. The New Encyclopaedia Britannica, Helen Hemingway Benton, Publisher, P. 91-116. 1978.

## ۱۰- ﴿وَالْمُنْسَى وَفُصْلَهَا﴾

٩١ : ١ سُر্ব ও তার উভাপের শপথ,

এ বিষয়টি ৭১ : ১৬ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

## ۱۱- ﴿وَالْقَبْرِ إِذَا تَلَهَا﴾

٩١ : ٢ চন্দের শপথ যখন সে (সূর্বকে) অনুসরণ করে।

এ বিষয়টিও ৭১ : ১৬ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

## ۱۲- ﴿وَالثَّمَآءَ وَمَابَنَهَا﴾

৯১ : ৫ শপথ আকাশের এবং যিনি এটি নির্মাণ করেছেন তাঁর,

এ বিষয়টি ২ : ২৯ আয়াতে এবং পরিশিষ্ট-১ আলোচনা করা হয়েছে।

## ۱۳- ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّنَهَا﴾

৯১ : ৬ আর পৃথিবী এবং যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন তাঁর শপথ।

এ বিষয় দুটি ২ : ১৬৪ এবং ২ : ২২ ও ১৩ : ৩ আয়াতসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবী সূর্যের একটি এহ যার গোলাকার পৃষ্ঠের আয়তন ২০.১ কোটি বর্গমাইল। এটা আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি যা নিজের মেরুদণ্ডের চারপাশে ঘুরে এবং সূর্যের চার পাশে নিজস্ব কক্ষ পথে পরিক্রমণ করে যার ফলে ঝাতু ও দিবা-রাতির পরিবর্তন হয়। আরও রয়েছে চাঁদের আলো, সূর্যের আলো, বিভিন্ন রং ও সৌন্দর্য, পৃথিবীর আবহাওয়া, বায়ু প্রবাহ, মেঘমালা, বৃষ্টি ও বজ্রপাত, পাহাড় পর্বত, গাছপালা, জঙ্গল, এবং কোথায়ও সবুজের মেলা আবার কোথায়ও মরুভূমি এ সবই আল্লাহর দান। তারপর পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি জৈব, অজৈব ও প্রাণীকুল রয়েছে আর এ সবার উপরে খিলাফত দেওয়া হয়েছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে।

## ۱۴- ﴿فَكُلَّ بُوْهٔ نَعَّصُ وَهَا ۚ ۚ فَلَدَّ مَدَّ رَعَّاهُ حَرَّهُمْ بِيَدِ شَيْءِهِمْ﴾

## فَسَوْهَا

৯১ : ১৪ কিন্তু তারা মাসুলকে অঙ্গীকার করল এবং তাকে (বী উটকে) কেটে কেলল। তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে খাস করে একাকার করে দিলেন।

ছামুদ নবীর লোকদের প্রসংগে এই আয়াতটি এসেছে। বিষয়টির উপর আয়াত ১১ : ৬৭তে আলোচনা করা হয়েছে।

### ٠ وَإِنَّ لَنَا لِلْأُخْرَةَ وَالْأُولَى٠

৯২ : ১৩ আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।

ইহজগতের সমাপ্তি অর্থাৎ আধিগত সম্পর্কে আয়াত ৮২ : ২, ৩এ এবং প্রারম্ভ সম্পর্কে আয়াত ২ : ১৬৪ ও পরিশিষ্ট ১ ও ২ এ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

### ٠ وَالثَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ٠

৯৫ : ১ শপথ ‘তীব’ ও ‘যাত্রুন’-এর-

*Ficus carica* প্রজাতির ডুমুর গাছ পঞ্চম এশিয়ার স্থানীয় একটি উষ্ণিদি। এখান থেকে এটা ডুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ডক্ষণযোগ্য ফলের কারণে সেখানে কমপক্ষে ৫০০০ বছর<sup>১</sup> ধরে এই ডুমুরের চাষ করা হয়। এর ফলে উচ্চমাত্রায় শর্করা রয়েছে (প্রায় ৬৪%), এবং এটা ক্যালসিয়াম, লৌহ ও তামা সমৃদ্ধ।<sup>২</sup> এই ফল উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর এবং কাঁচা অথবা মিছরিতে পরিণত করে খাওয়া যায়। এই ফল দিয়ে জ্যাম তৈরি, চোলাই করে মদ তৈরি কিংবা টিনজাতও করা যায়। এই ফল থেকে তৈরি সিরাপ রেচক (ওষুধ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলামী শাসনামলের একেবারে গোড়ার দিকে ফলটি বাহ্যিত সুপরিচিত ছিল এবং আরববাসীরা একে খাদ্য ও ঔষুধ হিসেবে গ্রহণ করত। তিনি থেকে পাঁচটি লতিযুক্ত বড় বড় ডুমুর পাতার গঠন বিন্যাস কিছুটা মানুষের হাতের ন্যায় এবং সম্ভবত এ কারণে প্রাচীন ব্রিটেন চিক্কলা ও ভাকর্বে বিহুৎ জননেন্দীয়সমূহকে এর পাতা দিয়ে ঢেকে রাখার একটি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।<sup>৩</sup>

বাইবেলে ডুমুর বৃক্ষের অনেকবার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কুরআনে একটি শপথ হিসেবে মাত্র একবার উল্লেখিত হয়েছে এবং জলপাই, সিনাই পর্বত ও পবিত্র মক্কানগরীসহ এই আয়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে। ডুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও নিকট প্রাচ্যে জলপাই-এর গুরুত্ব সম্পর্কে আয়াত ৬ : ৯৯ এ আলোচনা হয়েছে।

#### তথ্যসূত্র :

1. G. Usher, A Dictionary of Plants used by Man. Constable and Company Ltd. London, 1974.
2. The Encyclopaedia Americana, International edition, Vol.-11, p. 193, 1979.
3. B. Brouk, Plants consumed by man, Academic press, London, 1975.

٠٠٠-لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَصْوِيرٍ

৯৫ : ৪ আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।

এ বিষয়টি ৩ : ৬ ও ৬ : ২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١-إِنَّمَا يُعَصِّمُ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۲-خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقَةٍ ۝

٣-إِنَّمَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝

٤-الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ ۝ ۵-عَلِمَ الْإِنْسَانُ مَا لَفْتَ يَعْلَمُ ۝

৯৬ : ১-৫ পড় (হে নবী!) তোমার রবের নামসহ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে ঝুলন্ত এক জ্বাট বাঁধা পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।  
সুতরাং, পড়, তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না।

উপরের এই পাঁচটি আয়াতই কুরআনের নাখিল করা সর্বপ্রথম অংশ যা মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর প্রথম নাখিল হয়।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে কুরআনে সর্বপ্রথম জ্ঞান অর্জনের উপর সর্বোচ্চ শুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে এতদস্ত্রেও আজ বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান লিখতে ও পড়তে জানে না।

আরো লক্ষণীয় যে আধুনিক জ্ঞানের আলোকে আবিষ্কৃত মানব সৃষ্টি রহস্য প্রথম নাখিল করা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ যে রব এ বিষয় ১ : ২ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলাক শব্দের বৈশিষ্ট্য ও শুরুত্ব নিয়ে ২৩ : ১২-১৪ আয়াত সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ যে সর্বাধিক অনুগ্রহশীল তা ১ : ১ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াতে কলমের উল্লেখ প্রণিধান যোগ্য। মানুষ একমাত্র প্রাণী যে কলমের ব্যবহার জানে এবং কলম জ্ঞান অর্জন ও চর্চার সহায়ক। কলমের সাহায্যে অর্ধাংশ লেখার মাধ্যমে মানুষ তার লক্ষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার এবং মানসিক চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে যা নিজের ও পরবর্তী বংশধরদের জন্য আমানত হিসেবে থেকে যায়। কলমের বিষয়টি ৬৮ : ১ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখার ফলেই আজকাল বই, পত্রিকা, রেডিও, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে  
মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রচারিত হচ্ছে।

١- إِذَا رُزِّلَتِ الْأَرْضُ زِنَّالَهَا

٢- وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

১৯ : ১-২ পৃথিবী যখন জীবগভাবে আন্দোলিত হবে আর পৃথিবী তার  
মধ্যকার সকল বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে;

এই বিষয়টি ৮৬ : ১২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٣- وَكُونُ الْجَبَالُ كَالْمِنْ الْمُنْغُوشُ

১০১ : ৫ এ পর্বতসমূহ হবে খুনিত রংগিন পশমের মত;

আয়াত নং ৫৬ : ৪-৫ এ এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

٤- وَالْعَصْرِ

১০৩ : ১ মহাকাশের শপথ,

আল্লাহ এখানে সময়ের নামে শপথ করছেন। সময় এমন একটি বিষয় যা  
বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসুক্য জাগায়। সময় কী অসীম  
বা সার্বভৌম, না অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল? সময়ের কি কোন শুরু বা  
সমাপ্তি আছে?

সাধারণ মানুষ সময়কে সার্বভৌম অসীম বলে মনে করে। অর্থাৎ কেউ  
দ্যুর্ঘটনাবলী সময়ের বিরতিকে দুঁটি ঘটনার মধ্যবর্তীকালকে পরিমাপ করে। এবং  
যে কেউই তার পরিমাপ করুক না কেন এই সময় একই হবে। তবে শর্ত  
থাকবে যে তার একটি উন্নতমানের ঘড়ি থাকতে হবে। সময় ব্যাপ্তি থেকে  
সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বাধীন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এই ধারণার উপর  
প্রতিষ্ঠিত যে মুক্তভাবে পরিচালনরত সকল পর্যবেক্ষকগণের জন্য বিজ্ঞানের  
বিধানাবলি একই হওয়া বাস্তুনীয়, তা তাদের গতি যাই হোক না কেন।<sup>১</sup>  
আপেক্ষিক তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, অদ্বৈতীয় সার্বভৌম সময় বলতে  
কিছু নেই। কিন্তু এর বিপরীতে প্রত্যেক ব্যক্তির সময় পরিমাপের নিজস্ব পদ্ধা  
রয়েছে এবং তা নির্ভর করে তিনি কোথায় আছেন এবং কিভাবে চলাচল

କରଛେ । ବ୍ୟାଣି ଓ ସମୟ ହଞ୍ଚେ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ । ସବୁ ଏକଟି ବସ୍ତୁ ଚଲମାନ ହୁଏ ଅଥବା ଏକଟି ଶକ୍ତି କାଜ କରେ ତଥବା କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକତାବେ ବର୍ଣ୍ଣନାଯୋଗ୍ୟ ଅନବର୍ଜ୍ନେ ବ୍ୟାଣିକାଳେର ବକ୍ରତାକେ ପ୍ରଭାବାବ୍ଧିତ କରେ । ପାଲାକ୍ରମେ ବ୍ୟାଣିକାଳେର ଗଠନ କାଠାମୋ ଯେ ପଥେ ବସ୍ତୁ ଚଳାଚଳ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି କାଜ କରେ, ତା ପ୍ରଭାବାବ୍ଧିତ କରେ । ଏହି ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱେ ଯା କିଛୁ ଘଟେ ତାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଣି ଓ କାଳ କେବଳମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ବିଭାବର କରେ ନା, ନିଜେରା ପ୍ରଭାବାବ୍ଧିତ ହୁଏ । ବ୍ୟାଣି ଓ କାଳ ସମ୍ପର୍କେ ଧାରଣା ବ୍ୟତୀତ ସେମନ କେଉ ଏହି ବିଶ୍ୱେ ଘଟନା ସମ୍ପର୍କେ କଥା ବଲତେ ପାରେ ନା ତେମନି ସାଧାରଣ ଆପେକ୍ଷିକତାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଆମରା ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯେ ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱକେ ଜାନି ତାର ସୀମାର ବାଇରେର ବ୍ୟାଣି ଓ କାଳ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରତେ ଯାଓୟା ଅର୍ଥହିନ ହବେ । ଛାଯାପଥସମୂହ ପରମ୍ପରା ଥେକେ ଦୂରେ ମରେ ଯାଞ୍ଚେ ଏବଂ କୋନ ଏକ ସମୟେ ଦୂର ଅଭୀତେ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଛାଯାପଥ ସମୂହର ମଧ୍ୟକାରୀ ଦୂରତ୍ବେର ପରିମାଣ ଅବଶ୍ୟଇ ଶୂନ୍ୟ ଛିଲ । ମହାନାଦ (Big Bang) ଘଟନାର ସମୟ ସବୁ  $t=0$  ତଥନ ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱେର ଘନତ୍ତ୍ଵ ଓ ବ୍ୟାଣିକାଳେର ବକ୍ରତା ଅସୀମ ହୁୟେ ଥାକତେ ପାରେ । ଏକାଙ୍ଗ ଏକଟି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ହଞ୍ଚେ ଏମନ ଉଦ୍ଦାହରଣ ଯେଥାନେ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ଵ ନିଜେଇ ଅଚଳ ହୁୟେ ପଡ଼େ । ଏକାଙ୍ଗ ଅବଶ୍ୟକେ ଏକକ ହିସାବେ ଅଭିହିତ କରା ହୁଏ । ବସ୍ତୁତ ଆମାଦେର ସକଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ଵ ଏକାଙ୍ଗ ଏକକ ଅବଶ୍ୟାୟ ଏସେ ଭେଦେ-ପଡ଼େ, କୋନ କାଜେ ଥାଏଟେ ନା । ଏଇ ଅର୍ଥ ଏହି ଦାଢ଼ୀଯ ଯେ ଏମନକି ଯଦିଓ ମହାନାଦ (Big Bang) -ଏର ପୂର୍ବେତେ ଆରା ଘଟନା ଛିଲ ତବୁଓ ପାରେ କୀ ଘଟେ ତା ନିର୍ଧାରଣେର ଜଣ୍ୟ କେଉ ସେ ସକଳ ଘଟନାକେ ବ୍ୟବହାର କରତେ ପାରେନି । କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ୍ୟାଣୀ କରାର କ୍ଷମତାଇ ମହାନାଦ-ଏ ଏସେ ଅଚଳ ହୁୟେ ପଡ଼ତ । ଅନୁରୂପତାବେ ଯଦି ଆମରା କେବଳମାତ୍ର ଜାନତେ ପାରି ଯେ ମହାନାଦ-ଏର ପର ଥେକେ କୀ କୀ ଘଟେ ଚଲେଇଁ ଏବଂ ବାନ୍ଧବେତେ ତାଇ ହୁୟେ, ତାହଲେ ପୂର୍ବେ କୀ ଘଟେଇଁ ତା ଆମରା ନିର୍ଧାରଣ କରତେ ପାରି ନା । ଯେ ବିଷୟଟି ନିଯେ ଆମାଦେର ଯତଦୂର ଜାନାର କଥା ତା ହଞ୍ଚେ ମହାନାଦ-ଏର ପୂର୍ବେର ଘଟନାବଲିର କୋନ ପରିଣତି ଥାକତେ ପାରେ ନା । ସୁତରାଂ ଆମରା ବଲତେ ପାରି ଯେ ମହାନାଦ ଥେକେଇଁ କାଳ-ଏର ପ୍ରକୃତି

ବିଜ୍ଞାନେର ଜଗତ ଚତୁର୍ମାତ୍ରିକ, ବ୍ୟାଣିର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏର ତିଳଟି ମାତ୍ରା ରହେଇଁ ଆର କାଳକେ ନିଯେ ରହେଇଁ ଏକ ମାତ୍ରା । ବ୍ୟାଣିକାଳେର ଏହି ପ୍ରେକ୍ଷାପଟେ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାର ସୂତ୍ରସମୂହ ଏହି ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱେ ବିଦ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦେର ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କେ ଏକଟି ଗାଣିତିକ ବିବରଣ ପେଶ କରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରେ । ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାର ସକଳ ଜାନା ସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କେ ତାଂପର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଞ୍ଚେ ଏହି ଯେ ତାଦେର ଗାଣିତିକ ଗଠନ ବ୍ୟାଣି ଓ କାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଏକଟି ଭାରସାମ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ୩ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଟି ସୀମିତ ବ୍ୟାଣିକରମଶହ ଏହି ସୂତ୍ରସମୂହ ନିଜେରାଇଁ ବାମ ଓ ଡାନ, ଅଭୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା । ତବୁଓ ଆମାଦେର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭିଜନତାଯ ବ୍ୟାଣି ଓ କାଳେର ଅଭିଗ୍ରହ ଏହି ସକଳ ବିଷୟର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ସୁନ୍ପଟ

পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে ‘বায়’ ও ‘ডান’ পদ দু’টির অর্থ অদলবদল করার জন্য যদি কোন কিছু ঘটে যায় তাহলেও কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন অনুভূত হবে না। ন্যায়সমত মন-মানসিকতা সম্পন্ন ও সন্দেহজনক ব্যক্তিবর্ণের সংখ্যা এই পৃথিবীতে অসংখ্য। কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কোন অদলবদল করা হলে তা প্রচলিতভাবে একটি নতুন অবস্থানের সৃষ্টি করবে। এছাড়া, আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকবে। ভেঙে যাওয়া Humpty Dumpty (একটি ইংরেজী ছড়ার চরিত্র) লাফ দিয়ে দেয়ালের উপর সম্পূর্ণ মেরামতকৃত অবস্থায় গিয়ে বসবে। আর তাই এটা ‘কালের তীর’ সম্পর্কে ধারণা হাজির করবে।

#### তথ্যসূত্র :

1. S. W. Hawking, a Brief History of Time, Bantam Press, P. 187, 1988.
2. Ibid, P. 33.
3. Jacate Narlikor, The Structure of The Universe, Oxford University Press, P. 176, 1980.

## ٠-لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

૧૧૨ : તો તિનિ કાઉકે જન્મ દેનનિ એવં તાંકેઓ કેઉ જન્મ દેર ના ।

અત્ર આયાતટિ સાધારણ બુદ્ધિજ્ઞાનેર દૃષ્ટિતે અનુધાબન કરા સહજ નય, યા ઉદ્ભૂત કિછુર બ્યાખ્યાર જન્મ ઉંપાદક વા જન્મદાતાર અસ્તિત્વ દાબિ કરે । એકટિ શિશુર નિષ્પાપ, અબોધ જિજાસા ‘આમિ કોથા થેકે એસેછિ ?’ તથનઇ ઉન્નત ખુંજે પાય યથન સે માનવ પ્રજનનેર ધારાટા બુઝતે પારે । આમરા યદિ એહિ ધારાકે અતીતેર દિકે સ્મૃત્સારિત કરિ તાહલે કી ઘટબે । આમરા દેખતે પાઈ આદમ (આ) નામે એકજન પ્રારંભિક માનુષ આછેન યાર કથા ઇસલામે પરિચિત । પવિત્ર કુરાનેર ઉળ્લિખિત આછે યે, આસ્તાહું આદમકે (આ) માટી થેકે સૃષ્ટિ કરેછેન એવં તાર ભિતરે તૉર રહેર એકટા અંશ ફુંકે દિયેછેન-એડાબેઇ તાર મધ્યે દાન કરેછેન ઈશ્રી શુણાબલિ । શિશુર આરેકટિ જિજાસાકે તથા ‘કે આસ્તાહુંકે સૃષ્ટિ કરેછેન’-સમસ્યાસંકુલ મને હતે પારે કિન્તુ આસ્તાહુંઇ એ જિજાસાર જવાબ સ્પષ્ટ ભાષાય દિયેછેન । તાહલો : આસ્તાહું કાઉકે જન્મ દેન ના એવં તિનિ નિજેઓ જાત નહેન । બ્યાપારાટિ વાભાવિકભાવે હેયાલિપૂર્ણ મને હતે પારે । એ ધરનેર હેયાલિર અસ્તિત્વ આધુનિક પદાર્થ બિજ્ઞાનેર અગ્રગતિતે ઇતિમધ્યેઇ પાઓયા ગેછે ।

એ સકલ અગ્રગતિ આમાદેર બલહે યે, બડી બડી કળા છોટ છોટ કળા દ્વારા ગઠિત એવં છોટ છોટ કળા આરો કુદ્રતર કળા દ્વારા ગઠિત । એમનકિ કુદ્રતર કળાઓઓ આવાર અધિકતર કુદ્રત વા સૂક્ષ્મ કળા દ્વારા ગઠિત । એડાબે, બત્ત જગતે કુદ્રતાર બિભિન્ન સ્તર વા પર્યાય દેખા યાય પ્રદાર્થેર ગઠને : યોગ, અણ, પરમાળુ, ઇલેક્ટ્રન એવં નિઉક્લિયાસ, પ્રોટન, નિઝ્ટન વા કોયાર્ક । મૌલિક કળાર સઙ્કાને દેખા યાય, કોયાર્કસમૂહ (ખાતિતભાવે ચાર્જકૃત કળા એવં લેપટનસમૂહ ઇલેક્ટ્રન, નિઝ્ટન, નિઉટ્રિનો ઇત્યાદિ) બર્તમાને ‘બિભિંગ બ્રુક’ તથા નિર્માણ ફલક હિસેબે સ્વીકૃત હયે થાકે યા દ્વારા મહાવિશ્વેર સકળ બસ્તુઇ ગઠિત । કોયાર્કશુલો અવશ્ય પરીક્ષાગારે દેખા યાયાનિ । બિપુલ સંખ્યક પરીક્ષાર સત્ય રયેછે યા તથનિ બ્યાખ્યા કરા સંજ્ઞ વિશે ધરે નેરા હય યે, હ્યાન્ડસમૂહ (શક્તિશાળીભાવે ક્રિયાકારી કળાસમૂહ તથા નિઝ્ટન, પ્રોટન, પિઓન ઇત્યાદિ) ખાતિતભાવે ચાર્જકૃત કોયાર્કસમૂહેર બિભિન્ન યોગ દ્વારા ગઠિત (યથા આપ કોયાર્ક, ડાઉન કોયાર્ક, ટપ કોયાર્ક, બેટમ કોયાર્ક) એવં કોયાર્ક આકારો/હિસેબે હ્યાન્ડોનિક બસ્તુ વા પ્રદાર્થેર બર્ણના ટેકસિ હિસેબે પાઓયા ગેછે । યાહોક, બિભિન્ન કારણે, યાર તિતર આમરા યાબો ના, કોયાર્કસમૂહ રયેછે બની અબસ્થાય એવં એદેરકે

কখনও দেখা যাবে না। হ্যাত্রোনসমূহকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রজেক্টাইল দ্বারা কঠিনভাবে আঘাত করা যায় যাতে করে কোয়ার্কসমূহ মুক্ত হয়ে যায় এবং দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বায়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, এভাবে এ ধরনের উচ্চ শক্তি অনেক নিউক্লিয়ার বর্জের উৎপত্তি হয় এবং কোয়ার্কসমূহ দেখা যায় না। কোয়ার্কসমূহ কখনোই দেখা যাবে না, তবুও আমরা সেগুলোতে বিশ্বাস করি। যদিও আমরা কোয়ার্কসমূহ দেখি না তবুও আমরা তাদের শুণাবলিতে বিশ্বাস করি। কোয়ার্কসমূহের অদৃশ্যমানতা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা এ ভাবে উপলব্ধি করা যায় যে- যদি ক, খ দ্বারা তৈরি হয় তবে অবশ্যই ক ভাঙলে খ-কে দেখা যাবে। এরপ যুক্তিক আমাদের সাধারণ জগতে কাজে থাট্টে পারে। কিন্তু অধি-আগবিক পদার্থের বেলায় সেটি গ্রহণযোগ্য হয় না। এখানে শক্তি উৎপাদক জেনারেটরের কথা বলা যেতে পারে, যা অদৃশ্যভাবে শক্তি উৎপাদন করবে, কিন্তু কখনও দেখা যাবে না। সুতরাং যদি বস্তুবিজ্ঞানে কোথা হতে প্রস্তুত হলো তা না জেনে আমরা 'ফান্ডামেন্টাল পারটিকেল' এর উপস্থিতি স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকি তবে কেন আমরা সুপ্রীম সৃষ্টিকর্তার অন্তিম স্বীকার করবো না যিনি কোথা হতেও সৃষ্টি হননি এবং যাকে কখনও দেখাও যায় না। আমাদের প্রয়োজন তার সিফাত জানা। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর শুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরের উপরাটি অত্য আয়াতের একটি অংশ বুঝার জন্য একটি উপলক্ষ্য মাত্র।

দেখা যাক আল্লাহ কসেন্টটি জেনারেটরের ভূমিকায় দেখা হলে আমাদের কোন সেঙ্গ মোটেই তৈরি হয় কি-না। প্রথমে আমরা জেনারেটরের যান্ত্রিক দিক পরীক্ষা করি যা 'ইলিমেন্টারি পারটিকেল'-এ প্রতিফলিত হয়েছে।

যদিও বর্তমানে পদার্থবিদগণ কোয়ার্ক, যা হ্যাত্রোনিক ম্যাটার এর গঠনকারী নিয়ে বেজায় বুশী। এ কথা বলা যায় যে, কোয়ার্ক এর অভ্যন্তরীণ গঠন আছে অর্থাৎ এটা আরেক সাব-ইউনিট দ্বারা তৈরি। তাহলে এই মৌলিকতার শেষ কোথায় ? আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের এটা এক হতবৃদ্ধিকর প্রশ্ন ! শ্রীকদের সময় হতে মানুষ বস্তুর জেনারেটরের সিরিজ আবিকার করেছে। যোগ সকল বস্তুর জেনারেটর হলো, মৌল হলো সকল যৌগের, অণু হলো মৌলের, পরমাণু হলো অণুর, নিউক্লি এবং ইলেক্ট্রন হলো পরমাণুর, কোয়ার্ক হলো নিউক্লিয়ার এবং ভবিষ্যতে কোয়ার্কও নিজস্ব এক অভ্যন্তরীণ গঠনের অধিকারী হবে। বস্তুর জেনারেটরের সক্ষান করা একটি সৃষ্টি পিয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত। একটি স্তর ছাড়ানোর পর আর একটি স্তর একই তারপর আর একটি, যখন সে স্তর ছাড়ানো হয় তখন আর একটি দেখা যায়-এভাবে চলতেই থাকে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এই

সমস্ত কণার কথা উল্লেক করেছি যাদের উচ্চমাত্রার স্থায়িত্ব আছে। অধিকতু, বহুসংখ্যক কণা রয়েছে যারা খুবই ক্ষণস্থায়ী। মৌলিক কণার পরিমাণ এত বেশী হয়েছে যে, বস্তুর জেনারেটর এর কাছে তা খুব কম তাৎপর্যপূর্ণ।

যখন একটি কাঠামো আরেকটি কাঠামোর উৎপন্ন করে তখন এই জেনারেটরের সদসরা এতটা বিশাল হতে পারে যে, জেনারেটর পদার্থটিই তার তাৎপর্য হারাতে পারে। আসল ব্যাপারটা হলো যে, আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সাথে সঙ্গতি রেখে একটা অবস্থায় এসে আমরা থেমে যাই এবং এখান থেকে বিশ্বাস করি কিছু নির্দিষ্ট কাঠামোতে কোন প্রশ্ন ছাড়াই যে কোন কাঠামো থেকে বর্তমান কাঠামোটির উত্তর হয়েছে এবং আলোচ্য কাঠামোটি সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত বা উত্তৃত হয়। কাজেই, চূড়ান্ত সাদৃশ্যে যদি ‘জেনারেটর’ এবং ‘জেনারেটেড’ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর সত্যি দেয়া না যায়, তাহলে আল্লাহর ওহী যে তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি—এ ব্যাপারটি নিজ সীমাবদ্ধতামণ্ডিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির কোন ধাপেই আমাদেরকে হতভন্ন করা উচিত নয়। এই বক্তব্যটি থেকে এই ইশারাই গ্রহণ করা সমীচীন হবে যে, বিজ্ঞানীদের রিডাকশনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি উপর্যোগী হওয়া সত্ত্বেও তা আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

আমাদের বাসস্থান এই মহাবিশ্বের স্থান ও সময়ের গঠন এবং আমাদের জীবদ্ধেহগত সীমাবদ্ধতা আর সেই সাথে আমাদের প্রয়োগকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চূড়ান্ত সন্তু আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্যটি উপলব্ধি করা সম্ভব নাও হতে পারে। আমরা শুধু আমাদের নিকট জ্ঞাত আল্লাহর কিছু শুণাবলির দ্বারাই আল্লাহকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে পারি।

### ٥-أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

১১৩ : ১ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি উষার স্তুর।

পরিত্র কুরআনের প্রায় সকল অনুবাদক ‘বিরাবিল ফালাক’কে ‘উষার প্রভু’ হিসেবে অনুবাদ করেছেন।

ফালাক শব্দের মূল ধাতুর (শব্দমূল) অর্থ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিযুক্ত করা; একটি সংকীর্ণ অর্থে উষা হচ্ছে আলাদাভাবে আহরিত একটি অর্থ। এটা অযৌক্তিক নয় যে, উষা আরো রাতের আঁধারে প্রবেশ করে উজ্জ্বল তোরের সৃষ্টি করে। আমাদের মতে, এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘ফালাক’ শব্দের শব্দমূলের অর্থের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা অধিকতর যুক্তিসংগত হবে।।

বিচ্ছিন্নকরণ অথবা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী” হিসেবে এই বাক্যাংশের অনুবাদ করাও যথোপযুক্ত হবে। এই আয়াত এরপর অধিকতর গভীর ও ব্যাপকতর তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভৃত হবে যা পরবর্তী ব্যাখ্যাতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া একটি খুবই শুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা আমাদের চারদিকে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এর অসংখ্য উদাহরণ উদ্ভৃত করা যেতে পারে। উত্তিদ রাজ্যে বীজের খোসা ভেঙ্গে বীজের অঙ্কুর উদগম হয়। এ সকল বীজের মধ্যে কোন কোনটির খুবই শক্ত বহিরাবরণ রয়েছে (যেমন খেজুর, নারকেল, জলপাই, কুল ইত্যাদি)। বীজ থেকে বের হওয়া চারাগাছের শিকড় ক্রমান্বয়ে পানির অবেশে মাটির গভীরে প্রবেশ করে, আর এর শিকড় মাটিকে ভেঙ্গে ফেলে নিচে চলে যায় এবং সূর্যের আলোর প্রত্যাশায় মাটির উপর মাথা উঁচু করে তোলে। যে সব প্রাণী ডিম পাড়ে তাদের ক্ষেত্রে যথাসময়ে ডিমের শক্ত খোলস ভেঙ্গে বাঢ়া বেরিয়ে আসে। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে পুঁ শুক্রকীট স্ত্রী ডিষ্টাশয়ে জোর করে প্রবেশের ফলে স্ত্রীর জরায়তে ভূগের সৃষ্টি করে। জন্মগ্রহণকালে শিশু মায়ের ঝিলীময় থলে থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। জরায়ু মধ্যস্থ এই থলেতে ভূণ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে।

বস্তুজগতে শিলাময় পর্বত ভেঙ্গে মাটির নিচ থেকে সবেগে পানির ঝর্ণা বেরিয়ে আসে। কোন তারী পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন হয়।

আকস্মিক প্রচণ্ড বিক্ষেরণ নামে অভিহিত একটি প্রচণ্ড প্রকৃতির ভাঙনের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে এবং এই বিক্ষেরণের ফলে হঠাতেও খুবই দ্রুত বস্তুকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে। বর্তমানে আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যা বিশারদগণ বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টির শুরুতে অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উক্তপুণ “বিশ্বের আদিযুগীয় পরমাণু” একটি প্রচণ্ড বিক্ষেরণের (মহানাদ -Big Bang নামে অভিহিত) মাধ্যমে সম্প্রসারিত হতে শুরু করে এবং ব্যাপ্তি, কাল, পদার্থ ও শক্তিসহ এই নিখিল বিশ্বের অভ্যন্তর ঘটায়।

কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত পদার্থের এই ভাঙন এলোমেলোভাবে ঘটে না। বহু সংখ্যক শক্তির সংযুক্ত কার্যক্রমে এগুলো সংঘটিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত বিধান ও তাঁর জারীকৃত হৃকুমের মধ্যে এ সকল শক্তি কাজ করে।

## পরিশিষ্ট-১

### সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ

বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, মহাবিশ্ব সম্পর্কে দু'টি সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ তাদের ধারণাকে প্রায় স্পষ্ট করেছে। ১ মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশ (অর্থাৎ প্রতিটি ছায়াপথ) অন্য প্রত্যেক অংশ থেকে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে এবং তা হচ্ছে এক অতি প্রচও গতির সাথে। যতদূরে একটি অংশ সরে যাচ্ছে ততই এর সরে যাওয়ার গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২ সমগ্র আকাশ মন আলোয় উভাসিত হয়ে ওঠে যা প্রত্যেক দিকে একই রকম দেখায়। আলোর এই বর্ণচূটা দেখে এটাই অনুমিত হয় যে খুবই নিচু তাপমাত্রায়, প্রায়  $3^{\circ}$  কিলোওয়াট ( $3^{\circ}\text{K}$ ) এর উৎপত্তি। এই দুটি পর্যবেক্ষণ একত্রে এটাই ধারণা দেয় যে মহাবিশ্বের সকল অংশ একদা পরস্পর খুব বেশী নিকটে অবস্থিত ছিল; বরুত পক্ষে অতি ক্ষুদ্র, অতি নিবিড়, অতি উচ্চ তাপমাত্রা যুক্ত গুচ্ছকারে এ সকল অংশ বাঁধা ছিল। কোন এক দূর অভীতে পরস্পর সন্তোষজনক মহাবিশ্ব এক ভয়াবহ বিক্ষেপণের অর্থাৎ মহানাদ (Big Bang) মাধ্যমে সম্প্রসারিত হতে শুরু করে এবং ব্যাপ্তিকালের অনবচেদ্যতা পদার্থ ও শক্তির অস্তিত্ব প্রদান করে। প্রথমে চারটি মৌলিক শক্তি যথা মহাকর্ষ শক্তি, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি, শক্তিশালী আণবিক শক্তি ও দুর্বল আণবিক শক্তি একত্রে সমন্বিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তাড়িত চুম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা সঞ্চারিত শক্তির চাপ একটি বৃহৎ সম্প্রসারণ বজায় রাখে। ফলস্বরূপ প্রধানত প্রোটন, নিউট্রন, ইলেক্ট্রন ও কিছু পরিমাণে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম সহযোগে প্রথমে গঠিত পদার্থ গুচ্ছ বা স্তবকের আকারে গঠিত হতে শুরু করে। প্লাঙ্ক-এর সময় (Plank's time) (Big Bang-এর  $10^{-43}$  সেকেন্ড পর)-এ অভিকর্ষ অন্য চারটি মৌলিক শক্তি থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং এ সকল পদার্থকে গুচ্ছ বা স্তবক গঠন করার জন্য আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে। রশ্মি বিচ্ছুরণের শক্তির কারণে এ সকল গুচ্ছ পৃথক হয়ে সরে যেতে থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম গুচ্ছগুলো অভিকর্ষ শক্তির কারণে সংকুচিত হতে আরম্ভ করে। এসব গুচ্ছ অথবা গ্যাসীয় মেঘমালার মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সূর্যনের এক প্রচও গতিশক্তি লাভ করে। এ সকল গতির প্রভাবের ফলে গ্যাসীয় মেঘমালা বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যেমন সর্পিল, গোলক আকার, ক্ষুদ্র বটিকাকৃতি, উপবৃত্তাকার

ইত্যাদি। এই গ্যাসীয় মেঘ দলসমূহ শেষ পর্যন্ত ছায়াপথে রূপান্তরিত হয়। প্রচণ্ড ঘূর্ণনের কারণে গ্যাসীয় মেঘদল থেকে কোন কোন গ্যাসীয় পদার্থ ছিটকে বাইরে চলে যায়। আর বাইরে নিষ্কিণ্ঠ এ সকল বস্তু অভিকর্ষের সাহায্যে একত্রিত হয়ে নক্ষত্রের সৃষ্টি করে। অভিকর্ষ শক্তি যেহেতু কেন্দ্রে বেশী বেশী পরিমাণে পদার্থ আকর্ষণ করে তাই প্রচণ্ড তাপ ও তার সাথে চাপ যুক্ত হয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছুকাল পরে তাপমাত্রা এত উচুতে উঠে যে বস্তুটি থেকে আলো উত্পাদিত হতে থাকে। এই অবস্থাকে একটি নক্ষত্রের ভূগ কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদি বস্তুটির দলা বা পিও অনেক বড় হয় তাহলে এর কেন্দ্রে তাপমাত্রা অনেক বেশী হয়। তাপমাত্রা যখন এক কোটি ডিগ্রি কিলোয়াটের সমপরিমাণ হয় তখন কেন্দ্রে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। আর যদি নক্ষত্রের পিণ্ডটি সূর্যের পিণ্ডের চেয়ে এক দশমাংশের কম আয়তনের হয় তাহলে নক্ষত্রের পিণ্ডের কেন্দ্রে তাপমাত্রা অত উচুতে উঠতে পারে না যে তা পারমাণবিক একীভবন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কেবলমাত্র মহাকর্ষীয় চাপের ফলে সৃষ্টি তাপের কারণে একটি নক্ষত্রের আলো ছড়াতে থাকে। এরূপ তাপমাত্রায় নক্ষত্রের বৎ বাদামী হয়ে যায় এবং যেহেতু নক্ষত্রটি সুন্দরুক্তির হয় তাই একে “বাদামী বামন” (Brown dwarf) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে; এরূপ স্থিতিশীল অবস্থায় ঐ সকল নক্ষত্র কোটি কোটি বছর ধরে বিদ্যমান থাকে।

নক্ষত্রিণি যদি বেশ বড় হয় এবং সূর্য পিণ্ডের ১.৪৪ গুণ ছাড়িয়ে না যায় (ক্রিটিকাল পিণ্ড-চন্দ্র শেখরের লিমিট) তাহলে প্রচুর পরিমাণ পদার্থ কেন্দ্রে জড় হয়ে তাপমাত্রা এক কোটি ডিগ্রি কিলোয়াটে বৃদ্ধি পায়, তখন পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তখন হাইড্রোজেন হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। হাইড্রোজেনের ৪টি পরমাণু মিলিত হয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু উৎপন্ন করে। যেহেতু ৪টি হাইড্রোজেন পরমাণুর রয়েছে পিণ্ডটির ০.০৩ ইউনিট যা হিলিয়ামের একটি পরমাণু থেকে বেশী, পিণ্ডের অতিরিক্ত অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা অধিক সংখ্যক হাইড্রোজেন অণুকে হিলিয়ামে রূপান্তরকরণে এবং এর রশ্মি বিচ্ছুরণে ব্যবহৃত হয়। এই পর্যায়ে নক্ষত্রের উপর দুটি বিপরীত শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। মহাকর্ষীয় শক্তি একে সংকুচিত করতে চায়, আর রশ্মি বিকীরণকারী শক্তি একে সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। দীর্ঘকাল ধরে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা হয় এবং এ দুটি শক্তির মধ্যে একটি সমতার অবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অবস্থায় একটি নক্ষত্রকে “প্রধান অনুবর্তী নক্ষত্র” নামে অভিহিত করা হয়। যে নক্ষত্রের পিণ্ড তার ক্রিটিকাল পিণ্ডের (critical mass) পরিমাণ থেকে বেশী নয় তেমন একটি নক্ষত্রের এরূপ স্থিতিশীল অবস্থায় আয়ুকালের ব্যাপ্তি দাঢ়ায় ১২০০ কোটি বছর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রশ্মি বিকীরণকারী শক্তি মহাকর্ষীয় শক্তির উপর জয়লাভ করে। নক্ষত্র এক বিশাল, বিপুল আয়তনে সম্প্রসারিত হয় এবং রক্তাত দেখায়। এরূপ অবস্থায় একটি নক্ষত্রকে “লাল দৈত্য” নক্ষত্র বলা হয়। নক্ষত্রের মূল

କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶ ପ୍ରଧାନତ ହିଲିଆମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ଏର ଚାରଦିକେ ଏକାଇବନକୃତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ-ଏର ଏକଟି ଆବରଣ ରଖେଛେ । ହିଲିଆମେର କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶ କାରନେ ଏକିଭୂତ ହତେ ଶୁରୁ କରେ, ଆର ଏର ଫଳେ ଅଧିକ ପରିମାଣେ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରେ ଦିତେ ଥାକେ । ନକ୍ଷତ୍ରିଟିର ଉପର ଏକ ଧରନେର ଅନ୍ତିରତା ବିରାଜ କରେ । ନକ୍ଷତ୍ରି ସାଥେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ତଥନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହତେ ଶୁରୁ କରେ ଏବଂ ଅନୁଭ୍ବଳ ହତେ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ପୁନରାୟ ସଂକୋଚନେର ସମୟ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହେଁ ଉଠେ । ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିର ଥାକେ ନା ଅର୍ଥାଂ ଏକଟି Cepheid ଚଳ-ଏର ମଧ୍ୟେ ଥାକେ । ଏରପା ଅବଶ୍ୟ ଏକଟି ନକ୍ଷତ୍ରକେ ମୃଦୁ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ତାରକା ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ହୁଏ ।

ସାଥେ ଅଧିକ ପରିମାଣେ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହୁଏ ତଥନ ନକ୍ଷତ୍ରେର ବହିରାବରଣ ପୃଥିକ ହେଁ ଯାଇ ଯା ଆକାରେ ମାରାତ୍ମକତାବେ ସଂକୁଚିତ ହେଁ ପଡ଼େ । ଏ ସମୟ ମହାକର୍ଷ ଏକଛତ୍ର ଆଧିପତ୍ୟ ବିଭାବ କରେ । ଘନତ୍ର ଏତ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାଯ ପୌଛେ ଯେ ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶେର ଚାରଦିକେ ଅବଶ୍ତିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନେର ବହିରାବରଣ ଭେଦେ ଯାଇ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଓ ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶ ପରମର୍ପର ଏକତ୍ରିତ ହେଁ ଏକଟି ବ୍ୟବ ଗଠନ କରେ ଯାକେ ଶ୍ରେଣୀଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଧ୍ୟତ ବସ୍ତୁ ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ହୁଏ । ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାନେ ନକ୍ଷତ୍ରଟିକେ “ସ୍ନେତ ବାମନ” ତାରକା ହିସେବେ ପରିଚିତ ଦେଇଥାଏ । Critical ପିଣ୍ଡେର ଚେଯେ ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ରେର ପିଣ୍ଡେର ପରିମାଣ କମ ହୁଏ, ତାହଲେ ପାରମାଣବିକ ଜ୍ଞାଲାନି ନିଃଶ୍ଵର ହେଁ ଯାବେ ଏବଂ ଏରପା ଆର ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହେଁ ନା । ନକ୍ଷତ୍ରଟି ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପ ବିକିରଣ କରତେ ଶୁରୁ କରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ହତେ ଥାକେ ଓ ଏକ ସମୟ ଅନୁଭ୍ବଳ ହେଁ ପଡ଼େ । ‘ସ୍ନେତ ବାମନେର’ କାର୍ବନେର କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶେ ବିପୁଲ ପରିମାଣ ଚାପେର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏରପା ଅବଶ୍ୟ ଥାକତେ ଥାକତେ ଏଟା ଏକଟା ବ୍ୟବ ହିରାର କ୍ଷଟିକେ ପରିଣତ ହୁଏ ।

ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ରେର ପିଣ୍ଡ Critical ପିଣ୍ଡେର ଉପରେ ଥାକେ ତବେ ଅନେକ ବେଶୀ ଉପରେ ନାହିଁ, ଧରା ଯାକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପିଣ୍ଡେର ୧୦ ଗୁଣ ହୁଏ ତାହଲେ ମହାକର୍ଷୀୟ ଚାପ ଏତ ବେଶୀ ହବେ ଯେ ତା ପିଣ୍ଡେର କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶେର ପକ୍ଷେ ସହ୍ୟ କରା ଥୁବାଇ କଠିନ ହବେ । ସ୍ନେତ ବାମନ ନକ୍ଷତ୍ର ତାର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ହାରିଯେ ଫେଲେ ଅଥବା ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଚାପ, ତାପ ପ୍ରଭୃତିର ଦରକଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭାଗେର ଦିକେ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ । ଏଇ ଆକଶ୍ୟକ ବିପତ୍ତିମୂଳକ ଘଟନାଯ ଏକ ବିପୁଲ ପରିମାଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯାକେ ନୋଭା (ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶେଷ-ଏର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ୍ୟ ସହସା କିଛିକ୍ଷଣେ ଜନ୍ୟ ବୁନ୍ଦି ପାଇ) ଓ ସୁପାର ନୋଭା ବିକ୍ଷେପଣ ବଲେ । ନକ୍ଷତ୍ରେର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭାଗେର ଏଇ ସଂକୋଚନ ପ୍ରଚାନ୍ଦଭାବେ ନକ୍ଷତ୍ରକେ ଚେପେ ରାଖେ ଏବଂ ସବକିଛୁକେଇ କେନ୍ଦ୍ରେର ଦିକେ ଧାକ୍କା ଦିତେ ଥାକେ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରନେର କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶସମୂହେର ବିଦ୍ୟମାନତା ଧଂସ ହେଁ ଯାଇ । ଏତୁଲୋ ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶେର ପ୍ରୋଟନେର ସାଥେ ଏକିଭୂତ ହେଁ ନିଉ୍ଟର୍ ଗଠନ କରେ । କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶ କାର୍ବନେର ସାଥେ ମିଶ୍ରିତ ହେଁ ଲୋହା ତୈରି କରେ । ଲୋହା ଶକ୍ତିକେ ଛେଦେ ଦେଇର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ଆଘାଷ୍ଟନ୍ତ୍ର କରେ ନେଇ । ମହାକର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶକେ ଆଚନ୍ନ କରେ ଫେଲେ ଏକଟି ଅତି ଘନ ପାରମାଣବିକ କେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଂଶେର ମଧ୍ୟେ ଆଛନ୍ଦେ ପଡ଼େ ଧଂସ କରେ ଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଧାକ୍କାଜନିତ ତରଙ୍ଗକେ ବିମୁକ୍ତ କରେ ।

ନକ୍ଷତ୍ରେ ରଯେଛେ କେଣ୍ଟି ଅଂଶ ଯା ନିଉଟ୍ରନ ସହ୍ୟୋଗେ ଗଠିତ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ନକ୍ଷତ୍ରକେ ନିଉଟ୍ରନ ନକ୍ଷତ୍ର ନାମେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରା ହୁଏ । ଏର ରଯେଛେ ପ୍ରତି ସିସିଟେ୧୦୧୪ ଗ୍ରାମ-ଏର ବିପୁଲ ପରିମାଣ ଘନତ୍ଵ । ଭଲିଉମ-୧ ଏର  $Cm^3$  ଆୟତନେର ଏକଟି ଘନକ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୁଡୋ ଖେଳାର ପାଶା ଯଦି ନିଉଟ୍ରନ ନକ୍ଷତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ଯାଇ ତାହଲେ ତାର ଯେ ଓଜନ ଦାଁଙ୍ଗାବେ ତା ଏହି ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୋଟ ଓଜନେର ସମାନ ହବେ । ଏହି ନିଉଟ୍ରନ ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ମହ ଏକ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ଚମ୍ପକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକେ ସାଥେ ନିଯେ ଦ୍ରୁତ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ । କଥନଓ ଏକ ସେକେଣ୍ଟେରେ କମ ଏହି କମ୍ପନେର ସମୟ ମାନୁଷେର ତୈରି ଯତ୍ନ ଥେକେ ସଠିକ ସମୟ ଜ୍ଞାପନ କରେ । ସୁତରାଂ ନିଉଟ୍ରନ ନକ୍ଷତ୍ରକେ କମ୍ପନଧାରଣକାରୀ (pulsars) ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ହୁଏ ।

ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ର ପିଣ୍ଡଟି ଆରା ବେଶୀ କ୍ଷୀତ ହୁଏ ଧରା ଯାକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଥେକେ ୧୦୦ ଅଥବା ୧୦୦୦ ଗୁଣ ବେଶୀ, ତାହଲେ ଶେଷ ବାମନ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ନିଉଟ୍ରନ ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ବାଇରେ ଧଂସପ୍ରାଣ ହୁଏ ଏବଂ ବିପୁଲ ପରିମାଣ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଧଂସାବଶେଷ ଛଢିଯେ ଦେଇ । ଆର ଏଣ୍ଣଲୋ ପୁଡ଼େ ଗିଯେ ଯେ ଆଲୋ ଛଢିଯେ ଦେଇ ତା ସୁପାର ନୋଭା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋର ଚେଯେ ବେଶୀ । ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟି ଏତ ଘନ ଥାକେ ଯେ ଏମନ କୀ ମହାକର୍ଷୀୟ ଆରକ୍ଷଣେ ଯୁଠି ଥେକେ ଆଲୋ ବେରିଯେ ଆସତେ ପାରେ ନା । ନକ୍ଷତ୍ରଟି କେବଳମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ବାଇରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ ଯାଇ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଗହରର ସୃଷ୍ଟି କରତେ ପାରେ ଏବଂ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯଥନ ଏର ସଂଗୀର କାହିଁ ଥେକେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ପିଣ୍ଡ ଏର ଉପର ଜମା କରତେ ପାରେ ଏବଂ ଏକଟି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣକାଲୀନ ଅବସ୍ଥା ଧାକା ଦିତେ ପାରେ ।

ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଆକାଶମଣ୍ଡଳୀତେ ଆରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ତୁସମ୍ମହ ହାପନ କରେଛେ ଯାଦେର ସବ କିଛି ମିଲିଯେ ଏହି ବିଷ୍ଵ ଜଗଂ ଗଠିତ ହୁଏଛେ । ଏଣ୍ଣଲୋ-ହଚ୍ଛେ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳୀ, ଉପଘର୍ହ ଦଲ, ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ନୀହାରିକାସମ୍ମହ, ଛାଯାପଥ ଓ କୋଯାସାର ।

ଏହ ଓ ଉପଘର୍ହମୂହ : ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ା ଏହ ଥେକେ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଯଦିଓ ଚାକ୍ଷୁଷଭାବେ ଦେଖା ଯାଇ ନା ତବୁ ଓ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ରଯେଛେ ଯେ କିଛୁସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ଷତ୍ରେ ନିଜକୁ ଏହ ରଯେଛେ ଯାରା ତାଦେର ଚାରଦିକେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ ଚଲେଛେ । ଏକଟି ନକ୍ଷତ୍ର (ସୂର୍ଯ୍ୟର ନ୍ୟାୟ) ଓ ଏର ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବଶିଷ୍ଟ (ସୌରଜଗତେର ନ୍ୟାୟ) ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ବନ୍ତୁସମ୍ମହ ସଂକାଚନଶୀଳ ଗ୍ୟାସେର ଏକଇ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ମେଘମାଳା ଥେକେ ଗଠିତ ହୁଏଛେ ଏବଂ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗତ କ୍ଷୀତ ହଚ୍ଛେ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଛେ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ନକ୍ଷତ୍ରେରେ ଭାସମାନ ପୁଞ୍ଜପୁଞ୍ଜ ଧୂଲାରାଶିର ମେଘ କେନ୍ଦ୍ରେ ଘନିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ରଯେଛେ । ନକ୍ଷତ୍ରମୂହ ଏହ, ଉପଘର୍ହ ପ୍ରଭୃତି ଛେଡ଼େ ଗିଯେ ଚତୁର୍ଦିକେ ପରିବେଷ୍ଟନକାରୀ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ମଣଲେର ମାଧ୍ୟମେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳୀତେ ଛଢିଯେ ରଯେଛେ ।

ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ : ଆକାଶେ ଅବହିତ ବହସଂଖ୍ୟକ ବିଚିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ରେ ବାଇରେଓ ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ରଯେଛେ ଥାରା ମହାଶୂନ୍ୟେ ସ୍ଥିତ କଷପଥେ ପରିବ୍ରମଣ କରେ । ଏହାଡ଼ା ଜୋଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର

ପାଓୟା ଯାଏ ଯେମନ ଯୁଗ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର, ତ୍ରୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ବେଶ କରେକଟି ନକ୍ଷତ୍ର ନିଯେ ଗଠିତ ବହୁବିଧ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ । ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜେ ଏକଟି ପୁଞ୍ଜେର ଏଜମାଲି କେନ୍ଦ୍ରେ ଚାରଦିକେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ ସେ ପୁଞ୍ଜଟି ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳୀର ଏକଟି ବଡ଼ ଦଲ । ଏଦେରକେ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବଲେ । ଏ ସକଳ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ମହାକର୍ଷୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ମୁକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଓ କୁନ୍ଦ ଗୋଲାକାର ପୁଞ୍ଜଙ୍କ ରଖେଛେ । ଏକଟି କୁନ୍ଦ ବଟିକାକୃତିର ବୃଦ୍ଧି ପୁଞ୍ଜର ମଧ୍ୟେ ୧,୦୦,୦୦୦ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥାନ ହତେ ପାରେ । ଧରେ ନେଯା ହୁଏ ଯେ ଏ ସକଳ କୁନ୍ଦ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜେର ଉତ୍ସପତ୍ରିଷ୍ଟଳ ଏକଇ ।

**ନୀହାରିକା ମଣ୍ଡଳୀ :** ନୀହାରିକା ବଲତେ ଗ୍ୟାସ ଓ ଧୂଲାବାଲି ମିଶ୍ରିତ ମେଘ ଦଲକେ ବୁଝାଯ । ଏ ସକଳ ବୃତ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳଗତ ମହାଶୂନ୍ୟେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଆମରା ଇତୋପର୍ବେ ଦେଖେଛି ଯେ ରଜବର୍ଣ୍ଣ ଦୈତ୍ୟାକୃତିର ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ ଗ୍ୟାସେର ପିଣ୍ଡମୂହ ଏକତ୍ର ପ୍ରବାହ ତାଡ଼ିତ ହୁଏ, ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସର ଭାଗେ ପ୍ରତି ଚାପ ଓ ତାପେର ସଂକୋଚନେର କାରଣେ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଆବର୍ଜନା ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏର ଫଳେ ନୋଭା ଓ ସୁପାର ନୋଭାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏ ସକଳ ବୃତ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳୀୟ ଗ୍ୟାସ, ଧୂଲାବାଲି ପ୍ରତ୍ବତ୍ତି ମିଲିଯେ ନୀହାରିକା ଗଠନ କରେ । ନୀହାରିକାଇ ହଚ୍ଛେ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଜଗତର ଜନ୍ମାଶାନ ।

**ଛାୟାପଥସ୍ଥିତ ଉତ୍ସବଳ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳୀ :** ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଏକଟି ଆଲଗାଭାବେ ମହାକର୍ଷ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାୟାପଥ ନାମେ ପରିଚିତ । ଛାୟାପଥସମ୍ମହ ମହାବିଶ୍ୱେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଉନିଟ ହିସେବେ ବୀକୃତ । ଏ ଯାବତ ଦଶ କୋଟିରେଓ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ଛାୟାପଥ ଚିହ୍ନିତ କରା ହୁଏଛେ । ଛାୟାପଥସମ୍ମହ ଆକାର ଓ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ଆମାଦେର ଛାୟାପଥସମ୍ମହ ଏକେ ଅନ୍ୟର ଥିଲେ ଏକ ପ୍ରତିଶତର ଗଠନ ଗଠିତ ହୁଏ ।

**କୋଯାସାର :** ମହାବିଶ୍ୱେ କୋଯାସାର ହଚ୍ଛେ ସବଚେଯେ କୌତୁହଳ ଉତ୍ୱିପକ ଓ ତେଜୋମୟ ବୃତ୍ତ । ମିଳିଗୋଯେର ମତ ଛାୟାପଥ ଯାର ରଖେଛେ ଦଶ ହାଜାର କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ତାର ଥିଲେ ଏକ ପ୍ରତିଶତର କମ୍ କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର । ଏକଟି ଆଦର୍ଶ ନମ୍ବନାର କୋଯାସାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକୀରଣ ଉତ୍ସ ହିସେବେ କାଜ କରେ । ଏକଟି ଆଦର୍ଶ ନମ୍ବନାର କୋଯାସାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକୀରଣ ଦୀପିମୟତା ଏକଟି ସ୍ଵାଭାବିକ ସର୍ପିଳ ଛାୟାପଥେ ଚେଯେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଶୁଣ ବେଶୀ ଏକାପ କୋଯାସାରର ବ୍ୟାସ ୩୦୦୦୦ ଶୁଣେରେ କମ । ଆକାଶମଣ୍ଡଳୀର ଏ ସକଳ ବୃତ୍ତ ଛାୟାପଥ ବହିଭୂତ ନଥ । ତବେ ତାଦେରକେ ଅତି ଦୂରବତ୍ତୀ ଛାୟାପଥେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରତେ ହେବ । ଦୁଃହାଜାର କୋଟି ଆଲୋକ ବର୍ଷେର ଦୂରତ୍ବେ କୋଯାସାର ସମ୍ମହକେ ଚିହ୍ନିତ କରା ହୁଏଛେ । ଏ ସକଳ କୋଯାସାର ଆଲୋର ଗତିର ୯୦% ଗତିତେ ଅପସ୍ତ ହୁଏ ଚଲେଛେ । ଏ ସକଳ ତତ୍ତ୍ଵ ହଚ୍ଛେ ଏଇ ଯେ କୋଯାସାରମଣ୍ଡଳୀ ଏକନାମ ଅନୁଶ୍ୟ ଛାୟାପଥ ଯାର କେନ୍ଦ୍ରେ ରଖେଛେ ବିଶାଲାକାରେ କୃଷ୍ଣଗହ୍ରର ।

### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. Year Book of Astronomy, 1983.
2. National Geographic, June, 1983.

## পরিশিষ্ট-২

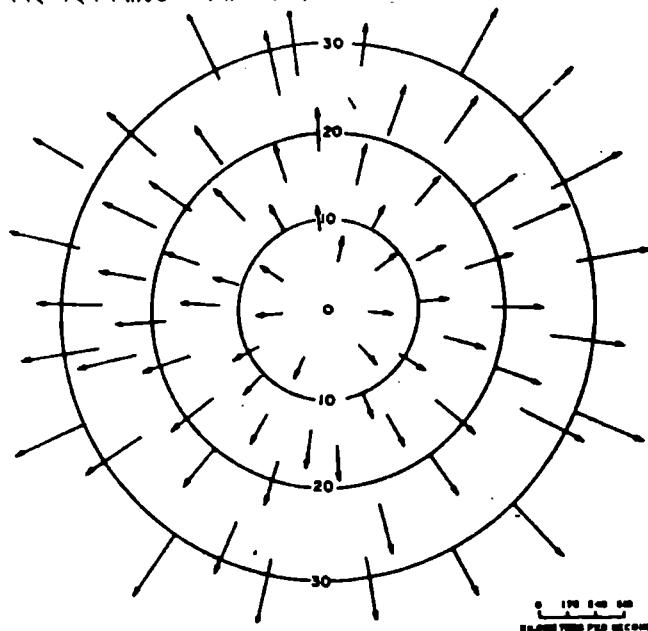
### মহাবিশ্ব সৃষ্টির আধুনিক তত্ত্ব

কীভাবে মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে? কখন এর শুরু ? আদি প্রাচীন সভ্যতা থেকে এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য মানুষের অনুসন্ধিৎসা জেগেছে এবং অতীতে এ বিষয়ে বহু কল্পকাহিনীর জন্ম হয়েছে। এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিভাশীল ব্যক্তিদের অনেককে নিয়োজিত রেখেছে। মনুষ্য প্রকৃতিকে জানা দেশ, ভূমির আবিষ্কারকদের সাথে তুলনীয় হতে পারে। এই তুলনা আবিষ্কারকের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত এই, উপগ্রহ, নক্ষত্রের মহাবিস্তারের সাথেও করা যেতে পারে। কেবল মাত্র বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে সেই বিখ্যাত ‘মহানাদ তত্ত্ব’ (Big Bang theory) এই ধার্যার ইঙ্গিত প্রদান করেছে। প্রায় ১৫ শত কোটি বছর আগে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে এই মহানাদ তত্ত্ব প্রায় নিশ্চিতভাবে কিছু ইঙ্গিত প্রকাশ করেছে।

Red Shift : জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে বেশ কিছুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির কলাকৌশল এই বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি প্রযুক্তিতে অনেক দূরের কোন নক্ষত্র বা ছায়াপথ থেকে আসা আলো দীর্ঘ সময় ধরে ধারণ করার কোশল আয়ত্ত হয়েছে। বহু দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে আলো ধারণের জন্য শক্তিশালী টেলিস্কোপ তৈরি করা হয়েছে যা ধারণকৃত আলো দ্বারা আলোকচিত্রের প্লেইটের উপর প্রতিচ্ছবি তৈরি করা যায়। আরেকটি পদ্ধতিতে আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্রাদি থেকে আসা আলো বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বিশেষ করা হয় এবং এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীগণ যে উপাদান অথবা অণু থেকে আলোর উৎপত্তি তা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের নিকট থেকে একটি নক্ষত্রের দূরে সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সকল পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রের পরিচিত “ডপলার প্রভাব” (Doppler effect) -এর সাহায্যে জানা যায় যে আলোর সমগ্র বর্ণচূটা লাল বর্ণের অথবা দীর্ঘ তরঙ্গের প্রাপ্তের দিকে স্থান পরিবর্তন করে। একেই জ্যোতির্বিদ্যায় লাল বর্ণের স্থানান্তরকরণ (red shift) বলে অভিহিত করা হয়। ১৮৮৮ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ ইচ সি ভোগেট (H.C. Voigt) অর্থম নক্ষত্রের আলোর মধ্যে red shift আবিষ্কার করেন। red shift -এর খোলামেলা ব্যাখ্যা দ্বারা আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত বৃত্তসমূহের তাপমাত্রা, আকার, গঠন কাঠামো ও গতি সম্পর্কিত তথ্য জানা সম্ভব করেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে radio astronomy নামে পরিচিত একটি নতুন ও অতি শক্তিশালী পদ্ধতির উত্তর হয়েছে। এর দ্বারা জ্যোতির্বিদগণ আকাশমণ্ডলীর বহু দূরবর্তী অঞ্চলে তাদের আবিষ্কার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর সে অঞ্চল

এতই দূরবর্তী যে এখনও পর্যন্ত চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ উপযোগী অতি শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে সে সকল নক্ষত্রের নিকট পৌছান যায়নি। এই প্রযুক্তিতে আকাশ মঙ্গলীর বস্তুসমূহ থেকে যে বেতার সংকেত পাওয়া যায় তা বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে স্থাপিত রাডারের মাধ্যমে ধারণ করা হয়। রাডার (Radar) হচ্ছে Radio Detection and Ranging-এর আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত একটি পরিভাষা। এশী বস্তুসমূহ থেকে গৃহীত বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (frequencies) বেতার সংকেতের উপর উপলাব্ধ প্রভাব কাজ করে যার ফলে এ সকল সংকেতের বিশ্লেষণ আমাদেরকে বিভিন্ন বস্তুর উৎস সম্পর্কে অতি মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। এসব হচ্ছে ক্ষুদ্র উপাদান বা অগু যা থেকে বেতার সংকেতের উৎপত্তি হয় এবং তাদের তাপমাত্রা, আকার, গঠন কাঠামো ও গতি সম্পর্কে জানা যায়।

**হাবলের নিয়ম (Hubble's Law) :** ১৯২৯ সালে হাবল ঘোষণা করেন যে ছায়াপথসমূহ আমাদের নিকট থেকে সব দিকে সরে যাচ্ছে। একটি ছায়াপথের দূরত্ব ও এর পিছনে সরে যাওয়ার বেগ-এর মধ্যে একটি রেখাগত বৈশিষ্ট্য আছে। একটি ছায়াপথের এই সরে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এর দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। (চিত্র-১)। একেই হাবলের নিয়ম বলা হয়। বিখ্যাত Mount Wilson astro laboratoryতে গবেষণাকালে হাবল ছায়াপথ পুঁজের red shift প্রত্যক্ষ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।



**চিত্র-১ :** মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একজন পর্যবেক্ষককে স্থাপন করলে মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে যে এই কেন্দ্র থেকে সকল দূরবর্তী ছায়াগথ ত্রয়োদশীয়ন গতিবেশের সাথে দুরে সরে গিয়ে অমেই দুরত বৃক্ষ করছে।

**'হাবলের ক্রুবক'** (Hubble's Constant) নামে পরিচিত বহু ছায়াপথের দূরত্ব ও বেগমাত্রার অনুপাতের সবচেয়ে ভাল হিসাব হচ্ছে প্রায় ৬১ ইউনিট (কিঃমিঃ/ সেকেণ্ড / ১০ লক্ষ আলোকবর্ষ)। এই অনুপাতের বিপরীত অবস্থাকে হাবলের কাল (hubble's time) ধরা হয়। এই কাল হচ্ছে কোন একটি ছায়াপথকে বর্তমান গতিবেগে তার বর্তমান অবস্থানে পৌছানৰ জন্য যে সময় অতিবাহিত হয়, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে যখন মহানাদের (Big Bang) ঘটনা ঘটে তখন থেকে নিরূপিত সময় হচ্ছে 'হাবলের কাল।' তদনুসারে ১৫৬ত কোটি বছর পূর্বে কোন সূর্য, নক্ষত্র, ছায়াপথ ছিল না অর্থাৎ তখন কোন আকাশগঙ্গী ও পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না।

**মহানাদ (The Big Bang)** : হাবলের অসাধারণ আবিষ্কার যে এই মহাবিশ্ব সব দিকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে-এর চৌদ্দ বছর আগে ১৯১৫ সালে আলবার্ট আইনষ্টাইন তাঁর বিখ্যাত 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' উপস্থাপন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে পুঁজের বা পিওসমূহের মহাকর্ষীয় প্রভাব মহাশূন্যে ছড়িয়ে রয়েছে এবং যথাসময়ে চলাচল করে। এই প্রভাব চতুর্মাত্রিক ব্যাণ্ডি-কাল-অনবচ্ছেদ বস্তুর বক্রতার পরিমাণের সমান। ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুসারে ভূপৃষ্ঠাকে সমতল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আইনষ্টাইনের ব্যাণ্ডি-কাল-অনবচ্ছেদতার তত্ত্ব অনুযায়ী আর কার্যকর নেই। সমান্তরাল রেখা সম্পর্কে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে যে একটি সমতলের উপর একটি নির্দিষ্ট সরল রেখার সাথে কেবল মাত্র একটি সমান্তরাল রেখা যদি সরল রেখার কোন বিন্দুর, যা সরল রেখার উপরে অবস্থিত নয়, মধ্য দিয়ে টানা যায় তাহলে অইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে তা উল্টিয়ে ফেলা হয়, উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে একটি না-ধর্মী বক্রতলের উপর ধরাকৃতি (geodesics) নামে অভিহিত বহুসংখ্যক সরল রেখা কোন একটি নির্দিষ্ট ধরাকৃতির উপরে অবস্থিত না হয়ে অন্য কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে টানা যায় এবং তা কখনও ধরাকারকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করবে না। ত্রিভুজের সকল কোণের সমষ্টি ১৮০° ডিগ্রি এই ইউক্লিডীয় উপপাদ্য একটি বক্রতলের উপর আর কার্যকর নেই। প্রাসঙ্গিক গাণিতিক সমীকরণ বিশ্লেষণ করে আইনষ্টাইন ১৯১৭ সালে বর্তুলাকার বিশ্ব তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এই মডেলে বা তত্ত্বে স্থানাঙ্ক বক্রতাবে উপস্থাপিত হয়েছে যেমন ভূ-পৃষ্ঠের উপর অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ স্থাপন করা হয়েছে এবং সময়ের অক্ষরেখা সোজা সরল পথে চলে গিয়েছে। আইনষ্টাইন উদ্ভাবিত বিশ্ব স্থির, এর মধ্যস্থিত ছায়াপথ সমূহকে সবলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এরা একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আলেকজাঞ্জার এ ফ্রিডম্যান (Alexander A. Friedmann) নামে একজন রুশীয় পদাৰ্থবিদ আবিষ্কার করেন যে

ଆଇନଟୋଇନେ ହିଂସର ତଥେ ଏକଟି ଭୁଲ ରହେছେ, ଏହି ହଙ୍ଗେ ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟାଯ ଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତିକରଣ । ଆଇନଟୋଇନେର ସମୀକରଣେ ସଞ୍ଚାର୍ୟ ସମାଧାନ ହିସାବେ ତିନି ଦୁ'ଟି ଅଶ୍ଵିତଶୀଳ ମଡେଲ ପ୍ରଣାଳେ କରେନ । ଏର ଏକଟି ହଙ୍ଗେ କାଳେର ସାଥେ ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପ୍ରଦାରଣ ଘଟିଛେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିତେ ସଂକୋଚନ ହଙ୍ଗେ । ସେ ସମୟେ କେଉଁଇ ଏହି ଐତିହାସିକ ତଥୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱାଣୀର ପ୍ରତି କୋନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେନନି ।

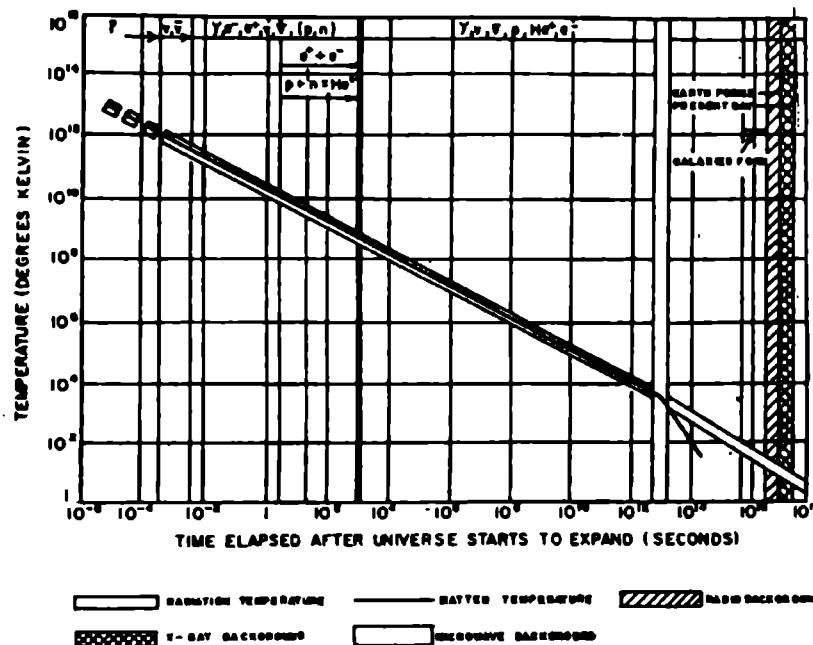
ଏଭାବେ ଫ୍ରିଡ଼୍‌ଯାନ ଓ ହାବଲ ଏକଟି ସମ୍ପ୍ରଦାରଣଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ତଥ୍ୱେର ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନ । ଶୀଗିର ବେଲଜୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଜେର୍ଜେସ ଲେମାଇଟ୍ରେ (Georges Lemaitre) ପ୍ରତାବ ଉଥାପନ କରେନ ଯେ ଆମାଦେର ଏହି ବିଶ୍ୱ ଅତି ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାର ଏକତ୍ରେ ଠେସେ ଥାକା ଏବଂ ଅତି ମାତ୍ରାର ତାପୀୟ ଅବଶ୍ୟ ଥେକେ ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ କରେଛେ । ଏରପା ଅବଶ୍ୟକେ ‘ବିଶ୍ୱର ଆଦିଯୁଗୀୟ ପରମାଣୁ’ ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ହ୍ୟ । ପ୍ରତି ବିକ୍ଷୋରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନାଦ (Big Bang) ଦ୍ୱାରା ସଂଘଟିତ ଅତି ଉଚ୍ଚମାତ୍ରାର ଉତ୍ତଣ୍ଡ (୧୦୧୩ ଡିଗ୍ରି କିଲୋଯାଟ୍), ଅତି ଘନ ଓ ଅତି ଶୁଦ୍ଧାକୃତିର ବିଶ୍ୱର ଆଦିଯୁଗୀୟ ପରମାଣୁର ସମ୍ପ୍ରଦାରଣେର ସାଥେ ସାଥେ ମହାବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଶୁରୁ ହେଁଥେବେ ।

**ହିଂସର ଅବଶ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵ (The Steady State Theory) :** ୧୯୪୮ ସାଲେ ଓ ଜନ ବ୍ରିଟିଶ ତାତ୍ସିକ ହାରମାନ ବ୍ରୋନ୍ଡ (Hermann Bondi), ଟମାସ ଗୋଲ୍ଡ (Thomas Gold) ଓ ଫ୍ରେଡ ହେୟଲ (Fred Hoyle) ଏହି ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ବିକଳ୍ପ ତତ୍ତ୍ଵ ଉପତ୍ତାପନ କରେନ । ବିଶ୍ୱର ହିଂସର ଅବଶ୍ୟ ତଥ୍ୱ ହାବଲେର ନିୟମକେ ଅବିକଳ ରେଖେ ଏହି ବିଶ୍ୱ କ୍ରମାଗତ ସମ୍ପ୍ରଦାରିତ ହେଁଥେ ଚଲେଛେ, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ଶୁରୁର ( $t=0$ ) ଅଥବା ସମାପ୍ତିର କୋନ ଉଦ୍ଦାହରଣ ନେଇ । ଦାର୍ଶନିକଭାବେ ‘କୋନ ଶୁରୁ ବା କୋନ ସମାପ୍ତି ନେଇ’ ତତ୍ତ୍ଵ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଗାଣିତିକଭାବେ ଏହି ମହାବିଶ୍ୱ ପଦାର୍ଥୀର କ୍ରମାଗତ ସୃଷ୍ଟିର ଫଳେ ଉତ୍ତ୍ରତ ହେଁଥେ କାରଣ, ମହାବିଶ୍ୱ ଏକ ଅବିରାମ ଘନତ୍ ବଜାୟ ରେଖେ ସମ୍ପ୍ରଦାରିତ ହଙ୍ଗେ । ପଦାର୍ଥୀର କ୍ରମାଗତ ସୃଷ୍ଟିର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଧାନେର ଲଂଘନକେ ନେତିବାଚକ ଶକ୍ତିର ବିକ୍ଷୁରଣେର ଏକଟି ଭାଗାରେର କଳନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧ କରା ହେଁଥେ, ଏହି ବ୍ୟବଶ୍ୟକେ G-field ବଳୀ ହ୍ୟ ।

୩<sup>୦</sup> କିଲୋଓୟାଟ୍ ପଚାଦହାନେର ବିଚୁରଣ ଓ ମହାନାଦ ତତ୍ତ୍ଵର ନିଚିତ ଧ୍ୟାନ ୪ ୧୯୪୬ ସାଲେ ଜର୍ଜ ଗ୍ୟାମୋ ଏକଟି ମହାନାଦୀ (Big Bang) ଫଳେ ସଂଘଟିତ ଆଦିଯୁଗୀୟ ବିକ୍ଷୋରିତ ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରାଗତ ଅଂଶେର ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଧାରଣ ଏବଂ ଏର ଫଳାଫଳ ଆବିକାରେର ସାହିସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ । ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଧାରଣେର ବିତ୍ତାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବେଶ ଚିନ୍ତାକର୍ଷକ । ଏଟା ଖୁବି ବିଶ୍ୱଯକର ଯେ ଏତ ନୀର୍ଧକାଳ ପୂର୍ବେ କୀ ଘଟେଛିଲ ସେ ସମ୍ପର୍କେ କୀ ପରିମାଣ ନିର୍ଭରତାର ସାଥେ ଏକଟି ସିଙ୍କାଣ୍ଡେ ଉପନୀତ ହୁଏଥା ସମ୍ଭବ । ବିଶ୍ୱର ଆଦିଯୁଗୀୟ ପରମାଣୁକେ ଏକଟି ଅନ୍ତର୍ତ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଘନମାତ୍ରାର ଏକତ୍ରେ ସଂବନ୍ଧ କରା ହେଁଥିଲି । ଏକ ତ୍ୟାବହ ପ୍ରତି ବିକ୍ଷୋରଣେ ପର ମହାବିଶ୍ୱ ଶୀତଳ ହତେ ଶୁରୁ କରେ । ଜର୍ଜ ଗ୍ୟାମୋ (George Gamow) ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱାଣୀ କରେନ ଯେ ଉତ୍ତଣ୍ଡ ଯୁଗେ

স্থিতিশীল রশ্মি বিচ্ছুরণ শীতল হয়ে পড়ে। পচাদভূমির বিচ্ছুরণ হিসেবে এমনকি বর্তমান কালেও তা দৃষ্টিগোচর হয়। এই বিচ্ছুরণ বেতারের অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যথা প্রায় ২ মি. মি. পর্যন্ত উঠে এবং এর অনুরূপ ৩০ ডিগ্রি কিলোওয়াট তাপমাত্রার কালো রশ্মি বিচ্ছুরণ হয়। ১৯৬৫ সালে আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীজ-এর দু'জন পদার্থবিদ আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias) ও রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) ৩০ ডিগ্রি কিলোওয়াট তাপমাত্রার পচাদভূমির বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করে এক যুগান্তকারী ঘটনার জন্ম দেন। আর এই বিচ্ছুরণ ছিল মহানাদের (Big Bang) অবশিষ্ট যৎসামান্য পরিমাণ অংশ মাত্র। এই আবিষ্কার “স্থির অবস্থা তত্ত্বের” (The Steady State Theory) এবং প্রতিষ্ঠিত মহানাদ তত্ত্বের উপর ছিল এক চরম আঘাত।

ছায়াপথ পুঁজি, নক্ষত্রমণ্ডলী ও গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি : মহানাদের ফলে ছায়াপথ পুঁজি, নক্ষত্রমণ্ডলী ও গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কালের শুরুতে যা ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল তাই এখন একটি সংগঠিত পদ্ধতির আকার পরিশৃঙ্খ করেছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের পর এক সেকেণ্ডের মধ্যে তাপমাত্রা ১০১০ ডিগ্রি কিলোওয়াটে নেমে আসে। এই অবস্থায় মহাবিশ্ব কেবলমাত্র অযৌগিক পদার্থ যেমন প্রোটন, ইলেক্ট্রন, নিউট্রিনো ও এর বিপরীত পদার্থ ধারণ করে। ১০০ সেকেণ্ড পরে তাপমাত্রার আরও পতন হয় এবং ১০৯ ডিগ্রি কিলোওয়াটে এসে দাঁড়ায়। প্রোটন ও নিউট্রন এই তাপমাত্রায় একত্রিত হয়। হালকা উপাদানের কেন্দ্রী অংশ যেমন হাইড্রোজেনের আইসোটোপ হিলিয়াম ও লিথিয়াম গঠিত হয়। হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ ডিউটেরিওন হচ্ছে প্রথম পারমাণবিক একত্রীভবন, এতে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। তারপর ২টি প্রোটন ও ১টি নিউট্রন একত্রিত হয়ে একটি হিলিয়াম আইসোটোপের কেন্দ্রী অংশ গঠন করতে পারে। এই প্রক্রিয়া প্রায় ১০০০ সেকেণ্ড পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তাপমাত্রা ১০৮ ডিগ্রি কিলোওয়াটে নেমে এলে এই প্রক্রিয়ার বিরতি ঘটে। এত নিচু তাপমাত্রায় পারমাণবিক বিকিরণ সম্ভব হয় না। এই পর্যায়ে মহাবিশ্বে ফোটন, প্রোটন, নিউট্রিনো, ইলেক্ট্রন ও হিলিয়ামের কেন্দ্রী অংশ বিরাজ করে। পারমাণবিক সংশ্লেষণে সকল নিউট্রন নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং মহাবিশ্বের ঘন পিণ্ডের ২৫% থেকে ৩০% হিলিয়ামের কেন্দ্রী অংশে ঝুঁপান্তরিত হয়।

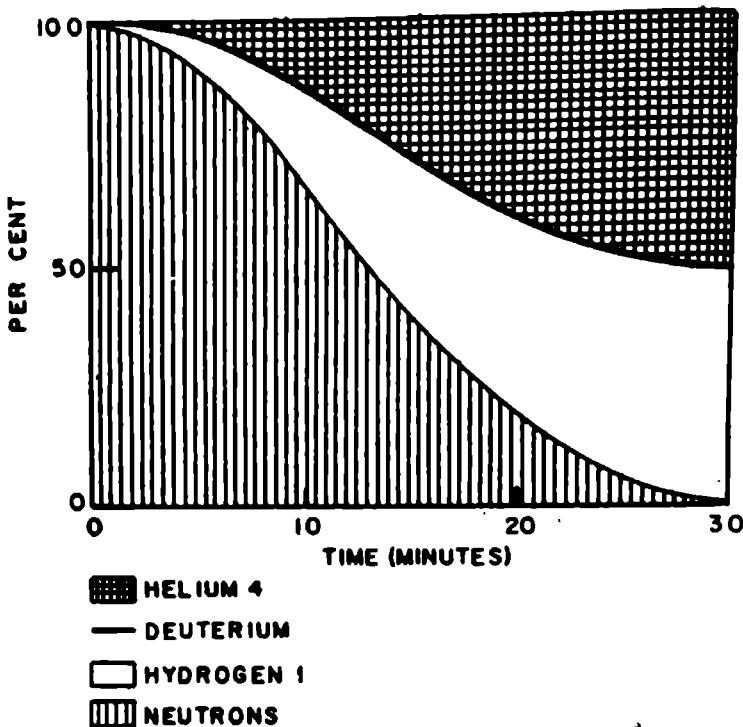


চিত্র-২

চিত্র ২ : মহানাদ (Big Bang)-এর পর পদার্থের সৃষ্টির একটি সরল চিত্র।

পরবর্তী ১০ লক্ষ বছরে মহাবিশ্ব যেমন সম্প্রসারিত হয় তেমনি শীতল হতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়া তাপমাত্রা  $3000^{\circ}$  কিলোওয়াটে নেমে আসা পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময় প্রোটন ইলেক্ট্রনকে ধরে ফেলে হাইড্রোজেন পরমাণু গঠন করে। এই পর্যায়কালে কেবলমাত্র হালকা উপাদান গঠিত এবং অভিকর্ষ শক্তি দ্বারা পদার্থ ক্রমান্বয়িত মূলকভাবে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে প্রথমে ছায়াপথ পুঁজে এবং শেষে বর্তমানে পরিদৃষ্ট ছায়াপথ ধরনের বন্ধুসমূহে এই ক্রিয়া চলতে থাকে। (চিত্র-৩)। মহাকর্ষীয় অস্থিরতা তত্ত্বের সমস্যা হচ্ছে এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না কেন ছায়াপথ পুঁজ পাক থেয়ে থেয়ে ঘোরে এবং কোথা থেকে কৌণিক ভরবেগের সৃষ্টি হয়। বিকল্প তত্ত্বের সবশেষ বিশ্লেষণে বিশ্ব জগত সৃষ্টি সংক্রান্ত একটি অপরিহার্য আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে যা এই নিখিল বিশ্বের উদ্ভব কালে বিদ্যমান ছিল। যাহোক, এই চিত্রটি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

**নক্ষত্রমণ্ডলী :** একটি নক্ষত্রের মধ্যকার বিভিন্ন পর্যায়ের অনুক্রম পরিশিষ্ট-১-এ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হালকা মৌলিক পদার্থের গঠন সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পারমাণবিক সংশ্লেষণ তত্ত্ব প্রমাণ করে যে সাধারণ নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগ ভারী পদার্থ দ্বারা গঠিত।



চিত্র-৩

মহানাদের (Big Bang) পর অথবা ৩০ মিনিটে তাপীয় পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কিছুসংখ্যক প্রাথমিক পরমাণুর কেন্দ্রী অংশ ও সূদ্র সূদ্র বস্তুর সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে এটা ধারণা করা হয় যে নক্ষত্রমণ্ডলগত মহাশূন্যে সূদ্র সূদ্র গ্যাসীয় মেঘমালা ও মহাজাগতিক ধূলিকণা থেকে ঘনীভবন প্রক্রিয়া সূর্য ও শ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। ছায়াপথ পুঁজের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার শত শত কোটি বছর পর প্রায় ৫০০ কোটি বছর পূর্বে সূদ্রাকারের গ্যাসীয় মেঘমালা ও ধূলিকণা ঘনীভূত হওয়ার প্রাক্কালে শুরু থেকেই পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে। আর যত বেশী ঘনীভূত হয় ততই এর পাক খেয়ে ঘোরার গতি বৃদ্ধিশায়। কৌণিক ভরবেগের অঙ্কুণ্ডতার কারণে এটা ঘটে। সম্ভবত বস্তুর বলয়সমূহ সৌর নীহারিকা (সৌরজগত বহিভূত ধূলিকণা ও গ্যাস) কর্তৃক পরিত্যজ হয়ে যায়, কারণ এটা এর কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হতে থাকে। ঘূর্ণনরত সৌর নীহারিকার কেন্দ্রীয় অংশ protosun গঠনের জন্য সংকুচিত হয় এবং অবশেষে নিজেই সূর্য হওয়ার জন্য আরও পরে

ଗିଯେ ଧରସ୍ତାଣ ହୁଏ । ଆରଓ ବେଶୀ ମହାକର୍ଷୀୟ ପତନେର ଫଳେ ସୌର ନୀହାରିକାର ବହିବଲ୍ୟସମୂହ ଏହ-ଉପଗ୍ରହେର ଜନ୍ମ ଦେଇ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଥନ ଏତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧାୟତନେର ଛିଲ ଯେ ମହାକର୍ଷୀୟ ସଂକୋଚନ ଥିଲେ ସଂଗ୍ରହୀତ ତାପ ଶକ୍ତି ଥିଲେ କେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଛିଲ । ଆର ଏହି ତାପଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସରେ ପାରମାଣ୍ଵିକ ଏକିଭବନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସୂଚନା କରେ ଯା ଥିଲେ ତାପେର ବିକାଶ ଘଟେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମରା ସେଇନ ଆମାଦେର ନିଜର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତାପ ଓ ଆଲୋ ଏହଣ କରାଇ । ଏହ, ଉପଗ୍ରହ ଏମନ କୋନ ବୃଦ୍ଧାୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯା ପାରମାଣ୍ଵିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାବେ ତାପେର ସୃଷ୍ଟି କରତେ ପାରେ ।

ବିଶ୍ୱ ଜଗତେର ଭବିଷ୍ୟତ : ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନାଟ ହଜେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ କୀ ଚିରକାଳ ଏକ ଅନନ୍ତର ଦିକେ କ୍ରମଗତ ସମ୍ପ୍ରଦାରିତ ହତେ ଥାକବେ ଅଥବା ଯଦି ଅଭିକର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ହୁଏ, ତାହଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାରଣ ପ୍ରକିଯା କ୍ରମାବୟେ ଥେବେ ଯାବେ ଏବଂ ସଂକୋଚନ ଉତ୍କଳ ହବେ । ଏହି ଶେଷେର ସଜ୍ଜାବ୍ୟତା ଅନେକ କମ୍ପନେର ଜନ୍ମ ଦିତେ ପାରେ ଅଥବା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍‌ଯାନେର ଜ୍ୟାମିତିତେ ଏକଟି କମ୍ପନ୍‌ଶାଲୀ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହତେ ପାରେ । ସକଳ ସାମ୍ପ୍ରଦାଇକ ପରୀକ୍ଷାଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା ହତେ ଦେଖି ଯାଏ ଯେ ଏହି ମହାବିଶ୍ୱ ଏର ସମ୍ପ୍ରଦାରଣ ପ୍ରକିଯା ବକ୍ତା କରବେ ନା । ଯାହେକ ତ୍ବ୍ରୁ ଶେଷ ଉତ୍ତର ଆମାଦେର କାରମରି ଜାନା ନେଇ ।

#### ତଥ୍ୟସୂତ୍ର :

1. Gamow, G. The Evolutionary Universe, Scientific American, Sept. 1956.
2. Gamow, G. The Creation of the Universe, Viking, 1952.
3. Webstar, A. The Cosmic Background Radiation, Scientific American, Aug. 1970.
4. Weinberg, S. Gravitation and Cosmology, Wiley, 1972.
5. Gott III. J.R. Gunn, J. E. Schramm DIN. and Tinsley, B. M. Will the Universe Expand Forever? Scientific American, March, 1976.
6. Pasachoff, Jay M. Contemporary Astrophysics, W. B. Saunders Co. London, 1977.

## পরিশিষ্ট-৩

### এইড্স Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

১৯৭৯-৮১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তার মাইকেল গটলিয়েভ তিনি জন সমকামী পুরুষ রোগীর মধ্যে কিছু নতুন ধরনের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। এরা ফুসফুসে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত ছিল যার কারণ ছিল নিওমোসিস্টিস কেয়ারিনিস (Pneumocystis Carenis Pneumonia= PCP) নামক রোগ জীবাণু যা সাধারণত সুস্থ লোককে আক্রমণ করে না। কোন রোগে দুর্বল হয়ে গেলে এই জীবাণু আক্রমণ করতে পারে। ডাঃ গটলিয়েভ হঠাতে ভাবলেন যে তিনি হয়তো এমন কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তবে তখনও তিনি এর গুরুত্ব উপলক্ষ্য করতে সক্ষম হননি। পরে ১৯৮১ সালের জুন মাসে তিনি এই রোগের বিবরণ যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে (Centre for Disease Control= CDC) পাঠিয়ে দেন। এরমধ্যে ডাঃ গটলিয়েভ তার চতুর্থ রোগী হাতে পেলেন এবং পরীক্ষা করে দেখলেন যে এদের স্বার শরীরের রোগ প্রতিরোধক হেলপার টি-সেল (Helper T-Cell) প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

CDC এই রোগের নাম দেয় Acquired Immune Deficiency Syndrome বা AIDS<sup>১</sup>। তাদের এই নতুন নামে হাসপাতালে আরও ৫ জন ইতিপূর্বে সুস্থ সমকামীর ফুসফুসে নতুন ধরনের রোগ পাওয়া যায় গটলিয়েভ যার নাম দেন PCP (Pneumocystis Carenis Pneumonia)। পরে ১৯৮১ সালেই নিউইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়ায় ২৬ জন সমকামী হঠাতে Kaposi's Sarcoma রোগে আক্রান্ত হয় এবং এদের ৮ জন এক বছরের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে। এই রোগ সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র বসবাসকারী কোন কোন ভূমধ্যসাগর পারের দেশবাসী এবং ইয়াঙ্গুদীদের মধ্যে ৬০ বছরের বেশী বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এই সব সমকামীদের বয়স ছিল মাত্র ২০ থেকে ৪০ বছর যাদের পূর্ব পুরুষদের কেউই ভূমধ্যসাগর এলাকাবাসী ছিল না অথবা তাদের এমন কোন রোগের ইতিহাস ছিল না যার ফলে তাদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। এমনিভাবে যুবকদের মধ্যে PCP বা Kaposi's Sarcoma দেখা দেওয়াকেই AIDS রোগের প্রধান লক্ষণ হিসাবে নির্ধারিত হয়।

### CDC কর্তৃক প্রস্তুত এবং WHO সমর্থিত AIDS রোগের সংজ্ঞা

এটা বিশ্বাসজনকভাবে নির্ণীত রোগ যাতে শরীরের বাতাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা মোটামুটি হ্রাস পেয়েছে বলে পাওয়া যায় (যেমন PCP, Kaposi's Sarcoma, candidiasis etc)। অথবা এমন কোন প্রমাণিত কারণ পাওয়া যায় না যার ফলে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাহ্রাস পেতে পারে।

### এইডস-এর সংক্রান্ত প্রকৃতি (Epidemiology)

যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎ এইডস রোগের প্রকাশ এবং দ্রুত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি গোটা পশ্চিমা জগতে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই রোগ খুব মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়। কারণ, গত তিন বছরে শতকরা ৮৫% রোগী মৃত্যুবরণ করে। গোটা যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগীর সংখ্যা ১৯৮১ সালের পূর্বে ছিল ৬৪, আর ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঢ়ায় ১২,০৬৭ তে যার অর্ধেকই ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৪,০০০।

যুক্তরাজ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১,২৪১ এবং ১২২৭ যার অর্ধেক মারা গিয়েছে। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ১৭টি দেশে এই রোগীর সংখ্যা ৯৪০ থেকে বহু হাজারে উপনীত হয় ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে।<sup>১</sup>

ইউরোপ ও আমেরিকার বেশির ভাগ উন্নত দেশেই এইডস ধরা পড়েছে। মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বিরাট সংখ্যক এইডস রোগীর সংকান পাওয়া গেছে। ক্ষি সেক্সের কারণে মুসলিম কালো আফ্রিকার জাতিশূলোর মধ্যে এইডস ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে-বিশেষ করে জিবাবুয়ে যেখানে ৫০%-৬০% লোক এইডস-এ আক্রান্ত।

এ পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশে এই রোগের সংখ্যা খুব কম। তবে যাদের এই রোগ হয়েছে তাদের সবার মধ্যে পাচাত্য দেশসমূহের সম্ভাব্য কারণসমূহ পাওয়া গেছে। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে খুব অল্পসংখ্যক রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

### কাদের এইডস রোগ হতে পারে ?

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইডস রোগের সংক্রমণ হতে পারে :

(১) সমকামী ও বিলিঙ্গামী পুরুষ : এ পর্যন্ত ৯০-৯৫% এইডস রোগীই পুরুষ যাদের ৭৫% সমকামী অথবা বহুগামী। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য মেট সমকামীর সংখ্যা যথাক্রমে ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং ১৯৬ লক্ষ বলে জানা যায় (অজানা সংখ্যা আরও বেশী)। সুতরাং এইসব দেশে অন্দুর ভবিষ্যতে এই রোগের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৯০ জন সমকামী পুরুষের বয়স ২০-৪৯ বছর এবং এদের মধ্যে সব ভাতীয় লোকই রয়েছে। সমকামীরা পুরুষ সমকামীদের সঙ্গে গৃহযাত্রার দিয়ে যৌন সঙ্গম করার সময় (sodomy) বীর্য ও রক্তের মাধ্যমে এইডস্ রোগে আক্রান্ত হয়। এদের কেউ কেউ বহু সমকামী (বৎসরে ৫০ জন নতুন সমকামী বা তারও বেশী) অথবা নিত্য বা অনিত্য সাথীদের সঙ্গে মেখুনে অভ্যন্ত। এইডস্ আক্রান্ত সমকামীদের এইডস্মুক সমকামীর তুলনায় অনেক বেশী যৌন সাথী থাকে। এক স্বীক্ষায় দেখা গেছে যে এইডস্ রোগীদের শতকরা ৫০ জনের প্রতিমাসে ১০ বা ততোধিক যৌনসঙ্গী ছিল এবং যৌন সাথীর সংখ্যা বছরে ১ থেকে ১০০০ পর্যন্ত ছিল।<sup>৩</sup>

পুরুষের বৃহদন্ত্রে (rectum) অন্য ব্যক্তির বীর্যপাত হলে তা বিজাতীয় (foreign) বা ভিন্ন এন্টিজেন (antigen) হিসেবে কাজ করে এবং এর ফলে বীর্যপ্রাণ ব্যক্তির রক্তে এর এন্টিবডি (antibody) তৈরি হয়। এসব এন্টিবডিগুলো auto-antibody জাতীয় বলে সেই ব্যক্তির নিজস্ব জীবকোষকেও প্রভাবিত করে বিশেষ করে T-lymphocytes সমূহকে। এর শেষ পরিণতি হলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস। এই অবস্থা ইন্দুরে পরীক্ষা করেও পাওয়া গেছে। সমকামী পুরুষের বৃহদন্ত্রে বারবার ভিন্ন ব্যক্তির বীর্যের সংস্পর্শের ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, এই পরিবর্তন এইডস্ রোগীর বেলায় সত্য।<sup>৪</sup>

(২) ইনজেকশানের মাধ্যমে নেশার ওষুধ প্রহণ করা : যুক্তরাষ্ট্রের সমকামী ছাড়া এইডস্ রোগীদের (পুরুষ ও নারী. উভয়.ক্ষেত্রে) প্রায় শতকরা ৬০% জনই এ ধরনের নেশাকর ওষুধ ইনজেকশান নিয়ে থাকে। সমকামী পুরুষদের মধ্যেও এই বদ অভ্যাস খুব বেশি। সাধারণত হেরোইন ও কোকেন এই উদ্দেশ্যে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই সব নেশাকর বস্তু নিজেদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে। কিন্তু একই সূচ একাধিক ব্যক্তির ব্যবহারের ফলে বিশেষ করে ইনজেকশানের জন্য নেশাকারী দল বেঁধে হাজির হলে একই সূচ অনেকে ব্যবহার করে থাকে। তার ফলে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের মত এইডস্ ভাইরাসও বিস্তার লাভ করে। নেশাকারীদের মধ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম এইডস্ ভাইরাসের এন্টিবডি পাওয়া যায় যেমন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৮৭' জন, স্পেনে শতকরা ৩৭ এবং যুক্তরাজ্যে মাত্র ১.৫% জনে।<sup>৫</sup> একটি আন্তর্য ব্যাপার এই যে এইডস্ রোগীর শতকরা ৮০ জনের রক্তে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের এন্টিবডি রয়েছে- যা তাদের পূর্বের বা বর্তমান রোগের কারণে ঘটেছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯০ জন হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তিনটি এইডস্ রোগের সংক্রান্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যেমন, সমকামী, সূচ দিয়ে নেশাকারী, এবং হিমোফিলিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি।

(৩) **হিমোফিলিয়া রোগী (Haemophiliacs)** : এইসব রোগীরা রক্ত জমাট বাঁধার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দুটি জিনিসের factor VIII ও IX স্বল্পতার শিকার যা জন্মগতভাবেই এসেছে। ফলে খুব সামান্য কেটে গেলেও এরা দীর্ঘ সময় রক্ত ক্ষরণের সমস্যায় ভোগে যাতে তাদের রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। জন্মগত এই দোষ কেবল পুরুষদের মধ্যেই পাওয়া যায়— যদিও মেয়েরা এই দৃষ্টিত জিন' বহন করতে সক্ষম। স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য এই সব রোগীদের প্রায়ই স্বল্প রক্তজমাটকারী বস্তুর ইনজেকশান নিতে হয়। Factor VIII এর অভাবই বেশী দেখা যায় যাকে Haemophilia A আর factor IX এর অভাবকে Haemophilia B বলা হয় (এর অপর নাম Christmas Disease)। ইনজেকশান দেওয়ার জিনিসগুলো বিশেষভাবে ঠাভা করে সংরক্ষিত করা হয়। Factor VIII প্রায় ২০ জনের রক্ত থেকে আর factor IX প্রায় ২০০০-৫০০০ রক্তদাতা থেকে সংগৃহীত হয়। ফলে একজন হিমোফিলিয়া রোগী প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোকের রক্তের সংস্পর্শে আসে। তাই অন্যান্য রক্ত প্রাপ্তকারীর তুলনায় (যারা মাত্র কয়েকজন রক্ত দানকারীর রক্তের সংস্পর্শে আসে) হিমোফিলিয়ার রোগীদের এইড্স রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। তাই এখন হিমোফিলিয়ার চিকিৎসা ক্ষেত্রে এইড্স হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বড় আশঙ্কা। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে ২০,০০০ হিমোফিলিয়ার রোগীর মধ্যে ৭১ জনের (৬ জন শিশুসহ) এইড্স রোগ ধরা পড়ে।<sup>১৬</sup>

(৪) **অন্যের রক্ত শ্রদ্ধণকারী** : রক্ত জমাটকারী বস্তু ছাড়াও সরাসরি সম্পূর্ণ রক্ত, রক্তের জলীয় অংশ, প্ল্যাটিলেট কণিকা এবং শ্বেত কণিকা চিকিৎসার প্রয়োজনে রোগীর দেহে শিরার মাধ্যমে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমেও এইড্স রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। যদিও এর মাধ্যমে এইড্স বিস্তার খুব কম তবুও হৃৎপিণ্ডের অপারেশন, কিডনি সংযোজন ও লিউকেমিয়া রোগীদেরকে বহুবার রক্তদান করতে হয় (প্রায় ৫০ বার) বলে এদের বেলায় এইড্স হওয়ার সম্ভাবনা দু একবার রক্তগ্রহণকারীর তুলনায় অনেক বেশী।

(৫) **এইড্স রোগীর ঘৌন সঙ্গী** : সমকামী নয় এমন পুরুষ বা নারী এইড্স রোগীর সঙ্গে ঘৌন মিলনে লিঙ্গ হলে এইড্স হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে এইড্স রোগীদের মহিলা ঘৌন সাথীদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬ জনের এই রোগ হয়েছে। তবে মহিলাদেরও পচাদশার দিয়ে ঘৌন সঙ্গমের সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে এমন ৪১ জন মহিলা এইড্স রোগী পাওয়া গেছে যারা এইড্স-এর সম্ভাবনাযুক্ত লোকদের সঙ্গে সঙ্গমের কথা অবীকার করে। তবে তাদের সবাই গত পাঁচ বছরে প্রায় ১০০ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গম করেছে বলে

স্থীকার করেছে। সুতরাং পতিতারা এইড্স রোগের ডিপো হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে মধ্য ও পশ্চিম (যেসব দেশে মুসলিম সংখ্যা নগন) আফ্রিকার পতিতাদের মাধ্যমে এইড্স রোগ দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এইসব দেশে বিয়ের বাইরে যৌন মিলন খুব সহজ ও সমাজ স্বীকৃত। সুতরাং যৌন রোগ বিস্তারের জন্য ও সব দেশে পতিতাই একমাত্র মাধ্যম নয়।

(৬) শিশুদের এইড্স : এইড্স ভাইরাস মায়ের প্লাসেন্টার মাধ্যমে বা খুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর দেহে প্রবেশ করতে পারে।

১১৪ জন শিশু রোগীর ১১৩ জনের বয়স এক বৎসরের কম এবং তাদের শতকরা ৭২% জনের বাবা বা মায়ের একজন বা উভয়ে হয় এইড্স রোগী অথবা যদের এইড্স হওয়ার সম্ভাবনা বেশী সেই গ্রন্তির অন্তর্ভুক্ত। শিশুদের বেলায় অর্ধেক রোগীর এইড্স কম মারাত্মক, আর বাকী অর্ধেক পুরোদস্তুর এইড্স রোগী।

বর্তমানে হেইতি, জায়ার, জাস্বিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা ও অন্যান্য বিষুব রেখার পার্শ্ববর্তী আফ্রিকান দেশসমূহে এইড্স রোগী বেশ পাওয়া যাচ্ছে। এই সব এলাকায় এইড্স রোগ হওয়া খুবই অর্ধবহু, কারণ এই এলাকায় স্থানীয়ভাবে (endemic) Kaposi's Sarcoma খুব বেশী (জায়ারেও শতকরা ১৩ জন)। সম্প্রতি এক রিপোর্টে দেখা গেছে যে, জায়ারের শতকরা ৩৬ জন শিশুদের রক্তে এইড্স ভাইরাসের প্রতিরোধক এন্টিবিড়ি রয়েছে। তা ছাড়া সম্প্রতি প্রায় ১৪০০০ হেইতিবাসী (প্রাক্তন সাগরবাসীদের বৎসরে) জায়ার ভূমণে যায় এবং হয়তো তাদের মাধ্যমেই এইড্স রোগ সে দেশে সংক্রমিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নর-নারীর যৌন মিলনের (সমকামী নয়) মাধ্যমেই আফ্রিকায় এইড্স ছড়াচ্ছে। এর সপক্ষে প্রমাণ হলো যে সেসব দেশে নর ও নারী এইড্স রোগীর অনুপাত ১ : ১ আর শতকরা ৮০% জন পতিতার রক্তে (বড় বড় শহরে) এইড্স ভাইরাসের এন্টিবিড়ি পাওয়া গেছে। যানা ও আইভরি কোষ্টে উভয় লিঙ্গে এই রোগ বিস্তার লাভ করছে।

### এইড্স রোগের লক্ষণাদি :

১। অনেকদিন ধরে দুর্বলতা অনুভব করা অথচ এর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

২। শরীরের বিভিন্ন অংশের লিম্ফ গ্রন্থিগুলো বড় হয়ে যায়, যেমন ঘাড়ের ও গলার দুপাশে, , কঙ্কে, বগলে, কনুইয়ের পাশে, কুচকিতে এবং পায়ের পেছন দিকে হয় এবং শরীরের অন্তত দু'জায়গায় প্রায় তিন মাস পর্যন্ত বড় থাকে এর কোন কারণ পাওয়া যায় না তবে এতে এইড্স হওয়ারই সম্ভাবনা। অগুরীক্ষণ

যজ্ঞের সাহায্যের এই গ্রহিতগোতে কোন নির্দিষ্ট রোগ ধরা পড়ে না (benign reactive hyperplasia)।

- (৩) দু'মাসের মধ্যে দশ পাউডের বেশী ওজনজ্বাস পাওয়া।
- (৪) বহু সংক্ষাহ ধরে জ্বরে ডোগা যা ডাক্তার কর্তৃক অজ্ঞানা কারণে জ্বর বলে (pyrexia of unknown origin= pnu) ডায়াগনোনিস করা। এই সমস্ত জ্বরের রোগীদের মধ্যে যক্ষার জীবাণু ছাড়াও Atypical mycobacteria cytomegalo-virus এবং অন্যান্য জীবাণু হতে পারে সে গুলো সাধারণত রোগ সৃষ্টি করে না।

- (৫) রাতে প্রচুর ঘায় হয় যার ফলে শুয়ু নষ্ট হওয়া।
- (৬) মুখে ও খাদ্যনালীর ফাংগাস (candida) নামক জীবাণুর আক্রমণ এবং স্থায়ী পেটের গোলমাল (Gay Bowel Syndrome বা সমকার্যীদের পেটের অসুব্ধি)।

(৭) Kaposi's Sarcoma, Lymphoma এবং মুখ ও গহ্যস্থারের ক্যান্সার।

(৮) স্নায়ুঘটিত রোগ যেমন অলসতা, হতাশতা (Depression) এবং এমন কি সবকিছু ভুলে যাওয়া (denentia)।

(৯) নিউমোনিয়া এবং PCP (Pneumocystis carinii) কর্তৃক ফুসফুসের রোগ। এদের রোগ সৃষ্টির সময়কাল জানা নাই, তবে ৬ থেকে ৭২ মাস পর্যন্তও হতে পারে।

আমেরিকার মেরিল্যান্ডস্ট বেথেস্ডা ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনসিটিউটে ডঃ রবার্ট গ্যালোর দ্বারা এক বছর পর ১৯৮৪ সালের মে মাসে এইচ টি এল ভি-৩ ভাইরাসটি শনাক্তকৃত হয়। আরো পরে, ডঃ লেভী সানক্রান্সিসকোতে এইডস-সম্পর্কিত ভাইরাস (আরভি) নামে আরেকটি অনুজ্ঞপ্রাপ্ত ভাইরাস বের করেন। এ ডিনটি ভাইরাসের সবগুলোই সম্বন্ধে একই ভাইরাস, কেবল ধাতুর বিশেষতা পরীক্ষা, জেনেটিক কোড এবং ইলেক্ট্রন মাইক্রোসকোপিক এপিয়ারেলে এগুলোকে পৃথক করে দেখা যায় না। এলএভি (LAV) এবং এইচ আই ভি (HIV)-র প্রথম আবিষ্কারককে যথাযথ স্থান দেখানোর জন্যে এইডস (AIDS) ভাইরাসকে বর্তমানে এইচটি এল ভি-৩/এলএভি ভাইরাস নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ আর ভি ভাইরাসটি এইচটি এল ভি-৩ ভাইরাসের মত একই মনে হয়। অঙ্গুনা, 'হ' (WHO) এইডস ভাইরাসের নাম দিয়েছে এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউন ডেফিসিয়েসি ভাইরাস)।<sup>১</sup>

এইচএলভি-৩ এলএভি-৩ প্রতিশেধক চিহ্নিত করা গেছে ৯৭% রোগীর ক্ষেত্রে, ৬০% সমকার্যীদের ক্ষেত্রে, ৪২% ভাগ এইডস কিংবা পিজিএল সংশ্রব

রোগীর ক্ষেত্রে, এবং ৩৪% অত্যধিক রক্তক্ষরণ প্রবণ রোগীদের ক্ষেত্রে যারা রক্ত জমাট বাঁধার ব্যবহার গ্রহণাধীন, রয়েছে। এইচ টি এলভি-৩ ভাইরাসটি এইডস রোগী, এইডস বহনকারী শিশু, শিশু এইডস রোগীর মাতা, এবং ডাঙ্কারীবিদ্যাগত স্বাভাবিক সমকামীদের মধ্যে উচ্চ হারে পাওয়া গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ দলের বাইরের কোন রোগীর মধ্যে এইচটি এলভি- সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

### এইচ টি এল ভি-৩ এর প্রতিষেধক আবিষ্কার

আমেরিকার এবোটস এবং যুক্তরাজ্যের ওয়েলকাম ডায়াগনষ্টিকস এইচ টি এল ভি-৩ এর প্রতিষেধক আবিষ্কারের এনজাইম ইমিউনো পরীক্ষা কৌশলের উদ্ঘাবন করে। কৌশলটি ইলাইসা পদ্ধতি নামে পরিচিত। মনে রাখতে হবে যে, এইচটি এল ভি-৩ এর প্রতিষেধকের উপস্থিতি এইডস-এর কোন ডায়াগনোসিস নয়। সেরো পজিটিভ নমুনাসমূহ উয়েস্টার্ন ব্লট টেকনিক (একটি ইমিউনো ইলেক্ট্রোফোরেটিক পদ্ধতি) দ্বারা পুনঃপরীক্ষিত হতে হবে। আবার, নেতৃত্বাচক কোন ফলাফল এইচটি এলভি-৩ দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কিংবা সংক্রমণের সম্ভাবনাকে বাতিল করে না। পজিটিভ পরীক্ষা শুধুমাত্র এতটুকুই ইঙ্গিত দেয় যে, রোগী এইচটি এলভি-৩ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মুখে ছিল। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন পজিটিভ ঘটনা শনাক্ত করা হয়নি।

### এইডস রোগ হওয়ার পদ্ধতি pathogenesis :

যে কোন রোগ জীবাণু দেহের বিশেষ জীবকোষ (macrophage cells) চিনে ফেলে এবং রক্তের T-cell গুলোকে সাবধান করে দেয়। তখন T-cell গুলো কাজ শুরু করে এবং বিভিন্ন রকম T-cell এ ক্লিপসারিত হয় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে-যার একটি হল সাহায্যকারী T-cell। এই সাহায্যকারী T-cell (Helper T-cell) শরীরের লিফোসাইট সমূহের B-cell গুলোকে উৎসেজিত করে যার ফলে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বাইরের রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য এন্টি বড়ি তৈরি করে। এইডস ভাইরাস এই T-cell গুলোকেই আক্রমণ করে সেই cell গুলোকে এইডস ভাইরাস তৈরি করতে বাধ্য করে। এমনিভাবে আরো Helper T-cell আক্রান্ত হয়। যার ফলে সাহায্যকারী T-cell হ্রাস পায় এবং B-cell কর্তৃক এন্টিবড়ি তৈরি বাধাগ্রাণ হয়। Helper T-cell কর্যে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য T-cell যেমন আক্রান্ত জীবাণুর কোষ ধ্বংসকারী (cytotoxic) এবং শক্তিহাসকারী (suppressor) T-cell গুলোও হ্রাস পায়। এর সঙ্গে সঙ্গে lymphokines তৈরিও হ্রাস পায় যা শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী বিভিন্ন শ্বেত কণিকার কর্মক্ষমতা খর্ব করে। এর শেষ ফলই হলো শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতার অভাব।

সবশেষে বলা যায় যে AIDS এক দুরারোগ্য ব্যাধি যা অঙ্গভাবিক ও অবৈধ যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে বিস্তার শান্ত করে।

সুতরাং এইডস্ রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো বিবাহিত না হয়ে এবং বিবাহের পর অবৈধ যৌন সঙ্গম সম্পূর্ণ পরিহার করা। এ ব্যাপারে ইসলামী যৌন নীতিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। আধুনিক বিশ্বের বেপরদার ফলে উদ্ভৃত যৌন উচ্ছ্বেলা বন্ধ না হলে শত চেষ্টা করলেও এমনকি এর ওষুধ আবিষ্কার হলেও এইডস্ রোগ প্রতিরোধ করা যাবে না।

### তথ্যসূত্র :

1. V. G. Daniels, AIDS, MTP Press Ltd. 1st edn . p. 1, 1985.
2. M. Marmor, A. E. Friedman-Kein, et al., Risk factors for Kaposi's sarcoma in homosexual men, *Lancet*, p. 1083, 1985.
3. V. G. Daniels, AIDS, MTP Press Ltd. 1st edn. p. 16, 1985.
4. Ibid, p. 48.
5. Ibid, p. 18.
6. M. G. Muazzam, AIDS in Bangladesh, *Bangladesh J. path.* Vol. pp. 48-59, 1986.
7. WHO Weekly Epidem, Rec. 61. p. 229-236, 1986.
8. Ibn 'Majah, Kitabul Fitn, Al-Hadis No, 4019, vol. 2. p. 1332.

## পরিশিষ্ট-৪

### অর্ধ পারমাণবিক পদাৰ্থ (Subatomic Particles)

বিতৰ্ক লেগেই আছে এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানও অব্যাহত আছে। এ্যটমোস (atoms), এৱ অৰ্ধ অবিভাজ্য, এবং এক সময় মনে কৱা হতো যে, পৰমাণু হ'ব পদাৰ্থের চূড়ান্ত অবিভাজ্য গঠনকৰ উপাদান। ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী আর্নেট রান্ডারফোর্ড প্ৰমাণ কৱেন যে, পৰমাণুৰ একটি অতি ক্ষুদ্ৰ ঘন নিউক্লিয়াস রয়েছে যাৱ চাৰদিকে ইলেক্ট্ৰনেৰ একটি বলয় ঘিৱে আছে। পৰবৰ্তীকালে এই মত প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নিউক্লিয়াস নিজেই ধনাত্মক গুণ বিশিষ্ট প্ৰোটন ও নিউট্ৰন নিয়ে গঠিত। ১৯৫৭ সালেৰ মধ্যেই ৩০টি তথাকথিত অতি ক্ষুদ্ৰ মৌলিক উপাদানেৰ সংজ্ঞান পাওয়া যায় এবং খুব শীঘ্ৰই একপ উপাদানেৰ সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। অতি ক্ষুদ্ৰ এ সকল উপাদানেৰ একপ সংখ্যাবৃক্ষি প্ৰশ্ৰুত জন্ম দেয় যে এ সকল উপাদানকে আদৌ মৌলিক বলে উল্লেখিত হবে কিনা। । এ সকল অৰ্ধপারমাণবিক উপাদানসমূহকে এখন এই নামে অভিহিত কৱা অধিকতৰ যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা কৱা হয়। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পারমাণবিক উপাদানেৰ একটি সুসংগঠিত ও সুন্দৰ জগতেৰ জন্য পদাৰ্থবিদদেৱ নিৱলস অনুসন্ধান প্ৰচেষ্টা অৰ্ধপারমাণবিক পৰ্যায়ে গিয়ে ঝুঁকিৰ মধ্যে নিপত্তি হয়। যাহোক, এই অবস্থা বিগত দশকে বিস্ময়কৰণভাৱে পৱিত্ৰিত হয়।

পদাৰ্থবিদগণ এ সকল অৰ্ধপারমাণবিক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পদাৰ্থেৰ মধ্যে কিছু সাধাৱণ বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ আবিষ্কাৰ কৱেন। এ সকল উপাদানকে তাৱা যে ধৰনেৰ শক্তি অনুভব কৱে সে অনুযায়ী বড় বড় দলে শ্ৰেণীবদ্ধ কৱা যায়। পদাৰ্থেৰ মধ্যকাৱ যাবতীয় মিথক্রিয়াৰ জন্য ৪টি মৌলিক শক্তি দায়ী, এৱা হচ্ছে মহাকৰ্ষীয় শক্তি, তাৰিত চুম্বকীয় শক্তি, সবল শক্তি ও দুৰ্বল শক্তি। মহাকৰ্ষীয় শক্তি সকল পদাৰ্থেৰ উপৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৱ কৱে এবং এটা অতি সন্নিকটবৰ্তী অবস্থান থেকে অসীম পৰ্যন্ত ক্ৰিয়াশীল হয়। তবে অন্যান্য শক্তিৰ তুলনায় এই

শক্তি উপেক্ষণীয়ভাবে ক্ষুদ্র। অন্যান্য শক্তি অর্ধপারমাণবিক ঘটনাবলির সাথে জড়িত ক্ষুদ্রাভিক্ষুদ্র পিণ্ডের মধ্যে স্থিত এবং এটা সবল শক্তির প্রায়  $10^{-5}$  গুণ শক্তিশালী। তাড়িত চুম্বকীয় শক্তিরও রয়েছে অসীম মাত্রা, কিন্তু এটা শুধুমাত্র তাড়িৎ অথবা বিদ্যুৎ পরিবাহীর উপর ক্রিয়া করে। পারমাণবিক শক্তির চেয়ে তাড়িত চুম্বকীয় শক্তি  $10^7$  গুণ দুর্বল। দু'টি ক্ষুদ্র পদার্থ পরস্পর একটি ফোটন অথবা একাধিক ফোটন অদলবদলের মাধ্যমে তাড়িত চুম্বকীয়ভাবে মিথ্যক্রিয়া করে। ফোটন এমন একটি উপাদান যার কোন পিও নেই, নেই কোন বিদ্যুৎ শক্তির সংঘার এবং এটা সবল অথবা দুর্বল শক্তির কোনটাতেই মিথ্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। নিউটন ও প্রোটন শক্তিশালী, বলু দূরত্বের (প্রায়  $10^{-13}$  সে. মি.) পারমাণবিক শক্তির মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া করে বলে জানা গিয়েছে। পারমাণবিক নিউক্লিয়ি-এর মধ্যে এ সকল পদার্থের আবেষ্টনকারী বলয়ের জন্য একপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দু'টি নিউক্লিয়ন (প্রোটন ও নিউটন) বীয় বৈশিষ্ট্য অদল বদল করে মিথ্যক্রিয়া সম্পন্ন করে। সবল মিথ্যক্রিয়ার শক্তির চেয়ে দুর্বল মিথ্যক্রিয়ার শক্তির পরিমাণ  $1/100$  ট্রিলিয়ন  $10^{-18}$  গুণ কম এবং কারোর জানা মতে তা কোন কিছুকে বেঁধে রাখতে পারে না। অনেক শক্তিশালী মিথ্যক্রিয়াশীল পদার্থের ক্ষয় বা পতনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিছু তেজক্রিয় নিউক্লিই ধর্মসের জন্য দায়ী।<sup>১২</sup>

যে সকল পদার্থ সবল শক্তি অনুভব করে তাদেরকে হ্যাঙ্গ্রোন বলে। এই হ্যাঙ্গ্রোন আবার ব্যারিয়োন ও মেসোন নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্যারিয়োনের মধ্যে প্রোটন, নিউটন ও তাদের বিপক্ষীয় পদার্থ রয়েছে। পাইয়োন ও কায়োন নামের পদার্থ মেসোন শ্রেণীভূক্ত। এখন পর্যন্ত সর্বমোট ১০০ এর অধিক হ্যাঙ্গ্রোন পাওয়া গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই অপৃথকীকৃত ও অস্থিতিশীল। যে সব ক্ষুদ্র পদার্থ সবল শক্তিকে অনুভব করে না কিন্তু দুর্বল শক্তিতে সাড়া দেয় তাদেরকে লেপটন বলে। লেপটনের সংখ্যা শুধুমাত্র ৪টি। যথা : ইলেক্ট্রন ও তার নিউট্রিন এবং মুয়োন ও তার নিউট্রিনো, এবং তাও ও জাউ এবং তাদের নিউট্রিনো ও তাদের বিরুদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থ। নিচে সারণি-১ এ অর্ধ-আণবিক পদার্থের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। এসব পদার্থের মিথ্যক্রিয়ার ধরন অনুসারে তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।<sup>১৩</sup>

## সারণি-১ : Present Status of Particle Physics

Interaction	Participating Particles	Carrier	Theory
strong	Quarks : u. d. c. s. (i), b	gluon	quantum chromodynamics (QCD)
electroweak	quarks (listed above) and leptons : e, $\nu_{\mu}$ $\mu, \nu_{\mu}$ $T, \nu_1$	photon, and intermediate bosons : $W^+, Z^0$	SU (2) X U (1) (including quantum electrodynamics (QED))
gravity	everyone and everything	gravitation	general relativity

## সারণি-২ : The Names and Properties of the Quarks

Quark	u	d	s	c	b	t
mass	-	5 MeV	100	2 GeV	5 GeV ?	
charge/e	10McV		MeV			
$Q_q$	2/3	-1/3	-1/3	2/3	-1/3	2/3
species (color)	3	3	3	3	3	3
interaction strength				strong at -1 GeV energy, but becomes 0 as energy approaches $\alpha$		

পদার্থের চূড়ান্ত গঠনকর উপাদানের সম্মান প্রচেষ্টা ১০০ এর বেশী সংখ্যক অবিপারমাণবিক অতি ক্ষুদ্র পদার্থ দৃশ্যপটে আনতে সক্ষম হয়েছে। হাত্তানের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ইনসিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানী Murray Gell-Mann ও র্জেফ Zweig আলাদাভাবে ১৯৬৩ সালে quark hypothesis এর প্রবর্তন করেন। এটা এখন ধারণা করা হয় যে, quarks ও antiquarks সরলভাবে মিথ্রিয়াকারী সকল পদার্থের গঠনকর উপাদান। মিথ্রিয়াকারী পদার্থসমূহ হচ্ছে প্রোটন, নিউট্রন, পাইয়োন, কার্যোন এবং আরও অনেক (সারণি-২)। পরিক্ষামূলক প্রমাণ নির্দেশ করে যে, প্রোটন ও নিউট্রনের একটি অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠোমো রয়েছে। অদ্যাবধি কোয়ার্ক একটি প্রকৃত অবিমিশ্র উপাদান তা কোয়ার্কের ইঙ্গিত থেকে বুঝা যায়। বিন্দু পিণ্ডের ন্যায় তাদের আচরণে প্রকাশ পায় যে, তাদের কোন অভ্যন্তরীণ গঠন

কাঠামো নেই। এগুলো এমন পদাৰ্থ যা দুটি কোয়ার্কেৰ মধ্যে বদল কৰা হয় এবং একই সাথে তাৱা সংৰক্ষ থাকে। ১৯৭৯ সালে একপ পরোক্ষ প্ৰমাণ পাওয়া যায় যে, পদাৰ্থে ঘূয়োন এৰ অবস্থিতি রয়েছে।

ইলেক্ট্ৰন, মুয়োন, নিউট্ৰিন ও তাৰ মিলে লেপটনস নামে পদাৰ্থেৰ একটি পৰিবাৰ গঠিত হয়। সৰ্বোচ্চ পৰিমাণ শক্তি বৰ্ধনেৰ সাথে সাথে যত কঠিন পৰীক্ষাই হোক না কেন এ সকল পদাৰ্থ কণাৰ কোন অভ্যন্তৰীণ গঠন কাঠামো আদৌ নেই। Steven Weinberg মত প্ৰকাশ কৰেন যে,  $w^+$ ,  $w^-$  এবং  $Z^0$  হচ্ছে তিনটি উপাদান যা দুৰ্বল শক্তিৰ কাজ কৰে।  $\psi$  প্ৰক্ষান্তৰে সবল পারমাণবিক শক্তি gluons থেকে উদ্ভৃত হয় যা রংয়েৰ পৰিবৰ্তন ঘটায় (কোয়ার্কেৰ একটি বৈশিষ্ট্য), দুৰ্বল পারমাণবিক শক্তি রুটিৰ সুগন্ধ (আৱেকটি বৈশিষ্ট্য) পৰিবৰ্তন কৰে এবং সম্পাদিত হয় কোয়ার্কেৰ  $w$  উপাদানেৰ মাধ্যমে। দুৰ্বল শক্তি হচ্ছে বৰ্ণন্দ।

এ সকল শক্তিকে একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টায় Salam ও Weinberg প্ৰমাণ কৰেন যে, তাড়িত-চূৰ্বকীয় শক্তি ও দুৰ্বল শক্তিৰ মিথ্যক্ষিয়া তাড়িত দুৰ্বল শক্তি হিসেবে পৰিচিত একটি একক শক্তিৰ ভিন্ন ভিন্ন বহিপ্ৰকাশ। এই শক্তিৰ বাহক হচ্ছে ফোটোনস ও মধ্যস্থ বোসোনস ( $w^+$ ,  $w^-$ ,  $Z^0$ )।

সৰ্বশেষে, আমৰা দেখতে পাই এই এই মহাবিশ্বেৰ সব কিছুই এই দুই ধৰনেৰ উপাদান থেকে গঠিত : লেপটন ও কোয়ার্কস। তাই পদাৰ্থেৰ চূড়ান্ত গঠনকৰণ উপাদানেৰ এই যে অৱেষণ তা সম্ভবত সফল হয়েছে বলে প্ৰতীয়মান হয়। পদাৰ্থেৰ এই দুটি fauilles ৱং, গন্ধ ও spins এৰ মধ্যে এক সুগঠনীয় সৌন্দৰ্যময় সামঞ্জস্য প্ৰদৰ্শন কৰে। বাতৰিকই এমন অৰ্ধপারমাণবিক পদাৰ্থেও সব কিছুই অতি উচু মাত্ৰায় সংগঠিত, ভাৱসাম্যপূৰ্ণ ও সুন্দৱ যা স্বষ্টা কৰ্তৃক পূৰ্ব নিৰ্দেশিত।

#### তথ্যসূত্র :

1. Sidney D. Drell, *Scientific American*, June, 1975
2. Geoffrey F. Chew, Murry Gell-Mann and Arthur H. Rosenfeld, *Scientific American*, Feb, 1964.
3. Sidney D. Drell, *Scientific American*, June, 1975.  
Lee, T.D. *Symmetries, Asymmetries and the World of Particles*, Union of Washington Press, p. 45, 1988.
4. Sheldon Glashow, *Scientific American*, Oct, 1975.
5. Steven Weinberg, *Scientific American*, Oct, 1974.

## পরিশিষ্ট-৫

### চান্দ অবস্থান

ক্রমিক নং	আরবী নাম	ভারতীয় নাম
১.	الشرطن	শারতান
২.	البطن	বুতাইন
৩.	الثريا	ছুয়াইয়া
৪.	الذبران	আদ-দারবান
৫.	الهقعة	আল-হেকা
৬.	الهنعة	আল-হেনা
৭.	الزراع	আজ-জেরা
৮.	النترة	আন-নেতৱাহ
৯.	الطرفه	আত-তারফা
১০.	الجبهة	আজ-জাবহা
১১.	الزبرة	আজ-জাবরা
১২.	الصفرة	আল-সেফরা
১৩.	العواء	আল-আওয়া
১৪.	الصماك	আস-সেমাক
১৫.	الغر	আল-গাফর
১৬.	البني	আল-জুবানা
১৭.	الأكل	আল-ইকলিল
১৮.	القلب	আল-কালব
১৯.	الشولة	আশ-শাওলা
২০.	النعم	আল-নায়ায়েম
২১.	البلدة	আল-বালদা
২২.	سعد الجبيح	সাদুল জাবিহ
২৩.	سعد البلع	সাদুল বালা
২৪.	سعد السود	সাদুল সাউদ
২৫.	سعد الاخباري	সাদুল আখবিয়া
২৬.	فرغا الدلوا	ফারগোদ দালওয়া
২৭.	فرغ الدلو	ফারগোদ দালওয়া
২৮.	المؤخر	আল-মুআখাৰ
	الرثا	আর-রিশা

## পরিপিট-৬

### জন্মগত শারীরিক ত্রুটি ও তার কারণ

জন্মের অব্যবহিত পরই আয় শতকরা ২০ জন নবজাত শিশু প্রাণ ত্যাগ করে কোন না কোন জন্মগত শারীরিক ত্রুটির জন্য।

নবজাত শিশুর জন্মগত শারীরিক ত্রুটি তিন প্রকার :

(ক) জীব কোষের মৌলিক দোষের জন্য (Genetic defects) ;

(খ) পারিপর্যাক অবস্থার প্রভাবে; ও

(গ) উভয় প্রকার কারণে যাকে বহু কারণ বিশিষ্ট জন্মগত দোষ বলা হয়।

(ফ) *Genetic* বা জীব কোষের মৌলিক ত্রুটিজনিত জন্মগত শারীরিক ত্রুটি :

নবজাত শিশুর প্রতি ২০০ জনের মধ্যে ১ জনের chromosome এর দোষ পাওয়া যায়। এই দোষ তিন প্রকার : (১) ক্রোমোজমের সংখ্যাতে ত্রুটি; (২) chromosome এর গঠনে দোষ। এসব দোষ লিঙ্গ সংক্রান্ত অথবা antisomar অথবা উভয় প্রকার হতে পারে। এই দোষের মূল কারণ জীবকোষের ভিতরে, বাইরে বা যুক্ত কোষের জৈব-রাসায়নিক ত্রুটি বা অন্য কোন কারণ; (৩) বিশেষ কারণে দোষযুক্ত জিন সমূহের (mutant genes) ত্রুটির ফলে।

#### (১) ক্রোমোজমের সংখ্যাগত ত্রুটি

জীবকোষের বিভিন্ন সময় ক্রোমোজমের বিভিন্ন বেশায় যদি এদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিচ্ছৃত হয় তা হলে প্রয়োজনীয় স্থানাবিক সংখ্যায় ত্রুটি দেখা দেয়। কোন সময় জোড়া নষ্ট হয় বা একটি অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়।

সাধারণত ক্রোমোজমগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে যাকে Homologues বলে। একজন পুরুষ মানুষের জীবকোষে ২২ জোড়া ক্রোমোজোম এবং একটি X ও একটি Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ  $22 + XY$  এবং একজন মহিলার ২২ জোড়া ক্রোমোজোম অর্থাৎ  $22 + XX$  থাকে। এই ধরনের জোড়ায় কোন ব্যতিক্রম হলে অর্থাৎ ৪৬টি chromosome বা ২৩ জোড়া এর কম বা বেশী হলে সংখ্যাগত ব্যতিক্রম জনিত জন্মগত ত্রুটি দেখা দেবে। যেমন Turner's Syndrome, Down's Syndrome এবং Klinefelter Syndrome

জাতীয় দোষ। এইসব ক্রটির ফলে শিশুর মানসিক ক্রটি দেখা দেয় এবং বিভিন্ন শারীরিক ও কার্যগত ক্রটি দেখা দিতে পারে। কোন কোন সময় অতিরিক্ত ক্রোমোজোমের জোড়া জীবকোষে জমা হলে গর্ভপাত হতে পারে।

### (২) আকৃতিগত ক্রটি

বিভিন্ন কারণে ক্রোমোজোম ভেঙ্গে গেলে একুপ ক্রটি দেখা দেয়- যেমন বিশেষ আলোক রশ্মির বিকিরণ (radiation), কোন ওষুধ বা ভাইরাস জাতীয় জীবাণুর আক্রমণ। ৩ আকৃতিগত ক্রটি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন translocation (এক স্থানে 'জিন' অন্য স্থানে সংযুক্ত হলে), deletion (জিনের সংখ্যা কম হলে), duplication (একই জিন দ্বিগুণ হলে) এবং inversion (জিনের অবস্থানের ক্রটি)। (৪) এর ফলে মানসিক ক্ষমতা হ্রাস, জন্মগত হৃৎপিণ্ডের ক্রটি এবং Down's Syndrome হতে পারে।

### (৩) জিনের প্রকৃতিগত ক্রটি (mutation)

জিনের প্রকৃতিগত ক্রটির ফলে প্রায় ১০-১৫% জন্মগত দোষ এ জন্যে হয়ে থাকে। এই দোষ উপরের দুটির তুলনায় অনেক কম। যদিও অনেক জিনের প্রকৃতিগত পরিবর্তন (mutation) হয় তবে এর্দের খুব কমই জন্মগত ক্রটির কারণে হয়। এই ধরনের ক্রটির ফলে achondroplasia বা শারীরিক গঠনের নানা ক্রটি, polydactyly (অতিরিক্ত আঙুল) বা অতিরিক্ত আঙুলের গিরা হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগত জিনের/সুষ্ঠু জিনের প্রভাবে এক্সিনাল গ্রাহ্য দোষ হতে পারে যাতে সেই গ্রাহ্য বেশী কর্মক্ষম (hyperplasia) হয়ে যৌন অঙ্গের বিকৃতি ঘটাতে পারে। কেবল একই ধরনের জিনসহ বাবা, মা হলে সুষ্ঠু জিন কর্মক্ষম হতে পারে নতুনা এই সুষ্ঠুতা ধরা পড়ে না।<sup>৫</sup>

(৪) পারিপার্শ্বিক কারণে জন্মগত ক্রটি : জনের প্রাণিগুলো (organisms) বিভিন্ন ক্রটি সৃষ্টিকারী বস্তুর প্রভাবে সহজেই প্রভাবাবিত হয়। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে জীবকোষের বিভক্তির বেলায়। যে সকল বস্তু জগকে সহজে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো-alkaloids, মদ, হরমোন, antibiotics, জৈব পারদ, ঘূমের ওষুধ, L. S. D. বিভিন্ন রোগ জীবাণু যেমন জার্মান হাম, সিফিলিস রোগের জীবাণু, আলোক রশ্মি (radiation) এবং মুখে গৃহীত জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড় ইত্যাদি।<sup>৬</sup> এ ছাড়া জরায়ুর বিশেষ আকৃতিগত দোষও জন্মগত ক্রটি' আনতে পারে।<sup>৭</sup>

### তথ্যসূত্র :

1. D. H. Carr., Heredity and Embryo, J. Science London, 6, 75, 1970.

2. Keith L. Moore, and A. M. A. Azzindani, *The Developing Human*, 3rd edn. W. B. Saunders Co. p. 140. 1983.
3. M., Bartalson, and T. A. Baromki, *Medical Cytogenetics*. The William and Wilkins Co, Baltimor, 1967.
4. W. R. Breg, *Autosomal abnormalities in endocrine and genetic diseases of childhood and adolescence* ed. by L. I. Gardner, 2nd edn. W. B. Saunders Co. Philadelphia, p. 730-762. 1975.
5. V. C. Vaughan, R. J., Mckay, and R. E. Behrman, *Nelson Textbook of Paediatrics*, 11th edn. W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1979.
6. T. V. N. Perraud, *Teratogenesis, Experimental Aspects and Clinical Implications*, Jena Gustav Fischer Verlag, 1979.
7. P. M. Dunn. *Congenital Postural Deformatics*, Brit. Med. J. 1976. p. 71.

## মানব জন্ম রহস্য আবিক্ষারের ইতিহাস

চিরকালই মানুষ মানব জন্ম পদ্ধতি সম্পর্কে কৌতুহলী। জন্ম সংক্রান্ত প্রাচীন কালের অধিকাংশ মতবাদ হাস্যকর এবং অবাস্তর, তবুও সেগুলো পড়ে দেখা উচিত। আমাদের বর্তমানের বিরাট জ্ঞান ভাস্তারের সমষ্টি এবং জৈববিজ্ঞানের উন্নতির যুগে এ কথা আমাদের ধারণায় আসবে না যে প্রাচীনকালে এ বিষয়টি তাদের কাছে কত রহস্যময় ছিল।<sup>১</sup>

প্রাথমিক যুগের মানুষ যৌনাঙ্গ ও শিশুর জন্ম সম্বন্ধে নানারূপ কুসংস্কার ও অদ্ভুত চিন্তার শিকার ছিল। এর ফলে যৌনাঙ্গ পূজার পদ্ধতিও চালু হয়েছে এবং এ নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক হয়ে গেছে।<sup>২</sup> আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও পুরুষ ও নারী যৌনাঙ্গের পূজা করা হচ্ছে ভারতের বিরাট জনসংখ্যা কর্তৃক। প্রাচীন মিশনারীয়রা নারীর যৌনাঙ্গকে কাপুরুষতার প্রতীক মনে করতো।<sup>৩</sup> পুরাতন বাইবেলে psalm লেখক বলছেন, ‘আমাকে পাপের মাধ্যমে আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছে।’ (Psalm-L15)

পুরুষ ও নারীর বীজের সংমিশ্রণের ফলে সন্তান উৎপাদন হয় সে সম্পর্কে প্রাচীন তৌরাত পঞ্চাদের কিছুটা ধারণা ছিল। তারা তাদের নবীদের মাধ্যমে এটাও জানতো যে আল্লাহ জীবন ফুঁকে দেন। কিন্তু তাদের ধারণা যে পুরুষের সাদা বীর্য শরীরের সাদা বস্তুসমূহ যেমন, হাড়, মগজ, চক্ষু ও দাঁত আর মেয়েদের লাল বীর্য (ঝুতস্বাব) গোশ্বত্ত, চামড়া, আঙ্গুল, নখ ইত্যাদি সৃষ্টি করে— এসবই ছিল মারাঘাক ভূল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের পিতা হিপোক্রেটিস (৪০০ খ্রি. পূ.)। তাঁর ধারণা ছিল যে পুরুষের বীর্যে বহু ক্ষুদ্র জীব রয়েছে যা সত্যিই খুব চমৎকার আন্দাজ ছিল। প্রেটোও এই ধরনের ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন।<sup>৪</sup>

এরিষ্টোটল (৩৫০ খ্রি. পূ.) বিশ্বাস করতেন যে, পুরুষ ও নারীর বিশেষ বস্তুর সংমিশ্রণে নব শিশুর জন্মান্তর হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রথম মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে বের হয়েছে। তার আরও ধারণা ছিল যে মা সন্তানের দেহের যন্ত্রপাতি দান করে, আর পুরুষের বীর্য মানুষের রূপ ধারণ করতে সাহায্য করে।<sup>৫</sup>

গ্যালেন (২০০ খ্রি.) বিশ্বাস করতেন যে, পুরুষ ও নারীর আলাদা আলাদা বীর্য রয়েছে যার মিলনে নবশিশুর জন্ম হয়। তাঁর ধারণা মূলত ঠিকই ছিল। তবে তিনি মনে করতেন যে যকৃত ও হৃৎপিণ্ড মায়ের রক্ত থেকে আর মগজ বাবার

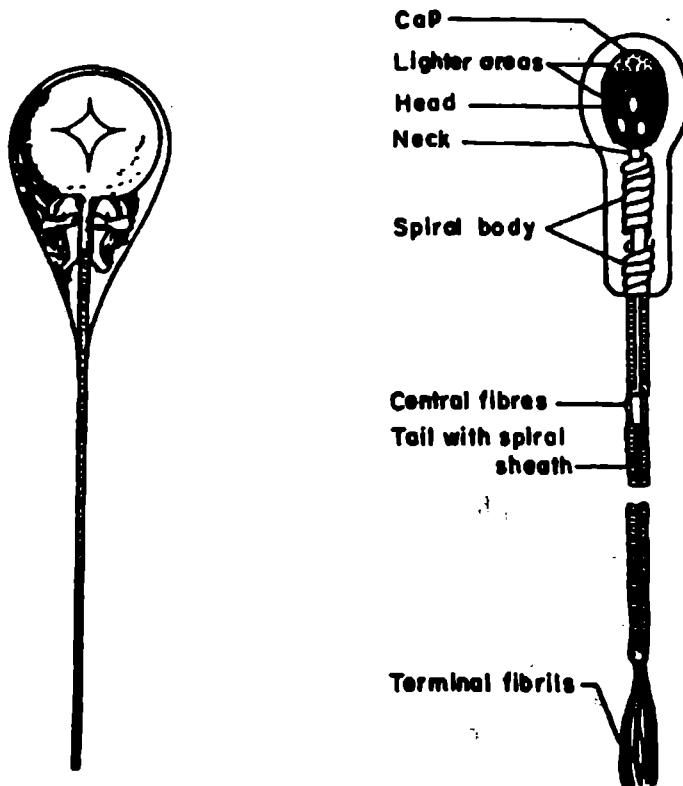
বীর্য থেকে তৈরী। তিনিই আবিক্ষার করেন যে পুরুষের অভক্তোষের মত নারীর শ্রী অভক্তোষ বা ওভারী রয়েছে এবং তিনি এটাও সঠিক সিদ্ধান্ত করেন যে নারীর অভক্তোষ থেকে নারী বীর্যপাত করে। এই ধারণা সত্যিই বিশ্বয়কর। মনে হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকলে তিনি শুক্রকীট ও ডিষ্ট আবিক্ষার করে ফেলতেন। তবে গ্যালেন মাতৃগর্ভে জনের ধীরে ধীরে বড় ইওয়ার ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। তার মতামত ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত জারী ছিল। তবে সবই অপ্রমাণিত মতবাদ মাত্র।

বিজ্ঞানী ফেরিসিয়াস (১৬০৪ খ্রি.) সর্বপ্রথম জুগ তত্ত্বের উপর পৃষ্ঠক প্রকাশ করেন। তাঁর বিশ্ব্যাত গ্রন্থ *de Formatione Ovi at Pulli* নামক গ্রন্থে তিনি ছবিসহ ডিম থেকে মুরগীর ছানা উৎপাদনের বিবরণ প্রদর্শন করেন। ১৬২১ সালে তিনি আরো ঘোষণা করেন যে শুক্র সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম এবং দূর থেকেও ডিষ্টকে গর্ভদান করতে পারে। অতঃপর ১৬৫১ সালে হারডে, তাঁর শিক্ষক পাদুয়ার ফেরিসিয়াসের মতবাদকে আরোও উন্নত করে এই নতুন মতবাদের নাম দেয় *Aura seminalis*. তিনি বলেন, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে বীর্য স্থাপনের পর তা মোটেই জরায়ুতে প্রবেশ করে না। কারণ যৌন মিলনের পর জরায়ুর ভিতরে এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা যৌন মিলনের পূর্বে ছিল না।<sup>৪</sup> তাঁর ধারণা শুক্র একটি বাল্প উত্থিত করে (*aura*) যা জরায়ুকে উত্তেজিত (কর্মক্ষম) করে। যার ফলে পার্থীর ডিষ্ট এবং মানুষের জরায়ুতে সন্তান উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে ফেরিসিয়াসের চিন্তাধারাকে হার্ডে ভুল পথে নিয়ে যায় এবং গ্যালেনের সঠিক ধারণাকে বর্জন করে।

১৬৭৪ সালে নিকোলাস মেইলব্রাউঁ *Encasement theory* নামে এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে মা-হাওয়ার ডিষ্ট কোষে গোটা মানবজাতির কিয়ামত পর্যন্ত সকল প্রজন্মের সমসংখ্যক ডিষ্ট ছিল এবং এক প্রজন্মের পর মহিলাদের ডিষ্ট কোষে একটি ডিষ্ট কমে যায়। একজন হিসাব করে বলেন যে ২০ কোটি প্রজন্মের পর মহিলাদের ডিষ্ট কোষে কোন ডিষ্ট থাকবে না এবং মানব জাতির অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। এই মতবাদে ডিষ্টকে সর্বাধিক শুল্ক দেওয়া হয়েছে বলে নিকোলাসের সমর্থকদেরকে *Ovists* বা ডিষ্ট সমর্থক বলা হতো। তাঁরা আরো মনে করতো যে ডিষ্টে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবশিশু স্ফুর্দু আকারে অবস্থান করে। অন্ন কিছুদিন পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিক্ষারক ওলন্দাজ টেকনিশিয়ান *Luewenhoek* তাঁর যন্ত্রে বীর্যের মধ্যে জীবিত শুক্রকীট (*sperm*) দেখতে পেয়ে ভাবলেন যে এগুলো স্ফুর্দু প্রাণী। তাই লিউয়েন হোয়েক ঘোষণা করলেন যে ‘সন্তান কেবল পিতার’ আর জরায়ুর কাজ হলো পাক ঘর বা তাপ প্রদানকারী স্থান বিশেষ- *a receptaculum seminis*, অর্থাৎ পুরুষের বীর্য গ্রহণকারী পাত্র মাত্র। এই মতবাদের অনুসারীদেরকে বলা হতো *Spermatists* বা শুক্রকীট সমর্থক। তাদের এসব কল্পনা এতদূর সম্প্রসারিত হলো যে ১৬৯৯ সালে বিশ্ব্যাত মন্টপিলার একাডেমী অফ সায়েন্সের সেক্রেটারী

Francois Plantades মানবের শুক্রকীটের এক ছবি প্রকাশ করে তার নাম দেন শুধু মানব শিশু (homunculus)। এরা ঘোষণা করলো যে তারা শুক্রকীটের মাথায় একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু দেখতে পয়েছে (ছবি-৪) যা মোটেই সত্য নয়। ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটি পূর্ণাঙ্গ শুক্রকীটের ছবিতে মানব শিশুর মতিক্ষের কোন সামান্যতম নির্দর্শনও দেখা যায় না (ছবি-৫)।

আর এক ওলন্দাজ বিজ্ঞানী De Graaf ১৬৭২ সালে সর্বপ্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিষ্ট্রিবিউশন বা ovum আবিষ্কার করেন এবং তিনি জরায়ু এবং তার সংশ্লিষ্ট নালি (fallopian tube) তে সেই ডিষ্ট্রিবিউশন দেখতে পান। De Graaf-এর এই চিত্রকার আবিষ্কারের পরও প্রায় আরো এক শতাব্দী পর্যন্ত ডিষ্ট্রিবিউশন ও শুক্রকীট সমর্থকদের (১৬৯৮-১৭৫০ খ্রি.) পিতা-মাতা উভয়ের মিলনে সন্তান উৎপন্ন হয় এ মতবাদ প্রচার করেন।



চিত্র : ৪

চিত্র : ৫

১৭৫০ সালে 'নিউহ্যাম' নামক এক রসায়নবিদ স্বতঃস্কৃত প্রজনন (spontaneous generation) নামে এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু ১৭৮৬ সালে ইতালিয়ান বিজ্ঞানী স্পেলানজানী এই মতবাদ ডুল প্রমাণিত করেন। ১৭৭৪ সালে উইলিয়াম হাট্টার তার পুস্তকে 'গর্ভাবস্থায় জরায়ুর এনাটোমি' সর্বপ্রথম জরায়ুতে অবস্থানরত মানব শিশুর প্রকৃত রূপ বিশ্ববাসীকে জানাতে সক্ষম হন। শ্রেইডেন এবং শোয়ান (Schleiden and Schwann) ১৮৩৯ সালে শরীর গঠনে জীব কোষের অবদান প্রমাণ করেন এবং এর মাধ্যমে histology এবং embryology (অণতত্ত্ব) বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৪৪ সালে বিশফ (Bischoff) ঝর্তু শ্রাবের সঙ্গে ওভারির ডিস্ক স্কুটনের সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। বেরি (Barry) ১৮৩৮ সালে শুক্রকীট কর্তৃক ডিস্কাগুর গর্ভ হওয়ার পদ্ধতি প্রকাশ করেন।<sup>১</sup> কিন্তু ১৮৫০ সালে লাইবিগ (Leibig) মানব শিশুর জন্ম রসায়ন প্রক্রিয়ার মতবাদ পেশ করে অণতত্ত্বকে অনেক পিছিয়ে দেন।<sup>২</sup> ১৮৫৬ সালে লুই পাস্তুর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জন্ম রহস্যের গবেষণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

এ পর্যন্ত জন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণা জন্মু জানোয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উইলহেলম হিস (Wilhelm His) ১৮৮০ সালে মানবীয় জৈববস্তুর উপর গবেষণা চালান এবং লাইবিগের রসায়ন মতবাদ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। মানব জ্ঞের উপর গবেষণা চালানো হয় মাত্র ১৯৪১ সালে।<sup>৩</sup>

মানব সৃষ্টির জন্ম রহস্যের পূর্ণ জ্ঞান মানুষ জানতে পেরেছে ১৯ শতাব্দীতে। কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে পুরুষ ও নারীর সংমিশ্রিত নৃৎকার বা কোটা থেকেই নব শিশুর জন্ম হয় (আয়াত ৭৬ : ২) এবং জরায়ুতে ধীরে ধীরে বৃক্ষিপ্তাণ্ড ভাগের বিবরণও দেওয়া হয়েছে (আয়াত ২২ : ৫ এবং ২৩ : ১২-১৪)।

এ কথা সত্য যে অনেক সময় মানব সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের নিজস্ব জ্ঞানের সঙ্গে কুরআনের জ্ঞানের মতভেদ হবার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, কুরআনের কথাই প্রকৃত সত্য। এমনিভাবে এখনও যে সব বিষয়ে কুরআনের সঙ্গে মানুষের বিজ্ঞানের মিল নেই সেখানেও কুরআনের কথাই অকাট্য সত্য বলে মেনে নিতে হবে। হয় তো ভবিষ্যতে মানুষ তার সত্যতা জানতে পারবে।

#### তথ্যসূত্র :

1. M.G. Muzzam, History of the mechanism of reproduction and the revelation in the Holy Quran, Pak. J. Sc. Vol. 14, No. 6, p. 281-298, 1962.

2. R. J., Mehta, Scientific curiosities of Love-life and Marriage, 11th edn. Bombay, 1960, India.
3. Herodotus, History Book II Cary Translation.
4. C.L. Evans, Principles of Human Physiology. 12th edn (1956): Churchill, London.
5. K. L. Moore, and A. M. A. Azzindani. The Developing Human with Islamic Additions, 3rd edn. Saunders & Dar Al-quibla, Jeddah, p., 120, 1983.

## পরিশিষ্ট-৮

### নিদ্রা

নিদ্রা হচ্ছে শরীরের বিশেষ করে স্নায়বিক তত্ত্বের সাময়িক বিশ্রামের অবস্থা। সারা দিনের কর্মকাণ্ডের পর এই নিদ্রা আমাদেরকে পুনঃ কর্মক্ষম করে তোলে, তাই এটা বিশ্রাম ও শক্তি সঞ্চয় করে যার ফলে দুর্বলতা দূর হয়। এর প্রতিফলন ঘটে শরীরের মাংসপেশীসমূহের কুণ্ডল হ্রাস, সচেতনতা হ্রাস এবং রাসায়নিক ও জৈবিক কর্মকাণ্ডের হ্রাসের মাধ্যমে। নিদ্রা শারীরিক শক্তি পুনরুদ্ধার করে। কারণ যদি কেউ জোর করে সজাগ থাকে তা হলে কিছুক্ষণ পর সহজেই ঘুম এসে যায়, আর এটা যে শক্তি সঞ্চয় করে তার প্রমাণ নিদ্রার পর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।<sup>১</sup>

নিদ্রা এমন একটি অবস্থা যার ফলে গোটা শরীর ও তার স্নায়বিক তত্ত্ব শক্তি পুনরুদ্ধার হয়। মন্তিক্ষে নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই নিদ্রায় সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় মন্তিক্ষ।<sup>২</sup>

নিদ্রার গভীরতার স্তর ভেদে ঘুমন্ত ব্যক্তির জ্ঞান লোপ পায়। যদিও একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি মুখের উপর মশা মাছি বসলে হাত দিয়ে তাড়িয়ে দেয় তবুও এ সম্পর্কে সে ওয়াকেবহাল নয় এবং এ কাজের কথা তার স্মরণও থাকে না। শরীরের জৈব ও রাসায়নিক ক্রিয়া যে হ্রাস পায় তার প্রমাণ ঘুমন্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এবং পাকস্থলীর হজম ক্ষমতার (metabolism) হ্রাস।<sup>৩</sup>

কেন নিদ্রা হয় তার কয়েকটি মতবাদ রয়েছে :

(ক) মন্তিক্ষে রক্ত সঞ্চালন হ্রাস পায় বলে এটা কতটুকু সত্য তা বলা মুশকিল, কারণ নিদ্রার সময় মন্তিক্ষের মোট রক্ত সঞ্চালন কমবেশী হয় না। হতে পারে যে, মন্তিক্ষের কোন বিশেষ অংশে (সম্ভবত মধ্যাংশ) রক্ত সঞ্চালন হ্রাস পায় এবং ঘুমের সময় মন্তিক্ষের সেই অংশটি প্রত্বাবারিত হয়।

(খ) স্নায়ুতত্ত্বের কেন্দ্রস্থলে অক্সিজেনের বন্ধনতা-দিনে ও রাতে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা এখানে দেখানো হলো :

	অক্সিজেন গ্রহণ	কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ
দিন (কর্মকাল)	৬৭.০%	৫৮.০%
রাত (নিদ্রাকাল)	৩৩.০%	৪২.০%

সুতরাং নিদ্রার সময় অক্সিজেন গ্রহণ এবং CO<sub>2</sub> ত্যাগের পরিমাণ হ্রাস পায়। এটা সর্বজনবিদিত যে, অতিরিক্ত CO<sub>2</sub> অস্থিতি ও অজ্ঞানতার কারণ। কিন্তু এই মতবাদ আজও প্রামাণিত নয় যে এই জন্য যে দিবসে কাজ করে শ্রান্ত না হলেও কেন ঘুম হয় আবার কেন কোন কোণ ব্যক্তি দিবসের যে কোন সময় ইচ্ছা করলেই ঘুমাতে পারে।

(গ) এই মতবাদ অনুযায়ী ঐচ্ছিক বা অনেকিক সকল অনুভূতির সঙ্গে মন্তিকের জীবকোষগুলোর রাসায়নিক ক্রিয়া দায়ী যার ফলে মনে কাজের ইচ্ছার সৃষ্টি হয়।

যখন বাইরের উত্তেজনা থাকে না-যেমন চোখ বদ্ধ করে বা মনকে ঘুমের জন্য তৈরি করে নিলে, তখন আর মনে কর্মোন্মাদনা হয় না এবং মানসিক শাস্তি বিরাজ করে। ২ এরপ ধারণা করা হয় যে, জাগ্রত অবস্থায় মন্তিকে নিদ্রা আনয়নকারী বস্তু সঞ্চিত হয় এবং পরে এর ফলে নিদ্রা এসে যায়। লিনডসলে-এর মতে “নিদ্রার কোন মতবাদই পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। রাসায়নিক মতবাদগুলো হলো, দূষিত বস্তু (toxins)-র বৃক্ষি, অতিরিক্ত CO<sub>2</sub>, স্বল্প O<sub>2</sub> অথবা নিদ্রা-উদ্দীপক (hypnotoxin) ট্রিপ্রিন সৃষ্টি। মন্তিকের বিশেষ এলাকায় (সম্ভবত diencephalon) সজাগ থাকার কেন্দ্র রয়েছে যার উপর ক্রমাগত উত্তেজক অনুভূতি আক্রমণ করে যা কাজকর্ম ও মাংসের কুণ্ডল দ্বারা ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কেন্দ্র কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণ মানুষ সজাগ থাকে। পরে যখন বিশ্রাম নেয় এবং মাংস কুণ্ডল দূর হয় তখন উত্তেজক আক্রমণ হ্রাস পায়; অঙ্ককার ও শাস্তি পরিবেশে মানুষত্বের উত্তেজনা আরোহাস পায়। যখন মন্তিকের সেই কেন্দ্রের কর্মক্ষমতা বিশেষ মানের নিচে নেমে আসে তখনই নিদ্রা আসে।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, কোন মতবাদই নিদ্রার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। এ বিষয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন।

ঘুমের দুটি স্তর রয়েছে যা একাধিকবার ঘোরাফেরা করে-এগুলো হলো NREM বা Non Rapid Eye Movement থীরে চক্ষু ঘূর্ণন বা স্বাভাবিক ঘুম আর REM (দ্রুত চক্ষু ঘূর্ণন) বা আন্দাভাবিক (paradoxical) ঘুম। মানুষ নিদ্রা গেলে সরাসরি স্বাভাবিক নিদ্রায় চলে যায়, যা থায় এক ঘটা স্থায়ী হয়। এরপর দ্রুত চক্ষু ঘূর্ণন সহ আন্দাভাবিক নিদ্রা চলে আসে যা ২ থেকে ১৫ মিনিট চালু থাকে। এরপর আবার স্বাভাবিক নিদ্রা চলে আসে। সাধারণত বয়স্কদের

ଘୁମେର ପ୍ରାୟ ତିନ ଚତୁର୍ଥୀଂଶି ସ୍ଵାଭାବିକ ନିଦ୍ରା, ଆର ନବଜୀତ ଶିଶୁର ବେଳାୟ ଏଇ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦେକ ।

“ଯଥିନ ନିଦ୍ରା ଆସେ ତଥନ ସାଧାରଣତ ଚକ୍ରଦୟ ମୁଦ୍ରିତ ଥାକେ । ଆଲୋଯ ଜ୍ଞାନ ଶୀଘ୍ର ଲୋପ ପାଯ ଯଦି ଚୋଖ ଖୋଲା ଥାକେ ତବୁଓ ଚୋଖେର ମଣି ଛୋଟ ହୟ ଯା ସଜାଗ ହଲେ ବେଶ ବଡ଼ ହୟେ ଯାଏ । ଏକମାତ୍ର ଶର୍ଷ ଅନୁଭୂତି ବିଶେଷ ନଷ୍ଟ ହୟ ନା । ତାଇ ସାମାନ୍ୟ ଶର୍ଷରେ ଗଭୀର ଘୁମ ଭେଙେ ଯାଏ । ଘୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଯ । ଆର ଘୁମ ଥିକେ ଜାଗାର ପର ସବଚେଯେ ଶେଷେ ଫିରେ ଆସେ ଶ୍ଵରଣଶକ୍ତି ଓ କଳନାଶକ୍ତି ଯା ସବଚେଯେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ । ମନ୍ତ୍ରିକ୍ଷେର ଯେ ଅଂଶ ଶରୀରେର ନଡ଼ାଚଡ଼ା ନିୟମିତ କରେ ତା ଦେଇତେ ଲୋପ ପାଯ । ତବେ ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଶେଷ ଜାନଙ୍ଗଲୋର ପୂର୍ବେଇ ମେହି କ୍ଷମତା ଫିରେ ଆସେ ।<sup>2</sup>

ମନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଶରୀରେର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନିଦ୍ରାଯ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରେ । କୋନ କୋନ ଅଂଶ ଯେମନ ହୃଦପିଣ୍ଡ, ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିକ୍ଷେର ପ୍ରଧାନ କର୍ମକେନ୍ତ୍ର (vital centres) ଓଲୋ ମୋଟେଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନା ।<sup>2</sup>

ନିଦ୍ରାର ପ୍ରୟୋଜନ ବୟାସେର ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୟ । ବୟକ୍ତଦେର ଦୈନିକ ୫-୮ ଘଟା ବା କିଛି ବେଶୀ ନିଦ୍ରାର ପ୍ରୟୋଜନ । ଯୁବା ବୟାସେ ମାନୁଷ ସହଜେଇ ଘୁମିଯେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବୟାସେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୁମ ସହଜେ ହୟ ନା ଅଥବା ହଲେଓ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗା ବା କମ ଗଭୀର ହୟ । ବୱୟାସକୁରଦେର ନିଦ୍ରାର ପ୍ରୟୋଜନ କମ, ଆର ଶିଶୁଦେର ପ୍ରୟୋଜନ ବେଶୀ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କୌଶଲେର ସାହାଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଦେଖା ଗେଛେ ଯେ, ମାନୁଷେର ଘୁମେର ବିଭିନ୍ନ ତର ଓ ପରିମାପ ରଯେଛେ । ଜାଧାତ ଲୋକେର ମନ୍ତ୍ରିକ୍ଷେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରତିଫଳନ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ୟ ଆଲାଦା ରକମ ହୟ, ତାରପର ଆସଲ ଘୁମେର ପ୍ରତିଫଳନ ଭିନ୍ନ ହତେ ଦେଖା ଯାଏ ।

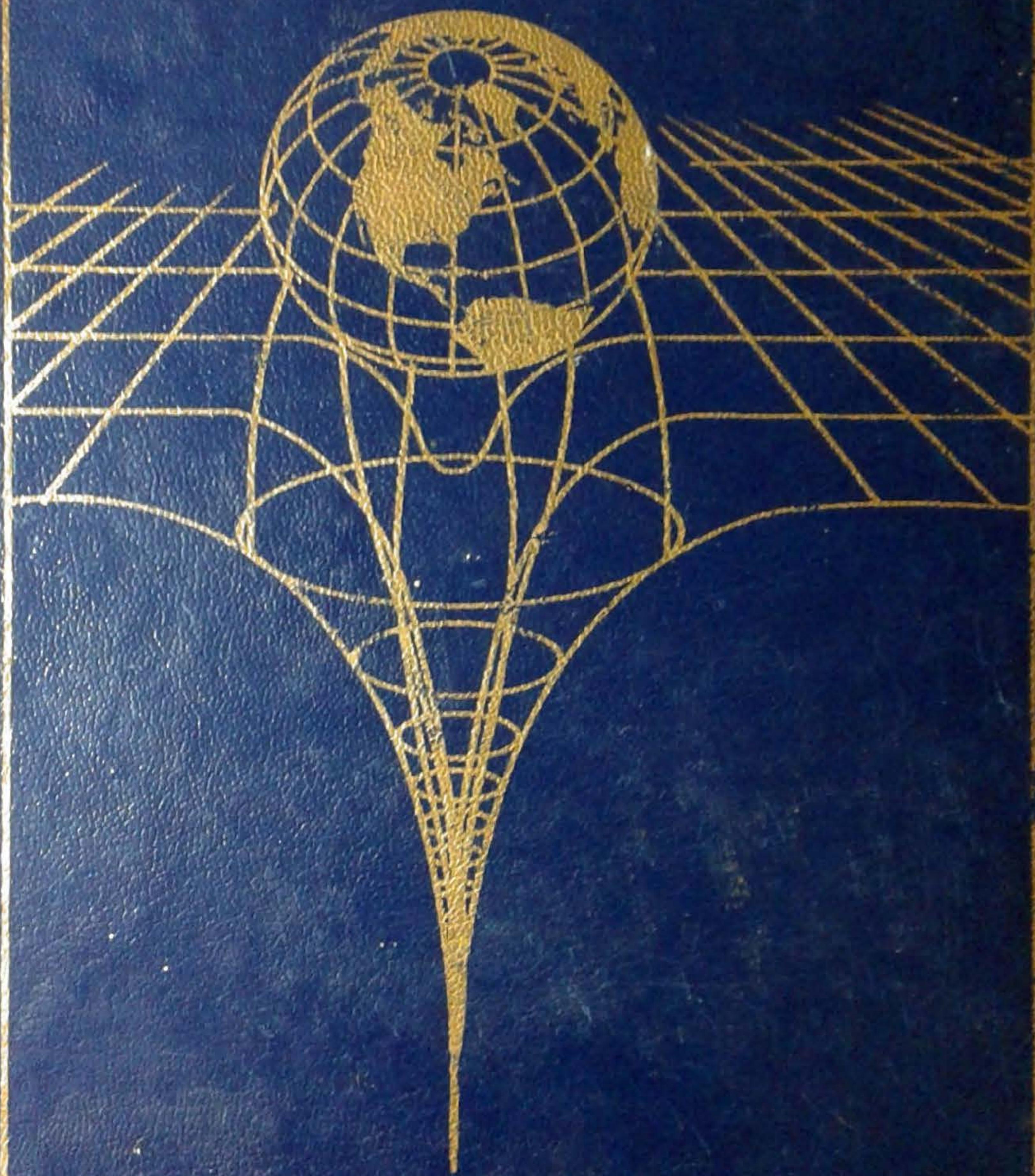
ଦେଖା ଗେଛେ ଯେ, ବେଶିର ଭାଗ ଲୋକ ଘୁମେ ନଡ଼ାଚଡ଼ା କରେ, ସମ୍ଭବତ ରକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଲନେର କ୍ରଟିର ଫଳେ ମାଂସେର ଉତ୍ୱେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ଦେଖା ଯାଛେ ଯେ, ସାଧାରଣତ ଏକଜନ ଘୁମଞ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୦-୩୦ ବାର ଶରୀରେର ଅବସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଗଡ଼େ ପ୍ରତି ୭ ମିନିଟେ ଏକବାର । ସୁତରାଂ ଏଜନ୍ୟ ବିଛାନା ବଡ଼ ହେୟା ଉତ୍ସମ ।

#### ତଥ୍ୟସ୍ତ୍ରୀ :<sup>3</sup>

1. D. B. Lindsley, Sleep. Colliers Encyclopaedia. Vol. 17, P. F. Colliers & Sons. Corp. New York. p. 639, 1956.
2. W. A. R. Thompson, Black's Medical Dictionary, 33rd edn. Adams and Charles Black, London, pp. 806-808, 1981.

# আল-কুরআনে বিজ্ঞান

Scientific Indications in the Holy Quran



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ